ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২২ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০]   ভারতী কার্য্যালয়,   [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২২ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

চিত্র-সূচী

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২২ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২২ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

চিত্র-সূচী



অশোক

(প্রাচীন চিত্র হইতে)
অধ্যাপক সমাদ্দারের অনুমত্যনুসারে

SEYNE

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২২ [৭ম সংখ্যা

আদ্যিকালের ছবি

যুগের পর যুগ মানুষ যে এই পৃথিবীতে বাস করছে তার অকাট্য নিদর্শন ও প্রমাণসকল আবিষ্কার করে ভূতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের মানবজাতি গুহাবাসী ছিল এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও নানা ব্যবহার্য্য সামগ্রী পাষাণ দিয়েই তারা রচনা করতো এবং শৃঙ্গ, দন্ত ও অল্পসল্প কাঠের কাজও তাদের জানা ছিল। এই পাষাণের যুগে ভারতবর্ষেও মানুষ ছিল এবং তাদের নানা নিদর্শন দক্ষিণভারত ও নর্ম্মদার তীরে পাওয়া যায়। যে সকল গুহায় আদি-মনুষ্যেরা বাস করে গেছেন তাদের অনেকগুলি থেকে —চকমকি পাথরের তৈরী তীরের ফলা, ছুরির বাঁট ইত্যাদি পাওয়া গেছে; আর সেই সঙ্গে তাঁদের হাতে লেখা নানা ছবিও ঐ সকল গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমি যে ছবিগুলির কথা বলছি সে সকল গুলিই ইউরোপের গুহাবাসীদের লেখা এবং পরে এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতেই একমত হয়েছেন। আমাদের দেশে ঐ যুগের চিত্রের নমুনা সম্প্রতি মধ্যভারতে রায়গড় নামক স্থানে রেলকোম্পানির এক সাহেব আবিষ্কার করেছেন। ইউরোপীয় ঐ শ্রেণীর চিত্রগুলির সঙ্গে তাদের এমন সৌসাদৃশ্য আছে যে মনে হয় যেন একই লোকের লেখা। এই ভারতীয় গুহাবাসীদের ছবিগুলি আমি দেখবার অধিকার মাত্র পেয়েছি কিন্তু এখনও প্রকাশের হুকুম পাইনি। ইউরোপীয় গুহাসকলের চিত্রাবলীর নমুনা Spearing সাহেব তাঁর The Childhood of Art নামক পুস্তকে প্রকাশ করেছেন; তারই নমুনা হ'তে আমরা বুঝি যে সেই আদিকালের মানুষের চিত্রকলার দক্ষতা বড় কম ছিল না।

এ হচ্ছে সেই সময়ের কথা মানুষ যখন তরুশাখা ছেড়ে পর্ব্বতগুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছে,—বিশ্বরাজ্যের অনেকটাই

ভীষণ নিবিড় রহস্যের মধ্যে মানুষকে যখন অসহায় শিশুর মত তার অশেষ আশঙ্কা নিয়ে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নিজের সত্ত্বারক্ষার জন্যে চারিদিকে কেবলি ধস্তা-ধস্তি করে চলতে হচ্ছে সে সময়ে ছবি-লেখার শক্তি তার ভিতরে জেগেছে এবং সে ছবি-লিখতে বসেছে এটা হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না;—যদিও বা বিশ্বাস করি তবে সে ছবি যে ঘুণাক্ষরের মত বা ছোট ছেলের ক খ লেখার মত নিতান্ত বাঁকা-চোরা ও অস্পষ্ট ছিল এটা বলতে আমরা কিছুমাত্র ইতস্তত করি না। কিন্তু যেটা অদ্ভুত, যেটা অঘটন, সেটাও দেখছি মানুষের ইতিহাসে ঘটে গেছে! আদিযুগের তাদের হাতে-লেখা শত শত ছবি পাষাণের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখা অতি অপূর্ব্ব একখানি ইতিহাসের মত দিনের পর দিন আমাদের চোখের সম্মুখে খুলে যাচ্ছে! এবং আমরা দেখছি চিত্রবিদ্যার সঙ্গে প্রথম এবং প্রকৃষ্ট পরিচয়ের এই ইতিহাস তারাই দিচ্ছে যাদের বিজ্ঞান ছিলনা, সাহিত্য ছিলনা;—যারা কেবল বিরাট এ বিশ্বরচনার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল—ঠিক একটি শিশু যেমন করে চেয়ে থাকে অপরিচিতের মুখে।

কালে কালে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় যত বেড়েছে ততই মানুষ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে শিল্পরচনা প্রকাশ পাচ্ছে তার আড়ালে যে রচয়িতা রয়েছেন তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে এবং নিজেদের শিল্পকে সাহিত্যকে সঙ্গীতকে যেন তাঁরই মহিমায় মানুষ বিশ্ব-রচয়িতার পরিচয় দূরে থাক্ বিশ্বের মধ্যে যেগুলি তাদের খুব নিকটে ছিল তারও পরিচয় যখন ভালো করে নিতে পারেনি তখন এই ছবি-লেখার নানা কৌশলের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখে আমরা আশ্চর্য্য না হয়ে থাকতে পারিনা। চিত্রের যে ষড়ঙ্গ—যেমন রূপ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ —সেই ছয়টারই সঙ্গে যে আদিম মানুষ কেমন সহজভাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এটা তাদের লেখা ছবিগুলি না দেখলে বোঝা কঠিন। রেখা রং এবং আলো-ছায়ার খেলা দিয়ে রূপের ডৌলটা হুবহু ফুটিয়ে তোলা, যেটি লিখছি সেটি, যা লিখছি বা যাকে লিখছি তার সমান হওয়া এবং ছবিটিতে ভাব ও লাবণ্য জুড়ে দেওয়া —এই হচ্ছে চিত্রবিদ্যার সমস্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুহাবাসী আদিমনুষ্যের লেখা ছবিতে আমরা এর একটারও অভাব দেখতে পাইনে। তাদের লেখা মহিষ, বরাহ, হরিণ শুধু এক একটা রূপের ছাপ নয়, তারা এক একটি ছবি—যার ভিতরে শিল্পীর মনকে আমরা যেন ধরতে পাই। সন্ধ্যার একটা রক্তরাগ আকাশ থেকে পৃথিবী পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, তারি মাঝে প্রকাণ্ড একটা নেকড়ে-বাঘের খানিকটা মুখ দেখা যাচ্ছে! এটা যদি ছবি না হয় তো ছবি আর কাকে বলি। দুইটা হরিণ আসছে, এক-ধারে নদী বয়ে চলেছে, জলে অনেক মাছ খেলা করছে, একটা হরিণ ঘাড় ফিরিয়ে যেন তার শাবক-

হরিণের দুটি চোখের আকারটি শিল্পী টুকে রেখেছে। একটা বরাহ লাফ্ দিয়েছে ; একটা ঘোড়া দৌড়ে চলেছে ; এক-পাল মহিষ, অনেকগুলো ঘোড়া ছুটেছে—একত্রে ঘেঁসাঘেঁসি।

এমনি সব ছোটখাটো দৃশ্য ; কিন্তু সেগুলি লেখা হয়েছে একেবারে পাকা চিত্রকরের মত। বাল্মীকির মুখের প্রথম শ্লোকের মত আদিমমনুষ্যের এই হাতের লেখা, তার মধ্যে কোথাও অসম্পূর্ণতা নেই!

কিসের জন্য তারা ছবি লিখ্ছে? কার জন্য তারা মুখের ভাষার অভাব সুনিপুণ রেখা ও বর্ণপাতের দ্বারা সম্পূর্ণ করে তুল্ছে?

ধরতে গেলে যে ভীষণ জন্তুগুলোর সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম কোরে তাদের বেঁচে থাকতে হয়েছিল তাদের মৃত্যুবাণ গুলোই উচিত ছিল তাদের নিপুণভাবে গড়া। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ঘটনাটাই ঘটেছে দেখছি। জীবজন্তুর ছবিগুলো লিখেছে তারা পাকা-হাতে, তার অস্ত্রগুলো গড়েছে অত্যন্ত কাঁচারকম! এক টুকরো পাথর কোনোরকমে ঘসে তারা বানিয়েছে তীরের ফলা, নয়তো হাতুড়ির মাথা। একটা পাহাড়ের গুহাকে কোনোরকমে পরিষ্কার করে নিয়ে বাস করেছে তারা তারি ভিতর অথচ চিত্রে সামান্য খুঁত্টাও তাদের সহ্য হয়নি!

অশ্রান্তভাবে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করবার জন্যই যার প্রস্তুত হবার কথা, সেটা না হয়ে ওঠে কেন সে চিত্রলেখায় রেখা ও বর্ণের ছন্দ-বাঁধায় পরিপক্ক? এ

আবার ধরতে গেলে যে পদার্থগুলো স্থির ও লেখা সহজ—যেমন গাছ পাতা ফল ফুল ইত্যাদি, সেইগুলোরই চিত্র করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু তা না করে তারা দেখছি লিখে চলেছে সেই গুলো যারা জীবন্ত—ছুটে বেড়াচ্ছে, খেলে বেড়াচ্ছে, গতিবিশিষ্ট এবং অস্থির! এরই বা অর্থ কি?

তবেই দেখছি মানুষ তদানিন্তন অবস্থায় বলের দ্বারা বিপদ-আপদ ঠেকিয়ে রেখে যে-কোনো-প্রকারে আপনাকে এবং সন্তান-গণকে রক্ষা করে চলাই একমাত্র কর্ম্ম বলে স্বীকার করেনি। শুধু যে তারা গৃহ-স্থালি করছে বা লড়াই করছে তা নয়, তারা দেখছি ছবি লিখে এক একটা ঘটনা, এক একটা ভাব বর্ণনা করছে! তারা যে শুধু বিশ্বরাজ্যে অবোলা জীবের মত একমাত্র আত্মরক্ষা ও সন্তানপালন নিয়ে ব্যস্ত, তা নয়। চোখ তাদের নানা পদার্থের পরিচয় নিচ্ছে, মন তাদের নানা রসের আস্বাদ পাচ্ছে, এবং তাদের নিপুণ অঙ্গুলি তখন থেকেই রেখার মধ্য দিয়ে রূপের মধ্য দিয়ে রঙের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলছে আপনাদের মনোভাবের নানা ছবি! তাদের ছবিগুলো দেখলে বোঝা যায় যে তারা দিনের অনেকখানি ধরে প্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্র গতিভঙ্গী এবং আলো-ছায়ার খেলা চলেছে তা নিরীক্ষণ করছে, উপভোগ করছে, সেগুলিকে নিরূপণ করছে ও সেটা চিত্রের দ্বারায় বর্ণন করে আনন্দ পাচ্ছে!

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই ছবিগুলো

যে কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য এগুলি রচনা করেছিল সেই কথাটাই বলেছেন। ছায়ার সঙ্গে কায়ার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দেখে আদিম মনুষ্যেরা সেই ছায়াকে পাকড়াও করে নানা জীবজন্তুর কায়াটির উপরে দখল জমাতে পারবে এই বিশ্বাসই যে এক সকল চিত্রের রচনার কারণ—এই কথাটি পণ্ডিতেরা বলেন। কিন্তু এটা তাঁরা ভুলে যান যে মানুষ তখন এত অক্ষম ছিলনা যে ছায়াবাজীর মন্ত্র দিয়ে গোরু-বাঁধবার জন্য তারা চেষ্টা পাবে বা কুশপুত্র পুড়িয়ে কারু জীবন-সংহারে উদ্যত হবে। তারা যাকে বাঁধতে চাইতো তাকে জোর করেই বেঁধে আন্‌তো; মারতো তারা পাষাণের আঘাতে নিজের হাতে। ঘরে বসে মন্ত্র পড়বার তাদের সময় ছিল না।

নিজের খাদ্য-সংগ্রহের জন্য হরিণের পিছনে দিনের পর দিন তারা মাঠে মাঠে ঘুরছে; বরাহ তাদের তেড়ে আস্‌ছে, বন্য মহিষ তাদের দিকে রক্তচক্ষু হয়ে দৃষ্টিপাত করছে নয়তো পাষাণ মুদ্গরের আঘাতে সে ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে!—এরি ছবি তারা লিখেছে। গ্রামবৃদ্ধ ধুনো জ্বালিয়ে বশীকরণ মন্ত্র আওড়াচ্ছে—এ ছবি প্রকৃতির তখনকার কৃতী সন্তান লিখে যায়নি। সেই সমস্ত পদার্থ যারা চোলতো না, বলতো না, তাদের কোনো চিত্র তারা দিয়ে যায়নি; যারা তাদের সঙ্গে লড়াই দিতে আস্‌তো, তাদের কাছ থেকে পালাতে চাইতো, তাদেরই মত অক্লান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতো, নির্ভীক নির্ব্বাক অথচ প্রাণের উচ্ছ্বাসে সেই আদিমমনুষ্যের প্রাণ টেনেছে এবং তাদেরই ছবি তারা লিখেছে—অতি যত্নে, মহা আনন্দে, রক্তের রাঙা আভা দিয়ে, ভীষণতার প্রগাঢ় ছায়া দিয়ে। আকাশ, বাতাস, রাত্রির অন্ধকার, বনের নিবিড়তা, ফুলপাতার বিচিত্রতা, মেঘের খেলা, এমন কি নানা কীট পতঙ্গ ও পক্ষীগুলির দিকে তারা লক্ষ্যই করেনি! যদিও এগুলো তাদের মনকে খুবই বিচলিত করতো সন্দেহ নাই কিন্তু এগুলোর সঙ্গে তারা যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না; এবং তাদের চিত্রগুলি থেকে এইটিই প্রমাণ হচ্ছে যে এগুলোকে তারা একটু ভয়ের চোখেই দেখ্‌ছে। মনে হয় যেন তারা এ সকল থেকে দূরেই থাকতে চেয়েছে। অন্ধকার আকাশে প্রকাণ্ড নরকপালখানার মত চন্দ্রের উদয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে বনের নিবিড়তা, হাওয়ার মাঝ-দিয়ে পাখীর সৃষ্টিছাড়া আশ্চর্য্যগতি—এ সবই তাদের মনকে ভয়েই হোক্ বা বিস্ময়েই হোক্ বিমুখ করে দেওয়া বই আকর্ষণ করতো না—নিশ্চয়। পাহাড়ের মধ্যে একটা নিত্যতা তারা অনুভব করেই তবে তাকে আশ্রয় করেছিল; চতুষ্পদ জীবগুলির সঙ্গে পৃথিবীর উপরে বিচরণ করা নিয়ে একটা যেন আত্মীয়তার ভাব তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল; তাই যেন পাখীদের অপেক্ষা এই সকল জীবজন্তুর খুব কাছে যেতে, তাদের যেন খুব কাছাকাছি পেতে, আদিমমানুষের প্রাণ চাইতো; এবং সেই প্রাণের টানই

শাস্ত্রের মারণ-মন্ত্রের কাজ করবার জন্যে এ ছবিগুলোর অবতারণা নয়;—প্রাচীন মানবের অবিশ্রান্ত জীবন-সংগ্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে যে ছুটি আসতো এগুলো সেই ছুটির খেলা;—এক-একটি দিনের অবকাশের এক-একটু আনন্দের ইতিহাস।

মা যেমন মরাছেলের খেলেনাগুলি গোপনে রক্ষা করেন তেমনি ধরিত্রী যেন তাঁর প্রথম-সন্তানের খেলার সামগ্রী—এগুলিকে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন যুগযুগান্তর ধরে এতদিন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেচারা

বিষ্ণু রায়বাবুদের বাড়ীতে মোসাহেবী করিত।

এই চাকরিটি সে যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জোগাড় করিয়াছিল তাহা নহে—বিনা চেষ্টায়, বিনা আয়াসে, একরকম আপনা-হইতেই এ কর্ম্মটি তার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। কবে হইতে তার এ কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহা সে নিজেই ঠিক জানে না;—বহুকাল পরে সে যখন একজন পাকা-মোসাহেব হইয়া উঠিল তখনই সে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিল।

যে রায়বাবুদের সে এখন মোসাহেবী করিতেছে ছেলেবেলায় তাদেরই সঙ্গে একত্রে সে স্কুলে পড়িত। রায়বাবুরা বড়-লোকের ছেলে;—তারা যে স্কুলে পড়িতে আসে এ ব্যাপারটাকে হেডমাষ্টার হইতে দরোয়ান পর্য্যন্ত এমনি করিয়া দেখিত যেন সেটা একটা তাদের মস্ত অনুগ্রহ!

রায়বাবুদের কাছে সমস্ত স্কুলটির এমনি ভাবে অবনত হইয়া থাকিবার কারণও যথেষ্ট ছিল। দশখানা গ্রামের মধ্যে এই শত্রুমুখে-ছাই-দিয়া জিয়াইয়া রাখিবার অন্য উপায় ছিল না, রায়কর্ত্তাদেরই মুখ-তাকাইতে হইত। নানা অনটন ও নানা অঘটনের মধ্যে পড়িয়া এই স্কুল-তরীটি যখন একবার মাঝ-দরিয়ায় ডুবু-ডুবু হইয়াছিল তখন রায়-কর্ত্তারাই ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তার পর থেকে বিপদ আপদে উঁহারাই একমাত্র ভরসা।

তা ছাড়া রায়বাবুরা যখন স্কুলে ভর্ত্তি হইল তখন হেডমাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলের অর্দ্ধেকের উপর মাষ্টারের প্রাইভেট টুইসনি জুটিয়া গেল। এবং যাদের জোটে নাই তারাও আশায় আশায় রহিল। কেহ রায়বাবুদের ইংরাজি পড়াইত, কেহ গণিত, কেহ বাংলা কেহ আর-কিছু, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল প্রাইভেট-টুউটরদের মাহিনা ছাড়া, পূজা-পার্ব্বণ ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষ্যে উপহার-উপঢৌকন-ইত্যাদি-আকারে অনেক উপরি-পাওনাও ছিল। এবং নীচের তলাকার চাকর-নফররাও যে রায়-বাবুদের করুণা হইতে বঞ্চিত হইত তাহা নহে।

রস সঞ্চয় করিত সেই কেন্দ্রটির পায়ে মাথা না ঠেকাইলে ধর্ম্মে সহিবে কেন?

এই স্কুলটিতে ছেলে খুব বেশী পড়িত না, এবং যারা পড়িত তারা সকলেই পাড়ার গরীবের ছেলে;—কেহই পূরা মাহিনা দিতে পারিত না। কাজেই তারা স্কুলের মধ্যে নগণ্য হইয়া ছিল। কেবল রায়বাড়ীর ছেলেরাই নিজেদের চারিদিকে ধনগৌরবের স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া স্কুলের মহিমা বর্দ্ধন করিত এবং নগণ্য ছাত্রদের সসঙ্কোচ দৃষ্টির আগে আগে থাকিয়া তাহাদিগকে আরো সঙ্কুচিত করিয়া তুলিত।

বিষ্ণুও ঐ নগণ্য ছাত্রদের একজন। কাজেই সহপাঠী হইলে কি হয় ছেলেবেলা হইতে রায়বাবুদের উপর একটা সমীহ রাখা তার প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া, তার বাপ-পিতামহ যে ঐ রায়বাবুদের অন্নে একরকম মানুষ বলিলেই চলে।

নগণ্য ছাত্রদের মধ্যে কেহই সাহস করিয়া রায়বাবুদের সহিত সমান হইয়া মিশিতে পারিত না। রায়বাবুরাও গরীবের ছেলের সঙ্গে মিশিয়া নিজেদের পদমর্য্যাদা নষ্ট করিবার কুশিক্ষা লাভ করে নাই। কাজেই সম্বন্ধ যতই নিকট হোক, সহপাঠীদের সহিত রায়বাবুদের ব্যবহার অত্যন্ত বিকট রকমেরই ছিল।

হঠাৎ একটা ছেলে একদিন কলিকাতা হইতে আসিয়া এই স্কুলে ভর্ত্তি হইল—একেবারে পূরা মাহিনা দিয়া। রায়বাবুরা

কাজেই এই ঘটনাটা স্কুলের সকলকেই একেবারে অবাক করিয়া দিল। ছেলেটির নাম সতীশ। তার বাপ কলিকাতার একজন বড় উকীল। সে কলিকাতায় লেখাপড়ায় মন দিত না—বদ্-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সেই জন্য তার বাপ তাকে এই গ্রামে তার কাকার কাছে পাঠাইয়াছেন। তার কাকা এখানকার মুন্সেফ।

সতীশ স্কুলে প্রবেশ করিয়াই পাড়াগেঁয়ে ভূতগুলোর প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা দেখাইতে লাগিল—রায়বাবুদেরও বাদ দিল না।

সতীশ ডবল ব্রেষ্ট সার্ট গায়ে দিত—চিনাবাড়ির চকচকে পম্পশু পায়ে পরিত এবং তার চোখে একজোড়া সোনার চশমা ছিল। রায়বাবুরা বড়লোক হইলে কি হয় সাজসজ্জার পারিপাট্য তাদের মোটেই ছিল না—পোষাক একেবারে সাদাসিধা।

এইখানেই সতীশ রায়বাবুদের একটা প্রচণ্ড ঘা দিল। এতদিন তারা সব-বিষয়ে সকলের চেয়ে বড় হইয়াছিল—কোথা হইতে একটা ছেলে আসিয়া তাদের সমস্ত মান-সম্ভ্রম যেন রসাতলে তলাইয়া দিল। সতীশ যখন-তখন সার্টের আস্তিন হইতে সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিত,—এসেন্সের গন্ধে চারিদিক ভরভর করিতে থাকিত। ছেলেরা তন্ময় হইয়া তাহা উপভোগ করিত, রায়বাবুদের মন কিন্তু আপশোষে জ্বলিতে থাকিত।

রায়বাবুরা জমীদার, সহজে দমিবার ছেলে নয়;—কেহ যে তাহাদের উপর টেক্কা দিয়া

গোলাপী-আতরের তুলো কানে গুঁজিয়া স্কুলে আসিতে আরম্ভ করিল।

সতীশ সেই দেখিয়া একদিন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং লেড-পেন্সিলের ছুঁচোলো মুখটা দিয়া তুলোর কুণ্ডলীর উপর একটা খোঁচা মারিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিল, বলিল—"What is that?" আতর-মাখানো তুলো কান হইতে খসিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

সতীশ তখন পেন্সিলের মুখটা নাকের কাছে একবার ধরিয়া নাকটা বিকৃত করিয়া বলিল—"What an obnoxious thing!" বলিয়া সে পেন্সিলের শিসটা পট্ করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। রায়বাবুদের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সতীশ তাদের দিকে না চাহিয়া ফস্ করিয়া ডবল-ব্রেষ্ট জামার আস্তিন হইতে চওড়া-পাড় রেশমী রুমাল বাহির করিয়া পেন্সিলের মুখটা একবার মুছিয়া লইল। তার পর আপন-মনে শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল।

রায়বাবুদের এক পোষা মুচি ছিল। সেই বাবুদের জুতো বানাইত। পূজার সময় তারই হাতের জুতো পায়ে দিয়া যখন রায়-বাড়ীর ছেলেরা বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইত তখন গ্রামের ছেলেরা লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই জুতোর দিকে চাহিয়া থাকিত—অনেক ছেলের প্রতিমা দেখার কথা মনেই থাকিত না। কিন্তু রায়বাবুরা যেদিন সতীশের পায়ে পম্পস্থ দেখিল সেই দিন তাদের জুতোর গুমোর ভাঙিয়া গেল।

রায়বাবুদের মুচি কখনো পম্পস্থ তৈরি করে নাই ...

সন্দেহ। বাবুদের ছেলেরা যখন তাকে পম্পস্থর ফরমাস দিল তখন জুতোর নাম শুনিয়াই তার মহা ভাবনা হইল। কিন্তু মুচির পো বড় চালাক ছেলে সে সহজে নিজের বিদ্যা ধরা পড়িতে দিল না। সে বলিল—"তার আর কি! এ কথা তো বল্লেই হ'ত—কোন্‌কালে বানিয়ে দিতুম। আমার পিসেমশায়ের খুড়ো কলকাতার সাহেব-বাড়ির মুচি ছিল—তার কাছেই আমার কাজকর্ম্ম শেখা—আপনাদের আশীর্ব্বাদে কোন্ কাজ শিখতে আমার বাকি? এমন জুতো বানিয়ে দেব যে চক্ষুস্থির হয়ে যাবে!"

মুচির পো মুখে সাওখুড়ি করিয়া গেল বটে কিন্তু কাজের বেলায় মনে মনে বিপদ গণিল। কি করিতে হইবে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কিছুদিন পালাইয়া পালাইয়া বেড়াইতে লাগিল। রায়বাবুরা খোঁজ করিয়া তাহাকে পাইত না। শেষে দ্বারবান দিয়া যেদিন তাকে ধরিয়া আনা হইল সে বলিল—"এ ত আর যে-সে কাজ নয়—এ পান্‌সি জুতো! এর অনেক সরঞ্জাম চাই, সে সব তো যোগাড় করতে হবে। তাড়া দিলে চলবে কেন?"

মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল, তাগাদার পর তাগাদা চলিতে লাগিল, তবু পম্পস্থ তৈরি হইয়া আসিল না।

মুচির পো ভাবিয়াছিল—এমনি করিলে বাবুরা শেষে হাল ছাড়িয়া দিবে কিন্তু সে দেখিল বেগতিক—বাবুরা কিছুতেই হাল ছাড়িতে চায় না, বরঞ্চ শক্ত করিয়া ধরে।

বলিল—"সরঞ্জাম সব তৈরি এখন বলুন কেমন পান্‌সি তৈরি করতে হবে। পান্‌সি তো আর এক রকমের নয়—হরেক রকমের।"

ছেলেরা পম্পসু সম্বন্ধে মুচির পোর মতোই অভিজ্ঞ, কাজেই এ কথায় পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। মুচির পো মনে মনে হাসিতে লাগিল—এমনটা হইবে সে গোড়া হইতেই জানিত, তাই সে সাহস করিয়া বুক ফুলাইয়া বাবুদের বাড়ী আসিতে পারিয়াছিল।

বড়বাবু বলিলেন—"কেমনতর জুতো হবে আমি দেখিয়ে দেব—তুই আমার সঙ্গে স্কুলে আসিস।"

পরদিন স্কুলে গিয়া মুচির পো সতীশের পায়ের পান্‌সি দেখিয়া আসিল।

যথাসময়ে এক অদ্ভুত চেহারার পম্পসু তৈরি হইয়া আসিল। রায়বাড়ীর ছেলেরা মহা ফূর্ত্তির সহিত নূতন জুতা পায়ে দিয়া মসমস্ শব্দে স্কুলময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সতীশ সেই শব্দ শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘাড় বেঁকাইয়া একবার জুতার দিকে চাহিল, তার পর চীৎকার করিয়া উঠিল—"Silence please!"

রায়বাড়ীর ছেলেরা থতমত খাইয়া গেল। সতীশ বলিল—"জুতার শব্দ করা ভয়ানক অসভ্যতা—জানেন কি? শিখুন!"

বাবুদের মুখ হেঁট হইয়া গেল। ছেলেদের সামনে এই অপমানে তাদের যেন মাথা কাটা গেল।

ব্যাপার ঐখানেই শেষ হইল না। সতীশ ঐ নূতন পম্পসুর গঠন সম্বন্ধে যে আর পায়ে দেওয়া চলে না—জলে ভাসাইতে হয়।

এমনি করিয়া সতীশ যখন-তখন যেখানে-সেখানে রায়বাবুদের ঠোকর মারিতে লাগিল। স্কুলের অন্য ছেলেরা তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইত। রায়বাবুদের মুখের উপর কথা বলিবার সাধ্য যে এ জগতে কারো আছে এ কথা তারা কল্পনাও করিতে পারিত না। এ যে দেখি তাও ছাড়াইয়া গেল—এ যে একেবারে অপমান!

সতীশের অপমানে রায়বাবুরা যে ইচ্ছা করিয়া চুপ করিয়া থাকিত তাহা নহে, চুপ না করিয়া উপায় ছিল না। সতীশ এমন সব ব্যাপার লইয়া ঠোকর দিত যাহা সতীশের বলিবার ধরণে রায়বাবুদেরও মনে হইত—হাঁ অদ্ভুত বটে! সতীশ সহুরে ছেলে—সভ্যতা সম্বন্ধে তার শিক্ষা, রুচি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা পাড়া-গেঁয়ে ছেলের চেয়ে ঢের বেশী—এ কথা রায়বাবুরা মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, কাজেই সেখানে তারা দুর্ব্বল ছিল। সেই জন্যই সতীশের সমস্ত অপমান তাদের নীরবে সহ্য করিতে হইত।

সতীশের আর-এক বিষয়ে প্রতিপত্তি ছিল। এর আগে সে কলিকাতার এক সাহেবী স্কুলে পড়িয়াছিল। সেইজন্য সে ফড়ফড় করিয়া ইংরাজি বলিতে পারিত এবং ইংরাজি উচ্চারণটা তার ভালোও ছিল। ক্লাসের মধ্যে মাষ্টারের ভুল উচ্চারণ লইয়া সে ছেলেদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা

ভুল উচ্চারণের বিরুদ্ধে রীতিমত সতর্ক করিয়া দিত। একদিন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে Pudding কথাটা পাওয়া গেল। মাষ্টার মশায় সেটাকে উচ্চারণ করিলেন—পাডিং! সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"Beg your pardon Sir! ওটা পুডিং হবে!"

মাষ্টারমশায় প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তীব্র স্বরে বলিলেন—"কে তোমাকে বল্লে পুডিং হবে?"

সতীশ বলিল—"Excuse me Sir! আমি খাস সাহেবের মুখেই ও কথাটা শুনেছি এবং অনেক বার ও জিনিষটার স্বাদও ইংরেজি হোটেলে গ্রহণ করেছি!"

মাষ্টারমশায় খানিকটা আমতা-আমতা করিলেন, তারপর চুপ করিয়া গেলেন। এর পর থেকে সতীশ সম্বন্ধে তাঁকে একটু সাবধান হইয়া চলিতে হইল।

ইতিপূর্ব্বে ইসারায়ও যদি কেহ রায়-বাড়ীর ছেলের প্রতি অসম্ভ্রম দেখাইত তাহা হইলে দ্বারবান থেকে হেডমাষ্টার পর্য্যন্ত অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিত এবং তার রীতিমত সাজা হইয়া যাইত। কাজেই সব ছেলে রায়বাবুদের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে চলিত। কিন্তু সতীশ সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটানো গেল না। একে সে সহুরে ছেলে—তার সঙ্গে পারা যায় না, তার পরে সে পূরা মাহিনা দেয়, সর্ব্বোপরি সে মুন্সেফ বাবুর ভাইপো! কাজেই তাকে আর-সকলের মতো হেনস্থা করা উকিল। ছেলের উপর উপদ্রব করিলে ফ্যাসাদে পড়িবার ভয়ও আছে। কে বলিতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের কানে সে কথা উঠিবে না। অনেক কষ্টের চাকরি কি শেষে যাইবে!—হেডমাষ্টার ও অন্যান্য শিক্ষকের সে ভয় গুরুতর ছিল।

সতীশের আচরণ দেখিয়া কিন্তু কয়েকটা ছেলের সাহস বাড়িয়া গেল। তারা মনে মনে রায়বাড়ীর ছেলেদের উপর চটা ছিল কিন্তু কিছু করিবার সাহস ছিল না—মনে মনে কেবল গুমরাইত। সতীশের সেই নির্ভিকতা তাদের মনের চটকা যেন ভাঙিয়া দিল।

একদিন টিফিনের ছুটির সময় হুটোপাটি করিতে করিতে একটা ছেলের ঠেলা খাইয়া সতীশ রায়বাড়ীর মেজোবাবুর গায়ের উপরে পড়িয়া গেল। মেজোবাবু সতীশকে কিছু বলিল না কিন্তু যে ছেলেটা ঠেলা দিয়াছিল ধাঁ করিয়া তাকে এক চড় কসাইয়া দিল। ছেলেরা এমন চড় আগে অনেকবার সহিয়াছে, গায়ে মাখে নাই, কিন্তু সেদিন আর সে পারিল না—সেও সজোরে এক চড় কসাইয়া দিল। মেজোবাবু উত্তেজিত হইয়া জুতা খুলিয়া তাকে মারিতে গেল—সতীশ তাড়াতাড়ি মাঝে আসিয়া বুক-ফুলাইয়া দাঁড়াইল—মেজোবাবুর হাতের জুতা হাতেই রহিয়া গেল।

এ ঘটনায় স্কুলের সমস্ত ছেলে একেবারে স্তব্ধ। কি ব্যাপার! রায়বাবু মার খাইল? এমন অঘটন তারা কখনো চক্ষেও

কানে এ কথা গেল। তিনি ছেলেটাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হেডমাষ্টারের ঘরের দিকে চলিতে লাগিল। সতীশ কাহাকেও কিছু না বলিয়া ক্লাস ছাড়িয়া তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

হেডমাষ্টার মনে করিতেছিলেন ছেলেটার একটা রীতিমত শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন—কিন্তু সতীশকে দেখিয়া তিনি দমিয়া গেলেন।

হেডমাষ্টার ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই চড় মেরেছিস্?"

ছেলেটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"হ্যাঁ!"

হেডমাষ্টার বলিলেন—"পূর্ণ! বেতগাছটা নিয়ে আয় ত।"

পূর্ণ বেত আনিয়া হাজির করিল;—হেডমাষ্টার হাতে করিয়া লইলেন।

ছেলেটা দূরে দাঁড়াইয়াছিল। হেডমাষ্টার বেতটা বাতাসের উপর দুই চারিবার শানাইয়া লইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"এ দিকে সরে আয় বল্‌চি!"

ছেলেটা কাতরভাবে চাহিতে চাহিতে এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সতীশ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে এইবার খপ্ করিয়া গিয়া ছেলেটার হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল—"দাঁড়া!"

হেডমাষ্টার চোখ পাকাইয়া বলিলেন—"সতীশ!"

সতীশ অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর করিল "Yes Sir!"

হেডমাষ্টার বলিলেন—"তুমি ক্লাসে যাও!

সতীশ বলিল—"Pardon Sir! 'am not an intruder!" বলিয়া সতীশ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

হেডমাষ্টার সতীশের দিকে আর না ফিরিয়া ছেলেটাকে ধমক দিয়া বলিলেন—"এদিকে আয়!"

সতীশ সজোরে তার হাত চাপিয়া রহিল।

হেডমাষ্টার তখন সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"সতীশ তুমি অন্যায় করচ।"

সতীশ মাথাটা একটা ইংরাজী ভঙ্গীতে নত করিয়া কথাটার উপর শ্রদ্ধা দেখাইল। তার পর মুখ তুলিয়া বলিল—"If you allow my criticism Sir, তাহলে বলি, আমি অন্যায় করিনি—Your Sirship অন্যায় করছেন স্নবোধের তো কোনো দোষ নেই—আমিই মেজোবাবুর ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিলুম—তাতে তিনি রেগে স্নবোধকে মেরেছেন। স্নবোধ মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দিয়েছে—and I admire his bravery!" বলিয়া স্নবোধের পিঠটা সে একবার থাবড়াইয়া দিল।

হেডমাষ্টার একটু চুপ করিয়া রহিলেন!

সতীশ একটা দুষ্ট চাহনি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল—"কলকাতার এক Class-friendএর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি Sir, সেখানে স্কুলে বেত-মারা তুলে দেওয়া হয়েছে।"

হেডমাষ্টার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। তার পর স্নবোধকে সে দিনকার

খোঁজ করে দেখব—দোষ কার? এখন তোমরা যাও।"

কিন্তু সে খোঁজ সেইখানেই শেষ হইয়াছিল;—এ সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য হয় নাই।

সুবোধ কথনো বেত খায় নাই—বেত দেখিয়া তার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গিয়াছিল। বেতের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সে ভালো করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সতীশ যে তাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে সে জন্য একটা কৃতজ্ঞতা সে মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না বটে কিন্তু তার সমস্ত দেহ দিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পাড়াগেঁয়ে ভূত বলিয়া সুবোধের প্রতি সতীশ কোনো দিন ভালো করিয়া তাকায় নাই কিন্তু আজ সুবোধের সেই আশঙ্কাপীড়িত করুণ মুখখানি দেখিয়া অবধি তার প্রতি কেমন একটি স্নেহের উচ্ছ্বাস তার অন্তর পূর্ণ করিয়া তুলিতে-লাগিল। সুবোধ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল;—সতীশ তার হাত ধরিয়া বলিল—"চল্ ভাই, ক্লাসে যাই!"

সুবোধের জন্য ক্লাসসুদ্ধ ছেলে শঙ্কিত হইয়া ছিল! যখন শুনিল তার কোনো শাস্তি হয় নাই তখন তারা একেবারে অবাক হইয়া গেল। সতীশ যে একেবারে অঘটন ঘটাইয়া দিল! আশ্চর্য্য ক্ষমতা! সেই মুহূর্ত্ত হইতে সতীশের শক্তির অসীমতার উপরে তাদের একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল।

এখন হইতে সতীশকে দলপতি করিয়া রায়বাবুদের উপর তাদের যে সমীহ ছিল তাহা কর্পূরের মতো উবিয়া গেল।

এই দলে সকলেই যোগ দিল কিন্তু বিষ্ণু পারিল না। বিষ্ণুর এই ছেলে-বয়সেই বুদ্ধি পাকিয়াছিল। সে বুঝিল সতীশ ঝড়ের মতো দুদণ্ডের জন্য আসিয়া পড়িয়াছে;—রায়-বাবুরা চিরদিনের,—চিরজীবনের। সতীশের ঝড়ে পড়িয়া সে যে কোথায় গিয়া পড়িবে তার ঠিক নাই। সেই জন্য সতীশকে সে বড় ভয় করিত। এই অল্পদিনের জীবনের মধ্যেই বিষ্ণু অনেক দুঃখ পাইয়াছে, অনেক দেখিয়াছে। তার বাপ কত ফিকির-ফন্দি করিয়া, কত হিসাব করিয়া তাদের দুঃখের সংসার চালাইত তাহা সে প্রতিদিন দেখিয়া আসিতেছে। বিপদে-আপদে রায়বাবুরা যে তাদের একমাত্র ভরসা তাহা সে এত টুকু বেলা হইতে বুঝিয়াছে। সে যে স্কুলে বিনা-বেতনে পড়ে তাহা রায়বাবুদের দৌলতে। সে যে জুতা জামা কাপড় পরিয়া স্কুলে আসে তাও তার বাপ রায়বাড়ী হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া জোগাইয়াছে। শুনিয়াছে তার পিতামহ একসময় দেনার দায়ে জেলে যাইতে বসিয়াছিল, সে-সময় স্বর্গীয় রায়কর্ত্তারা তাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কথা বিষ্ণুর মনে জাজ্বল্য হইয়া ছিল। সে দিবারাত্র ভিতরে-বাহিরে রায়-বাবুদের করুণা বহন করিয়া বেড়াইত—কাজেই তাদের বিরুদ্ধ-দলের সহিত যোগ দেওয়া কিছুতেই তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ছেলেরা অনেক টিটকারি দিল—খোসা মুদে বলিয়া তাকে উপহাস করিল কিন্তু

রায়বাবুরা স্কুলের ছেলেদের দ্বারা যখন এমনি ভাবে অপমানিত হইল তখন তারা মনে মনে খুব চটিয়া উঠিল বটে কিন্তু সতীশ আছে বলিয়া কিছু করিতে সাহস পাইল না। তাকে ঘাঁটাইতে গেলে অপমানের বোঝা বাড়িবে বই কমিবে না। সতীশ যদি না থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় ছেলেগুলোর হাতে-মাথা-কাটা হইত।

ছেলেদের প্রতি তারা একরকম উদাসীনই ছিল;—কেবল নিজেদের গর্ব্বপ্রকাশের জন্য তাদের একটু আবশ্যক ছিল, এখন সে প্রয়োজনেরও মায়া কাটাইয়া রায়বাবুরা ছেলেদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব ধারণ করিল। মনে হইয়াছিল, এই ঔদাসীন্য ছেলেদের আঁতে গিয়া লাগিবে; কারণ তারা স্বচক্ষে প্রতিদিনই ত দেখে তাদের বাপ খুড়ার একটু প্রসন্ন মুখ, একটু সদয় চাহনি লাভ করিবার জন্য এই সব ছেলেদেরই বাপ-দাদারা উমেদার হইয়া ফিরিতেছে;—বড়-মানুষের এতটুকু কৃপাকণা পাইলে তারা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করে,—এরা তো তাদেরই ছেলে! কিন্তু স্কুলের ছেলেরা তাদের ঐ উদাসীনতায় মোটেই বিচলিত হইল না, বরং এমনি ভাব দেখাইল যে তারা উহা গ্রাহ্যই করে না। বাবুদের মন ভারি দমিয়া গেল এবং ছেলেদের উপর একটা আক্রোশ বাড়িতে লাগিল। তখন তাদের মনে হইতে লাগিল, বড়মানুষের অনুগ্রহ লাভ করাটা যে কী তাহা ছেলেদের একবার সমঝাইয়া দেওয়া চাই; তাহা না হইলে কেমন করিয়া বুঝিবে যে তারা গিয়াই পড়িল—কারণ শ্রদ্ধার সহিত অনুগ্রহ গ্রহণ করে এমন ছেলে তো আর ছিল না।

বিষ্ণুর তখন আদর দেখে কে! রায়বাবুরা তার সহিত এমন ব্যবহার আরম্ভ করিল যেন সে তাদেরই এক ভাই! সর্ব্বদা বিষ্ণুকে কাছে-কাছে রাখা, একসঙ্গে স্কুলে আসা, স্কুল থেকে যাওয়া, টিফিনের সময় একসঙ্গে খাবার ভাগ করিয়া খাওয়া—এই রকম খুঁটিনাটি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বরকমে তাকে অনুগ্রহে একেবারে প্লাবিত করিয়া তুলিতে লাগিল। কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকিতে দিল না। সাজসজ্জার ডৌল তার ফিরিয়া গেল—এখন আর সে ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া জামা নাই, এখন সব ঝকঝকে চকচকে! এক সতীশ ছাড়া এমন পারিপাট্য আর-কারো ছিল না। ছেলেদের ঈর্ষা উদ্রেক করিবার জন্য তাদের চোখের সাম্‌নে রায়বাবুরা বিষ্ণুকে লইয়া একেবারে মাতিয়া থাকিত। যে রায়বাবুরা গুমোরে কারো সহিত ভালো করিয়া কথা কহিত না, তারাই আজ বিষ্ণুর পরামর্শ না লইয়া এতটুকু কাজও করে না। অনেক সময় এরা দেখাইয়া দেখাইয়া নিজেদের চেয়ে ভালো জিনিষ বিষ্ণুকে দিত এবং নিজেরা ছোটো হইয়া থাকিয়া বিষ্ণুকে বড় করিয়া ধরিত।

বিষ্ণু রায়বাবুদের দেবতার মতো দেখিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই বিষ্ণু যখন দেখিল, যে-রায়বাবুরা তার ছায়া মাড়াইতে ঘৃণা করিত—কাছে পড়িলে মুখ বাঁকাইয়া

কাছে, হাত ধরিয়া কথা কহিতেছে, তখন তার ছোটো মনটি গুটাইয়া আরও ছোটো হইয়া যাইতে লাগিল। রায়বাবুদের কাছে আগে তার যতটা সঙ্কোচ ছিল এখন তার চেয়ে ঢের বেশী সঙ্কোচ সে ভিতরে ভিতরে বোধ করিতে লাগিল। এতটা দয়ার যোগ্য সে কিছুতেই নয়—এই তার দৃঢ়বিশ্বাস। সেইজন্য রায়বাবুদের এতখানি অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে তার বুক কাঁপিত, হাত কাঁপিত—কিন্তু মনের ভিতর হইতে এমন সাহস পাইত না যে সেই ভয়টুকুও সে প্রকাশ করে। সে যেন কলের পুতুল; রায়বাবুরা যাহা দিত মাথা নীচু করিয়া তাহা গ্রহণ করিত। তার অন্তরের মধ্যে তার অযোগ্যতার যে কুণ্ঠা ছিল তাহা প্রকাশ করাও হইয়া উঠিতনা। এমন সাহস তার কোথায় যে রায়বাবুদের সামনে দাঁড়াইয়া যেমন-হোক্ দুটো কথা সে কহিতে পারে?

বিষ্ণুর অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সে কৃতজ্ঞতাও সে কথা দিয়া প্রকাশ করিতে পারিতনা, কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস বাড়িয়াই চলিতেছিল। এ কি কম কথা! রায়বাবুরা তাকে ভায়ের মতো দেখে! এ কথা ভাবিতেও যে তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! কিন্তু তাই তো সে পদে পদে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে! সে মুখে কিছু বলিতে পারিত না কিন্তু তার মনটা রায়বাবুদের পায়ের তলার ধূলোর মধ্যে লুটাইতে থাকিত। তার মনে হইত—আর কিছু নয়, রায়বাবুদের ঐ পা জড়াইয়া মাটিতে লুটাইতে পারিলে যেন তার জীবন তৃপ্ত হইয়া যায়।

নাই;—মনে হইয়াছিল রায়বাবুদের এ পরিহাস! কিন্তু পরিহাস তো আর দিনের পর দিন চলে না। কাজেই এতবড় অসম্ভব ব্যাপারটা তাকে বিশ্বাস করিতেই হইল। তার পর একদিন যখন বড়বাবু সকলকার সামনে তাকে বিষ্ণুদা বলিয়া ডাকিল এবং তার দেখাদেখি অন্য ভায়েরাও তাই বলিতে লাগিল, তখন তার মনের অবস্থাটা যে কি হইল তাহা ঠিক বর্ণনা করা যায় না। সে কোথাকার কে—এক অতি নগণ্য গরীবের ছেলে, তাকে মহাপ্রতাপান্বিত রায়বাবুরা দাদা বলিয়া ডাকিতেছে—এর চেয়ে সৌভাগ্য জগতে আর-কিছু আছে বলিয়া বিষ্ণু মনেই করিতে পারে না। তার মতো গরীবের উপর রায়বাবুদের যে এতখানি দয়া তাহা বহন করিবার মতো শক্তি যেন সে নিজের মধ্যে হাতড়াইয়া পাইতেছিল না! এ যেন তার এতটুকু হৃদয়ের উপরে একেবারে আচম্‌কা এক বন্যার মতো আসিয়া পড়িয়াছে—সে দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল।

গোড়া হইতেই বিষ্ণু রায়বাবুদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এখন হইতে একেবারে তার সমস্ত প্রাণটা তাদের কাছে দিবারাত্র প্রণত হইয়া রহিল। এমন কি, যদি মনে হইত রায়বাবুদের কঠিন ভূমি মাড়াইয়া চলিতে কষ্ট হইতেছে তবে বুকখানা সেইখানে পাতিয়া দিবার জন্য তার প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি করিত। তার মন বলিত, আর ত উপায় নাই—এমনি করিয়াই তো অন্তরের ঋণ পরিশোধ

ছেলেরা বিষ্ণুকে দলে টানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল—অনেক সাধ্যসাধনা করিল, অনেক ভয় দেখাইল, গাল দিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিষ্ণু যে স্বপ্নেও রায়বাবুদের বিরুদ্ধে যোগ দিতে পারে এমন বিশ্বাস তার ছিল না। সে ছেলেদের স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। তাদের জন্য সময় সময় তার একটু দুঃখ হইত,—হায়, গোঁয়ার সতীশের পাল্লায় পড়িয়া ছেলেগুলো কী সর্ব্বনেশে কাণ্ড করিতেছে! তারা কি জানে না ইচ্ছা করিলে রায়বাবুরা তাদের রাখিতে পারে,—মারিতে পারে!

ছেলেরা যখন বিষ্ণুকে কিছুতেই বাগাইতে পারিল না তখন তারা তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে টিট্‌কারি দিতে লাগিল। এমন সব কথা বলিতে লাগিল যাতে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা শক্ত। রায়বাবুরা কিন্তু এই টিট্‌কারি বিশেষভাবে উপভোগ করিত। কারণ তারা বুঝিত এ টীটকারি তো আর-কিছু নহে—বিষ্ণু যে আদর পাইতেছে তারই জন্য এ গায়ের জ্বালা! যতই এই গায়ের জ্বালা প্রকাশ পাইত, রায়-বাবুরা ততই খুসি হইয়া উঠিত।

বিষ্ণু প্রথম প্রথম এই টিট্‌কারিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু যেদিন দেখিল রায়বাবুরা তাহাতে খুসি, তখন তারও মনটা খুসি হইয়া গেল। তখন সে কামনা করিতে লাগিল—উহারা যত পারে টিট্‌কারি দিক্! আমাকে অবলম্বন করিয়া এই যে রায়-বাবুদের মন খুসি হইয়া উঠিতেছে এ তো আছে যে রায়বাবুদের আমি খুসি করিতে পারি! ছেলেদের টিট্‌কারিতে রায়বাবুরা যখন হাসিত বিষ্ণুও সে হাসিতে যোগ দিয়া রসান দিত। শেষে ছেলেরা দেখিল এমন বেহায়ার সঙ্গে পারিয়া ওঠা শক্ত।

বিষ্ণু রায়বাবুদের কাছে একেবারে পুতুল বনিয়া গিয়াছিল বলিয়া বিষ্ণুকে লইয়া যা ইচ্ছে তাই করিতে তাদের আটকাইত না। নইলে এতটা কি সম্ভব হয়? খেলার পুতুল শিশুদের ইচ্ছায় কোনো বাধা দেয় না, তাই ছেলেরা পুতুল এত ভালোবাসে—পুতুল যদি জীবন্ত হইত তাহা হইলে ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই তার বনিত না। রায়বাবুরা যে দিন অনুভব করিল বিষ্ণু পুতুলেরই মতো, সেই দিন হইতে বিষ্ণুকে লইয়া খেলা করিয়া মজা দেখিবার প্রবৃত্তি মনে জাগিয়া উঠিল। বিষ্ণু সে খেলার প্রতিবন্ধক হইত না, সেই জন্য খেলা দিন দিন জমিয়াই উঠিতেছিল—নইলে কবে ভাঙিয়া যাইত!

একদিন রায়বাবুরা বিষ্ণুকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। বিষ্ণু একেবারে গলিয়া গেল। তার পর রায়বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিল, বাবুদের সঙ্গেই তার আসন পাতা হইয়াছে তখন সে একেবারে অবাক! ইহার পূর্ব্বে সে পূজার সময় বাপের সহিত রায়বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছে বটে কিন্তু তখন আহারের স্থান হইত উঠানে। কিন্তু এ যে একেবারে বাবুদের খাসমহলে! এবার পাতা পাড়িয়া নহে—রূপার বাসনে! সে বাবুদের সঙ্গে

ভালো করিয়া আহারে মনই দিতে পারিল না। রায়বাবুরা তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তখন তারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু যতই পীড়াপীড়ি হয় ততই আরো সঙ্কোচে তার হাত গুটাইয়া আসে। বাড়ীতে যখন সে খাইতে বসে—কেহ তার খোঁজও লয় না; ভাত ঢাকা পড়িয়া থাকে সে ঢাকা খুলিয়া আপন-মনে গলাধঃকরণ করিয়া যায়—কম পড়িল কি না এ প্রশ্ন যে উঠিতে পারে এ ধারণাই তার ছিল না। আজকের এই পীড়াপীড়িতে, এই আদর-যত্নে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

বিষ্ণুকে যতই খাইতে বলা হয়, সে খাইতে পারে না—ইহাতে রায়বাবুরা মজা পাইয়া গেল। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন এক ভাই আসিয়া জোর করিয়া বিষ্ণুর মুখের মধ্যে খাবার পুরিয়া দিল। বিষ্ণুর গলা তখন কাট—খাবার সে গিলিতে পারিবে কেন? বাবুর সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে খাবারের পর খাবার পুরিয়া যাইতে লাগিল। বিষ্ণু গিলিতেও পারে না, ফেলিতেও পারে না। শেষ গাল দুটো ফুলিয়া যখন চোখ অবধি ঠেলিয়া আসিল, তখন তার সেই মূর্তি দেখিয়া রায়বাবুরা সমস্বরে হো-হো-করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিষ্ণু ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এ মজাটা বিষ্ণু নিজে না দেখিলে পুরা জমিবে না বলিয়া ছোটোবাবু ছুটিয়া গিয়া একখানা আয়না আনিয়া বিষ্ণুর মুখের সামনে ধরিল। বিষ্ণু খানিকক্ষণ নিজের মুখের দিকে সেই মূর্তির পানে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল—তার পর তার দুই চক্ষু দিয়া টস্-টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। রায়বাবুরা আবার যেমন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বিষ্ণু মুখের খাবার ফেলিয়া দিয়া তাদের সঙ্গে উচ্চ হাস্যে যোগ দিল—তখনও তার চোখের জল শুকায় নাই। জানি না, তার জীবনের এই প্রথম রাজভোগ বিষ্ণু পান্তাভাতের চেয়ে বেশী উপভোগ করিয়াছিল কি না!

ইহার অল্প দিন পরে আর একটা মজা হইয়া গেল! রায়বাবুদের এক ভাগ্নে—ছোট্ট ছেলে—রামায়ণের গল্প শুনিয়া হনুমান দেখিবার বায়না ধরিল। ছেলেটি সম্প্রতি শক্ত রোগ হইতে উঠিয়াছে—এ সময়কার বায়না দীর্ঘস্থায়ী হইলে শরীরের ক্ষতি হইতে পারে মনে করিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হনুমান এখন পাওয়া যায় কোথা? অগত্যা বিষ্ণুকেই হনুমান সাজিতে হইল। দুই গালে ভুষা মাখিয়া লম্বা ল্যাজ পরিয়া তাকে গাছের ডালে গিয়া বসিতে হইল। তার সেই মূর্তি দেখিয়া ছেলেটি হাসিয়া খুন—আর সকলেও হাসিতেছিল। বিষ্ণুরও একবার মনে হইয়াছিল হাসে, কিন্তু পাছে হাসিলে হনুমানী নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে সে হাসি চাপিয়া গেল।

পরদিন ছেলেদের কানে এ খবরটা কেমন করিয়া গিয়া পৌঁছিল। তারা বিষ্ণুকে লইয়া ক্ষেপাইতে লাগিল। বিষ্ণু তাদের কথা হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যা-হ্যাঃ করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তবুও যখন ছেলেরা ছাড়িল না তখন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল—“জান ত, হনুমানের জন্যেই রাক্ষসকুল নির্মূল।”

রায়বাবুদের উপর সতীশের এখন আর তেমন দৃষ্টি ছিল না। প্রথমটা তাদের যতটা অদ্ভুত সে দেখিয়াছিল, এখন আর তেমন বোধ হয় না—তাদের অনেক খোঁচ-খাঁচ সমান হইয়া গেছে। সে এখন ফুটবল ক্লব, ডিবেটিং ক্লব প্রভৃতি লইয়াই মাতিয়াছিল,—রায়বাবুদের কথা লইয়া মাথা-ঘামাইবার সময় ছিল না। রায়বাবুরা কিন্তু সতীশের দাম্ভিকতা ভুলিতে পারে নাই—যদি কখনো বাগে পায় একবার শিক্ষা দিবে এ সংকল্প তাদের মনে মনে ছিল।

বিষ্ণু অন্য ছেলেদের গ্রাহ্য করিত না—তারা কি করে, না করে তার জন্য সে কিছুমাত্র চিন্তিত ছিল না; কিন্তু সতীশকে সে মনে মনে ভয় করিত। এ ভয়টা যে কেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিত না। তবুও সতীশের নামে তার বুকটা কেমন দুর্‌দুর্‌ করিয়া উঠিত। তার মনে হইত—সে যেন ইচ্ছা করিলে একটা প্রলয় বাধাইয়া দিতে পারে। পাছে সে সতীশের কোপদৃষ্টিতে পড়ে এই জন্য তার মনে একটা আতঙ্কও ছিল।—সেই জন্য প্রকাশ্যভাবে সতীশের কোনোরূপ বিরুদ্ধতা করিবার সাহস তার ছিল না। বরঞ্চ সুবিধা পাইলে এমন ভাব সে বাহিরে দেখাইত যে সতীশের সে অনুগত। রায়বাবুরা অনেকবার সতীশকে জব্দ করিবার ফন্দি আঁটিয়াছে, বিষ্ণু সে সব শুনিয়াছে, একবার তার সুযোগও হইয়াছিল কিন্তু বিষ্ণুর সাহস হয় নাই। সেবার পরীক্ষার সময় সতীশ একটা কাগজে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া সুবোধের কাছে চালান করিয়া দিতেছিল। সুবোধ সে বছর অনেক দিন ব্যামোয় ভুগিয়াছিল, পড়াশুনা কিছুই হয় নাই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার তার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না, অথচ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তার বৃত্তি বন্ধ হইয়া পড়াশুনার দফা শেষ হইবে। সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ছিল—কেবল সতীশ সাহস দিয়াছিল—কোনো ভয় নাই! এবং সেই জন্যই সতীশ এমনি করিয়া সুবোধকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সাহায্য করিতেছিল। বিষ্ণুর চোখে ইহা পড়ে। বিষ্ণুর মনে হইল সতীশকে জব্দ করিয়া রায়বাবুদের প্রীতিভাজন হইবার এই সুযোগ। ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিলে সতীশের লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না। বিষ্ণু সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সেই সময়টিতে সতীশ লিখিতে লিখিতে একবার অন্যমনস্কভাবে যেমন মাথা তুলিয়া বিষ্ণুর দিকে চাহিল অমনি তার বুক কাঁপিয়া উঠিল—সে থপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। কি করিতে কি হইয়া পড়িবে, ভাবিয়া বিষ্ণু এ কথা কারও কাছে আর প্রকাশ করিল না।

সতীশ যেদিন শুনিল রায়বাবুরা বিষ্ণুকে হনুমান সাজাইয়াছে, সে কোনোরূপ বিদ্রূপ করিল না, শুধু বিষ্ণুকে গোপনে ডাকিয়া তীব্র স্বরে বলিল—"কেন এ সকল অপমান তুমি সহ্য কর!"

বিষ্ণু অন্য ছেলেদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল কিন্তু সতীশের কথায় হাসিঠাট্টার তরলতা ছিল না বলিয়া সে কোনো উত্তর করিতে পারিল না। অপমান

সে তখন বোধ করিতে পারে নাই কিন্তু সতীশের কথার ভিতর কি ছিল সেইটা অপমানের খোঁচা হইয়া এখন বিষ্ণুর বুকে গিয়া বিঁধিল। এখন সে সত্যই বুঝিল কত-বড়-একটা অপমান সে সহ্য করিয়াছে! সতীশের তিরস্কারের রেশ তার অন্তরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া রণিত হইতে লাগিল; এবং তারই তাপে রায়বাবুদের উপর একটা বিদ্বেষ তার মনের মধ্যে ধোঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। সে অনেকক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল। তারপর রায়বাবুরা যখন তাকে আদর করিয়া ডাকিল তখন ক্ষণেকের জন্য তার মন বিমুখ হইয়া রহিল বটে কিন্তু সে যখন সাড়া দিল তখন তার মন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেছে। রায়বাবুদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তার হঠাৎ একবার মনে পড়িল—সতীশকে! —সে চোখের সামনে দেখিল সতীশ যেন একটা প্রলয়ের ঝড়—কিছু মানে না, সর্ব্বস্ব উড়াইয়া লইয়া চলিয়া যায়! পাছে সেই ঝড়ের ঘূর্ণীর মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! সে মনে মনে সেই সময় রায়বাবুদের পা সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিল।

সতীশকে পালাইয়া বেড়াইতে পারিলে বিষ্ণু বাঁচিত কিন্তু ছাড়ো-ছাড়ো ভাব দেখাইলে পাছে সতীশ রাগ করে তাই সে একেবারে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিত না। তা ছাড়া সতীশের সঙ্গে কথায় এইটে সে অনুভব করিত সতীশ বিষ্ণুকে একেবারে তাচ্ছিল্য করে না—তার জন্য একটুখানি স্নেহ তার হৃদয়ের কোথায় সঞ্চিত হইয়া আছে—মধ্যে মধ্যে তার বিন্দু বিষ্ণুর উপর ক্ষরিত হইয়া পড়ে। দয়ার পাত্র বলিয়া বিষ্ণুর উপর একটা মায়া সত্যই সতীশের ছিল। এবং সেই মায়ার টানে বিষ্ণুর জন্য যে কথাগুলা সে মধ্যে মধ্যে বলিত তাহা বিষ্ণুর হৃদয় একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিত না।

বিষ্ণুর এক একবার মনে হইত একটা বিষের মত যেন কি সতীশ তার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে এবং তারই চাঞ্চল্য সে মধ্যে মধ্যে সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্যে অনুভব করিত। হঠাৎ এই বিষ এতটা কাজ করিয়াছিল যে সে একদিন রায়বাবুদের কথা গ্রাহ্য করে নাই;—তাকে লইয়া মজা করিবার মজলিশ হইতে যে ডাক আসিল তাহা উপেক্ষা করিয়া সে ঘরে বসিয়া রহিল। সে বলিয়া পাঠাইল শরীর অসুখ, আজ যাইতে পারিব না। তারপর সেই কথা শুনিয়া রায়বাবুরা যখন হুড়মুড় করিয়া তাহার ভাঙা কুঁড়েয় আসিয়া হাজির হইল এবং যত্নের সহিত তার শরীর সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল তখন সে একেবারে গলিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কপট রোগশয্যা ছাড়িয়া সে রায়-বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। এবং রায়বাবুদের সম্বন্ধে তার মনের সমস্ত গ্লানি তখনই মুছিয়া গেল। ইহার পর কয়েকদিন সে সতীশকে এড়াইয়া চলিয়াছিল এবং তার মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে পারে নাই।

বিষ্ণুকে রোজই সকাল-বিকাল রায় বাড়ীতে হাজিরা দিতে হইত। তাকে

লইয়া রায়বাবুদের বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল—সে যেন একটা নেশার জিনিষ! তার দুদণ্ড আসিতে দেরী হইলে বাবুরা ছট্‌ফট্ করিত। এমনি রোজ চলিতেছিল। হঠাৎ একটা ঘটনায় কয়েকদিনের জন্য বিষ্ণুর রায়বাড়ীতে আসা বারণ হইল। বিষ্ণুর বাপ বসন্ত-রোগে মারা গিয়াছিল—পাছে ছোঁয়া লাগে এই ভয়!

বিষ্ণু অশৌচের দিন কয়েকটা একলাটি বাড়ীতে বসিয়া কাটাইতেছিল, রায়বাবুদের জন্য মনটা এক একবার কেমন-কেমন করিত বটে কিন্তু তার চেয়ে একটা ভাবনা বেশী করিয়া তাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। সেই ভাবনাতে সে বাপের শোকও তেমন করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছিল না। এত-বড় সংসারের ভাবনা তারই ঘাড়ে এইবার পড়িল। সে যে কি করিবে ভাবিয়া কূল পাইতেছিল না—চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল। টাকা যে কেমন করিয়া রোজগার হয় সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান তার ছিল না—অথচ এটা সে দেখিতেছে টাকা না হইলে সংসার চলে না। সে তো কাহাকেও কোথাও দেখিতেছে না—কেহ তো এই দুর্দ্দিনে তার কাছে একবার আসিল না। তবে সাহায্য কে করিবে? এই বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ তাকে কে দেখাইয়া দিবে?—এই ভাবনা সে দিনরাত ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিল না। রায়বাবুদের কথা তার মনে উঠিয়াছিল বটে কিন্তু রায়বাবুদের সামনে দাঁড়াইয়া মুখ ফুটিয়া কেমন করিয়া সে তো সে আজ পর্য্যন্ত নিজের থেকে বলিতে পারে নাই—বলিতে তার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া শুষ্কমুখে একলাটি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে এমন সময় সতীশ আসিয়া হাজির হইল। আসিয়াই বলিল—"বড় দুঃখিত হলুম বিষ্ণু তোমাদের বিপদ শুনে!"

তার জন্য দুঃখিত! বিষ্ণু জীবনে এই প্রথম এমন কথা শুনিল। তারপর সতীশ আসিয়া যখন স্নেহের সহিত তার হাতখানা ধরিল তখন সে একেবারে গলিয়া গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সতীশ বলিল—"কাঁদিসনে ভাই, এ দুঃখ তো আছেই, একদিন না একদিন সবাইকে সইতে হবে।"

বিষ্ণু এই ক'দিন নিজেকে কী ভয়ানক নিরাশ্রয় মনে করিতেছিল, আজ হঠাৎ মনে হইল সে যেন একটা শক্ত আশ্রয় পাইয়াছে—সে সতীশকে আঁকড়াইয়া ধরিল। সতীশ তাকে স্নেহের সহিত বুকের মধ্যে ধরিয়া নিজের হাতে তার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল।

এর পর থেকে সতীশ রোজ একবার করিয়া বিষ্ণুর সহিত দেখা করিতে আসিত এবং খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিত। বিষ্ণু একদিন সমস্ত দুঃখের কথা বলিয়া বলিল—"কি করি বল দেখি ভাই সতীশ?"

সতীশ বিষ্ণুর সমস্ত ভাবনাটাকে যেন ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিল—"এর জন্যে ভাবনা কি? আমি তো শীঘ্রই কলকাতায়

একটা চাকরীর যোগাড় আমি ঠিক করে দেব! এখানে পড়ে থাকলে বিষ্ণু তোমায় পচে মরতে হবে!”

সতীশের মতো এমন সুহৃদ বিষ্ণুর কে আছে? বিষ্ণু বলিল—“তুমি যা বল ভাই, আমি তাই করতে রাজী।”

সেদিন যাইবার সময় সতীশ বলিয়া গেল—“বিষ্ণু তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি আছি!”

সতীশ আছে!—এ কথাটা নিজের অন্তরের মধ্যে হইতেও বিষ্ণু বেশ শুনিতে পাইতেছে।

তারপর তুই বন্ধুতে মিলিয়া দিনের পর দিন কলিকাতা যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিল। ঠিক হইল অশৌচটা শেষ হইলেই সতীশের সঙ্গে বিষ্ণু চলিয়া যাইবে!

যাইবার দিন বিষ্ণু বলিল—“সতীশ, একবার রায়বাবুদের বলে যাওয়া দরকার। তাঁদেরই আশ্রিত আমরা! না বলে গেলে রাগ করতে পারেন। কি জানি শেষে কি হতে কি হবে!”

সতীশ কথাটা শুনিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—“আচ্ছা!”

বিষ্ণু বলিল—“তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি চট্ করে সেরে আসি!”

বিষ্ণু খানিক দূর যাইতে সতীশ কি মনে করিয়া বিষ্ণুকে ডাকিল, বলিল—“দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।”

রায়বাড়ী গিয়া পৌঁছিতে বাবুরা হল্লা করিয়া উঠিল—“এই যে বিষ্ণু দা! এই যে বিষ্ণু দা!”

সকলে আসিয়া হাত ধরিয়া তাকে বসাইল।

বিষ্ণু একেবারে থতমত খাইয়া গেল—কোনো কথা কহিতে পারিল না।

সতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—“বিষ্ণু, তোমার কাজটা সেরে নাও!”

সতীশের কথায় বিষ্ণুর যেন চট্‌কা ভাঙিল, সে যেন একটু সাহস পাইল, সেই সাহসের স্ফুলিঙ্গের মাথায় সে ঝট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—“আমি বিদায় নিতে এসেছি!”

চারিদিক হইতে একটা বিস্মিত প্রশ্ন উঠিল—“বিদায়?”

বিষ্ণুর মুখে আর কথা নাই।

সতীশ তখন অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—“বিষ্ণু চাকরী করতে কলকাতায় যাচ্ছে!”

সতীশের দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না, কথাটা যেন বিষ্ণুরই—এম্‌নিভাবে বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া সকলে বলিল—“সে কি হয় বিষ্ণুদা! আমাদের ছেড়ে যাবে কোথায়? তোমায় ছাড়ে কে?” বলিয়া সকলে মিলিয়া তাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল।

বিষ্ণু মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। সতীশ দাঁড়াইয়াছিল। রায়বাবুদের কেহ তার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না। এই তাচ্ছিল্যে সতীশের মুখের আগায় একটা খোঁচা আসিয়াছিল কিন্তু সে সামলাইয়া গেল। সে কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিষ্ণুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিয়া উঠিল—“তাহ’লে চল্লুম ভাই, বিষ্ণু!”

বিষ্ণু একটা ফ্যাল্-ফেলে দৃষ্টি তুলিয়া সতীশের মুখের পানে চাহিল। সতীশ বিষ্ণুর প্রতি শুধু একটা কঠোর দৃষ্টিক্ষেপ করিল, তার পর গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

তুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

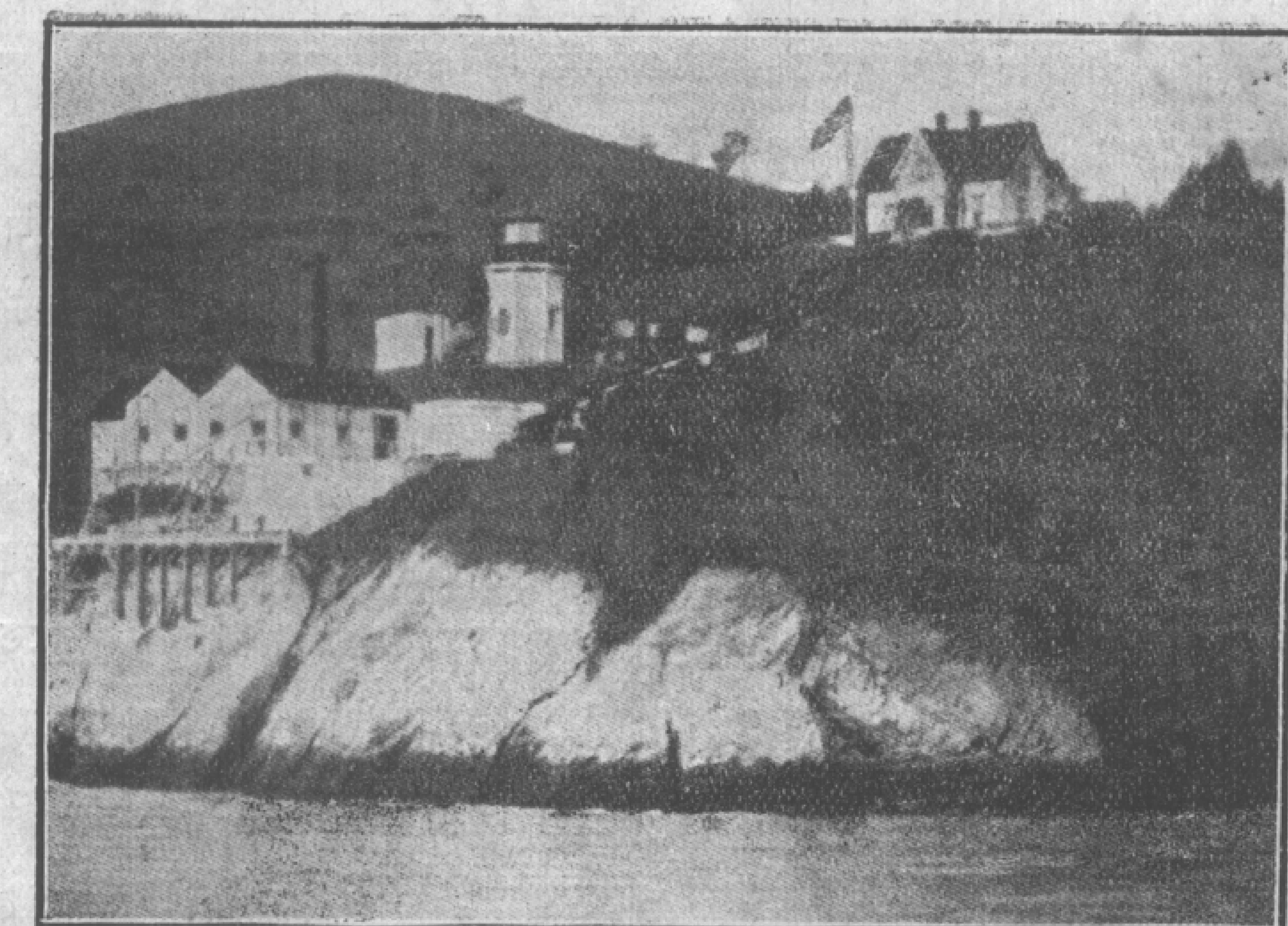
মোটরকারে নগর ভ্রমণ

সেদিন Sightseeing Carএ বসিয়া ডেন্‌ভার নগর দেখিয়া লইয়াছি। আজ স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো দেখিতে বাহির হইলাম। যাতায়াতে প্রায় ৫০ মাইল হইবে—চারি ঘণ্টার পালা। মূল্য ৫৲। প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী ২৫।৩০ জন লোক বসিতে পারে। প্রদর্শক, আরোহীদিগের দিকে মুখ করিয়া, চালকের নিকট উপবেশন করে। তাহার মুখে একটা চোঙ্গা লাগান থাকে। ইহার ভিতর কথা বলিয়া প্রদর্শক সহজেই সকলের নিকটে নিজ বক্তব্য প্রচার করে।

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো সহরের কয়েকটা রাস্তা পার হওয়া গেল। সহরটা সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এইরূপ সহর পূর্ব্বে আর দেখি নাই। দার্জ্জিলিং, শিমলা ইত্যাদি অঞ্চলে পাহাড় কাটিয়া সমতলভূমি প্রস্তুত করা হয়—তাহার উপর বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে; দূর হইতে সে গৃহগুলিকে সিঁড়ির স্তরবিন্যাসের অনুরূপ দেখায়। কিন্তু স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো নগরের জন্য পাহাড় কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই। তরঙ্গায়িত পর্ব্বতের পৃষ্ঠে, স্কন্ধে, শিরোভাগে এবং পাদদেশে গৃহাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজপথ, উদ্যান, সৌধ, আলোকস্তম্ভ সকলই এই অসমতল ভূমির উপর অবস্থিত। পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষরাজি যেরূপ দেখায়—স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো দেখাইতেছে। যে কোন রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকিলে বুঝিব একবার উঠিতেছি একবার নামিতেছি—আবার উঠিতেছি আবার নামিতেছি। এই কারণে গৃহগুলি তরঙ্গায়িত বোধ হয়—সমস্ত নগরটাই যেন গৃহের তরঙ্গস্বরূপ।

ডেন্‌ভার দেখিয়া স্বাস্থ্যকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যময় নগরের একটা পরিচয় পাইয়াছিলাম। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো ডেন্‌ভার অপেক্ষা বৃহত্তর। ধনসম্পদের প্রভাবও এখানে বেশী কিন্তু শিকাগো নিউইয়র্ক অপেক্ষা এই নগর বেশী সুশ্রী ও স্বাস্থ্যকর বোধ হইতেছে। ইয়াঙ্কিরা এখানে নীল নভোমণ্ডল, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ, অসমতল পার্ব্বত্যভূমি, বিচিত্র উদ্ভিদ্‌রাজি এবং সুনীল সিন্ধু প্রকৃতির দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে বিদ্যাবল ও ধনবল প্রয়োগপূর্ব্বক ইহারা তুনিয়ার পশ্চিমতম প্রদেশে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রাসাদপুরী দেখিবামাত্র প্রত্যেক ব্যক্তিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

মোটরকার উপসাগরের কিনারায় আসিল। এইখানে ষ্টিমারে চড়িলাম। সাত মাইল সমুদ্রের হাওয়া খাইতে খাইতে অপর পারে পৌঁছিলাম। উপসাগরের ভিতর তুএকখানা রণতরী দেখা গেল। বন্দর রক্ষা করিবার জন্য উহা প্রহরীর কার্য্য করে। ক্ষুদ্র দ্বীপও তুএকটা পথে পড়িল। একটাতে



দ্বীপের উপর আলোক-গৃহ



ওক্‌ল্যাণ্ডের কিয়দংশ

ডাঙায় নামিয়া আবার মোটরে বসা গেল। প্রদর্শক-কোম্পানীর ব্যবসায় সুবিস্তৃত—এপারে ওপারে সকল পারেই তাহাদের কার্য্যালয় আছে। গাড়ী ওক্‌ল্যাণ্ড সহরের ভিতর দিয়া চলিল। অত্যুচ্চ প্রাসাদ এবং প্রশস্ত রাজপথ ইয়াঙ্কিস্থানের সর্ব্বত্র দেখিয়াছি—পশ্চিমতম জনপদেও এই সমুদায় লক্ষ্য করিতেছি। ওক্‌ল্যাণ্ডে প্রস্ফুটিত ফুলের বাগান রাস্তার দুইধারে অনেক দেখিলাম। প্রত্যেক গৃহের সঙ্গেই ক্ষুদ্রবৃহৎ উদ্যান সংলগ্ন। সবুজ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের শোভা কালিফর্ণিয়া প্রদেশের প্রারম্ভ হইতেই দেখিতে পাইয়াছি—ওক্‌ল্যাণ্ডে তাহার প্রাচুর্য্য উপলব্ধি করিলাম। সহরের নিতান্ত ব্যবসায়-পাড়া ছাড়াইয়া আসিবার পর যেন কুঞ্জবনের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। নানাবর্ণের পুষ্পরাশি এই অঞ্চলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

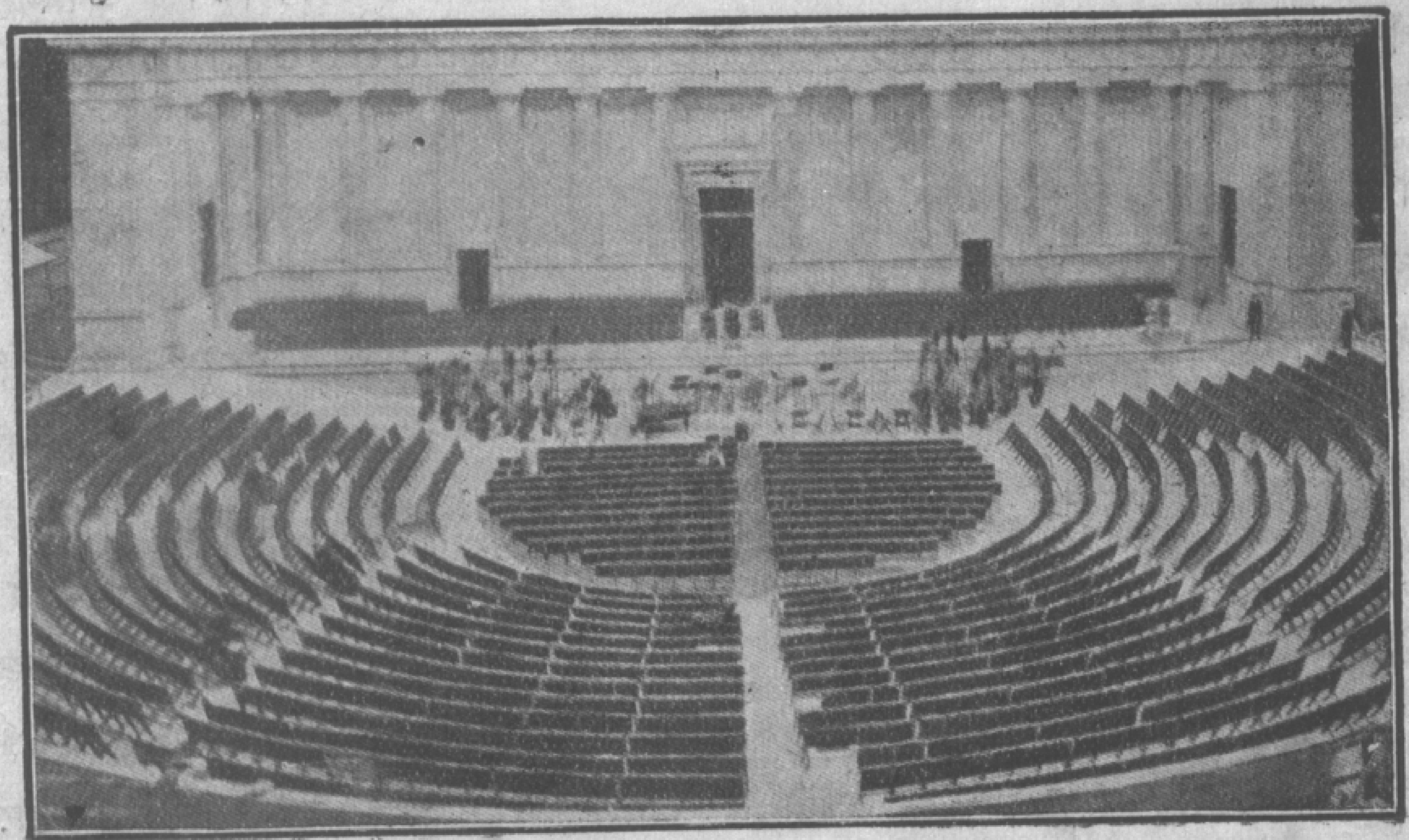
ক্রমশঃ বার্কলে নগরের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। সুবিখ্যাত কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই নগরে অবস্থিত। বিলাতের অক্সফোর্ড কেম্বিজ যেমন বিদ্যা-নগর, ইয়াঙ্কিস্থানের বার্কলেও সেইরূপ প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ বিদ্যা-নগর। এখানকার আব্-হাওয়ায় শিক্ষাপ্রচার ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠানের স্থান নাই।

ইয়াঙ্কিস্থানের প্রাচ্যতম প্রদেশে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ছাত্রসংখ্যা কলম্বিয়ায় যত আমেরিকার অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত নয়। আজ ইয়াঙ্কিস্থানের পাশ্চাত্যতম প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত। ছাত্রসংখ্যা হিসাবে কলম্বিয়ার পরেই বার্কলের বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ প্রাকৃতিক আবেষ্টনের ভিতর অবস্থিত, তাহার সঙ্গে কলম্বিয়ার তুলনা করিতে হইলে লজ্জাবোধ হয়। কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটের উপর সেনেট-হাউস, মেডিক্যাল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইত্যাদির অবস্থান স্মরণ করিলেই নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মালগুদামসদৃশ ব্যারাক-গৃহগুলির চিত্র কল্পনা করিতে পারা যায়। বিলাতের লীড্‌স্ ও ম্যাঞ্চেষ্টার, স্কট্‌ল্যাণ্ডের এডিনবরা এবং আয়র্লণ্ডের ডাব্‌লিন—এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ও অবস্থান হিসাবে নিতান্তই অবজ্ঞেয়। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজগুলির কোন-কোনটার নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। কিন্তু মোটের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যহিসাবে ইহারাও দুনিয়ার পশ্চিমতম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতপ্রভ। এমন রমণীয় স্থানে জগতের আর-কোন বিদ্যা-মন্দির আছে কি না জানিনা।

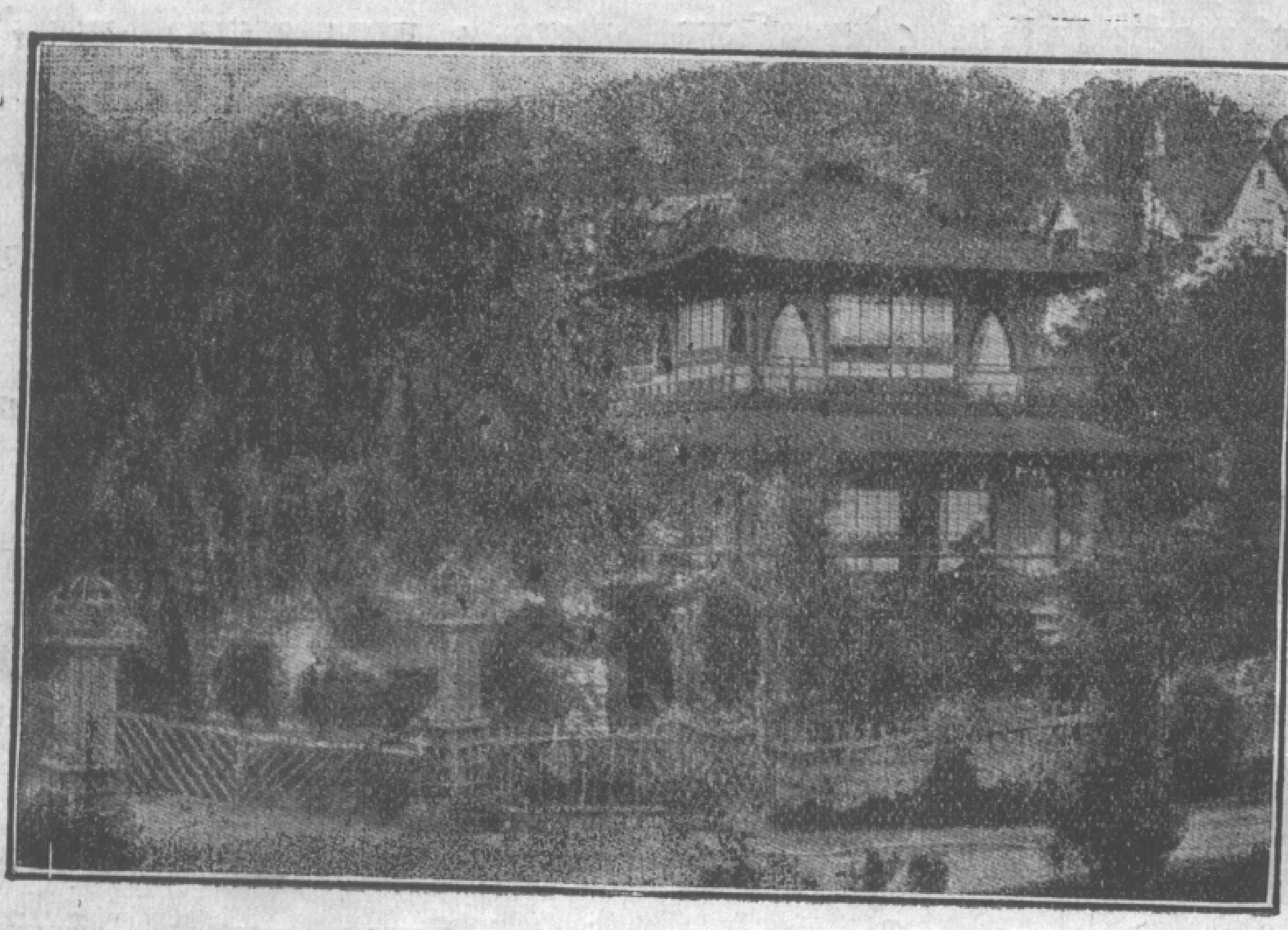
একটা পাহাড়ের পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ভবন নির্ম্মিত। সৌধগুলি একটা সুবিস্তৃত উদ্যানের ভিতর স্থাপিত হইয়াছে মনে হয়। অন্যান্য স্থানে আগে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া পরে গাছপাতা বাগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে প্রকৃতি-রচিত বাগানের অভ্যন্তরেই বিদ্যা-মন্দির তৈয়ারী হইয়াছে। পাহাড়ের শিরোভাগ আজ কুয়াশায় আচ্ছন্ন দেখিলাম—অতি বৃহদাকার বৃক্ষ এই পর্ব্বতকে নিবিড় ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সৌধ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের কটিদেশে উপস্থিত হইলাম। এইখানে তরুবরসমাবৃত নিভৃত স্থান দেখা গেল। প্রদর্শকের কথা অনুসারে গাড়ী হইতে নামিলাম। প্রাচীন গ্রীকেরা তাহাদের রঙ্গমঞ্চ যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিত, কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রণালীতে একটা নাট্যমঞ্চ তৈয়ার করিয়াছেন। মঞ্চের উপরে কোন ছাদ নাই, পশ্চাতে কতকগুলি গৃহ, তাহার প্রাচীর মাত্র দেখা যায়। মঞ্চের সম্মুখে অর্দ্ধগোলাকৃতি স্থান—তাহার উপরেও কোন ছাদ নাই। এই স্থানে দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী উপবেশন করিতে পারে। শুনিলাম এই "গ্রীক থিয়েটারে" যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় সভাপতি বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। নাট্যাভিনয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা এই মঞ্চ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বার্কলে নগরের অন্য দিকে যাওয়া গেল। চারিদিকে ফুলের বাগান ও ফলের বাগান। লাল নীল পীত বেগুনী রংয়ের ফুল, সবুজ তৃণমণ্ডিত ভূমি, এবং পত্রসমন্বিত সুবৃহৎ বৃক্ষরাজী সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। ক্রমশঃ পর্ব্বতের উচ্চতর অংশে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই অঞ্চলের বাগান-বাড়িগুলি নিতান্তই প্রমোদভবনস্বরূপ। অবশেষে ওকল্যাণ্ডের এক উদ্যানে আসিয়া গাড়ী থামিল। এইখানে গন্ধক-ঝরণা দেখিবার জিনিষ। এতক্ষণ নগরের বিভিন্ন অংশই প্রাকৃতিক শোভায় পূর্ণ দেখিতেছিলাম, কাজেই এই উদ্যানের তরুলতা ফুলফল দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম না। ইহার ভিতরে জাপানী রীতিতে নির্ম্মিত একটা চা-পানের গৃহ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এখানকার চিত্র-ভবন। এই ভবনে প্রায় পাঁচশত অত্যুচ্চ শ্রেণীর চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। রুষ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ওলন্দাজ, ইয়াঙ্কি, ইতালীয় ইত্যাদি সকল শিল্পীর কারুকার্য্য এই ভবনে দেখিতে



গ্রীক থিয়েটার



পীডমণ্ট বাগানে জাপানী চা-গৃহ

পাইলাম। একমাত্র এই চিত্রগুলি দেখিবার জন্যই একবার এই উদ্যানে আসা উচিত। চিত্রগুলির বর্ণিত বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রদর্শককে চেষ্টিত দেখিলাম।

চিত্র-ভবন হইতে নূতন পথে ফেরি-ঘাটে উপস্থিত হওয়া গেল। ষ্টিমারে বসিয়া দেখিলাম স্যানফ্র্যান্‌সিস্কো হইতে হাজার হাজার নরনারী ষ্টিমারে পার হইয়া আসিতেছে। দিবাভাগে কর্ম্ম করিয়া ইহারা সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিতেছে। হাবড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনদ্বয়েও সন্ধ্যাকালে এই দৃশ্য দেখা যায়। ওক্‌ল্যাণ্ড ও বার্কলে স্যান-ফ্র্যান্‌সিস্কোর উপনগর।

ক্যালিফর্ণিয়ার সম্পদ্

কি দিনে কি রাত্রে প্রদর্শনী-নগরের সৌধগুলি যতবার দেখিতেছি ততবারই মনে হইতেছে যেন অগণিত তাজমহলের মেলা বসান হইয়াছে। প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ যে সমুদায় দ্রব্য থাকা উচিত, গৃহসমূহের ভিতর সবই দেখিতে পাইলাম। তাহার তালিকা করিয়া লাভ নাই। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে দুনিয়ার কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগে যত প্রকার উন্নতি হইয়াছে সে সকলই এখানে সংগৃহীত। প্রদর্শনীগুলি বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা মাপিবার এক প্রকার কল-বিশেষ।

দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে বিরাট প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। যাঁহারা সেই প্রদর্শনী দেখিয়াছেন তাঁহাদের এই বিশ্ব-মেলা না দেখিলেও চলিতে পারে। প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীতে পার্থক্য করা বড় কঠিন। প্রত্যেকটাতেই প্রায় এক ধরণের বস্তু দেখা যায়—কতকগুলি জিনিষ হয় ত একস্থানে বেশী, অন্য কতকগুলি অন্য একস্থানে বেশী। কাজেই যে কোন দুই প্রদর্শনীর প্রভেদ বুঝিতে হইলে বিশেষজ্ঞের ন্যায় প্রত্যেক বিভাগ তলাইয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু

ওরূপ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিবার সময়, সুবিধা ও যোগ্যতা বহু লোকের নাই। স্বাধীনদেশের রাষ্ট্রকর্তৃক বিচক্ষণ ধুরন্ধরেরা এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহারা নিজ নিজ বিভাগের সকল প্রকার খুঁটিনাটি বুঝিবার জন্য প্রদর্শনীতে বহুক্ষণ কাটাইয়া থাকেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা সমাজের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার লোক প্রদর্শনী দেখিয়া উপকৃত হন। যাঁহারা শিল্প, কৃষি, ব্যবসায়, বিদ্যালয় ইত্যাদির পরিচালক তাঁহারা নানাবিধ সংগৃহীত দ্রব্যের সাক্ষাতে আসিলে সহজেই ভবিষ্যতে লাভবান্ হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন।

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর বিশ্বমেলায় এই দুই শ্রেণীর লোকই নানা দেশ হইতে আসিয়াছেন। ইয়াঙ্কিরাও প্রদর্শনীর নানা বিভাগ দেখিয়া নিজ নিজ অসম্পূর্ণতাগুলি সংশোধন করিবার প্রণালী চিন্তা করিতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে এই ধরণের বিচক্ষণ লোক একজনও আসেন নাই। এমন কি ভারতবর্ষে আজকাল ছোট-বড় যত প্রদর্শনী খোলা হয় সেগুলি দেখিয়া যথার্থরূপে শিক্ষালাভ করিবার জন্য কয়জন ভারতবাসী চেষ্টা করেন, জানি না। বোধ হয় ভারতীয় প্রদর্শনীসমূহ হইতে দেশীয় লোকের ভিতর যথোচিত শিক্ষাবিস্তার হয় না। বরং ইয়াঙ্কি, ইংরাজ, জার্ম্মানী ইত্যাদি বিদেশীয় ব্যবসায়ী ও পর্য্যটকেরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভারতীয় লোকজনের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ভবিষ্যতে দখল করিবার পন্থা বুঝিয়া লন। এলাহাবাদের বিরাট প্রদর্শনী হইতে ভারতবাসীর লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশী হইয়াছে মনে হইতেছে।

স্যানফ্র্যানসিস্কোর এই মেলায় ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের ধাতু-রত্ন-পশু-সম্পদ্ বিশেষভাবেই সংগৃহীত হইবার কথা। যখন যে কেন্দ্রে বিশ্ব-সম্মিলন হয় তখন সেই কেন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদই বিশ্বে সুপ্রচারিত হয়। এইবার ইয়াঙ্কিস্থানের পশ্চিম প্রদেশ এবং বিশেষভাবে ক্যালিফর্ণিয়া সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।

নেভাডা পর্ব্বতের শৃঙ্গেই রেলগাড়ী ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে চলিতেছে। তখন এই অঞ্চলের আকর সম্পদ দেখিতে পাইলাম। ক্রমশঃ নিম্নতর ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছিল। তখন মনে হইতেছিল বাঙ্গলা দেশের কথা আর সেই মিশরের কথা—

"এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

* * * *

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
সে যে পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখীর গানে জেগে।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ক্যালিফর্ণিয়া-ভূমির ফুল-বাগান, ফল-বাগান, কৃষিক্ষেত্র, পশু-চারণের মাঠ দুনিয়াবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? মাত্র ৪০।৫০ বৎসর হইল এই প্রদেশে বসতিস্থাপন যথার্থভাবে আরব্ধ হইয়াছে। আগামী ৫০ বৎসরের ভিতর এই ধনধান্যপুষ্পভরা জনপদের সমৃদ্ধি কতগুণ বাড়িয়া যাইবে কে বলিতে পারে?

প্রদর্শনী-নগরের সুবৃহৎ ক্যালিফর্ণিয়া-ভবনে প্রবেশ করিয়া এই প্রদেশের সকল সম্পদ্ একত্র দেখিয়া লইলাম। লতাপাতা ফুলফল নদনদী পর্ব্বতসাগর ইত্যাদি বিভাগ হইতে উদ্ভাবিত ধনাগমের উপায়সমূহ এই সৌধে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রচুর ধনলাভের সুযোগ আছে তাহা দর্শকগণকে বুঝাইবার জন্য নানা প্রকার বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা বিতরিত হইতেছে। কৃষিকার্য্য ও পশুপালন সম্বন্ধেই লোকজনের দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হইল। অশেষবিধ ফলমূল শাকসব্জীর নমুনা দেখিলাম। ফলমূল বহুকাল অবধি তাজা রাখিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলমূলের চাষে বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন করিয়া ক্যালিফর্ণিয়ার প্রথার বার্ব্বাঙ্ক প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীর নিদর্শনসমূহও দেখিতে পাওয়া গেল।

সোনার ক্যালিফর্ণিয়ায় ইয়োরোপের নানা স্থানের নানা সৌন্দর্য্য একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "জমায়ে চাঁদের সুধা বিধি গড়েছিল তায়!" ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনায় এই প্রদেশের কৃষিসম্পদ্ও যথেষ্ট।

ভারতবর্ষের এক প্রদেশসম্বন্ধে আমরা প্রাকৃতিক শোভা ও কৃষিসম্পদ্ নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া থাকি ঃ—

"সবার—সবার হইতে মধুর
যাহার শস্য, যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে
গুঞ্জরি স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!
ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির!
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া
ভাসায় যাহার কানন-তীর!
মাধুরী বন্য কুসুমে জানিয়া
ঘুমায় অঙ্গে রমণী-শ্রীর;
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে
কে সম মেবার-সুন্দরীর।"

সুতরাং বাঙ্গালী ক্যালিফর্ণিয়ার গৌরব সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

চীনা-টোলা

উত্তর-ভারতের প্রায় সকল সহরেই একটা করিয়া বাঙ্গালী-টোলা আছে। কাশীর বাঙ্গালী-টোলা সুপ্রসিদ্ধ। আমেরিকার বড় বড় সহরে একটা করিয়া চীনা-টোলা দেখিতে পাই। নিউইয়র্ক, শিকাগো এবং স্যান্‌ফ্র্যান-সিস্কোর চীনা-পাড়াগুলির নাম পর্য্যটক-মাত্রেই শুনিতে পান।

মার্কিন দেশ দুনিয়ার বারইয়ারিতলা—ইয়োরোপ ও এসিয়া দুইদিক হইতেই এখানে লোক আসিয়া বাস করিতেছে। বলাবাহুল্য পশ্চিম জনপদে এসিয়াবাসীর প্রভাবই বেশী। চীনা ও জাপানী নরনারীর সংখ্যা এই অঞ্চলে অত্যধিক—এমন কি কয়েক হাজার ভারতীয় শিখ এবং পাঞ্জাবীও এখানকার অধিবাসী। মার্কিনেরা ইয়োরোপীয় জনগণকে সাদরে গ্রহণ করিতে চাহে, কিন্তু "প্রাচ্য"-দেশীয় লোকের উপনিবেশ-স্থাপন আদৌ পছন্দ করে না। ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় যাহাতে লোক আসিতে না পারে, তাহার বিশেষ

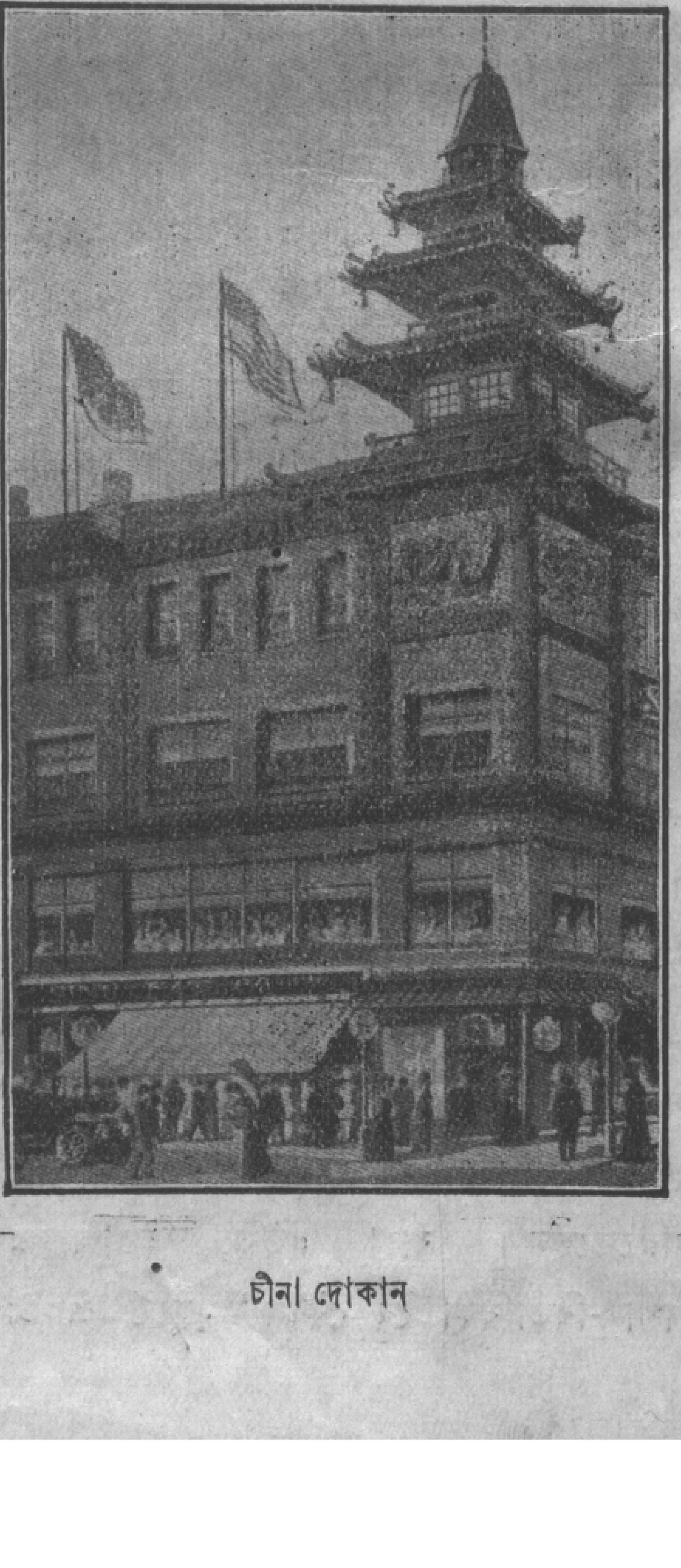
কি ভারতীয় ছাত্রগণের আগমন এই বিধানে যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ; সুতরাং ভারতবাসীর বিরুদ্ধে আইন জারি করিতে যাইয়া ইয়াঙ্কিদের কোন বাধা পাইতে হয় না। অধিকন্তু ভারতীয় নরনারীর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে অতিশয় অল্প—এই কারণে তাহাদের প্রভাবে ইয়াঙ্কি-সমাজের সুফল কুফল বেশী ঘটে না। কিন্তু চীনা ও জাপানীদের লইয়া মার্কিনদের মহাবিপদ। জাপানকে অসন্তুষ্ট করা যুক্ত-রাষ্ট্রের নিতান্তই ইচ্ছাবিরুদ্ধ—জাপানের ক্ষমতায় ইয়াঙ্কিরা সত্যসত্যই আশঙ্কিত, কাজেই জাপানীদের বিরুদ্ধে আইনজারি করিবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত হইতে হয়। ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে বহু জাপানী বসতিস্থাপন করিয়া বসিয়াছে। ইহাদিগকে যেন তেন প্রকারেণ এখান হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য ক্যালিফর্ণিয়া-রাষ্ট্র অতিশয় চেষ্টিত। জাপানের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া লড়াই বাধিবার আশঙ্কাও কম নয়। কোন কোন ইয়াঙ্কির মুখে শুনিতে পাই—"জাপানীরা যদি ক্যালিফর্ণিয়া দখল করে, তাহা হইলে আমরা নেভাডা পর্ব্বতের পূর্ব্ব অঞ্চলে যাইয়া বাস করিব, —জাপানের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।" জাপানের সঙ্গে মার্কিনদের মন কষাকষি অত্যধিক চলিতেছে। ক্যালিফর্ণিয়া রাষ্ট্র দুএক স্থলে কিছু কাঁচা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা সাম্‌লাইয়া তুলিবার জন্য ফেডার‍্যাল রাষ্ট্র যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। যাহা হউক, ইয়াঙ্কিদের জাপান-বিভীষিকা যে কোন মুহূর্ত্তে একটা বিষম আকার ধারণ করিতে পারে। এই জন্যই আজকাল জাপানীতে ও ইয়াঙ্কিতে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সম্মিলন ইত্যাদির বহুবিধ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। কারণ "সেটার যতই অভাব হবে, ততই সেটা বলতে হবে।"

ভারতবাসীর মা-বাপ নাই; কাজেই মার্কিন রাষ্ট্র এক কলমের খোঁচায় ভারতীয় সমস্যা সমাধান করিতে পারেন। চীন স্বাধীন বটে এবং আজকাল স্বরাজ বা প্রজাতন্ত্র-শাসনের পর হইতে চীনারা ইয়াঙ্কিদের মহাবন্ধু হইয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু চীন অতি দুর্ব্বল—দুনিয়ার বাজার স্বরূপ—স্বাতন্ত্র্যহীন মেরুদণ্ডহীন "কোম্পানীর নাগড়া"। সেদিন পর্য্যন্ত মিশরের যে দুরবস্থা ছিল, তুরস্কের আজও যে দুরবস্থা রহিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের যে দুরবস্থা ছিল, চীনের এখন সেই দুরবস্থা। শক্তিহীন চীন-সমাজ রুশ, ইংরাজ, জার্ম্মাণ, জাপানী ও ইয়াঙ্কি এই পাঁচজাতির প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কাজেই চীনদেশে আজকাল চীনাদের গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া কঠিন। চীনের হাটে কখনও ইংরাজের গলা, কখনও ইয়াঙ্কির গলা, কখনও জার্ম্মানের গলা শুনিতে পাই—চীনাদের গলা শুনিতে কখনও পাই কিনা সন্দেহ! এই ই-জ-ব-র-র-য়ের ভিতর ইয়াঙ্কিরা নিজেদের প্রতিপত্তি কিছু বেশী রকমেই স্থাপিত করিয়া লইয়াছে। চীনারাও ইয়াঙ্কি-দিগকে খুব ভালবাসে—ইয়াঙ্কি-সমাজকে সকল বিষয়েই ইহারা গুরু ও পথপ্রদর্শক এবং উদ্ধারকর্ত্তা বিবেচনা করিতেছে।

ইয়াঙ্কিরা যুবক চীনের হৃদয়মধ্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ হিসাবে চীনাদের সঙ্গে ইয়াঙ্কিদের লেন্-দেন্ বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই চলিয়া থাকে। কিন্তু রক্তসংমিশ্রণ, শ্রমজীবি-সমস্যা, পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে ইয়াঙ্কিরা চীনাদিগকেও ভারতীয় ও জাপানী হইতে পৃথক বিবেচনা করে না। এইজন্য চীনা নরনারীগণকে ইয়াঙ্কিস্থানে দলে দলে প্রবেশ না করিতে দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বহুবিধ আইন আছে। ইয়াঙ্কিরা ভারতবাসীদের সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখে না—জাপানীদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু বিবেচনা করে—ও চীনাগণকে বন্ধুভাবে আদর করে এবং তাহাদের পীঠে হাত বুলাইয়া কাজ হাসিল করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই তিন জাতীয় লোকের কোন ব্যক্তিকেই ইহারা মার্কিনদেশে বসতি-স্থাপনের জন্য আহ্বান করিতে চাহে না। সকল এসিয়াবাসীর উপরেই ইহাদের ঘৃণা অত্যধিক।

বর্ত্তমানে চীনা-টাউন বা চীনা-টোলা ইয়াঙ্কিস্থানের বড় বড় নগরমাত্রেই আছে—বিগত ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের ভিতরে এইগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই এক্ষণে এগুলি কোন আইনের জোরে উঠাইয়া দেওয়া সহজ নয়। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে চীনাদের আমদানী কম হয়, তাহার জন্য বিশেষ কতকগুলি Immigration Rules প্রচারিত হইয়াছে।

কলিকাতার চীনা-বাজারে চীনারাই প্রধানতঃ এবং বিশেষভাবে মুচিগিরি করে। ছুতার-মিস্ত্রির কাজেও চীনাদিগকে আমরা দেখিতে পাই। আমেরিকার চীনা-টোলাগুলি কেবলমাত্র ছুতারপাড়া বা মুচিপাড়া মাত্র নয়। এখানকার নগরের চীনাপাড়ায় অন্যান্য পাড়ার ন্যায় ধনীদরিদ্র, শিল্পী, দোকানদার, দর্জ্জী, হোটেলওয়ালা ব্যাঙ্কার, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই থাকে। নিউইয়র্ক, শিকাগো, স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো ইত্যাদি নগরে নিগ্রোপাড়া, ইহুদিপাড়া, জার্ম্মানপাড়া, পোলপাড়া, ইতালীপাড়া ইত্যাদি নানাজাতির বড় বড় পাড়া আছে। প্রত্যেক পাড়াতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের



চীনা দোকান

লোকই বাস করে। চীনাপাড়াতেও ঠিক সেইরূপ চীনাসমাজের সকল প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। চীনাদের মন্দির, হোটেল, নাচঘর, থিয়েটার, ব্যাঙ্ক, বিদ্যালয়, সভাসমিতি ইত্যাদি সকলেরই প্রতিষ্ঠা চীনা-টোলায় আছে। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর চীনা-টোলার অধিবাসীরা চীনা ভাষায় টেলিফোন্ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। এইজন্য টেলিফোন্-কোম্পানি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল কারণে পর্য্যটকেরা চীনা-টোলায় বেড়াইতে আসা একটা অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য করে।

চীনা-টাউন দেখিবার জন্য নগর-প্রদর্শক-কোম্পানীর মোটরকারে বসা গেল। নৈশ-ভোজনের পর বাহির হইলাম। মূল্য দিতে হইল তিনটাকা। যে গাড়ীতে বসিলাম, তাহার ভিতর প্রায় পঞ্চাশজন পুরুষ ও রমণী। এইরূপ গাড়ীভরা 'টুরিষ্টে'র সঙ্গে রাস্তায় অনেকবার দেখা হইল।

নগর প্রদর্শনী-কার্য্য এদেশের একটা বিশেষ ব্যবসায়। এজন্য কোম্পানী সকল প্রকার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া থাকে। কোন্ কোন্ বাড়ীতে যাইতে হইবে—কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে—কোন্ কোন্ পরিবারের পরিচয় দেওয়া হইবে—কোথায় কোন্ ব্যক্তি বক্তা ও প্রদর্শকের কার্য্য করিবেন—এই সকল বিষয়ই খাঁটি ব্যবসায়ের নিয়মে নির্দ্ধারিত করা হয়। পর্য্যটকেরা কোম্পানীর আশ্রয় লইয়া নগরস্থ কোন কোন জিনিষ অতি সহজে বুঝিতে পারেন। এমন কি ফ্যাক্‌টরী, বিদ্যালয়, দেখা সম্বন্ধেও প্রদর্শক-কোম্পানী সাহায্য করিয়া থাকে।

গাড়ী নগরের নানা নৈশ-দৃশ্যের ভিতর দিয়া এক চীনা-মন্দিরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। এই মন্দির দেখাইয়া বক্তা বলিলেন—"কয়েক বৎসর হইল চীনাদের মন্দির এই নগরের অন্যান্য অট্টালিকার সঙ্গে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ১৯০৬ সালের ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে করুন। কিন্তু এই মন্দিরে ধনবান্ চীনাদের আসা-যাওয়া আছে। কাজেই অল্পকালের ভিতরই কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। চীন-দেশ হইতে সকল প্রকার মাল-মসলা ও উপকরণ আনা হইয়াছিল।"

মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বক্তা বেশ সরসভাবে চীনাদের ধর্ম্ম, পূজা, দেব-দেবী, আচার-ব্যবহার, বিবাহ-পদ্ধতি, ও শবসৎকার ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প করিলেন। মন্দিরের ভিতরকার কারুকার্য্য, মূর্ত্তি, সিংহাসন ইত্যাদির ভিতর উচ্চ অঙ্গের শিল্পকর্ম্ম বিদ্যমান। বক্তৃতা হইতে দর্শকেরা তাহাও বুঝিতে পারিল। বর্ত্তমানে খ্রীষ্টানদের পক্ষে দেবতাপূজা, আরতি, দেবনিদ্রার প্রার্থনা ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কাজেই চীনা-ধর্ম্মপ্রণালী ইহাদের নিকট অদ্ভুত বোধ হইল। আমি দেখিলাম মূর্ত্তি-পূজা যে যে দেশে আছে, সেই সকল দেশেই পূজা-প্রণালীও মোটের উপর একপ্রকার। ভারতীয় জনগণ চীনা-মন্দিরের আসবাব-অনুষ্ঠান ও রীতি-পদ্ধতিতে নিজেদের সুপরিচিত বস্তুই দেখিতে পাইবে। কাঁশর-

নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া থাকেন। দিবারাত্র আগুণ জ্বালাইয়া আলোক-রক্ষা করা চীনারা বিশেষ আবশ্যক বোধ করে। শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা অশৌচের লক্ষণ বিবেচিত হয়। দেবতার "চালী"তে অসংখ্য মূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিলাম। চালী আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া। এই সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনের ভিতরে ও উপরে বহু স্বর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া সাধারণ হিন্দুরা তাঁহাদিগকে সহজেই তেত্রিশকোটি দেবদেবীর অন্যতম বিবেচনা করিবে। বাস্তবিক পক্ষে মূর্ত্তিগুলির আকার যদি চীনাজাতির অনুরূপ না হইত, শিক্ষিত হিন্দুও তাহা হইলে এইরূপই বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেন। অন্ততঃ, যাঁহারা বহুদেবদেবীর মূর্ত্তিতে মঙ্গোলিয় জাতির আকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা চীনাধর্ম্মে হিন্দুপ্রভাব ও হিন্দুধর্ম্মে চীনা-প্রভাব বুঝিতে পারিবেন। মূর্ত্তিগঠনশিল্পে চীনা এবং হিন্দুর সাম্যও অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়।

মন্দির দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া যাইতে হইল। চীনাদের কয়েকটা বড় বড় দোকানে প্রবেশ করিলাম। এক চীনা-পরিবারের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজবে কাটান গেল। চীনা বালকবালিকারা আসিয়া গান শুনাইল। অবশেষে এক চীনাগৃহে আসিলাম। গান-বাজনা হইতে লাগিল। চীনাবালিকারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চা-পান করাইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই এক "পুরিয়া" চা উপহার পাইলাম।

বক্তা মাঝে মাঝে চীনের প্রজাতন্ত্রশাসন সম্বন্ধে The Great Republic of China বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইঁহার মুখে শুনিলাম—"চীনারা অত্যন্ত সাধু। ইহারা রসিদ না লইয়াই টাকা ধার দেয়। ইহাদের কথার দাম খুব বেশী।"

ঘণ্টাতিনেক আনন্দের সহিত কাটান গেল। দলের মধ্যে একজন ইয়াঙ্কি-রমণীর সঙ্গে আলাপ হইল। গৃহ নেব্রাস্কা-প্রদেশে। ইনি পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সাক্ষী

(গান)

পাখী আমার সাক্ষী আছে, ঊষা-অরুণ এসেছিল।
কুঞ্জতলে, দীঘির জলে হাসির দীপ্তি ভেসেছিল।
আঁধার ঘরে আমি একা! আমাকে না দিল দেখা!
ভুলে গেছে, আগে আমায় কত ভালবেসেছিল।

শিশির-ধোয়া কুসুমরাশির গাল-ভরা সেই শুভ্র হাসির
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল;
তখন আমি দুয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে;
আমার দুঃখে ডাক্‌ল পাখী, বাতাস একটু শ্বসেছিল।
জানত তারা আগে মোরে কত ভালবেসেছিল।

কুসুম

ক

সে পতিতা। জীবনের ক্ষণিক ভ্রমেতে নয়,—বিধাতার বিধানে সে পতিতা।......

পঙ্কের ভিতরে পদ্মের মতই কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

*　　*　　*

ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিবার আগেই, পথের ধারের বারান্দায় কুসুম তাহার রূপের প্রদীপ উজল করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার প্রাণ তখন কাঁদিত, মুখ হাসিত।

রাস্তার লোকগুলা যেন 'উর্দ্ধমুণ্ড' ব্রত গ্রহণ করিয়াছে,—সকলের চোখ তাহার উপরে! তাহাদের সেই নিষ্ঠুর, ক্ষুধিত, ও ঘৃণিত দৃষ্টির মাঝে কুসুম, বিশ্বের নারী-জাতির প্রতি মৌন ধিক্কারকে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাইত।

রাস্তায় গাড়ীর পর গাড়ী ছুটিতেছে। এক-একখানা গাড়ীর খড়খড়ি-কপাট সব তোলা। কিন্তু কুসুম দেখিত, খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে কুললক্ষ্মীদের কৌতুহলী দৃষ্টি বাহিরের মুক্ত আলোর দিকে একাগ্র হইয়া আছে। সে দৃষ্টি কুসুমের উপর পড়িলেই সচকিত হইয়া উঠিত। কুসুমের মনে হইত, সে পবিত্র নয়নের নির্ম্মল দৃষ্টি যেন বিদ্যুতাগ্নির মত তার দেহ-মনকে ঝল্‌সাইয়া দিয়া যাইতেছে। মরমে মরিয়া কুসুম, বারান্দার রেলিঙ্গে মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকিত। দেহের ভিতর হইতে তাহার নারী-প্রাণ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিত, "এ রূপের প্রদীপ নিবিয়ে দাও,—ওগো কঙ্কালের বাঁধন খুলে দাও!"

খ

বারান্দা হইতে কুসুম সেদিন উৎকণ্ঠিত হইয়া দেখিল, ট্রামগাড়ী থেকে নাবিতে গিয়া একটি ভদ্রলোক পা ফস্কাইয়া রাস্তার উপরে পড়িয়া গেলেন। গাড়ীসুদ্ধ লোক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল,—কিন্তু গাড়ী না থামাইয়া চালক আরও জোরে গাড়ী চালাইয়া দিল।

পাথরে মাথা ঠুকিয়া বৃদ্ধ একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চারিপাশে ক্রমেই লোক জড় হইতে লাগিল।

একজন বলিল, "ওহে, মাথা দিয়ে রক্ত পড়্‌চে যে!"

আর একজন বলিল, "মরে যায় নি ত?"

আর একজন বলিল, "উঁহু!"

আর একজন বলিল, "মরেনি, কিন্তু মর্‌তে কতক্ষণ! চলহে, এখনি পুলিশ-টুলিস এসে পড়বে, আর সাক্ষী মেনে থানায় ধরে নিয়ে যাবে!"

বারান্দার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আকুল-চোখে কুসুম দেখিল, সবাই গোলমালই করিতেছে, বৃদ্ধকে সাহায্য করা কাহারও ইচ্ছা নয়!

কুসুম আর স্থির্ থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি উপর হইতে নামিয়া আসিল।

ভিড় ঠেলিয়া সে ভিতরে গেল। অচেতন বৃদ্ধের দিকে একবার চাহিয়া, কুসুম বলিল, "আপনারা এঁকে দয়া করে আমার ঘরে তুলে দিয়ে আস্‌বেন? নৈলে ইনি মারা যাবেন।"

তিন-চারজন লোক ছুটিয়া আসিল।

ভিড়ের ভিতরে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া একজন বলিল, "বুড়োটা এর কে রে?"

আর একজন বলিল, "হেঁঃ! তা আর বুঝ্‌তে পার্‌চ না ম্যাড়াকান্ত?"—সে একটা অর্থপূর্ণ ঈশারা করিল। অনেকেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কুসুম সে সব কাণেও তুলিল না। চোখ নামাইয়া সে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

চারজন লোকে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে তুলিয়া ধরিল। তখনও তাঁর জ্ঞান হয় নাই; মাথায় রক্তপড়াও বন্ধ হয় নাই। তাঁর মুখ একদিকে হেলিয়া আছে,—হাত দুখানি অসহায়-ভাবে দু'দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কুসুম আস্তে আস্তে হাতদুটি আবার বৃদ্ধের বুকের উপরে তুলিয়া দিল।

পিছন হইতে কে-একটা অসভ্য উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যত্ন কর্‌বার এমন মনের মানুষ পেলে আমিও বাবা, দিনে দুশোবার ট্রাম থেকে পড়ে যেতে রাজী আছি!"

গ

একরাত একদিন গিয়াছে,—বৃদ্ধ তেমনি অজ্ঞান।

কুসুম একরকম খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছে। ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিয়াছে; রাতভোর জাগিয়া, বিছানার পাশে বসিয়া তাঁকে পাখার হাওয়া করিয়াছে। বাড়ীর তলায় একজন ডাক্তার থাকিত, কুসুম তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়াছিল।

কিন্তু সকাল গেল, বিকাল গেল—কৈ, রোগীত এখনো চোখ মেলিয়া চাহিলেন না! কুসুম ভাবনায় পড়িল।

সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়া কুসুম দেখিল, গা যেন আগুন!

ভয় পাইয়া তখনি সে চাকরকে একজন নামজাদা ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে বলিল।

ডাক্তার আসিল। সে বয়সে যুবক,—সবে বিলাত হইতে ফিরিয়াছে।

পরীক্ষার পর ডাক্তার বলিল, "এঁর অবস্থা বড় ভাল নয়।"

কুসুম কাতরে বলিল, "তবে কি হবে?"

"ভাল করে চিকিৎসা হলে, বিশেষ কোন ভয় নেই।"

রোগীর মাথায় 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া ও 'প্রেস্‌ক্রিপসন্‌' লিখিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম, ডাক্তারের হাতে 'ভিযিটে'র টাকা কটা গুঁজিয়া দিল।

আঙ্গুল দিয়া টাকাগুলি অনুভব করিতে করিতে কুসুমের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিল, "ইনি তোমার কে?"

কুসুম কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, কিন্তু তার আগেই ডাক্তার আবার বলিল, "ইনি বুঝি—"

ডাক্তার কি বলিবে, সেটা আগে

শেষ না-হইতে-হইতেই কুসুম সবেগে মাথা-নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, না!"

"তবে?"

কুসুম অল্প দু-চার কথায় সব বুঝাইয়া দিল।

ডাক্তার খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল, "দেখ, তুমি এক কাজ কর। এঁকে কাল সকালেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। সেখানে ভাল চিকিৎসাও হবে, আর হঠাৎ কিছু হলে তোমারও কোন দায়দোষ থাক্‌বে না।"

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ডাক্তারের কথা একমনে শুনিতেছিল। এখন, হঠাৎ সে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "আমিও তাই বলি ডাক্তারবাবু! ত্যাখদিকিন্, কোথাকার আপদ কার ঘাড়ে এসে পড়্‌ল! ও ছুঁড়ীর মতিচ্ছন্ন হয়েছে,—আমার কথাতে কিছুতেই ও কাণ পাত্‌বে না। আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় কোনরকমে দুটাকা-পাঁচটাকা ঘরে আসে, তা ও হ্যানরে ত্যানরে, রুগীরে ডাক্তার রে, ওষুধ রে পত্তি রে,—ভালমানুষের ওসব কি পোষায়, না ভাল দ্যাখায়? তা তুই—"

কোনরকম উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনমনে সে গড়্‌গড়্ করিয়া বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কুসুম অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "মা তুই থাম্ বল্‌চি!"

"থাম্‌ব? কেন থাম্‌ব? হক্ কথা বল্‌ব, তা—"

"ফের্ যদি ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ কর্‌বি মা, তাহলে এই ঘটি দিয়ে—" বলিতে বলিতে কুসুম জলের ঘটির দিকে হাত বাড়াইল।

কুসুমের মা ভয় পাইয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল; এবং সেখান হইতে অকথ্য ভাষায় মেয়েকে গালি পাড়িতে লাগিল।

সেদিকে কাণ না পাতিয়া কুসুম, ডাক্তারকে বলিল, "এঁর জ্ঞান হবে কখন্?"

ডাক্তার এতক্ষণ চুপ্‌টি করিয়া কি-এক চোখে কুসুমের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "আজ রাতেই জ্ঞান হতে পারে। তবে, বলাও যায় না",—তারপর হাত বাড়াইয়া বিছানার উপর হইতে টুপীটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তবে, আমি এখন চল্লুম।"

"আসুন,"—কুসুম, ডাক্তারকে নমস্কার করিল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া ডাক্তার বলিল, "দেখ, তোমার 'ভিজিটে'র টাকা ফিরিয়ে নাও।"

কুসুম, বিস্মিতস্বরে বলিল, "কেন?"

ডাক্তার স্নিগ্ধচোখে কুসুমের চকিত চোখের দিকে চাহিয়া, শুধু বলিল, "না।"

কুসুম অত্যন্ত সন্দেহ ও বিরক্তির সহিত কহিল, "কেন নেবেন না, বলুন আপনি!"

কুসুমের মনের ভাব বুঝিয়া ডাক্তার মুখ টিপিয়া নীরব-হাস্য করিল। তারপর হাতের টাকাগুলো ঝন্‌ঝন্-শব্দে বিছানার উপরে ছুঁড়িয়া দিয়া, জুতা মস্‌মস্ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম খানিকটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। আপনমনে অস্ফুট ও দুঃখিত কণ্ঠে বলিল, "এমন পোড়া মন নিয়ে সংসারে এসেচি যে, সাধুকেও সন্দেহ হয়!"

ঘ

অনেক রাতে রোগীর জ্ঞান হইল।

পাশ ফিরিয়া, থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "বুক জ্বলে যাচ্চে – একটু জল।"

পাখার বাতাস করিতে করিতে তখন কুসুমের সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। রোগীর গলা শুনিয়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া সে উঠিয়া বসিল। তাড়াতাড়ি কুঁজো হইতে একটা কাঁচের গেলাসে জল গড়াইয়া সে রোগীর মুখের কাছে ধরিল।

জলপান করিয়া রোগী আরাম পাইলেন। কুসুম তাঁহার তপ্ত কপালে আপনার ঠাণ্ডা হাতদুখানি আল্‌তভাবে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

"ওঃ! বুক জ্বলে যাচ্ছে, বুক জ্বলে যাচ্ছে!

কুসুম তখনি রোগীর বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। তিনি "আঃ" বলিয়া চোখ বুজিলেন।

খানিক পরে আবার তাঁহার তৃষ্ণা পাইল। কুসুম আবার জল দিল।

রোগী খানিকক্ষণ ঝিমন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর একবার জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কে? মা সুধা?"

মুখ ফিরাইয়া কুসুম বলিল, "না, না! আমি পোড়াকপালী!"

রোগী চোখ মুদিয়া আপনা-আপনি বলিলেন, "এত রাত অবধি জেগে আছিস মা!"

কুসুমের সারা বুক ভরিয়া উঠিল। খাটের পরে মাথা রাখিয়া সে একমনে, সেই সুর আপন মনের মধ্যে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া শুনিতে লাগিল।

তার বোধ হইল, সে যেন এই বিপন্ন বৃদ্ধের আপন কন্যা! বাবা যে কেমন, কুসুম ত একথা কখনই জানে নাই,—আজ যেন তারই একটা অজানা আনন্দের আভাস প্রাণে তার জাগিয়া উঠিল।

হঠাৎ ঘরের দরজায় বাহির হইতে করাঘাত হইল।

কে ডাকিল, "কুসুম!"

কুসুম শুনিয়াও শুনিল না। সে তখনও বুঝি মা-ডাক্ শুনিতেছে!

"কুসুম!—অ আমার কুসুমকলি!"

কুসুম চুপ।

"ও কুসুম, শুন্‌চ?"—সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুক বাজ্‌খাই গলায় একটা গান ধরিয়া বসিল। সে ত গান নয়—যেন ষাঁড়ের ডাক্!

এবারে কুসুমের মনে ভারি ভয় হইতে লাগিল,—রোগী যদি শুনিতে পান?

"(হঠাৎ গান থামাইয়া) ওগো কুসুম,—ও—" কিন্তু কথা শেষ হইতে-না-হইতেই হঠাৎ নীরবে দরজাটা খুলিয়া গেল এবং বিদ্যুতের মত বাহিরে মুখ বাড়াইয়া নিম্ন অথচ তীব্রস্বরে কুসুম বলিল, "ফের্ যদি কুসুম কুসুম করবে, তাহলে ঝাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব। বেরোও এখান থেকে—।

যেমন সহসা দরজাটা খুলিয়াছিল তেমনি

৬

পরদিনের সন্ধ্যাবেলা। কুসুম জানালার কাছে একলাটি বসিয়াছিল।

আজ সকালে রোগীর জ্বর হঠাৎ বাড়িয়া উঠাতে কুসুম ভয় পাইয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছে। না দিয়া আর উপায় কি?

আপন জীবনের মলিনতা, কুসুমকে সব-সময়েই কাতর করিয়া রাখিত। এই মলিনতার ভিতরে থাকিয়াও, সে যে একটা ভাল কাজ করিতে পারিয়াছে, এটা ভাবিয়াও মন তার সন্তোষ ও পুলকে পূরিয়া উঠিতেছিল।

আর, রোগীর উপরে তার কেমন একটা মায়াও পড়িয়া গিয়াছিল। রোগীর সেই রোগকাতর মুখখানি এখনও তার প্রাণের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল।

দিনের ভিতরে চার-পাঁচবার চাকর পাঠাইয়া কুসুম রোগীর খবর লইয়াছে। জানিয়াছে যে, রোগীর বাড়ীর লোকেরা কেমন করিয়া সংবাদ পাইয়া হাসপাতালে আসিয়াছে।

* * *

তিন-চারদিন পরে শুনিল, রোগীর জ্বর বন্ধ হইয়াছে, কাল তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরিবেন।

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কুসুম ভগবানকে ধন্তবাদ দিল। ঠিক করিল আজই সে রোগীকে একবার দেখিতে যাইবে।

৮

হাসপাতালের সুমুখে আসিয়া কুসুম চাদরখানি মাথার উপরে টানিয়া দিয়া চাকরের সঙ্গে চলিল। চাকর তাহাকে রোগীর ঘর চিনাইয়া দিল। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া কুসুম ভিতরে ঢুকিল।

একটি বালিসে ঠেসান্ দিয়া বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। পাশে একটি যুবক ও একটি বয়স্কা রমণী। বৃদ্ধ কি কথা কহিতেছিলেন,—হঠাৎ কুসুমকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন।

কুসুম সঙ্কুচিতভাবে আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধের পায়ে মাথা ছোঁয়াইয়া ভক্তিমতী কন্যার মত প্রণাম করিল।

কুসুমের দিকে চাহিয়া বিস্মিত বৃদ্ধ বলিলেন, "কে গা তুমি?"

কুসুম মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে চিনতে পার্‌ছেন না বাবা?"

ভাল করিয়া কুসুমের মুখ দেখিতে-দেখিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "হুঁ, চিনি-চিনি কর্‌চি বটে! বোধ হয়—বোধ হয়, অসুখের সময়ে তোমাকে কোথায় দেখেচি। তাই নয় কি?"

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

"রোসো—রোসো, মনে পড়েচে। তুমি কি আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলে, আমাকে জল খেতে দিয়েছিলে?"

"ট্রাম থেকে পড়ে গেলে পর আপনাকে আমি আমার ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আমার বাড়ীতে দু-রাত ছিলেন। তারপর আপনার জ্বর বেড়ে ওঠাতে আমি ভয় পেয়ে আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দি। আপনি ভাল আছেন শুনে একবার দেখে

বৃদ্ধ মুখ নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর, কুসুমের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার খরচোখে দেখিয়া লইয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তোমার ঘরে, তোমার হাতে আমি জল খেয়েচি,—বল-কি, অ্যাঁ!"

বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া কুসুম একেবারে থ হইয়া গেল।

তীব্রস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, আরও মনে পড়্‌চে। তুমি আমাকে দুধ আর সাবুও খেতে দিয়েছিলে।" একটু থামিয়া হঠাৎ বিছানার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া, উগ্রকণ্ঠে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন, "গণিকা তুই,—জানিস্‌, আমি ব্রাহ্মণ!"

কুসুমের মাথা হেঁট হইয়া গেল।

"আমার জাত মেরেচিস্‌! তার চেয়ে আমি মরে গেলাম না কেন, আমি মরে গেলাম না কেন!—পাপিষ্ঠা, আবার কি কর্‌তে এখানে এসেচিস্‌ তুই?"

কুসুম কিছু বলিতে পারিল না। আড়ষ্ট ও জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ কর্কশস্বরে বলিলেন, "কথা ক'! বল্‌, কি চাস্‌ তুই? বখ্‌শিষ্‌?"

বখ্‌শিষ্‌!—কুসুমকে ঠিক যেন কে একটা ধাক্কা মারিল। গর্ব্বিতভাবে হঠাৎ মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "হাঁ!"

বালিশের তলা থেকে একখানা দশ-টাকার নোট বাহির করিয়া, বৃদ্ধ অবজ্ঞা-ভরে কুসুমের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। নোটখানা কুসুমের গায়ে লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

কুসুম হেঁট হইয়া নোটখানা তুলিয়া লইল। তারপর কোন দিকে না-চাহিয়া নতমুখে দৃঢ়পদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।...

কুসুম, রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা খোঁড়া ভিখারী হাত পাতিয়া বলিল, "মা কিছু ভিক্ষে দাও মা!"

কুসুম অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নোটখানা ভিখারীর হাতে গুঁজিয়া দিল।

ভিখারী প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর কুসুমের পায়ের তলায় পড়িয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিল, "জয় হোক্‌ রাজা-মা,—জয় হোক্‌!"

কিন্তু, সে, জয়ধ্বনি কুসুমের কাণে প্রবেশ করিল না। বধির হইয়া সে রৌদ্রদীপ্ত আকাশের অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিল,—হায়, তাহার অশ্রু-অন্ধ চোখে বিশ্ব আজ অন্ধকার—অন্ধকার!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ভাষা-সংস্কার-বিচার

দিনকার-দিন বাঙ্গালা ভাষার বেশ আদর বাড়িয়াছে; যাঁহাদের সুশিক্ষা আছে, পদমর্য্যাদা আছে, তাঁহাদের অনেকে এখন বাঙ্গালায় রচনা করা কিংবা বাঙ্গালা-সাহিত্য পড়া বিশেষ লজ্জার কথা মনে করেন না। বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা বাড়িয়াছে বলিয়াই, কিরূপ ভাষায় লিখিতে হইবে বা রচনা-রীতি কিরূপ হইবে প্রভৃতি বিষয় লইয়া, অনেক আলোচনা চলিতেছে। ভাষা এবং সাহিত্যকে উন্নত করিবার উপায়-নির্দ্ধারণই যখন সকলের উদ্দেশ্য, তখন এ বিষয়ের আলোচনার সময়ে কেহ যেন মতভেদের জন্য ধীরতা না হারাই।

একবার শুনিয়াছিলাম যে কোন কোন সুধী ব্যক্তি নাকি আমাদের সাহিত্যে হুতুমি বাঙ্গালা চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং নিজেরা ঐ রীতিতে রচনা প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহাদের নামে এই কথাটি রটিয়াছিল, তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া এবং তাঁহাদের মুখেই তাঁহাদের রচনা-পাঠ শুনিয়া বুঝিলাম, কথাটি মিথ্যা। হইতে পারে, যাঁহাদের নাম শুনিয়াছিলাম, তাঁহারা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখন যখন সংবাদপত্র বাড়িতেছে, সাহিত্যমুকুর (magazine) বাড়িতেছে, নানা শ্রেণীর পুস্তকের সংখ্যা বাড়িতেছে, এবং লেখক ও পাঠকদলের বৃদ্ধির সঙ্গে নানা মুনির সাহিত্যের আদর্শ-ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

সাহিত্যে যদি শব্দগুলিকে জনসাধারণের উচ্চারণের অনুরূপ মূর্ত্তিতে ব্যবহার করিতে হয়, অর্থাৎ যদি হুতুমি ভাষাকে চূড়ান্ত হুতুমি করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে জমিদারি সেরেস্তার মুহুরি এবং আদালতের মোক্তারদিগকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক করিতে হয়। আদর্শ-ভাষা চালাইবার জন্য যদি একখানা পত্রিকার প্রয়োজন হয়, তবে এইভাবে তাহার বিজ্ঞাপন দিলে চলে:—"আম্রা শিগ্‌গির অ্যাক্ নতুন কাগোজ চালাবো, ও তার্ কত্তা কোর্বো জগোবন্ধু বিদ্দেসাগোর্‌কে, আর সহোকারি কোর্বো ওতুল চন্দোর্ বিস্‌সেস্‌কে। চোত্তিরের তিরিশের মোদ্‌ধে বারো আনা না পেলে কাক্‌কেও কাগোজ দোবো না। আম্রা জোচ্চোর নৈ, তা জোতিন্দির্ মিত্তিরের মোতো ভদ্দোর বেক্তিরে বোল্‌বেন। ভালো জে লিখ্‌বো, তার্তো ভাব্‌না নেই! ঈতি ছ্রি গং-আ নারান্ রোকৃখিৎ। সাকিন্ কোলকেতা ত্যারো নোম্বোর পেল্লাদ মোল্লিকের গোলি।"

কেহ যদি বলেন যে তিনি ঠিক জনসাধারণের উচ্চারণ ধরিবার জন্য আদমসুমারির বিবরণ দেখিয়া অধিকসংখ্যক লোকের হিসাব লইবেন না, কেবল তাঁহার নিজের দলের কয়েকজন ভদ্রলোকের উচ্চারণ লক্ষ্য

মেটে না। সকলে না হয় একটা নির্দ্দিষ্ট দলকে আদর্শ ভদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে যে আবার সেই প্রাচীন "সাধু বনাম অসাধু"র কথা তুলিতে হয়। পাকে চক্রে সকলকেই যখন একটা সাধুভাষা খাড়া করিতে হইতেছে, তখন সাধু কথাটাকে তামাসার জিনিস না করিয়া, কে সাধু কে অসাধু তাহার বিচার করিলেই ভাল হয়। এই বিচারের সুবিধার জন্য একটুখানি ইংরেজি-ভাষার দৃষ্টান্ত ও নজীর দিতে হইবে; কারণ প্রথমতঃ এই বিচারের জন্য অন্য একটি উন্নত ও লোক-ব্যবহৃত ভাষার সহিত কিঞ্চিৎ তুলনা করিবার প্রয়োজন আছে, এবং দ্বিতীয়তঃ ভাষা-বিজ্ঞানটি ইউরোপীয় এবং উহার মূল সূত্রগুলি খাটাইয়া যে সকল ভাষার উন্নতি এবং ক্ষয়ের কথা বিচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমরা ইংরেজির সহিত অল্পাধিক পরিচিত।

সকল ভাষারই পরিবর্ত্তনে এবং গড়নে দুইটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়,—একটি Phonetic decay বা স্বর-ক্ষয় এবং অন্যটি Dialectic regeneration বা প্রাদেশিক শব্দের উদ্ধারে ভাষার পুষ্টি। ভাষা-বিজ্ঞানের কথায় যাঁহাদের নামের দোহাই দেওয়া চলে তাঁহারা বলেন, যে মানুষেরা স্বাভাবিক আলস্যে এবং অন্যবিধ প্রাকৃতিক কারণে নিরন্তরই ভাষার শব্দগুলিকে ভাঙ্গিয়া ছোট করিতেছে এবং উচ্চারণ-বিকৃতিতে একেবারে নূতন শব্দের মত করিয়া তুলিতেছে। Dr. Skeat বলিয়াছেন যে সমুদ্রের ঢেউ গণা যেমন নির্দ্দেশ করাও তেমনই অসম্ভব। আমাদের দেশে কি ভাবে শব্দ-বিকৃতি এবং স্বর-ক্ষয় চলিয়া আসিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত না দিয়া সুবিধার জন্য দোহাইয়ের উপরই নির্ভর করিলাম, কারণ-প্রযুক্ত সূত্রের যথার্থতা দেখাইতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়।

মানুষে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, তাহাই যদি আদর্শ-ভাষায় গৃহীত হইত, তাহা হইলে সাহিত্যের আদর্শ-ভাষাকে প্রতি মুহূর্ত্তে নবজন্ম পরিগ্রহ করিতে হইত। নূতন নূতন রঙ্গিনপত্রে সাহিত্য-মুকুর প্রকাশ করিবার মত, না হয় প্রতিদিন ভাষাকে নূতন মূর্ত্তিতে খাড়া করা যাইত; কিন্তু পরিবর্ত্তনের ঢেউগুলি অসংখ্য বলিয়া এ কাজটি করা অসম্ভব। সাধুদলের লোকেরাও এবৎসর যে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শব্দ চালাইতেছেন, কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাদিগকে তদতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে; এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক বিকৃতির নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাল ঠিক রাখিয়া চলা, সকল ভাষার পক্ষেই অসম্ভব। তবে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট দলের লোকেরা বলেন, যে আমরা এই মুহূর্ত্তে যেরূপ সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃতরূপ দেখাইতেছি, তোমরা তাহাই চিরস্থায়ী করিয়া রাখ, তাহা হইলে সেই আবদার গ্রাহ্য করা চলে কি না, ভাবিয়া দেখিতে হয়।

ইংলণ্ডের মত ছোট দেশেও অনেক

গৌরবে মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে, অথচ সেই সকলগুলি প্রাদেশিক ভাষাই একটি আদর্শ-সাহিত্যের ভাষার শাসনে শাসিত হইতেছে। এ কথাও উল্লেখ করিয়া রাখি, যে লণ্ডন সহরের প্রাদেশিকতা এবং লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রাদেশিকতাও আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয় না বরং আদর্শের শাসনে নিয়মিত হয়। নাটকাদিতে এবং অন্যবিধ রচনায় প্রয়োজন-মত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাদশিক ভাষা, উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া লিখিত হয়, এবং প্রয়োজন হইলে সকল প্রদেশের ঘরওয়া কথা এবং প্রবাদ-রচনাদি আদর্শ ভাষা, রচনার কাছা-কাছিই উদ্ধৃত হয়; এবং তাহাতে আদর্শ-ভাষাকে ক্ষীণবল বা উপহসিত হইতে হয় না।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহার সহিত 'সবুজ পত্রে'র সুযোগ্য সম্পাদকের কোন বিরোধ নাই। তিনি সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলির সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে চাহেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি, যে তিনি দেশবিশেষের বিকৃত উচ্চারণের শাসন মানা দূরে থাকুক, বরং সাহিত্যে আদর্শ-ভাষার প্রভাবে প্রাদেশিক বিকৃতিকে দূর করিতে চাহেন। শব্দের মৌলিক শুদ্ধতা রক্ষা করিবার দিকে এবং যথাস্থানে যথার্থ ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করিবার দিকে সুপণ্ডিত প্রমথনাথ চৌধুরী সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখেন। সাহিত্যের আদর্শ-ভাষায় যিনি সর্ব্ববিধ বিকৃতি পরিহার করেন, তিনি যে কি জন্য সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে নিয়মের ব্যাভিচার করিতে

বহুশ্রুত প্রমথনাথ জানেন এবং স্বীকার করেন, যে, করিয়া, খেলিয়াছি, গিয়াছে, ঘটিল প্রভৃতি রূপগুলি ভাষায় কল্পিত নহে এবং ক'রে, খেলেছি, গেছে, ঘট্‌ল প্রভৃতি উহাদেরই ক্ষয়ে জাত। তিনি বলেন যে "ক্ষীণ" ক্রিয়াপদগুলি ভাষায় অধিকতর বলশালী এবং অবিকল পদগুলি বাক্যের দ্রুতগতির বাধা। যে সকল শব্দ গদ্য-রচনায় ব্যবহার করিলে বেশ ভাল শোনায় সেগুলিও অনেক সময়ে পদ্যরচনায় কথা, এবং ভাবের জোর রাখিতে পারে না। কবিতায় যখন—ধরিয়া চরণ, করিয়া যতন, মরমে মরিয়া, ভরিয়া লইবে কুম্ভ, খেলিয়াছি কত খেলা করিয়াছি কত আয়োজন, গিয়াছে চলিয়া, নিশ্চয় মরিব, ঘটিল কি দায়, চলিতেছি পথ একেলা প্রভৃতি কোন প্রকার দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করে না, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মত শব্দকুশলী ও সুর-তালের ওস্তাদ যখন ঐ সকল ক্রিয়া তাঁহার পদ্য-রচনায় অসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারেন, তখন উহাদিগকে ক্ষীণ করিয়া বলবিধানের চেষ্টা না করিলে চলে। পদ্য-রচনাতেই সময়ে সময়ে অনেক শব্দকে কাটিয়া ছাঁটিয়া লইতে হয়; পদ্যেও যাহাকে আস্ত রাখা চলে, গদ্যে তাহাকে খর্ব্ব করিবার কোন কারণ নাই। ক্রিয়াগুলির ব্যবহারে যখন একটা সাধারণ নিয়ম থাকিবে তখন এ কথাও বলা চলে না যে, দৃষ্টান্তের ক্রিয়াপদগুলি এবং ঐরূপ আরও কতকগুলি ক্রিয়াপদ না হয় পূর্ণাঙ্গরূপে রক্ষিত হইবে, কিন্তু অতিদীর্ঘ ক্রিয়াপদ-

এখন সর্ব্বনামের কয়েকটি শব্দের কথা বলিতেছি। উত্তম-মধ্যমের বেলায় সকলেই নীরব আছেন দেখিতেছি; আমি, আমরা, তোমাকে, তোমাদের, আপনি, আপনাদের প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া গিয়াছে। "সে" এবং "তিনি"র বহুবচনে এবং কর্ম্মাদি কারকের রূপে যে "হা" এবং "হাঁ" আসে তাহা লোপ করিলেই যে ভাষার গায়ের জোর অধিক হইবে এবং রচনার গাম্ভীর্য্য বাড়িবে তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। কথার জোর উহার Emphasis বা ঝোঁকের উপর নির্ভর করে; যেখানে ঝোঁকের মাথায় "হা" বা "হাঁ" আপনি লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, সেখানে অক্ষর থাকিলেও কোন বাধা হয় না এবং সকল ভাষাতেই ঝোঁক এবং টানের (accent) অনুক্রমে শব্দের অক্ষরবিশেষ অনুচ্চারিত বা অর্দ্ধ-উচ্চারিত থাকে। কোনস্থানেই যখন নূতন কিছু করিবার প্রয়োজন হইল না, তখন এই তুচ্ছ "হা" "হাঁ" লইয়া তর্কের ঝড় তুলিবার প্রয়োজন কি? এইসঙ্গে আর একটি কথাও বলিয়া রাখি। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা যায়, যে চৌধুরী-মহাশয় যে পন্থা অবলম্বনীয় মনে করিয়াছেন তাহাই প্রশস্ত, তাহা হইলেও দশজনের অবলম্বিত পন্থা তিনি একাকী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যেখানে চরিত্র-নিষ্ঠার কথা নাই, জীবন-মরণের কথা নাই, সেখানে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজের মতটি গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার মত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রচলিত প্রথাই

যে সকল স্থানে সাহিত্য-সমাজ সুতন্ত্রিত, অর্থাৎ যেখানে আমাদের দেশের মত প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন হইতে পারে না, সেখানে কেহ নূতন মত-প্রচারের জন্য তাঁহার নূতন ব্যাকরণ অথবা বানান অথবা অন্যবিধ পরিবর্ত্তন, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া যে কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে পারেন; কিন্তু নিজের উদ্ভাবিত পন্থা অনুসরণ করিয়া যদি সাধারণ প্রবন্ধে নূতন বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতি চালাইয়া যান, তবে প্রবন্ধটি ভাষার হিসাবে কুরচিত বিবেচিত হইবে এবং কুত্রাপি মুদ্রিত হইবে না। কেহ নূতন উচ্ছৃঙ্খলতা না আনেন ইহাই প্রার্থনা।

এ পর্য্যন্ত স্বরক্ষয়ের কথা বলিয়াছি; এখন Dialectic regeneration সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলিব। সকলেই জানেন যে বিশেষ্য-বিশেষণজ্ঞাপক শব্দরাশি অর্থাৎ Vocabulary লইয়া ভাষার কাঠাম রচিত হয় না এবং যে ব্যাকরণ লইয়াই ভাষা, তাহার পনরআনা হইল সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদের রূপ ও সংযোগ লইয়া। সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে অর্থাৎ ঐগুলি যদি কোন প্রাদেশিক বিকৃতির অনুরূপ না হয়, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্যের আদর্শ-ভাষা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের বলিয়া তর্কই উঠিবে না। কোন বিশেষ কারণে যদি কোন একটি প্রদেশের শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না; এতদিন পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন কথাই উঠে নাই। আরব ও পারস্যের অনেক

এবং এখন ইউরোপের অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করিতেছি। সংস্কৃত নামে প্রসিদ্ধ ভাষাতেও বৈদিক শব্দ ছাড়া ভারতবর্ষের দ্রাবিড়াদি জাতির এবং বাহিরের গ্রীক্ প্রভৃতি জাতির শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। ভাব-প্রকাশের জন্য শব্দের অভাব হইলে লোকে প্রথমতঃ আপনাদের ভাণ্ডার খুঁজিয়া দেখে এবং পরে বাধ্য হইয়া অপরের কাছে শব্দ ধার করে। মূলতঃ ইংরেজি ভাষায় পূর্ব্ব-মর্শিয়ার শব্দই অধিক ছিল, কিন্তু হম্বার নদীর উত্তরভাগের প্রাদেশিক শব্দ বহু পরিমাণে অধিকার লাভ করিতে ছাড়ে নাই। আদর্শ-ইংরেজি ভাষায় ভাব-প্রকাশের সুবিধার জন্য দেশের সকল প্রাদেশিক ভাষা হইতেই সযত্নে শব্দ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইংরেজি ভাষা-বিজ্ঞান গ্রন্থে দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত শব্দগুলির দীর্ঘ দীর্ঘ তালিকা আছে।

ভাব-প্রকাশের অসুবিধা দেখিয়া মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত, বর্দ্ধমান জেলা হইতে সেখানকার দেশী "ভাস্কর" শব্দটি সংগ্রহ করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। আমাদের যদি আপনাদের ভাষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকে, সকল প্রদেশগুলিকে টানিয়া একসঙ্গে বাঁধিবার ইচ্ছা থাকে, উপযুক্ত ভাব-প্রকাশক শব্দ সংগ্রহ করিয়া ভাষার পুষ্টি-বিধানের চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মত যত্ন করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন কোষে মুদ্রিত করিব, এবং যে প্রদেশের যে শব্দটি ভাষার অভাব পূরণ করিবে মনে হইবে, তাহাই আদর্শ-ভাষায় প্রচলিত করিব। নিজের ঘরের শব্দ-ভাণ্ডার না খুঁজিয়া সংস্কৃত-কোষ হইতে শব্দ খুঁজিতে যাওয়াও অন্যায় বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষার ভাণ্ডার হইতে যেদিন শব্দ সংগৃহীত হইয়া আদর্শ-ভাষা পুষ্টিলাভ করিবে, সেদিন অলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রদেশগুলি প্রাণের টানে একত্র মিলিবে এবং আমাদের আদর্শ ভাষা অমুক বিশেষ প্রদেশের বলিয়া অসার কোলাহল উঠিবে না। ত্রিবেণী হইতে কলিকাতার উত্তরভাগ পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয়কূলস্থিত স্থানের শব্দ-উচ্চারণের যে ধাঁচা আছে এবং টান্ (accent) আছে, কেহ কিছু না বলিলেও উহাই সর্ব্বত্র গৃহীত এবং শিক্ষিত হইবে; কারণ ঐ ধাঁচা ও টান্ আপনার প্রাকৃতিক মাধুরীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

Dialectic regeneration প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতেছি। অনেককেই এ-যুগে নূতন ভাব বুঝাইবার জন্য নূতন নূতন কথা চালাইতে হয় এবং নূতন করিয়া শব্দ গড়িতে হয়। যে পদ্ধতিতে এই কাজটি হইয়া থাকে তাহার সমালোচনায় দুই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শব্দের দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) একজন একটি নূতন শব্দ ব্যবহার করিবার পরেও অন্য ব্যক্তি অন্য নূতন শব্দ চালাইতে চেষ্টা করেন, এবং তাহাতে নূতন ভাব-প্রকাশক একটা সুনির্দ্দিষ্ট শব্দ পাওয়া যায় না। একজন আগে কিছু লিখিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার কথাটি বজায় রাখিতে হইবে, তাহা নয়, তবে প্রথমকার ব্যবহৃত শব্দটির যে কোন বিচারই হয় না, এবং ইচ্ছামত সকলেই যে নূতন

নূতন শব্দ গড়িতে থাকেন, এইটিই দুঃখ। একালের বিজ্ঞানের Evolution শব্দটির বিভিন্ন শব্দে অনুবাদ দেখিতে পাই। প্রথমে Evolution অর্থে বিবর্ত্তন শব্দটি চলিয়াছিল এবং এখনও উহার ব্যবহার আছে, কাহারও কাহারও আপত্তি এই, যে বিবর্ত্তন বলিলে ঠিক Darwinএর Evolution বুঝায় না। এটা বড়ই দুর্ব্বল যুক্তি। Darwinএর প্রপিতামহের জন্মের পূর্ব্বেও Evolution শব্দটি ইংরেজি ভাষায় ছিল, এবং উহার যে অর্থ ছিল তাহাতে Darwinএর তত্ত্ব পরিস্ফুট হইত না। নূতন বিজ্ঞানে ঐ শব্দটি, যে ভাব বুঝাইবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহা নূতন তত্ত্ব না পড়িলে কাহারও বুঝিতে পারা অসম্ভব। একটা ভাবের কথঞ্চিৎ অনুরূপ শব্দ যদি ভাষায় পাই, তবে তাহাকেই নূতন ভাব দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারি; চিরকালই এই প্রথায় কাজ চলিয়াছে। Darwinএর বিবর্ত্তন-বাদ বলিলে কোন প্রকারে হিন্দু-দর্শনের কথার সহিত গোল বাধে না, এবং যেখানে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয় সেখানে কথার ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে কোন্ বিবর্ত্তনের কথা বলা হইতেছে। যে উহার তত্ত্ব কিছুই জানে না, তাহার কাছে সকল শব্দই সমান হইয়া উঠিবে। বিবর্ত্তনবাদের সঙ্গে যে Progress কথা চলে তাহারও অনুবাদে আমরা উন্নতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারি,—কোন ক্ষতি হয় না; Progress বলিতে এবং উন্নতি বলিতে একটা ভালর দিকে গতি হইতেছে বুঝা যায়; অথচ বিবর্ত্তনের উন্নতিতে ভালমন্দ বিচার আদৌ নাই। কথা বলিবামাত্রই সমস্ত বিজ্ঞানের ভাব লোকে বুঝিয়া ফেলিতে পারিবে, এমন শব্দ কেহই আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না। নূতন ভাবের কাছা-কাছি হইলেই একটা দেশী শব্দ লইয়া সেই নূতন ভাব বুঝাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে; এবং তাহাতে এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জন্মিতে পারে,—এবং চিরকালই সকল দেশে তাহা হইতেছে। বিবর্ত্তন শব্দটাও দার্শনিকদের নূতন গড়া শব্দ নহে, এবং প্রাচীন ভাষায় উহার অন্য অর্থে ব্যবহারও ছিল। এইরূপ শ্রেণীর শব্দ লইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বিবাদের সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নাই। ক্রমাগত ইচ্ছামত নূতন নূতন শব্দ গড়িলে পাঠকদিগকে কেবল বিব্রত করা হয়। Evolutionটি যে তত্ত্বের অন্তর্গত তাহার সাধারণ নাম Geneologyকে উদ্ভব-তত্ত্ব নাম দিলে সকলেই বেশ বুঝিতে পারে; এবং ঐ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময় নূতন বিবর্ত্তন-পদ্ধতি বুঝাইলে কিছুই ক্ষতি হয় না।

(২) সংস্কৃত ভাষা হইতে অপ্রচলিত নূতন শব্দ আনিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া নূতন ভাব বুঝাইবার আগে দেশী শব্দের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করা উচিত। অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে Prestige এবং Sensitive শব্দের অনুবাদ লইয়া কয়েকজন পণ্ডিত বিষম তর্ক তুলিয়াছিলেন, এবং অবিশ্রান্ত সংস্কৃত কোষগ্রন্থ হাত্‌ড়াইতেছিলেন। আমাদের দেশের "গুমর" শব্দটির গায়ে অন্য যে কোন ভাবের ছায়া থাকুক না কেন, ঠিক Prestige কথা বুঝাইবার সময়ে যদি "গুমর" শব্দটির ব্যবহার করা যায় তবে কোন

লোকের পক্ষে যথার্থ অর্থ বুঝিতে গোল হয় না। যতদিন একজনের কোন দুর্ব্বলতা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং বাহিরের লোকে তাহা ধরিতে পারে না, ততদিন তাহার দব্‌দবাই ও গুমর বেশ বজায় থাকে, কিন্তু কোনপ্রকারে সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িলেই গুমর চলিয়া যায়। ঐ গুমর শব্দটি কখনও Pride এবং কখনও Conceit অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সেরূপ স্থলে শব্দের আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি প্রভৃতি দেখিয়া সকল ভাষাতেই শব্দের অর্থ স্থির করিতে হয়।

(৩) Sensitive কথাটা লইয়াই আর একশ্রেণীর গোলযোগের কথার দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংরেজি একটা শব্দে যত রকমের ভাব সূচিত হয়, সেই সকল ভাব-গুলিই আমরা একটা শব্দে খুঁজিতে চেষ্টা করিব কেন? শরীরে একটা প্রদাহের ফলে একটি স্থান Sensitive হয়, অর্থাৎ সে স্থানটি অল্প একটু ছুঁইলেই ছন্‌ছন্‌ করিয়া উঠে, সেখানে ছন্‌ছন্‌ কথার বিশেষণরূপে "ছন্‌ছনে" বলিলে Sensitive কথা সহজে ব্যক্ত হয়। একটু কথা কহিলেই যাহার লাগে এবং কথায় কথায় অভিমান হয় তাহাকে অভিমানী বলি; সেও Sensitive। যেখানে অল্প ছুঁইলেই স্পর্শটি সর্ব্বত্র চালিত হয়, অথচ যেখানে অভিমানের কথা নাই, সেখানে স্বতন্ত্র শব্দ খুঁজিতে হইবে। অমুক যন্ত্রটি Sensitive অথবা অমুক গাছটি Sensitive বলিলে যে সূক্ষ্মরকমের স্পর্শানুভব-সামর্থ্য বুঝায়, তাহা যখন কেবল তত্ত্বান্বেষী-দিগকে বুঝাইতে হইবে, তখন সংস্কৃত স্পর্শভেদ্য শব্দ ব্যবহার করা চলে। শব্দগুলি সাহিত্যে চালাইবার জন্য লিখি নাই; শব্দ গড়িবার পদ্ধতির আলোচনার জন্যই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

যখন বীরভূমের অজয়ের কূল হইতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি পর্য্যন্ত এবং কশাই বা বা কাঁশাই নামে পরিচিত কপিশা হইতে ত্রিস্রোতা বা তিস্তা পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিব, তখন হয়ত দেখিব যে বিভিন্ন নূতন ভাব প্রকাশ করিবার অনেক শব্দ পাওয়া যাইবে। সমগ্র বঙ্গভূমির প্রতি যথার্থ ভালবাসা না বাড়িলে এ কাজ হইতে পারিবে না। প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্রতায় আমরা পাছে সমগ্র ভারতের প্রতি ভালবাসা হারাই, সেইজন্য হয়ত প্রতিদিন স্নানের সময়ে সমগ্র দেশের প্রধান প্রধান নদীর নাম করিয়া মন্ত্র পড়িতে হয়। "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি, সরস্বতী, নর্ম্মদে, সিন্ধু, কাবেরি জলেঽস্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু" বলিয়া আমরা প্রথম ডুবটি দিব, কিন্তু দ্বিতীয়বার ডুব দিবার পূর্ব্বে যদি নিম্নলিখিত নূতন শ্লোকটি পড়ি, তাহা হইলে হয়ত বা নিয়ত মন্ত্রজপের ফলে যথার্থ স্বদেশ-প্রীতি একটু বাড়িতে পারে। আমার প্রস্তাবিত শ্লোকটি এই:—

অজয়প্রীতসঙ্গীতৈঃ কপিশে, দারুকেশ্বর,
দামোদর, তথা রূপনারায়ণ শ্রিতাম্বুধে।
ত্রিস্রোতশ্চ তথা কর্ণফুলি, পদ্মে, চ মেঘনে,
কপোতাক্ষ, তথা গঙ্গে, জলেঽস্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু॥

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সৈন্য ও বিধি-ব্যবস্থা

শাসন-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, সৈন্য-বিভাগের নূতন বন্দোবস্ত আবশ্যক হইল; কেননা সৈন্যবিভাগ হইতেই ১৮৫৭ অব্দের যত কিছু উৎপাত উপদ্রব সমুদ্ভূত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, সামরিক প্রণালী পর-পর তিনটি অবস্থা অতিক্রম করে।

*
* *

প্রথম অবস্থায়,—ভারত-সরকারের রাষ্ট্র-নীতির মূল-কথা:—"যুদ্ধং দেহি।" ভারত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, সৈন্যমণ্ডলী ভারত সাম্রাজ্যকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যগণ দুই বৎসর ধরিয়া স্বকীয় প্রধানদের সহিত বিবাদ করিয়াছিল এবং কোম্পানীর য়ুরোপীয় সৈন্যগণ সিপাহী-বিদ্রোহের ঠিক পূর্ব্বেই বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাই উভয় সৈন্যদলেরই নূতন বন্দোবস্ত আবশ্যক হইল।

প্রথমেই য়ুরোপীয় সৈন্য। কোম্পানীর সৈন্যদলকে বিদায় করা হইল; "রাজকীয়" সৈন্য সংখ্যা বাড়ান হইল। কেবলমাত্র এই সৈন্যমণ্ডলী হইতেই তোপের সৈন্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট সৈন্যদল গৃহীত হইবে স্থির হইল।

ভারতীয় সৈন্য। এই সৈন্যের সংখ্যা

"বঙ্গ-ফৌজ"কে একেবারেই রহিত করা হইল! নূতন ফৌজ গঠিত হইল:—যাহারা সিপাহী বিদ্রোহের মূল, সেই উচ্চবর্ণের হিন্দুস্থানী দিগের মধ্য হইতে আর সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে না স্থির হইল। তাহাদের বদলে পঞ্জাবী (বিশেষতঃ শিখ্) গুর্খা, আফগান ও বেলুচিদিগকে সৈন্যভুক্ত করা হইবে।

কিন্তু কেবল সাবধানতা ও দূরদর্শিতা হইতেই এই সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল।

সামরিক গঠনপদ্ধতির আর কোন বদল হইল না। সেই তিন সৈন্যমণ্ডলী লইয়াই সৈন্যসংগঠন, অশ্বারোহী ও পদাতিক পল্টনের সেই একইরূপ বিভাগ, দেশীয় সেনা-নায়কদিগের সেই একইরূপ নিম্নপদে নিয়োগ। সৈন্যসংগ্রহকার্য্যে ও ইংরাজ সৈনাধ্যক্ষদিগের উন্নতিসম্বন্ধেই যাহা কিছু অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ফলতঃ প্রকৃত পরিবর্ত্তন যাহা হইয়াছিল—তাহা ভিতরকার মূল-ভাবটির। লর্ড ডেলহৌসীর সৈন্য দেশ-জয়ের সৈন্য ছিল। ১৮৫৭ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত ভূটানের কতকগুলি প্রদেশ ছাড়া আর কোন বিজয় সাধনের কাজ হয় নাই। সৈন্যমণ্ডলী প্রায় পুলিশের মতই পাহারা ও পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত ছিল।

*
* *

দ্বিতীয় অবস্থায়,—আফগানিস্থান ও ব্রহ্ম-

ভাবটা ফিরিয়া আসিল। আশিয়ায় রুশের অগ্রসরণ, ভারতের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সাধারণ প্রজাবর্গ ও দেশীয় সৈন্যসম্বন্ধে ইংরাজ-সরকারের যে অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ত্রিশ বৎসরকালব্যাপী রাজভক্তির প্রভাবে সেই অবিশ্বাস বিদূরিত হইল। এখন হইতে অধিক সংখ্যায় সিপাহী সৈন্য সংগৃহীত হইবে, পূর্ব্বাপেক্ষা উহারা রণসাজে ভাল করিয়া সজ্জিত হইবে, আধুনিকতম আদর্শের বন্দুক প্রাপ্ত হইবে এইরূপ স্থির হইল। ইংরাজ-সৈন্য যাহাদের কাজ শুধু উহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা—এখন হইতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে উহাদিগকে স্বকীয় যুদ্ধসহচররূপে গ্রহণ করিল। এক্ষণে ভারতকে একটি সামরিক শক্তিরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে এইরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইল। যে বড় বড় পদগুলা তিন প্রেসিডেন্সির মধ্যে বিভক্ত ছিল, সেই সকল পদ কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইল। প্রধান সেনাপতি "বঙ্গ ফৌজের" সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিলেন। "বঙ্গ ফৌজ" এক্ষণে স্বতন্ত্র দুই বিভাগে বিভক্ত হইল ;—"বাঙ্গলা" ও "পঞ্জাব।" সর্ব্বসমেত উপসেনাপতিদিগের অধীনে চারিটি সৈন্যমণ্ডলী গঠিত হইল।

শীঘ্রই সৈন্যের ক্ষুদ্র বিভাগগুলি রহিত হইয়া তাহার স্থলে সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী বড় বড় স্বতন্ত্র সৈন্যদলে বিভক্ত হইল। যে প্রদেশে সৈন্য সংগৃহীত হইবে, ইহার দ্বারা সেই প্রদেশের দেশীয় বিশেষত্বটুকু রক্ষিত হইতে পারিবে।

*
* *

ভারতীয় সৈন্যের ক্রমবিকাশ, অবশেষে পরিবর্ত্তনের তৃতীয় অবস্থায় প্রবেশ করিল। সাম্রাজ্যবিস্তার ও এসিয়ায় য়ুরোপীয় উপনিবেশাদির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, ভারত দুর্জ্জয় শত্রুসমূহের সংস্পর্শে আসিল। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রনৈতিক বিভ্রাটবশতঃ, চীন, সৌদান ও এডেনে সৈন্য পাঠান আবশ্যক হইয়া পড়িল। বড় বড় নগরে, রাজাদিগের রাজধানীতে একটা ভারতীয় বিশেষ মতামত ও ভারতীয় মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছিল। যদি সরকার-বাহাদুর কখন কখন শিক্ষিত লোকদিগের, রাজকর্ম্মচারীদিগের, অধ্যাপকদিগের, মুদ্রাযন্ত্রের এবং ভারতের যোদ্ধৃজাতি সামন্তমণ্ডলীর সাহায্য না পান তাহা হইলে একটা সাম্রাজ্যসাধারণ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সৈন্যসংগ্রহের কোন এক নূতন প্রণালীকে জাতীয় ভাবাপন্ন করিতে হইলে, যাহাতে রাজপুতবংশধরেরা, সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমানেরা, প্রাচীন মারাঠা সর্দ্দারেরা, উচ্চপদে উপনীত হইতে পারে তাহা দেখা আবশ্যক। সায়ত্ত শাসনের অধিকার ছাড়া আর সমস্ত অধিকারই যে দেশে আছে, সে দেশে বিদেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে কেবল একটা পেষাদার সৈন্যমণ্ডলী অবস্থিত। এই সব কারণেই সেখানে যুদ্ধ-প্রধান রাষ্ট্রনীতি অসম্ভব।

*
* *

ভারতীয় সৈন্যের ক্রমবিকাশ হইতেই আমরা ভারতের দুই শতাব্দীব্যাপী ক্রমবিকাশের ইতিহাস অবগত হই। পেশাদার

ভারতীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ভারতবিজয়, এই পেশাদার সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহের আবির্ভাব, কিছুকাল ধরিয়া প্রতীক্ষা ও অবিশ্বাসের অবস্থা, আবার যে সময় হইতে, একটা জাতীয় সৈন্যমণ্ডলী ক্রমশ গড়িয়া উঠিবে বলিয়া একটু আভাস পাওয়া যায় সেই নূতন যুদ্ধবিগ্রহের কাল।

বিধি-ব্যবস্থা

শাসনকার্য্য ও সৈন্যমণ্ডলীর দ্বারা বর্ত্তমানে ভারত-জয় সাধিত হইল; এবং ভবিষ্যতে এই বিজয় কার্য্য স্থিরতর রাখিবার জন্য বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক হইল।

ভারতীয় বিধিব্যবস্থা এক জটিল ব্যাপার সিপাহী বিদ্রোহ হইতে গভর্ণমেণ্ট এই যুগলাত্মক শিক্ষাটি লাভ করিয়াছিল:— ভারতীয় সভ্যতার প্রতি গভর্ণমেণ্টের অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, অথচ য়ুরোপীয় সভ্যতার দ্বারা, সাবধানে ও অধ্যবসায় সহকারে, ভারতকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা।

নূতন বিধিব্যবস্থার স্থূল রেখাগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

*
* *

হিন্দু ও মুসলমানের প্রাচীন ব্যবস্থাদির দ্বারা, জাতি ও বর্ণের প্রথাদির দ্বারা, ব্যক্তিগত অধিকার এবং উত্তরাধিকার সাধারণভাবে নিয়মিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল আইন, এই সকল প্রথা, আদালতের বিচার-নিষ্পত্তি, ও ভাষ্যকার- অনেকটা সহজ হইয়া উঠিয়াছে এবং বিশেষাধিকারসমন্বিত বর্ণবিশেষের স্বার্থ, যে মিথ্যা ব্যাখ্যাকে প্রশ্রয় দিয়াছিল, সেই মিথ্যা ব্যাখ্যা রহিত হইয়াছে। ক্রমশঃ একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাশাস্ত্র গড়িয়া উঠিল। তবে কিনা উহা একটু বেশী পাণ্ডিত্য-পূর্ণ—কেননা, লোকপ্রচলিত প্রথার সরল আকারগুলিকে উহা জটিল করিয়া তুলিল; এবং উহা একটু বেশী সুনির্দ্দিষ্ট কেন না, এই ব্যবস্থাশাস্ত্র পরিবর্ত্তনশীল প্রথাগুলিকে স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল, আইনের পরিত্যক্ত নিয়মগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল, বন্যজাতি সমূহের উপর—অস্পৃশ্য বর্ণসমূহের উপর হিন্দু আইন জারি করিল। এমন কি, তদ্দারা তাহাদের নীচত্বও কতকটা ঘুচাইয়া দিল। এই সকল বাড়াবাড়ির মূল কারণটি এই:—

ভারতবাসীদিগের মন নিয়ম-বন্ধনের অনুরাগী ও সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী; তাই যে সকল সাধারণ নিয়ম তাহারা কার্য্যে পরিণত করিতে চাহে না (প্রকৃত প্রাচ্য জাতিরই অনুরূপ), সেই সকল সাধারণ নিয়ম হইতে তাহারা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য বাহির করিতে ভালবাসে; কিন্তু ইংরাজেরা দৃঢ়-চিত্ত ও তাহাদের যথাযথদর্শিনী বুদ্ধি; সুতরাং তাহারা আইনের আক্ষরিক অর্থ সর্ব্বদাই বিচার করিয়া দেখে এবং ভারতবাসীরা যে সকল উপপত্তি মূলক নিয়ম অনুসরণ করিয়াছে, ইংরাজেরা প্রায়ই তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া থাকে।

এই অভিনব ব্যবস্থাশাস্ত্রের কতকগুলি

উহা বিবিধ প্রথার বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনিয়াছে; স্থিরনির্দ্দিষ্টতা,—অনিশ্চয় ও পরিবর্ত্তনের স্থান অধিকার করিয়াছে।

ইহারই মধ্যে সংহিতার দ্বারা, অথবা নূতন একটা ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা দ্বারা, উত্তরাধিকার এবং চুক্তি প্রভৃতি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অনতিবিলম্বেই কতকগুলি আইন সংহিতায় পরিণত হইবে। মুসলমান আইন, সম্বন্ধে কোনপ্রকার কঠিনতা উপস্থিত হইবে না। কেননা, বহু শতাব্দী হইতে মেক্কা, বাগ্‌দাদ ও দিল্লির ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতদিগের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু আইন সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য ধর্ম্মসংহিতা কখনই আইনের বলবত্তা প্রাপ্ত হয় নাই। হিন্দু আইন চিরকালই ব্যবহারের আইন হইয়া থাকিবে। তথাপি বিবিধ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা হইতে কতকগুলি প্রাদেশিক ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইতে পারে এবং ক্রমে কতকগুলি ব্যবহার ক্রমশ আইন-সংহিতায় পরিণত হইবে।

*
* *

এই ভারতীয় বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে ব্যবস্থাকর্ত্তারা এসিয়ার মতামত ও য়ুরোপের মতামতের একটা আপোষ বা "মন রাখার" সংকল্প করিয়াছেন। এ সমস্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্ত্তিত আইন।

ব্যক্তিগত অধিকার, উত্তরাধিকার এবং সমজাতি ও সমধর্ম্মী লোকদিগের মধ্যে চুক্তি-ব্যবহার সম্বন্ধে এই সকল আইন খুব সাবধান সহকারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমাসম্বন্ধে আইন-ঘটিত কতকগুলি মূল-নিয়ম স্থাপন করা, দেওয়ানী কার্য্যবিধি স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, য়ুরোপীয়, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চুক্তি-ব্যবহার নিয়মিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এখন যে ফৌজদারী আইন আছে তাহা সমস্ত ভারতেই প্রযুজ্য :—১৮৬০ অব্দের দণ্ডবিধি, ১৮৬১ অব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধি (মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পুনঃসংস্কার হইতেছে), ১৮৭২ অব্দের "প্রমাণ বিধি" ইত্যাদি।

*
* *

পরিশেষে সমস্ত য়ুরোপীয় ধরণের বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন। ইংরাজ পার্লেমেণ্টের বিধিবদ্ধ আইন, সমস্ত ভারতে প্রযুজ্য। অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে, সিভিল-সার্ভিশ সম্বন্ধে, সৈন্যসম্বন্ধে এই সকল আইন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। দেওয়ানী মোকদ্দমার উপরেও উহার কতকটা প্রভাব আছে; তাহার পর, কাহার দ্বারা আইন প্রণীত হইবে, কি রকম-ভাবে প্রণীত হইবে, কিরূপে উহার প্রয়োগ হইবে —এই সমস্তও উহার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

অতএব, ভারতীয় ব্যবস্থাপ্রণয়নের ক্রমবিকাশে আমরা দুইটি লক্ষণ দেখিতে পাই।

একপক্ষে স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইবার দিকে এই সকল ব্যবস্থার প্রবণতা। কেননা, একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা, সমস্ত পরিবর্ত্তন-শীল প্রথাদিকে কতকগুলি ধ্রুব নিয়মের

অধীনে আনয়ন করা—ইহাই আজকালের আধুনিক সমাজের একটা পরিচায়ক লক্ষণ।

পক্ষান্তরে, হিন্দু আইন ও য়ুরোপীয় আইন একত্র মিশাইয়া একটা জাতি-সাধারণ আইন গড়িয়া তোলাই এই ব্যবস্থাকর্ত্তা-দিগের চেষ্টা হইয়াছে। এবং ইহার দ্বারা হিন্দু-য়ুরোপীয় সভ্যতার পথ যে প্রস্তুত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মস্তিষ্ক ও আত্মার বিকাশ

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদে মস্তিষ্কের বিকাশই জীববিকাশের শেষ পরিণামরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই মস্তিষ্কের বিকাশ দ্বারাই মনুষ্য জীবজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। সুতরাং মস্তিষ্কের বিকাশ আলোচনায় জীবরাজ্যে মনুষ্যের রাজমহিমার প্রকৃততত্ত্ব আমরা উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইব আশায় উপস্থিত প্রসঙ্গের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

হৃদয়ের বিকাশের সহিত যেমন রক্তের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় মস্তিষ্কের বিকাশের সহিতও তেমনই স্নায়ুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত শরীরের প্রথম উপাদান;—তাহাতেই "রক্তমাংসের শরীর" এইরূপ কথা প্রচলিত হইয়াছে। রক্তকে যেমন আমরা শরীরের প্রথম উপাদান বলিতে পারি—স্নায়ুকে তেমনই শেষ উপাদান বলিতে পারি।

হৃদ্‌যন্ত্রে যেমন রক্তরাশি কেন্দ্রীভূত হয়—স্নায়ুমণ্ডলও তেমনই মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রকারে হৃদ্‌যন্ত্র যেমন রক্তের আধার মস্তিষ্কও তেমনই স্নায়ুর আধার হইয়াছে। ইহা হইতে হৃদয় ও মস্তিষ্ক যে শরীর ধারণের প্রধান যন্ত্র তাহাই বুঝিতে পারা যায়। উভয়ই শরীর ধারণের প্রধান যন্ত্র হইলেও ইহাদের মধ্যে স্নায়ুরই বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ স্নায়ু শক্তিতে রক্ত সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হইয়া তবেই দেহের রক্ষা ও পোষণকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

রক্ত হইতেই আমাদের দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। তাহাতেই রক্তহীন স্থানে অনুভূতির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত চৈতন্যের সঞ্চারক বলিয়াই রক্তাধার হৃদ্‌যন্ত্রও চৈতন্যের আধার হইয়াছে। এই জন্যই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রহিত হইলে চৈতন্যেরও বিলোপ হয়। হৃদয় এই প্রকার অনুভূতির আধার বলিয়াই সুখ-দুঃখের অনুভূতি হৃদয়ে হইয়া থাকে।

স্নায়ুর দ্বারা শরীরের রক্তসঞ্চালন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কার্য্যই নির্দ্ধারিত হয়। এই কারণেই দেহের কোন অঙ্গে স্নায়ু বিকল হইয়া গেলে তাহা যেমনই রক্তাভাবে শুষ্ক হইয়া যায় তেমনই অকর্ম্মণ্যও

হইয়া যায়। কোন অঙ্গে স্নায়ুর কার্য্যকারিতা নষ্ট হইয়া গেলে তাহার অনুভব শক্তিও নাশ পাইয়া থাকে। পক্ষাঘাতের দ্বারা যে অবশাঙ্গতা ঘটে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই প্রকারে আমরা স্নায়ুতে রক্তাপেক্ষাও অধিক বোধশক্তির আধার দেখিতে পাইতেছি। ইহা হইতে স্নায়ুতে যে রক্তাপেক্ষাও অধিক চৈতন্য নিহিত আছে তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। সুতরাং হৃদযন্ত্র রক্তকেন্দ্র বলিয়া এবং চৈতন্যাধার মস্তিষ্ক স্নায়ুকেন্দ্র বলিয়া যে তদপেক্ষাও চৈতন্যাধার তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। এই প্রকারে মস্তিষ্কই আমাদের চৈতন্যের প্রধান মূলাধার হইতেছে। সন্ন্যাসরোগে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়াতেই সংজ্ঞা লোপ পাইয়া থাকে। নিদ্রাতেও মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা বন্ধ হওয়াতেই অচৈতন্যাবস্থা সংঘটিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে চৈতন্যস্ফূর্ত্তিই যে মস্তিষ্ক-বিকাশের প্রধান ফল তাহাই আমরা প্রতিপাদন করিতে পারি।

মস্তিষ্কের উপরি-উক্ত চৈতন্যশক্তির মাত্রাদ্বারাই বিকাশের মাত্রা পরিমিত হইয়া থাকে। যাহাতে উক্ত চৈতন্যশক্তি বা চিচ্ছক্তির অধিক পূর্ণতা, তাহাতেই বিকাশের অধিক পূর্ণতা ইহাই চৈতন্য বা চিচ্ছক্তির দ্বারা বিকাশ-বিচারের পদ্ধতি। মস্তিষ্ক আমাদের দেহের উৎকৃষ্ট বিকাশ বলিয়াই ইহার আধারভূত মস্তক দেহের "উত্তমাঙ্গ" অর্থাৎ প্রকৃষ্টাঙ্গ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্কের এই চিচ্ছক্তির প্রেরণায় স্নায়ুজালযোগে শরীরের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় ইহাই পাশ্চাত্য দর্শনের মত। পাশ্চাত্য দর্শনমতে এই চিচ্ছক্তিই 'মন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মস্তিষ্ক ইহারই যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় আমাদের শাস্ত্রেও মস্তিষ্কেই সমস্ত কার্য্যপ্রেরণার স্থান সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা এই প্রেরণার কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার নাম শাস্ত্রে "আজ্ঞাচক্র" প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার বর্ণনা এইরূপ :—

"ভ্রুবোরুপরি নাড়ীনাং ত্রয়ানাং প্রান্ত উচ্যতে।
তৎপ্রান্তং ত্রিপদ্মস্থানং ষট্‌কোণং চতুরঙ্গলম্‌॥
রক্তবর্ণন্তু যোগজ্ঞৈরাজ্ঞাচক্রমিতীরিতম্‌॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কালিকাপুরাণে ৫৪ অধ্যায়।

পাশ্চাত্যগণ যেমন মনকে মস্তিষ্কের অধিষ্ঠাতা বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন, শাস্ত্রে 'আজ্ঞাচক্রের' অধিষ্ঠাতাও মনকেই উল্লিখিত দেখা যায়; যথা :—

"ষষ্ঠমাজ্ঞালয়ং চক্রং দ্বিদলং শ্বেত মুত্তমম্‌।
ধারাচক্রমিতিখ্যাতং মনঃস্থান প্রকীর্ত্তিতম্‌॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুধৃত পাদ্মে স্বর্গ খণ্ডে ২১ অধ্যায়।

কিন্তু এই প্রকারে মন মস্তিষ্কের অগ্রভাগের বা ললাটদেশের অধিষ্ঠাতারূপে বর্ণিত হইলেও ইহা পাশ্চাত্যদিগের মনস্তত্ত্বের সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। আজ্ঞাচক্রের অধিষ্ঠাতারূপে মন আত্মারই সহযোগী। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কিন্তু আত্মা হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই মনস্তত্ত্বকে বুঝিয়া থাকেন। এই আত্মনিরপেক্ষ মনস্তত্ত্বের স্থান কিন্তু ললাটদেশ নহে—তাহার স্থান হৃদয় বা হৃদযন্ত্র। নিম্নোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

"ত্রয়াণামথ নাড়ীনাং হৃদয়ে চৈকতা ভবেৎ।
তৎস্থানং ষোড়শাস্রং স্যাৎ সপ্তাঙ্গুলপ্রমাণতঃ।
তৎপীতমুক্তং যোগজ্ঞৈরাদি ষোড়শচক্রকম্।
ধ্যানানামথ মন্ত্রাণাং চিন্তনস্য জপস্যচ।
যস্মাদাদ্যঞ্চ হৃদয়ং তস্মাদাদীতি গদ্যতে॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কালিকাপুরাণে ৫৪ অধ্যায়।

চৈতন্যের আদিস্থান হৃদয় বলিয়াই ইহার নাম "আদিচক্র" হইয়াছে।

ললাট যে প্রকৃত মনের অধিষ্ঠান স্থান নহে পরন্তু আত্মারই অধিষ্ঠান স্থান, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তান্ত্রিক বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়:—

"আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধেতু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত তন্ত্রসারঃ।

হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আমরা শরীরের প্রধান যন্ত্র বলিয়াছি। এই দুই যন্ত্রযোগেই আমাদের দেহমনের কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। (১) হৃদয়কে মনের অধিষ্ঠান বলিয়া বুঝিলে এবং মস্তিষ্ককে আত্মার অধিষ্ঠান বলিয়া বুঝিলে হৃদয় ও মস্তিষ্কের একযোগে কাজ মন ও আত্মার একযোগে কাজই বুঝিতে হয়। আমরা "মনেপ্রাণে" কার্য্যের কথা যে বলিয়া থাকি তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মন ও আত্মার যোগই বুঝায়। ইংরেজী 'Heart and Soul' কথায় এই যোগের কথা বিশেষরূপেই পরিস্ফুট। আত্মা যে মন হইতে পৃথক্ পদার্থ তাহা প্রধানতঃ নিদ্রায় স্বপ্ন-ব্যাপারের দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে। স্বপ্নে আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকায় তখন কেবল মনেরই কার্য্য হইতে থাকে—তাহাতেই অনেক সময় স্বপ্নে অসম্ভব ঘটনা-পরম্পরা দৃষ্ট হয়। উন্মাদগ্রস্ত লোকদিগের মনের উপর আত্মার প্রভুত্ব না থাকাতেই তাহাদিগকে অসংলগ্ন উক্তি ও অসঙ্গত কার্য্য করিতে দেখা যায়।

আমরা মন হইতে অতিরিক্ত যে প্রকৃষ্ট চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি—আমাদের দর্শনশাস্ত্রে তাহাই আত্মতত্ত্বরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে; যথা—

"তত্তদ্ভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সত্য স্বভাবং
প্রত্যক্‌চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বম্॥" ইতিশব্দকল্পদ্রুম।

এই বিশুদ্ধচেতনতত্ত্ব যে মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলেরই বিকাশ ষট্‌চক্রের সহস্রার (সহস্রদল) পদ্মের বর্ণনায় তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে; যথা:—

"সহস্রদল সমাকীর্ণং পরমাত্মপ্রকাশকম্।
নিত্যজ্ঞানময়ং সত্যং সহস্রাদিত্য সন্নিভম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৭ অধ্যায়ঃ।

এস্থলে যে সহস্রদল পদ্মকে আমরা 'পরমাত্মার প্রকাশক' বলিয়া উল্লেখ পাইতেছি তাহা যে মস্তিষ্কের উপর বিস্তৃত স্নায়ুমণ্ডলেরই রূপকমাত্র এ কথা যাঁহারা মস্তিষ্কের আবরণকারী স্নায়ুমণ্ডলের চিত্র কোন শারীর বিজ্ঞানগ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছেন তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

এই সমস্ত হইতে আত্মার প্রধান লক্ষণ আমরা প্রকৃষ্টচৈতন্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। চিন্তাকেই এই চৈতন্যের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। চৈতন্য ও চিন্তা যে একই চিৎধাতু হইতে উৎপন্ন তাহাতেই উভয়ের যোগ প্রমাণিত হয়।

ললাটে আত্মার স্থান বলিয়াই যোগিগণ

ললাটে আত্মতত্ত্বের চিন্তা করিয়া থাকেন। যোগীদিগের সমাধি হইতে আমরা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণই প্রাপ্ত হই। তখন সমস্ত শারীর কার্য্যই নিবৃত্ত হয়—যেমন হৃৎপিণ্ডের কার্য্য স্থগিত হয়—তেমনই মনোব্যাপারও স্থগিত হয়, তাহাতেই যোগের সংজ্ঞা হইয়াছে—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। 'চিত্তবৃত্তিনিরোধের নামই যোগ।' মনের কার্য্য, শরীরের কার্য্য যখন রহিত হইয়া যায় তখন আর কোন্ শক্তিবলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে? ইহা যে এতদতিরিক্ত অন্য কোন শক্তির কার্য্য তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেই শক্তিই চিণ্ময়ী আত্মশক্তি।

আত্মার বিকাশ যে মনের বিকাশের উর্দ্ধে অবস্থিত নিম্নোদ্ধৃত গীতোক্তিতে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধিঃ যো বুদ্ধেঃ পরতস্তুসঃ॥" ৪
৩য় অধ্যায়ঃ।

"ইন্দ্রিয়গণকে (দেহাদি অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, দ্ধিবু অপেক্ষা যিনি পর (শ্রেষ্ঠ) তিনি সেই (আত্মা)।"

আত্মা প্রকৃত চৈতন্যতত্ত্ব বলিয়া আত্মার যোগ ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্ভবপর হয় না—তাহাতেই আমাদের দর্শনে আত্মাকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ামকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যথা—"আত্মেন্দ্রিয়াত্ত্বধিষ্ঠাতা।" "আত্মাই ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা।' ইন্দ্রিয় শব্দের ব্যুৎপাদনেও আমরা ইন্দ্র শব্দকে আত্মা অর্থেই ব্যাখ্যাত দেখিতে পাই; যথা—"ইন্দ্রস্য আত্মনঃ লিঙ্গং ইন্দ্রিয়ম্॥"

উপনিষদে রূপকচ্ছলে আত্মাই সারথী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যথাঃ—

"আত্মানং সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ॥"

"আত্মা সারথি (চালক) ইন্দ্রিয়সকল অশ্ব আর মন অশ্বের বল্‌গা।"

মস্তিষ্কের পরমবিকাশরূপ আত্মা কেবল পার্থিব দেহেরই শেষ বিকাশরূপে শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই—কিন্তু ইহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শেষ বিকাশরূপেও বিবেচিত হইয়াছে। তাহাতেই বিশ্বের চরম তত্ত্বরূপে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান যেমন "ব্রহ্মাণ্ড" নামে আখ্যাত হইয়াছে—ব্রহ্মরূপী আত্মার অধিষ্ঠানভূত বলিয়াই মস্তিষ্কও তদ্রূপ "ব্রহ্মরন্ধ্র" (২) নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সহস্রার পদ্ম যে পরমাত্মার প্রকাশক তাহা আমরা উপরি-উদ্ধৃত পুরাণের বর্ণনা হইতেই জানিতে পারিয়াছি।

ললাটদেশস্থ মস্তিষ্কের 'আজ্ঞাচক্র' নামক স্থান যে আত্মার অধিষ্ঠান তাহারও উল্লেখ আমরা উপরে পাইয়াছি। সহস্রারাধিষ্ঠিত আত্মা যেমন পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—আজ্ঞাচক্রাধিষ্ঠিত আত্মাও তেমনই জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

---

(২) জ্ঞাত্বা সুষুম্না সন্তেদং কৃত্বা বায়ুক মধ্যগম্॥
স্থিত্বা সদৈব সুস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিরোধয়েৎ॥
বিশ্বকোষধৃত হটযোগ দীপিকা। ৪।১৬

পরমাত্মা ললাটস্থিত স্নায়ুমণ্ডলে অধিষ্ঠিত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়যোগে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে বলিয়াই এই মণ্ডলের 'আজ্ঞাচক্র' নাম হইয়াছে। আত্মা যখন মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত যোগবিরহিত হইয়া সহস্রারে স্ব-ভাবে অবস্থিত হয় তখনই ইহার কুটস্থ চৈতন্য অবস্থা বলা যায়। ইহাই পরমাত্মার ভাব—পরম ব্রহ্মভাব। যোগে আত্মাকে আত্মাচক্র হইতে আনিয়া সহস্রার চক্রে স্থাপন করিতে হয়। এইরূপে জীবাত্মা সহস্রারে আসিয়া পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয় বলিয়াই এই কার্য্যের নাম যোগ হইয়াছে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ যে যোগসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাতেও সমস্ত চিত্তবৃত্তির কার্য্য নিবৃত্ত করিয়াই যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ যে সহস্রার পদ্মকে আমরা পরমাত্মার অধিষ্ঠানরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই—তাহা পরমাত্মার অসংখ্য বৃত্তিরই রূপকমাত্র। অসংখ্যবৃত্তির কার্য্যসূত্ররূপেই স্নায়ুসকল সহস্রদলরূপে কল্পিত হইয়াছে। আত্মার বৃত্তিসকল বহির্মুখ হইলেই বাহ্যবিষয় সকল আরব্ধ হয়। বৃত্তিরূপে এই প্রকারে আত্মা যে বাহ্যবিষয়সকলে ব্যাপৃত হয় তাহাই জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃত্তি সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় মূলকেন্দ্রে আসিয়া উপসংহৃত হইলে যে বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্ত্বা উদ্ভাসিত হয়, তাহাই পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। জীবাত্মা বিষয় হইতে নির্লিপ্ত হইতে হইতে যে পরমাত্মার সারূপ্য প্রাপ্ত হয় তাহাই ইহার পরমাত্মায় লীন হওয়া বলিয়া কথিত হয়। ইহাই যোগের মুক্তি। এই মুক্ত আত্মা বা পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম উভয়ের একই স্বরূপ সুতরাং উভয়েই মূলে একই তত্ত্ব। যোগের দ্বারা ঈশ্বরভাব সিদ্ধ হয় বলিয়াই যোগের অষ্টশক্তি, অষ্টৈশ্বর্য্য অর্থাৎ অষ্টঈশ্বর প্রভাবনামে নির্দ্দেশিত হয়। এই প্রকারে আমাদের মস্তিষ্কে কেবল যে আত্মারই বিকাশ হয় তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরত্ব, পরব্রহ্মত্বেরও যে বিকাশ হয় তাহাই আমরা এতক্ষণে বুঝিতে সমর্থ হইলাম।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়

(আদম্ সুমারি)

গত আদম্ সুমারিতে বঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা কত ছিল, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা জানা যায়ঃ

ধর্ম্ম	সংখ্যা ১৯১১ খৃঃ অব্দ
মুসলমান	২৪,২৩৭,২২৮
হিন্দু	২০,৯৪৫,৩৭৯
এনিমিষ্ট	৭৩০,৭৮০
বৌদ্ধ	২৪৬,৮৬৬
খৃষ্টান	১২৯,৭৪৬
জৈন	৬,৭৮২
ব্রাহ্ম	২,৯৫৮
শিখ	২,২২১
ইহুদী	১,৯৯৩
কনফিউসিয়ান	১,০৫৮
পার্শী	৬১১
আর্য্য	২০

হিন্দু ও মুসলমান

বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক; অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা ৫২'৩ জন মুসলমান, ৪৫'২ জন হিন্দু, এবং ২'৫ জন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা

সর্ব্বত্র সমান নয়; পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম, পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং উত্তর ও মধ্যবঙ্গে মাঝামাঝি।

	হিন্দুর সংখ্যা শতকরা
পশ্চিম বঙ্গ	৮২
মধ্য বঙ্গ	৫১
উত্তর বঙ্গ	৩৭
পূর্ব্ব বঙ্গ	৩১

বঙ্গে ১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দকালের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। এ বৃদ্ধির হারও আবার বঙ্গের সর্ব্বত্র সমান নয়—

হিন্দুর বৃদ্ধির হার

পূর্ব্ববঙ্গ	৬.৬	শতকরা
মধ্য বঙ্গ	৫.২	"
উত্তর বঙ্গ	৩	"
পশ্চিম বঙ্গ	২	"

যেখানে হিন্দুর সংখ্যা যত কম, বৃদ্ধির হারও সেখানে সেই পরিমাণে বেশী।

বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু সর্ব্বত্র সমান নয়, পূর্ব্বে বেশী, পশ্চিমে কম।

	মুসলমান সংখ্যা শতকরা
পশ্চিম বঙ্গ	১৩
মধ্য বঙ্গ	৪৮
উত্তর বঙ্গ	৫৯
পূর্ব্ব বঙ্গ	[illegible]

হিন্দুর ১/৩ অংশ পশ্চিম বঙ্গে, ১/৪ অংশ পূর্ব্ব বঙ্গে, এবং ১/৫ অংশ মধ্য ও উত্তর বঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়; মুসলমানের ১/২ অংশ পূর্ব্ববঙ্গে, ১/৪ অংশ উত্তর বঙ্গে, এবং ১/৬ অংশ মধ্যবঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১০.৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছে; কিন্তু বৃদ্ধির হার সর্ব্বত্র সমান নয়—

মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার

পূর্ব্ব বঙ্গ	১৪.৬
উত্তর বঙ্গ	৮.২
পশ্চিম বঙ্গ	৪,৯
মধ্য বঙ্গ	৩.১

যেখানে মুসলমানের সংখ্যা যত বেশী সেখানে বৃদ্ধির হারও তত অধিক।

বঙ্গে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে; মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা হিসাবে তিনগুণ বাড়িয়া যাইতেছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুরা শতকরা ১৬ জন হিসাবে বাড়িয়াছে, কিন্তু মুসলমানের বৃদ্ধির হার শতকরা ২৯ জন হিসাবে। গেটসাহেবের মতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের এই সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ—

(১) তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের সমধিক প্রচলন;

(২) স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের মধ্যে সামান্য পার্থক্য;

(৩) পুষ্টিকর আহার;

(৪) উন্নত আর্থিক অবস্থা

এবং এই সব কারণে তাহাদের উর্ব্বরতাও সমধিক।

আবার ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

	কুমারী	সধবা	বিধবা
হিন্দু	২	৭৬	২২
মুসলমান	২	৮৭	১১

১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা

হিন্দু	৩, ২৩৮, ১৮৫
মুসলমান	৪, ১৮৩, ২৮৮

মুসলমানের সংখ্যা অধিক, উর্ব্বরতা অধিক এবং স্ত্রীলোকের পরিমাণও অধিক; সেই জন্যই তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিধবা-বিবাহ এবং বহুবিবাহও এ বৃদ্ধির হার কিয়ৎপরিমাণে বাড়াইয়া দিতেছে।

এনিমিষ্ট*

পশ্চিম বঙ্গে, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অনুর্ব্বর অংশে, প্রায় তিন লক্ষ এনিমিষ্ট (অধিকাংশই সাঁওতাল) বাস করে; মালদহ, দিনাজপুর ও জলপাই-গুড়ি জেলায় প্রায় ২৩৮,০০০ ঔপনিবেশিক সাঁওতাল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ময়মনসিং ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে কোচ, কুকি, মরং, ক্ষামী, ত্রিপুরা প্রভৃতি জাতি দেখা যায়।

এনিমিষ্টদের সংখ্যা ১৯০১ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন হিসাবে বাড়িয়াছে; বৃদ্ধির কারণ বঙ্গের বিভিন্ন অংশে ইহাদের উপনিবেশ-বিস্তার।

বৌদ্ধ

কলিকাতায় বিস্তর বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী চীনা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৌদ্ধগণের সংখ্যা ছিল,—

চট্টগ্রাম বিভাগে	১৭৩, ১৯৪
বাখরগঞ্জে	৮, ৮২৮
পার্ব্বত্য ত্রিপুরায়	৫, ৯৯৭
	১৮৮, ০১৯
দার্জ্জিলিংয়ে	৪৭, ৯০৫
সিকিমে	২৮, ৯১৫
জলপাইগুড়িতে	৮, ০৫৪
	৮৪, ৮৭৪

এখন বঙ্গের পূর্ব্ব দক্ষিণে এবং উত্তর অংশে মগ, নেপালী, ভুটিয়া ও লেপছা জাতির মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শিখ ও জৈন

১৯১১ সালের গণনার সময় কলিকাতায় শিখের সংখ্যা ছিল, ৯৩২ জন এবং জৈনের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গদেশে ৬৭৮২ জন। জৈনদের অধিকাংশই মাড়োয়ারী।

ব্রাহ্ম

১৯১১ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় আদম সুমারিতে ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল ৩৫৪৩, জন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ছিল, ৩১৭১ জন। দশ বৎসরে ব্রাহ্মের সংখ্যা কেবলমাত্র ৩৭২ বাড়িয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, নূতন কেহ বড়-একটা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন না। উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারের সহিত লোকের গোঁড়ামি কমিয়া যাইতেছে এবং আধুনিক হিন্দুর দল ব্রাহ্ম নামে অভিহিত হইবার কোন আবশ্যকতাও বিবেচনা করেন না। আবার ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও হিন্দু-আখ্যায় অভিহিত হইবার প্রবল ইচ্ছাও দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মদের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন কলিকাতায় বাস করেন; বাকীর অধিকাংশ মফঃস্বলের বড় বড় সহরে বাস করেন; পল্লীগ্রামে ব্রাহ্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিগত আদম সুমারিতে পল্লীগ্রাম হইতে কেবলমাত্র ৫৭৪ জন ব্রাহ্মের সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল।

ইহুদি, পার্শী ও কন্‌ফিউশন

বঙ্গদেশের সমগ্র ২,০১৮ ইহুদীর মধ্যে ১৯১৯ জন কলিকাতায় বাস করে। ইহারা আবার দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ স্পেনদেশীয় ইহুদী, ধর্ম্মের তাড়নায় স্পেন পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশে আসিয়া বহুকালাবধি বসবাস করিতেছে; অপর একভাগ আরব ও তুরস্ক হইতে এদেশে আসিয়া ইদানীং বাস করিতেছে। ইহুদীদের ⅓ অংশের ভাষা ইংরাজী, বাকীরা হিব্রু কিংবা আরবি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহুদীদিগের ⅔ অংশের জন্মস্থান কলিকাতা, বাকী ⅓ অংশের জন্ম আরবে।

পার্শী বণিকেরা সকলেই জোরোয়াষ্টার মতাবলম্বী; চীনা মুচী ও ছুতারেরা কতক

কনফিউসান মতাবলম্বী, কতক-বা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। চীনাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে।

খৃষ্টান

বঙ্গে গত আদম স্নুমারিতে ইউরোপীয়ান, আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, ও ইউরোপীয় জাতি-সম্ভূত অপর জাতির সংখ্যা ছিল ২৪,৩৮৮ ; আরমানীর সংখ্যা, ১০৬৩, এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা ছিল ১৯,৮৩৩ জন। কলিকাতায় শতকরা ৫৫ জন ইউরোপীয়ান, ৭৭ জন আমেরিকান ও ৭১ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাস করে।

উক্ত ইউরোপীয়ানদের ৯/১০ ভাগ বৃটিশ প্রজা এবং সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজের সংখ্যাই অধিক। গত আদম স্নুমারিতে কলিকাতায় ইউরোপীয়ানের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া গিয়াছিল—

ইংরাজ	...	৯,২১৫
আইরিস	...	৯৯০
স্কচ	...	১,৫৮৪
জার্ম্মান	...	২৮০
ফরাসী	...	২১২

সমগ্র বঙ্গে ১৪,৭৫১ জন (প্রায় অর্দ্ধেক) ইউরোপীয়ান যুক্তরাজ্যে জন্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ১১,০২৯ জন ইংরাজ।

ইউরেশীয়ানদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন এনগ্লিকান, ২০ জন রোমান কাথলিক, এবং ১০ জন প্রেসবিটেরিয়ান।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের (অর্থাৎ ইউরেশী-

কাথলিক, ৩২ জন এংগ্লিকান, বাকী ব্যাপটীষ্ট, মেথডিষ্ট অথবা প্রেসবিটেরিয়ান।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রায় ১২০০ জন পূর্ব্ববঙ্গীয় ফিরিঙ্গী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহারা বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে বাস করে; প্রায় সকলেই এখন রোমান কাথলিক ও ওলন্দাজ দস্যুবংশ-সম্ভূত। ইহারা এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করে এবং ইহাদের আচার-ব্যবহারও কতকটা এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর মত; প্রভেদ যা-কিছু তা কেবল ধর্ম্মে, পরিচ্ছদে, নামে ও বর্ণের কৃষ্ণতায়।

মেদিনীপুর জেলায় গেঁয়োখালির নিকট কতকগুলি ফিরিঙ্গী বাস করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহিষাদলের রাজা বর্গীর হাঙ্গামা হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য চট্টগ্রাম হইতে যে সকল ওলন্দাজ গোলন্দাজ আনাইয়াছিলেন, ইহারা তাহাদেরই বংশধর। ইহাদের সংখ্যা অল্প—১২৯ জন মাত্র। ইহারা নাম ও ধর্ম্ম ছাড়া সকল বিষয়েই সাধারণ বাঙ্গালীর মত।

আরমানীরা বঙ্গে ন্যূনাধিক তিন শতাব্দী-কাল ধরিয়া বাস করিতেছে। বাণিজ্য করিবার জন্য ইহারা স্নুতানটিতে (বর্ত্তমান কলিকাতা) জব চার্ণকের অন্ততঃ ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আরমানীরা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে পরওয়ানা পাইয়া মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ সৈয়দাবাদ গ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করে, এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এতদ্দেশে

যদিও প্রধানতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায় করিত, তথাপি রাজদ্বারে তৎকালে ইহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল; আরমানী বণিক খোজা সার-হদের প্রভাবে ইংরাজেরা মোগল সম্রাট ফারকসিয়রের নিকট হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল। আরমানীদের মধ্যে অনেকে এতদ্দেশে বাদশাহগণের সৈন্য-বিভাগে উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিল; গুরগন্ খাঁ (খোজা গ্রেগরি) মীর কাশেম আলির প্রধান সেনা-পতি ছিলেন।

১৯১১ সালে বঙ্গে ১,০৬৩ জন আরমানী ছিল এবং ইহাদের ৪/৫ অংশের বাস কলিকাতায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইদানীন্তন পারস্যের জুলফা নামক স্থান হইতে আসিয়াছে। ইহারা যখন কলি-কাতায় প্রথম পদার্পণ করে, তখন ইংরাজী ভাষা মোটেই জানিত না, কিন্তু অল্পকাল পরে ইংরাজী ভাষা শিখিয়া লয় ও ইংরাজী চাল-চলনের অনুকরণ করে। কলিকাতাবাসী আরমানী পুরুষদের অর্দ্ধেকের জন্ম পারস্য দেশে; কিন্তু পারস্যদেশীয় আরমানী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প।

গত আদম্ সুমারিতে বঙ্গে ৮৩,২৬০ জন দেশী খৃষ্টান পাওয়া গিয়াছিল। ১৯০১ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে বঙ্গদেশে ২৩, ১৫০ (অর্থাৎ শতকরা ২১.৭ জন) দেশী খৃষ্টান সংখ্যায় বাড়িয়াছে; কিন্তু ছোট-নাগপুর বিভাগে ৯৫,৭৬৭ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫.৫ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা ছোটনাগপুরে খৃষ্টান ধর্ম্ম মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। একমাত্র রাঁচিতেই দেশী খৃষ্টানের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গের সংখ্যার দ্বিগুণ। নিম্ন তালিকা হইতে বঙ্গের নেটিভ খৃষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা জানা যাইবে—

রোমান কাথলিক	২৮,৮৮৫
লুথারেন্	৩,৯৭৬
এন্‌গ্লিকান	১৮,০০৮
ব্যাপ্‌টিষ্ট্	২২,৯০৩
প্রেস্‌বিটেরিয়ান্	৪,১১৫
মেথডিষ্ট্	৩,০৩৭
কন্‌গ্রিগেসন লিষ্ট্	২,৩৩৬
	৮৩,২৬০

বঙ্গে লেপছা ও সাঁওতালদের মধ্যে "নেটিভ খৃষ্টানে"র সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করি-য়াছে এবং ছোটনাগপুরে ওরাওঁ, মুণ্ডা, খাড়িয়া ও সাঁওতালদিগের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে।

আদিম নিবাসীদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্মের অধিকতর প্রসার লাভের একটি কারণ বোধ হয় এই যে, তাহারা স্বধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিলেও স্বজাতীয়ের সহিত সংস্রব-সম্পর্ক হারায় না; এমন কি একসঙ্গে পান-ভোজনেও তাহাদের কোন বাধা থাকে না। অপর একটি কারণ এই যে তাহারা ইচ্ছা করিলে খৃষ্টান ধর্ম্মে ইস্তফা দিয়া আবার স্বধর্ম্মে ফিরিতে পারে। আবার খৃষ্টান হই-বার পক্ষে তাহাদিগের প্রধান প্রলোভনও এই যে, পাদ্রী সাহেবেরা তাহাদিগকে জমিদারের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবেন

বিবাদ-বিসম্বাদ বাধে, তাহাতে সাহায্য করিবেন। পাদরী সাহেবদের চেষ্টায় তাহাদের ভূমি-সংক্রান্ত আইনেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

পার্ব্বত্য জাতিদিগকে বাদ দিলে দেখা যায় যে খৃষ্টান ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে নিম্ন-জাতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ উচ্চজাতীয় হিন্দু খৃষ্টান হইলে স্বজনের সহিত সকল সংস্রব তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়; গৃহ-ত্যাগীও হইতে হয়। কিন্তু নিম্নজাতীয় হিন্দু খৃষ্টান হইলে বরং সে মর্য্যাদা লাভ করে, সমাজে স্থান পায়,—যেন এক ধাপ উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

হিন্দুত্ব

হিন্দু কে? সিন্ধু নদের অপর পারে যে বাস করে। হিন্দু শব্দ পারসী ভাষা হইতে উদ্ভূত। সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে যাহারা বাস করিত, পারসিকেরা তাহাদিগকে হিন্দু বলিত। কালক্রমে 'হিন্দু' আখ্যা প্রসার লাভ করিয়া এক বিশেষ-সমাজ-বন্ধনে-বদ্ধ, এক বিশেষ-ধর্ম্মাবলম্বী ভারত-বাসী জাতি-সমষ্টিকে বুঝাইতেছে। শুধু ভারতবর্ষে বাস করিলে, কিংবা কোন বিশেষ জাতিভুক্ত হইলে, কিংবা কোন বিশেষ প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত অবলম্বন করিলেই হিন্দু হয় না। যে কেহ হিন্দু হইতে পারে না—হিন্দুর ঘরে না জন্মিলে হিন্দু হওয়া যায় না; হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা খৃষ্টান হইতে পারে, কিন্তু

বৈষ্ণব এক পন্থাবলম্বী, শাক্ত অপর পন্থা-বলম্বী, কিন্তু উভয়েই হিন্দু; আবার বৈদান্তিক যে সেও হিন্দু। কেবল ধর্ম্ম মত বা মার্গের উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। একেশ্বর-বাদ, অনেকেশ্বর-বাদ, নিরী-শ্বর-বাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সবই হিন্দু-ধর্ম্মে স্থান লাভ করিয়াছে। মতসম্বন্ধে হিন্দু অত্যন্ত উদার। কিন্তু আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হিন্দু অত্যন্ত কঠোর; আচার-ভ্রষ্ট হইলে হিন্দুত্ব লোপ পায়। হিন্দুর সমাজ আচারের উপর গঠিত, জাতিভেদ ইহার একটি অঙ্গ। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আচারই অভিব্যক্তির প্রধান অঙ্গ। সামাজিক অভিব্যক্তি সামাজিক আচারের উপর নির্ভর করে, সামাজিক আচার ত্যাগ করিলে সামাজিক অভিব্যক্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। সামাজিক আচারই সমাজের ধর্ম্ম; আচারই সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; আচারই অভিব্যক্তির মূল। সামাজিক অভিব্যক্তি ধাপের পরে ধাপ ধরিয়া চলিতেছে; এক একটি জাতি অভিব্যক্তির পথে এক একটি ধাপ; এবং প্রতি জাতির আচারের উপর ইহার অভিব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। সনাতন ধর্ম্মে অভিব্যক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। যে হিন্দু সমাজের উপযোগী আচার পালন করে, সে "হিন্দু"; যে করে না, সে অহিন্দু, "ম্লেচ্ছ"।

গত আদম সুমারিতে হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে কি প্রভেদ তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল—(১) যে কোন বিশেষ দেবতার

না; (২) হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিলে, হিন্দু বলা যায় কি না; (৩) সদ্‌ব্রাহ্মণ যাহার পৌরোহিত্য করে, সে হিন্দু কি না; (৪) পতিত ব্রাহ্মণ যাহার পুরোহিত, সে হিন্দু কি না; (৫) উচ্চজাতীয়েরা যাহাদের জল গ্রহণ করে তাহারই কেবল হিন্দু কি না; এবং (৬) অস্পৃশ্য জাতীয়েরা হিন্দু কি না!

কেহ দুর্গা, কেহ কালী, কেহ হরি, কেহ হর, কেহ মনসা, কেহ শীতলা, কেহ ষষ্ঠী, কেহ বা গণেশের পূজা করে। সকলেই হিন্দু; হিন্দুর দেবতা অসংখ্য; সুতরাং কোন বিশেষ দেবতার পূজার উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার ও পূজা দিবার অধিকার থাকিলেই কাহাকেও হিন্দু বলা ঠিক হয় না। অনেক নিম্ন-জাতি আছে দেবমন্দিরে যাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, তজ্জন্য তাহারা অহিন্দু নহে। আবার নিম্নজাতীয় হিন্দু মন্দির স্থাপন ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, কিন্তু স্বয়ং সে বিগ্রহের পূজা করিতে পারে না; পূজার ভার ব্রাহ্মণের উপর। অহিন্দু "ফিরিঙ্গী" বহুবাজারে "ফিরিঙ্গী কালীর" পূজা দেয় বলিয়া সে হিন্দু হইয়া যায় না। পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম, চামার, বাগ্‌দী, তেওর, শুঁড়ি প্রভৃতির প্রবেশের অধিকার নাই; গয়ায় বিষ্ণুপাদ মন্দিরে চামার, ধোপা, ডোম ও মুচিরা প্রবেশ করিতে পারে না; সেজন্য তাহারা কেহই অহিন্দু নহে।

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়, হিন্দুত্ব ধর্ম্মমতের উপর নির্ভর করে; লৌকিক আচারের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমান-বঞ্চিত শত সহস্র হিন্দুর চক্ষে হিন্দুয়ানী হিন্দুর চাল-চলন ও হিন্দুর আচার-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। হিন্দুত্ব বলিলে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মমত, জাতিভেদ, জন্মস্থান লৌকিক আচার ও সামাজিক মঙ্গলের সমষ্টি বুঝায়। সেজন্য কেবল ধর্ম্মমত, বা পূজা-পদ্ধতি, বা জাতিগত ভেদ, বা আচার-ব্যবহার, বা ব্রাহ্মণের শাসনের উপর হিন্দুর পরিচয় নির্ভর করে না। এই কারণে গত আদম সুমারিতে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে হিন্দু নামে পরিচিত অনেক জাতি আছে, যাহারা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে না; বেদ মানে না; হিন্দুর প্রধান প্রধান দেবতার পূজা করে না; সদ্‌ব্রাহ্মণ যাহাদের পৌরোহিত্য করে না; যাহাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত মোটেই নাই; হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশে যাহাদিগের অধিকার নাই; যাহারা অস্পৃশ্য; যাহারা শব দাহ না করিয়া সমাহিত করে; এবং যাহারা গো-খাদক।

বৈষ্ণব, যুগী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, ভূমিজ, চথমা ও কোরা জাতিরা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে না। বাউরি, ভুঁইয়া, চামার, কোরা, মুচি, মুণ্ডা ও সাঁওতালেরা ব্রাহ্মণ বা কোন হিন্দু গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে না। সুব্রাহ্মণে বাগ্দী, বৈষ্ণব, বাউরি, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চথমা, চামার, চাষাধোপা, ধোপা, ডোম, হাড়ি, যুগী, জেলে, কৈবর্ত্ত, কলু, কাওরা, কাপালী,

কোচ, কোরা, মাল, মালো, মুচি, মুণ্ডা, নমঃশূদ্র, ওরাওঁ, পাটনী, পোদ, রাজবংশী, সাঁওতাল, সাহা, সোণার, সুবর্ণবণিক, শুঁড়ি, ছুতর ও তেওর প্রভৃতি জাতির পৌরোহিত্য গ্রহণ করে না। বৈষ্ণব, বাউরি, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চকমা, চামার, ডোম, হাড়ি, যুগী, কাওরা, কোরা, মাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির আদৌ ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই। বাগ্‌দী, বাউরি, ভুঁই মালী, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চামার, ধোপা, ডোম, হাড়ি, যুগী, কলু, কামার, কাওরা, কাপালী, কোরা, মাল, মুচি, নমঃশূদ্র, পোদ, রাজবংশী, সাঁওতাল, সাহা, সোনার, শুঁড়ি ছুতার ও তেওর প্রভৃতি জাতির হিন্দুর দেব-মন্দির-প্রবেশে অধিকার নাই। বাগ্‌দী, বাউরি, ভুঁইমালী, ভূমিজা, ভুঁইয়া, চামার, ধোপা, ডোম, হাড়ি, কাওরা, কোরা, মাল, মুচি, মুণ্ডা, ওরাওঁ, পোদ, সাঁওতাল, মুঁচি ও তেওর অস্পৃশ্য। বৈষ্ণব ও যুগীরা তাহাদের শব দাহ না করিয়া পুঁতিয়া ফেলে। বাউরি, চামার, ডোম, হাড়ি, কাওরা, কোরা, মাল, মুচি, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে গোখাদক দেখা যায়।

বেদ মানে না বা হিন্দু দেবতার পূজা করে না, এরূপ হিন্দু জাতি বঙ্গে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে গতিবিধি ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়ায়, হিন্দুদের মধ্যে "ছোঁয়াছুতের" ভাব ক্রমশ শিথিল হইয়া যাইতেছে। অস্পৃশ্য জাতিদিগের মধ্যে শব দাহ না করিয়া সমাহিত করিবার কারণ কিনিবার অক্ষমতা। যে সকল গো-খাদক নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কসাইয়ের দ্বারা গোহত্যা করায় না, বা গোমাংস খরিদ করিয়া খায় না, তাহারা কেবল মৃত গরুর মাংস ভোজন করে। উপর্য্যুক্ত তালিকায় অনেকগুলি জাতির নামোল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা প্রকৃতপক্ষে এনিমিষ্ট, প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাদিগকে হিন্দু বলা ঠিক নহে।

বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের অধিকাংশই আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগের বংশধর; এবং তাহারা অল্পকাল হইতে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। পশ্চিম বঙ্গের অনুর্ব্বর প্রান্ত ও ছোটনাগপুরের অধিত্যকা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে অনার্য্য ভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। বৈবস্বত পুরাণে বীরভূমি বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং তথায় কৃষ্ণকায়, নীতি-বিহীন ও ধর্ম্ম-বিহীন এক জাতির বাস ছিল বলিয়াও জানা যায়; বরাহভূমিতে (মানভূম ও বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশে) ধর্ম্মহীন, বন্য ও সর্পভুক্, তস্কর-দস্যুদের বাস ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে; তাহারাই বোধ হয় "চোয়াড় জাতীয়" আধুনিক বাগ্‌দী, বাউরি, ও ভূমিজ। আর্য্যজাতীয়েরা ক্রমশ বঙ্গদেশ অধিকার করায় অধিকাংশ অনার্য্য জাতি পাহাড় পর্ব্বত, উপত্যকা, অধিত্যকা, বনে ও জঙ্গলে পলাইয়া যায়, এবং সামান্যভাগ আর্য্যদের দাসত্ব স্বীকার করে এবং ক্রমশ তাহাদের ধর্ম্ম ও ভাষাও গ্রহণ করে। অহিন্দু অনার্য্য কিরূপে এখনও হিন্দুত্ব লাভ করিতেছে,

হিন্দুত্ব লাভ করিবার এক প্রকৃষ্ট উপায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা। যে জাতি ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে নিয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই জাতিই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার পাইয়াছে। ব্রাহ্মণ নিম্নশ্রেণীর হইতে পারে, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না—শুধু ব্রাহ্মণ হইলেই হইল। অনাচারণীয় জাতীয়েরা স্বজাতীয় "পণ্ডিত" পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ করিতে পারিলেই হিন্দু-আখ্যা লাভ করিয়া, ক্রমশ পদ-মর্য্যাদাও প্রাপ্ত হয়। এমনও দেখা যায়, কোন কোন জাতি "পণ্ডিত"-স্বত্বেও ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে, কেহ বা পণ্ডিতদিগকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে, আবার কেহ-বা পণ্ডিত-বংশ লোপ পাইলে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে। ব্রাহ্মণেরা ক্রমশ পণ্ডিতদিগকে অপসারিত করিতেছে। পূর্ব্বে হাড়িদিগের পুরোহিত বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি সংজ্ঞা-ধর্ম্ম-মিত্রের মধ্যে "ধর্ম্মকে" পূজা করিত; এখন ব্রাহ্মণেরা "ধর্ম্ম"কে বিষ্ণু বা শিব বলিয়া পূজা করে।

বর্ত্তমান হিন্দুয়ানি

শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দু দর্শন ও ধর্ম্ম পুনরনুপ্রাণিত ও পুনরভ্যুদিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এবং থিয়সফিষ্টেরা হিন্দুশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিবার ফলে বাঙ্গলা দেশে বেদান্তের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৈদান্তিকেরা সাধারণত উদার প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের কোন গোঁড়ামি নাই।

বৈদান্তিক

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের উক্তি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বেদান্তের সার কথাও বাঙ্গালী জানিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে পরমহংস দেবের শিক্ষা বিস্তার করিবার প্রয়াস করেন এবং সম্যকরূপে বেদান্ত-চর্চ্চার নিমিত্ত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "রাম কৃষ্ণ মিশন" স্থাপন করেন। খৃষ্টান-মিশনের ন্যায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, আতুর ও রোগগ্রস্ত জীবের সেবাশ্রম-স্থাপন এবং ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার করিতেছে। বৈদান্তিক অত্যন্ত উদার; সকল ধর্ম্মই তাহাতে লীন হয়; যে, যে পথে থাকিয়া ভগবানকে সর্ব্বান্তঃকরণে পাইতে চাহে, সে সেই পথেই তাঁহাকে পাইবে; তুমি যে পথে যাও, চাহিলে তাঁহাকে পাইবেই!

জ্যোতিঃস্বরূপ উপাসনা

কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে গাজিপুর হইতে পরমহংস শিবনারায়ণ বঙ্গে আসিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ উপাসনা-পদ্ধতি প্রচার করেন। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ; এবং পরমহংসদেব সেই জ্যোতিঃস্বরূপের একাগ্র উপাসনা-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। জাতি-ভেদ বা প্রতিমা-পূজা তাঁহার শিক্ষায় স্থান পায় নাই।

রাধাস্বামী

সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই; এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে কোন হিন্দুকে তাহার সামাজিক আচার-ব্যবহারও পরিত্যাগ করিতে হয় না। আত্মার মুক্তি কেবল যোগ-সাধনায় সম্ভব; কিন্তু সদ্‌গুরু ব্যতীত তাহা ঘটিতে পারে না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কতকগুলি এই সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতাতেও অনেক রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী আছেন।

হরিসভা

হরিসভা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায়! জ্ঞান-মার্গ সাধারণের নহে; কিন্তু ভক্তি-মার্গ জন-সাধারণেরই। হরিসভায় ভক্তি-পথে সাধারণের মুক্তির ব্যবস্থার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদি পাঠ, হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। দেব-মন্দিরে দেব-পূজায় সাধারণের অধিকার নাই; কেবল ব্রাহ্মণেরই পূজায় অধিকার; বিনা "মারফতে" কোন পূজা সম্ভব নহে। কিন্তু হরিসভায় দোল, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসবের সময় পূজা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এবং ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে; হরিসভায় সকলেই যোগদান করিতে পারে। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই হরিসভায় যোগদান করিয়া থাকে।

গীতাসভা

জন-সাধারণের মধ্যে গীতার উপদেশ প্রচারই গীতা-সভার উদ্দেশ্য। পল্লীতে পল্লীতে হরিসভা এবং নগরে নগরে এখন গীতা-সভা দেখিতে পাওয়া যায়; উভয়েরই উদ্দেশ্য ধর্ম্মতত্ত্ব জন-সাধারণের নিকট সরস ও সুবোধ্য করিয়া তোলা।

কর্ত্তাভজা

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জগৎ-কর্ত্তার ভজনা করে; ইহাদের সংসার-ত্যাগের ব্যবস্থা নাই; সংসার-ধর্ম্মপালনই শ্রেয়ঃ; এবং সংসার-আশ্রমে কর্ত্তাকে একাগ্র ভজনা করিলে সামীপ্য-মুক্তি হইয়া থাকে। কর্ত্তাভজারা মিথ্যা কথা বলে না, প্রতিদিন পাঁচ বার—সাম্প্রদায়িক মন্ত্রোচ্চারণ করে, প্রতি শুক্রবারে উপবাস, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম্মচর্চ্চা ও "মজলিস" করিয়া থাকে। তাহারা মদ্য ও মাংস আহার করে না; এবং ঘোষ-পাড়ার মেলায় উৎসব উপলক্ষে যথাসাধ্য যোগদান করিয়া থাকে। ইহারা সম্প্রদায়ের বাহিরে সামাজিক আচার-ব্যবহারে আদৌ হস্তক্ষেপ করে না; কিন্তু ইহাদের সম্প্রদায়ের ভিতর ছোট-বড় বিচার নাই, সকলে সমান, জাতিভেদ নাই। সাধারণ লোকের মধ্যে ইহাদের গূঢ়তত্ত্ব প্রচারিত না হওয়ায়,—এবং ইহাদের নিত্যক্রিয়াকলাপ সাধারণ চক্ষুর অলক্ষ্যে হওয়ায়, সাধারণ লোকের ধারণা যে অন্তরালে ইহারা বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত করিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের বঙ্গে আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৈষ্ণবদিগের "সহজ ধর্ম্ম" প্রচলিত ছিল; কর্ত্তাভজার সহিত সহজিয়ার প্রভেদ এই যে বৈষ্ণবের মার্গ ভক্তি এবং কর্ত্তাভজার মার্গ জ্ঞান।

বাউল

বাউল এক প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় জনসাধারণের মধ্যে ইহারা ভগবদ্ভক্তির

গান গাহিয়া বেড়ায়; চুল বা নখ কাটে না, সতেরো তালি দেওয়া ময়লা আলখাল্লা পরিয়া থাকে, হাতে সর্ব্বদাই গোপীযন্ত্র থাকে।

সতীমার দল

ইহা একটি নূতন সম্প্রদায়। মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ ও কলিকাতা অঞ্চলেই ইহাদের বাস। ইহারা শক্তির উপাসক। ইহারা সংসার-ধর্ম্ম পালন করে; পুরুষেরা বড় বড় চুল ও নখ রাখে; স্ত্রীলোকেরা মাথায় জটা রাখে। ইহারা মদ্য মাংস ভোজন করে না; ব্যারাম হইলে ঔষধ খায় না, সতীমার পীঠের মাটি মাথায় ছোঁয়ায়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মেলা-মেশার বাধা নাই। এই সম্প্রদায়টি বোধ হয় কর্ত্তাভজাদেরই একটি শাখা। কর্ত্তা-ভজার দল পুরুষ কর্ত্তার ভজনা করে এবং সতীমার দল প্রকৃতিরূপী আদ্যাশক্তি সতীকে ভজনা করে, এই যা প্র ভেদ! নতুবা ইহাদের আচার-ব্যবহার, করণ-কারণ প্রভৃতিতে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। রামশরণ পাল এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক; তাঁহার স্ত্রীকে "সতী-মা" বলা হইত; যে গাছের তলায় সতী-মার সমাধি হইয়াছিল, সেখানকার একটু মাটি অঙ্গে ছোঁয়াইতে পারিলে সকল প্রকার ব্যাধি সারিয়া যায় ও সকল পাপ বিদূরিত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

কালাচণ্ডী

নদীয়ায় এক নূতন বৈষ্ণব দল দেখা দিয়াছে, ইহাদিগকে "কালাচণ্ডী" বলে;

প্রবর্ত্তক। ইহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা নাই, তীর্থস্থান নাই, জাতিভেদ নাই। ইহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক।

মাণিক-কালীর দল

মেদিনীপুরের দক্ষিণভাগে মাণিককালীর দল বলিয়া একটী সম্প্রদায় আছে; হেদা-রাম দাস,—জাতিতে কৈবর্ত্ত,—এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি উড়িয়া ভাষায় আগম পুরাণ প্রভৃতি শিখিয়াছেন, এখনও জলমুঠা পরগণার অন্তর্গত গোপীনাথপুর গ্রামে ইহার পাদুকা ও আগম পুরাণের নিত্য পূজা হইয়া থাকে। হেদারাম নিজে সাধক ছিলেন; মাণিক কালী তাঁহার মত প্রচার করিয়া খ্যাতি লাভ করে। মাণি-কের বুলি ছিল, "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"। মাণিকের দলে জাতিভেদ নাই।

সাঁই

ইদানীন্তন বাঁকুড়া জেলায় সাঁই নামক একটি নূতন সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছে। ভগবান সাঁই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা অপ্রত্যক্ষ দেবতায় বিশ্বাস করে না; গুরুই ইহাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, ইহারা গুরুর উপাসনা করে। ইহাদের গুরুর উপদেশ—মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, স্ত্রী-সহবাস না করা, সাধু-সঙ্গে বাস করা, ও আত্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা করা।

শিক্ষাপড়া

ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র শাখা; মধ্য বাঙ্গালায় ইহাদের কয়েক স্থলে

শ্রীকৃষ্ণই এ বিশ্বে একমাত্র পুরুষ, তদ্ব্যতীত সবই প্রকৃতি; স্ত্রীলোকের শ্রীকৃষ্ণই স্বামী; এ জগতে গুরুই শ্রীকৃষ্ণ-স্থানীয়; এবং সেই গুরুরই পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই।

বিবিধ মুসলমান সম্প্রদায়

মুসলমানদিগের মধ্যে বিশ্বাস যে প্রতি শতাব্দীর প্রারম্ভে খোদা তাঁহার ইমামকে ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ ও সংস্কার করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন; এবং প্রলয়ের পূর্ব্বে মাহদি আবির্ভূত হইয়া, দজ্জলকে শাসন করিয়া, জগতে ইসলাম ধর্ম্ম 'প্রোথিত' করিবেন। আধুনিক কয়েকটি মুসলমান সম্প্রদায়ের মূলে উক্ত বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান সম্প্রদায়গুলি ওহাবি সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদ ইব্‌ন অবদুল ওহাব নামে আরব্যদেশীয় এক ধর্ম্মসংস্কারক ওহাবি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ওহাবিরা উৎকট ধর্ম্মনিষ্ঠ; ইহারা স্বাধীনভাবে কোরাণ ব্যাখ্যা করে; গোঁড়া মুসলমানদিগের হনিফা, মালিক, সফি, ও হনবল নামক চারিজন ইমামের মত গ্রাহ্য করে না; ইহারা মৃত পীর প্রভৃতির পূজা নিষেধ করে; এবং বিধর্ম্মীর সহিত জেহাদ কর্ত্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করে।

ভারতে সৈয়দ মহম্মদ ওহাবি-মত প্রচারকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মক্কায় গমন করিয়া ওহাবের গমন করিয়া পীর পূজা নিষেধ করেন, মৃতব্যক্তির পূজায় কোন লাভ নাই বলিয়া প্রচার করেন, সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করেন এবং বিধর্ম্মীর সহিত জেহাদ করিতে উপদেশ দেন। বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান মুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই সকল মত সমধিক প্রচার লাভ করিয়াছে।

তিতুমিয়া বঙ্গে ওহাবি ধর্ম্ম প্রচার করিবার বাসনায় জেহাদ করেন; ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৩২য়ের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ২৪-পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুরে বলপূর্ব্বক কতকগুলি হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, গোঁড়া মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, ও অনেক গ্রাম লুণ্ঠন করেন এবং প্রচার করেন যে মুসলমানেরা তাহাদের রাজ্য শাসনের ভার পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিতুমিয়ার লড়াই হয়; এবং সেই যুদ্ধে তিতুমিয়ার মৃত্যু ঘটে। তাহার ৩৫০ জন শিষ্যও বন্দী হয়।

তিতুমিয়ার মৃত্যুর পর পাটনানিবাসী ওহাবি এনায়েত আলি মালদহ, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলায়, কেরামত আলি ঢাকা, মৈমনসিং নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ জেলায়, এবং জৈয়েন-উল-আবদিন ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে ওহাবি মত প্রচার করেন।

বিচারে ওহাবিদিগের রাজদণ্ড হইবার পর হইতে তাহারা তাহাদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এখন তাহারা আপনাদের

বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। "আহল-ই-হাদি"রা স্বাধীনভাবে "হাদি" (মহম্মদের উক্তি) ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, "ঘরের মুকল্লিদেরা সুন্নীদের চারিজন ইমামের মধ্যে কাহাকেও মানে না। আহল-ই-হাদিরা তাহাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এতদূর নিষ্ঠাবান্ যে তাহারা গোঁড়া মুসলমানদিগেকে বিধর্ম্মী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই তাহাদের মসজিদ দখল করিবার প্রয়াস করে এবং সেই অভিলাষে কখনও কখনও দেওয়ানি আদালতে মকর্দ্দমা অবধিও রুজু হয়। তাহারা বিবাহাদি উপলক্ষে গীত-বাদ্য, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শির্ণি চড়ান, এবং পীরের কবরে পূজা দেওয়া নিষেধ করে। নদীয়া জেলার মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া মহকুমায় কতকগুলি "আহল ই-হাদি" দেখিতে পাওয়া যায়।

পাগল-পংক্তি

মৈমনসিংহে একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আচার-ব্যবহার এতই উদ্ভট যে লোকে তাহাদিগকে "পাগল-পংক্তি" বলে। করিম দরবেশ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা কোরাণ ও মহম্মদে বিশ্বাস করে, সুন্নত করে না, এবং নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে বিবাহ বা আহারাদি করে না। ইহারা টাকার সুদ লয় না, বিবাহে পণ দেয় না, লয়ও না, এবং পাল্কী, ছাতা কিংবা জুতা ব্যবহার করে না।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

নবাব

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পারির জীবন-লীলা

মাদাম জেঙ্কিন্স সজ্জিত সুন্দর কক্ষে বসিয়া পিয়ানোর সুরে কণ্ঠ ছাড়িয়া নূতন গানটা গাহিবার চেষ্টা করিতেছিল। ওস্তাদ সেদিন সকালে আসিয়া এই গানটাই শিখাইয়া গিয়াছিল। মাদাম গাহিতেছিল,

"ভালবেসে তারে কেঁদে সারা আমি
বুক ফাটে সখি, বলিতে!
সে যে বলে মোরে, 'ভালবাসি কত'—
সে কেবলি মোরে ছলিতে।"

সেতারের এই সুর লহরী বাহিরের আকাশ-বাতাসটুকুকে অবধি করুণ করিয়া তুলিয়াছিল। মাদাম আবার গাহিল,

"এই যে প্রাণের প্রেম-আরাধন
আদর, সোহাগ, প্রীতির বচন—"

গাহিতে গাহিতে মাদামের বুক বেদনায় ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ সুর ছাড়িয়া সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। গানের সুরে আজ নিজেরই প্রাণের সহস্র সুপ্ত বেদনা সর্পের মত ফণা তুলিয়া উঠিয়াছে! সেগুলা যেন এখনই তাহাকে দংশন করিবে! মাদাম পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে কৃত্রিম প্রাকারের

গায়ে-রচা কৃত্রিম নির্ঝর হইতে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল সহস্র ধারায় উছলিয়া পড়িতেছিল—রৌদ্র-কিরণ পড়ায় সে জল আবার রূপালি ঝালরের মত দেখাইতেছিল। মাদাম একদৃষ্টে সেই নৃত্যশীল জলরাশির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার জেঙ্কিন্স গৃহে ছিল না। কাজের ভিড়ে ও স্বাস্থ্যের আহ্বানে ডাক্তার আজ কয়দিন পারি ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাই এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায় মাদামের প্রাণের মধ্যে নিষ্ফল প্রণয়ের সহস্র বেদনা কোনমতেই আর আপনাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। সে আজ কত দিনেরই বা কথা! ইহারই মধ্যে তাহাদের প্রণয়-স্রোতে এতখানি বাধা লাগিল, কেন? আজ কয় মাস ধরিয়া দুইজনের কথাবার্ত্তাও অনেকটা ঢিলা পড়িয়া আসিয়াছে। আহারের সময় মাত্র দুইজনের শুধু সাক্ষাৎ হইত—তখন সংসারের প্রয়োজনীয় দুই-চারিটা মাপা-বাঁধা কথা ছাড়া উভয়ের মধ্যে আর কোন কথা হইত না। অপর কথা যদি উঠিত ত সে মাদামের পুত্র মারাণকে লইয়া। ডাক্তার মারাণের সম্বন্ধে দুই-চারিটা কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিত, মাদাম স্তব্ধ হইয়া সে মন্তব্য শুনিয়া যাইত,—চোখের পিছনে অশ্রু আসিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা পাইত, মাদাম প্রাণপণ বলে সে অশ্রু রোধ করিত। এই প্রাণহীন বর্ব্বর যদি সে অশ্রু দেখিয়া ফেলে ত পরিহাসের আর সীমা থাকিবে না! মার প্রাণের সে আন্তরিক বেদনার এতটুকু অপমানও মাদাম সহ্য করিতে পারিবে না।

এত দুঃখেও ডাক্তারের প্রতি মাদামের ভালবাসা কিন্তু একতিল কমে নাই! আজ-কাল করিয়া বিবাহ-ব্যাপারটা পিছাইতে পিছাইতে ক্রমেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—ইচ্ছা থাকিলেও মাদামের সে কথা নূতন করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি ছিল না! অথচ বিবাহ-বন্ধন-হীন এই ঘৃণ্য জীবনও আর বহন করা যায় না! একবার অতিকষ্টে মাদাম কথাটা তুলিয়াছিল—ডাক্তার হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "সুবিধে-মত হবে'খন। তোমার কি সন্দেহ হয়, আমাকে?" ইহার পর মাদামের মুখে আর দ্বিতীয় কথা জোগাইয়া উঠে নাই।

তাহার পর চারিদিকে বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। ডিউকের মৃত্যু ডাক্তারের সমস্ত আশার মূল কাটিয়া দিয়াছে! এত বড় একটা রোগীকে মৃত্যু আসিয়া হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল! ডাক্তার বিষম রাগিয়া গেল; প্রমাদ গণিল। দেশের লোকের ডাক্তারের উপর বিশ্বাসও কমিয়া গিয়াছে—তাহার উপর বেথলিহামের অমন আশ্রমটাও লোকসানে দাঁড়াইলে—নবাব আর তাহাতে এক পয়সাও সাহায্য দান করিবে না! নানা কারণে কোন দিকেই আর সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে ছিল না। ডাক্তারের আর্থিক অবস্থাও ক্রমে মন্দ হইয়া দাঁড়াইল! এই সকল ব্যাপারের জন্য ডাক্তার কিছু দিনের মত পারি ছাড়িয়া বাহিরে কোথাও থাকিবার সঙ্কল্প করিল। মাদাম নিঃসঙ্গ একা এই প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে পড়িয়া রহিল। যদি বিবাহটা হইয়া যাইত, তাহা হইলে মাদাম

অবহেলিত জীবন লইয়া এত বড় পুরীর মধ্যে পড়িয়া থাকা—না, এ অসহ্য কষ্ট, নির্ম্মম দুঃখ!

তবু এ কষ্টের মধ্যেও মাদাম কোনমতে একটু সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইয়া ছিল। খুঁজিয়া বাছিয়া মনের মত গানগুলি গাহিয়া কোনমতে সে দিন কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আপনার প্রাণের সহিত কথা কহিয়া, আপনার মনকে এ সমস্ত বেদনার সাক্ষ্য রাখিয়া মাদাম একটু পরিতৃপ্তির সন্ধান করিতেছিল—কিন্তু কোথায় সে পরিতৃপ্তি, কোথায় বা সান্ত্বনা! কিছুই মিলে নাই!

বাহিরের পানে চাহিয়া মাদাম আপনার সমগ্র জীবনটার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইতেছিল, এমন সময় দাসী আসিয়া হাতে একখানা কার্ড দিল। কার্ডে লেখা আছে—"হার্ত্তুজ্—এজেণ্ট।"

দাসী কহিল, লোকটি মাদামের সহিত দেখা করিতে চায়—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মাদাম কহিল, "তুমি বলো, ডাক্তার সাহেব বাড়ী নেই!"

দাসী কহিল, "বলেছি, তিনি বললেন, মাদামের কাছেই তাঁর দরকার।"

"আমার কাছে!" মাদাম ভাবিল, আমার সহিত এ অপরিচিত লোকটার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে! নিশ্চয় কোন ভুল করিয়াছে! তবুও একটু পরে কহিল, "আচ্ছা, যাও, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।"

হার্ত্তুজ্ আসিয়া মাদামকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। কাঠের মত শক্ত মুখ—ভাবহীন চক্ষু—ক্রমাগত আইন ঘাঁটিয়া ছাপ মুখে-চোখে আঁটিয়া যায়, লোকটার মুখে-চোখে তেমনই একটা কঠিন পরুষতা! সে মুখ দেখিলে বুকের রক্ত যেন জল হইয়া যায়!

মাদাম কহিল, "আপনি জানেন না, বোধ হয়, আমার স্বামী ডাক্তার জেঙ্কিন্স এখন এখানে নেই—আর তাঁর বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

হাতে কাগজের তাড়া দেখাইয়া হার্ত্তুজ্ কহিল, "আমি সব কথা জানি, মাদাম। তাঁরই কাছ থেকে আমি আসছি।"

মাদামের মুখ চকিতে পাংশু হইয়া গেল। মাদাম কহিল, "তাঁর কাছ থেকে আসছেন, আপনি?"

"হাঁ, মাদাম। ডাক্তারের অবস্থা—এখন —অর্থাৎ সে সব আপনি ত জানেনই। চারদিকেই তাঁর সব কারবারে লোকসান যাচ্ছে। তাই তিনি বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, আসবাবপত্র, অর্থাৎ সবই আর কি, এই মোক্তার-নামায় আমায় বিক্রী করবার অধিকার দিয়েছেন।"

মাদাম একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, —মোক্তার-নামা কেন—এ কাজ কি আমি করিতে পারিতাম না! কিন্তু সহসা দারুণ অভিমান তাহার বুকের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিল! ইহার সহিত তর্ক? না, ঘৃণা হয়! মাদামকে নিরুত্তর দেখিয়া হার্ত্তুজ্ আবার কহিল, "একটা কথা—আপনাকে না বললেও নয়—মানে, ডাক্তার জেঙ্কিন্স প্যারিতে কবে ফিরবেন, আর ফিরবেন কি না, তারও কোন ঠিকানা নেই—

অতখানি প্রতিপত্তিতে বাস করতেন, এখন সব খুইয়ে সেখানে থাকা—বুঝতেই ত পারছেন—তাই আর কি তিনি বলেছেন, আপনি যদি আপনার ছেলের সঙ্গে থাকতে চান ত তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। মানে, আপনি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই —অর্থাৎ বুঝেছেন কি না—"

মাদামের কানে আর কোন কথাই প্রবেশ করিল না! সুতার মুখ ধরিয়া টানিলে রিলে জড়ানো সুতা যেমন অনর্গল বাহির হইতে থাকে, হার্ত্তুজের মুখ হইতে তেমনি কথার রাশি কুণ্ডলী-মুক্ত হইয়া অবাধে বাহির হইতেছিল। মাদামের কর্ণে তখন চকিতে সেই গানের সুরের রেশটুকু বাজিয়া উঠিল—

"এই যে প্রাণের প্রেম-আরাধন,
আদর, সোহাগ, প্রীতির বচন—"

মাদাম ভাবিল, মিথ্যা মিথ্যা কথা! এত মিথ্যা কে রচিয়াছিল? ভালবাসা—! সে ত শুধু কথার কথা মাত্র! তখনই আবার তাহার চিত্তে নারীর গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। দৃপ্ত স্বরে মাদাম কহিল, "থাক্, আর কোন কথা বলতে হবে না, মশায়, আমি সব বুঝেছি। বুঝেছি, যে, আমায় এই দণ্ডে ঘর ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—একটা দাসীর মত পথে দাঁড়াতে হবে। আর কথা বলে আমায় অপমান করবেন না। যথেষ্ট হয়েছে, আমি এখনই যাচ্ছি।"

হার্ত্তুজ্ একটু সহানুভূতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে কঠিন মুখে হাসির রেখা টানিয়া

যথার্থই আমি দুঃখিত! তবে ডাক্তার বলে দিয়েছেন, এ ছাড়াছাড়ির জন্য তাঁরও খুব কষ্ট হয়েছে—কিন্তু কি করেন? তিনি নিরুপায়! হাঁ, তবে তিনি বলে দেছেন—টেবিল, চেয়ার, সোফা, কৌচ, বাক্স,—এ সব জিনিষের মধ্যে আপনি যা দরকার মনে করেন, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন—এ বিষয়ে আপনার মতকে মেনে চলতে আমি বাধ্য। ডাক্তার আপনাকে একেবারেই নিঃসম্বল করতে চান না—এই আর কি মানে!"

মাদাম বিদ্রূপের সুরে কহিল, "যথেষ্ট অনুগ্রহ তাঁর! থাক্, এ অনুগ্রহের কোন প্রয়োজন নেই।" বলিয়া মাদাম ঘণ্টা টিপিল। নিমেষে এক দাসী আসিয়া দেখা দিল।

মাদাম কহিল, "আমি এখনই বেরুব—আমার টুপি আর ক্লোকটা দিয়ে যাও। শীগ্‌গির—"

দাসী চলিয়া গেলে মাদাম হার্ত্তুজ্‌কে কহিল, "এখানকার এ সমস্ত জিনিষ ডাক্তার জেঙ্কিন্সের। আপনি এ সমস্তই বিক্রী করিতে পারেন। আমি এর কিছুই নিতে চাই না—আমার কোন দরকার নেই।"

হার্ত্তুজ কোন উত্তর দিল না। উত্তরের প্রয়োজনও ছিল না। তাহার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে—বাকীটুকুতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

মাদাম একটা ডয়ার খুলিয়া কতকগুলা চিঠি-পত্র বাহির করিল। এগুলা মারাণের চিঠিপত্র। যতগুলি চিঠি সে মাদামকে

করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এইগুলাকে নাড়িয়া চাড়িয়া বুকে ধরিয়াই মাদাম আপনার অতৃপ্ত স্নেহ-ক্ষুধা মিটাইতে বসিত! দাসী পোষাক আনিয়া দিলে মাদাম শীঘ্র তাহা গায়ে দিয়া দাঁড়াইল, আবার ড্রয়ার খুলিল,—যদি একখানা চিঠিও পড়িয়া থাকে! না, নাই—একখানিও পড়িয়া নাই!

দাসী কহিল, "একখানা গাড়ী ডেকে দেব?"

"না, না, গাড়ী কি হবে?" মাদামের স্বর অচঞ্চল। মাদাম বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বার্ণাড জাঁস্থলে মার বুকে মাথা গুঁজিয়া গাড়ী করিয়া সম্মুখ-পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মাদাম জেঙ্কিন্সের জীবন-নাটকের অভিনয়টুকুও নবাবের জীবন-অভিনয়ের মতই করুণ, বেদনাময়। না, বুঝি, এ অভিনয়ের খেলা আরও করুণ, কেন না, ইহা নিতান্তই আকস্মিক, নিতান্তই অতর্কিত।

মাদাম জেঙ্কিন্স ক্ষিপ্র চরণে চলিয়াছিল। কি দারুণ, ভীষণ এ পতন! পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে সে বসিয়াছিল—চারিধারে সম্ভ্রম ও সম্মানের বিপুল সমারোহ—আর এখন—মাথা গুঁজিবার এতটুকুও আশ্রয় নাই। নিতান্তই নাম-হীনা অভাগিনী—পথের কাঙ্গালেরও অধম সে! নির্ম্মম অদৃষ্ট!

মাদাম এখন কোথায় যাইবে? কি করিবে?

মারাণের কথাই আজ সকলের আগে তাহার মনে জাগিল। কিন্তু পুত্রের কাছে সকল অপরাধ, সকল ত্রুটি স্বীকার করা—সম্মান ও ইজ্জৎ খোয়াইয়া অমন উঁচু-মন ছেলের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়া—সে বড় কষ্ট—সে কষ্ট সহিবার সামর্থ্যও যে মাদামের আজ নাই! না, কি বলিয়া কোন্ মুখ লইয়া অমন ছেলের সম্মুখে গিয়া আজ সে দাঁড়াইবে? না, না, সে তাহা পারিবে না। তবে মৃত্যু! মৃত্যুই তাহার একমাত্র উপায়—মুক্তির একটিমাত্র পথ! যত শীঘ্র পারা যায়, মৃত্যুর হাতে আপনাকে সঁপিয়া দিতে হইবে! কিন্তু কেমন করিয়া, কোথায় গিয়া মরা যায়? মৃত্যুলোকে যাইবার পথ ত অনেক! মনে মনে সব পথগুলারই একটা চিত্র সে আঁকিয়া লইল। সহসা মাদামের মনে হইল—কিন্তু এ মৃত্যু—আত্ম-হত্যার সে বিকৃত মূর্ত্তি, তীব্র কুৎসা—না, না, চারিধারে কোলাহল পড়িয়া যাইবে। সে কোলাহলে ছেলের মাথা আরও হেঁট হইবে! সে অনেক সহ্য করিয়াছে—এ সব সে সহ্য করিতে পারিবে না! না, না, ছেলের হিতের জন্য আত্মহত্যা করা হইবে না! আত্মঘাতিনী সে হইতে পারিবে না! তবে—উপায়—উপায় কি?

মাদাম জেঙ্কিন্স মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল—কি ভাবিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা কে অভিবাদন করিয়া ডাকিল, "মাদাম জেঙ্কিন্স—"

মাদাম মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, মার্ক ইস্ত মপার্ভ—শক্ত প্লেটওয়ালা সার্টের উপর কালো ভেলভেটের কোট চড়াইয়া দর্প-স্ফীত বক্ষে দাঁড়াইয়া—জামার বোতামের ছিদ্রে এক

গুচ্ছ ফুল গাঁথা—মুখে মৃদু হাসির রেখা! মাদাম মৃদু হাসিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া দ্রুত সরিয়া গেল—দাঁড়াইল না।

মোরার প্রিয় বন্ধু মপার্ভঁ। মুখে হাসির রেখা টানিলেও ভিতরটা তাহার আজ পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। তাহার টাকাকড়ি বন্যার জলে ধুইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। পাওনাদারের ভিড়ে বাড়ীতে থাকিবার জো নাই। কেবলই তাগাদা আসিতেছে! পোষাকের দাম, মদের দাম, আসবাবের দাম—দেনায় মপার্ভঁর মাথার চুল অবধি বিক্রয় হইবার জো! পাওনাদারের দল তাগাদায় শেষ হার মানিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়াছিল। সেই দিনই পাঁচ-ছয়খানা ক্রোকের নোটিশ জারি হইয়াছে। মাথা আর তুলিয়া রাখা যায় না। মপার্ভঁর বুকের পাঁজরাগুলা যেন চূর্ণ হইয়া যাইবে, এমনই মনে হইতেছিল। নোটিশ পাইয়া মপার্ভঁ বাড়ী ছাড়িয়া পথে ঘুরিতেছিল। কি করিবে সে উপায়ও স্থির হইয়া গিয়াছিল। দেনার দায়ে অত বড় বংশের ছেলে হইয়া শেষে সে জেলে যাইবে—মপার্ভঁ জেলে! না, না, না!

গোপনীয় চিঠি-পত্র পুড়াইয়া ছাই করিয়া, ছোট-খাট ব্যাপারগুলা সারিয়া লইয়া মপার্ভঁ আজ পথে বাহির হইয়াছে, মরিবার জন্য। সে মরিবে! কিন্তু কোথায় গিয়া, কেমন করিয়া মরিবে সে? পারিতে নয়। এখনই একটা হুলস্থূল বাধিয়া যাইবে। কলঙ্কের কালিতে সহর কালো হইয়া উঠিবে। মরিবে সে নিশ্চয়—কিন্তু পারির বাহিরে গিয়া মরা চাই! এক নিভৃত নির্জ্জন কোণে! বিকৃত মুখে পরিচয়ের চিহ্নমাত্র থাকিবে না! মপার্ভঁ তাই মরিবার জন্য এক নিভৃত বিজন কোণের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল।

হাঁটিয়া সহর পার হইয়া মপার্ভঁ এক ক্ষুদ্র গ্রাম-প্রান্তে আসিয়া পৌছিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। খানিকটা পথ চলিয়া মপার্ভ দেখে, এক কয়লার দোকানের পার্শ্বে গেট-ওয়ালা একটা বাগান। বাগানের ফটকে অস্পষ্ট আলোর অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "বাথ" (স্নানাগার)। মপার্ভঁর মুখে হাসি দেখা দিল। আঃ, এতক্ষণে মিলিয়াছে,—স্থান মিলিয়াছে! এই নিভৃত গ্রাম-প্রান্তে ক্ষুদ্র একটা বাথ-রুমে,—ঠিক! কেহ চিনিতে পারিবে না—কোন গোল উঠিবে না—নামহীন পরিচয়হীন একটা সাধারণ শবের মতই তাহার মৃত দেহপিণ্ডটাকে ইহারা টানিয়া কোথায় জঙ্গলের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবে। ঠিক হইয়াছে! মরিবার জন্য এমন ঠাঁই আর কোথাও মিলিবে না!

মপার্ভঁ ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই খানিকটা সরু পথ—পথের দুইধারে বন্য গাছের ঝোপ। পথ গিয়া একটা কুটীরের দ্বারে মিশিয়াছে! মপার্ভঁ দ্বারে আসিয়া ডাকিল, "বেয়ারা—"

একটা লোক আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

মপার্ভঁ কহিল, "জল তোয়ের কর। স্নান করব।"

মপার্ভঁকে ভিতরে বসিতে বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। ঘরে সম্মুখেই একটা বৃহৎ আয়না ছিল। মপার্ভঁ তাহার সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইল। আপনার প্রতিবিম্বের পানে চাহিয়া রহিল—এই গর্ব্বস্ফীত বুক—এই তেজোদ্দীপ্ত মুখ—না, আর এখন ও-সব দেখিয়া, ও-সব ভাবিয়া কি ফল? হাতের পাশা পড়িয়া গিয়াছে—ও-সব কথা ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই!

ভৃত্য আসিয়া সেলাম করিয়া জানাইল, জল তৈয়ার হইয়াছে। "চল" বলিয়া মপার্ভ কুটীরের বাহিরে আসিল। বাগানের এক কোণে বাথ-রুম—মপার্ভ ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

* ● *

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কম্পিত বক্ষে মাদাম জেঙ্কিন্স আঁদ্রের ষ্টুডিয়ো-ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে কেহ নাই! মাদামের পা কাঁপিয়া উঠিল। সে যেন চোর—এ ঘরের বিমল শান্তিটুকু যেন সে চুরি করিতে আসিয়াছে! ঘরের একটা চাবি তাহার কাছে পূর্ব্ব হইতেই ছিল—মারাণের দেওয়া চাবি—আর একটা মারাণ নিজে রাখিত। কাজেই ঘরে ঢুকিতে কোন বাধা ছিল না।

চিরপ্রথামত টেবিলের উপর ভাঁজ-করা এক-টুকরা কাগজ ছিল। মারাণের লেখা। মারাণ লিখিয়া রাখিয়াছিল, "আমি রিহার্সালে যাইতেছি। সন্ধ্যার পরই ফিরিব।"

এ ব্যবস্থা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। মা যদি আসিয়া পুত্রকে দেখিতে না পায়, তাই বাহিরে গেলে কখন্ তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা, সে কথা এমনইভাবে সে লিখিয়া রাখিত। সেই লেখাটুকু মাদাম বুকে ধরিয়া সেই কাগজটুকুতে অজস্র চুম্বন ঢালিয়া প্রাণ ভরিয়া একবার কাঁদিল। কিসের লোভে, কিসের প্রলোভনে, এই পুত্রের সান্নিধ্য ছাড়িয়া সে দূরে ছিল! পুত্রের প্রতি কিসের জন্য সে এতখানি অবিচার করিয়াছে—আপনার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসারও এতখানি অপমান করিয়াছে! ধিক তাহার নারী-জন্মে, ধিক তাহার মাতৃত্বে! এই ক্ষুদ্র ঘরের কোণে যে বিপুল শান্তি জমা রহিয়াছে, তাহার একটা কণাও যে জেঙ্কিন্সের সেই অত-বড় প্রাসাদে খুঁজিলে মিলে না! কখনও মিলেও নাই! মাদামের দুই চোখ বহিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

মাদাম বসিয়া অতীতের কথা ভাবিতেছিল! পাপিষ্ঠের প্রতারণাময় সেই সব প্রলোভন—পুত্রের সহিত ছাড়াছাড়ি—কি সে মুহূর্ত্তগুলা! চিন্তার পর চিন্তা তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া ছুটিয়াছিল। তাহার আর সীমা নাই—শেষ নাই!

সহসা বাহিরে জুতার শব্দ পাওয়া গেল। শিষ দিতে দিতে আঁদ্রে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অন্ধকার ঘর। মন আজ তাহার উল্লাসে ভরা ছিল—জুজের গৃহে এখনই নিমন্ত্রণ যাইতে হইবে! আলো! আলো! আজ একটু সাজিবারও প্রয়োজন আছে! প্রণয়ী আজ প্রণয়িনীর গৃহে ভোজন করিবে! আলো জ্বালিতেই পিছনে কাহার দীর্ঘশ্বাস শুনা গেল। চমকিয়া আঁদ্রে ফিরিয়া চাহিল, রুদ্ধ স্বরে বলিল, "কে? মা!"

তখনই দুইখানা অধীর হস্ত আসিয়া আঁদ্রেকে আঁটিয়া ধরিল, স্নেহের একটা উষ্ণ

তাপ—মা ছেলেকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল ; কহিল, "হাঁ, আমি।"

দুই-চারিটা কথা কহিয়াই মাদাম পলাইবে, স্থির করিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে বলিল, "একটু বেড়াতে যাব, আমি। তাই যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলুম।"

"কেন মা? কোথায় যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন? আমার নতুন নাটক থিয়েটারে 'প্লে' হবে—তুমি দেখবে না? না মা,—তোমায় দেখতেই হবে। তার পর আমাদের বিয়ে আসছে—তুমি সে সময় না থাকলেই যে নয় মা! ও বুঝি তোমায় আসতে দেবে না? সেই মতলবেই—"

মাদাম তাড়াতাড়ি সে কথায় বাধা দিয়া—দুই-একটা মিথ্যা ওজরে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আঁদ্রে কহিল, "না, মা, আমি কোন কথা শুনতে চাই না।"

মাদাম আর পারিল না, কাঁদিয়া বসিয়া পড়িল। আঁদ্রে আসিয়া মার হাতটা টানিয়া আপনার দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, কহিল, "কি হয়েছে, মা—আমায় বল, তুমি। খুলে বল আমায়—"

মাদাম চোখের জল মুছিয়া কহিল, "কিছু না, বাবা, কিছু নয়—আমার মনটা ভাল নেই—তাই একটু ঘুরে আসতে চাই, তুমি আমায় এমনি চোখেই দেখো—আমি তোমার মা—বড় দুঃখিনী মা—"

আঁদ্রে মিনতি করিল, "না, মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি আমায় বল, কি হয়েছে।"

মাদাম কোন কথা কহিল না—চাহিয়া রহিল।

আঁদ্রে কহিল, "তোমাদের কি ছাড়াছাড়ি হয়েছে, তবে?"

মাদাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "আমায় বলো না, ও-সব কোন কথা তুলো না, মারাণ।"

"মা, আমার কাছে কি লুকোচ্ছো, তুমি! আমি ত ছ'মাস আগেই বলে রেখেছিলুম—নয় কি, মা?"

"তুমি তা হলে সব জানো?"

"সব জানি! এ যে ঘটবে, তা আমি বহুদিন থেকেই জানি, মা! আমি ত এই দিনেরই প্রতীক্ষায় ছিলুম—"

"আমি এখানে এলুম—"

বাধা দিয়া মারাণ কহিল, "এই ত তোমার ঘর, মা—এ তোমার মন্দির! আজ দশ বছর আমি তোমার কাছ-ছাড়া হয়েছি—তোমার কাছ থেকে দশ বছরের স্নেহ আমার পাওনা আছে—আমি আর তোমায় ছেড়ে দেব না।"

বাহিরে আবার কাহার পদ-শব্দ শুনা গেল। এলিস মারাণের খোঁজে আসিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়াই আলিঙ্গন-বদ্ধ মাতা-পুত্রকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মারাণ কহিল, "এসো এলিস,—মার কাছে এসো, এই আমার মা। মা, এই এলিস—তোমার বৌ—"

দুই হাত বাড়াইয়া মাদাম তখন এলিসকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল, অজস্র চুম্বনে তাহার মুখখানিকে রাঙ্গাইয়া ফেলিল, তারপর গাঢ় স্বরে কহিল, "একবার

আমায় ডাকো—'মা' বলে একবার তোমরা দুজনে আমায় ডাকো,—আমার সব দুঃখ এখনই ঘুচে যাবে।"

আঁদ্রে, এলিস দুইজনে তখন মাদামের বুকে মাথা রাখিয়া ডাকিল, "মা—"

"আঃ, বড় সুখ, বড় সুখ" সুগভীর পরিতৃপ্তিতে মাদামের বেদনা-দীর্ণ মন ভরিয়া গেল। সত্যই বড় সুখ! পৃথিবীতে যে এত সুখ ছিল,—মাদাম তাহা কোনদিন ধারণাও করিতে পারে নাই।

ও-ধারে পল্লী-প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র বাথে তখন মহা কলরব পড়িয়া গিয়াছিল। এক জন লোক বাথে ঢুকিয়া বহুক্ষণ বাহির হইতেছে না দেখিয়া ভৃত্যকে সন্ধান লইতে পাঠানো হয়। সে গিয়া দেখে, রক্ত-মাখা একটা মাংস-পিণ্ড পড়িয়া আছে—তাহার মুখে গলায় অজস্র ক্ষুরের ঘা—প্রাণ-হীন দেহ! ফুলের মত শুভ্র সার্টের প্লেট রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে। বীভৎস মুখ! দেখিলে চেনা যায় না! সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

হায়, বেচারা মপার্ভ! মাদামের এ তৃপ্তির একটি কণারও স্বাদ সে জীবনে কখনও পায় নাই! এই স্নেহ-ভরা দৃষ্টির অতি ক্ষীণ একটা রশ্মিও কোনদিন তাহার আঁধার বুকে মুহূর্ত্তের জন্য ফুটিবার অবকাশ পায় নাই! হতভাগ্য জীব!

(ক্রমশ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চয়ন

বিস্মৃত নগর

একটি বিশাল নগর গভীর জঙ্গলের ভিতরে কেমন করিয়া হারাইয়া গিয়াছিল, আজ কেহ তাহা বলিতে পারে না। সে কতদিনের কথা! ইংলণ্ড তখনও প্রায়-অসভ্য, পারি তখন ছোটখাট একটি গণ্ডগ্রামের মত এবং শ্বেতাঙ্গের নিকট আমেরিকা তখনও একটি না-দেখা স্বপ্ন! সেই সুদূর অতীতে কিন্তু এই বিস্মৃত নগর সভ্যতার সিংহাসন ছিল,—ঐ স্তব্ধ অট্টালিকা এবং ভগ্ন স্তম্ভাবলীকে জিজ্ঞাসা কর, উহারা মৌন ভাষায় এক বিলুপ্ত নিপুণতা এবং অর্থ ও সামর্থ্যের অপূর্ব্ব কাহিনী আবৃত্তি করিবে—যে অবর্ণিত কাহিনা ইতিহাসে স্থান লাভ করে নাই।

'ইণ্ডো-চায়না'র এক নিবিড় অরণ্যে এই বিস্মৃত নগর আজিও ধ্বংশ-বিধ্বস্ত দেহে দাঁড়াইয়া আছে। একদিন ইহা Khmer বা কাম্বোডিয়ার রাজাগণের বড় আদরের রাজধানী ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখানকার ইট-কাঠ-পাথর ও শিলালিপি প্রভৃতি পরখ করিয়া বলিয়াছেন, নবম খৃষ্টাব্দে এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সহর হইতে মাইল-



ওঙ্কার-বাটের মন্দির



ছাদশীর্ষে শিবের প্রকাণ্ড মুখ

প্রকাণ্ড মন্দির আছে, তাহার নির্ম্মাণকাল দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ। নগর এখন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার, রাজপথগুলি বুনো গাছপালায় অগম্য, বাড়ীঘর বন্য পশুদের নিরাপদ বিরামাগার হইলেও মন্দিরটি এখনও প্রায় অটুট আছে—কেবল সামান্য দু-চার জায়গা খসিয়া গিয়াছে।

এই রাজধানী-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, এক হিন্দুরাজা স্বদেশে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এখানে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের বশ করিতে তাঁহাকে বড় বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। রাজার সঙ্গে কেবল যে সৈন্যসামন্ত আসিয়াছিল, তাহা নহে; পরন্তু, দলে দলে পুরোহিত, পণ্ডিত, শিল্পী, স্থাপত্যবিদ্, রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার এবং তন্তুবায়ও তাঁহার সাথের সাথী হইয়াছিল। ইহাদের লইয়া রাজা এখানে জাঁকিয়া বসিলেন; এবং দেখিতে দেখিতে ভারত-বর্ষের উন্নত হিন্দু সভ্যতা ঘরের বাহিরেও এক স্বপ্নের মত বিচিত্র 'ময়দানবের পুরী' গড়িয়া আকাশের অনেকটা শূন্য পূর্ণ করিয়া তুলিল। এই প্রবাদ-কাহিনীর মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য ও কতটুকু জনরবের অত্যুক্তি আছে, তাহা ঠিক বলা না গেলেও এ কথা নিশ্চিত যে, এই বিস্মৃত নগর হিন্দুর কীর্ত্তি।

কিন্তু এই নগর নির্ম্মাতা পরাক্রমশালী রাজবংশের অধঃপতনের কারণ কি? নগর কেন পরিত্যক্ত হইল—রাজবংশ কোথায় গেল? সে কাহিনী এখনও ভাল করিয়া জানা যায় নাই। কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে বা ভূমিকম্পে নগর যে সহসা শ্মশানে পরিণত হয় নাই, ধ্বংসস্তূপগুলি দেখিলে সে কথা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন পরাক্রমশালী জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কি ওঙ্কার-ধামের পরিণাম এমন শোচনীয় হইয়াছে? এ প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

স্থানীয় বাসিন্দারা এই ভাঙ্গাচোরা, পুরাণো সহরের শেষ স্মৃতিটুকুও মুছিয়া ফেলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কারুকাজ-করা পাথরের থাম্, সিংহমূর্ত্তি, নাগের মাথা এবং শিব ও বুদ্ধের প্রতিমা প্রভৃতি নানারকমের রাশীকৃত জিনিষ মানুষের অত্যাচারে স্থানচ্যুত হইয়া এদিকে-ওদিকে পড়িয়া আছে। সেকালের সেই প্রতিভাবান্ শিল্পিগণের অন্ধ অভাগা বংশ-ধরেরা আজ এতটা আত্মবিস্মৃত হইয়াছে যে, তাহারা আপনাদের স্মরণীয় গৌরবের মূলেও কুঠারাঘাত করিতে লজ্জাবোধ করে নাই। সংপ্রতি ফরাসী-গভর্ণমেণ্ট কালের ও মানুষের অত্যাচার-নিবারণের চেষ্টায় মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগেও ভারত-শিল্পীর মাল-মশ্লা ও নির্ম্মাণ-পদ্ধতি এমন চমৎকার ছিল যে, মন্দির বা প্রাসাদের যে-সকল অংশ হারাইয়া বা খসিয়া গিয়াছে, এই উন্নত, বৈজ্ঞানিক যুগের কারিকরেরা যথাসাধ্য যত্ন-চেষ্টাতেও সে-সকল জায়গা আর মেরামত করিতে পারে নাই।

ওঙ্কারধামের বাড়ী-ঘর, মন্দির, স্তম্ভ, এমন-কি পথঘাট পর্য্যন্ত শিল্প-সুষমা ও খোদন-পটুতায় পরিপূর্ণ;—সে কলা-বৈচিত্র্য দেখিলেই অজন্তা, এলোরা, সাঞ্চী, সারনাথ

ও কণারকের ঐন্দ্রজালিক শিল্পিগণকে মনে পড়িয়া যায়। পাথরের গায়ে এখানেও শত শত অবদান খোদা আছে। কোথাও একটি যুদ্ধযাত্রার ছবি খোদিত। সকলের আগে-আগে ভেরী-বাদকের দল; তারপর ছত্রধারীদের মাঝখানে হস্তীপৃষ্ঠে সেনাপতি; তারপর বর্ষা-চর্ম্মধারী রথারোহী ফৌজের সারি, তারপর রণ-হস্তী প্রভৃতির সম্মুখে বর্ম্মাবৃত, অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ; তারপর তীর-ধনু, তরবারি, কুঠার ও যষ্টি লইয়া পদাতিক সেনাদলের পিছনে সেনাদল ও ক্রীতদাসগণ, গরুর গাড়ীতে বোঝাই-করা ভারে ভারে রসদ, ফৌজদের পরিচর্য্যা ও আনন্দবিধানের জন্ম ভৃত্যগণ, বাদ্যবাদকের শ্রেণী ও নর্ত্তকীবৃন্দ। বালু-পাথরের উপরে খোদা এ-সকল ছবির প্রতি খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্ত শিল্পীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। মূর্ত্তিগুলি জীবন্ত, স্বাভাবিক ও তেজে-ভরা,—তাহাদের ভঙ্গিমাও সুন্দর ও বিচিত্র! চারিদিকে শতসহস্র মূর্ত্তির ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলে, কোন্‌টি আগে বা কোন্‌টি পরে দেখিব, কোন্‌টি ভাল বা কোন্‌টি মন্দ এ-সব কিছুই ঠাহর করিতে পারা যায় না। সমস্ত মূর্ত্তির মুখে-চোখেই খোদ্‌কারী এক-একটি বিশেষ ও বিভিন্ন ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তাহাদের কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ সুখে উল্লসিত, কেহ দুঃখে ম্রিয়মান! শুধু মানুষ নয়, ছবিতে জীবজন্তুদের যে-সকল মূর্ত্তি দেখা যায়, সেগুলিও সুললিত ভাবপূর্ণ। হাতীর ছোট ছোট চোখগুলি ঠিক যেন জীবন্তের মতই ঝিকমিক করিতেছে, গরুগুলি ঠিক যেন মূর্ত্তিমান ধৈর্য্য, শূকরগুলা পালকের ডাঙ্গসের ঘা খাইয়া রাগে ঘোৎঘোৎ করিতেছে। শিল্পীরা যে নেহাৎ বেরসিক ছিলেন না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এক জায়গায়, একজন মাহুত ভয়ে-ভয়ে আড়্‌-চোখে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে পিছন দিকে হাত চালাইয়া দিয়া সাবধানে থলি হইতে মাল চুরি করিতেছে! এম্‌নি পাথরের পটে ঠিক যেন বায়স্কোপের মত ছবির পর ছবি,—ছবির পর ছবি! যুদ্ধ-দৃশ্য, শীকার, নৌ-বিহার, মাছ ধরা, উৎসব, শোভাযাত্রা, কীর্ত্তন-সম্প্রদায়, রাজপথের জনতা, কুচ-কাওয়াজ, রাজ-অভ্যর্থনা, মল্ল-ক্রীড়া, গৃহস্থের ঘর-সংসার, কুট্‌না-কুটা, রান্না-বান্না ও পারিবারিক মেলা-মেশা প্রভৃতি সেকালের সেই অতীত সভ্যতার বিষয়ে যাহা-কিছু জানিবার-বুঝিবার,—তখনকার জীবন-যাত্রা-প্রণালী, আচার-পদ্ধতি, মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্র, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘটি-বাটি-গেলাস প্রভৃতি সমস্তই বাটালির মুখে দেওয়ালে দেওয়ালে খুদিয়া রাখা হইয়াছে। এইসঙ্গে যেখানে-সেখানে হিন্দু-দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অসংখ্য ত্রিমূর্ত্তি নজরে পড়িয়া যায়।

এক জায়গায় বাহান্নটি কোণাকৃতি চূড়ার মাঝখানে প্রাসাদের প্রধান চূড়াটি আকাশ ছুঁইতে উপরে উঠিয়াছে। প্রতি চূড়াটির সঙ্গে শিবের চারিটি করিয়া মুখ খোদিত। ছাদের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলে সমস্ত ওঙ্কার-ধাম সুলিখিত চিত্রের মত চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

নয় মাইল জঙ্গল যুড়িয়া ধ্বংশ-স্তূপের পর ধ্বংশ-স্তূপ, গভীর কাননের সবুজ বর্ণলীলার মাঝে মাঝে কোথাও একটা হেলিয়া-পড়া প্রাসাদের চূড়া, কোথাও একটা শৈবালশ্যাম মন্দিরের মুকুট, কোথাও-বা একটা ভাঙ্গা থামের আধখানা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রাসাদের ছাদ হইতে দেখিলে বুঝা যায়, একদিন এই শক্তিশালী রাজার রাজধানী, বিশালতায়, মহিমায় ও সৌন্দর্য্য-শ্রীতে নিরোর রোমকেও সর্ব্বাংশে পরাজিত করিয়াছিল।

এই প্রকাণ্ড সহরের চারিদিক বেড়িয়া এক দীর্ঘ প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের উচ্চতা ষাট ফুট; পাঁচটি ফটক আছে। এই ফটকগুলির ভিতর দিয়া অনায়াসে হাতীর দল হাওদা-সমেত চলিয়া যাইতে পারে। সৈন্যদল, ক্রীতদাস ও কুলি প্রভৃতি রাজকার্য্যে নিযুক্ত অসংখ্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও অনায়াসে ইহা বলা যায় যে, এ সহরে অন্তত দুইলক্ষ বাসিন্দা বাস করিত।

ওঙ্কার-ধামের অদূরে ওঙ্কার-বাট। আকারে ছোটখাট হইলেও এটিও একটি নগরবিশেষ। এখানেও রাজপ্রাসাদ, এবং পুরোহিত, অতিথি ও অসংখ্য সৈন্যের জন্য বাড়ী-ঘর আছে। ওঙ্কার-ধামের মত এখানেও মাইলের পর মাইল যুড়িয়া শিল্পবিচিত্র প্রস্তরপট আছে। তবে এখানকার শিল্প ওঙ্কার-ধামের কারুকার্য্য অপেক্ষা দেখিতে পেলব ও সুন্দর হইলেও ততটা সতেজ ও স্বাভাবিক নহে।

এ-সব ছোটখাট খুঁতের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, ওঙ্কার-বাটের খোদন-শিল্প পৃথিবীর ভিতরে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এখানে দেড়শত ফুটের চেয়েও দীর্ঘ এক এক-খণ্ড প্রস্তর-পটের উপরে রামায়ণ ও মহাভারতের এক-একটি গল্পচিত্র খোদিত আছে। বৌদ্ধধর্ম্মমূলক চিত্রাবলীরও অভাব নাই। ওঙ্কার-বাটের প্রধান চূড়াটির উচ্চতাও বড় অল্প নহে—সমতল ভূমি হইতে দুইশত ফুটেরও অধিক!

হায়, এই বিরাট-বিশাল শিল্প-পুরী গড়িয়া তুলিবার জন্য শত শত বর্ষ ধরিয়া কত কষ্ট, কত যত্ন, কত ধৈর্য্যের আবশ্যক হইয়াছিল! মহাকালের একটি দীর্ঘনিশ্বাসে আজ তাহার সকল মহিমা, সকল গরিমা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে,—পড়িয়া আছে শুধু দিগন্তব্যাপী এক মহা-কঙ্কাল! কিন্তু এ কঙ্কালও মাধুর্য্যবর্জ্জিত নহে,—কলাবিদের কাছে এখনও ইহা আনন্দ ও দৈববাণীর মত, কবির কাছে সোণার স্বপ্নের মত, দার্শনিকের কাছে ধর্ম্মবাণীর মত, শিক্ষিতের কাছে জ্ঞানাগারের মত, এবং নূতনত্বপ্রার্থী ভ্রমণকারীর কাছে যেন জ্বলন্ত উত্তেজনার মত!

পশ্চিম-গগনে স্বরচিত শ্মশান-চিতায় সূর্য্য যখন মরণ-শয়নে ঢলিয়া পড়েন, ওঙ্কার-বাটের বিপুল ধ্বংশ-স্তূপের উচ্চ শিখরের উপরে তখন ঘনীভূত অন্ধকারের যবনিকা নামিয়া আসে, চারিদিকের শত শত কুঠরীর ভিতর হইতে সহসা তখন হাজার হাজার বাদুড়ের দল নিবিড় তিমিরের বার্ত্তা বহন করিয়া মাথার উপরে

চক্রে চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে থাকে, তাহাদের ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দে ঘুমন্ত বনভূমি যেন ভয়ে শিহরিয়া জাগিয়া উঠিয়া বসে! রজনীর আগমনে আকাশের বিলীয়মান নীলিমার উপরে ঐ কালো কালো নিশাচর-গুলাকে দেখিতে কি ভয়ানক—কি ভয়ানক! —যাহাদের প্রাণের একান্ত কামনায় ওঙ্কার-ধামের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, উহারা কি তাহাদেরই অশান্ত অতৃপ্ত আত্মা?......কে বলিতে পারে?

The Pall Mall Magazine হইতে

নূতন শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি

ভাদ্রমাসের ভারতীতে প্রকাশিত "শিশু-শিক্ষায় নবপদ্ধতি" পাঠ করিয়া অনেক পাঠক আগ্রহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন; অতএব, এ-বিষয়ে আরও দু-এক কথা বলিলে বোধ করি, মন্দ হইবে না।

আজকাল আমেরিকাতেই শিশু-শিক্ষা লইয়া বেশী আলোচনা চলিতেছে। ফলে, শিশুশিক্ষার জন্য তথায় অনেকগুলি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ-সকল পদ্ধতি ঠিক একরকমের না হইলেও, উহাদের মূলকথা এক। শিশুদের শৈশবকালটা যাহাতে অকেজো শিক্ষায় বিফল হইয়া না যায়, সকল পদ্ধতিতেই প্রধানত সেই চেষ্টাই করা হয়।

ডাঃ বোরিস সিডিস্‌ নামে আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত একরূপ নূতন পদ্ধতিতে তাঁহার পুত্রকে এমন শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, এগার বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহার বালকপুত্র হার্ভার্ড যুনি-ভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষালাভের অধিকারী হইয়াছিলেন! এই নবপদ্ধতির বিরুদ্ধে ... জাহির করিয়াছেন। কেহ বলেন, "কচি ছেলেকে এমন জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইলে বয়সকালে তাহার দৈহিক ও মানসিক অবনতি ঘটিবে।"—কেহ বলেন, "ইহাতে শিশুর শিশুত্বের উপরে ডাকাতি করা হয়।"—কেহ বলেন, "নবপদ্ধতির গুণে এরূপ শিক্ষালাভ হয় না,—ছাত্রের বিশেষ একটা শক্তির গুণেই হয়। সকল শিশুর ভিতরেই কিন্তু এই বিশেষ গুণটি নাই";—এই মতগুলির কোনটিই কাজের নয়।

নূতন পদ্ধতি শিশুকে ঔষধ গিলাইবার মত করিয়া লেখাপড়া শিখায় না, বা তাহার শিশুত্ব হরণ করিয়া তাহাকে 'ইঁচড়ে পাকায়' না। এ শিক্ষা দেওয়া হয় আনন্দের সহিত, শিশুকে খেলায় মাতাইয়া, ক্রীড়াচ্ছলে। প্রতি শিশুর ভিতরেই সুপ্ত ভাবে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহার বিকাশ সাধন করাই নবপদ্ধতির উদ্দেশ্য।

এর্ভিন পাল্ডা নামে একটি শিশু দুবছর বয়সের সময় সমস্ত ইংরাজী বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিয়াছিল। যে ঘরে বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরা লেখাপড়া ত,করি এর্ভিন

সেই ঘরে উপস্থিত থাকিত। ছেলেদের পড়াশুনা এর্ভিন যে মন দিয়া শুনিত, তার ভাব দেখিলে তাহা আদোপেই টের পাওয়া যাইত না। অবশেষে তার বাপ-মা দৈবগতিকে হঠাৎ একদিন টের পাইলেন যে, এর্ভিন আপনা-আপনি সমস্ত বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিয়াছে!

এই সত্যটা জানিতে পারিয়া পিতা-মাতার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল; তাঁহারা উৎসাহের সহিত এর্ভিনকে বানান ও অঙ্ক শিখাইতে লাগিলেন। এর্ভিনও খুব খুসি হইয়া এই শিক্ষা গ্রহণ করিত। মাস-কতকের ভিতরেই এর্ভিন বানান ও অঙ্ক সম্বন্ধে এতটা জ্ঞানলাভ করিল, যে সকলেই তাহার আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

কিন্তু এর্ভিনের বয়স যখন তিন বৎসর, তাহার পিতামাতা তখন শিশুর অনিষ্ট-আশঙ্কায় লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

এর্ভিনের পিতা বলিতেছেন, "আমার ছেলে পাছে শিশুত্বের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, সেই ভয়েই আমি তার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এর্ভিনও অতি শীঘ্রই যা-কিছু শিখেছিল, সব ভুলে গেল। তার পরে যখন তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হল, তখন তাকে আবার নূতন করে সমস্ত শিখতে হয়েছিল। শিশুকালে যে-সব বিষয় সে খুব ফূর্ত্তির সঙ্গে অনায়াসে শিখতে পেরেছিল, বালকবয়সে সেই বিষয়গুলিও সে তেমন সহজে শিখতে ও বুঝতে পারে নি। এখন তার বয়স আঠারো বছর। সে উপস্থিত ... বালকের চেয়ে আমার পুত্র বেশী কোন শক্তি দেখাতে পারে নি। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, শিশুকালে তার লেখাপড়া বন্ধ না করলে, সে ঠিক ডাক্তার সিডিসের পুত্রের মত শক্তির পরিচয় দিতে পারত।"

ঠিক নিয়মে শিক্ষা দিতে পারিলে, এমন শিশু নাই, যে অল্পবয়সে অসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ দিতে না পারিবে। রেভারেণ্ড এ, এ, বার্ল্ নামে এক পাদরী তাঁহার চারিটি সন্তানকেই নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি, পিতামাতারা আপনাদের দায়িত্ব ভুলে মাহিনাকরা মাষ্টারের হাতে ছেলেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন বলেই ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে অক্ষম হয়। আমার বড় মেয়ে লিনার বয়স যখন তিন বছর, আমরা তখনি তাকে লেখাপড়া শিখাতে সুরু করি। —স্কুলে যাবার আগেই শিশুদের লেখাপড়া সুরু করা উচিত; এ শিক্ষায় শিশুরা কষ্ট বোধ করে না, আর শৈশবের হাসি-খুসিতেও বঞ্চিত হয় না। আমার মেয়ে লিনা পুতুলখেলাও করত, লেখাপড়াও শিখত। আমরা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, লেখাপড়াও একরকম খেলা। সেও তাই বুঝেছিল।"

মিঃ বার্লের বড় মেয়ে লিনার বয়স এখন ষোল বৎসর; সে র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজে পড়ে; আপাতত 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট'। তাঁহার প্রথম পুত্রও হার্ভাড য়ুনিভার্সিটির 'আণ্ডার

হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর লিও উয়েনারও শিশুশিক্ষায় নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার পুত্র-কন্যারাও অপূর্ব্ব বিদ্যার পরিচয় দিয়াছে। অধ্যাপকের জ্যেষ্ঠপুত্র নরবার্ট এগার বছর বয়সে কলেজে প্রবিষ্ট হয় এবং চৌদ্দ বছর বয়সেই গ্রাজুয়েটের সম্মান লাভ করে। এখন সে Ph. D. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণ বালকেরা যে বয়সে সর্ব্বপ্রথম কলেজের শিক্ষা আরম্ভ করে, সেই বয়সেই নরবার্ট যে Ph, D. ডিগ্রি লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নর্‌বার্টের পিতা বলিতেছেন:—যাঁরা মনে করেন আমার ছেলেমেয়েরা বিশেষ একটা গুণ পেয়েছে, তাঁরা নির্ব্বোধ। অন্যান্য বালক-বালিকারা আমার পুত্র-কন্যার মত জ্ঞানলাভ কর্‌তে পারে না, তার প্রধান কারণ এই যে, আমার সন্তানেরা যেভাবে শিক্ষা পেয়েছে, অন্যান্য বালক-বালিকা সেভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয় না।

"পিতা-মাতারা তাঁদের শিশু-সন্তানকে যতটা নির্ব্বোধ মনে করেন, তারা ততটা নির্ব্বোধ নয়। শিশুদের স্বভাবিক বুদ্ধি কাজে খাটালেই সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও শিক্ষা-প্রবৃত্তিকে চেপে রাখ্‌লে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হবে না। শিশুর কথা ও কার্য্যের উপরে পিতা-মাতার সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। শিশুর সাম্‌নে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বল্‌তে হবে, ছেলে-মেয়েরা যাতে বাপ-মায়ের সঙ্গে সমানভাবে আলোচনার সুযোগ পায়, তাও করতে হবে, তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সকল বিষয় উপভোগ করবার ক্ষমতা তাদের আছে। এক কথায়, যাতে তাদের বিচারবুদ্ধি বিকাশলাভ করে, সর্ব্বদাই সেইদিকে মনোযোগী থাক্‌তে হবে।

"তারপর, শিশুদের মনের টান্ যে বিষয়ের প্রতি, সেই বিষয়ই তাদের শেখানো দরকার। হয়ত কেউ আঁক কষ্‌তে ভাল-বাসে, কেউ পড়তে ভালবাসে, কেউ ছবি আঁক্‌তে ভালবাসে। তাদের ভালবাসা উপেক্ষা করলে চল্‌বে না। আমার ছেলে নর্‌বার্ট যখন আঠারো মাসের, তখন তার ধাত্রী একদিন তাকে নিয়ে সাগরতীরে গিয়ে বালিতে এ, বি, সি, ডি লিখে খেলা কর্‌ছিল। নর্‌বার্ট খুব মন দিয়ে সব দেখ্‌চে-শুন্‌চে দেখে ধাত্রী বালির উপর আঁচড় কেটে তাকে বর্ণমালা শেখাতে লাগ্‌ল। দুদিন পরে সে আমার কাছে এসে বল্লে যে, নর্‌বার্ট সমস্ত বর্ণমালা শিখে ফেলেছে!"

The Lady's Realm হইতে

রেঁাদার বিখ্যাত ছাত্রী

ভাস্কর-কার্য্যে সাধারণত পুরুষের অনুরাগই বেশী দেখা যায়। কিন্তু সংপ্রতি একজন রমণী ভাস্করের কাজে আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখাইয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

এই মহিলার নাম কাথেলীন ব্রুশ স্কট; তিনি অজ্ঞাত তুষার-রাজ্যের আবিষ্কারক, মহাবীর কাপ্তেন রবার্ট স্কটের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী।

কাথেলীন স্কট সর্ব্বপ্রথমে চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য প্যারিসে গমন করেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তাঁহার মন ফিরিয়া যায়। ছবি-আঁকার চেয়ে মূর্ত্তি-গড়ার কাজই তাঁহার বেশী পছন্দ হইল। ফলে, তিনি বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রেঁাদার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

রেঁাদার কাছে তিনি পাঁচবছর ধরিয়া শিক্ষানবীসি করেন। এই পাঁচ বছরের শিক্ষা ও সাধনায় তিনি যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, অনেক পুরুষের পক্ষেও তাহা শ্লাঘার কথা।

কাথেলীন স্কটের হাতের কাজ এতটা পাকা যে, সেগুলি দেখিলে সকলেরই মনে হইবে তাহা খোদ রেঁাদারই তৈয়ারী। তাঁহার গড়া সকল মূর্ত্তিই ভাবাভিরাম ও জীবন্ত। কোন মহিলা-শিল্পী যে মানুষের ভিতরের আত্মাকে এমন অবলীলায়, এমন তেজের সহিত প্রকাশ করিতে পারেন, এ কথা এতদিন কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারিতেন না। মূর্ত্তিগুলির গড়ন-পিটনে, ভাব-ভঙ্গীতেও শিল্পীর আত্মপ্রকাশ নাই,

ভিতরে পুরুষোচিত ভাব আছে, রেঁাদার সফল অনুকরণ আছে।

কাথেলীন স্কট বলেন, "পুরুষ-মানুষ গড়্‌তে আমার বড় সাধ। আমি মেয়েমানুষ গড়্‌তে চাই না—শুধু চাই পুরুষ গড়্‌তে। এতে বেশী আমোদ পাওয়া যায়।……টাকার জন্যে আমি মূর্ত্তি গড়ি না। শিল্পকর্ম্মের ভিতরে যখনি টাকা-পয়সার কথা ওঠে, তখনি আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। ইচ্ছা করলেই আমি অগাধ অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে পারি, কিন্তু তেমন ইচ্ছা আমার কখনো হয় না। আমি যখন নিজের মনের খুসিতে কাজে লেগে যাই, তখন আনন্দও পাই, কাজও ভাল হয়। কিন্তু যখন কারও ফর্‌মাস-মত পয়সার জন্যে কাজ কর্‌তে বসি, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌তে থাকে,—আমার খালি ভয় হতে থাকে যে, হয়ত আমার কাজ খরিদ্দারের মনে ধরবে না।"

কাথেলীন স্কট অনেক নামজাদা লোকের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়াছেন; যেমন, ম্যাক্স বীর-ভোম্, জন গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, স্যর ক্লেমেণ্টস্ মার্কহাম্, ডাঃ ন্যান্‌সেন্, শি, এস্, রল্‌স্, মিঃ অ্যাস্‌কুইথ্ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে শি, এস্, রল্‌সের প্রতিমূর্ত্তিটি বিশেষরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বর্গীয় শি, এস্, রল্‌স্ বিলাতের বিখ্যাত পুষ্পক-রথ-সারথি। পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে 'ইংলিশ প্রণালী' পার হইয়াছিলেন। রসজ্ঞ শিল্পী মূর্ত্তিটিকে এমনি লঘু



মাতৃত্ব

দাঁড়াইয়া থাকিলেও মনে হয়, তাহা যেন অনায়াসেই শূন্যে উড়িয়া যাইতে পারে!

তাঁহার গঠিত "শৈশব", "যৌবন" ও "আনন্দের" প্রতিমূর্ত্তিও অপূর্ব্বসুন্দর; এবং কঠিন পাষাণেও পেলব জীবনের এমন উচ্ছাস ও আভাস দেখিলে দর্শকমাত্রকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

আমরা এখানে কাথেলীন স্কটের "মাতৃত্বে"র প্রতিমূর্ত্তি দিলাম। কাথেলীনের উপরে রোঁদার প্রভাব যে কতটা বেশী, এই মূর্ত্তিটি দেখিলে তাহা বুঝা যায়। দুগ্ধরূপে মা তাঁর বুকের রক্ত প্রাণের দুলালকে দান করিতেছেন; জননীর নিমীলিত স্নেহ-দৃষ্টি পুত্রের উপর আনত। "মাতৃত্ব" ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না,—ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সকলেরই বোধগম্য।

Nash's Magazine হইতে

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

নব্য ইতালীর কবি

নব্য ইতালীর নূতন কবি দান্নুন্‌সিয়োর (Gabriele D' Annunzio) নাম আমাদের অনেকের নিকট অপরিচিত; কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষা ইতালীয় সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তিনিই নব্য ইতালীর জাতীয় কবি এবং এই

বিরাট য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় তাঁহার বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "Song of the Dardanelles" ইতালীর নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এবং পথে পথে নর-নারীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত ও গীত হইতেছে।

দান্নুন্‌সিয়োর বয়স এখন পঞ্চাশ বৎসর মাত্র। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আব্রুজি প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রৌদ্রস্নাত উন্মুক্ত দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়—প্রকৃতির এই নগ্ন সৌন্দর্য্য যে তাঁহার বাল্যজীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মধুর আঙ্গুর-কুঞ্জের সৌন্দর্য্য-শ্রী ফুলের মত তাঁহার হৃদয়ে মুকুলিত হইয়া এবং যথাকালে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ইতালীয় সাহিত্যকে বৈচিত্রে ও মাধুর্য্যে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে। ষোল বৎসর বয়সে যখন তিনি টাস্কানিতে শেষ বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তিনি Primo Vere" নামক এক কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কাব্যপাঠে ইতালীর বিখ্যাত সমালোচক Giuseppe Chiarini এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনি নবীন কবির কবিতাসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া উদীয়মান সাহিত্যিককে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। প্রতিভার প্রধান ধর্ম্ম, মৌলিকতা। দান্নুন্‌সিয়োও পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্বষ্ট এই অভিনব সাহিত্য তাঁহাকে চির- যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করেন, তখন ইতালীর অনেক দিনের তন্দ্রা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, এবং ইতালীয় সাহিত্য-শিল্পের ভিতরে জাগরণের চেতনা ফুটিয়া উঠিতেছিল। দান্নুন্‌সিয়ো এই জাগরণের বার্ত্তাঘোষণা করিবার ভার লইলেন। কিন্তু এখানেও সেই পুরাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না—সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার অনেক শত্রুসৃষ্টি হইল। তাঁহার নূতন প্রণালী পুরাতন-পন্থীদিগকে আঘাতদান করিল। এমন-কি, তাঁহার সাহিত্য-গুরু Chiarinio তাঁহাকে অশ্লীলতা-দোষে অপরাধী করিয়া তাঁহার কলঙ্কিত লেখনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন!

এদিকে কেবলমাত্র নিছক সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা দিনাতিপাত করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। উদর-পোষণের জন্য তিনি সংবাদপত্রের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন, এবং 'Tribuna' পত্রে 'Duca Minimo' ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নাটক প্রভৃতি রচনা দ্বারা সংবাদপত্রের লেখনীর মধ্য দিয়াও যে প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টি কতটা করা যায়, সকলকেই তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, ফ্রান্সের আঁতো ফ্রানস্।

এইবার দান্নুন্‌সিয়োর সাধনার কথা। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে মনে হয় যে, তিনি একজন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কবি; বস্তুত, তাঁহার লেখাকে Physical passion হইতে বিচ্ছিন্ন করা

জনিত সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় আছে। তবে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি যেরূপ আন্তরিকতার সহিত পৃথিবীর সৌন্দর্য্য, দুঃখ ও নৃশংসতাকে অনুভব করিতে পারিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর অন্য কোন লেখক তাহা পারেন নাই। তিনি যেমন পরিপূর্ণভাবে, মেঘ-রৌদ্রের খেলা, সুমিষ্ট আঙ্গুরের আঘ্রাণ, তরুণীর এলায়িত বেণীর সুষমা এবং ঘনকৃষ্ণ মেঘের শ্রী-ছাঁদ অনুভব করিতে পারেন—তেমন অপরের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতির এই বিচিত্র শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ তাঁহার লেখনীর মুখে মধুঝরণার সৃষ্টি করিয়াছে।

দান্নুন্‌সিয়োর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তাঁহার রচনা দুর্নীতির নির্ঝর। তিনি যেরূপ ভাবে Sexual relation বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তাহা দর্শন করিলে ইবসেন কিম্বা ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের শিষ্যেরাও হয়ত চমকিয়া উঠিবেন। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসই স্ত্রী-পুরুষের বিরহ-মিলন লইয়া রচিত।

দান্নুন্‌সিয়োর একজন ইংরাজভক্ত এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সাফাই দিয়াছেন:—"বেশত,—পৃথিবীতে কোন্ জিনিসই বা দুর্নীতি নয়—এই প্রকৃতিটাই ত' একটা মস্ত দুর্নীতির খেলা! জন্মটাও কত বড় কামুকতার ব্যাপার!"

"Birth is a grossly sexual thing!" এত বড় কথার পরেও আমাদের নীতিবাগীশ সাহিত্যিকেরা যে দান্নুন্‌সিয়োকে আমোল দিবেন; তাত মনে হয় না! এমন-কি, ইংলণ্ডেও তিনি বেশী শিষ্যলাভ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক, যিনি সৌন্দর্য্যের পূজারী, তাঁহার নিকট এই ইতালীয় কবির কাব্য পরম উপভোগ্য।

ইতালীতে কেবল কবি বলিয়া নহে, স্বদেশ-প্রেমিকরূপেও দান্নুন্‌সিয়োর স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার বিশ্বাস, প্রাচীন গৌরব ইতালীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তিনি বলেন, এই প্রাচীন গৌরব ইতালীর গলায় ভারী পাথরের মত ঝুলিতেছে। আর ইতালী কি কেবল য়ুরোপ ও আমেরিকার ক্রীড়া ও ভ্রমণ-ক্ষেত্র হইয়াই থাকিবে? ইতালীর কি কোন উচ্চতর আদর্শ নাই?

তিনি সেদিন উচ্চকণ্ঠে মুক্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, "না, আমার ইতালী আর বিদেশীর জন্য যাদুঘর হইয়া থাকিবে না—জাগিয়া উঠুক্ রোমের সমস্ত শক্তি! বিদেশীর ক্রীড়াকুঞ্জ সে ভাঙ্গিয়া চুরমার্ করিয়া দিক্!

"ভিনিসের খালে খালে ঐ যে আমোদ আকুল নরনারীদের বহন করিয়া প্রমোদ-তরণীগুলা ভাসিয়া যাইতেছে, পুড়াইয়া দাও—উহাদিগকে পুড়াইয়া দাও!"

নব্য ইতালীর কবি দান্নুন্‌সিয়ো যে মহিমময়ী নূতন বাণী প্রচার করিতেছেন, ইতালীকে একদিন তাহা গৌরবের তুঙ্গ শিখরে অগ্রসর করিয়া দিবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

বিনয়-পরিচয় *

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বলাভের পর যত দিন তাঁহার ধর্ম্ম লোকমধ্যে প্রচারিত হইয়া বেশ একটু প্রসার লাভ করিতে সমর্থ না হইয়াছে, তত দিন তিনি নিজের অধিগত তত্ত্ব বা সাধ্য-সাধন বুঝাইতে ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করিতেন, বিনয়ের কথা বা ঐ শব্দ তখন তাঁহার নিকট শুনিতে পাওয়া যাইত না। বোধিলাভের পর তিনি অজপালনামক-তরুতলে বসিয়া ভাবিতেছেন (মহা.১-৫-২), তিনি যে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, (১) তাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ ও দুর্ব্বোধ। সংসারাসক্ত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিবে না। তিনি ধর্ম্ম উপদেশ করিতে পারেন, (২) কিন্তু বুঝিবে কে? ইহার পর ব্রহ্মার সহিত তাঁহার কথোপকথনে (মহা.১-৫), আড়ার কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রকে উপদেশদানে (১-৬), এবং পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ হইতে আরম্ভ করিয়া (১-৬-১৪) যশের আত্মীয়বর্গকে উপসম্পদা দান পর্য্যন্ত (১-১০) সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখে ধর্ম্মেরই কথা শুনা যায়, বিনয়ের কথা তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

শনৈঃ-শনৈঃ দুই-চারিজন করিয়া লোক তাঁহার নব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা ৬১ জন পর্য্যন্ত হইয়াছে (১-১০-৪), তিনি ইহার বহুল প্রচারের জন্য বলিতেছেন (১-১১-১)—"ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহু-জনের সুখের জন্য তোমরা ভ্রমণ কর। একসঙ্গে দুই জন যাইও না। তোমরা আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ ও অন্তকল্যাণ ধর্ম্ম উপদেশ কর।" ভিক্ষুগণ এই আদেশ লাভ করিয়া নানাদিকে নানা জনপদে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন, এবং বহু-বহু লোকে আকৃষ্ট হইয়া এই নব ধর্ম্মে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। ভিক্ষুগণ চারিদিকে দূর-দূরতর স্থান হইতে দলে-দলে এই সমস্ত লোককে বুদ্ধদেবের নিকট লইয়া আসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে এইরূপে বহুলোকের একটি দল সৃষ্ট হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে তিনি নিজেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিতেন, কিন্তু তখন দেখিলেন একাকী তাঁহার দ্বারা ইহা হওয়া কঠিন। তিনি বহুদিকে বহু অসুবিধা বুঝিতে পারিলেন। দূর-দূরতর স্থান হইতে ধর্ম্মার্থী লোকসমূহের তাঁহার নিকটে আসা কষ্টকর, আবার ভিক্ষুগণেরও তাহাদিগকে তাঁহার নিকটে আনা কষ্টকর (১-১২-২)।

---

* বিনয়পিটকের (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয়ই) প্রাতিমোক্ষ প্রবন্ধকার-কৃত অনুবাদ ও সুবৃহৎ টীকার সহিত অচিরে প্রকাশিত হইবে, এই প্রবন্ধটি তাহারই ভূমিকার একাংশ।

তিনি ইহা আলোচনা করিয়া ভিক্ষুগণেরও উপর প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবার ভার অর্পণ করিলেন। ভিক্ষুগণ এতদিন কেবল নিজেরই ভার বহন করিতেছিলেন, এখন হইতে তাঁহাদিগকে অন্যেরও ভার গ্রহণ করিতে হইল। পূর্ব্বে ধর্ম্মসাধনায় কেবল বুদ্ধ ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত, এখন হইতে ভিক্ষুগণ অর্থাৎ সঙ্ঘেরও আশ্রয় গ্রহণ করা আরম্ভ হইল। (৩) সঙ্ঘের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভিক্ষুগণ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন না; তিনিও নানাস্থানে স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া মগধ-জনপদের এত লোক তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল যে, সেখানকার অধিবাসীরা হতাশ হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল (মহা. ১-২৪-৫)—'শ্রমণ গৌতম স্ত্রীলোকদের বৈধব্যসাধনের জন্য, অপুত্রতার জন্য, বংশোচ্ছেদের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন!' ভিক্ষুর সংখ্যা যখন এইরূপ বাড়িয়া উঠিল; উত্তম-অধম যোগ্য-অযোগ্য, অধিকারী-অনধিকারী সকলেই যখন নির্ব্বিশেষে দলে-দলে সঙ্ঘমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন, বলা বাহুল্য, নৈসর্গিক নিয়মেই—মানবের স্বাভাবিক ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষ-বশতই এই ভিক্ষুদলের মধ্যে নানাবিধ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম নবপ্রবিষ্টগণকে শিক্ষা উপদেশ দিবার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কিরূপ ভাবে কি করিতে হইবে, না-হইবে, তাহারা ঠিক করিতে পারিত না; নানাস্থানে নানা-রূপ অকার্য্য করিয়া ফেলিত। গৃহিগণ এই সমস্ত দেখিয়া বিরক্ত হইতে লাগিল, এবং বুদ্ধদেবকে ইহার উপায় চিন্তা করিতে হইল। তিনি উপাধ্যায়ের ব্যবস্থা করিলেন (১-২৫-৬)—"ভিক্ষুগণ, আমি উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি ("অনুজানামি ভিক্‌খবে উপজ্ঝায়ং")। এইস্থানেই সর্ব্ব-প্রথমে বিনয়ের সূত্রপাত হইল। তিনি উপাধ্যায়ের বিধান করিয়া বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় নিজের সহচর ("সদ্ধি-বিহারিক") ভিক্ষুকে পুত্রের মত দেখিবেন, এবং সহচরও উপাধ্যায়কে পিতার মত দেখিবেন। তাহা হইলেই তাঁহারা এই ধর্ম্ম-বিনয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপুষ্ট হইতে পারিবেন। (৪) তিনি পূর্ব্বে ধর্ম্মেরই কথা বলিতেন, এখন হইতে ধর্ম্ম ও বিনয় উভয়কেই একত্র বলিতে

৩। এই জন্যই দেখা যায় (১-৪-৫) উপাসকও হইতে হইলে পূর্ব্বে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত—"এতে বয়ং ভন্তে ভগবন্তং সরণং গচ্ছাম ধম্মং চ,...তেব লোকে পঠমং উপাসকা অহেসুং দ্বে বাচিকা।" কিন্তু পরে সঙ্ঘেরও আশ্রয় প্রচলিত হইল। পূর্ব্বে "স্বাক্‌খাতো ধম্মো, চর ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুক্‌খস্‌স অন্ত কিরিয়ায়" (১-৬-৩২, ৩৪, ৩৭, ইত্যাদি)—এই মাত্র বলিয়াই ভগবান্ উপসম্পদা প্রদান করিতেন' কিন্তু পরে (১-১২-৪) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি"—ইহাই তিনবার পাঠ করাইয়া উপসম্পদা দান বিহিত হইল।

আরম্ভ করিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাই বলিয়াছেন। (৫)

দেশ-দেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচারের বৃদ্ধির সহিত সঙ্ঘও ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বে যেরূপ সূচিত হইয়াছে, এই সঙ্ঘমধ্যে আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই নানা-বিধ বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নানা-রূপ অ না চা র দেখা যাইতে লাগিল। (৬) যথোচিত নিয়মের মধ্যে আনিয়া সংযত করিতে না পারিলে, এই সঙ্ঘকে সৎপথে পরিচালিত করা অসম্ভব দেখিয়া বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণের শীল-অর্থাৎ স্বভাব-সম্বন্ধে, শরীর ও বাক্যের সংযম-সম্বন্ধে শিক্ষার (৭) বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি নানারূপ আজ্ঞার প্রচার (৮) ও নানারূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষুগণের এক-একটি অন্যায় কার্য্য ও অসদাচরণের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিতে লাগিল, আর তিনিও তাহার প্রতিকারের জন্য এক-একটি নিয়ম করিয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক ভবিষ্যতে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। আবার তাহাদের কোন অভাব-অভিযোগ বা অসুখ-অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তিনি অবিলম্বে তাহা অপনয়ন করিবার জন্য নূতন-নূতন নিয়ম বিধান করিতেন। আবশ্যক হইলে তাহাদের কল্যাণের জন্য পূর্ব্ববিহিত কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে তাহার স্থানে নূতন নিয়ম উদ্ভাবন করিতে হইত, অথবা তাহাতেই আর কিছু যোগ করিতে হইত, কিংবা তাহার প্রতিপ্রসব করিতে হইত। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের পর হইতেই বহুদিন যাবৎ তাঁহাকে এই বিধি-নিষেধ লইয়াই কাটাইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত বিধি-নিষেধের সংখ্যা এত অত্যধিক, এবং ইহাদের কোনো-কোনটি এতই যৎ-সামান্য ও অনাবশ্যক বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব এই সকল লইয়া তাঁহার অমূল্য সময় ব্যর্থ নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব। বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত শীলবিষয়ক এই সকল বিধি-নিষেধই বি ন য় নামে প্রসিদ্ধ। (৯)

৫। "ইমস্মিং ধ ম্ম বি ন য়ে আকঙ্খতি পব্বজ্জং" (দীঘ.১৬-৫-২৮)। এইরূপ অনেক। বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ-সময়ে বলিতেছেন (দীঘ.১৬-৬-১)—"যো বো আনন্দ ময়া ধ ম্মো চ বি ন য়ো চ দেসিতো।" এই ধর্ম্ম ও বিনয় একত্র শা স ন (উপদেশ) নামে অভিহিত হইয়া থাকে (মহা.১০-৫);—"এসো ধম্মো এসো বিনয়ো এতং সত্থু সা স নং।"

৬। "অ না চা রং আ চ র তি।"—মহা.১-২৯-১; ভিক্ষুবিভঙ্গ, সঙ্ঘা, ২২-১। এইরূপ বহু স্থানে। "বি বি ধ ম্পি অ না চা রং আ চ র ন্তি।"—ভিক্ষুবিভঙ্গ, সঙ্ঘা ১৩-১-২। বিবিধ অনাচারটা কিরূপ তাহাও এইস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৭। "অধিসীলসিক্খা" (অধিশীলশিক্ষা); "বিনয়নতো কায়বাচানং।"

৮। "আণাদেসনা" (আজ্ঞাদেশনা)।

৯। প্রাচীন আচার্য্যগণ বি ন য় শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

"বিবিধ-বিসেস-নয়ত্তা বিনয়নতো চ কায়বাচানং।

বুদ্ধদেব প্রথমত নিজের ধ র্ম্ম ই প্রচার করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত ধর্ম্ম-তত্ত্বকে,—সাধ্য-সাধনকে চারিটি সহজ কথায় বলিতেন। তিনি ইহাদের নাম দিয়াছিলেন আ র্য্য স ত্য। তিনি বলিতেন, ১। দুঃখ আছে, ২। দুঃখের কারণ আছে, ৩। দুঃখের ধ্বংস আছে, এবং ৪। দুঃখধ্বংসের উপায়ও আছে। দুঃখধ্বংসের উপায় (১-৬-২২) "সম্যগ্‌দর্শন" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গ পথ (আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ)। লোকেরা ইহা শুনিল ও গ্রহণ করিল। তাহারা বুঝিল দুঃখধ্বংসই লক্ষ্য বা সাধ্য। এবং তাহার উপায় বা সাধন হইতেছে ঐ অষ্টাঙ্গ পথ। বলিবার বা বুঝিবার আর-কিছু বাকী থাকিল না, ধর্ম্মের প্রচার ও গ্রহণ চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহা অতি-স্বাভাবিক যে, অনেক সময়ে কেবল সাধ্য-সাধনেরই উপদেশে কাজ হয় না, হইতেও পারে না; সাধনেরও সাধন উপদেশ করিতে হয়। পিপাসার উপশমের জন্য জলের উপদেশ করিয়া কখনো-কখনো কোনো-কোনো লোককে কোথা হইতে কিরূপে কিসের দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতে হয়; সাধনেরও সাধন বলিতে হয়। বুদ্ধদেবকেও ইহা করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথমে ধ র্ম্ম অর্থাৎ মূলভূত সাধ্য-সাধন নির্দ্দেশ করিয়া অবান্তর সাধনস্বরূপ উল্লিখিত বিধি-নিষেধাত্মক বি ন য় বিধান করিয়াছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, চক্রের অভাবে যেমন রথ চলিতে পারে না, সেইরূপ বিনয়ের অভাবে তাঁহার ধর্ম্মও চলিতে পারে না। এইজন্যই পরিনির্ব্বাণ-সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন (মহাপ.৬-১)—"আনন্দ, তোমাদের মনে হইতে পারে যে, 'আমাদের প্রবচনের (উপদেশের) শাসক (উপদেশক) চলিয়া গেলেন, আমাদের আর শাসক কেহ নাই।' আনন্দ, এরূপ মনে করিও না; আমি যে, তোমাদিগকে ধ র্ম্ম ও বি ন য়ে র উপদেশ করিয়াছি, বুঝাইয়া দিয়াছি, আমার অভাবে তাহাই তোমাদের শাসক হইবে।" (১০) ধ র্ম্মে র জন্য যে, বি ন য় চাই-ই চাই, ইহা তিনি গভীরভাবে বুঝাইবার জন্য পুনঃপুনঃ পুনঃপুনঃ ঐ শব্দ দুইটিকে একত্র প্রয়োগ করিতেন; এবং সর্ব্বত্রই

ইহার অর্থ:—যেহেতু ইহাতে বিবিধ নয় (=নীতি) ও বিশেষ নয় আছে, এবং যেহেতু ইহা কায় ও বাক্যের (অত্যাচার অর্থাৎ অসংযমকে) অপনয়ন করে, সেই জন্য বিনয়বিদ্‌গণ ইহাকে বি ন য় বলিয়া থাকেন। বিবিধ নয়=পঞ্চবিধ প্রতিমোক্ষপাঠ, পারাজিকাদি সপ্তবিধ দোষসমূহ, মূল প্রতিমোক্ষ ও বিভঙ্গাদি। বিশেষ নয় ঐ সকল নয়েরই আবশ্যকস্থলে দৃঢ়ীকরণ, শিথিলীকরণ, ইত্যাদি।

১০। "যো বো আনন্দ, ময়া ধ ম্মো চ বি ন য়ো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চয়েন সত্থা।" ইহা দ্বারা শাস্ত্রনিষ্ঠাই উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেব আর এক স্থানে (দীঘ.১৬-১-৬; =মহাপ.২-৭৭) অপরিহার্য্য ধর্ম্মের মধ্যে এই কথাটি খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—"ভিক্ষুগণ, আমি যাহা বিধান করি নাই, যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ তাহা বিধান করিবে না; বা যাহা আমি বিধান করিয়াছি, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা তাহার সমুচ্ছেদ করিবে না; এবং আমি যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তৎসমুদয়ই অবলম্বন করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা চলিবে, হে ভিক্ষুগণ,

ধ র্ম্ম শব্দকে প্রথমে ও বি ন য় শব্দকে তাহার অব্যবহিত পরে প্রয়োগ করিতেন।" (১১) এইরূপ গৌরব দেখিয়াই তাঁহার শিষ্যগণ মহাধর্ম্মসঙ্গীতির সময়ে প্রথমে বি ন য় আবৃত্তি করিয়া পরে ধ র্ম্ম আবৃত্তি করেন (চুল্ল-১১-১-৬, ৮)। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন বি ন য় ঠিক ভাবে থাকিলে ধ র্ম্ম ও ঠিক ভাবে থাকিবে, অন্যথা ধর্ম্ম টিকিতে পারে না। সেই জন্যই বুদ্ধঘোষের সমন্তপাসাদিকায় (২৮৯ পৃ) প্রথম ধর্ম্মমহাসঙ্গীতির বিবরণে উক্ত হইয়াছে, মহাকাশ্যপ যখন সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রথমে ধ র্ম্ম বা বি ন য় আবৃত্তি করা যাইবে, তখন ভিক্ষুগণ উত্তর করিয়াছিলেন—"বি ন য় ই বুদ্ধশাসনের আয়ু, বি ন য় থাকিলেই শাসন থাকিবে, অতএব আমরা প্রথমে বি ন য় ই আবৃত্তি করিব।" (১২) দেখা যায় বিনয়ই নির্ব্বাণলাভের প্রথম সোপান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (১৩)

সমগ্র বুদ্ধবচনের একই তাৎপর্য্য ('বিমুত্তিরস') হইলেও এইরূপে তাহা স্পষ্টত দুইভাগে বিভক্ত হইল, ধ র্ম্ম ও বি ন য়। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণলাভের পরেই রাজগৃহের ধর্ম্মমহাসঙ্গীতিতে সমবেত ভিক্ষুগণ পরিস্ফুটভাবে এই দুই ভাগেই সমগ্র বুদ্ধবচনকে যথাক্রমে উপালি ও আনন্দের নিকট জিজ্ঞাসা করেন (চুল্ল.১১-১-৭-৮)। পরে,—বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অনেক পরে, তাঁহার চিন্তাশীল শিষ্যবর্গ ধর্ম্মেরই অংশবিশেষ, অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তার অনুকূল বিষয়সমূহকে অবলম্বন করিয়া একটি নূতন তত্ত্বের, নূতন সাহিত্যের উদ্ভাবন করেন, ইহার নাম হইল অ ভি ধ র্ম্ম। (১৪) এবং বুদ্ধবচনের যে অংশ পূর্ব্বে ধ র্ম্ম নামে

কতকগুলি ভিক্ষু কিরূপ দুর্গতিপ্রাপ্ত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল, বিনয়ে (সুত্তবিভঙ্গ, পারা.১-৭) তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণও এই শাস্ত্রনিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন (১৬-২৩,২৪):—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।"

১১। "ইমস্মিং ধ ম্ম বি ন য়ে আকঙ্খতি পব্বজ্জং",—মহাপ ১-৩৮-১। এইরূপ শতশত বাক্য আছে। তাঁহার পরেও বৌদ্ধসাহিত্যে এই শব্দযুগল এইরূপ ভাবেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

১২। "বি ন য়ো নাম বুদ্ধসাসনস্স আয়ু, বি ন য়ে ঠিতে সাসনং ঠিতং হোতি, তস্মা পঠমং বি ন য়ং সংগায়াম। বুদ্ধঘোষের অন্যান্য অর্থকথাতেও ইহা উক্ত হইয়াছে (দ্রঃ—সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১০ পৃ)।

১৩। "বি ন য়ো সংবরত্থায়, সংবরো অবিপ্পটিসারত্থায়......বিমুত্তি ঞাণ দস্সনং অনুপাদপরিনিব্বানত্থায়।"

১৪। অ ভি ধ র্ম্ম=অ ধি ধ র্ম্ম (তুলঃ—"অভিসমাচারিকায় সিক্খায় সিক্খাপেতুং, অভি ব্রহ্মচারিকায় সিক্খায় সিক্খাপেতুং, অ ভি ধ ম্মে বিনেতুং, অ ভি বি ন য়ে বিনেতুং"—(মহা.১-৩৬-১২), অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক। ধ র্ম্ম শব্দ এখানে ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব অংশে প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় অ ভি ধ র্ম্মে র কোনো কথাই ছিল না, তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। চুল্লবগ্গে বর্ণিত প্রথম (রাজগৃহের) ও দ্বিতীয় (বৈশালীর) ধর্ম্মমহাসঙ্গীতিতে ইহার কোনো উল্লেখ নাই; কেবল ধ র্ম্ম ও বি ন য়ে র কথা আছে। বুদ্ধঘোষের অর্থকথাগুলিতে ধর্ম্মমহাসঙ্গীতির বিবরণসমূহে অ ভি ধ র্ম্মে র ও পাঠের কথা আছে, কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী সংযোগ ভিন্ন

প্রচলিত ছিল, পরে তাহাই সূত্র বা সূত্রান্ত নামে কথিত হইতে লাগিল। অবশিষ্ট বিনয় অংশ সেই নামেই চলিতে থাকিল। ক্রমশ এই তিন অংশ পৃথক্ পৃথক্ তিন ভাগে সঙ্কলিত ও লিখিত হইল, এবং এক-একটি পৃথক্-পৃথক্ পিটকে (অর্থাৎ পেটী বা ঝাঁপিতে) রক্ষিত হওয়ায় কালক্রমে আধার ও আধেয়ের অভেদ-ব্যবহারে (১৫) প্রত্যেক অংশই এক-একটি পিটক নামে অভিহিত হইতে লাগিল। ইহা হইতেই তিনটির সাধারণ নাম হইল ত্রিপিটক। এই তিন পিটকে প্রধানত তিনটি বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে; শীলবিষয়ক (১৬) শিক্ষা বিনয়ে, চিত্তবিষয়ক শিক্ষা সূত্রে, (১৭) এবং প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষা অভিধর্ম্মে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

স্রোতের ফুল

(৩৯)

এই ঘটনার পর মালতীর মন অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল, না জানি কখন প্রেমানন্দ আসিয়া তাহার নিভৃত বাসে উপদ্রব ঘটাইয়া তুলিবে। ঘরে এমন একটি খিল নাই যাহা রুদ্ধ করিয়া মালতী একটু আপনাকে অন্তরাল করিতে পারে। মালতী মনে করিল কপাট ভেজাইয়া তোরঙ্গ প্রভৃতি ভারি জিনিষ চাপাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে; কিন্তু দেখিল দরজাগুলি সমস্তই বাহির দিকে খোলে। ইহাতে তাহার মন এমনি ভয়চকিত হইয়া উঠিল যে তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল সকল দরজার ফাঁকে লুব্ধ দৃষ্টি পাতিয়া প্রেমানন্দ বুঝি তাহাকে দেখিতেছে; কোথাও একটু খুট করিয়া শব্দ হইলে, কাহারও পদশব্দ শুনিলেই সন্ত্রস্ত হইয়া সে চমকিয়া উঠে। মালতীর বিশ্রাম নিদ্রা

১৫। "ত্রিভুবন-বাসী জানে" এই অর্থে "ত্রিভুবন জানে" প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এখানে আধার ও আধেয়ের অভেদ ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতস্থলে বিনয় রাখিবার একটা পৃথক্ পিটক ছিল, এইরূপ সূত্র ও অভিধর্ম্মের ও পৃথক্-পৃথক্ পিটক ছিল। প্রথম-প্রথম সকলে বলিত "বিনয়ের পিটক," "সূত্রের পিটক," "অভিধর্ম্মের পিটক"; তাহার পর অভেদে বিনয়পিটক ইত্যাদি ব্যবহার হয়। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিলে এইরূপই বলিতে হয়। তিনি পৌরাণিকগণের মতানুসারে (সুমঙ্গল ১৮—১৯ পৃ) বলেন—"তেন এবং দুবিধত্থেন পিটকসদ্দেন সহ সমাসং কত্বা বিনয়ো চ সো পিটকঞ্চ পরিয়ত্তিভাবতো তস্স অত্থস্স ভাজনতো চাতি বিনয়পিটকং।" বস্তুত, কর্ম্মধারয় সমাস না করিয়া বিনয়ের পিটক, বিনয়পিটক, এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলেই হইতে পারে।

১৬। শীল=স্বভাব (অভিধান. ১৭৮, ১০৯১), সংযম (ঐ, ৪৩০)।

একেবারে বন্ধ হইয়া গেল; সে আপনাকে লইয়া একটু নিরালা বসিয়া ভাবিবারও সময় পায় না।

কিন্তু চার পাঁচ দিন মালতী গুরুর দর্শন পর্য্যন্ত পাইল না; তিনি সর্ব্বদা নিজের ঘরটিতে বসিয়া পূজা পাঠে অত্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া উঠিয়াছেন।

হঠাৎ একদিন প্রভাতে প্রেমানন্দ বিপিন ও মালতীকে ডাকাইয়া আনিলেন। গুরুর আহ্বান শুনিয়া মালতীর মন ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠিয়াছিল; সে শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, সেখানে আর কে আছেন?

শান্তি বলিল—যোগানন্দ আর আমি ছিলাম; যোগানন্দ স্বরূপানন্দকে ডাকতে গেছেন, আমি তোমায় ডাকতে এসেছি।

মালতী যখন দেখিল যে বিপিনেরও ডাক পড়িয়াছে, তখন সে নির্ভয়ে গুরুর গৃহের অভিমুখে শান্তির সঙ্গে যাত্রা করিল।

প্রেমানন্দ বলিতেছেন—দেখ বিপিন বাবু, আমি ভেবে দেখলুম এ আশ্রমে তোমাদের থাকা কল্যাণের হবে না। তুমি মালতীকে নিয়ে সংসারাশ্রমেই ফিরে যাও...

কথাটা মালতীর কানে গেল। মালতী আসিয়া কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া প্রেমানন্দকে প্রণাম করিয়া এক পাশে উৎসুক হইয়া বসিল।

বিপিন একবার অপাঙ্গে মালতীর দিকে চাহিয়া গুরুকে বলিল—আমাকে এমন কঠোর আদেশ করছেন কোন্ অপরাধে? সংসারে আমার কোথাও ঠাঁই নেই দেখে আমি আপনার চরণে আশ্রয় নিয়েছি—আমার কি কোথাও আশ্রয় নেই?

নিরুপায় ভাবপ্রবণ বিপিনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

প্রেমানন্দ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন; আর একটি কথাও তিনি বলিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া মালতী হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। তখন বিপিনও গুরুকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রেমানন্দ দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখ বিপিন, তোমার মনে বৈরাগ্য এসে থাকলেও মালতীর মন বড় তরল আছে; এ আশ্রমে আর থাকা কল্যাণের হচ্ছে না! তুমি তাকে অন্যত্র রাখবার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

বিপিন মালতীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে নিশ্চয় আশ্রম-প্রতিকূল এমন আচরণ কিছু করিয়াছে যাহার জন্য গুরু তাহাকে আশ্রমে রাখিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিপিন হনহন করিয়া গিয়া মালতীর ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিল—মালতী!

আশ্রমে আসিয়া অবধি বিপিন একটি বারও মালতীর নিকটে আসে নাই, কথা বলে নাই। আজ তাহাকে ডাকিতে শুনিয়া মালতীর আনন্দ-সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল, হৃদয় শতদল বিকশিত হইয়া উঠিল,—তবে বুঝিবা গুরুদেবের অনুরোধে সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিপিন তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে! মালতী তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া লজ্জিত স্মিতমুখে বিপিনির মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল।

বিপিনের মনের সমস্ত উগ্রতা নিমেষে

মিলাইয়া গেল। তাহারও অন্তরে সুখের প্রলোভন উঁকি মারিতে লাগিল। বিপিন আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; সে মালতীকে কিছুই না বলিয়া ফিরিয়া চলিল।

মালতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আপনি আমাকে কি বলছিলেন?

কুণ্ঠিত বিপিন একবার মালতীর দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তুমি কি আশ্রমের নিয়ম পালন কর না?

মালতীর অত্যন্ত রাগ হইল—প্রেমানন্দ নিশ্চয় বিপিনের কাছে তাহার নামে নালিশ করিয়াছে। মালতী উগ্রস্বরে বলিল—না।

—কেন?

—কেন? জানিনে কেন।—বলিয়াই মালতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বিপিন দেখিল মালতী মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া খাটের বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। বিপিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

(৪০)

বিপিন নীচে নামিয়াই দেখিল দুগ্রহের মতো তারক দাঁড়াইয়া আছে। বিপিনকে দেখিয়াই তারক তাহার বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—কি হে সৌখীন সন্ন্যাসী, অপি তপো বর্দ্ধতে? কিংবা—

> অপি প্রসন্নেন মহর্ষিণা ত্বং
> সম্যগ্-বিনীয়ানুমতো গৃহায়?
> কালোহয়ং সংক্রমিতুং দ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশের জোগাড় ত গাঁটছড়া বেঁধে ভায়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরছে। কেমন নয়?

বিপিন তাহাকে গ্রাহ্য মাত্র না করিয়া নিজের ঘরে গিয়া যোগবাশিষ্ঠ খুলিয়া পড়িতে বসিল—

এই যে চরাচর-চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য বিষয়,—এ সমস্তই অস্থির, ইহা আপদের মূল ও পাপের হেতু। বিষয়-সমূহের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা স্বীয় মানসিক কল্পনামাত্র।

শিরা-কঙ্কাল-গ্রন্থি-শালিনী মাংসপুত্তলী রমণীর যন্ত্রবৎ চঞ্চল অঙ্গসমূহে প্রকৃতপক্ষে শোভার সামগ্রী কি আছে? পুরুষ সংসার-পল্বলের মৎস্য, চিত্তকর্দ্দম তাহার বিহারক্ষেত্র, দুষ্টবাসনা সেই মৎস্য ধরিবার বঁড়িশ-সূত্র এবং রমণী সেই বঁড়িশস্থিত পিষ্টকপিণ্ড।

হে রাম! পণ্ডিতেরা বাসনা-ক্ষয়কেই মুক্তি এবং বিষয়বাসনার আতিশয্যকেই বন্ধন বলিয়া থাকেন।

যদ্দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় এবং পুনর্জন্ম-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর যাহা পরম শান্তির আস্পদ, তাহাই জীবনপদবাচ্য।

কিন্তু শাস্ত্র যাহাই বলুক, রমণীকে যতই কদর্য্য করিয়া চিত্রিত করুক, বিপিনের মনের মধ্যে মালতী কিছুতেই অসুন্দর হইতেছিল না, মালতীহীন জীবন তাহার নিকট জীবনপদবাচ্য বোধ হইতেছিল না। সদ্য সে মালতীকে কাঁদিতে দেখিয়া আসিয়াছে—সেই তাহার তপ্ত অশ্রুবিন্দুগুলি একে একে গলিয়া গলিয়া বিপিনেরই হৃদয়পাত্রে পড়িয়া মুক্তাময় বরমাল্যের আকারে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে ভাবিতেছিল ঐ উপরের ঘরেই মালতী

পারিত, এখনো পারে, কিন্তু এই সুখ সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে; এই জন্য বেদনার মধ্যেও ত্যাগের একটা গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল।

তথাপি শাস্ত্রের উপদেশ ও অনুশাসন এবং বৈরাগ্যের গর্ব্ব অগ্রাহ্য করিয়া তাহার চিত্ত কেবলই মালতীর দিকেই অভিসার করিতেছিল। তাহার এক একবার মনে হইতেছিল, এর চেয়ে মালতীকে বিবাহ করিয়া কেরানীগিরি করাও ভালো ছিল। নিঃসঙ্গ একাকী বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়িবার মতো মনের গঠন বিপিনের নহে।

বিপিন ভাবিতে লাগিল—মালতী আমার একটি প্রশ্নেই অমন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল কেন? তবে কি মালতী এখনো আমায় ভালো বাসে? এখনো কি তাহার মন আমার প্রতি তেমনি অনুরক্ত আছে? আমি তাহার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছি তাহা কি সে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে? আমি যেমন তাহার অভাবে দগ্ধ হইতেছি, উহার প্রাণেও কি তেমনিতর প্রণয়বহ্নি জ্বলিতেছে? হায় অভাগিনী! কেন তুমি নবকিশোরকে বিবাহ করিয়া তাহার কাছে থাকিলে না। তাহা হইলে আমার সাধনার বিঘ্ন ঘটাইয়া তোমার চিন্তা সর্ব্বদা আমায় ঘিরিয়া থাকিত না। আগে মনে করিয়াছিলাম মালতী কাছে থাকিলে নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মসাধন করিতে পারিব; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিতেছি তাহা ভ্রম; পরম প্রলোভনের সামগ্রী পার্শ্বে রাখিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে পারিবার মতো দৃঢ় চিত্ত আমার নয়, এ কথা স্বীকার

করিতে লজ্জা নাই। তার চেয়ে বরং মালতী নবকিশোরকে বিবাহ করিলে তাহাকে একেবারে আয়ত্তাতীত মনে করিয়া হয় ত ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু সত্যই তাহা পারিতাম কি? সে হয় ত আরো অসহ্য হইত। দূর হোক ছাই, এ সন্ন্যাসের পথে ধর্ম্মসাধন আমার কর্ম্ম নয়; আমি আজই গুরুজীকে বলি মালতীকে না পাইলে আমার ইহ-পরকাল দুই-ই নষ্ট হইয়া যাইবে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপিনের অন্তর মালতীর প্রতি অনুরাগে প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। সে তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুরুজীর সন্ধানে বহির্গত হইল।

সে গুরুর ঘরে গিয়া দেখিল গুরু একখানি আসনে শুদ্ধ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন।

বিপিন এতক্ষণ যে সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া আসিয়াছিল তাহা এখন গুরুর সম্মুখে আসিয়া শিথিল হইয়া পড়িল। সে এই মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচর্য্যকে কেমন করিয়া বলিবে যে সে আর পারিতেছে না, মালতীকে তাহার পত্নীরূপেই চাই। বিপিনের মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে অপ্রতিভ ভাবে ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আপনার ঘরে গিয়া গীতা খুলিয়া পাঠ করিতে বসিল—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদ্ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

আগামী মাঘীপূর্ণিমা হইতে নির্জ্জন-বাস আরম্ভ করিবে স্থির করিল। যে সন্ন্যাসী নির্জ্জনে জপ আরাধনা করিতে চায় তাহার জন্য আশ্রম-উদ্যানের চার কোণে চারটি গুহাগৃহ আছে; সে সেই গৃহে সংরুদ্ধ থাকে—আশ্রমের একজন নির্দ্দিষ্ট কেহ দিনান্তে তাহাকে কিছু পানীয় ও আহার্য্য দিয়া আসে। শীঘ্রই আশ্রমে রটিয়া গেল বিপিন নির্জ্জনে তপস্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিপিন নির্জ্জনবাস করিবে শুনিয়া মালতী ভীত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

(৪১)

আশ্রমের সকল শিষ্য ও শিষ্যারা লক্ষ্য করিতেছিল কয়েক দিন ধরিয়া গুরুর মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চঞ্চল হইয়া আছে; তিনি সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, দিনে ও রাত্রে অধিক সময়েই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া কাটাইতেছেন; থাকিয়া থাকিয়া উঠিয়া গিয়া ঠাকুরঘরে পূজায় বসেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার মুখে স্নিগ্ধ হাসি লাগিয়াই থাকে না; সমবেত শিষ্যদের মিষ্ট কথায় উপদেশ দ্যান না; শিষ্যশিষ্যারা অভ্যাস ও নিয়ম-মত প্রাতে ও সন্ধ্যায় আসিয়া তাঁহার ঘরে সমবেত হইলে গুরু কেমন ব্যস্ত হইয়া পড়েন; কেহ কোনো প্রশ্ন করিলে নীরস বিরস ভাবে তাহার উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ হয়ত মাঝ-খানে থামিয়া অন্যমনস্ক হইয়া যান অথবা সেখান হইতে চঞ্চল হইয়া চলিয়া যান।

ইহা দেখিয়া ও বুঝিয়া শিষ্যশিষ্যারা আর তাঁহার কাছে কেহ আসিত না; সকলেই ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে রহিত। দু-চার-দিন পরে হঠাৎ এক সময় প্রেমানন্দ নিজেই সকল শিষ্য-শিষ্যাকে ডাকিয়া তাহা-দিগকে শাস্ত্র পড়িয়া শুনাইতে বসিতেন, কোনো দিন বা বৈষ্ণব পদাবলী কীর্ত্তন করিতেন, কিন্তু কোনো দিন তিনি মালতীকে ডাকিতেন না, মালতীও গুরুর মুখে বৈরাগ্যের উপদেশ শুনিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিল না।

মালতী বুঝিতে পারিতেছিল গুরু তাহাকে এড়াইয়া চলিতেই চাহিতেছেন। প্রেমানন্দের ঘর হইতে ঠাকুরঘরে বা নীচে যাইতে হইলে বা ঠাকুরঘর বা নীচে হইতে তাহার ঘরে আসিতে হইলে মালতীর ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়; মালতী দেখিত প্রেমানন্দ অভ্যাসের বশে সেই পথে যাইতে বা আসিতে গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া অন্য দিকের বারান্দা দিয়া ঘুরিয়া যাইতেন। মালতী বুঝিতেছিল যে গুরু হইয়া তিনি যে মালতীর গোপনতার মধ্যে একদিন উঁকি মারিতে গিয়াছিলেন এইজন্য তিনি লজ্জিত হইয়া মালতীর সম্মুখীন হইতেও পারিতেছিলেন না। মালতী ক্ষমা করিয়া নিজে তাঁহার সম্মুখে গিয়া যতদিন না তাঁহার মনের গ্লানি মার্জ্জনা করিয়া দিবে ততদিন তিনি আর মালতীর নিকটে সহজভাবে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। মালতীর কিন্তু প্রেমানন্দের এই লজ্জার দীনতা দূর করিবার বিশেষ কোনো আগ্রহ হইতেছিল না। প্রেমানন্দের ঘরের মজলিসে যোগ দিলে মাঝে মাঝে বিপিনকে দেখিতে পাইবে বলিয়া যাইবার প্রলোভন হইত, কিন্তু প্রেমানন্দের দৃষ্টির সম্মুখে বিপিনের সহিত মিলনও তাহার একটুও বাঞ্ছনীয় মনে হইত না।

বিপিনও এই সুযোগটি খুঁজিয়া গুরুর

মজলিসে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া হাজির হইত এবং মালতীকে দেখিতে না পাইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সকলের শেষে চলিয়া যাইত। তাহার দিন এক-একটা করিয়া বড় শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে মাঘী পূর্ণিমা হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নির্জ্জনবাস করিতে হইবে—কি পাথেয় কি সঞ্চয় লইয়া সে ঐ সুদীর্ঘ সময় বদ্ধ থাকিবে? তাহার আগে মালতীকে যদি সে একটিবারও ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে পারিত!

আজ মাঘী পূর্ণিমা। আজ চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপিনকে গুহায় রুদ্ধ হইতে হইবে। যুদ্ধযাত্রী ভীরু সৈনিকের ন্যায় যাইতে তাহার কিছুতেই মন চাহিতেছিল না, থাকিবারও তাহার আর জো নাই। বিপিন আজ ছটফট করিয়া বেড়াইতে-ছিল।

মালতীরও আজ দুঃখ যেন চরমে উঠিয়াছে। এতও তাহার অদৃষ্টে ছিল! যে বিপিনের কাছে-কাছে থাকিতে পাইবে বলিয়া সে সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়াছে, সেই বিপিন তাহাকে অসহায় কোথায় কাহার কাছে রাখিয়া নির্জ্জন গুহায় তপস্যা করিতে চলিল! এত বড় ধার্ম্মিক সে! এত বড় নিষ্ঠুর নির্ম্মম নির্দ্দয় পাষাণ সে! মালতী আপনার ঘরের চারিদিকের দরজা ভেজাইয়া দিয়া আপনার তোরঙ্গের গোপন তল হইতে বিপিনের একখানি ফটোগ্রাফ বাহির করিল; এই ছবিখানি সে মথুরাপুর হইতে আসিবার সময় বিপিনের ঘর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল; এখানি তাহার ধন! ইহার দিকে চাহিতেই তাহার অশ্রু-ধারা পাগল হইয়া ছুটিল। মালতী ফটো-গ্রাফখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুতে অন্ধ হইয়া ব্যথিত অন্তরে নীরবে আর্ত্তনাদ করিয়া লুন্ঠিত হইতে লাগিল—ওগো তুমি এত নিষ্ঠুর! এত নিষ্ঠুর!

মালতী ছবিখানিকে খাটের বিছানার উপর রাখিয়া তাহার সামনে মাথা কুটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছিল—ওগো তুমি কি এমনি কাগজে তৈরি—প্রাণহীন ভাবহীন দয়াহীন!

কখন্ গঙ্গার হাওয়া আসিয়া নিঃশব্দে মালতীর ঘরের বারান্দার দিককার কপাটটি আস্তে আস্তে খুলিয়া দিয়াছিল। মালতী মাথা নীচু করিয়া চোখ মুদিয়া অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আপনার গভীর বেদনার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, সে টের পায় নাই। ঠিক সেই সময় প্রেমানন্দ সেই পথ দিয়া ঠাকুর-ঘরে যাইতেছিলেন; মালতীর ঘরের সামনে আসিয়া থমকিয়া ফিরিতে যাইবেন; দেখিলেন মালতী বিপিনের ছবির পায়ে মাথা রাখিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

প্রেমানন্দ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিলেন; একবার ফিরিয়া গেলেন; আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া ছবিখানি হঠাৎ হাতে উঠাইয়া লইয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন—রাধারাণী, এ উত্তম!

শাবক চুরি করিতে গেলে বাঘিনী যেমন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে মালতী তেমনি করিয়া ধনুক-ছাড়া বাণের মতো প্রেমানন্দের উপর লাফাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া

প্রেমানন্দ মালতীর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও আবেগমত্ত আক্রমণে ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি একহাতে মালতীকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া একহাতে ছবিখানিকে পিছনে সরাইয়া ধরিয়া ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

মালতী চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার জিনিস আপনি দিয়ে যান বলছি।

মালতীর চোখ হইতে আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

গোলমাল শুনিয়া কয়েকজন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সেখানে ছুটিয়া আসিয়া জড়ো হইল—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার গুরুর দিকে একবার মালতীর দিকে চাহিল!

মালতী গর্জ্জন করিয়া প্রেমানন্দের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—এই চোরটাকে আপনারা গুরু বলে পূজো করেন!

সকলে অবাক হইয়া গুরুর দিকে চাহিল।

গুরু মালতীর দৃপ্ত মূর্ত্তির সম্মুখে একেবারে অপ্রতিভ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আজ যেন অপরাধী—বিচারকদের সম্মুখে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিপিনের ছবিখানি সকলকে দেখাইয়া বলিলেন—সন্ন্যাসিনী এইখানি বুকে করে বসে ছিলেন! চোর কে?

কি লজ্জা! কি লজ্জা! এত লোকের সামনে এমন করিয়া একজন স্ত্রীলোককে অপমান করিতে পারে—এমন কাপুরুষ বলিয়া মালতী ত একবারও প্রেমানন্দকে ভাবে নাই! কি লজ্জা! কি লজ্জা! একজন রাখিতে পারে এমন অঘটন ত এ আশ্রমে কখনো ঘটিতে সমবেত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা দেখে নাই! তাহারা সকলে মালতীর দিকে ঘৃণার দৃষ্টি হানিয়া অবাক হইয়া চলিয়া গেল। মালতী রৌদ্রদগ্ধ লতার মতন বিবর্ণ হইয়া সেইখানে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। প্রেমানন্দ বিপিনের ছবিখানি লইয়া নিজের ঘরে গিয়া লুকাইলেন।

বিপিন তখন গঙ্গায় স্নান করিয়া নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিয়া এক হাতে কমণ্ডলু ও একহাতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ লইয়া গুহায় অবরুদ্ধ হইতে যাইতেছিল। এমন সময় সন্ধ্যার বাতাস বিদীর্ণ করিয়া মালতীর আর্ত্ত কণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর!

বিপিনের রক্ত প্রতপ্ত হইয়া উঠিল, চরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া মালতীকে দুই বাহু দিয়া আগলাইয়া বলে—ভয় নাই তোমার, আমি আছি!

যোগানন্দ বলিল—গুরুভাই, এখন তোমার চিত্তবিক্ষেপ হওয়া উচিত নয়, তুমি গুহায় চল।

বিপিন একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

মালতী ছুটিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—আমাকে অসহায় ফেলে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি যাকে গুরু মনে করে পূজো করছেন সে একটা চোর!

বিপিনের মুখ শুকাইয়া ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে; সে শূন্য ভীত দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিয়া কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা

প্রেমানন্দ অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন—সন্ন্যাসিনী একজন পুরুষের ছবি বুকে করে কাঁদছিলেন; আমি কেড়ে নিয়েছি।

বিপিন যেন কতদিন আগে মরিয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহা তাহার শব।

মালতী তীব্রস্বরে বিপিনকে বলিল—বলুন আপনি আপনার গুরুকে, আমার জিনিস আমায় ফিরিয়ে দিতে।

বিপিনের রসশূন্য জিহ্বা কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—কার ছবি?

মালতীর মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিয়াছিল; এখন লজ্জার আভা সেই লালিমা গাঢ়তর করিয়া তুলিল; তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল অস্তসূর্য্যের আলো আর উদীয়মান চন্দ্রের জ্যোৎস্না! মালতী মাথা নত করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—সে আমি জানিনে, আপনি দিতে বলুন।

বিপিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

মালতী সেই পথের ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া ধূলির চেয়েও ধিক্কৃত উপেক্ষিত তাহার অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দিতে চাহিল! এমনি লজ্জায় জানকী মাটিতে মিশাইয়াছিলেন; যে অপমানে স্ত্রীলোকের চরমতম আবরণটুকু হরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত সংসারের নিষ্ঠুর কৌতূহল দৃষ্টির মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দ্যায়, এ সেই অপমান; সেই দারুণ অপমানের লজ্জায় মালতী মাটির ধূলা চোখের জলে ভিজাইতে লাগিল।

কে দুখানি স্নেহকোমল হস্তে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া করুণাস্নিগ্ধ স্বরে ডাকিল—দিদি, তুমি উঠে এস।

মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া শান্তির বুকে মুখ লুকাইয়া লজ্জা ঢাকিয়া যেন বাঁচিল। পরুষ পুরুষদের দৃষ্টি হইতে শান্তি তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল। মাঘীপূর্ণিমার চন্দ্র তখন সমস্ত আশ্রম ভরিয়া হাসিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি

আশ্বিনের ভারতীতে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিম্নে লিখিলাম। আশা করি শীতলবাবু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

মূলোদ্ধার না করিলে আর্য্যজাতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইবে না। এদিক ওদিক বাদ দিয়া মধ্য হইতে ইতিহাস লিখিলে তাহা কখন ঠিক হইতে পারে না। এজন্য প্রথম হইতেই ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। আমার "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব" এই ধরণের পুস্তক।

যাঁহারা পুরাণ পড়েন নাই, তাঁহারাই পুরাণকে ঘৃণা করেন। যাঁহারা পড়িয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতে ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, এ হিসাবে শীতলবাবু ধন্যবাদের পাত্র।

পুরাণে প্রাচীন ইতিহাসের যে উপাদান আছে তাহা কত মূল্যবান, তাহা শীতলবাবুর প্রবন্ধ পড়িলে বিশেষরূপে জানা যায়। "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব" পাঠ করিলে তাহাই ধারাবাহিকরূপে জানিতে পারিবেন।

ইলাবৃত বর্ষ দুইটি। যে ইলাবৃত বর্ষে সূর্য্য ছয় মাস উদিত এবং ছয় মাস অস্তগত থাকেন, যেখানে তিনি তাপ প্রদান করেন না, যেখানে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র প্রকাশ পায় না বলিয়া লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, সেই ইলাবৃত বর্ষই প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম ইলাবৃত বর্ষ। ইহা উত্তরমেরু প্রদেশে অবস্থিত। ইহাই নারায়ণের নাভিপদ্ম বলিয়া পুরাণে কথিত। এখানেই আদি আর্য্যমানব ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল। যজ্ঞাগ্নি প্রথম এখানেই প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

যে ইলাবৃত বর্ষে দেবতাদিগের অর্থাৎ ইন্দ্রাদির জন্ম হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় ইলাবৃত বর্ষ। ইহা সুমেরু প্রদেশে অর্থাৎ আল্‌টাই পার্ব্বত্য প্রদেশে সাইবেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ড মেরুতত্ত্বে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইলাবৃতের অব্যবহিত দক্ষিণে যে উত্তরকুরু, তাহা আদি উত্তরকুরু নহে। আদি উত্তরকুরুতে ও ভারতে সূর্য্য একসঙ্গে উদয় হয় না। ভারতে লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, উত্তরকুরুতে সিদ্ধপুরে তখন সন্ধ্যা হয়। এই উত্তরকুরুই আদি। পরে যখন সুমেরু প্রদেশ (আল্‌টাই পার্ব্বত্য প্রদেশ) ইলাবৃত বর্ষ হইয়াছে, তখন প্রথম ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে উত্তরকুরু স্থাপিত হইয়াছে। এই উত্তরকুরুর কথাই রামায়ণে সুগ্রীব মুখে উক্ত হইয়াছে। এখানে ও ভারতে সূর্য্য এক সঙ্গে উদয় হয়।

১৩২১ সালের মাঘের নব্যভারতের ৬২৯ পৃষ্ঠায় আমার প্রতিবাদের উত্তরে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াও যে শীতলবাবু ১৩২২ সালের আশ্বিনের ভারতীতে লিখিয়াছেন যে, "আর্য্যগণ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়াই সুর ও অসুর এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে তাঁহারা এক দেবতাজাতির অন্তর্ভূত ছিলেন," ইহাতে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পৃথিবীর পুরাতত্ত্বে এ সব বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রাচীন মিশর

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ না কি স্থির করিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সভ্যতার মুখ দেখিয়াছে—মিশর।* কিন্তু তাঁহারা যদি হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন মিশরের প্রথম রাজা "মেনা" পুরাণাদিতে "মনু" নামে কথিত হইয়াছেন। সাবার্ণমনু মিশরের প্রথম রাজা। ইনি বিদেশী শাস্ত্রে "নুহ্" নামে কথিত হইয়াছেন।

সাবর্ণ মনুর পুত্রের নাম ধৃতি, নির্ম্মোহ, যবস্, সুমতি ইত্যাদি। মিশরের প্রথম রাজা মেনার পরে তৎপুত্র "তেতা" রাজা হইয়াছিলেন, এই তেতাই "ধৃতি" নামে কথিত। নির্ম্মোহ হাম নামে, যবস্ যাযেত নামে এবং সুমতি সাম নামে কথিত হইয়াছে। সকলেরই গোড়া ভারতীয় শাস্ত্রে পাইবেন, সুতরাং যে আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই স্বজাতি মিশরেও প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাণ ধরিয়া টানিলেই মাথা আপনি আইসে, মিশর আদি সভ্যদেশ বলিলে ভারতের সভ্যতার প্রশ্ন আপনি মীমাংসিত হইয়া যাইবে। চাই আলোচনা।

"মিশরবাসীরা মরুভূমির অসভ্যগণের সহিত আপনাদের পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্ম আপনাদিগকে "মানুষ" বলিতেন" কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই জানেন, "মনুর" পুত্রই মানুষ বা মানব নামে কথিত।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

সমালোচনা

অশোক অনুশাসন। (মূল পাঠ, অনুবাদ, বিবিধ টীকা, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ ও সংস্কৃত তাৎপর্য্যসহিত) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম, এ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রিণ্টার ও পাবলিসার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস, মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা, কাপড়ে বাঁধাই দুই টাকা মাত্র। এই গ্রন্থে সমগ্র অশোক অনুশাসনের মূল, টীকাদিসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক-তত্ত্বানুসন্ধানে সম্পাদকদ্বয় তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Study) অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের যতপ্রকার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে (১) বিদেশীর ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারিগণের লিখিত ইতিবৃত্ত, (২) প্রস্তর-গাত্রে, ধাতু-ফলকে বা অন্য আধারে খোদিত লেখরাজি ও মুদ্রা লিপি, (৩) গাথা কাহিনী ও আখ্যায়িকা এবং সমসাময়িক সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।" কথাটা খুবই ঠিক। সুখের বিষয় আমাদের ঐতিহাসিকগণ এখন এই পথেরই পথিক এবং এইরূপ আলোচনা দ্বারাই সম্প্রতি আমাদের জাতীয় লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার-কার্য্য চলিয়াছে। প্রাচীন ভারতে মহারাজ অশোকই যে উৎকীর্ণ শিলালিপির সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক ছিলেন, সে বিষয়েও ঐতিহাসিকগণ এখন এক-মত। "সেই লিপিসকল মুখ্যতঃ 'ব্রাহ্মী' অক্ষরে লিখিত।" সম্পাদকদ্বয় বেশ দক্ষতার সহিত 'ব্রাহ্মী' অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামতের আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, "এই ব্রাহ্মীলিপিই এক সময়ে প্রাচীন ভারতের জাতীয় লিপি ছিল; কুষাণ, গুপ্ত, প্রাচীন দ্রাবিড়, দেবনাগরী, বাঙ্গালা, তিব্বতী, উড়িয়া, গুরুমুখী, সারদাসিন্ধী, গ্রন্থ, তেলুগু, তামিল, মলয়ালম, সিংহলী বর্ম্মী, শ্যামী, কম্বোজ, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি ভারতের ও বহির্ভারতের তাবৎ প্রাচীন ও আধুনিক লিপি সম্পাদকদ্বয় 'প্রাচীন বস্তু-চিত্র' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মিসর, আসিরীয় ও চীন প্রভৃতি দেশের বর্ণমালা বস্তু-চিত্র হইতে উৎপন্ন। ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার আচার ও গঠন-প্রণালী বিশেষভাবে আলোচনা করিলে উহাও যে প্রাচীন বস্তু চিত্র (hieroglyphics) হইতে উৎপন্ন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।" এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা বেশ সুনিপুণ যুক্তি-প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, "অশোক বুদ্ধ-দেবের উপদেশের অর্থ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া কথিত জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় আপনার বক্তব্য প্রচার করিলেন, পরবর্ত্তী ভারতীয় রাজাগণের ন্যায় সংস্কৃতের আশ্রয় লইলেন না। তাঁহার অনুশাসনের ভাষাকে মাগধী প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যাইতে পারে। এই মাগধী প্রাকৃত হইতেই কথিত বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে এবং কথিত বাঙ্গালা ক্রমে সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া 'সাধু' বা সাহিত্যের আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। এই হিসাবে অশোকের ভাষাকে প্রাচীনতম বাঙ্গালা বলিতে পারা যায়। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে এই কারণে অশোক অনুশাসনের মূল্য অধিক।" * * * কথিত বাঙ্গালার 'মুনিস', 'কেওট,' 'লেখা', 'বছর' 'বাম্ভন' 'চিকিছা' প্রভৃতি অনেক শব্দ অশোক অনুশাসনেও দেখা যায়।" এই গ্রন্থখানি নানা দিক দিয়াই আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া ইতিহাস-বিভাগের সমধিক সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। সমগ্র অনুশাসনের সংগ্রহ ভারতীয় অপর কোন ভাষাতেই এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই, বাঙ্গালায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সম্পাদকদ্বয়ের সুগভীর গবেষণা-শক্তি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনার নিপুণতা, অসাধারণ অধ্যবসায় ও স্বদেশ-প্রীতির প্রগাঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থ জাত্যভিমানী প্রত্যেক

সত্যনারায়ণের পাঁচালী। দুর্গাপ্রসাদ ঘটক বিরচিত। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন কর্তৃক সংশোধিত; রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত এবং মুদ্রিত। এই গ্রন্থের ভূমিকাটির বিশেষ মূল্য আছে। 'ভূমিকা'য়, সত্যনারায়ণের পূজা-প্রবর্তনের কাল-নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে এবং ভারতের নানা প্রদেশে কি ভাবে এই পূজা প্রচলিত, তাহারও একটি কৌতূহলপূর্ণ আলোচনা আছে।

বল্লাল সেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। কলিকাতা, লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। এখানি নাটক। আনন্দভট্ট রচিত 'বল্লাল-চরিতম্' এই নাটকের ভিত্তি। নাটক-হিসাবে গ্রন্থের কোন বিশেষত্ব নাই—নাটক-রচনায় লেখকের শক্তির কোন পরিচয় পাইলাম না।

অবদান। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। "ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিবিধ গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া" এই পুস্তকের আখ্যায়িকাগুলি রচিত। হকিকত রায়, ইউলালিয়া, তুলসীদাস, মার্গারেট, লুৎ-ফউন্নিসা প্রভৃতি নয়টি আখ্যায়িকা হইতে সন্নিবিষ্ট। আখ্যায়িকাগুলি ঐতিহাসিক। লেখকের উদ্যম ও নির্ব্বাচন প্রশংসার্হ, কিন্তু রচনায় বিশেষত্ব নাই। আখ্যায়িকাগুলির স্বকীয় একটা রস আছে—লেখায় কিন্তু সে রস ফুটিতে পায় নাই। লিপিকুশলতার অভাবে সংবাদপত্রের সংবাদের মতই আখ্যায়িকাগুলি নির্জ্জীব ও প্রাণহীন হইয়াছে।

ভাষা ও সুর। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। কলিকাতা, লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। লেখক ভূমিকায় বহ্বারম্ভ করিয়া লিখিয়াছেন:—"কবিতাগুলির মধ্যে একটা আন্তরিকতা—একটা আবেগ, একটা প্রবাহ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" আমরা লেখকের বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সেগুলির সন্ধান লইতে গিয়া কিন্তু নিরাশ হইয়াছি—আশা করি, লেখক ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না।

বল্লরী। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা। প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতাগ্রন্থ। অনেকগুলি খণ্ডকবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার লেখক বাঙ্গালার একজন উদীয়মান কবি। কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর, ঝঙ্কারে রমণীয়—ছন্দের অপরূপ লীলায় মনোহর। শব্দ-চয়নেও লেখকের দক্ষতা অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কল-ঝঙ্কারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে প্রাণের তার সে ঝঙ্কারে সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে। এই কবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

ঢেউ। শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, যশোহর। কলিকাতা, বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানিও কবিতা-গ্রন্থ; কয়েকটি খণ্ডকবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলিতে ভাব কোথাও বড়-একটা স্পষ্ট ফুটে নাই; কোথাও-বা আবার ভাষা ও ছন্দের গহনে ভাব উদ্দাম দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া মরিয়াছে! লেখকের হাত কাঁচা—তবে চর্চ্চা রাখিলে 'চলন-সই' কবিতা তাঁহার হাতে বাহির হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। 'ঢেউয়ে'র কবিতাগুলিতে চেষ্টা ও কষ্ট-কল্পনার ছাপ্‌টাই সব-চেয়ে চোখে বেশী পড়ে। ললাট-পটে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়-মহাশয়ের প্রশংসার টিকিট আঁটা থাকা সত্ত্বেও আমরা এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩২২　　[৮ম সংখ্যা

নবাব

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদেশে

তিন সপ্তাহ পরে পল দ্য গেরি টিউনিস হইতে দেশে ফিরিতেছিল। তিন সপ্তাহ কাল টিউনিসে থাকিয়া সে হেমারলিঙ্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিপুল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। সেখানে পৌঁছিয়াই সে শুনিল, জাঁসুলের বিরুদ্ধে গোপনে এক মকর্দ্দমা রুজু করিয়া বে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিতে ক্রোক দিয়া বসিয়াছে। নবাবের অফিস বন্ধ, জাহাজ ও সম্পত্তিতে শীল পড়িয়াছে—এবং তাঁহার প্রকাণ্ড প্রাসাদের সম্মুখে সতর্ক সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্রি মোতায়েন রহিয়াছে! সমস্ত আয়োজন ঠিক—শুধু লুঠের দ্রব্য ভাগ করিয়া লইতেই বাকী! ইহারই মধ্যে মাথা খেলাইয়া গেরি বাহিরের টাকা-কড়িগুলাকে কোনমতে আদায় করিয়া দ্রুত দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

সে এক অক্লান্ত শ্রম, বিপুল সংগ্রাম! নৈরাশ্য বা অবসাদ কোনটিকেই গেরি মুহূর্ত্তের জন্য আমোল দিল না! হেমারলিঙের ফাঁস কাটাইয়া নবাবের পাওনা টাকার কতক উশুল করিয়া গেরি টিউনিসে মুহূর্ত্তকালও আর অপেক্ষা করা সঙ্গত ভাবিল না। কে জানে, মামুদ বের হুকুমে এখনই এ টাকা হয়ত পথেই বাজেয়াপ্ত হইতে পারে! ইহার উপর সে টেলিগ্রাম পাইয়াছিল, পারিতে নবাবের নির্ব্বাচন নাকচ হইয়া গিয়াছে! এ সংবাদ টিউনিসেও রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। গেরি তখন দ্রুত আসিয়া একখানা ইতালী-গামী জাহাজে টিকিট কিনিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। সে দশলক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিল। এই লুঠের বন্দরে আবার পাছে তাহা হারাইতে হয়, এই ভয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাহার রোমাঞ্চ হইতেছিল।

ডেকে বসিয়া দেখিল, টিউনিসের শ্বেত অট্টালিকাগুলা জাহাজের পশ্চাতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ক্রমে জাহাজ আসিয়া জেনোয়ার বন্দরে নোঙ্গর ফেলিল। গেরির বুকটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কি জানি, টিউনিস হইতে যদি কোন টেলিগ্রাম আসিয়া থাকে এবং সেই টেলিগ্রাম পাইয়া ইতালীয় পুলিশ যদি জাহাজে উঠিয়া তাহার সন্ধান করে? কিন্তু না,—কেহই তাহার কোন সন্ধান করিল না। পরে জাহাজ হইতে নামিয়া ট্রেনে উঠিল। এই ট্রেণ বরাবর সমুদ্রতীর দিয়া মার্শেল যাইবে।

পথে কিন্তু এক বিপদ ঘটিল। সাভোনা-ষ্টেশনে এঞ্জিন বিগড়াইল। দশ-বারো ঘণ্টা এখানে এখন অপেক্ষা করিতে হইবে। রিলিফ-এঞ্জিন না আসিলে ট্রেণের আর নড়িবার সামর্থ্য নাই।

তখন আবার সকাল হইয়াছে। বিলম্বে বিরক্ত হইয়া গেরি ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল। কোথায় গিয়া এখন এই সময়টুকু কাটানো যায়! লোকচক্ষুর সম্মুখে থাকিতে কিছুতেই তাহার মন সরিতে ছিল না। বেচারা জাঁস্থলের কথাই সর্ব্বাগ্রে তাহার মনে হইল। তাঁহার ইজ্জৎ, তাঁহার সম্ভ্রম—সব যে এই টাকার উপর নির্ভর করিতেছে! আর আলিন,—তাহার প্রাণাধিকা আলিন! সে যে গেরির পথ চাহিয়াই বসিয়া আছে! কিন্তু উপায় নাই—দশ-বারো ঘণ্টা এখানে পড়িয়া থাকিতেই হইবে!

নাইস্ সহরটা দেখিয়া লইবার সঙ্কল্প করিল।

চারিধার তরুণ সূর্য্য-কিরণে ঝলমল করিতেছিল—সেই স্নিগ্ধ রৌদ্রে স্নান করিয়া তরু-লতা অপূর্ব্ব শ্রীতে সাজিয়া উঠিয়াছিল! দূরে-অদূরে অনতি-উচ্চ গিরিমালা নীল আকাশের দিকে অসংখ্য শৃঙ্গ-বাহু তুলিয়া আনন্দে যেন তাহাকে অভিবাদন করিতেছিল। পথের দুইপার্শ্বে সবুজ শষ্পে মণ্ডিত ভূমি অঙ্গে সূর্য্য-কিরণ মাখিয়া সবুজ ভেলভেটের মতই পড়িয়া ছিল! চারিদিকে সমস্তই সজ্জিত, সুন্দর! গেরির অশান্ত চিত্ত সে দৃশ্যে মুগ্ধ হইল!

গেরির গাড়ী আসিয়া পর্ব্বত-প্রান্তে অবস্থিত ব্রেগাট হোটেলের সম্মুখে থামিল। গেরি হোটেলে ঢুকিতেই সম্মুখে দেখিল, প্রকাণ্ড একটা কুকুর! কাতুর, না—ফেলিসিয়ার কুকুর? দেখিতে হুবহু কাতুরের মতই।

গেরি আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। পোষাক ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া সে খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছগুলা চঞ্চল শিশুর মতই বায়ুর সহিত লীলা-রঙ্গে মাতিয়া খেলা করিতেছে। হঠাৎ পাশের ঘরে কাহার স্বর শুনা গেল! এ কি স্বপ্ন! গেরি চমকিয়া উঠিল। না, ভুল হইয়াছে, নিশ্চয় ভুল! এ পৃথিবীতে দুইজনের কণ্ঠস্বরে এতখানি মিল থাকিতেই পারে না! স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শে গেরির সকল ক্লান্তি ঘুচিয়া গিয়াছিল—তাহার তন্দ্রাবোধ হইতেছিল। গেরি আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। নিদ্রা আসিয়া নিমেষে তাহার

ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল,—বিচিত্র, মধুর সে স্বপ্ন!

—আলিনের সহিত যেন সে মধু-বাসর-যাপনে যাত্রা করিয়াছে। সুন্দরী বধূ! উজ্জ্বল চক্ষু, প্রেম ও বিশ্বাসে ভরা আলিনের দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর স্থির-নিবদ্ধ! আর এই হোটেলেরই অপর প্রান্তের ঘরে সে ছিল—ফেলিসিয়া! তাহার উজ্জ্বল শুভ্র রেশমী পোষাক—ভায়োলেটের গন্ধে ভরপূর! অদূরে ফেলিসিয়ার অস্তিত্ব সে স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল।

আবেগে গেরি আলিনকে চুম্বন করিল। আলিন চমকিয়া সরিয়া গেল। তাহার মুখে নিমেষে করুণ বিষাদের এমন একটা ছায়া পড়িল যে তাহা দেখিয়া গেরির প্রাণ আর্দ্র হইল। গেরি সাদরে আলিনকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। আলিন তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া মৃদু কম্পিত স্বরে কহিল, "ফেলিসিয়া রয়েছে—তুমি আমায় আর ভালো বাসবে না।" হাসিয়া গেরি কহিল, "কে বললে, ফেলিসিয়া এখানে আছে?" আলিন সহসা মুখ তুলিয়া সভয়ে কহিয়া উঠিল, "হাঁ, সে আছে ঐ যে—ঐ যে সে—"আলিন পার্শ্বের ঘরের দিকে অঙ্গুলি দেখাইল! অমনি গেরি শুনিল, ফেলিসিয়ার স্বর! স্পষ্ট! ফেলিসিয়া হাঁকিতেছে, "কাতুর—কাতুর—"

চমকিয়া গেরি জাগিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া সে দেখে, ঘরে সে একা! কোথায় আলিন! কোথায় সে প্রেমের লীলা-রঙ্গ! কিন্তু এবার সে স্পষ্ট শুনিল, পাশের ঘরে একটা কুকুর ডাকিতেছে। গেরি বিছানায় পড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। পাশের ঘরে কে করাঘাত করিল। পরমুহূর্ত্তেই গেরি মানুষের কণ্ঠ শুনিল, "দোর খোল গো—আমি এসেছি—আমি জেঙ্কিন্স।"

এ কি সত্য—না, এখনও সে স্বপ্ন দেখিতেছে? না, এ'ত স্বপ্ন নয়! ঐ যে জানালার বাহিরে পাহাড় দেখা যায়। ঘরে রৌদ্র-কিরণের ঢেউ উথলিয়া উঠিয়াছে—আর এই ত সে জাগিয়া আছে! তবে—তবে!

গেরি বিছানায় উঠিয়া বসিল। সত্যই কি তবে ফেলিসিয়া এখানে আছে? আর সেই পাপিষ্ঠ জেঙ্কিন্সটাও এখানে আসিয়া জুটিয়াছে! পাশের ঘরে দ্বার খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষ কণ্ঠের পরিচিত স্বর—"কেমন, এবার তোমায় খুঁজে বার করেছি ত!"

না, কোন ভুল নাই। সে নাম না বলিলেও শুধু স্বর শুনিয়াই গেরি ঠিক বুঝিত, এ আর কেহ নহে, জেঙ্কিন্স! এমন পরুষ কর্কশ স্বর আর কাহারও থাকিতে পারে না।

জেঙ্কিন্স কহিল, "তোমায় আজ পেয়েছি, তা হলে। আট দিন ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি—জেনোয়া থেকে নাইসের মধ্যে তন্ন তন্ন করে তোমার সন্ধান করেছি। আমি জানি, তুমি এখনও বেরিয়ে পড়নি। বের বজরা এখনও বন্দরে বাঁধা রয়েছে! সমুদ্রের ধারে সমস্ত হোটেলে খোঁজ করেছি! ব্রেহাটের কথা আজ মনে পড়ল। ভাবলুম, হয়ত তাহলে এখানে আছ। এসে

খোঁজ নিলুম—ঠিক! এখানেই তুমি আছ, তাহলে! আঃ—"

কিন্তু এ কাহার সহিত জেঙ্কিন্স কথা কহিতেছে! কৈ, কেহ উত্তর দিল না ত! তবে—তবে—না, ঐ যে কে উত্তর দেয়! বড় কোমল মৃদু কণ্ঠ! উত্তর হইল, "হাঁ, এখানে আছি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে, শুনি—"

গেরি উঠিয়া দেওয়ালে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকের মধ্যে একটা দারুণ অস্বস্তি সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। জেঙ্কিন্স কহিল, "আমি এসেছি, তোমায় আটকে রাখতে। টিউনিসে তোমায় যেতে দেব না।"

"টিউনিসে আমার কাজ আছে। আমি সেখানে যাবই।" না, কোন ভুল নাই। এ স্বর ফেলিসিয়ারই বটে!

জেঙ্কিন্স কহিল, "কিন্তু তুমি বুঝছ না—ফেলি, শোন—"

—"কোন দরকার নেই, শোনবার। আমি নিজে যা ভাল বুঝব, করব। তুমি আমার অভিভাবক নও যে আমায় উপদেশ দিতে আসবে! আমি অবাক হচ্ছি, তোমার এ আস্পর্দ্ধা দেখে! এ অনধিকার চর্চ্চা কেন! তোমার উপদেশের মূল্য জেনো—ঐ কুকুরটার চীৎকারের মতই আমি অর্থহীন, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি।"

"বোঝ, ফেলিসিয়া, তোমার এই রূপ, এই বয়স! টিউনিস তোমার পক্ষে এমন অবস্থায় মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। বিশেষ তুমি একা—"

—"পারিতেও ত আমি একা ছিলুম। তা ছাড়া আমি কন্স্তাঁকে নিয়ে যাচ্ছি—!"

—"শুধু কন্স্তাঁকে নয়—আমাকেও তাহলে সঙ্গে নিতে হয়।"

—"তোমাকে?" ফেলিসিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিল, পরে কহিল, "আর তোমার পারিকে—তোমার মক্কেলদের—তোমার সুসভ্য সমাজটি—তাদেরও সঙ্গে নিতে হবে, কি বল? তুমি পাগল!"

—"যাই বল, ফেলিসিয়া, তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমি তোমার সঙ্গে যাবই—এ আমার প্রতিজ্ঞা।"

তাহার পর মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েই স্তব্ধ রহিল। পল ভাবিল, এ ভাবে লুকাইয়া এ সকল কথাবার্ত্তা শুনা তাহার পক্ষে উচিত হইতেছে না! কিন্তু প্রাণে তাহার অদম্য কৌতূহল জাগিতেছিল। যদি নূতন তথ্য কিছু সংগ্রহ হয়! ক্লান্তিতে পা তাহার জড়াইয়া আসিতেছিল—দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়! তবুও পারির সভ্য সম্ভ্রান্ত সমাজের যে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা ধীরে ধীরে আজ আপনার বদ্ধ ফাঁদের সুতাগুলাকে জোট খুলিয়া মুক্ত করিয়া ধরিতেছিল, তাহার যতখানি বুঝিতে পারা যায়—শুধু এই আশায় পল কিছুতেই আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সেই জন্যই কোন মতে সে নিশ্বাস রোধ করিয়াও স্থির জড়পুত্তলির মতই দেওয়ালে কান পাতিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, "বাজে কথা থাক্ জেঙ্কিন্স—তুমি চাও কি?"

—"আমি তোমায় চাই, ফেলিসিয়া।"

—"জেঙ্কিন্স—" সে স্বর তীব্র, পরুষ!

—"হাঁ, আমি শুধু তোমায় চাই, ফেলিসিয়া। এ কথা আমার মুখে উচ্চারণ করতে তুমি বারণ করেছ—কিন্তু অন্য অনেকে তোমার কাছে এই কথা বলেছে—তখন তুমি বিরক্ত হওনি—কাজেই আমি আবার এ কথা বলছি। আমার কথাই বা তুমি রাখবে না, কেন, ফেলিসিয়া?"

পাশের ঘরে মুহূর্ত্তে যেন বাজ হাঁকিল। ফেলিসিয়া তীব্র দীপ্ত স্বরে কহিল, "সাবধান হয়ে কথা বলো, জেঙ্কিন্স, আমার মর্য্যাদায় আঘাত করো না। যতই তোমার শক্তি থাকুক না কেন,—তবু জেনো, আমিও একেবারে দুর্ব্বল নই। এ ধৃষ্টতার শাস্তি আমি দিতে জানি—"

গদ্‌গদ কণ্ঠে জেঙ্কিন্স কহিল, "কেন এত রাগ করছ, ফেলিসিয়া? আমি তোমায় ভালবাসি—চিরকাল ভাল বেসেছি—। কেন, তুমি নিষ্ঠুর হচ্ছ? তুমি বিচার করে দেখ, তোমায় ভালবাসি বলে—"

"আমায় ভালবাস!" ফেলিসিয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "ভালবাস, জেঙ্কিন্স? তোমার মর্জ্জি হয়, আমায় ভালবাসতে পার। কিন্তু জেনো, আমারও মর্জ্জি, আমি তোমায় ঘৃণা করি। এত ঘৃণা মানুষ ইতর পশুকেও করতে পারে না! আমার যত কিছু বিশ্বাস শক্তি সে সমস্ত তোমারই জন্য আজ ধূলায় লুটিয়ে গেছে! আমার সমস্ত জীবনটা তোমারই নিশ্বাসে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! আমার নারীত্ব তোমারই স্পর্শে কলঙ্কিত অপমানিত হয়েছে! তুমিই আমাকে আমার মর্য্যাদার আসন থেকে টেনে এনে মাটিতে লুটিয়ে দেছ। তোমার সঙ্গ-সুখের চেয়ে আমি যে কোন অমর্য্যাদা যে কোন হীনতাকে আজ মাথায় তুলে নিতে পারি। পারির সমাজের যত কিছু ভাণ, মিথ্যা, আমি মাথায় তুলে নিয়েছি—নিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়েছি—সে সব শুধু তোমারই কৃপায়! আর কেউ তোমায় চিনতে না পারে, কিন্তু আমি তোমায় চিনি—একটা ভণ্ড, স্বার্থপর, পাপিষ্ঠ, নির্লজ্জ কাপুরুষ—পারির সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত পাপের কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি—তুমি এসেছ, আমার কাছে ভালবাসা জানিয়ে আমার হৃদয় অধিকার করতে—"

ক্রোধে ফেলিসিয়ার মুখে স্বর আর বাহির হইল না। সে রাগে ফুঁসিতে লাগিল।

জেঙ্কিন্স কহিল, "তুমি এ সব কি বলছ, ফেলিসিয়া? যদি তুমি জান্‌তে, তোমার এ রাগে আমার বুক কতখানি জ্বলে যাচ্ছে! দায়ে পড়ে আমায় এমন অমানুষ হতে হয়েছিল, ফেলিসিয়া! কি বিপুল বিঘ্নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমায় দিন কাটাতে হয়েছিল, তা যদি তুমি জানতে! তবুও একমাত্র তোমাকেই আমি চিরদিন ভাল বেসেছি! তোমার ক্রোধ, তোমার বিদ্রূপ, তোমার অপমান—কিছুতেই আমার এ ভালবাসা কম পড়েনি। সেই ভালবাসার বলেই আমার সাহস আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে—না হলে তোমার কাছে ঘেঁসতেও আমার আজ সাহস হত না, ফেলিসিয়া। আজ আর কোন দিকে আমার লক্ষ্য নেই—কোন বিষয়ে স্পৃহা নেই। আমি সব ত্যাগ করতে পারি—ত্যাগ করেওছি—কিন্তু

তোমার আশা ত্যাগ করতে পারব না। ফেলিসিয়া, তুমি আমায় বিয়ে কর।”

“বিয়ে!”

“হাঁ, বিয়ে।”

“আর তোমার স্ত্রী?”

“সে মারা গেছে।”

“মারা গেছে? মাদাম জেঙ্কিন্স মারা গেছে! এ কথা সত্য?”

“তুমি আমার স্ত্রীকে জানতে না, ফেলিসিয়া। যাকে জানতে, সে আমার স্ত্রী নয়। তার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন আমার স্ত্রী যে ছিল, সে বেঁচে, আয়ার্লাণ্ডে থাকত। এর সঙ্গে জানাশোনা হবার ঢের আগেই আমার গলায় দড়ি পড়েছিল। তখন আমার বয়স পঁচিশ বৎসর, আয়ার্লাণ্ডে আমি ডাক্তারি পড়ছিলুম। অবস্থা খারাপ—পড়ার খরচ চলত না। সেই সময় এই বিয়ে হয়। তার নাম ছিল, মিস্ ষ্ট্র্যাঙ্গ। দেনায় তখন আমার মাথার চুল অবধি বিকোবার জো। এই মিস্ ষ্ট্র্যাঙ্গের ভাইয়ের কাছে পাঁচশ পাউণ্ড ধার জমে গেছল। সে আমায় জেলে পাঠাবার উদ্যোগ করে ছিল, কাজেই সেই জেল আর দেনা দুয়েরই হাত এড়াতে তার বেতো-রোগী বোন মিস্ ষ্ট্র্যাঙ্গকে বিবাহ করি! ভেবেছিলুম, কালে তাদের সম্পত্তিরও মালিক হব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর! সম্পত্তি পাওয়া দূরে থাক, সেই বেতো স্ত্রী ক্রমে এক ভার হয়ে দাঁড়াল। তার কড়া তদারক আর কড়া মেজাজের জ্বালায় আয়ার্লাণ্ড ছেড়ে পারিতে এলুম ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায়। চারিদিকে বিপদের আর কূল-কিনারা দেখা যাচ্ছিল না, তাতে মানুষকে একটু দুঃসাহসিক হতে হয়—সেই দুঃসাহসে ভর করে পারিতে এসে মাথা তুললুম। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে মানুষের উপর আমার প্রবল ঘৃণা জন্মেছিল। সেই ঘৃণার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে চারিদিকে শুধু বিষই ছড়িয়েছি। মান ইজ্জৎ টাকা সবই দু হাতে কুড়িয়ে বেড়িয়েছি! কিন্তু কোন দিন শান্তি পাইনি। তাই শেষ সে-সব ছেড়ে বিয়েছি। স্ত্রীর সে ভাইটা নিঃসম্বল হয়ে মারা গেলে বেতো স্ত্রীকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হই। আজ আমি আবার মুক্ত, স্বাধীন—”

“মুক্ত, স্বাধীন! ঠিক বলেছ, জেঙ্কিন্স! তবে যে তোমার স্ত্রী না হয়েও স্ত্রীর অধিক তোমার অনুগতা, দাসীর মত পড়েছিল, তাকে কেন বিয়ে কর না!”

“না, আর নয়! সেও এক কয়েদ! অত মিনমিনে ভাব, অত অনুরাগ, তাও আমার অসহ্য বোধ হয়। তা ছাড়া তাকে ঘরে এনে রাখলেও যেদিন তোমায় দেখেছি, মন আমার সেই দিন থেকে তোমারই পিছনে ছুটে বেড়িয়েছে—মন শুধু তোমাকেই চায়। তার সঙ্গে আমার সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলেছি।”

“হঠাৎ এমন সর্ব্বত্যাগী হলে যে!”

“পারি, সমাজ—সব ত্যাগ করেছি। সেখানে শান্তি নেই, সুখ নেই—”

“পারিতে আর ফিরবে না?”

“না। এখন শুধু তোমার সঙ্গ-সুখের প্রার্থী আমি। সব ত্যাগ করে আমি তোমার বাসায় গেলুম। গিয়ে দেখলুম,

বাড়ী খালি পড়ে আছে—গায়ে টিকিট আঁটা, "বাড়ীভাড়া।" তখন আমার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্‌ করে উঠল। পাখী উড়ে পালিয়েছে! তুমি পারি ছেড়ে আসায় সেখানে আমার আর সুখ নেই—আমিও তাই পারি ছাড়লুম। তুমি তোমার ঘর-বাড়ী বেচে ফেলেছ, আমিও আমার ঘরবাড়ী বেচে এসেছি।"

"আর সে? সেই সাধ্বী, সেই অনুগতা নারী যে তোমার স্ত্রী না হয়েও লক্ষ স্ত্রীর চেয়ে তোমায় ভালবাসত, তোমার সুখের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও যে কুণ্ঠিত নয়—সেই নারীকে তুমি পথে বসিয়ে এসেছ! চমৎকার কাজ করেছ, জেঙ্কিন্স, চমৎকার কাজ! আজ তার সেই পরিত্যক্ত মহামূল্য আসনে আমায় বসাবার জন্য তুমি অনুরোধ করতে এসেছ! স্বার্থপর কাপুরুষ—" কথাটা বলিয়া ফেলিসিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

জেঙ্কিন্স করুণ স্বরে কহিল, "আর আমায় লজ্জা দিয়ো না, ফেলিসিয়া। তাকেও যে আমি ত্যাগ করেছি, সে তোমারই জন্য। আজ আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এসেছি, শুধু তোমারই আশায়। আমার এ অবস্থায় তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না—নিষ্ঠুর হয়ো না। আমায় দয়া কর।"

"দয়ার আশা মনেও স্থান দিয়ো না, জেঙ্কিন্স। এত বড় নিষ্ঠুর কাপুরুষের হাতে আপনাকে আমি সঁপে দেব, এমন পরিচয় পাবার পরও? তা হয় না, জেঙ্কিন্স, তা অসম্ভব!"

হইয়া বসিল, করুণ আবেদনের দৃষ্টিতে ফেলিসিয়ার পানে চাহিয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, "এ আশা ত্যাগ কর, জেঙ্কিন্স। তুমি অসম্ভব কামনা করছ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোথাও কিছু রাখা-ঢাকা নেই। বিশেষ এ-সব কথার পর তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও আমি বিশ্বাস করতে পারব না। তা ছাড়া আরও শোন, জেঙ্কিন্স, আমার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক নয়—আমি মোরার রক্ষিতা ছিলুম।"

পল চমকিয়া উঠিল। এ সন্দেহ আভাষে তাহার মনে উঁকি দিত। তবুও সেই কণ্ঠ হইতে এমন পরিষ্কার অকম্পিত স্বীকৃতি সে কোন দিনই আশা করে নাই! পৃথিবীর সমস্ত আলো নিমেষে যেন তাহার চোখের সম্মুখে নিবিয়া গেল। এই নারী—এই হৃদয় লইয়া এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়া আসিয়াছে!

জেঙ্কিন্স মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া উত্তর দিল, "আমি তা জানি। তুমি তাকে যে সব চিঠি লিখেছিলে, তার কতক আমার হাতে পড়েছে।"

"আমার চিঠি!"

"হাঁ, তোমার চিঠি—এই সে চিঠি। নাও, আমি এ চিঠি তোমায় ফিরিয়ে দিলুম। নাও। ও চিঠি অনেকবার করে আমি পড়েছি, আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে। এ চিঠির কথা মনে হলে আমার বড় কষ্ট হয়! কিন্তু জীবনে এর চেয়েও ঢের বড় বড় কষ্ট আমি সহ্য করেছি! ওঃ, কত পাল্‌ ডিউককে আমি খাইয়েছি। যত

মৃত্যুকে আরও এগিয়ে এনেছিল! বড় জ্বালা আমি পেয়েছিলুম, ফেলিসিয়া। জ্বলে পালের মাত্রা বাড়িয়ে তাকেও আরও জ্বালিয়েছি! তবুও সে চেয়েছে। আমিও তার মুখে ধরে দিয়ে মনে মনে বলেছি,—আরও জ্বল্‌তে চাও, তুমি? নাও, খেয়ে জ্বলো—"

* * *

পল সভয়ে সরিয়া আসিল। আর না—এত বড় পাপের কথা ধৈর্য্য ধরিয়া কানে শুনাও যায় না! সে আর শুনিবে না!

সহসা তাহার দ্বারে করাঘাত হইল—"গাড়ী হাজির—"

পল তাহার পোর্টম্যাণ্টটা তুলিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। পাশের ঘর তখন নিস্তব্ধ হইয়াছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। পল দ্রুত হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িলে পল আপনার জামার পকেট হইতে পেন্সিলে আঁকা একখানি ছবি বাহির করিল। সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল চোখ! সে চোখে অখণ্ড বিশ্বাস—অপূর্ব্ব অনুরাগ জ্বল্‌জ্বল করিতেছে। পল স্থির দৃষ্টিতে সে ছবির পানে চাহিয়া রহিল, পরে পরিপূর্ণ আবেগে ছবিখানাতে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিয়া সেখানাকে সে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার প্রাণের জ্বালা মুহূর্ত্তে যেন জুড়াইয়া গেল। (ক্রমশ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সরসী

কি শোভা খেলিছে মোর অঙ্গে অঙ্গে লহরে লহরে!
কোটী রতনের খনি, নাহি যার অন্ত ও অবধি,
আমি নহি ফেনময় ফণাময় সে নীল জলধি;
শাখা-বাহু প্রসারিয়া, আলিঙ্গিতে ভীষণ সাগরে
উচ্ছৃঙ্খল গতি যার, আমি নহি সে দুরন্তা নদী
কল কল ছল ছল করি আমি ক্ষুদ্র পরিসরে;
জল মম বিহীন-শৈবাল-রাশি! ভ্রমরে ভ্রমরে
লীলায়িত, হের বক্ষে শত পদ্ম, কুমুদী শারদী!
কবিচিত্তকুঞ্জবনে আমি ক্ষুদ্র সনেট্‌-সরসী!
হের হের, লাল নীল শ্বেত পীত ভাবের শফরী,
উছলি উছলি নাচে অঙ্গে মম দিবস-শর্ব্বরী!
এ কি লহরীর লীলা!—ওই হের হাসে পূর্ণশশী
একা শূন্যে; কিন্তু মোর অপরূপ স্বচ্ছ শুভ্রজলে
চতুর্দ্দশ রাকা চাঁদ!—হেন চাঁদ আছে কি ভূতলে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অতৃপ্তি

একটা গান কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসে—

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায়, মা !

কি করুণ, কি হতাশ, হতভাগ্যের আক্ষেপ ! সংসারও আবার এমন স্থান যে যদি প্রত্যেক লোককে পরীক্ষা করা যায়, বা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে দেখিব, প্রত্যেকেরই একটা না একটা বা একাধিক আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিয়া তাহাকে বেদনা দিতেছে। এই অতৃপ্তিই যখন অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইয়া উঠে, তখনই আকুল ক্রন্দনে স্বতঃই তাহা বাহির হইয়া আসে।

তবে এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সকলেরই একরূপ নহে। কাহারও হয় ত অর্থ, কাহারও স্ত্রী, কাহারও পুত্র, কাহারও যশ লইয়া; কাহারও আকাঙ্ক্ষা পবিত্র, কাহারও বা অপবিত্র। কেহ চায় আত্মতৃপ্তি, স্বার্থ, কেহ চায় পরোপকার, পরার্থ। কিন্তু সংসার যেরূপ নশ্বর, সেইরূপ অসম্পূর্ণ; সম্পূর্ণ তৃপ্তিও কোথাও নাই; সাময়িক তৃপ্তিমাত্র দেখিতে পাই। অথবা তাহাকে সাময়িক তৃপ্তি না বলিয়া "সাময়িক অবসাদ" বলা উচিত। এই সাময়িক অবসাদের অবসানে আবার অতৃপ্তির উদ্রেক ও কষ্ট।

তাই গীতাতে দেখি—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ৫।২২

আমাদের সংসারে আমরা যত প্রকার আনন্দ জানি, তাহার সবগুলিই সংস্পর্শজ। রসনার সহিত সুস্বাদু দ্রব্যের সংস্পর্শ হইলেই সুখ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সুন্দর সুমধুর সঙ্গীতের সংস্পর্শ হইলেই আনন্দিত হই। কিন্তু এই প্রকার সুখ বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ তাহাদের উৎপত্তি দুঃখে। এই সকল সুখের প্রভাবজনিত যে অনুভূতি, তাহা অতীব দুঃখকর। কাজেই দেখিতেছি, তাহাদের উৎপত্তি প্রারম্ভ দুঃখে। আবার যাহার আরম্ভ আছে, তাহার শেষও আছে। সংসারের নিয়মই এই। এই জন্য আবার শেষেও দুঃখ প্রধ্বংসাভাবের জন্য। সুখটা শেষ হইয়া গেল, আর তাহা ভোগ করিতে পাইতেছি না ! এইরূপে যে সুখের আদি আছে, অন্ত আছে—যাহার আদিতে দুঃখ, ইচ্ছার উদ্রেক অবধি,—যাহার অন্তে দুঃখ, সুখটি শেষ হওয়া অবধি, বোধ হয় মৃত্যু পর্য্যন্ত,—এমন দ্রব্যে এমন সুখে পণ্ডিতগণ মুগ্ধ হন না। ইহাই গীতার একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

তাই প্রায়ই দেখিতে পাই, লোকে কোন একটি আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছে; অত্যন্ত ছুটাছুটি, পরিশ্রম, কলহ করিতেছে। আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইতেছে না বলিয়া স্বীয় পুরুষকার, দৈব, ভগবান, প্রত্যেককে, একের পর একে আহ্বান করিতেছে এবং সফলকাম বা সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে

পারিতেছে না বলিয়া অশেষ মনের দুঃখে কালযাপন করিতেছে। কিন্তু হয়ত একদিন তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, অথবা সে ভাবিল যে, তাহারে আকাঙ্ক্ষ পূর্ণ হইল, অমনি তাহার মুখে হাসির রেখা ফুটিল। তাহার ললাট কুঞ্চিত অশান্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। তাহার শরীর আর খিন্ন স্বেদসিক্ত বা আকুল সঞ্চালনে ব্যস্ত নহে, এখন তাহা বেশ শান্ত, সুস্থ।

কিন্তু আবার শীঘ্রই চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা দেয়। এবারের চাঞ্চল্য ঠিক যে অতৃপ্তির তাহা নহে। এবারকার চাঞ্চল্য দীর্ঘ ঈপ্সিত, আজ এত নিকট,—তৃপ্তির মুখ চাহিয়া। এই তৃপ্তি, যাহার জন্য সে কত আকুল হইয়া বেড়াইয়াছে, কত খাটিয়াছে, কত প্রার্থনা করিয়াছে, ইহার জন্য কত পবিত্র, কত অপবিত্র চিন্তায় মন পরিপূর্ণ করিয়াছে, সে আজ এত নিকট, ইহারই জন্য এই চাঞ্চল্য। পরে যখন সেই আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিবার জন্য চাঞ্চল্য আরও তীব্র হইয়া উঠে। তখন এই সুখ যত গভীরভাবে যত অধিক কাল ধরিয়া ভোগ করা যায়, সেই চিন্তা, সেই চেষ্টা তাহাকে তত অনুপ্রাণিত করে। এই নূতন চাঞ্চল্যে তাহার ভোগ পরিপূর্ণ হয় এবং যতক্ষণ তাহার সে সুখ ভোগ শেষ না হয়, ততক্ষণ তাহার ভোগের আনন্দের সঙ্গেই সেই ভোগ শেষ হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। তাহাও যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অবিমিশ্র বা সম্পূর্ণ নহে। তাহাতেও আশঙ্কা ভয়, বিষাদ জড়িত রহিয়াছে।

সুখভোগ যত শেষ হইয়া আসে, ততই এই আশঙ্কা, ভয়, বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হইয়া মানব-জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ক্রমে যখন সত্যই সুখভোগের অবসান হয়, তখন প্রধ্বংসাভাবজনিত দুঃখ ও নৈরাশ্য তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

এই জন্যই দেখি, সাংসারিক সুখের প্রথমে দুঃখ, মধ্যে আশঙ্কা-মিশ্রিত সুখ, শেষে আবার দুঃখ। এই জন্যই গীতায় সংস্পর্শজনিত সুখ-ভোগের বিরুদ্ধে মানবকে সতর্ক হইতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু ঠিক দেখিলে দেখিতে পাই যে সংসারে সংস্পর্শজ আনন্দ ত সবই। হয় শারীরিক, না হয় মানসিক। যাহা শারীরিক তাহা ত সকলেই দেখিতে পাই। মানসিক দেখি, মনে কোনও একটি ভাব বা চিন্তার উদ্রেকে। কিন্তু ইহাদেরও ত আরম্ভ এবং শেষ আছে।

মনে কোন একটি ভাবের উদ্রেকে আনন্দ হয়। কিন্তু হয়ত তৎপরেই ভাবান্তরের ঘাত-প্রতিঘাতে আনন্দের স্থলে নিরানন্দের আবির্ভাব দেখিতে পাই। তাহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই, প্রত্যহ না হউক, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃপ্তি কোথাও নাই। তাহার স্থলে একটা সাময়িক অবসাদ মাত্র আসিয়া

করিয়া দেখায়। বিরাট সাহারার তৃষ্ণা ক্ষুদ্র মানবের তৃষ্ণার নিকট হার মানে।

যদি তর্কের খাতিরে বলি যে, আমরা তৃপ্তি পাই, তাহা হইলেও যে বিশেষ সুবিধার কথা, তাহা নহে। কারণ প্রায়ই দেখিতে পাই যে যাহাকে তৃপ্তি বলিয়া তাহার শান্ত ভাবের কীর্ত্তন করি, তাহা তমোভাবপ্রধান, আলস্য-জনিত জড়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্ম্ম হইতে, চেষ্টা হইতে বিরতি চাহি বলিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, এই ওজরে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকি। এই তৃপ্তি আধ্যাত্মিক মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র।

অথচ গীতায় দেখিতেছি, আদেশ, "নিত্য তৃপ্ত" হও। এই "নিত্য তৃপ্ত" হইবার চেষ্টায় আবার যেন কাল্পনিক তৃপ্তির শান্ত ভাব হইতে সুপ্তি, এবং সুপ্তি হইতে আধ্যাত্মিক মৃত্যুতে গড়াইয়া না পড়ি! তাহা হইলে কি গীতায় এই নিত্য তৃপ্ত হইবার উপদেশ মিথ্যা?

আবার উপনিষদে দেখি, "ক্রতুময়ো পুরুষঃ, অথ ক্রতুং কুর্বীত", অধ্যবসায় কর।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

অনবরত কর্ম্ম করিতে করিতে একশত বৎসর বাঁচিতে চাহিবে ইহাই উপদেশ। ইহা ব্যতীত তোমার আর কিছু করিবার নাই।

বিষম সমস্যার কথা। বিরুদ্ধ দুই মত সমান তেজে অভিব্যক্ত হইতেছে।

আবার যদি অধ্যবসায়ই করিলাম,

যদি অতৃপ্তিই মানব-ভাগ্যে স্থিরভাবে লেখা থাকে, তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়া অধ্যবসায় করা মূর্খের কাজ। অধ্যবসায় না করিলেও ত অতৃপ্তি ঘুচে না। অধ্যবসায় করিয়াও ঘুচে না। লাভের মধ্যে পরিশ্রম-জনিত শারীরিক অবসাদ ও তাহার ফলস্বরূপ আশাভঙ্গ, অতৃপ্তি, মানসিক অবসাদ। ইহাই অধ্যবসায়ের সমগ্র ফল।

আবার যদি বলি তৃপ্তি হয়, তাহাতে ত' দেখি যে "তৃপ্তি" কথাটার কোন স্থির অর্থ নাই। কে বা কতটুকুতে তৃপ্ত হয়, তাহারও ঠিক নাই। অল্পবীর্য্য হীনমতি লোকে অল্পেই তৃপ্ত হয়। তাই বলে—

সুপূরা স্যাৎ কুনদিকা সুপূরো মূষিকাঞ্জলিঃ।
সুসন্তুষ্টঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনাপি তুষ্যতি॥

আবার দেখি, একজন যাহাতে তৃপ্ত, আর একজন তাহার দ্বিগুণে তৃপ্ত, তৃতীয় ব্যক্তি তাহার একশত গুণে তৃপ্ত ইত্যাদি। কিন্তু যে দিন তাহার তৃপ্তি আসে, সেই দিনই (তাহার অধোগতি না হউক) ঊর্দ্ধগতি বন্ধ হইয়া যায়। একটা বিরাট সম্ভাবনার হঠাৎ কি এক ক্ষুদ্রত্বে পর্য্যবসান!

উপনিষৎ এই বিষম সমস্যার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। উপনিষৎ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং...যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তন্মর্ত্যং"। ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই অমৃত, যাহা অল্প, তাহা মরণশীল। ইহা যে অকাট্য সত্য, তাহা আমরা জীবনে প্রত্যহ দেখিতেছি!

আলো দেয়, কিন্তু তীব্রতর দীপবর্ত্তিকার নিকট তাহার প্রভা ম্লান হইয়া পড়ে। এই তীব্রতর দীপ-বর্ত্তিকাও আবার কেরোসিন তৈলের বর্ত্তিকার নিকট ম্লান। কেরোসিন দীপবর্ত্তিকাও আবার বৈদ্যুতিক দীপের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। বৈদ্যুতিক দীপও দিবালোকে হীনপ্রভ। এইরূপে স্বল্পশিক্ষিত লোক অল্পশিক্ষিত লোকের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু উত্তরোত্তর অধিক শিক্ষিত লোকের নিকট নিকৃষ্টতর শিক্ষিত লোক হীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। হীনতর লোকের প্রভাব উচ্চতর লোকের নিকট পরাজিত ও মৃত। সে প্রভাব জীবিত থাকে, যতক্ষণ না উচ্চতর লোক তাহার নিকটে আসে। সে প্রভাবের অস্তিত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নহে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে। সে প্রভাবের মূল্য অতি অল্প। কিন্তু যাহা ভূমা, যাহার উপর আর কিছুই নাই, সেই অমৃত, তাহার পরাভব নাই, এবং পরাভবই মৃত্যু, তাই ভূমা অমৃত। সেইজন্যই এই ভূমা প্রার্থনা করিবে, এই ভূমার জন্য অধ্যবসায় করিবে, অল্পে কখনও তৃপ্ত থাকিবে না, অল্প লইবে, কিন্তু অতৃপ্তির ভাবে। ইহার অপেক্ষাও ঊর্দ্ধে যাইতে হইবে, ইহার অপেক্ষাও অধিক লাভ করিতে হইবে। অল্পকে আরও-অধিক-পাইবার সোপান স্বরূপ বিবেচনা ও ব্যবহার করিবে।

তাহা হইলে দেখিতেছি যে উপনিষৎ খুবই জোরের সহিত অতৃপ্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৃপ্তিই মৃত্যু, অতৃপ্তি জীবন। তৃপ্ত হইও না। কিন্তু সত্য কি তাহাই? উপনিষৎ কি বলেন যে চিরজীবন অতৃপ্তির ভীষণ তৃষ্ণা মিটিবে না? মানব কি চিরকাল অতৃপ্তির হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিবে? তাহা নহে।

উপনিষৎ বলেন, ব্যথাবেদনা ও চাঞ্চল্যময় অতৃপ্তির মধ্য দিয়াই চিরশান্তিময় তৃপ্তিতে পৌঁছিতে হইবে। কিন্তু এই অতৃপ্তি অতি তীব্র ও দীর্ঘকালব্যাপী। যথাসময় ভিন্ন এই অতৃপ্তি ত্যাগ করিলে জীবনের সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইহার কথা সুন্দররূপে তৈত্তিরিয় উপনিষদে ব্যক্ত আছে—

যুবা স্যাৎ সাধুযুবা? ধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষ আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামাহতস্য তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বানন্দাঃ। স এক পিতৃণাং। চিদ লোক লোকানামানন্দাঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা দেবানপিয়ন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃঃ স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।

উপনিষৎ বলিতেছেন, আনন্দের কথা!

খুব আনন্দ পাইলাম। কিন্তু সত্য সত্য কতখানি আনন্দ সে পাইয়াছে, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সে পূর্ণ একমাত্রাও মানুষ-আনন্দ পায় নাই। একমাত্রা মানুষ-আনন্দ পাইবার পাত্র কিরূপ, তাহা উপনিষৎ বলিয়াছেন—তিনি যুবা, অর্থাৎ শারীরিক, ও মানসিক ইন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতি পূর্ণ স্বাস্থ্যে বর্ত্তমান; তিনি সাধু, কারণ যুবাও অসাধু হইতে পারে, এবং তাহা হইলে তাহার অশান্তি ও অসুখেরই সম্ভাবনা; তিনি অধ্যায়ক, অধীতবেদ; তিনি আশিষ্ঠ, অশাস্তৃতম; তিনি দৃঢ়িষ্ঠ; তিনি বলিষ্ঠ; এইরূপ গুণসম্পন্ন লোকের পক্ষেই এই পৃথিবী সর্ব্ব বিত্তে পূর্ণ, ইনিই একমাত্রা মানুষ-আনন্দের অধিকারী।

ইহাতেই প্রতীত হইয়াছে যে যিনি ইহা অপেক্ষা গুণে যতখানি হীন, তিনি সেইরূপে ততখানি কম মানুষ-আনন্দ পাইতে পারেন। তাহা হইলে কত কম সংখ্যক লোকে যে একমাত্রা মানুষ-আনন্দের অধিকারী তাহা আমরা বুঝিতে পারি! এই একমাত্রা মানুষ-আনন্দের শতগুণ আনন্দ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ। এই শতগুণ আনন্দও মানুষ পাইতে পারে। কিন্তু যে সে নহে—যিনি এই আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার "অকামহত" হওয়া চাই। তিনি যদি "কামহত" হইয়া ঐ অতি দুর্ল্লভ একমাত্রা মানুষ-আনন্দে মজিয়া যান, তাহা হইলে আর তাঁহার উর্দ্ধগতি নাই। তাঁহার ভাগ্যে ঐ একমাত্রা মানুষ-আনন্দ মিলিয়া সব শেষ হইয়া গেল; না মজিয়া, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া আরও উর্দ্ধগতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্রমে ঐ প্রথমলব্ধ একমাত্রা মানুষ আনন্দের শতগুণ যে একমাত্রা মনুষ্য-গন্ধর্ব্বদিগের আনন্দ, তাহা লাভ হইবে। এখানে দেখিতেছি যে অতৃপ্তিই উর্দ্ধগতির মূলীভূত কারণ।

এইরূপে অতৃপ্তিই ক্রমে সোপান-পরম্পরায় উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতরে মানবকে লইয়া যায়। মনুষ্যগন্ধর্ব্বদিগের আনন্দ হইতে দেবগন্ধর্ব্বদিগের আনন্দে, তাহা হইতে পিতৃলোকদিগের আনন্দে, তাহা হইতে আজানজ দেবদিগের আনন্দে, তাহা হইতে কর্ম্মদেবদিগের আনন্দে, তাহা হইতে ইন্দ্রের আনন্দে, তাহা হইতে বৃহস্পতির আনন্দে, তাহা হইতে প্রজাপতির আনন্দে। এইরূপে মানুষ-আনন্দ হইতে শতগুণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে প্রজাপতির আনন্দে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে এক আনন্দে উপস্থিত হইয়া তৎপর এবং উর্দ্ধস্থিত আনন্দে যাইতে হইলে, পূর্ব্বলব্ধ আনন্দ যতই লোভনীয় হউক, তাহাকে তাচ্ছল্যের সহিত ত্যাগ না করিলে উচ্চতর আনন্দ-প্রাপ্তি অসম্ভব।

এখানে দেখিতেছি যে প্রজাপতির আনন্দ দুর্লভ মানুষ-আনন্দের ১০০০০০০০ ০০০০০০০০০০০০ গুণ। এই আনন্দ যে কত বেশী তাহার ধারণা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহার অপেক্ষাও উচ্চতর আনন্দ আছে। এই বিরাট প্রজাপতির আনন্দেও তৃপ্ত না হইয়া, যে আরও উচ্চতর আনন্দের

সেই আনন্দ ব্রহ্মের আনন্দ। ইহা প্রজাপতির আনন্দেরও শতগুণ। আর এ আনন্দের গুণ এরূপ যে এ আনন্দ কেহ পাইলে—

"ন বিভেতি কুতশ্চন (কদাচন)"

"অভয়ং গতো ভবতি।" ইত্যাদি

তাহার কারণ যে মূল হইতে যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অগভীর গভীর আনন্দের ধারাসমূহ বহিয়া যাইতেছে, সেই আনন্দের মূলকেই সে পাইয়াছে; "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধাঽনন্দী ভবতি।"

কিন্তু এই আনন্দ পাইতেছি না যতক্ষণ না সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সংস্পর্শ হইতেছে। মানুষ-আনন্দ হইতে যত ঊর্দ্ধে উঠিব, ততই ব্রহ্মের আনন্দের নিকট যাইব। উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিলেই ক্রমে ব্যবধান কমিতে থাকিবে। কিন্তু যেখানে তৃপ্ত হইব, আমার ঊর্দ্ধগতি সেইখানেই রুদ্ধ। এমন কি যদি প্রজাপতির আনন্দে গিয়াও তৃপ্ত হই, তাহা হইলে আমার লব্ধ আনন্দ ও ব্রহ্মের আনন্দের মধ্যে ব্যবধান সামান্য হইলেও উক্ত ব্রহ্মের আনন্দ হইতে আমাকে রূঢ়ভাবে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।

এই ব্রহ্ম সংস্পর্শ যে কি বস্তু, তাহার কথা কেনোপনিষদে আছে যে, ইন্দ্র অগ্নি ও বায়ু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারাই প্রথমে ব্রহ্মকে দেখিয়াছিলেন। আবার এই তিন দেবতার মধ্যে ইন্দ্রই শ্রেষ্ঠতম পদলাভ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনিই

কিন্তু এই ব্রহ্মের আনন্দপ্রাপ্তির কারণ ব্রহ্ম সংস্পর্শ। এখানে আবার এক সমস্যা—সংস্পর্শ। গীতাতে ত সংস্পর্শজ সুখকে ত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে তবে "সংস্পর্শ" কিরূপ?

একরূপে দেখিতে গেলে "সংস্পর্শ" কথা ব্যবহার ঠিক এবং অন্যরূপ ভুল। "সংস্পর্শ" মাত্র হইলে ভাল নয়। কারণ সে সংস্পর্শের অবসান হইলেই আবার দুঃখের পুনরুৎপত্তি এবং সুখের পর বলিয়া সে দুঃখ তীব্রতর বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

কিন্তু আমরা যে সংস্পর্শের কথা বলিতেছি, তাহা উপলব্ধি-জনিত। যাহা আছে, এতকাল উপলব্ধ হয় নাই, এবং হইলেই যে সংস্পর্শের ভাব মনে আসে, ইহা তাহাই।

আরও সাধারণতঃ আমরা খণ্ড উপলব্ধি, খণ্ডসংস্পর্শ লইয়াই থাকি। এই সমস্ত খণ্ডসংস্পর্শ ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে যায়। তখন এক খণ্ডসংস্পর্শ তদপেক্ষা বৃহৎ খণ্ডসংস্পর্শে লয় পাইয়া স্বীয় অস্তিত্ব হারায়। এইরূপে যখন বৃহত্তমতে আসিয়া পৌঁছাই, তখন দেখি—

"অনন্তমানো যদনন্তমত্তি"

তিনি সকলকে গ্রাস করিয়া আছেন, তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে এমন কেহই নাই। এত সর্ব্বগ্রাসী, যে ইহার জোয়ার ভাঁটা নাই। ইহার পরিচ্ছেদ নাই। তাঁহারই কথা—

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এ বেদং সর্ব্বমিতি।"

ইনিই সৎ ইনিই সত্তা ইনিই সত্য

ইনিই আনন্দ। ইহা ব্যতীত যাহা কিছু, এক চুল কম হউক না কেন, তাহা সৎ হইতে হীন, তাহা খণ্ড সত্ত্বা, তাহা খণ্ড সত্য, তাহা আপেক্ষিক তাহা বেদনপূর্ব্ব ও বেদনাপর সুখ, তাহা নশ্বর ; যতই দীর্ঘস্থায়ী হউক না কেন, অনন্তের হিসাবে তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা মিথ্যা, আজ আছে, কাল নাই।

যতদিন এই সত্য ব্যতীত অন্য 'জ্ঞান' আমাদের অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন আমরা সত্য হইতে বঞ্চিত থাকিব, ততদিন 'মিথ্যা' আমাদের অধিকার করিয়া থাকিবে। ততদিন আমাদের স্বরূপ যে সত্য, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া মিথ্যারূপের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়া থাকিব। যেদিন এই পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি হইবে, সেইদিনই এই মিথ্যারূপ ত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ পাইব ও আমাদের মুক্তি হইবে। তাই ভাগবতে আছে—

"মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

কিন্তু এই মুক্তিতে পৌঁছবার মূলীভূত কারণ, অতৃপ্তি। নিম্নতর আনন্দে অতৃপ্ত হও। উচ্চতর আনন্দের আকাঙ্ক্ষা কর। নিম্নতরকে সোপান-স্বরূপ করিয়া ঊর্দ্ধতরতে উঠিবার চেষ্টা কর। নিম্নতর যেন তোমাকে আকর্ষণ করিয়া বাঁধিয়া না রাখে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ততোঽধিকতরং পুরুষার্থং ত্বাপ্রপমপি প্রাপ্রিপয়িষুঃ ক তদাস্থো ভবেৎ। ন কশ্চিৎ তদসারজ্ঞস্তদর্থী স্যাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বো হ্যপর্য্যুপর্য্যেব বুভূষতি লোকঃ।"

এইরূপে অতৃপ্তির সাহায্যে যখন ক্ষুদ্র আনন্দকে তুচ্ছ করিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর আনন্দের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া বৃহত্তম পূর্ণতমতে গিয়া দেখিব—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

তখন আনন্দ এত হইবে যে দেখিব,

"আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি, অভিসংবিশন্তি।"

অতৃপ্তির চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়া লাভ হইবে,—অখণ্ড অনন্ত তৃপ্তি ও আনন্দ!

শ্রীবিমলাচরণ দেব।

দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

বর্ত্তমান যুগের কৃষিকার্য্য

আধুনিক জগতে কৃষিকর্ম্ম কলযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত শিল্প-বিশেষ। সাধারণ শিল্প-কারখানার

ও প্রাকৃতিক উপকরণ সরবরাহ করা পর্য্যন্ত সকল কাজেই উচ্চতম বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিতে পাই। বিলাতে বিস্কুট-ফ্যাক্টরী দেখিয়া

রিকার কৃষিক্ষেত্রেও তাহাই বেশ দেখিতে পাইতেছি। রেলে বসিয়া ভুট্টাভাজা, মুড়্কী, চীনাবাদামভাজা, শুকনা মিষ্ট ডুমুর, কৌটায় সুরক্ষিত তাজা আনারস ও নাসপাতি এবং অন্যান্য বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্য পাইয়াছি। মনে হইতেছিল, এই সকল জিনিষ পরিষ্কার করিবার সময় শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছে—শেষ পর্য্যন্ত পুরিয়ার মধ্যে রাখিবার সময়েও কলের সাহায্যই লওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে লোকসংখ্যা অল্প হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বেশী—কারণ এক একটা কল বা যন্ত্র বহু ব্যক্তির কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতেছিলাম—ইয়াঙ্কিরা কি ক্রমশঃ চীন ও ভারতবর্ষের মুড়িমুড়কীর দোকানগুলিও দখল করিয়া ফেলিবে? এ ভয় নিতান্ত অমূলক বলিয়াও মনে হয় না!

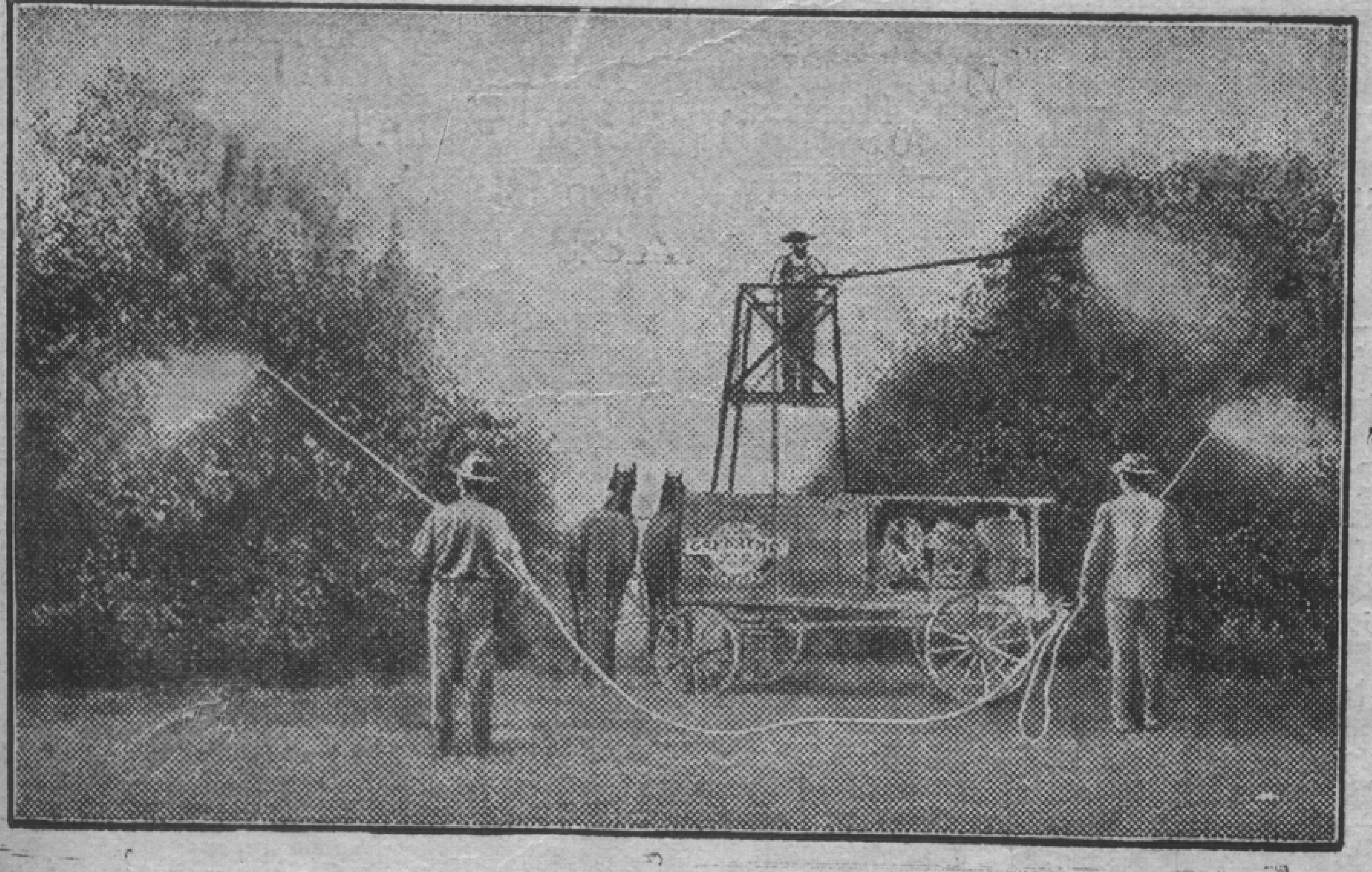
প্রদর্শনী-নগরের কয়েকটা সৌধে প্রবেশ করিয়া আধুনিক কৃষিকার্য্যের চরম নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। ফ্রান্সে মনে হইতেছিল—"ফরাসীরা কৃষিজীবী জাতি, কি শিল্পী জাতি, কি ব্যবসায়ী জাতি, তাহা স্থির করা কঠিন।" ইয়াঙ্কিস্থানের পশ্চিম অঞ্চল এবং এই প্রদর্শনী দেখিয়াও ভাবিতেছি—মার্কিনদেশ কৃষিপ্রধান কি শিল্পপ্রধান কি বাণিজ্যপ্রধান তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। এখানে কৃষিসম্পদের চূড়ান্তই দেখিতেছি। ভারতভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধনধান্য পুষ্পে ভরা বিবেচনা করিতে এখন লজ্জাবোধ হয়। ভারতের কৃষিসম্পদ্ লইয়া বর্ত্তমান যুগে আর গৌরব করা চলে না। শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যাহাই থাকুক না কেন, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ কৃষিকার্য্য হিসাবেও নিতান্তই অবজ্ঞেয়। কাজেই দশ-বিশ বৎসরের ভিতর ভারতবাসীর মুড়িমুড়্কী, চিঁড়ে, খৈ, আম, জাম, খেজুর, আলু ও কপিও বিদেশীয়েরা যোগাইতে থাকিবে এরূপ আশঙ্কা করা পাগলামি বোধ হয় না।

বিগত ৫০।৭৫।১০০ বৎসরের মধ্যে কৃষিকার্য্যে এবং কৃষিবিজ্ঞানে যত পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০০০ বৎসরেও তত হয় নাই। এই অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কোনটাতেই ভারতবাসী সাহায্য করেন নাই; এবং করিবার সুযোগও পান নাই। কাজেই কৃষিজাত দ্রব্য সম্বন্ধেও ভারতবাসী ক্রমশঃ বিদেশীর উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবেন।

আজকালকার কৃষক বলদের সাহায্যকারী মানবমাত্র নয়। তাহারা শিল্প-কারখানার মজুরের ন্যায় কলযন্ত্রের পরিচালক বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানসমূহের নিয়ন্তা। প্রদর্শনীর ক্যালিফর্ণিয়া-ভবন, কানাডা-সৌধ, Horticulture-গৃহ ইত্যাদির ভিতর দেখিলাম, কৃষকদের সকল কার্য্যই উচ্চ অঙ্গের বিদ্যাবলের ফল। ভূমির উর্ব্বরতা নাই—তাহাতে আধুনিক কৃষক ভীত হয় না। সে রাসায়নিক উপকরণের সাহায্যে ভূমির উৎপাদনী শক্তি যথেচ্ছক্রমে বাড়াইয়া লইতেছে। উত্তাপ, আলোক, গ্রীষ্ম-বর্ষা, জলাভাব, জলপ্রপাত, জলাধিক্য ইত্যাদির কোনটা কৃষকের কার্য্যেই আজ-

বলে বর্ত্তমান যুগের কৃষক এই সমুদয় প্রাকৃতিক শক্তির ইচ্ছামত সদ্ব্যবহার করিতেছে। বীজ, অঙ্কুর, ফসল, ফল, মূল, পত্র, লতা ইত্যাদির আকার বাড়ান-কমান অথবা স্বাদ ও বর্ণ বদলান—এই সব কার্য্যও কৃষকেরা অতি সহজেই করিতে পারে। ছোট আলুকে বড় আলুতে পরিণত করা, সকণ্টক ও বিস্বাদ শাক-শব্জীকে নিষ্কণ্টক ও সুস্বাদু জাতিতে পরিণত করা এই সমুদয় কার্য্যে ইহারা সিদ্ধহস্ত। আজকালিকার উদ্ভিদ-জগতে কৃষকেরা ঐন্দ্রজালিক ও যাদুকরের মত। তাহার পর বীজবপন হইতে শস্যকর্ত্তন পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই শতলোকের পরিবর্ত্তে একজন লোকের সাহায্য লওয়া হইতেছে। অল্পমাত্র মানবশ্রমে প্রচুর ফল পাওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু কৃষিকার্য্য সম্পর্কিত কোন দ্রব্যই বৃথা নষ্ট হয় না। কোন না কোন উপায়ে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহও নানাবিধ অর্থকর প্রণালীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাঠের কোন জিনিষই অনাবশ্যক বিবেচনায় ফেলা যায় না।

ভারতবর্ষে দেখা যায় আম জাম কাঁঠাল গাছ একবার খারাপ হইতে থাকিলে সেগুলির আর উন্নতি হয় না। বৎসর বৎসর এই সমুদয়ের ফল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র, স্বাদহীন ও অল্পসংখ্যক হইতে থাকে। পাশ্চাত্যদেশে প্রত্যেক বৃক্ষের উৎপাদনী-শক্তি অশেষ উপায়ে বাড়াইবার ব্যবস্থা আছে। গাছের পাতাগুলি মাঝে মাঝে ধুইয়া পরিষ্কার করিবার জন্যই বহুবিধ কলের ব্যবহার হয়। জলের মধ্যে নানা-প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া মালীরা গাছের পাতায় সেই জল ছিটাইয়া দেয়। বৃক্ষের ব্যাধি নিরূপণপূর্ব্বক রাসায়নিক পদার্থ নির্ব্বাচন করা হয়—এবং বৃক্ষের আকার অনুসারে জল ছিটাইবার



গাছে রাসায়নিক পদার্থ-মিশ্রিত জল ছিটান হইতেছে

কল ব্যবহার করা হয়। "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ"-বিদ্যা হিন্দুর অপরিচিত নয়—কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহার ব্যবহার অত্যল্প হইতেছে—অধিকন্তু, নবীন বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও উন্নতি সাধিত হয় নাই।

কৃষিকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী নানা কল এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। স্যান্‌ফ্রানসিস্কোতেও অনেক দেখিলাম। লাঙ্গল ব্যবহার যেমন কৃষকমাত্রেরই অত্যাবশ্যক সেইরূপ নানাবিধ দমকল, জল ছিটাইবার কল, Force-Pump, Sproyer ইত্যাদির ব্যবহারও আজকাল অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়।

আলুর ক্ষেত্রে, তুলার জমিতে, ফল-ফুলের বাগানে সর্ব্বত্রই এই সকল কলের ব্যবহার হইতেছে। বহুবর্ষজীবী প্রাচীন এল্‌ম্ তরুও এই সমুদয়ের প্রয়োগ-ফলে নবীন ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষে এই সমুদয়ের ব্যবহার-প্রচলন নিতান্তই আবশ্যক। প্রাচীন বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থার সঙ্গে নবীন Horticulture বিদ্যার সংযোগ-বিধান শীঘ্রই কর্ত্তব্য।

উন্নত লাঙ্গল ও সার সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক কথা জানা আছে। কতকগুলি সামান্য সামান্য কার্য্যে কারিগরী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম! একটা কলের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছোট বড় মাঝারি নাসপাতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সাজান হইতেছে। কোন লোকের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। একটা ক্ষুদ্র কলে মুড়কী প্রস্তুত হইতেছে—গুড়ের সঙ্গে খৈ মিশাইবার জন্য কোন লোকের না বসিয়া থাকিলেও চলে। এমন কি চীনাবাদামও কলে ভাজা হইতেছে। আগুনের তাপ এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, হঠাৎ খানিকটা বাদাম বেশী-ভাজা হইয়া যাইতে পারে না। কলের সাহায্যে বাদামগুলি আপনাআপনিই যথাস্থান হইতে পড়িয়া নিয়ম-মত ভাজা হইয়া যথাস্থানে জমা হয়। কলের সাহায্যে কিশমিশের বোঁটা ছাড়ান, খোসা ছাড়ান, পরিষ্কার করাও দেখিলাম। প্রত্যেক স্থলেই পুরিয়া-বাঁধাও কলে হইয়া থাকে।

এই সব দেখিতেছি আর ভাবিতেছি—রজনীকান্তের সাধ

"যদি কুমড়োর মত চালে ধরে র'ত
পান্‌তোয়া শত শত
আর সরিষার মত হত মিহিদানা
বুদিয়া বুটের মত"—ইত্যাদি

একমাত্র মিষ্টান্ন সম্বন্ধেই মিটিয়াছে এমন নহে—মার্কিনদেশীয় লোকেরা উদ্ভিজ্জ বিষয়েও এইরূপ সাধ মিটাইতে সমর্থ। কৃষিক্ষেত্রে যাদুকরেরা অদ্ভুত ফল প্রদর্শন করিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে সোরা উৎপন্ন হয়। এই সোরা সারের উপাদান। কিন্তু এখানে সোরা যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আজকালকার কৃষকেরা হা হতোঽস্মি করিতে থাকিবে কি? বৈজ্ঞানিকেরা আশ্বাস দিয়াছেন—"কোন ভয় নাই।" কৃত্রিম উপায়ে বাতাস হইতে সোরা প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। সোরার প্রধান উপকরণ নাইট্রিক য়্যাসিড। এই য়্যাসিড প্রস্তুত করিবার জন্য খোলা আকাশ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। তাহার সঙ্গে অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ বিধান

করিলে সহজে নাইট্রিক য়্যাসিড তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়। কাজেই ভূমিতে সোরা না পাওয়া গেলেও কৃষকেরা বিব্রত হয় না। স্যানফ্র্যান্‌সিস্কোর একজন বিজ্ঞানসেবীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি বাতাস হইতে নাইট্রিক য়্যাসিড ও সোরা প্রস্তুত করিবার সস্তা ও সহজ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। একদিন ইঁহার ল্যাবরেটরীতে যাইয়া কলগুলি দেখিয়া আসিলাম।

প্রকৃতির দাসত্ব স্বীকার না করিয়া প্রকৃতিকে দাসীতে পরিণত করা বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষকেরা অসাধ্য সাধন করিতেছে। বর্ত্তমান জগতের কৃষিকার্য্য প্রকৃতির খেয়ালের অধীন নয়—প্রাকৃতিক শক্তিগুলি মানবকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মরুভূমিতে সোনাফলান, আঁধার ঘরে চাঁদ ভাসান, বর্ষাকালে আমসত্ব শুকান, কাশীধামে ভূমিকম্প ঘটান, পশ্চিমে সূর্য্য উঠান—এ সব কার্য্য বর্ত্তমান যুগেই সম্ভব।

শুনিতে পাই, কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান প্রয়োগ জর্ম্মাণিতে চূড়ান্তরূপেই হইয়া থাকে। জর্ম্মাণ দেশের ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা নয়—অথচ এখনকার কৃষকেরা রুষিয়ার কৃষকগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতেছে। জর্ম্মাণির ভূমি হইতে সস্তায় বেশী মাল উৎপন্ন হয়—কৃষকগণের লাভও বেশ থাকে। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জর্ম্মাণিতে পূর্ব্ব অপেক্ষা শতকরা ৬০ ভাগ বেশী গোধূম উৎপন্ন হইতেছে—অন্যান্য শস্যের উৎপত্তিও প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বাড়িয়াছে। অথচ এবং কৃষকদিগের সংখ্যাও পূর্ব্বের মত সমানই রহিয়াছে। এই শস্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ বিজ্ঞানের সাহায্য। বস্তুত ইয়াঙ্কিদের ন্যায় জর্ম্মাণরাও শস্য "Manufacture" করিতেছে বলা যাইতে পারে। জুতা তৈয়ারী, জামা তৈয়ারী, কাপড় তৈয়ারী, টেবিল তৈয়ারী, ও গ্লাস তৈয়ারী ইত্যাদি শিল্পের ন্যায় আলু, কপি, বীট-চিনি, গোধূম ইত্যাদি তৈয়ারীও জার্ম্মাণদেশে একটা শিল্পবিশেষ!—ইহাকে কৃষিকার্য্য বলা উচিত নয়। প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করিয়া কৃষকেরা সাধারণ ভূমির উপর একটা ইচ্ছানুরূপ কৃত্রিম ভূমি প্রস্তুত করিয়া লয়। এই কৃত্রিম ভূমির রাসায়নিক পদার্থসমূহই উদ্ভিজ্জের আকারে দেখা দেয়। এই জন্য উদ্ভিজ্জসমূহকে প্রাকৃতিক অথবা কৃষিজাত না বলিয়া শিল্পজাত বলা হইল।

দুধের ব্যবসায়

একদিন প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রায় বার ঘণ্টা কাটানো গেল। চীন, জাপান, ফিলিপাইন, হাওয়াই, শ্যাম, তুরস্ক ইত্যাদি দেশীয় ভবনগুলি দেখিলাম। জাপানী বাগান, চা-গৃহ এবং প্রমোদালয় বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো নগরের পাড়ায় পাড়ায় জাপানী প্রভাব দেখিতে পাই—প্রদর্শনীতেও জাপানীরা প্রভুত্ব করিতেছে। এখানে মার্কিনদের পরেই জাপানীদের জয়জয়কার দেখিতেছি।

ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকজন ভারতবাসীর সঙ্গে দেখা হইল। কেহ কেহ পথশ্রান্ত পর্য্যটকগণকে গাড়ীতে বসাইয়া প্রদর্শনী

উপার্জ্জিত হয়। এই ধরণের ভারতীয় যুবক দুইজন মাত্র চোখে পড়িল। দর্শকমণ্ডলীর ভিতর দুইটি ভারতীয় বালিকার সঙ্গে আলাপ হইল। ইহারা আমেরিকাতেই বাস করিতেছে। ইহাদের সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক শিশুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটি কে?" বুঝিলাম—এই দুই ভগ্নী তাহাদের তিন ভাইয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে এখানে লেখাপড়া শিখিবার জন্য আসিয়াছে। এক্ষণে প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল ইহারা গৃহত্যাগী। দিল্লী নগরীর বণিকবংশে ইহাদের জন্ম। গৃহ হইতে কোন সাহায্য না লওয়া ইহাদের উদ্দেশ্য। পাঁচ হাজার টাকা লইয়া দেশ হইতে বাহির হইয়াছিল। অল্পকালের মধ্যে সে অর্থ নিঃশেষ হয়। তাহার পর হইতে বড় ভাইয়েরা দোকানে ও কৃষিক্ষেত্রে মজুরী করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছে। দৈনিক বেতন ইহারা ছয় টাকা করিয়া পায়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর ধনবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছিল—অর্থাভাবে লেখাপড়া সম্প্রতি স্থগিত রহিয়াছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানে না। যখন ইহারা আমেরিকায় পদার্পণ করে তখন এই শিশুর বয়স ৫।৬ বৎসর মাত্র ছিল। কনিষ্ঠা ভগ্নীও হিন্দী কিম্বা উর্দ্দু জানেন না। স্যানফ্র্যান্‌সিস্কোর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ইহারা লেখাপড়া শিখিতেছে। উচ্চতম শিক্ষা না পাইয়া কেহই স্বদেশে ফিরিবে না। বালকবালিকারা ইয়াঙ্কিদের মতই ইংরাজী বলে—ভারতবর্ষের কোন কথাই জানে না। ইতালীয়, জর্ম্মাণ, পোল ইত্যাদি জাতীয় লোকেরা ইয়াঙ্কিস্থানে আসিয়া যেরূপ হয়, এই ভারতসন্তানগণকেও সেইরূপ বোধ হইল। মোটের উপর ইহাদের উৎসাহ, ভাবুকতা ও অসমসাহসিকতা দেখিয়া



ইয়াঙ্কিস্থানে হিন্দু বালক-বালিকা

পুলকিত হইলাম। ভারতীয় পুরুষ ও রমণীগণের মধ্যে এই শ্রেণীর উত্তম ও হঠকারিতা এখনও অতি বিরল—কিন্তু অল্পকালের ভিতরই এই সকল গুণের আবির্ভাব আমাদের সমাজে হওয়া অত্যাবশ্যক।

পশুবিভাগে খানিকক্ষণ কাটাইলাম। ঘোড়া খচ্চর, গো বলদ, মেষ ছাগল, শূকর কুকুর, বিড়াল, এবং পাখী ইত্যাদি নানাবিধ জন্তু সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পশু-পক্ষী এখানে বিক্রয় করাও হয়। তাহা ছাড়া এইগুলি লইয়া নানাপ্রকার বাজী খেলিবার বন্দোবস্ত আছে। কোন্ মুরগী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ডিম পাড়ে তাহারও পরীক্ষা চলিতেছে। এই প্রতিযোগিতার নাম "International Egg-laying contest"! অশ্বচালন, ঘোড়দৌড়, পোলো-প্রতিযোগিতা, কুকুরের লড়াই ইত্যাদি নানাবিধ খেলারও ব্যবস্থা আছে।

পশুশালার গাভী ও বলদগুলি একটা দুগ্ধব্যবসায়ী কোম্পানীর সম্পত্তি। এই কোম্পানীর প্রস্তুত দুধ স্যানফ্র্যানসিস্কোয় আসিয়া অবধি রোজ পান করিতেছি। এইজন্য ইহাদের গোয়াল-ঘরে কিছুকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। আমরা গোসেবক গোপূজক জাতি, কিন্তু আমাদের গোমাতা ভারতমাতার ন্যায়ই জীর্ণশীর্ণ ও অস্থিকঙ্কাল-সার। মার্কিন দেশের গোখাদক জাতির গোশালা এবং গোধন দেখিবামাত্র আমাদের দুরবস্থা স্মরণ করিলাম। একমণ দেড়মণ দুধ দেয় এরূপ গাভী এখানে অসংখ্য। অধিকন্তু গাভীর জাতি-সংস্কার করিবার জন্য ইয়াঙ্কি বৈজ্ঞানিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। উদ্ভিজ্জগতে বীজের উন্নতি, চারাগাছের উন্নতি, ফলের উন্নতি, ফুলের উন্নতি ক্রমাগত সাধিত হইতেছে। দুই-চারি-দশ বৎসরের ভিতর এক একটা উদ্ভিদের জাতি ও বংশ বদলাইয়া ফেলা হইতেছে। বীজনির্ব্বাচন ইত্যাদির প্রভাবে অতি নিম্ন-জাতীয় উদ্ভিদসমূহও উচ্চজাতীয় উদ্ভিদে পরিণত হইতেছে। এইরূপ নির্ব্বাচন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া পশুপালকেরাও জীব-জগতে নূতন নূতন গুণ-রূপবিশিষ্ট বংশ ও জাতির সৃষ্টি করিতেছে। Breeding বা (উদ্ভিদ পালন ও পশুপালন) বর্ত্তমান যুগে হাতুড়ের কাজমাত্র নয়—উচ্চ অঙ্গের প্রাণি-বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগপূর্ব্বক করিৎ-কর্ম্মা লোকেরা উদ্ভিদ ও পশুর রূপান্তর ও গুণান্তর সাধন করিয়া থাকে। মানব-জগতেও এই ধরণের গুণ-রূপ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের নাম Eagerist বা "বংশোন্নতি সাধক।" যাহা হউক পশুশালায় থাকিতে থাকিতে মার্কিন দেশের Breeding বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। এই বিদ্যা-সম্পর্কিত নানাবিধ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র এবং পুস্তিকাও সংগৃহীত হইয়াছে। কোনটা পক্ষী-সম্বন্ধীয়, কোনটা অশ্ব-সম্বন্ধীয়, কোনটা মুরগী-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি। এই রচনাগুলি খাঁটি বৈজ্ঞানিকের ভাষায় লিখিত নয়—সাধারণ কৃষক পশুপালক এবং গ্রাম্য লোকেরা যাহাতে বংশোন্নতি-বিদ্যা সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্যই এই ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়।

গোশালা দেখিয়া দুধের কারখানায়

আসিলাম। এ কয়দিন লক্ষ্য করিতেছি—আধুনিক যুগের কৃষিকর্ম্ম একটা শিল্প-বিশেষ। আজ দেখিলাম, আজকালকার গোয়ালাগিরিও কলযন্ত্রনিয়ন্ত্রিত কারবার-বিশেষ। সাধারণ কারখানায় আর দুধের কারখানায় কোন প্রভেদ নাই।

আমরা ভারতবর্ষে "গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধে"র বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকি। এই কন্‌ডেন্সড্‌ মিল্ক সুইজর্ল্যাণ্ডে প্রস্তুত হয়। যাঁহারা চা-পানের জন্য অথবা শিশুদের জন্য এই দুগ্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—এই দুধের সঙ্গে চিনি এবং অন্যান্য পদার্থও মিশ্রিত আছে। গরম জলের সঙ্গে না মিশাইলে এই দুগ্ধ তরল হয় না। ইহা আঠাল, দেখিলে দুধ মনে হয় না। ইহার স্বাদও খাঁটি দুধ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। কিন্তু মার্কিন দেশে কৌটায় বন্ধ করা একপ্রকার দুধ পান করিতেছি, তাহাতে দুগ্ধ ছাড়া আর কোন জিনিষ নাই—ইহার রং ও স্বাদ সবই খাঁটি গো-দুগ্ধের মত। বস্তুতঃ গাভীর দুধ হইতে জল শুকাইয়া ফেলিলে দুধের যে অবস্থা হয় এই দুধ সেই ধরণের। অথচ আগুনে জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ, ক্ষীর বা রাবড়িও ইহাকে বলা উচিত নয়। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আসিয়া দুধের জল Evaporate বা শুকাইয়া ফেলিবার প্রণালী দেখিয়া লইলাম।

এই গৃহের কর্ত্তা যন্ত্রগুলির কার্য্য বুঝাইয়া দিলেন। যন্ত্রগুলি বিশেষ জটিল বোধ হইল না। আবার সেই ম্যাঞ্চেষ্টারের বিস্কুট-ফ্যাক্টরীর কথা মনে হইল। মাত্র গো-দুগ্ধ ঢালা হইতেছে—এখান হইতে আপনা-আপনিই দুধ পরবর্ত্তী কলে চালান হইতেছে। দুগ্ধ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন কলের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে অবশেষে বাজারে রাখিবার উপযোগী কৌটা-বন্দী হইয়া পড়ে। এইরূপে হাজার হাজার কৌটা প্রতিদিন বাহির হইতেছে।

কলগুলির সাহায্যে দুগ্ধ সম্পূর্ণরূপেই নির্জ্জলা হইয়া যায়। কৌটাগুলিকেও তাড়িতের দ্বারা বিশেষরূপে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। কাজেই দুধের মধ্যে কোন প্রকার 'ব্যাসিলাই' বা স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থ আসিতে পারে না। শত শত সহস্র সহস্র মাইল দূরেও এই সমুদয় দুগ্ধভরা কৌটা চালান দেওয়া চলে। বহুকাল পরে ব্যবহার করিলেও দুধের কোন দোষ দেখা যায় না। ভারতবর্ষে আমরা এখনও মামুলি প্রথায় দুধ দোহাইয়া থাকি—তাই এবেলার দুধ ওবেলা পর্য্যন্ত থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই বর্ত্তমান যুগের দুগ্ধ-ব্যবসায় আমাদের পক্ষে বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। আজকালকার কৃষকের ন্যায় গোয়ালারাও বস্তুতঃই শিল্পী ও কারিগর বা Manufacturer। ইহারা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় অসম্ভবও সম্ভব করিতেছে।

ছোট কৌটায় প্রায় এক পোয়া দুধ থাকে—মূল্য দশ পয়সা। দুধ এত ঘন যে জলের সঙ্গে না মিশাইয়া পান করা চলে না। অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুধ মিশাইয়া এক পেয়ালা পান করিলাম। মূল্য দিতে হইল না। কলিকাতায় পাঁচ

হয়, এই জলমিশ্রিত দুধের স্বাদ সেইরূপ মনে হইল। সুতরাং মার্কিনেরা অতি সস্তা দরেই দুধ Manufacture করিতেছে না কি? হায়, অল্পকালের ভিতরেই ইয়াঙ্কিরা ভারতের গোপজাতিকেও যে ব্যবসায়হীন করিয়া ফেলিবে দেখিতেছি। তবুও কি আমরা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য কিছু করিব না?

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মেরুদণ্ডের বিকাশ

প্রাণিবিজ্ঞানে প্রাণীদিগের মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী এই দুই প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিকাশক্রমে মেরুদণ্ডী প্রাণিশ্রেণীই শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের "মেরুদণ্ডী" নামের দ্বারা মেরুদণ্ডেই যে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য নিহিত আছে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং মেরুদণ্ডের বিকাশ-আলোচনায় ক্রমবিকাশের বিশেষ রহস্যই যে উদ্ঘাটিত হইবে, তাহা আমরা আশা করিতে পারি।

মেরুদণ্ডের প্রথম গঠন মৎস্যজাতীয় জীবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের পাশ্চাত্য ভাষার নাম হইতে ইহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভাষায় মেরুদণ্ডের নাম Spine। ইহা যেমন মেরুদণ্ডকে বুঝায় তেমনই মাছের পীঠের তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটা বিশেষকেও বুঝায়। মৎস্যাস্থিকে আমরা কাঁটা বলিয়া থাকি। Spine শব্দের প্রকৃতিগত অর্থও অভিধানে কাঁটাই পাওয়া যায়।

মৎস্যজাতির কাঁটাসকল অপর মেরুদণ্ডী জীবদিগের অস্থিসকলের ন্যায় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় না।* সুতরাং ইহাদের মেরুদণ্ডও অপর মেরুদণ্ডী জীবদিগের মেরুদণ্ড অপেক্ষা যে কোমল হইবে তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। ইহা হইতেও তাহাদের মেরুদণ্ডই যে মেরুদণ্ডের প্রথম বিকাশ তাহার প্রমাণ পাই।

মৎস্যাদির মেরুদণ্ড অপেক্ষা পক্ষীদিগের মেরুদণ্ড অধিকতর দৃঢ়; পক্ষীদিগের অপেক্ষা আবার পশুদিগের আরও অধিক দৃঢ়। পশুদিগের মধ্যে আবার বানর ও বনমানুষজাতির মেরুদণ্ড সমধিক দৃঢ়। মনুষ্যদিগের মেরুদণ্ড বানর বনমানুষাদির মেরুদণ্ড অপেক্ষাও দৃঢ়তর। এই প্রকারে মেরুদণ্ডকেই আমরা মেরুদণ্ডী জীবদিগের

* "With respect to fishes, whose growth is slow, and whose skeleton never attains to the consistency which characterizes the bones of mammalia and birds and which in some, as the ray, skates, sharks etc. remains permanently cartilaginous * * *."

National Encyclopaedia, Article: Age of Animals.

ক্রমবিকাশের মানদণ্ড বলিয়া মনে করিতে পারি।

মনুষ্যজাতির বিকাশ-ক্রম পর্য্যালোচনা করিলে আমরা মেরুদণ্ডসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। মানবশিশুকে যে প্রথমে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয়, তাহা হইতে তাহার মেরুদণ্ড যথোচিত দৃঢ় না থাকারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমে যতই মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা হইতে থাকে ততই শিশু প্রথমে উঠিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করে এবং পরে হাঁটিয়া চলিতে সমর্থ হয়। মেরুদণ্ড স্নায়ুরজ্জুর আধার। স্নায়ুরজ্জুর পুষ্টির সঙ্গেসঙ্গেই মেরুদণ্ডের বল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই প্রকারে মেরুদণ্ডের সবলতা হইতেই দেহোন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং স্নায়ুশক্তিই আমাদিগের দেহকে উর্দ্ধদিকে উত্থিত করে। এইজন্যই স্নায়ুর বিশিষ্ট পরিণাম বিকাশের পরিচিহ্ন হইয়াছে। ইহা হইতে মেরুদণ্ডের বা তৎসঙ্গে সঙ্গে দেহের উন্নমনই যে আমাদের উচ্চবিকাশ বা উন্নতির প্রকৃত অর্থ তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

মনুষ্যোচিত উচ্চ বিকাশের আনুষঙ্গিক রূপেই স্নায়ুর বিশেষ পরিপুষ্টি হইয়া থাকে, এবং স্নায়ুর বিশেষ পরিপুষ্টির আনুসঙ্গিক রূপেই মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা হইয়া থাকে। এইজন্যই কোন কারণে মনুষ্যসমাজে শিশুর পক্ষে প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ না ঘটিলে তাহার মেরুদণ্ডের মনুষ্যোচিত দৃঢ়তা না ঘটিবারই সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক মনুষ্যশিশুর প্রতিপালিত হওয়ার যে ঘটনা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে ব্যাঘ্রের ন্যায়ই তাহাকে হাতে ও পায়ে চলিতে জানা গিয়াছে, মনুষ্যের ন্যায় কেবল পায়ে হাঁটিতে জানা যায় নাই।

পশুদিগের মধ্যেও মনুষ্যজাতির সহিত যাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়,—যেমন বানর ও বনমানুষজাতি, তাহাদিগকে কখন কখন হাঁটিয়াও চলিতে দেখা যায়। আমাদের ভাষায় ইহাদের 'বানর' ও 'বনমানুষ' উভয় নাম দ্বারাই ইহারা যে মনুষ্যেরই পূর্ব্ববর্ত্তী বিকাশ তাহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয়। 'বানর' শব্দের অর্থানুধাবন দ্বারা 'নরসদৃশ' এই অর্থই উপলব্ধ হয়; কারণ 'বা' অব্যয়ের উপমা অর্থ অভিধানে স্পষ্টরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—

"বাস্যাদ্বিকল্পোপমেয়য়োরেবার্থেঽপি সমুচ্চয়ে।"

'বনমানুষ' নামের দ্বারা কেবল বন্য ভাবেই মানুষের সহিত পার্থক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য জীব-বিজ্ঞানে ইহারা যে anthropiod ape অর্থাৎ "মানব লক্ষণান্বিত বানর" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিরই পোষকতা দেখা যাইতেছে। এই প্রকারে ইহাদের প্রকৃতিতে মানবের তুল্য বিকাশ হইতেই ইহাদের মেরুদণ্ডও মানব মেরুদণ্ডের সদৃশ দৃঢ় হইয়াছে—তাহাতেই অন্য কোন পশু হাঁটিতে সমর্থ না হইলেও ইহারা হাঁটিতে সমর্থ হইয়াছে।

মেরুদণ্ডের উন্নতি কেবল যে মানসিক বিকাশেরই মানদণ্ড তাহা নহে; তাহা আধ্যাত্মিক বিকাশেরও মানদণ্ড। এইজন্যই উপাসনা—যোগ-সাধন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক

অনুষ্ঠানে আমরা আসনের বিশেষ বিধান দেখিতে পাই; এবং এই সমস্ত বিধানেই মেরুদণ্ডকে বিশেষরূপে সমুন্নত রাখার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। আমরা গীতা হইতে এরূপ আসনের একটি বর্ণনা নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

তত্রৈকাগ্রং মনঃকৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলংস্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীতমৎপরঃ ॥ ১৪

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

"সেই আসনে বসিয়া মনকে একাগ্র করিয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন।"

"দেহের মধ্যভাগ মস্তক ও গ্রীবাদেশকে (অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) সরল ও নিশ্চলভাবে ধারণ করিয়া স্থির হইয়া স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগ (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ) অবলোকন করিয়া এবং অন্যদিকে অবলোকন না করিয়া (শিবনেত্র হইয়া) প্রশান্ত চিত্তে, নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া মনকে সংযত করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ ও যুক্ত হইয়া অবস্থিত করিবেন অর্থাৎ গুরুপদিষ্ট সাধন করিবেন।"

আর্য্যমিশন অনুবাদ।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেও শিরোগ্রীবের সমভাবে অবস্থানই শরীরের স্বাভাবিক অবস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মেরুদণ্ডের সমুচিত দৃঢ়তা দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত রূপ সমুন্নত ভাবটি স্থায়ী হইতে পারে। আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা স্নায়ুবল সঞ্চিত হইয়াই সেই দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। তাহাতেই যোগীগণকে যুগ যুগান্তর অক্লান্তভাবে এইরূপ সমুন্নত অবস্থায় অবস্থিত হইতে দেখা যায়। এই প্রকারে আমরা সমুন্নত মেরুদণ্ডকে আধ্যাত্মিক বলের মানদণ্ডস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারি। ইংরেজীতে "strong backbone of character" 'চরিত্রের দৃঢ় মেরুদণ্ড' রূপ কথা যে প্রচলিত আছে, তাহা ও মেরুদণ্ড যে আধ্যাত্মিক বলেরই আধার তাহারই আভাস প্রদান করে।

আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যেমন মেরুদণ্ডকে সমুন্নত করে—আধ্যাত্মিক অবনতিতে তেমনই ইহাকে অবনত করে। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি সেক্সপীয়র তদীয় "Tempest" (ঝটিকা) নামক নাটকে—সাইকোরেক্স (Sycorax) নাম্নী ডাকিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "who was with age and envy almost bent double",—"যে বার্দ্ধক্যে ও ঈর্ষ্যার ভারে প্রায় দ্বিগুণ নমিত হইয়াছিল।"

এই প্রকারে মেরুদণ্ডের অবনত ভাবের সহিত অনুচ্চ বিকাশের যেরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে—মেরুদণ্ডের অভাবের সহিত তদ্রূপ আরও অধিক অনুচ্চবিকাশের সম্বন্ধও জড়িত হইয়াছে। তাহাতেই নৈতিক চরম অবনতি প্রকাশ করিবার জন্য কৃমি কীটের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডহীন জন্তুর মৃত্তিকার বুকে ভর দিয়া চলা বুঝাইতে ইংরেজীতে creep শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই creep শব্দ চাটুকারিতার হেয় অর্থও প্রকাশ করে। ইংরেজীতে চাটুকারিতার বাচক যে "cringe" শব্দ

পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃত অর্থ নতদেহ বা আনতজানু হওয়াই বুঝায়। ইহা দ্বারাও মেরুদণ্ডের নতভাবের প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হই। সুতরাং আমাদের মেরুদণ্ডের উন্নতি যেমন উৎকৃষ্ট বিকাশের নির্দ্দেশক তেমনই মেরুদণ্ডের অবনতি বা অভাব যে নিকৃষ্ট বিকাশের নির্দ্দেশক তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য

গবর্ণমেণ্টের Statistical Report বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ভারতের বহির্বাণিজ্য শনৈঃ শনৈঃ বাড়িতেছে। ১৯০৪—৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের সহিত ১৯১৩-১৪খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের তুলনা করিলে এই কথার যাথার্থ্য সহজেই উপলব্ধি হয়। ঐ বৎসরে আমাদের দেশ হইতে ১৫০ কোটির অধিক দ্রব্য রপ্তানি এবং কিছু কম ১১০ কোটির দ্রব্য বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানি হয়। ১৯০৬-৭ সালে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ১৬৫ কোটি মুদ্রা। ঐ বৎসরে আমাদের দেশে আমদানী দ্রব্যের মূল্য ১১০ কোটি মুদ্রা হইবে। ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য আরও বেশী,—এই বৎসর আমরা প্রায় ১৭৫ কোটি মুদ্রার দ্রব্য বিদেশে চালান দিই, এবং ১২০ কোটি টাকার দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করি। পর বৎসরে ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে আমদানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়; রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য গত বৎসরের অনুরূপ; —আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ১৩৫ কোটি ও ১৭৫ কোটি মুদ্রা। ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের বাণিজ্যের কিছু অবনতি ঘটে। এই অবনতির প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-(International trade)-বিপ্লব। ঐ সালে আমরা মাত্র ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করি; এবং বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যাদির মূল্যও ১৩০ কোটি মুদ্রার অধিক নহে। ইহার পর বৎসর হইতে আবার ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য কিছু কম ১৯০ কোটি মুদ্রা; এবং আমদানি দ্রব্যও প্রায় ১৩৫ কোটি টাকার। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি বাবদে কিছু কম ২১০ কোটি টাকার দ্রব্য চালান যায় এবং প্রায় ১৫০ কোটি মুদ্রার দ্রব্য ভারতে আমদানি হয়। ১৯১১-১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা যথাক্রমে প্রায় ২৩০, ২৫০, ২৫০, ও ২৫০ কোটি মুদ্রার দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়াছি এবং বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ১৩৮, ১৫০, ১৭০ ও ২১০ কোটি মুদ্রা। উপরে এই যে নয় বৎসরের

তুলনামূলক (comparative figure) অঙ্ক দেওয়া গেল, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ভারতের বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নতির মুখে চলিয়াছে। ইহা আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান ভারতীয় বাণিজ্যের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। এখানে সেই স্বাতন্ত্র্যের কথাটিও সংক্ষেপে বিবৃত করা উচিত। মোটামুটি ভাবে এ কথা বলা পারা যায় যে, আমরা সমস্ত সভ্যজগৎকে কাঁচা মাল (Raw Material) যোগাই আর তাহার পরিবর্ত্তে সভ্য জগতের নিকট হইতে আমরা তৈয়ারি মাল পাইয়া থাকি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমরা কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন করিয়া তুলা প্রস্তুত করি, তুলা বিদেশে চালান যায়, এবং তাহা হইতে আবার সেই তুলাই বস্ত্রে পরিণত হইয়া আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করে। আমাদেরই দেশে প্রস্তুত চামড়া (Hide) জুতায় পরিণত হইয়া আসিয়া আমাদের শ্রীচরণে বুটের আকার ধারণ করে। আমাদেরই দেশে উৎপন্ন পাট বিদেশে গাত্রবস্ত্রে পরিণত হইয়া আবার এখানে আসিয়া আমাদের শরীর রক্ষা করে। এইরূপে আমাদের দেশের উৎপন্ন অধিকাংশ দ্রব্যই বিদেশীর দ্বারা Raw Material ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ কি? ইহার সহজ অর্থ এই যে, ইহা যুগান্তরের সূচনা করিতেছে। এতদিন আমরা নিষ্ক্রিয় শান্তি-প্রিয় জাতিমাত্র ছিলাম। ছায়া-দিয়া-ঘেরা কলহশূন্য পল্লীজীবন আমাদের আদর্শ ছিল। কিন্তু সে নেশা ছুটিতেছে। এখন কলহ চাই, মারামারি চাই, ঠেলাঠেলি চাই। এই শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে নগরের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বাণিজ্যের পথ ক্রমশঃ সুগম হইতেছে এবং ভারতবাসীর জীবিকা-নির্ব্বাহের নানা উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারত এখনও নূতনের সহিত সম্পূর্ণ বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারে নাই; তাই এখনও অতি-বৃদ্ধ ভারতবর্ষ Factoryর জীবন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই; ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে মাত্র। এইজন্যই ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত করিবার জন্য বিদেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং বাধ্য হইয়া আমরা তাহাদের সাহায্য লইতেছি। এইজন্যই ভারতকে Mart for Raw materials নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হইতে ভারতে কল-কারখানাও কিছু কিছু বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ কয়েক বৎসর হইতে আমাদের দেশের যুবকগণ বিদেশ হইতে কলকারখানা চালাইবার উপায় শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, ভারত কৃষিকার্য্যকেই আর একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ না করিয়া Factoryর জীবন শীঘ্রই বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করিবে। তাহার সূচনা কিরূপ দেখা যাইতেছে, প্রথমে তাহাই বলিতেছি।

চাষ-বাস ভারতবর্ষের প্রধান অবলম্বন। ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৬৭ জন চাষ-বাসের উপর নির্ভর করে। অবশিষ্ট

ভারতবর্ষে যে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যসূত্র জড়িত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাইতেছি, এই কল-কারখানা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের জীবিকা-অর্জ্জনের পথে কতটুকু সহায়তা করিতেছে। ইহার পর বিলাতের কল-কারখানার সংখ্যা ও প্রণালীর সহিত ভারতীয় কল-কারখানার তুলনা করিয়া দেশের ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রকার কল-কারখানার সংখ্যা ছিল ৩৩২৭। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৩৮৬৭টি কারখানা (Factory) স্থাপিত হয়; ইহা ব্যতীত করদ ও মিত্ররাজ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত কারখানার সংখ্যাও ১৭টি। কোন্‌প্রকার কারখানার সংখ্যা কত, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল;—

তুলার কল—২৬৮
পাটের কল—৬৫
পাট পিষিয়া গাঁট বাঁধিবার কল—১২০
জিন ও তুলা বাঁধিবার কল—১৫৩৯
চালের কল—৩২৭
রেলওয়ের কারখানা—১২৯
ময়দার কল—৪১
লোহা ও পিতল ঢালাইয়ের কল—৪৮
কাঠ কাটিবার (Saw mill) কল—১২৯

উল্লিখিত কলগুলির মধ্যে পাটের কল ও কাপড়ের কলগুলিই বিখ্যাত। যে দেশে যে Raw Material হয়, সেই দেশে প্রায় সেই জাতীয় কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বেরার প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়, এজন্য বোম্বাই প্রদেশেই কাপড়ের কল অধিক। পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া, এইজন্য কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া হুগলী অবধি গঙ্গার দুই ধারে অসংখ্য পাটের কল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্ম চালের আড়ৎ। এইজন্য চাল ভাঙ্গিবার কল ব্রহ্মদেশে অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপরে কল-কারখানার যে Figure দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে যেগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং কারখানার আইনের মধ্যে আসিয়া পড়ে না, সেগুলি ছাড়িয়া দেওয়া গেল। ঐ কল এঞ্জিন বা তাড়িত সাহায্যে পরিচালিত; কিন্তু অবশিষ্টগুলি প্রায়ই স্বভাবের সাহায্য গ্রহণ করে না। সেগুলি সাধারণতঃ ছোট কুঠি এবং খুব অল্প লোক লইয়া সেখানে কাজ-কর্ম্ম হয়। এই জাতীয় কলগুলি প্রায়ই পাথরের কল, না-হয় রেশমের ছোট ছোট ছিপিখানা ছাপাই কল।

ভারতের কলগুলিতে যে সমস্ত শ্রমজীবী তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য কার্য্য করে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১০,৫৮১৪১ জন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা ছিল ৯,৭৮৯২৩ জন। এই মোট শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা কেবল কারখানা-সংক্রান্ত আইন-কর্ত্তৃক পরিচালিত কলে কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা ৮,৬৯৬৪৩ জন; তাহাদের মধ্যে ৬,৮৫৮২২ জন পুরুষ, ১,৩০,০২৫ জন স্ত্রী, ৪৪,১৩২জন বালক এবং ৯,৬৬৪ জন বালিকা। মোটামুটি বলিতে হইলে, বলা যায় যে, সমগ্র ভারতে যত লোক কারখানায় কার্য্য করিয়া দিনপাত করে, তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৭ জন

বাঙ্গালায় এবং ৩০ জন বোম্বাইয়ের কল-সমূহে কার্য্য করিয়া থাকে।

এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে সংঘর্ষের ভাব প্রবলভাবেই আমাদের দেশে প্রবেশ করিতেছে। ইহাকেই আমরা যুগান্তরের সূচনা বলিয়া মনে করি। ভারতে কল-কারখানা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই বিশ্বাস হয়। আমাদের দেশের অনেক কাঁচা মাল (Raw material) ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত করিবার জন্য বহু সহস্র কারখানার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক, কেন না এখনও আমরা অনেক কাপড় ভারতের বাহির হইতে আনিয়া তবে আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছি। জুতার কারখানা এদেশে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় "উৎকল টানারি" প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ কার্য্য করিতেছে; এই জাতীয় বহু 'টানারী'র এখনও প্রয়োজন আছে। পশম ও রেশমের কারখানারও বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। কোন্ দ্রব্য বাবদে কত টাকার দ্রব্য আমাদের দেশে আমদানি হয়, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাপড়ের কল ছিল না। আমরা ঘরে কাটা সুতা তাঁতিদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া, তাহাদের দ্বারা কাপড় বুনাইয়া লইতাম। তাহাতেই আমাদের লজ্জা নিবারণ হইত। এই জাতীয় বস্ত্র অত্যন্ত মোটা ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইত। বিলাসীদিগের জন্য একপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের তাঁতিগণ হাতে প্রস্তুত করিত; কিন্তু গৃহস্থগণ তাহা কখনও চক্ষেও দেখিতে পাইত না। আর্ক-রাইট প্রভৃতি মনীষিগণকর্তৃক উদ্ভাবিত অভিনব কলে পরিপূর্ণ ম্যাঞ্চেষ্টার যদি আমাদের দেশে অল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট বস্ত্রের আমদানি না করিত তাহা হইলে স্বল্পে সন্তুষ্ট গতানুগতিক তন্তুবায়-সম্প্রদায় আরও কতকাল সনাতন প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিত, তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশ ব্যবসায়-হিসাবে সমধিক উন্নত। তথাকার ব্যবসায়িগণ য়ুরোপবাসিগণের সহিত বাণিজ্যে অনেকটা প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরেই প্রথম কল স্থাপিত হয়। আমাদের দেশের লোকেরা তখনও কল-কারখানার উপযোগিতা বুঝিতে পারে নাই,—মুক্ত ময়দানে বিস্তৃত গগন-তলে বসিয়া পুরুষানুক্রমে স্বচ্ছন্দে যাহারা উদর পূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বদ্ধ স্থানে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক হওয়া বিচিত্র নয়। কাজেই বাঙ্গালায় কল-কারখানার আশানুরূপ উন্নতি এখনও দেখা যায় নাই। বোম্বাইয়ের উন্নতিশীল পারসীগণ কাপড়ের ব্যবসা অনেকটা নির্ব্বিবাদে হস্তগত করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছে। অত্যল্পকাল মধ্যে বোম্বাই কাপড়-কলের পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছে। কাপড়ের ব্যবসায় কেমন ধীরে ধীরে এই ক্ষেত্রে উন্নত হইতেছে, নিম্নে উদ্ধৃত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে তাহা বুঝা যাইবে।

১৮৭৯—৮৪ সাল	পর্য্যন্ত	কাপড়ের কল	৬৩
১৮৮৪—৮৯	"	"	৯৩
১৮৮৯—৯৪	"	"	১২৭
১৮৯৪—৯৯	"	"	১৫৬
১৮৯৯—১৯০৪	"	"	১৯৫
১৯০৪—১৯০৫	"	"	২১৮
১৯০৯—১০	"	"	২৪৫
১৯১০—১১	"	"	২৫৪
১৯১১—১২	"	"	১৫৮
১৯১২—১৩	"	"	১৬৬
১৯১৩—১৪	"	"	২৬৪

Currency Reform এর পর হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্য ক্রমশ উন্নতিলাভ করিতেছে। ১৮৯৪—১৮৯৯ সালের মধ্যে বোম্বাই সহরে ২৭টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর উন্নতি তত দ্রুত না হইলেও বোম্বাই নিতান্ত পিছাইয়া পড়িতেছে না। কেবল গত বৎসরে বোম্বাইয়ের কোনই উন্নতি হয় নাই, বরং দুইটি কল উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি?

আমাদের দেশে প্রস্তুত সমস্ত কাপড় কেবলমাত্র আমরাই ব্যবহার করিতাম না। তাহার অধিকাংশই আমরা হয় চীনে, না হয় জাপানে বিক্রয় করিতাম। সম্প্রতি জাপানে এই সব জিনিষের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা যে শুধুই আমাদের কাপড় লইতেছে, তাহা নয়, অধিকন্তু চীনের ব্যবসায়ও হস্তগত করিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও দুইটি সাময়িক দুর্ঘটনায় বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ১৯১৩ সালে আমাদের দেশের কতকগুলি দেশীয় ব্যাঙ্ক ফেল হয়। বোম্বাইয়ের কলগুলির তাহাদের সহিত লেন-দেন ছিল, কাজেই এই দুর্ঘটনার পর হইতে তাহাদেরও আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বেরার প্রদেশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। কলওয়ালারা পর-বৎসরে উচ্চদরে বস্ত্র বিক্রয় করিবার আশায় অধিক সংখ্যক বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া গুদাম-জাত করে; পর বৎসরেও তুলার দর বৃদ্ধি পায় নাই, তাহার উপর য়ুরোপে মহাসমরের সূচনা হইতেই রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ আশাতীতরূপে হ্রাস পাইয়াছে। ফলে তাহাদের বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

কাপড়ের কলগুলিতে প্রায় ২,৬০৮৪৭জন লোক কার্য্য করে। ইহাদের মধ্যে ১,৮৯৫৯৮ জন পুরুষ, ৪৪,৮৪৮ জন স্ত্রীলোক, এবং ২৬,৪০১ জন বালক-বালিকা। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে সর্ব্বসমেত ৬৪,৪৮,৫২৬৭৭ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে ২০,৬৭৯০৪১৭ পাউণ্ড আমরা বিদেশে পাঠাইয়া দিই। এক্ষণে আমাদের দেশে যে সূতা উৎপন্ন হয়, তাহা ২৫ নম্বরের নীচে। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর সূতা যথেষ্ট প্রস্তুত করিতাম। গত বৎসর ভারতবর্ষে প্রায় ১৯০০০০০০ পাউণ্ড সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

এইবার পাটের কথা বলিব। পাটের কার্য্যকারিতা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা নীল চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালা দেশই নীলের একচেটিয়া ব্যবসার স্থান ছিল। ইহারও পূর্ব্বে বাঙ্গালা য়ুরোপকে রেশম যোগাইত। বাঙ্গালার প্রাচীন ব্যবসায়ের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যখন বাঙ্গালার রেশমের ব্যবসায় চীন ও নীলের ব্যবসায় জর্ম্মাণি গ্রাস করিয়া বসিল, তখন হইতেই সে পাটের একচেটিয়া কারবার লাভ করিয়াছে। এখন পাটের কারবারই বাঙ্গালার প্রধান কারবার। শুনা যাইতেছে য়ুরোপীয়গণ রসায়ন-সাহায্যে বৃক্ষ-ত্বক হইতে সূতা বাহির করিয়া নকল পাট প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যতদিন না তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয়, ততদিন পাট আমাদের একচেটিয়া ব্যবসায় থাকিয়া যাইবে। ১৮৭৮—৭৯ পর্য্যন্ত পাটের কারবার তত লাভজনক ছিল না, কাজেই লোকে এই ব্যবসায়ে ততখানি মনোনিবেশ করিত না। কিন্তু ১৮৭৯—৮০ হইতে এই ব্যবসায় ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। নিম্নে পাটকলের কারখানা ও শ্রমজীবিদিগের সংখ্যা প্রদত্ত হইল :—

	কারখানার সংখ্যা	শ্রমজীবীর সংখ্যা (নম্বরগুলি হাজার-করা হিসাবে)
১৮৭৯—৮৪	= ২১	৩৮.৮
১৮৮৪—৮৯	= ২৪	৫২.৭
১৮৮৯—৯৪	= ২৬	৬৪.৩
১৮৯৪—৯৯	= ৩১	৮৬.৭
১৮৯৯—১৯০৪	= ৩৬	১১৪.২
১৯০৪—০৯	= ৪৬	১৬৫
১৯০৯—১৯১০	= ৬০	২০৪.১
১৯১০—১৯১১	= ৫৮	২১৬.৪
১৯১১—১৯১২	= ৫৯	২০১.৩
১৯১২—১৯১৩	= ৬১	২০৪

সাল	পাটের থলি (নম্বরগুলি দশলক্ষ হিঃ)	পাটের কাপড় (নম্বরগুলি ১০ লক্ষ গজ হিঃ)
১৮৭৯—৮৪	৫৪.৯	৪.৪
১৮৮৪—৮৯	৭৭	১২.৪
১৮৮৯—৯৪	১১১.৫	৪১
১৮৯৪—৯৯	১৭১.৫	১৮২
১৮৯৯—১৯০৪	২০৬.৫	৪২৭.২
১৯০৪—০৯	২৫৭.৮	৬৯৮
১৯০৯—১০	৩৬৪.৪	৯৪০.১
১৯১০—১১	৩৬০.৯	৯৫৫.৩
১৯১২—১২	২৮৯.৯	৮৭১.৫
১৯১২—১৩	৩১১.৭	১, ০২১.৮
১৯১৩—১৪	৩৬৮.৮	১, ০৬১.২

ইতিমধ্যে কাঁচা পাটের রপ্তানিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৫৫০,০০০০ হনড্রেড ওয়েট কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৭৯—১৮৮০ কাঁচা পাটের রপ্তানি ৭৫০০০০০ হনড্রেওয়েট মাত্র ছিল। কাঁচা পাটের দাম ক্রমশঃ উঠিতেছে। ১৯০৭—৮ খৃষ্টাব্দে যে বেলের পাটের দাম ৪২৲ টাকা মাত্র ছিল, ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে সেই বেলের পাটের দাম দাঁড়াইয়াছিল, ৭৬৸০। ইহাই পাটের Record Sale.

ভারতে আর একটি দ্রব্য ক্রমশঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। সেটি কাগজ। ভারতবর্ষের বাসিন্দারা এখন আর ভূর্জ্জপত্রে লিখে না। পূর্ব্বে মহাভারতের ন্যায় প্রকাণ্ড গ্রন্থও ভূর্জ্জপত্রে লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু এখন কাগজ না হইলে কাহারও চলে না। ১৯১৩—১৪

ব্যবহার করিয়াছি। কাজেই আমাদের কলের কাগজের প্রয়োজন আছে। গত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে মোট কাগজের কল ছিল নয়টি। এই নয়টির মধ্যে তিনটি বাঙ্গালায়, চারিটি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে, একটি যুক্ত রাজ্যে, এবং একটি গোয়ালিয়র ষ্টেটে অবস্থিত আছে। এই সমস্ত কলে ৫৪ লক্ষ টাকা ফেলা (Invested) হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই সমুদয় কল হইতে ৮১৫ লক্ষ টাকার, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৭৭ লক্ষ এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৮০ লক্ষ টাকার কাগজ প্রস্তুত হয়। এই সময়ে য়ুরোপে প্রস্তুত শস্তা দরের কাগজ আমাদের দেশে আমদানি হয়। তাহাতে আমাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে। এই আমদানি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। নিম্নে বিদেশ হইতে আনীত ও এ-দেশে প্রস্তুত কাগজের একটি তুলনামূলক তালিকা দিলাম :—

সাল	ভারতে উৎপন্ন কাগজ (মূল্য)	বিদেশী কাগজ (মূল্য)
১৯০৯	৭৯,১২০০০৲	১০,০৩,০০০৲
১৯১০	৮১,৫২০০০৲	১১,০০৬,০০০
১৯১১	৮০,০৪০০০৲	১১,৬১২,০০০
১৯১২	৭৭,০৬,০০০	১৩,৫৪৩,০০০
১৯১৩	৮০,৩৭,০০০	১৪,৯০০,০০০

ভারতবর্ষ কথনই পশমের জন্য বিখ্যাত ছিল না। ছাগ, চামরী প্রভৃতি পশুলোমে কাশ্মীরে ও পঞ্জাবে হাতের তাঁতে গাত্র-বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ভারতে উৎকৃষ্ট পশম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কখনই পাওয়া যাইত না। পশমের ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া কতিপয় য়ুরোপীয় বণিক কয়েকটি কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ার সূক্ষ্ম পশমের সহিত ভারতের নিকৃষ্টতর পশম মিশ্রিত করিয়া সৈনিকগণের জন্য একরূপ গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন। সমগ্র ভারতে সাতটি পশমের কল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে মহীশূর ষ্টেটে একটি কানপুরে এল্‌গিন ও লালিম্‌লি নামক দুইটি এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত ধারওয়ালের পশমের কলই সমধিক প্রসিদ্ধ। নিম্নে ভারত-জাত ও বিদেশ হইতে আনীত পশমের কাপড়ের তালিকা দেওয়া গেল :—

সাল	ভারতে প্রস্তুত (মূল্য)	বিদেশ হইতে আনীত (মূল্য)
১৯০৯	৪৩২৫০০০৲	২০১৮৫০০০৲
১৯১০	৪৭২০০০০৲	২৯২৯৭০০০৲
১৯১১	৫১০৪০০০৲	৩৪৫৪৩০০০৲
১৯১২	৫৩৮৩০০০৲	৩০৪৪২০০০৲
১৯১৩	৬১৬৬০০০৲	৩৮৪১২০০০৲

আমরা কিছু কিছু কম্বল ও কারপেট ইত্যাদি পশমীদ্রব্যও ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকি। কোন্ বৎসরে কত টাকার দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

		টাকার	দ্রব্য
১৯০৯ সালে	২০৬৮০০০	”	”
১৯১০ সালে	২৪৫৫০০০	”	”
১৯১১ সালে	২৪৪৮০০০	”	”
১৯১২ সালে	২২৬২০০০	”	”
১৯১৩ সালে	২২৩০,০০০	”	”

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

(৪২)

বিপিন মালতীকে উপেক্ষা করিয়া গুহায় গিয়া রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালা গুহার বাহিরে রুদ্ধ করিয়া আসিতে পারিল না। গুহার মধ্যেকার নিরেট অন্ধকার একখানা প্রকাণ্ড কালো পাথরের মতো তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল; গুহায় সে একা, তাই সহস্র চিন্তা তাহার মন ছেঁকিয়া ধরিতে লাগিল। মালতী কার ছবি বুকে করিয়া কাঁদিতেছিল? মালতীর জন্য সে পিতামাতার স্নেহ-স্বর্গচ্যুত; নিরাশ্রয় সন্ন্যাসী হইয়াও সে ত মালতীর চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে নাই; সে যে নির্জ্জন গুহায় তপস্যা করিতে আসিয়া শুধু মালতীরই ধ্যান করিতেছে। আর মালতী?—সে কাহার অনুরক্ত, কাহার বিরহে তাহার এত আকুলতা, অশ্রুজলে সে কাহার স্মৃতির তর্পণ করে? বিপিনের মন নানা সন্দেহে নানা আশঙ্কায় পীড়িত হইতে লাগিল—কেন সে জানিয়া আসিল না সে ছবিখানি কার! বিপিন বৃশ্চিকদষ্ট বন্দীর মতো ছটফট করিতে লাগিল—এত কষ্ট, এমন কষ্ট, জীবনে সে কখনো ত পায় নাই। বিপিন গীতা পাঠে মন দিল—

> বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
> নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি॥

মালতীরও বুকে বড় ব্যথা বাজিয়াছিল। তাহাকে অপমানের মধ্যে অসহায় ফেলিয়া বিপিন অক্লেশে চলিয়া যাইতে পারিল! পুরুষ মাত্রেই কি এমনি নির্ম্মম, এমনি নিষ্ঠুর, এমনি হৃদয়হীন! কোনো পুরুষ ত তাহাকে কখন এতটুকু করুণা করে নাই। শান্তি যদি না থাকিত তবে তাহার লজ্জা ঢাকিত কে? সে বড় বিশ্বাস করিয়া বিপিনের সঙ্গে আসিয়াছিল—নবকিশোর থাকিলে তাহার প্রতি এই অপমান কখনো সে নীরবে সহ্য করিত না। মালতীর নবকিশোরের উপর দারুণ রাগ হইতে লাগিল—কেন সে বিপিনকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল না, কেন সে বিপিনকে এমন করিয়া বহিয়া যাইতে দিল!

গুরু প্রেমানন্দের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আপনার কাছে আপনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, আপনার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া দুর্ব্বল সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। গুরু সঙ্কল্প করিলেন তিনি তীর্থপর্য্যটনে যাইবেন। বিলম্ব করা নয়, শীঘ্রই।

গুরু দীর্ঘকালের জন্য তীর্থপর্য্যটনে যাইবেন, শিষ্যশিষ্যারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ বিমর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি সর্ব্বক্ষণ গুরুর কাছে-কাছেই তাঁহার সেবা করিয়া ফিরিতেছে। মালতী আবার একাকী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার প্রাণে কেমন একটা মুক্তির আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল; এই আশ্রমে কিছুদিন অন্তত

গুরু থাকিবেন না, বিপিন কিছুদিনের জন্যও প্রেমানন্দের প্রভাব হইতে বিযুক্ত হইবে, এই সম্ভাবনাতেই মালতীর মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

কাল প্রত্যুষে প্রেমানন্দ তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিবেন। সমস্ত দিন তিনি ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান পূজা করিয়া তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া লইতেছিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে সমস্ত শিষ্যশিষ্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিয়া গুরু আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। কেবল মালতী আশীর্ব্বাদ লইতে বা গুরুকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিতে আসিল না। বিপিন ত গুহায় বদ্ধ। কিসের একটা উত্তেজনা গুরুর চিত্ত আলোড়িত করিতেছিল —তাহার সংঘাতে তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত ও অবস্থা বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রেমানন্দ বুকের উপর দুই হাত শৃঙ্খলিত করিয়া দীর্ঘ ঋজুভাবে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

রাত্রি গভীর নিশীথ হইয়া গেল তবু তাঁহার পায়চারির বিরাম নাই; একবার ঘর হইতে লাইব্রেরী-ঘরে, আবার লাইব্রেরী-ঘর হইতে ঘরে, বারবার ধীরে ধীরে গতায়াত চলিতে লাগিল; মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি উদাস লক্ষ্যহীন।

স্তব্ধ গভীর নিশা। ঘরের মধ্যে একটা ঘড়ী মুহূর্ত্ত গণিতেছে, পাশের ঘরে মালতীর নিশ্বাস পতনের শব্দ শোনা যাইতেছে; মর্ম্মরসোপানে গঙ্গাজলের মর্ম্মর শব্দ প্রেয়সীর কানে প্রণয়গুঞ্জনের মতো হিমভরা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। গঙ্গার পরপারে একটা কুকুরের চীৎকার-শব্দ জলের উপর দিয়া গড়াইয়া এপারে আসিতেছিল। আর কোথাও কোনো প্রাণের সাড়া নাই। প্রেমানন্দ বেড়াইতে বেড়াইতে এক-একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া তাহাই শুনিতেছেন।

হঠাৎ মালতীর ঘরের অর্গলহীন কপাট উন্মুক্ত হইয়া গেল। কপাটের ফাঁক দিয়া লাইব্রেরী-ঘরের প্রদীপের স্বর্ণকিরণ সোনালি সূতার জালের মতন বাতাসে ভাসিয়া গিয়া মালতীর মুখে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রেমানন্দ থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিলেন মালতী ঘুমাইতেছে। নরম বালিশে তাহার মাথাটি ডুবিয়া গেছে; খোঁপাতে চাপ লাগিয়া মুখের চারিধারে চুলগুলি ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর প্রদীপের সোনালি আলো আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে,—যেন জলের উপর বড় একটি পদ্মফুল অরুণালোকে পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বুকের উপর শুভ্রবাস নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ঢেউয়ের মতো দুলিতেছিল, যেন উষারাণী ফুলের বনে নিদ্রামগ্ন।

প্রেমানন্দ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যতই ঐ মুখ তাঁহার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাঁহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমশ অবশ হইয়া চারিদিকের হাল্কা হাওয়ার সহিত মিশাইয়া যাইতে লাগিল;—বিশ্বজগতের মধ্যে কিছুই আর রহিল না, রহিল শুধু তাঁহার অচপল দৃষ্টি আর ঐ নিদ্রামগ্ন মুখখানি। তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে প্রেমানন্দের মন

হইতে বিপিন, গুরুগিরি, আশ্রম, শিষ্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিরোহিত হইয়া গেল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অনন্ত দেশকালের অসীম সৌন্দর্য্যের শতদলের মাঝখানে তিনিই শুধু ভক্ত উপাসক মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতো একাকী দাঁড়াইয়া আছেন। বিশ্বসৌন্দর্য্যের সুরাসার, চুনির পেয়ালার ন্যায় মালতীর অধরপুটে, তাঁহারই জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে; প্রেমানন্দের ইচ্ছা হইতে লাগিল তাঁহার আজন্মের উন্মাদ পিপাসা এক চুমুকে মিটাইয়া মাতাল হইয়া উঠেন। কে বলিতে পারে এই প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরালবর্ত্তী প্রণয়-পাগল প্রাণ এই গভীর নিশীথে চুম্বন-স্ফুলিঙ্গ লাভ করিয়া চকমকির আগুনে সোলার মতো জ্বলিয়া না উঠিবে? প্রেমানন্দের হৃদয় গুরু স্পন্দিত হইতে লাগিল, আগ্রহ ও অপেক্ষার মধ্যে মন আন্দোলিত হইতে লাগিল, ইচ্ছা হইতে লাগিল সেই মোমের মতো নরম নমনীয় সুন্দর নারীটিকে দুই বাহুর নিবিড় চাপে একেবারে নিঙাড়িয়া ফেলেন। এই নীরব নিস্তব্ধ নিশীথে সৌন্দর্য্যের পদতলে আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দ্যান।

এমন সময় নিদ্রাঘোরেই প্রেমানন্দের প্রতপ্ত বাসনার উদ্যত আক্রমণ অনুভব করিয়া মালতী মুখ অপ্রসন্ন করিয়া একবার পাশ ফিরিল—চোখে আলো লাগিতেই পরক্ষণেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া লাফাইয়া বিছানা হইতে নামিয়া ঘরের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। চোখে আলো লাগাতে এবং হঠাৎ ঘুম হইতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মালতীর মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, সে মূর্চ্ছিতপ্রায় দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তাহার মনে হইতেছিল, অন্ধের গৃহে আগুন লাগিলে সে যেমন প্রজ্বলিত গৃহ হইতে নিরাশ্রয় হওয়ার দুঃখে ও মুক্তির আনন্দে নূতন বিপদের আশঙ্কা না করিয়া পাগলের মতো দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করে সেও তেমনি করিয়া এই আশ্রম ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে।

প্রেমানন্দ মালতীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মালতীর চোখ দুটি দুখানি ধারালো ছুরীর মতো তাঁহার বুকের রক্ত চুষিয়া খাইবার জন্য যেন উদ্যত হইয়া আছে। প্রেমানন্দ সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া আপনার ঘরে পলায়ন করিলেন।

ঘরে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বারান্দায় গিয়া প্রেমানন্দ ডাকিলেন—যোগানন্দ, শান্তি, আমার তীর্থযাত্রার উদ্যোগ কর।

বাহিরে তখন ঊষার গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড় বোনা হইতেছিল। দিঘীর জলে গাছের সবুজ ছায়া পড়িয়া তরল পান্নার মতো টলটল করিতেছিল। ছোট ছোট শাদা শাদা মেঘ আকাশময় ছড়াইয়া আছে; তাহাদের উপর যখন প্রভাতারুণের চুম্বনরাগ ফুটিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন বিস্ময়-আনন্দে আকাশ রোমাঞ্চিত হইতেছে। প্রভাতের আগমন-সংবাদ ক্রমশ

গাছপালা যেন হাতপা মেলিতে লাগিল, পত্রে পত্রে শিহরণ খেলিয়া যাইতে লাগিল; কত নামগোত্রহীন ফুল সূর্য্যার্ঘ্য সাজাইয়া ফুটিয়া উঠিল, কত বিচিত্র মিশ্র গন্ধ বাতাস ভরিয়া তুলিল। বড় বড় নীল প্রজাপতি এক এক টুকরো আকাশভাঙা আনন্দের মতো ফুলে ফুলে নাচিয়া বেড়াইতেছিল, টিয়াপাখীগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, যেন সবুজ ঘাসের এক-একখানি ক্ষেত আকাশের গায়ে ভাসিয়া যাইতেছে। পল্লবের মরমর, ঝরণার ঝরঝর, গঙ্গার কলকল, কাকের কলরব যেন একতান সঙ্গীতে প্রভাতী নহবত বাজাইয়া তুলিতেছিল।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের দিকে প্রেমানন্দের দৃষ্টি ছিল না। তিনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

(৪৩)

প্রেমানন্দ চলিয়া গেলেও মালতী অপমানের লজ্জায় স্তম্ভিত নিস্পন্দ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর দাবানল-দগ্ধ বন হইতে হরিণীর ন্যায় ত্রাসচঞ্চল হৃদয়ে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। লঘুক্ষিপ্র গতিতে নীচে নামিয়া একবার বিপিনের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল বিপিন গুহায় বদ্ধ, ঘরে নাই; আর ঘরে থাকিলেই বা কি? সে এই দুদিন আগে তাহার যাচিয়া-বলা দুঃখ-নিবেদন শুনে নাই, অবহেলা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজই কাছে ভিক্ষার দীনতা স্বীকার করা আর নয়, আর নয়! কিন্তু জগতে তাহার আশ্রয়ও ত দ্বিতীয় আর কেহ নাই? না থাকে গঙ্গার গভীর ক্রোড় আছে, তবু বিপিনের কাছে দয়া ভিক্ষা করা আর নয়! তখন সে দ্রুতপদে বাগানে নামিল; অন্ধকার শীতের রাত্রি—আকাশ কোয়াসায় আচ্ছন্ন, বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা, তাহার তলে বাগানের ঝোপঝাড় অন্ধকার বাড়াইয়া কালো কালো দৈত্যের মতো দাঁড়াইয়া আছে। মালতী একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল একটা তারা পূর্ব্ব গগনে আগুনের ফুলের মতো দপদপ করিতেছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর শীতের ভয়ে কোয়াসার চাদর মুড়ি দিয়া আকাশের অসংখ্য দেউটি নিবাইয়া নিশ্চিন্তনীরবে ঘুমাইতেছে। কোথাও জীবনের এতটুকু সাড়া নাই—গঙ্গার জল নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে অজগর সর্পের চিক্কণ কৃষ্ণচর্ম্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে। দীঘির কালো জল প্রকাণ্ড দৈত্যের বড় একটা চোখের মতো সজল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে যেন তাহাকে চোখের ইসারায় ডাকিতেছে। মালতীর মনে হইল এমন জীবন্ত গঙ্গা থাকিতে পুকুরে ডুবিয়া মরিব কেন, জীবন দিব যদি ত জীবনস্রোতেই ঢালিয়া দিব। সে দ্রুতপদে গঙ্গার দিকে চলিতে লাগিল। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে ফিরিয়া পলায়ন করিল—অত ভোরে কে একজন গঙ্গাস্নান করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে।

পার হইয়া বাহিরের রাস্তায় গিয়া পড়িল।

পল্লীপথ নির্জ্জন নিঃশব্দ। মধ্যে মধ্যে পথকুক্কুর চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। একাকিনী এই পথে চলিতে মালতীর গা ছমছম করিতে লাগিল, প্রতি পদ-বিক্ষেপে বিপদের আশঙ্কা তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু সে যে প্রেমানন্দের আশ্রম হইতে মুক্তি পাইয়াছে এই সুখে তাহার নূতন বিপদের ভয়ও তুচ্ছ বোধ হইতেছিল। সে জানে না কোথায় সে যাইতেছে, কোথায় সে যাইতে চাহে। তবু সে যে সকলের অজ্ঞাতসারে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িতে পারিয়াছে ইহাতেই সে যেন মুক্তির আনন্দ বোধ করিতেছিল, বাহিরের বাতাস হাল্কা বোধ হইতে লাগিল, মাঘ মাসের ভোরের হিম-তীব্র বায়ুর নিষ্ঠুর স্পর্শও তাহার নিকট আশ্রমের আরাম-শয্যা অপেক্ষা সুখকর বোধ হইতে লাগিল। সে যেন লঘুচরণে উড়িয়া চলিতেছিল, পথের বুকে শিশিরের দানা ভাঙিয়া তাহার পায়ের দাগ যেন মাটিতে পড়িতেছিল না।

সে জানে না কোন্ পথে কোন্ দিকে যাইতে হয়—কোন্ পথ কোন্ অজানা বিপদের দিকে না জানি তাহাকে লইয়া যাইবে। তবু সে শুকতারাটিকে সম্মুখে রাখিয়া বরাবর ছুটিয়া চলিয়াছিল,—শুকতারাটি সম্মুখে রাখিয়া চলিলে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া যেখানেই গিয়া পড়ুক আশ্রম হইতে দূরেই চলিয়া যাইবে। মালতী ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে চলিতে এক-একবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল কেহ তাহাকে ধরিতে আসিতেছে কি না, কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে কি না। তাহার মনে হইতেছিল এতক্ষণ হয়ত আশ্রমে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে, হয়ত সকলে দলে দলে লণ্ঠন লইয়া তাহাকে খুঁজিতে ছুটিয়াছে, তাহারা আসিল বলিয়া, ধরিল বলিয়া। প্রত্যেক ঝোপঝাড় তাহাকে চমকিত করিয়া তুলিতেছিল, পথের ধারে সামান্য একটু শব্দ তাহাকে আতঙ্কিত করিতেছিল। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল যে অন্বেষণকারীরা এতক্ষণে হয়ত তাহার খুব নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এখনি আসিয়া তাহারা তাহাকে ধরিবে, লাঞ্ছনা করিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে আশ্রমে লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিবে, আবার প্রেমানন্দের গঞ্জনা ও জঘন্য ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে। এই কথা যতই তাহার মনে হয়, ততই সে দ্বিগুণ বেগে ছুটিতে থাকে; তাহার অনভ্যস্ত চরণ ক্লান্ত হইয়া বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, রাস্তার কাঁকরে কোমল চরণতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তবু তাহার গমনে বিরতি ছিল না।

ক্রমে ফর্সা হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের যবনিকা পশ্চিমদিগন্তে গুটাইয়া যাইতে লাগিল। কোকিল জাগ্রত হইয়া আম্রকুঞ্জে তন্দ্রাজড়িম কণ্ঠে কুহরিয়া উঠিল, দোয়েল শ্যামা বুলবুল শিশের একতান ঝঙ্কারে প্রভাতী বন্দনা গাহিতে লাগিল। পথপার্শ্বে ঘাসের শীষে শিশিরকণাগুলি অরুণচুম্বনে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তখনো রাস্তার ধারের গাছগুলা শীতের জড়িমায়

নিজেদের পল্লবাবরণের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ভোরের বাতাসে হিহি করিতেছে; পাড়ার চালে চালে তখনো কুয়াসা কুণ্ডলী পাকাইয়া স্থির হইয়া ছিল, যেন বড় বড় হাঁসগুলি বসিয়া বসিয়া ডিমে তা দিতেছে। তখনো কোনো গৃহে জাগরণের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। ক্রমে পথে দুএকজন লোক দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা একজন অপরূপ রূপসীকে একা কনী যাইতে দেখিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মালতী আপনাকে যথাসম্ভব সমাবৃত করিয়া কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু বুকের মধ্যে তাহার ভয় তোলপাড় করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে রৌদ্র উঠিল; পথের ধারে ধারে নরনারী রৌদ্রে পিঠ দিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া সেবারকার কনকনে শীত আর প্রচুর আমের ফসলের সম্ভাবনা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু মালতীর আবির্ভাবে তাহাদের আরব্ধ আলাপ থামিয়া যাইতে-ছিল, সকলেই অবাক দৃষ্টিতে মালতীকেই দেখিতেছিল এবং মালতী তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে না-হইতে তাহার সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা অনুমান আলোচনা আরম্ভ করিতেছিল। মালতী এসমস্তই অনুভব করিতেছিল বলিয়া আপনাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। একজন শিউলী বাঁকের দুধারে অনেকগুলি খেজুর-রসের ডাবরি লইয়া একগাছের তলা হইতে অপর গাছের তলায় রসসংগ্রহের জন্য হনহন করিয়া চলিয়া গেল; তাহার পিঠের দিকের কোমরে কাপড়ের মধ্যে একখানা চাঁচদা গোঁজা; গলায় গাছে উঠিবার জন্য একগাছা দড়ি জড়ানো। সে বাঁকের বাহু বিস্তৃত করিয়া রাস্তা জুড়িয়া চলিতেছিল, মালতী একপাশ হইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। অল্প অগ্রসর হইয়াই মালতী একস্থানে দেখিল কয়েকজন রমণী ঘেঁসাঘেঁস বসিয়া রোদ পোহাইতে পোহাইতে পরস্পরের মাথার উকুন বাছিতেছে; একটি আলুশ-বর্ণা বালিকা সম্পূর্ণ নগ্ন রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কোমরে একগাছি ঘুনসি, একহাতে একটি ধামিতে মুড়কি লইয়া খাইতেছে, আর শীতে তাহার নীচের ঠোঁটটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে; একটি বালকের গায়ে দোলাই জড়ানো, গলার পিছনে গিট বাঁধা—জগন্নাথ-মূর্ত্তির মতো নিশ্চল দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে বালিকার মুড়িমুড়কির ধামির দিকে লোলুপ দৃষ্টি হানিতেছে। একটি শিশু উকুন-বাছিতে-ব্যস্ত জননীর হাতের পাশ দিয়া মাথা গলাইয়া স্তন্যপান করিতে লাগিয়া গিয়াছে; নিকটেই একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া, আর একটা বিড়াল লেজ খাড়া করিয়া দোলাই জড়ানো ছেলেটির পায়ে গা ঘসিয়া ঘসিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ঘরর-ঘরর শব্দ করিয়া নিজেকে একটুখানি উষ্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মালতী দেখিল সম্মুখেই রেল-লাইন। তখন সে রাস্তা ছাড়িয়া রেল-লাইনে গিয়া উঠিল এবং রেল-লাইন ধরিয়া ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হাতে তাহার

পয়সা নাই, ষ্টেসনে গিয়া কি হইবে, এ ভাবনা তখনো তাহার মনে উঠে নাই—সে শুধু ভাবিতেছিল, রেলে উঠিতে পারিলে অতি সত্বর সে প্রেমানন্দের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিবে। সম্মুখে সুদূর-প্রসারিত রেল-লাইনগুলি যেন তাহাকে অজানার উদ্দেশ্যে আহ্বান করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। প্রভাত-রৌদ্র হিমসিক্ত রেলের উপর পড়িয়া চকচক করিতেছে, সঙ্কেত-স্তম্ভের মাথায় লণ্ঠনের লাল সবুজ কাচে রৌদ্র লাগিয়া লোহিত হরিৎ সূর্য্যমূর্ত্তি চোখে ঝিলিক হানিতেছে।

এই-সব দেখিতে দেখিতে মালতী ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া উঠিল। অমনি তাহার দৃষ্টি পড়িল তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন প্রেমানন্দ। মালতী তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—সে ব্যাধবেষ্টিত হরিণীর ন্যায় কোন্ পথে যে কোথায় পলাইবে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

প্রেমানন্দ তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন—রাধারাণী, আমি তীর্থে চলেছি; কবে ফিরব, ফিরব কি না, ঠিক নেই। তুমি কোথায় যাবে বল, যোগানন্দ টিকিট করে তোমায় সেই গাড়ীতে তুলে দেবে।

মালতী ক্ষণেক অবাক হইয়া প্রেমানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আমি ...কাশী—না, কলকাতা যাব।

প্রেমানন্দ বলিলেন—বেশ, তাই হবে।

মালতীর আবির্ভাবে প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত যাত্রী বাবুর দলে সাড়া পড়িয়া গেল। যেমন গঙ্গার মাঝখান দিয়া ষ্টিমার চলিয়া গেলে তাহার আন্দোলন দুই তটকে স্পর্শ করে, তেমনি মালতী বাবুদের জনতা ভেদ করিয়া যাইবার সময় দুধারের হৃদয়ে আন্দোলন নাচিয়া উঠিল। মালতী দৃপ্ত অটল গতিতে গিয়া মেয়েদের অপেক্ষা-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কলকাতা যাইবার ট্রেন আসিলে যোগানন্দ মালতীকে মেয়ে-কামরায় তুলিয়া টিকিট দিয়া গেল। মালতী জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল—রেল-লাইনের ধারে ধারে রেল-কর্ম্মচারীদের, কুলিদের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাসা ও বাড়ী; কোনো বাড়ীর জানালায় একটি বধূ দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও ছেলেরা ডাণ্ডাগুলি খেলিতেছে, কোথাও খর্জ্জুর তাল নারিকেল শজিনাবৃক্ষে বেষ্টিত ডোবায় রমণীরা স্নান করিতেছে, বাসন মাজিতেছে, জল্পনা করিতেছে, কলহ করিতেছে; রেলের ধারে কুলিরা কাজ করিতেছে। গাড়ী হুসহুস করিয়া প্রকাণ্ড অজগরের মতো এত বড় প্রাণের বোঝা উদরে বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু নিত্যকার ব্যাপার বলিয়া অভ্যাসবশত কেহই তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছিল না। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে মাঠে বেগুন, কপি, মটর, আর রবি শস্যের ক্ষেত; গোরু ছাগল চরিতেছে, রাখাল গান গাহিতে গাহিতে থামিয়া চলিষ্ণু গাড়ীর আরোহীদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে এবং এই অর্থহীন আচরণেই অপর্য্যাপ্ত কৌতুক তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। মালতী দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল, সকলেরই আশ্রয় আছে, কাজ

আছে, আনন্দ আছে; সেই কেবল নিরাশ্রয়, জগতের জঞ্জাল।

গাড়ীর দুপাশে কত বাড়ী, বাগান, ক্ষেত খামার, কলকারখানা বায়োস্কোপের ছবির মতো ক্ষণিকের জন্য দর্শন দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া সরিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে গাড়ী আসিয়া শিয়ালদহে পৌঁছিল। একদণ্ডে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম্ম জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। আবার দেখিতে দেখিতে জনতা পাতলা হইয়া গেল। তখন মালতী নামিয়া একখানা ঠিকা গাড়ীতে, যে প্রথমে তাহাকে ডাকিল তাহাতেই, ভাড়া ঠিক না করিয়াই চড়িয়া বসিল। গাড়োয়ান দরজা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে?

মালতী বলিল—চোরবাগান।

গাড়োয়ান দুই হাতে ঘোড়ার রাশ আছড়াইয়া হেই হেই টকাস টকাস শব্দ করিতে করিতে ও পাদানিতে পা ঘসিতে ঘসিতে অশ্বিনীকুমার যুগলকে গমনে উৎসাহিত করিতে করিতে রওনা হইল।

গাড়ী নবকিশোরের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতী গাড়োয়ানকে গাড়ীর কড়া নাড়িতে বলিল। গাড়োয়ান গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর কড়া নাড়িতে লাগিল। নবকিশোর দরজা খুলিয়াই মালতীকে গাড়ীতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—মালতী! তুমি একলা?

মালতী নবকিশোরের মুখের দিকে করুণ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমি চলে এসেছি।

কেন? হয়েছে কি?

মালতী অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নবকিশোর অবাক হইয়া মালতীর ক্রন্দন দেখিতে লাগিল; কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটিও সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিতেছিল না।

বাহির হইতে গাড়োয়ান চীৎকার করিল—ওগো বাবু, সোয়ারি নামিয়ে লও না গো! হামি কি সারা রোজ খাড়া থাকব?

নবকিশোর তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিয়া মালতীকে বলিল—তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।

মালতী নামিয়া গেল। নবকিশোর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—কত ভাড়া?

গাড়োয়ান বলিল—কেতো ভাড়া আবার? আপনে কি রুপেয়া দো রুপেয়া দেবে না হামি ভি মাঙ্গব? শিয়ালদা সে চোরবাগান ত বারে আনা হিসাব ধরা আছে।

নবকিশোর দ্বিরুক্তি না করিয়া বারো আনা পয়সা দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় দিল।

ইত্যবসরে মালতী আত্মসংবরণ করিয়া মুখ মুছিয়া বসিয়া ছিল। নবকিশোর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মালতী সদ্যসমাপ্ত-বর্ষণ সন্ধ্যাশ্রীর মতো দীপ্ত বিষণ্ণতার প্রতি-মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া আছে। সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—মালতী, বিপিন ভালো আছে ত?

মালতী ঘাড় নাড়িল। তখন নবকিশোর অধিকতর বিস্মিত হইয়া ধাঁধায় পড়িয়া গেল। কি জিজ্ঞাসা করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে তুমি একলা এলে যে?

মালতী গম্ভীর ভাবে বলিল—আমি কাউকে বলে আসিনি।

এ উত্তরে নবকিশোরের নিকট সমস্যার সমাধান না হইয়া বরং সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল। সে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাউকে না বলে একলা চলে এলে, ব্যাপার কি?

—গুরুজীর অত্যাচারে আমার সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

মালতী একে একে সমস্ত কথা সংক্ষেপে নবকিশোরকে বলিল। নবকিশোর শুনিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল—বিপিনকে এ কথা জানাওনি কেন?

—জানাতে চেষ্টা করেছিলুম, তিনি শোনেন নি। ......তারপর গুরুর অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠতে কাল রাত্রে গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলুম, তাতেও বাধা পড়ল। মাসিমার কাছেই যেতুম, কিন্তু ঐদিকে প্রেমানন্দ যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে যেতে সাহস বা প্রবৃত্তি হল না। তাই আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে মাসিমার কাছে দিয়ে আসুন।

গম্ভীরভাবে নবকিশোর বলিল—পালিয়ে এসে কাজটা ভালো করনি মালতী। ... তোমায় ফের আশ্রমে ফিরে যেতে হবে। মানুষের মনের মধ্যে স্বাভাবিক একটা আরাম-স্পৃহা আছে, যাতে করে সে সহজে শান্তিকে ঘাঁটিয়ে গণ্ডগোল বাধাতে চায় না; সেইজন্যে সে জেনে শুনেও মিথ্যাকেও সহজে অবিশ্বাস করতে চায় না। বিপিনের এই বিশ্বাস তোমাকেই ভাঙতে হবে।

আমায় ত্যাগ করবেন? তবে কি আমার মৃত্যু ভিন্ন আর গতি নেই?

নবকিশোরের হৃদয়বীণার প্রণয়তন্ত্রীর কোমল পর্দায় আঘাত করিয়া মালতীর এই কথা কটি একটি করুণ রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিল। নবকিশোর বলিল—বিপিনকে ছেড়ে গেলে, বিপিনের সঙ্গে মিলনে তোমার ব্যাঘাত ঘটবে।

হতাশার করুণ রাগিণী বাজাইয়া মালতী বলিল—সে আশা সে আকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই। কোথাও একটু নিরুপদ্রবে থাকতে পেলে বেঁচে যাই। আপনি আমায় মাসিমার কাছে রেখে আসুন।

—আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, সে মিথ্যে কথা, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই অভিমান অমন ছলনা করছে। এই উপদ্রবের ভিতর দিয়েই নিরুপদ্রব হবার সূচনা হয়েছে। একদিন না একদিন বিপিনের মোহ কাটবে, ...সেদিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে তোমায় বিপিনের কাছে থাকতে হবে।......তুমি মরতে পাবে না, পালাতে পাবে না, সকল অত্যাচার থেকে আপনাকে রক্ষা করে বিপিনকে সেই-সব অত্যাচারের আঘাত দিয়েই সচেতন করে তোলা তোমার এখনকার কর্ত্তব্য হবে।......এই যে তুমি আমার কাছে এসেছ, এতে তোমার কাজ অনেকখানি পিছিয়ে গেল। ভারি ভুল করেছ, তুমি চলে না এসে যদি বিপিনকে আর-একবার একটা নাড়া দিয়ে দিতে তাহলে এতক্ষণে তার সকল মোহ ঝরে পড়ত; তোমরা দুজনে একসঙ্গে আমার কাছে এসে

কাটিয়ে আমরা আজ মিলতে পেরেছি।......আসবে সেদিন শীগগির আসবে, তুমি কিছু ভেব না। এখন চল। আর বিলম্ব নয়।......তোমার খাওয়া হয়নি, না? চট করে স্নান করে খেয়ে নাও, আমি গাড়ী ডেকে আনি। (আগামী বারে সমাপ্য)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ইতিহাস*

(আলোচনা)

বোধ হয় স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন গবেষণার আশ্রয় লইয়া বাঙ্গালার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস ছাড়া আর যতগুলি বাঙ্গালার বা ভারতবর্ষের ইতিহাস বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হইত তাহাদের প্রায় সকলগুলিই ইংরেজী পুস্তকের তরজমা। ইদানীং বঙ্গীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বদেশের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সাধনার ফলস্বরূপ সম্প্রতি দুইখানি ইতিহাস-গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। একখানি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড়-রাজমালা, অপরখানি এই আলোচ্যমান রাখাল বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস।

যে সকল বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রাচীন লিপিবিদ্যায় একজন প্রকৃষ্ট পণ্ডিত, কাজও করেন প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে; ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম এবং বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। এতাদৃশ ব্যক্তি ইতিবৃত্ত প্রণয়নে হস্তার্পণ করিলে তাহা যে অতি শোভন হইবে এটা বলাই বাহুল্য।

আলোচ্য পুস্তকখানিকে রাখাল বাবু যদি "বাঙ্গালার ইতিহাস" না বলিয়া "ভারতবর্ষের ইতিহাস" বলিতেন, তাহা হইলেই বোধ হয় যথার্থ কথা বলা হইত। তিনি যেভাবে ভারতময় শিল্পলিপি ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আর একটু বাড়াইলেই সমগ্র 'ভারতের প্রাচীন ইতিহাস' রূপে এই গ্রন্থ পরিগণিত হইতে পারিত। ভিন্‌সেণ্ট এ, স্মিথ কৃত আর্লি হিস্‌টরি অব্‌ ইণ্ডিয়া (প্রাচীন ভারতেতিহাস) গ্রন্থে ইহার অধিক দুএকটি অধ্যায়ে দুই চারিটি বেশী কথা বলা হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় গৌড় রাজমালায়ই সংক্ষেপে বঙ্গ (গৌড়-মগধ) রাজ্যের ঈদৃশ

ইতিহাস লিখিয়াছেন; সুতরাং এক্ষেত্রে না চলিয়া রাখালবাবু বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেই ভাল হইত।

স্বদেশের ঐতিহাসিক উপকরণ সম্বন্ধে তিনি উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। যে মহাগ্রন্থ উপলক্ষ করিয়া "ইতিহাস" শব্দটি সংস্কৃত অভিধানে ব্যবহৃত হইতেছে সেই মহাভারতেরই ঐতিহাসিকতা তর্কের বিষয় মনে করিয়া রাখালবাবু উহা পরিহার করিতেছেন।(১) ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই; "ইতিহ" পারম্পর্য্যোপদেশ অর্থাৎ লোকপরম্পরা যাহা চলিয়া আসিয়াছে। "আস" আসন, স্থান। যাহাতে লোক-পরম্পরাগত উপদেশ স্থানলাভ করিয়াছে। রাখালবাবু গোঁড়ামি করিয়া ইতিহাসের এই শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করিবেন, অথবা মহাভারতের অনুস্বার-বিসর্গকেও আধুনিক 'ইতিহাস' বলিয়া গণনা করিবেন, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু শুধু তর্কের বিষয় বলিয়া মহাভারতকে বর্জ্জন করিবেন, এটা তাঁহার কাছ হইতে আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি নাই। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা উপলক্ষে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন রাখালবাবু অবশ্যই তাহা দেখিয়াছেন। তবে অন্ততঃ বঙ্কিমবাবুর মতটার অসমীচীনতা দেখাইয়া দিয়া এইরূপ বর্জ্জন করিলে শোভন হইত। মহাভারতেরই যখন এই অবস্থা, 'পুরাণ'ও যে রাখালবাবুর নিকট সমাদরণীয় হইবে না, তাহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নহে। (২) কিন্তু সুখের বিষয়, পুরাণেও যে ইতিহাসের উপাদান আছে, আধুনিক অনেক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইতেছে। তারপর জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় রাখালবাবু—কেবল তিনি কেন, ইংরেজী-শিক্ষিত প্রায় সকলেই—স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে এই ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি পূর্ব্বে ছিল না। আর্য্যেরা মধ্য এশিয়া—অথবা বল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী কিংবা এতাদৃশ অপর কোনও স্থান হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। এটা ভাষাতত্ত্ব-আলোচনাকারি-গণের অনুমান হইতে প্রচারিত হইয়াছে—কোনও শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, গ্রন্থ ইত্যাদিতে এ বিষয়ের ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। বরং এদেশের বেদ পুরাণ ইতিহাস সংহিতা প্রভৃতিতে ইহার বিপরীত কথাই পাওয়া যায়। এতদিন একতরফা বিচারই চলিতে ছিল। সুখের বিষয় অধুনা উল্টা দিক্‌টার আলোচনাও হইতেছে, এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রমুখ দুই একজন লেখক ভারতবর্ষই যে আর্য্যজাতির সনাতন আবাসভূমি তাহা প্রমাণিত করিতেছেন। আমার সবিনয় অনুরোধ, রাখালবাবুর ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিগণও কেবল ইংরেজ গ্রন্থকার-গণের কথা উদ্ধৃত না করিয়া স্বয়ং

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, পরিশিষ্ট (ক) ২৬ পৃষ্ঠা

(২) পরিশিষ্ট (খ) ৪৬পৃঃ। রাখালবাবু পার্জিটর সাহেবের গ্রন্থোল্লেখিত পুরাণের মাত্র দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বয়ং সেদিকে যান নাই।

দুইপক্ষ দেখিয়া যাহা হয় একটা মীমাংসা করিবেন। (৩)

একটি মাত্র কথা এতৎসম্পর্কে এস্থলে বলিব। পৌণ্ড্র জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে রাখালবাবু বলেন, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে।" পাদটীকায় বলেন, "মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অদর্শনে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতির বৃষলত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে পৌণ্ড্র গণের নাম আছে।" (৪) সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদ্ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।"

দেখা গেল ব্রাহ্মণাদর্শন এবং ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হইয়া পৌণ্ড্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক পূর্ব্বে আর্য্যনিবাস ও আর্য্যোচিত সংস্কারাদির সত্তা ঐ সকল জাতিতে বা তদধ্যুষিত স্থানে ছিল বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না কি? শনৈঃ শনৈঃ 'ক্রিয়া লোপ' হইতে যে কত সময়ের প্রয়োজন তাহাও ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার এই আকুঞ্চন-প্রসারণের স্পষ্ট নিদর্শন পূর্ব্ব-ভারতীয়-দ্বীপপুঞ্জ ও তৎ সমীপস্থ এশিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে আজও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কি?

রাখালবাবু সমতট, শিলিচটল কমলাঙ্ক প্রভৃতির অবস্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। তিনি, "সমতট যদি বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম হয়" (৫) এই বলিয়া ফুটনোটে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের যে ইহাই মত তাহা বলিয়াছেন। নলিনীকান্ত বাবুর লিখিত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রবন্ধ পড়ি নাই। কিন্তু তল্লিখিত "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্তৃত জনপদ" নামক প্রবন্ধ পাড়িয়াছি। তাহাতে তিনি বলেন, "বর্ত্তমান ত্রিপুরা নোয়াখালি বরিশাল ফরিদপুর এবং ঢাকা জেলা লইয়া এই (সমতট) রাজ্য গঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী কর্ম্মান্ত নগর এই বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল।" (৬) অতএব রাখালবাবু ঠিক যাহা বলিতে চান, নলিনীবাবু তাহা বলেন নাই। যাহা হউক এস্থলে নলিনীবাবুর অভিমত সম্বন্ধেও আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

"শিলিচটল" ও "কমলাঙ্ক" সম্বন্ধে ইউয়ান্ চুয়াং বলেন যে, শিলিচটল সমতটের পূর্ব্বোত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল এবং কমলাঙ্ক শিলিচটলের দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগে ছিল। শিলিচটল ও কমলাঙ্ক উভয়ই সমুদ্রের তীরে পর্ব্বতময় ভূভাগে অবস্থিত। ইউয়ান্ চুয়াঙ্

(৩) শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বোধ হয় এই মতটিতে একটা আশ্বাসের হেতু পাইয়াছিলেন: আফ্রিকা-আমেরিকার ইউরোপীয় উপনিবেশকারিগণ তদ্দেশীয় প্রাচীনতর অধিবাসীদিগকে "নেটিভ" বলেন—আমরা তাদৃশ "নেটিভ" নহি—আমরাও অন্যান্য দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতিকে তাড়াইয়া দিয়া এখানে উপনিবিষ্ট হইয়াছি!

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১৭—৩৮পৃঃ।

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৮৮ পৃষ্ঠা।

(৬) প্রতিভা, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৩৮২ পৃঃ।

এইরূপ বলাতেই একদল প্রত্নতাত্ত্বিক সমুদ্রতটস্থ নিম্ন ব্রহ্মে উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ওয়াটাস্ সাহেব বলেন, তাহা হইলে সমতটের "পূর্ব্বদক্ষিণ" বলা ইউয়ান্ চুয়াংয়ের উচিত ছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যতগুলি পাঠ আছে সমস্তই একবাক্যে "পূর্ব্বোত্তর" নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; অতএব ইহা বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলা হইবে। (৭) ওয়াটার্স সাহেবের এই উক্তি ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ সমর্থন করিয়াছেন। (৮) কিন্তু ওয়াটার্স সাহেব প্রকৃত স্থানের কাছাকাছি গিয়াছেন মাত্র। শিলিচটল দ্বারা বস্তুতঃ যাহা বুঝায় বর্ত্তমান ত্রিপুরার উত্তরার্দ্ধ সতরখণ্ডল বা সরাইল পরগণা সেই শ্রীহট্টের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির এই মতই ছিল; এবং ইহাই সমীচীন মত। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও অন্যত্র বলিয়াছি, (৯) এখনও এস্থলে বলি, যে চীনদেশীয় পরিব্রাজকের নিকট "শ্রীহট্ট" এই কট-মট গোছের নামটি 'শ্রীক্ষত্র' বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল—তাহা আবার চৈনিক অক্ষরে শি-লি-চ-ট-ল রূপে লিখিত হইয়াছিল। তবে শ্রীহট্ট সমুদ্রতীরবর্ত্তী হইল কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। রবার্ট লিণ্ডসে নামক জনৈক ইংরেজ ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের রেসিডেণ্ট্ ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকা হইতে কর্ম্মস্থলে যাইবার সময় পথের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে আছে—

"In passing my boat towards Sylhet, I had recourse to my compass, the same as in sea and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent". (১০)

মাত্র একশত পনেরো বৎসর পূর্ব্বেকার এই কথা। ইহারও প্রায় ১১২৫ বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থা ছিল, একবার ভাবিয়া দেখুন।

এই শ্রীহট্ট রাজ্য তখন বহুবিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ এবং ত্রিপুরার উত্তরাংশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এই বিস্তৃত রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে "কমলাঙ্ক" প্রদেশ ছিল। ইহাও একটা উপসাগরের তীরস্থ বলিয়া ইউয়ান্ চুয়াং বলিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরস্থ শ্রীহট্টের যখন ঐ অবস্থা ছিল, এই কমলাঙ্ক অর্থাৎ "কোমিল্লা" রাজ্যেরও যে তাদৃশ দশা ছিল না, এ কথা বলা যায় না। (১১)

প্রাচীন পুঁথিতেও এই "কমলাঙ্ক" রাজ্যের ঐ অঞ্চলে অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত

(৭) Watter's Yuang Chwang, Vol ii. pp. 188-89.

(৮) Watter's Yuang Chwang, Vol ii. p. 340.

(৯) বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২০, ৬৩০ পৃষ্ঠা।

(১০) Lives of the Lyndsays (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত)।

(১১) এবার বন্যায় যে দৃশ্য দেখা গিয়াছে প্রায় ১২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থা যে এইরূপই ছিল তাহা অনুমানতঃ বলা যাইতে পারে।

ভট্টশালী কর্তৃক সম্পাদিত ময়নামতীর গানে দেখা যায়—

বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়ির সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাইমু কমলাকনগর। (১২)

এই 'কমলাক' যে "কমলাঙ্ক", নলিনী বাবু তদীয় "ময়নামতীগানের ভূমিকায়" তাহা বলিয়াছেন। ফলতঃ "কোমিল্লা"ই যে 'কমলাঙ্ক' তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না।

তবে অবান্তর হইলেও এস্থলে নলিনী বাবুর একটি কথার আলোচনা করিতে হইতেছে। তিনি কোমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমস্থিত বড়-কামতা নামক স্থানটিকে "কর্ম্মান্ত" নগররূপে আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহাকেই সমতটের রাজধানী বলিয়াছেন। আমার বোধ হয় এই "কর্ম্মান্ত" 'কমলাঙ্কের'ই রূপান্তর—এস্থান হইতে হয়ত কমলাঙ্ক নগর স্থানান্তরিত হইয়া নিকটস্থ কোমিল্লায়' পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সমতটকে একটি বিশাল রাজ্য বলিয়াছেন—যাহা বর্ত্তমান বরিশাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার রাজধানী এমন একটা প্রান্তভাগে হইবার বিশেষ কারণ আছে কি? তিনি ই-চিং-কথিত সমতট-রাজের তাম্রশাসন বিশেষে উল্লিখিত "রাজভট্ট" ও কর্ম্মান্তরাজ "রাজভট্টকে" একই ব্যক্তি মনে করিয়াছেন। কিন্তু দুইটি কথা এস্থলে বিবেচ্য; ১ম ইচিং যে নামটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বহু আয়াসে "রাজভট" হইয়াছে।

"Iching who uses our pilgrim's (Yuang-chwang's) transcription of the name, merely places the country (saneatata) in East India. He calls the king at his time "Hoh-to-she-po-ta' which M. Chavannes restores as Hatshabhata but the first three characters are as he states used to express Raja, and the king's name was probably "Rajabhata." (১৩)

ইউয়ান চুয়াং অবশ্যই 'হোলশে' অর্থাৎ হর্ষ দ্বারা 'রাজা' শব্দ বুঝাইতেন; কেননা তখন ভারতবর্ষের রাজা হর্ষই ছিলেন। কিন্তু ইচিং সকল বিষয়ে ইউয়ানের অনুকরণ করিলেও মাছিমারা কেরাণীর ন্যায় রাজা অর্থে "হর্ষ" লিখিবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ, যদিই বা ইচিং এর সময়ে সমতটের রাজার নাম রাজভটই ছিল, তথাপি তিনি এবং কর্ম্মান্তরাজ প্রদত্ত শাসনে উল্লিখিত 'রাজভট্ট' যে একই ব্যক্তি তাহার প্রমাণ কোথায়? নলিনীবাবু প্রধানতঃ অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিয়াই কর্ম্মান্তের রাজভট্টকে ইচিং-এর সমসাময়িক বলেন, কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও হর্ষের ফলকের সঙ্গে কর্ম্মান্তের ফলক শতাধিক বৎসর অগ্র-পশ্চাৎ হইতে পারে (১৪) এবং সমতটের প্রবল

(১২) প্রতিভায় প্রকাশিত ময়নামতীর গান ৬ পৃষ্ঠা। (অত্রোল্লিখিত 'গৌড়'ও সন্নিকৃষ্ট 'শ্রীহট্ট' রাজ্যের একাংশ ছিল।)

(১৩) Watter's Yuang Chwang, Vol ii p. 188.

(১৪) ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সভ্যতার কেন্দ্রস্থান আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যভাগে অক্ষরাদির পরিবর্ত্তন যেরূপ সত্বর হইয়াছে পূর্ব্বতম প্রান্তস্থিত স্থানবিশেষে তাহা না হইতে পারে। কাছাড়ের দলিলাদিতে আজও এমন অক্ষর দেখা যায় যাহা হয়ত কলিকাতাতে শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

পরাক্রান্ত রাজভট্টের নামে কর্ম্মান্তের রাজকুমারের নামকরণ হওয়াও বিচিত্র নহে। বিখ্যাত সমুদ্রগুপ্তের দেখাদেখি কামরূপ-রাজ 'সমুদ্র'বর্ম্মার নামকরণ হইয়াছিল। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের আদি প্রত্নোপাসক (১৫) গঙ্গামোহনবাবু এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র একবাক্যে এই শাসনগুলিকে অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

যাউক; আমার বক্তব্য বলিলাম। আশা করি রাখালবাবু এবিষয়ে একটু মনোযোগ প্রদান করিবেন। তিনি অন্যত্র (১৬) লিখিয়াছেন, "সমতটের পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্র (বর্ত্তমান প্রোম) কমলাঙ্ক (বর্ত্তমান পেগু)" ইত্যাদি। জিজ্ঞাস্য এই যে প্রোম 'পেগু' এগুলি কি কোমিল্লার পূর্ব্বে? অতএব তাঁহারই উক্তিতে 'সমতট' কোমিল্লা হইতে পারিতেছে না।

প্রত্নতত্ত্বে কল্পনা অনুমান ইত্যাদির কার্য্যকারিতা খুবই আছে এবং থাকিবেও। তবে সেগুলি সঙ্গত হওয়া চাই। এই ভূমিকা দিয়াও আমাদের দুই একটি আনুমানিক কথা আজ বলিতে হইল—অসঙ্গত হইলে আশা করি প্রত্নতাত্ত্বিক মহাত্মগণ উদারতাগুণে মার্জ্জনা করিবেন। কমলাঙ্কের পূর্ব্বে ইউয়ান চুয়াং "তলপতি" এবং তৎপুর্ব্বে "ইশাংনোপুল" প্রদেশের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। (১৭) কমলাঙ্ককে কর্ম্মান্ত—কোমিল্লার সঙ্গে এক করিলে তাহার পূর্ব্বাংশে ত্রিপুরা রাজ্য—পাওয়া যায়। তৎকালে যে ইহা ছিল, ত্রিপুরাব্দই তাহার প্রমাণ। আজ ১৩২৫ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে অর্থাৎ '৫৯০' খৃষ্টাব্দে ইহা আরব্ধ হয়। অতএব 'তলপতি' ত্রৈপুরপতির রাজ্য ত্রিপুরা হইতে পারে কি না একটু ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি? তৎপরে ইহার পূর্ব্বে "ইশাংনোপুল" মণিপুর রাজ্যের "বিষ্ণুপুর" হইতে পারে নাকি? ত্রিপুরা রাজ্য তখন লুশাই পাহাড় নিয়া অবস্থিত ছিল—তাহার পূর্ব্বে মণিপুরের সংস্থান বটে। এই বিষ্ণুপুরের অস্তিত্ব আমরা একসম্প্রদায় মণিপুরী হইতে পাইতেছি—উহাদের ভাষা 'আর্য্যগন্ধি'। ডাঃ গ্রিয়ারসন তদীয় "লিঙ্গুইস্টিক্ সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

A tribe known as Mayang speaks a mongrel form of Assamese known by the same name. * * * They are also known as Bishnupuriya Manipuris. * * I have said above that Mayang is a mongrel form of Assamese. It can with equal (or perhaps more) justice be classed as a form of Eastern Bengali the language posseses characteristic of both the languages but at the same timediffers widely from both. I therefore place it in a supplement while for statistical purposes I have shown it as a form of Assamese merely because its speakers all live in the territory

(১৫) ইহা নলিনীবাবুর প্রদত্ত বিশেষণ; কিন্তু ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির উপর অবিচার হয় নাই কি?

(১৬) বাঙ্গালার ইতিহাস পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯৫ পৃঃ

(১৭) Watter's Yuan Chwang Vol ii p. p. 187-88

under the political influence of the Assam Government. * * * In the Manipur state the Leadguistic of Mayang are two or three plain villages, near Bishnupur (locally known as Lamangdong), 18 miles to the south-west of Imphal. (১৮)

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বিষ্ণুপুর মণিপুরের প্রাচীন রাজধানী। (১৯) এবং তাই ইউয়ান চুয়াং বিষ্ণুপুরের কথা শুনিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু অনুগ্রহ করিয়া তদীয় ইতিহাসে ভাস্কর-বর্ম্মার কর্ণসুবর্ণ অধিকার সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র লেখকের নাম ও গ্রহণ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও আমার যাহা বক্তব্য আছে, সবিনয়ে বলিতেছি। তিনি বলেন—

নিধানপুরের (২০) আবিষ্কৃত ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত তাম্রশাসন কর্ণসুবর্ণ বাস হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে শ্রীযুক্ত (এই লেখক) অনুমান করেন যে কর্ণসুবর্ণ তৎকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। * * কিন্তু এই অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। স্কন্ধাবার বা বাসক শব্দে রাজধানী বুঝায় না। সম্ভবতঃ ভাস্করবর্ম্মা শশাঙ্কের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সময় কিয়ৎকাল কর্ণসুবর্ণ অধিকার ক'রয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নিধানপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। যুদ্ধযাত্রার সময়ে তাম্রশাসন প্রদানের আরও দুই একটি উদাহরণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। গহড়বাল-বংশীয় কান্যকুব্জ-রাজ গোবিন্দচন্দ্র ১২০২ বিক্রমাব্দে মুদ্গগিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীধর ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র এই সময়ে নিশ্চয়ই যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে মুদ্গগিরিতে বা মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন। কারণ, অঙ্গদেশ তখনও গাহড়বাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। (২১)

"কর্ণসুবর্ণ তৎকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল" এ কথা আমি বলি নাই। "তৎকালে" দ্বারা রাখালবাবু যেন হর্ষবর্দ্ধনের কালে বুঝাইয়াছেন—আমি তাহাও বলি নাই। যাহা বলিয়াছি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে সেই বিপ্লবের সময়েই হউক বা চীনদূতের সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপেই হউক, তৎকালে ভাস্কর-বর্ম্মার হাতে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যটি পড়িয়াছিল, এটা আমরা অনুমান করিতে পারি।"

---

(১৮) Dr. Grierson's Ling. Survy. of India, Vol. V. part I. p. 419.

(১৯) এ বিষয় অন্যত্র বহু আলোচনা করিয়াছি তাই এস্থলে উল্লেখমাত্র করিলাম। Vide Mr. Gait's History of Assam—a critical study. Hindustan Review, 1908 Feby. p p. 196-198.

(২০) স্থানটির প্রকৃত নাম নিধনপুর।

(২১) বাঙ্গালার ইতিহাস, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯০—৯১ পৃঃ

"কামরূপ রাজ্যের অন্তভুর্ক্ত ছিল" ঠিক্ এই বাক্যটি আমি বলি নাই বটে, কিন্তু উহা বস্তুতঃ কামরূপের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল বই কি? কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্ম্মার "রাজধানী" না হইতে পারে। ইংরাজীতে যাহাকে "কেম্প" বলে কর্ণসুবর্ণ তাহাই হইয়াছিল। লর্ড হার্ডিং আজ গৌহাটি আসিয়া যদি একটা আদেশবাক্য প্রচার করেন তবে তাহা "কেম্প গৌহাটি" হইতেই বাহির হইবে—তদ্রূপ ভাস্করবর্ম্মারও স্কন্ধাবার কর্ণসুবর্ণ বাসক হইতে দানপত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাতে আপত্তির স্থল কোথায়? শশাঙ্ক ও ভাস্করবর্ম্মার যুদ্ধের সময়ে এই শাসনপত্র জারী হয়, এটাও মানিতে পারি না। কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কের জীবিত অবস্থায়—ভাস্করের দূরে থাকুক—হর্ষের হস্তেও পতিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ! শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালবাবু বিশেষজ্ঞ—সুতরাং তাঁহার প্রতিবাদে কিছু বলিতে যাওয়া অতিসাহসের কথা। কিন্তু শশাঙ্ক সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তাহাতে বোধ হয় যে ভাস্কর, শশাঙ্ককে ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করিতেন এবং হর্ষবর্দ্ধনও শশাঙ্ক না মরা পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে একছত্র সম্রাট্‌রূপে নিজেকে পরিগণিত করিতে পারেন নাই। সেই মহাবীর শশাঙ্ক যে প্রাণ থাকিতে যুদ্ধে বিমুখ হইয়া কর্ণসুবর্ণ ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন এটা অবিশ্বাস্য কথা। এবং যুদ্ধেও যে তিনি মরেন নাই, ইউয়ান চুয়াংই তাহার সাক্ষী। একথা অন্যত্র বলিয়াছি। (২২)

রাখালবাবু দৃষ্টান্তস্বরূপ গহড়বালের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের যে নজীর দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে রাখালবাবুর কথা আমি বুঝি নাই। তিনি উদ্ধৃত অংশে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "অঙ্গদেশ কখনও গহড়বাল রাজ্যের অন্তভুর্ক্ত হয় নাই" অথচ একাদশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, "১২০২ বিক্রমাব্দে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গদেশের (২৩) কিয়দংশ অধিকার করিয়া মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ায় গোবিন্দদেব মুদ্গগিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনদ্বয় গোবিন্দচন্দ্রকর্ত্তৃক মগধ ও অঙ্গ অধিকারের স্পষ্ট প্রমাণ। গোবিন্দচন্দ্র বোধ হয় পালবংশীয় নরপালগণের সাহায্যার্থে মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ অধিকৃত হইলে তিনি উহা পালরাজগণকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। (২৪)

রাখালবাবুর কোন্ কথা গ্রহণ করিব? একটা রাজ্য যদি বৃটিশ সম্রাটের দখলে আসে, তবে উহা অবশ্যই তদীয় রাজ্যের অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই হইয়া পড়ে। তবে রাখালবাবু যদি কথার মার-পেচ খেলান, সে স্বতন্ত্র কথা। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা তাঁহার এই দুই স্থলের উক্তিতে অসামঞ্জস্য

(২২) বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২০। ৬২৬—২৭ পৃঃ

(২৩) না "অঙ্গদেশের"?

দেখিয়া, "বুঝিতে পারিলাম না" এইমাত্রই বলিলাম।

এই "দুর্ব্বোধ" বিষয়ের অপর একটি ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ করিব। "মাৎস্যন্যায়" শব্দের অর্থ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাহা গৌড়-লেখমালায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহাতে রাখালবাবু "বিদ্রূপের" ভাব দেখিতে পাইলেন কিরূপে? (২৫)

আর একটি জায়গায় আমার খট্‌কা বাঁধিয়াছে। রাখালবাবু লিখেন—

"নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে জয়পাল প্রাগ্-জ্যোতিষের অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন, 'ভগদত্ত'বংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল বীরবাহু সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।" (২৬)

এই জয়পাল, দেবপালের খুল্লতাত-পুত্র; তাঁহারই রাজত্বকালে (৮২৫—৮৬৫) বিদ্যমান ছিলেন। ঐ সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে হর্জ্জরদেব রাজা ছিলেন—৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে (৫১০ গুপ্তাব্দে) উৎকীর্ণ তেজপুরস্থ পর্ব্বতগাত্র-লিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইলে বড় জোর তদীয় পুত্র বনমালদেবের সঙ্গে জয়পালের যুদ্ধ ঘটিয়া থাকিতে পারে। জয়মাল বীরবাহু নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া আমাদের অনুমান। (২৭) এবং আরও অনুমান করি যে বিজেতা 'জয়পালের' নামে হয় তো 'জয়মালের' নামকরণ হইয়াছিল; কেননা বঙ্গীয় ও ভারতীয় অনেক দিগ্বিজয়ী রাজার নামে বহু কামরূপাধিপতির নাম দেখিতে পাইতেছি—পুষ্য, সমুদ্র, হর্ষ, গোপাল, ধর্ম্মপাল,—কত বলিব?

রাখালবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসে শ্রীহট্ট রাজ্যের কোন উল্লেখ নাই; অবশ্য আজ ইহা আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ১৮৭৪ অব্দ পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট বাঙ্গালার অংশই ছিল। এবং ভবিষ্যতেও আবার হয়ত বাঙ্গালার সামিল হইতেও পারে। ১৮৮০ অব্দের আগষ্ট্ মাসের এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসিডিংসের মধ্যে শ্রীহট্ট ভাটেরায় প্রাপ্ত দুই-খানি তাম্রশাসন দেখা যায় (২৮) তাহাতে "শ্রীহট্ট" রাজ্যের "নরগীর্ব্বাণ খরবাণ"

(২৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, সপ্তম পরিচ্ছেদ, ১৪৮ পৃঃ, ২৫ সংখ্যক পাদটীকা

(২৬) বাঙ্গালার ইতিহাস, অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৮৩—৪ পৃঃ

(২৭) এ বিষয়ে প্রাচীন কামরূপের রাজমালা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩২০, ৩য় সংখ্যা)

(২৮) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহা আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠে ভুল আছে—শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তেও সকল ভুল রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি ভুল বড়ই রহস্যজনক। প্রথম শাসনখানির ৪র্থ শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে আছে, "শৃহ রাজ্যকমলায়াঃ"। ইহার পাঠ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল "স্বচ্ছরাজ্য কমলায়াঃ" করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পাদে দুইটি মাত্রা কম হইয়াছে, কেননা একটি অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে; সেই অক্ষরটি "ট্ট"; অতএব "শৃহট্ট রাজ্য কমলায়াঃ" পাঠ হইবে। "শ্রীহট্ট" স্থলে 'শৃহট্ট' বানান এই শাসনের

প্রভৃতি পাঁচজন ভূপতির নাম আছে—ইহা বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের এক অধ্যায় হইবার উপযুক্ত। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তেও অনেক নূতন কথা আছে; কিন্তু রাখালবাবুকে জেলার ইতিবৃত্তগুলির প্রতি তেমন অনুগ্রহপরায়ণ বলিয়া বোধ হইল না। ঐ গুলির কোনওটির উল্লেখ তদীয় ইতিহাসে দেখা গেল না। কিন্তু এসকলের প্রতি একটু দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বাঙ্গালার ইতিহাস পরিপুষ্টাবয়ব হইত।

রাখালবাবু ইতিহাস-সঙ্কলনে তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা ও প্রাচীন সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ অবলম্বন করিয়াছেন—ভাল কথা। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস (পলিটিকেল হিস্‌টরি) এইগুলি হইতেই পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহোদয় বহু পরিমাণে কুলগ্রন্থগুলির উপরেও নির্ভর করিয়াছেন—কেননা তিনি বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। আমার বোধ হয়, নগেন্দ্রবাবুর পন্থা ভিন্ন হওয়াতে, রাখালবাবু তাঁহার গ্রন্থে নগেন্দ্রবাবুর এত প্রতিবাদ না করিলেই ভাল হইত। কুল-গ্রন্থের উপর রাখালবাবু, রমাপ্রসাদবাবু প্রভৃতি অনেকেই বীতরাগ; কিন্তু এগুলি একেবারে ফেলিয়া দিবারও জিনিস নহে। যেখানে তাম্রশাসন বা শিলালিপি প্রভৃতির সঙ্গে অনৈক্য হয় সেখানে কুলগ্রন্থোক্ত বিবরণ বর্জ্জনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাম্র-শাসন যে জাল হয়, রাখালবাবুই তার দু-একটি উদাহরণ দিয়াছেন। তাম্রশাসনেরই যখন এই অবস্থা তখন মুদ্রা তো অনায়াসেই কৃত্রিম হইতে পারে। অন্ততঃ আধুনিক সময়ে এই প্রত্নতত্ত্বের হুজুগে উপরওয়ালার সন্তোষের নিমিত্ত অথবা নাম কিনিবার জন্য কেহ সামান্য চেষ্টায়ই জালমুদ্রা তৈয়ার করাইতে পারে। অতএব শাসন বা মুদ্রা মাত্রেই যে গ্রহণীয় এবং কুলগ্রন্থ মাত্রেই যে বর্জ্জনীয় তাহা বলা যায় না।

কুলগ্রন্থে অথবা প্রাচীন পুঁথিতে অনেক অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীও স্থান পাইয়া থাকে। এক হিসাবে সেগুলিও গ্রহণীয়। মহামতি গেইট্ বাহাদুর তদীয় আসাম-ইতিহাসে ‘জয়মতী’র কাহিনী বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছেন—অথচ তাঁহার অলৌকিক ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার ও আত্মবলির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ জয়সাগর আজিও বর্ত্তমান আছে। আসামের আহোম রাজ-বংশের কোনও ব্যক্তির কাহিনী যদি বঙ্গীয় সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে তবে এই জয়মতীর কাহিনীই নানা গ্রন্থে এমন কি গীতাভিনয়েও স্থানলাভ করিয়াছে। যাঁহারা আমাদিগকে এই সকল বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদেরই জাতীয় একজন বিশিষ্ট ইতিহাস-লেখকের কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Our ideas of Roman characters are derived in some degree from the legends which appear in the earlier part of the Roman story and which we have rejected from history. Those legends however were universally received as true by the Romans themselves and therefore they are, as a distinguished writer (Dr Merivale) says "true to the genius of the time and of the people, true in the lessons of Roman character which they inculcate, true for the practical purpose of teaching us what

manner of men those old Romans really were." Legendery lore possesses in fact a formative power in moulding the national character by consecrating traditional types of men for the admiration and imitation of posterity. The Romans thought of early Rome and of her heroes as the poets and orators taught him to think and so from the legends we can understand in a measure the thoughts and actions of those. who inplicitly believed them. (২৯)

আমরা টডের "রাজস্থান"কে হেয়জ্ঞান করিতে পারি কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই মহাগ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালা দেশের কত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ নিবন্ধ সৃষ্টি করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা প্রদান করিয়াছে। ভি, এ, স্মিথের 'আর্লি হিস্‌টরি অব্‌ ইণ্ডিয়া' স্কুল কলেজের পাঠ্য হইতে পারে কিন্তু তাহাতে আমাদের তাদৃশ উপকার হইবে কি? ক্ষেতে চাউল বুনিলে চারা হয় না; বায়ু রাশিতে শুধু অম্লজান থাকিলে সংসারটা ছারখারে গিয়া শ্মশান হইত। ভগবানের এই ইঙ্গিতের প্রতি আমাদের উদীয়মান ঐতিহাসিকগণ একটু দৃষ্টিপাত করেন এই অনুরোধ।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে তদীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি—ইহা হইতে আমি বহু শিক্ষালাভ করিয়াছি। তবে ভুলভ্রান্তি মানবের সকল বিষয়েই থাকিবে—ইহাতেও আছে, তাহা তিনি নিজেও ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই মূল্যবান গ্রন্থখানি, যথাসম্ভব নির্দ্দোষ দেখিতে বাসনা করিয়াই এই সামান্য আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যদি ইহাতে আলোচিত গ্রন্থের অণুমাত্রও উপকার হয় তাহা হইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

দারোগা-গিরির নমুনা

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রেক সাহেব, শ্যামলাল বাবু দারোগার এলাকা ডেফলতলা থানার অধীন তারাপুর গ্রামে একটি Bad livelihood মোকদ্দমা (চলিত ভাষায় ইহাকে "বদমায়েসী" মোকদ্দমা বা "১১০ ধারার মোকদ্দমা" বলে) বিচার করিতে যাইবেন। বর্ষার প্রাচুর্য্যবশতঃ কোর্ট সব-ইনস্‌পেক্টর-বাবু স্বকীয় কোটর ত্যাগ করিয়া অতদূর যাইতে নারাজ হইলেন। অবশ্য পুলিশের চাকরিতে "রাজী", "নারাজী" বলিয়া কোন আপত্তি চলে না, "Police officers are always on duty,"—তবে কোর্ট-বাবু হইতেছেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পেয়ারের লোক, কাজেই তাঁহার

(২৯) Sanderson's Outlines of the World's History: part II. p. 176.

সাত খুন মাপ! সদরে আর কোন নাও-য়ারেশ মাল না থাকায় কোতোয়ালী থানার ছোট দারোগা,—"ছাই ফেলিবার ভাঙ্গা কুলো" আমার উপরই এই কাজের ভার পড়িল। আমি নূতন লোক, কর্ম্মজীবনের পরমায়ু আমার তখন দুই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই,—কাজেই "টুঁ" শব্দটি উচ্চারণের সাহস না করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

পান্সীঘাটায় গিয়া ডকিলাম, "ভাড়া যাবি কে রে?" অমনি এক সঙ্গে সাত আট জন মাঝি হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদারা, মুদারা, তারা—নানা স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আইসেন কর্ত্তা, আমার নৌকায় আইসেন, যাবেন কোহানে?" আমার স্কন্ধে কি যে শনি চাপিল, পরিণাম অজ্ঞাত না থাকিলেও রসনায় হঠাৎ সত্য কথাটাই বাহির হইয়া পড়িল, বলিলাম, "যাব, ডেফল-তলা থানায়।" থানা-পুলিশের নাম শুনিলেই নৌকার মাঝিমাল্লারা শীতের সাপের মত একবারে যেন জড়সড় হইয়া পড়ে, কোন মতেই আর মাথা তুলিতে চায় না। আমার কথা শুনিবামাত্র উহাদের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে আমি একজন "পুলুশ"। অমনি সব চুপচাপ,—কাহারও মুখে আর কথাটি নাই, যেন নৌকা ভাড়া দেওয়া উহাদের কর্ম্মই নহে। মুহূর্ত্তমধ্যে সব মাথাগুলি কচ্ছপের গলার মত নৌকার ছইয়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বুঝিলাম, মুখের দোষে সব মাটী হইয়াছে। আর সংশোধনের উপায় নাই। তথাপি একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে যে নৌকাখানা ছিল, তাহারই মাঝিকে ডাক দিয়া বলিলাম, "কিরে বাবু, কত ভাড়া চাস?" মাঝি মহাশয় নিতান্ত কাতর ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আপনাকে নৌকায় নেওয়া ত আমার ভাগ্যের কথা,—কিন্তু কি করব কর্ত্তা,—মাল্লা দুজনেরই আজ ৫।৬ দিন যাবৎ জ্বর, নৌকা বাইবে কে? কদিন থেকে ঘাটে বসে বসে ঘাট-মাঝির পয়সা দিচ্ছি, আমার পরে এসে কত নৌকা ভাড়া হয়ে চলে গেল, আমিই এখনও পড়ে আছি! বাড়ী হতে যা চাল ডাল এনেছিলাম, তাও প্রায় শেষ, এখন না খেয়ে মরতে হবে দেখ্‌ছি।" মাঝি এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে, গলুইয়ে বসিয়া যে মাল্লাটি রসুইয়ের উদ্যোগ করিতেছিল, তাহার কোঁকানি ও কাঁপুনি একসঙ্গে আরম্ভ হইল,—দ্বিতীয় মাঝিটি এতক্ষণ ছাপ্পড়ের উপর বসিয়াছিল; সেও তাড়াতাড়ি পালখানা বেশ ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া দিল। উহাদের কাণ্ড দেখিয়া আমি হাসিব, না নিজমূর্ত্তি ধারণ করিব, তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই চাহিয়া দেখিলাম, অপর সব নৌকার মাঝিমাল্লারা "পাড়া" খুলিয়া "পাড়ি" ধরিয়া যেন-কতই-কাজে-ব্যস্তভাবে ওপারে "দাসের বাজারে" যাইবার উদ্যোগ করিল। বিলম্বে কার্য্যহানি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আমি জ্বর-হওয়া এই দুইজন মাল্লারই নৌকাখানায় লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কাজেই উহারা আর নৌকা খুলিতে অবসর পাইল না। মাঝি মহাশয় আরও দীনভাবে ব'লল, "হুজুর, আমার নৌকোয় উঠলেন কেন?

দেখ্‌ছেনই ত, আমার ডান হাত বাঁ-হাত দুখানাই ভাঙ্গা,—(অর্থাৎ দুইজন দাঁড়ীরই অসুখ)!" আমি বলিলাম, "সেজন্য কোন চিন্তা নাই, আমার কনেষ্টবল বেশ হাল ধরিতে জানে, সে তোমার বদলে মাঝি গিরি করিবে, তুমি একখানা দাঁড় টানিও, আর একখানা দাঁড় টানিবার জন্য না হয় একজন চৌকিদারকে সঙ্গে লইব।"

দাঁড়িবিষয়ক আপত্তি ভঞ্জন হইলেও মাঝি কিন্তু নিরস্ত হইল না। সে দ্বিতীয় অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল, "হুজুর, আমার এই একটুখানি নৌকো, তাতে আপনার বিছানা-পত্র, বাক্স, পেটারা সব তুলে আনলে সে সবই বা রাখব কোথায়,—আর আমার এই মাল্লাদেরই বা শুতে দেব কোন্‌খানে? এ নৌকায় গেলে আপনার বড়ই কষ্ট হবে। আরও ত কত নৌকো আছে, আপনি তারই এক খানা নিয়ে যান না কেন?" আমি গরম না হইয়া মাঝির দৌড় কতদূর, তাহা দেখিবার জন্য, অত্যন্ত নরম সুরেই বলিলাম, "বাবা, আমি বাক্স-পেটারা কিছুই সঙ্গে লইব না,—বিছানাপত্রও অতি সামান্য,—একখানা তোষক, দুইটা বালিশ আর একখানা কম্বল মাত্র, তাহাতেও যদি তোমার মাল্লাদের অসুবিধা হয়, তবে না হয় আমি কম্বলখানা পাতিয়াই বসিব,—বিছানা আর বিছাইব না।" মাঝি যেন আমার দুঃখে বড়ই কাতর হইয়া বলিল, "তাও কি হয় হুজুর,—ডেফলতলা ত নিকটের রাস্তা নয়,—এক ভাঁটা এক জোয়ারে সেখানে যাওয়া দুষ্কর,—ততক্ষণ আপনি কেমন করে বসে কাটাবেন? আপনি হচ্ছেন বড়লোক, আপনি ডাক দিলে এখনই কত নৌকা এসে পড়বে,—তারই একখানা নিয়ে যান,—আমার নৌকায় এসে কেন মিছে কষ্ট পাবেন?" আমি বলিলাম, "আহা! আমার কষ্টের কথা ভাবিয়া তোমার মনে যেরূপ উদ্বেগ দেখিতেছি, তাহাতে অন্য নৌকায় যাইতে আমার আর ইচ্ছা হইতেছে না,—আমার দরদ তোমার মত আর কেহই বুঝিবে না। বিশেষতঃ আমার দুঃখে তুমি যখন এতটা দুঃখিত হইয়াছ, তখন তোমার দুঃখটাও ত আমার বুঝা উচিত। তা' না হইলে ধর্ম্মে সহিবে কেন! তোমার দুইজন মাল্লা, দুই জনেই ৫।৬ দিন যাবৎ জ্বরে পড়িয়া আছে, ওদিকে তোমার খোরাকীও শেষ, এমন অবস্থায় তোমার সাহায্য করা ত আমার একান্ত কর্ত্তব্য! তা বেশ, আমার নিজের লোক দিয়াই নৌকা বাহিয়া লইব,—তুমি বিনা মেহনতে যা হয় কিছু পাইবে ত, তাহাতে আর কিছু না হৌক, ঘাট-মাঝির খাজনা এবং তোমাদের পেটের খোরাকিটা একরকমে চলিয়া যাইবেই,—মন্দ কি?" ভাবিয়াছিলাম, বাগ্‌যুদ্ধ এই খানেই শেষ হইবে,—মাঝির মাথায় আর কোন আপত্তি বোধ হয় যোগাইবে না। কিন্তু আমার সে ভ্রম ঘুচিতে বিলম্ব হইল না।

মাঝিটী যেন দ্বিতীয় সব্যসাচী, সে যেমন দুইহাতে সমান অস্ত্র ধরিতে জানে, তাহার হরদত্ত তুণটীও তেমনই অক্ষয়! সে এবার তাহার ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ

করিয়া বলিল, "হুজুর, এই ভরা বাদলের মধ্যে আমার এই ভাঙ্গা নৌকায় আপনাকে আমি কোনমতেই তুলিতে পারিব না। পেটের জ্বালায় ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়াছি, নৌকার উপরে নীচে, কোন খানেই হাত দিতে পারি নাই,—এখন দেখি, বৃষ্টি হইলে ছাপ্পর দিয়া জল চুঁয়ায়,—আবার তলা দিয়াও পানি নেয়। এ নৌকায় কি ভদ্রলোকের যাওয়া পোষায়? ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিছানা তুলিয়া জল সেঁচিতে হয়,—আবার বৃষ্টি নামিলে ত উৎপাতের সীমাই থাকে না,—বিছানাপত্র সব গুটাইয়া ঢাকিয়া ঢুকিয়া না বসিলে ত সব ভিজিয়া একাকার হইয়া যায়। হাঙ্গামার অন্ত নাই!"

মাঝির কাণ্ড দেখিয়া আমার সুপ্ত পুলিশী মেজাজ ক্রমেই জাগিয়া উঠিতেছিল, তথাপি যথাসাধ্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "কলিকালেও যে তোমার মত এমন সাচ্চা লোক জন্মায়, সে ধারণা আমার আদৌ ছিল না মাঝি,—আজকালকার দিনে দেখিতে পাই, লোক "মেকি"কেই "সাচ্চা" বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করে, আর তুমি কি না নিজেই তোমার নৌকার যত দোষ আছে, সব তোমার চড়নদারকে আগে হইতে জানাইয়া দিতেছ! তোমার মত খাঁটী লোক আর কখনও আমার চোখে পড়ে নাই,—তোমার মত সাধু লোক দর্শনেও পুণ্য! তোমার কথা শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। তা বাপু, সেজন্যও তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। তুমি নিজেই যখন বলিতেছ যে, তোমার নৌকাখানা খারাপ, ছাপ্পর দিয়া জল পড়ে, তলা দিয়াও জল নেয়,—তার উপর তোমার মাল্লাদেরও জ্বরে শয্যাত্যাগ, তখন আমি তোমাকে ভাড়া যতদূর সম্ভব কম করিয়া দিব! অন্য নৌকার ভাড়া রোজ এক টাকা,—তা আমি তোমাকে ছয় আনা হিসাবে দিব, তবেই আর কোন গোল থাকিবে না। কেমন, এইবার হইল ত?—আর ত কোন আপত্তি নাই? এই বার তোমার হাইলটী খুলিয়া আমার সঙ্গে চল দেখি বাপু,—আমার বিছানাপত্র লইয়া আসিবে।" মাঝির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল,—তাহার এত বাক্-প্রপঞ্চের পরিণাম যে এমন সাংঘাতিক দাঁড়াইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। আর বাক্-চাতুর্য্য বিস্তারে ভরসা না করিয়া এবার উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমি এত বক্‌তে পারি না বাবু,—আমি ভাড়া যাব না,—আপনি অন্য নৌকার চেষ্টা দেখুন।"—এই কথা বলিয়া সে গলুইয়ে আসিয়া "পাড়া" তুলিবার উপক্রম করিবামাত্র আমিও নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিলাম, "তবে রে বেটা বদমায়েস, চালাকি পেয়েছিস! ভাল চাস ত চল্,—না হয় ধরে নিয়ে জেলে পূরে দেব, জানিস্?" ভরা জালায় একখানা ইট ছুড়িয়া মারিলে জালার জল যেমন ছিট্‌কাইয়া উঠে, আমার মুখে জেল-খানার নাম শুনিবামাত্র, মাঝির সঙ্গে সঙ্গে মাল্লা দুইজনও তেমনই লাফ দিয়া উঠিল,—আর তাহাদের সে কাঁপুনি-কোঁকানি নাই, আর সে শীতে জড়সড় ভাব নাই; তিনজনের ছয়টা চক্ষু যেন দুর্ব্বাসা মুনির মত আমাকে ভস্ম করিবার জন্য

একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। তিনজনে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি? কি? কি বল্লে বাবু, তুমি? জেলে দেবে?—জেল অম্‌নি পথে ঘাটে পড়ে আছে আর কি! কার ঘ'রে চুরি করেছি,—কার চালে আগুন দিয়েছি,—কার বুকে ছুরি মেরেছি,—জেল অমনি দিলেই হলো আর কি? এটা বুঝি মগের মুল্লুক? খুসী হলো না ভাড়া গেলাম না,—তার আবার জোর-জবরদস্তি কি? যান্, যান্ মশায় আপনি,—নামুন আমাদের নৌকা থেকে,—আমাদের নৌকা ভাড়া হয়ে গেছে কবে! যদুবাবু উকীলের মেয়েকে নিয়ে আমরা বাঁশবেড়ে থেকে এসেছি, জামাইবাবু আবার এখনই এই নৌকায় বাড়ী ফিরে যাবেন। আমরা তাঁর কাছে আগাম ভাড়া পেয়েছি!" আমার আর সহ্য হইল না,—সব-চেয়ে জোয়ান যে মাল্লাটি, তাহার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিয়া বলিলাম, "এই নে বেটা তোর আগামি ভাড়া,"—"এই নে বেটা, তোর জ্বরের পাঁচন,"—(আর এক চড়),—"আয়, এইবার নিয়ে যাবি চ তোর যদুবাবুর জামাইকে,"—বলিয়া নিজহাতে আমি হাইলটি খুলিয়া উহার কাঁধে চাপাইয়া দিলাম। জ্বলন্ত আগুনে হঠাৎ এক কলসী জল ঢালিয়া দিলে সে আগুন যেমন মুহূর্ত্তে নিবিয়া যায়,—আমার এই দুইটি বজ্র চাপড়ে মাঝি-মাল্লা তিনজনেরই নর্ত্তন কুর্দ্দন একদম থামিয়া গেল,—আগুন নিবিলে তবু একটু ধোঁয়া থাকে,—ইহাদের কিন্তু তাহাও রহিল না, একেবারে সব মধ্যে সেখানে অনেক লোক জমিয়া গেল,—ঘাট-মাঝিও দৌড়িয়া আসিল। ঘাট-মাঝি লোকটি আমার পরিচিত,—সে আমাকে দেখিয়াই লম্বা এক সেলাম ঝাড়িয়া বলিল,—"আপনি কেন নৌকা নিতে এসেছেন ছোটবাবু? আপনি নেমে আসুন,—আমিই সব ঠিক্ করে দিচ্ছি!" তারপর মাঝির দিকে চাহিয়া বলিল, "আরে কি হে করিমবক্স,—দাড়ী চুল পেকে গেল, তবু লোক চিন্‌তে পার্‌লে না? আমাদের ছোট বাবুর মত সদাশয় লোক কি আর আছে? উনি অন্য পুলিশের মত নন। যাও, যাও, ওঁর সঙ্গে যাও, ভাড়া নিয়া কোন গোল হবে না। খাওয়া-নাওয়ারও কোন কষ্ট পাবে না, নিশ্চিন্তে চলে যাও।" ঘাটমাঝিকে দেখিয়া মাঝিমাল্লাদের ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। করিমবক্স মাঝি অমনই সুর বদলাইয়া বলিল, "ভাড়া যাব না কেন? ভাড়াই যদি না যাব, তবে এসেছি কি কর্‌তে? বাবুদের সঙ্গে যাওয়া ত আরও সুখের কথা,—কোন চোর ডাকাতের ভয় থাকে না,—কোন লোক কোন কথা বল্‌তে সাহস পায় না,—ঘাটে গেলেই চাহিতে না চাহিতে মাছ দুধ তরকারী সব আসিয়া হাজির হয়,—এমন সুখের ভাড়া যাব না কেন? অবশ্য ভাড়া যাব। যা রে পীরমামুদ যা, বাবুর বিছানা নিয়ে আয়!" মাঝির আদেশে সেই চপেটা-ঘাত-প্রাপ্ত মাল্লাটী হাইল কাঁধে লইয়া নামিতে উদ্যত হইলে ঘাটমাঝি বলিল, "হাইল আর নিতে হবে না,—যা, আমি

যো নাই, ছোটবাবু,—আপনি যান্, বিছানা নিশ্চিন্তে পাঠিয়ে দিন্-গে।” ঘাটমাঝির কথায় হাইলটা রাখিয়াই মাল্লার সঙ্গে থানায় ফিরিলাম।

থানায় আসিয়া রামদীন সিংহ কনষ্টেবলকে আমার বিছানা-পত্র লইয়া অবিলম্বে নৌকায় যাইতে আদেশ করিলাম,—সে “বহুৎ আচ্ছা, হুজুর,”—বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমিও তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কারণ ভাঁটার বড় অধিক বিলম্ব ছিল না। ভাঁটায় আমাদিগকে কল্যাণপুর পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে জোয়ারে ডেফলতলা থানায় যাইতে হইবে। সেখানে শ্যামলালবাবু দারোগার নিকট মোকদ্দমার অবস্থা শুনিয়া তবে আমাকে তারাপুরে মোকদ্দমা পরিচালন করিতে হইবে। খুন, ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি মোকদ্দমার মত Bad livelihood Case-এ পুলিশ প্রায়ই কোন ডায়েরী দেয় না, কেবল মামুলী-মত একটী রিপোর্ট দাখিল করে মাত্র। সে রিপোর্ট যেরূপ অদ্ভুত রকমের সেকেলে বাঙ্গলা ভাষায় লেখা থাকে, তাহা বুঝিয়া উঠা আমার মত নিতান্ত একেলে লোকের পক্ষে তখনও তেমন সহজ হইয়া উঠে নাই। সেই জাতীয় বাঙ্গলার একটু নমুনা দিতেছি,—“হুং হয় যে, লাং বাং হাং হয়, —তিনি কং এর সন্তোষজনক কৈঃ হুং পেং করেন।”*

আহারান্তে ঘাটে আসিয়া দেখি, রামদীন কনষ্টেবল ঝোলাটী শিয়রে দিয়া ঘাটমাঝির ঘরে পাশাপাশি-পাতা দুইটী কেরোসিনের বাক্সের উপর পড়িয়া গভীর নিদ্রায় অচেতন, আর আমার বিছানাটী একখানা মাদুরের উপর মেজেতে পড়িয়া আছে। ঘাটে কোন নৌকা নাই, ঘাটমাঝিও অন্তর্হিত। ভাঁটার টান ফিরিয়াছে,—অবিলম্বে যাত্রা না করিলে জোয়ার আসিবার পূর্ব্বে কল্যাণপুর পর্য্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। অন্তরে তখন যে ভাবের সঞ্চার হইল, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা দুরূহ। হাতের লাঠি দিয়া রামদীনের পার্শ্বদেশে এক খোঁচা মারিলাম, অমনি সে “কোন্ হায়,” “কোন্ হায়”, বলিয়া চোখ রগ্ড়াইতে রগ্ড়াইতে উঠিয়া বসিল। আমার দিকে চাহিতেই তাহার মুখখানা যেন অম্লরসে ভরিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া নিজের পাগড়ী দিয়া একটী কেরোসিনের বাক্স মুছিয়া, “বৈঠিয়ে হুজুর, হাম্ মান্‌ঝি কো বোলাওতে হেঁ,” বলিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল। পাখী যে শিকলি কাটিয়া উড়িয়া গিয়াছে, সে কথাটা তাহাকে বলিবারও অবসর পাইলাম না,—সে উধাও হইয়া ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। এখন কি করি,—কোথায় যাই,—কেমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গম্য স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, এই সব কথা ভাবিতেছি, আর রামদীনের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই যে

* “হুকুম হয় যে, লাইনবাবুর (Reserve Sub-Inspector) হাওলা হয়,—তিনি কনষ্টেবলের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ হুজুরে পেশ করেন।”

এত কষ্টে ঠিক-করা নৌকাখানা হাত-ছাড়া হইয়া গেল, সেই কথা ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া উঠিতেছি,—এমন সময় শুনিলাম, রামদীন "ও মান্‌ঝি, মান্‌ঝি, জল্‌দী কিস্তী হিঁয়া লে আও, বাবু আয়া হ্যায়" বলিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। সে কোন্ মাঝিকে কোথা হইতে আসিতে বলিতেছে, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই নদীর অপর পার হইতে একজন লোক উত্তর দিল, "এই যাচ্চি গো! পেস্কারবাবু এখনো আসে নি।" রামদীন আবার ঘাটমাঝির ঘরে ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নৌকা কোথায় হে রামদীন?" সে তদুত্তরে জানাইল, আমি নৌকা ভাড়া করিয়াছি জানিয়া, পেস্কার কেদারবাবুও আমার সঙ্গে সেই নৌকায় যাইবেন, স্থির করিয়াছেন। কেদারবাবুর বাড়ী নদীর অপর পারে "দাসের বাজারে।" আমার আগমন-সংবাদে তিনি রামদীনকে বলিয়া বিছানাপত্র আনিবার জন্য নৌকা নিজের ঘাটে লইয়া গিয়াছেন। আমার প্রধূমিত ক্রোধ কাজেই আর বহ্নিমান্ হইতে পারিল না; বরং অন্তরে হর্ষেরই সঞ্চার হইল। কারণ, এতটা পথ একাকী যাওয়ার চেয়ে একজন ভদ্রলোক সঙ্গী পাওয়া আনন্দেরই কথা, তাহার উপর কেদারবাবুরও আমারই মত দাবাখেলায় বড় আগ্রহ, কাজেই তাঁহার মত একজন সঙ্গীলাভ করা ত ভাগ্যের কথা! রামদীনকে তখনই বাসা হইতে দাবা-বোড়ে এবং খেলিবার নক্সা-করা পেষ্টবোর্ডখানা আনিবার

আসিতে আসিতে নৌকাখানাও পেস্কার বাবুকে লইয়া এপারে আসিল। আর বিলম্ব না করিয়া বিছানাপত্রসহ তখনই নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম, এবং মাঝিমাল্লারাও "দরিয়ার পাঁচপীর, গাজী, বদর বদর," বলিয়া নৌকা খুলিয়া দিল।

এখন আর মাঝি-মাল্লাদের তেমন অপ্রসন্ন ভাব ছিল না,—আমারও মনটা নিশ্চিন্ত। কাজেই একটু তামাসা দেখিবার জন্য মাঝিকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলাম, "দেখুন কেদারবাবু, আমাদের এই মাঝিটী বড় নিস্পৃহ, এবং ভারী সাধু লোক। উহার নৌকার ছাপ্পড় দিয়া জল চুয়ায়, এবং তলা দিয়া জল উঠে বলিয়া সে নিজেই দৈনিক ছয় আনা হিসাবে ভাড়া লইতে রাজী হইয়াছে।" মাঝির মুখখানা অমনি পোড়া হাঁড়ীর তলার মত মলিন হইয়া গেল,—সে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "ছ' আনা ভাড়া দিলে কি গরীব বাঁচে কর্ত্তা? আমার নৌকার তলা দিয়া ত কই তেমন পানি উঠে না,—যদিও-বা একটু-আধটু উঠে, তা দিনে একবার সেঁচে ফেল্‌লেই যথেষ্ট। আর ছাপ্পর্ দিয়া ত কখনও পানি চুয়াতে দেখি নাই,—যদিই বা হঠাৎ কখনও একটু আধটু চুয়ায়, তবে তখন না-হয় আমার কাঁথাখানা ছাপ্পড়ের উপর পেতে দিব,—তাই বলে কি আপনাদের গায় পানি পড়্‌তে দিব?" আমি সে কথা না শুনিবার ভাণ করিয়া রামদীনের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "ভাল কথা, রামদীন, তুমি ত

যে, রামদীন আরা জেলার বিশুদ্ধ ছত্রী, তাহার সাত পুরুষেও কেহ কখনও নৌকার হাল ধরে নাই),—তা তুমি গিয়া মাঝির হাত থেকে হাইলটী নিয়ে বস গে,—আর সেখপাড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় নৈমুদ্দি চৌকিদারকে ডেকে নিও,—কারণ মাল্লারা দুজনেই অসুস্থ, নৌকা বাইতে পারবে না।”

করিমবক্স মাঝি অমনি বলিয়া উঠিল, “কেন আর মিছে চৌকিদারকে ডাক্‌বেন কর্ত্তা,—একেই ত এই ছোট নৌকা, তার উপর আরও লোক তুল্‌লে নৌকায় জায়গা হবে কেন? কি আর করা যাবে, পীরমামুদ আর সোনা-উল্লাই কোনমতে দাঁড় টেনে যাবে আর কি! জ্বর বলে বসে থাক্‌লে কি আর আমাদের মত গরীব কাঙ্গালের চলে কর্ত্তা?”

আমি তখন করিমবক্সকে বলিলাম, “আচ্ছা মাঝি, এখন যে তুমি সব কথাই কাটাইয়া দিতেছ, প্রথমে তবে অত সাত পাঁচ ঘোর-ফের কথা বলিতেছিলে কেন? পুলিশের কাছে নৌকা ভাড়া দিতে তোমাদের আপত্তি করিবার কি হেতু থাকিতে পারে? প্রায়ই দেখি, পুলিশের লোক নৌকা ভাড়া করিতে আসিলেই সব মাঝি-মাল্লারা পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে,—ইহার কারণ কি? ভাড়াও ত আমার বিশ্বাস, পুলিশের নিকট কেহ কম পায় না! কারণ ভাড়ার পয়সা ত পুলিশের লোক কখনও নিজের গাঁট হইতে দেয় না। বদলী হইয়া যাইবার সময়, কিম্বা সরকারী খাজনা কি আফিং, কি কয়েদী প্রভৃতি একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইতে হইলে সে ভাড়া ত সরকার হইতেই পাওয়া যায়। থানার দারোগারা খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি মোকদ্দমা তদন্ত করিতে মফঃস্বলে গেলে তখনকার নৌকাভাড়া ত পক্ষগণ আইন খরচের মতই বিনা আপত্তিতে বহন করে,—সুতরাং পুলিশের লোকের ভাড়া কম দিবার কোন কারণই আমি বুঝিতে পারি না। আহারাদি যে ভাল হয়, সে কথা ত তুমি নিজেই বলিলে,—তবু পুলিশের লোককে নৌকাভাড়া দিতে তোমরা এত আপত্তি কর কেন?” করিমবক্স আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—কোন উত্তর দিল না। কেদারবাবু বলিলেন, “কিহে, চুপ করিয়া থাকিলে কেন,—দারোগাবাবু যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কথার জবাব দাও না।”

মাঝি তখন অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত বলিল, “বল্‌ব আর কি কর্ত্তা? আমাদের এই বাবুটী যেমন সদাশয় (?), তেমন ত পুলিশের সকল বাবু নন! অনেক বাবুই আমাদিগকে জোয়ার-ভাটায়, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে অনাহারে অনিদ্রায় খাটাইয়া বেজায় কষ্ট দেন। খুন জখম চুরি ডাকাতি ইত্যাদি মোকদ্দমার সংবাদ পাইলে তাঁহারা ঘটনা-স্থলে পৌঁছিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তখন তাঁহারা নৌকায় যাইতে-ছেন কি ষ্টীমারে যাইতেছেন, সে কথাটা যেন ভুলিয়া যান, কেবল বলেন, ‘ও মাঝি, জোরে চালাও, আরও জোরে চালাও,—ভারি দেরী হয়ে গেল যে!’ যদি বলা

যায়, 'বাবু বেগণ * হ'য়ে গেছে। নৌকো এখন চালাব কেমন করে?' অমনি বাবু তেড়ে উঠে বলেন, "বেগণ হয়েছে, ত ভারি বয়ে গেছে,—দাঁড়ে না চলে ত গুণে নেমে যা,—গুণের পথ না থাকে ত লগি খুঁচিয়ে চল, বজ্জাতি করে যদি কাজ নষ্ট করিস্, তবে এক পয়সাও ভাড়া পাবি নে, জানিস?' কাজেই আমরা প্রাণপণে নৌকা বাইতে সুরু করি। ষ্টীমারের যে ইঞ্জিন, সেও কয়লা আর জল না পেলে চল্‌তে পারে না,—পুলিশের বাবুরা আমাদের ইঞ্জিনের চেয়েও বোধ হয় ভাল কল বলে মনে করেন,—সেজন্যে আমরা নাওয়া খাওয়া কর্‌তে চাইলেও নৌকা থামাতে দেন না! থানায় ফেরবার সময়েও আবার 'চল্ চল্, শিগ্‌গির চল,—না-জানি, এ ক'দিনে থানার কি হয়ে গেছে,' বলিয়া তেমনই তাড়া দিতে থাকেন! এত খাটুনির পর যেই ভাড়া চাওয়া গেল অম্‌নি কসাকসি আরম্ভ হইল। নৌকা ভাড়া কর্‌বার সময় যা চাই, বাবুরা তাতেই রাজী, কিন্তু টাকা দেবার বেলাই ঢু-ঢু। বাবুরা ত ঘাটে-ঘাটেই, যেখানে যে মোকদ্দমা থাকে, সব মোকদ্দমার আসামী ফরিয়াদী দু'পক্ষের কাছ থেকেই নৌকাভাড়া বলে গণ্ডা গণ্ডা টাকা আদায় করেন। কেউ দু'-চার-আনা কম দিতে চাইলে আমাদের সাক্ষ্য মানিয়া বলেন, 'জিজ্ঞাসা কর না মাঝিকে রোজ কত ভাড়া—'। আমরাও পাইবার আশায় এক টাকার জায়গায় দেড় টাকা হাঁকিয়া বসি। পক্ষগণও আর সামান্য টাকার জন্য দারোগাবাবুর কোপ না জন্মাইয়া যাহা চান তাই দিয়া ফেলেন। সে টাকাটা কিন্তু আমাদের হাতে আসে না,—বাবুর নজরের টাকার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাভাড়ার টাকাটাও কনষ্টেবলের হাতে পড়ে,—বাবুরা নিজ হাতে কখনও কারও কাছ হইতে এক পয়সা গ্রহণ করেন না। কাজ-অন্তে থানায় আসিয়াই বাবু সটান বাসায় চলিয়া যান, কনষ্টেবল মহাশয় দিন গণিয়া যত দিন হয় ততটা টাকাও আমাদিগকে দিতে চায় না,—বলে, 'বেটা, সে দিন ত দণ্ড দুই বেলা থাক্‌তেই থানা থেকে রওনা হয়ে গেলাম, সে দিনের আর ভাড়া পাবি কি? তার পরদিন থেকে হিসাব কর্।' দুই দণ্ড থাক্‌তে নৌকা ছাড়া হয়েছিল, সে কথা ঠিক্ বটে,—কিন্তু সারাটা রাত্রি যে নৌকা ঠেলে গেলাম, সে পরিশ্রমটা কনষ্টেবল ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আন্‌লে না। যেখানে পাব ন্যায্য পাঁচ টাকা, সেখানে ফকিরের ভিক্ষার মত বড়-জোর দুটো টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যদি অত কম ভাড়া নিতে আপত্তি করা যায়, তবে বলে, "আচ্ছা, তা'হলে এখন চলে যা, বাবু আসুন, তখন যত নিতে পারিস্ নিবি,—বাবু আমাকে এর চেয়ে বেশী ভাড়া দেবার হুকুম দিয়ে যান্ নি, আমি কোথা থেকে দিব?' তিনদিন তিন রাত্রি খাটিয়া কোথায় একটু বিশ্রাম করিব, তা ন', আবার বাবুর খোঁজে আসিতে হইবে! হয়ত তখন আসিয়া শুনিব যে, বাবু অন্য কাজে

কোথায় চলিয়াই গিয়াছেন! কাজেই কনষ্টেবল যাহা দিল, তাহাই হাতে লইয়া বাবুর বাসার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কনষ্টেবল, বক্সী, জমাদার সকলে অমনি তাড়া আরম্ভ করিল, 'ওখানে দাঁড়ালি কেনরে বেটা, বাবু তিন দিন তিন রাত্রি কত খাটিয়া আসিয়া, সবে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন, এর মধ্যে আবার তাঁকে ত্যক্ত করিতে গেলি কেন? ভাড়া ত পেয়েছিস্, আবার কি চাস্? কোন কথা থাকে, একটু পরে আসিস্। আমরা ত আর থানা সমেত পালিয়ে যাব না,—ভয় কি?' মজা দেখুন—বাবুর বেলা বলা হলো, 'তিন দিন তিন রাত' কিন্তু ভাড়া দিবার সময় দুই রোজের বেশী দেওয়া হল না! কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলে, এমন সাহস কার? তাড়া খেয়েও যদি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে "বাবু," "বাবু," বলে ডাক দেওয়া গেল, তা আধ-ঘণ্টার মধ্যে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। নিতান্ত নাছোড়-বান্দা হয়ে যদি তথনও ডাকাডাকি বন্ধ না করিলে, তবে হয় ত বাবু চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে হে বাপু, তোমরা অত চেঁচামেচি কচ্চ কেন? কি চাও? বাড়ী কোথায় তোমার?' হায় রে! তিন দিন তিন রাত যে বাবু আমার নৌকায় কাটাইয়া আসিলেন, আজ আর তিনি আমাকে দেখিয়া চিনিতেও পারিলেন না! নিজের পরিচয় দিয়া ভাড়ার টাকা চাহিবামাত্র তিনি কনষ্টেবলকে তাড়া দিয়া উঠিলেন, 'এখনও ইহাদের ভাড়া দাও নাই কেন?' কনষ্টেবল অগ্রসর হইয়া বলিল, 'সে কি কথা? ভাড়া ত আমি কোন্‌কালে দিয়েছি। —বেটা বজ্জাতি করে আবার তবু আপনাকে ত্যক্ত করতে গিয়েছে?' যেই কনষ্টেবল এই কথা বলেছে, বাবু অমনি পায়ের জুতা খুলে 'তবে রে বেটা হারাম-জাদ—জোচ্চোর, এত বড় আস্পর্দ্ধা, থানার উপর ফাঁকি দিয়ে দু'বার ভাড়া নিতে এসেছিস্,—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা?' বলিয়া মারেন আর কি! ইহাতেও যদি হাত যোড় করে বলা যায়, 'হুজুর, তিন দিন তিন রাত খাটিয়া যদি দুইটিমাত্র টাকা পাওয়া যায়, তবে আমাদের কেমন করিয়া চলে? অমনি বাবু বলেন, 'ওহো! দু'টাকা পেয়েও তোমরা সুখী হও নাই,—আচ্ছা, বেশ, দেখি টাকা দুটো, দাও ত আমার হাতে' —যেমন টাকা দুইটী হাতে দেওয়া গেল, অমনি তিনি বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আশা করিতেছি, বাবু বোধ হয় একখানা পাঁচটাকার নোটই আনিয়া দিবেন। শোভান আল্লা! সে আশায় ছাই পড়িতে বিলম্ব হইল না। বাবু তাঁহার চাকরের হাত দিয়া একটি টাকা আর আট আনার পয়সা পাঠাইয়া দিয়াছেন! চাকর বলিল, 'বাবু বলিয়াছেন যে, আপ্-খোরাকী ভাড়া রোজ বার-আনা,—তোরা ত প্রত্যহ দু'বেলা খোরাকীও পেয়েছিস্, কাজেই রোজ আট-আনার বেশী কিছুতেই পাবি না,—হাতীর মত যোয়ান এক এক বেটা, চার আনায় তোদের একজনেরও দুবেলা খোরাকী হয়

না। যা হোক, বাবু দয়া করে আট আনা হিসাবে তিন দিনে পূরা দেড় টাকাই দিয়েছেন। এই নিয়ে যা তোরা,—এখন গিয়া ঘাটেই থাক্, মকিমপুরে একটা বড় চুরি হয়ে গেছে,—বাবু নেয়েখেয়েই সেখানে যাবেন। তোদের নৌকাখানা নাকি ভাল, বাবু আবার তোদের নৌকাতেই যাবেন—'। শুনিবামাত্র আমাদের পেটের পিলে চম্‌কে উঠ্‌ল,—আর 'ভিক্ষায় কাজ নাই বাবা, তোর কুকুর ঠেকা' বলিয়া মনে মনে বাবুকে 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক', আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দে সটান দৌড়! তারপর ঘাটে আসিয়াই লম্বা চম্পট! এই ত গেল মফঃস্বলের কথা। যদি বদলী বা খাজনা লইয়া একস্থান হইতে অন্যত্র বাবুদেরে লইয়া যাওয়া হয়, তবে ত ভাড়া আদৌ দিতে চায় না,—বলে, 'এখন টাকা পাব কোথায়? আগে বিল করি, সরকার থেকে টাকা পাই, তারপর ত তোদের টাকা দেব। টাকা কি আর আমার বাক্সে মজুত আছে? মাস্‌কাবারে যখন বিল পাশ হয়ে আস্‌বে, তখন খবর দেব, এসে রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ে যাস্!' কাজেই বুঝতে পারেন যে, আমরা কেন বাবুদের নৌকা ভাড়া দিতে ভয় পাই! কি বল্‌ব বাবু, নেঙ্গটি-পরা বয়স থেকে নৌকা বেয়ে বেয়ে দাড়ী-চুল পেকে গেল, অনেক দেখে-ঠেকেই এই রকম কর্‌তে হয়।"

মাঝির এই সুদীর্ঘ কাহিনী একটু রঞ্জিত হইলেও, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা আর ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া 'মৌনং হি শোভনং' নীতি অবলম্বন করিয়া দাবা-ব'ড়ে লইয়া কেদারবাবুর সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম।

পর দিন অতি প্রত্যূষেই আমাদের নৌকা ডেফলতলা থানায় উপস্থিত হইল। আমাদের গমন-সংবাদ শ্যামবাবু পূর্ব্বেই পত্রযোগে অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে অত সকালে ঘাটে পায়চারি করিতে দেখিয়া বোধ হইল যে, তিনি যেন আমাদের আগমনের জন্যই প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। কেদারবাবুর পিশতাত ভাই ডেফলতলা কাছারীর নায়েব, নৌকা ঘাটে ভিড়িবামাত্র কেদারবাবু সেইখানে চলিয়া গেলেন। তিনি আমাকেও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে অনুরোধ করিলেন, আমি জিভ্ কাটিয়া বলিলাম, "আরে রাম, তাও কি হয় মশা'য়, শ্যামলালবাবুকে আগে থেকে খবর দিয়ে রেখেছি, এখন অন্যত্র গেলে তিনি কি মনে করবেন?" শ্যামলালবাবুর সঙ্গে এক থানায় কাজ করিবার সৌভাগ্য না ঘটিলেও তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় পূর্ব্ব হইতে ছিল। সাক্ষ্যদান বা অন্য কোন কার্য্য-উপলক্ষে সদরে গেলেই তিনি আমাদের থানায় একবার পদধূলি দিয়া ও সকলের কুশল-সংবাদ লইয়া আপ্যায়িত করিয়া আসিতেন। সময়ে অসময়ে দুই একবেলা এই দীনের কুটীরে আতিথ্য স্বীকার করিয়াও কৃতার্থ করিয়াছেন। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য তিনি নৌকার নিকট আসিবামাত্র আমি নমস্কার করিয়া

প্রতি-নমস্কারান্তে আমার শারীরিক ও পারিবারিক কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কেদারবাবুকেও সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া থানায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কেদারবাবু যথেষ্ট বিনয়ের সহিত সে অনুরোধ এড়াইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কেদারবাবুর চক্ষু দুইটি যেন আমার দিকে একটু বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল, —তখন আমি ইহার কোন হেতু উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

শ্যামলালবাবু প্রায় আমার পিতার বয়সী, এবং একজন সিনিয়র অফিসার, কাজেই আমি যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া থানা-ঘরে উপবিষ্ট হইলাম। একথা সেকথা বহু কথার পর কাজের কথা আরম্ভ হইল। আমি যে মোকদ্দমা-পরিচালনের জন্য তারাপুর চলিয়াছি, সেই মোকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত একে একে তাঁহার নিকট জানিয়া লইলাম। কয়জন আসামী, কাহার কয়টি পূর্ব্ব-শাস্তি (Previous conviction) আছে, কে কয়টা মোকদ্দমায় কি কি কারণে সন্দিগ্ধ হইয়াছে, কাহার সংসারে কয়জন খাইবার লোক, কাহার কত বিঘা জমি-জমা আছে,—কাহার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ সাক্ষীদ্বারা কি কি বিষয় প্রমাণিত হইবে, —একে একে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কথাই সংক্ষেপে নোট-বহিতে টুকিয়া লইলাম। যাহাতে আসামীগুলি সকলেই শ্রীমন্দির দর্শন করে, সেজন্য মোকদ্দমাটী বিশেষ মনোযোগের সহিত পরিচালন করিবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমিও যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটি করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে,—কথাবার্ত্তায় এতক্ষণ স্নানাহারের চিন্তা মনেও আসে নাই। ঘড়ির দিকে চাহিয়াই মনে পড়িল, পূর্ব্ব রাত্রে আমাদের কিছুই আহার হয় নাই,—কাজেই শ্যামলালবাবু সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমি আত্মীয়তার ভাব দেখাইয়া বলিলাম, "আর কেন মশায়, এইবার উঠে পড়ুন, স্নানাহার করা যাক্‌গে,—।" আমার কথায় শ্যামলালবাবুর যেন চমক ভাঙ্গিল,— তিনি বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তাই ত, তাইত, বেলা যে ঢের হয়ে গেছে,—সহরে থেকে তোমাদের সকাল সকাল খাওয়ার অভ্যাস,—তা বেশ, এখন তুমি ওঠ। আমাদের ত আজ একাদশী,—আহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়,—বেলা গেলে যা হয় একটু ফলটল খাব,—তা তুমি ভায়া যাও, স্নানাহার সেরে ফেল,—বৈকালে কিন্তু আমার একটু কাজ করে দিতে হবে।" আমি বলিলাম, "তা বেশ ত, আহারান্তে যা বলেন করে দেব। এখন একটু তেল দিতে বলুন, স্নানটা করে আসি।" শ্যামলালবাবু অমনি, "কানাই, কানাই, ও কানাই,—আঃ, বেটা যেন কুঁড়ের বাদশা,—কোথায় গেলি, ও কানাই—" বলিয়া হাঁক দিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একটী কৃশকায় ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্যামলালবাবু তাহাকে একটু তৈল

কুণ্ঠার সহিত বলিল, "আজ্ঞে, তেল কোথায় পাব? আজ রান্না হবে না বলে ত তেল মোটে আনাই হয় নি,—সেই কাল দুপুরে যে দু-পয়সার তেল আন্‌তে দিয়েছিলেন, তা'ত কালকেই প্রায় শেষ হয়েছিল,—শিশির-তলায় যা একটু-খানি ছিটে-ফোঁটা ছিল, তাও আজ সকালে আপনার আফিঙ্গে মেখে দিয়েছি,—তেল ত আর নাই—"! শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম! শ্যামলাল বাবু কি তবে আমার পত্র পান নাই? কিন্তু পত্র না পাইলেই বা ক্ষতি কি? আমরা যে আসিয়াছি, সেও ত প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টার কথা,—ইহার মধ্যে কি আর একজনের আহারের যোগাড় হইয়া উঠিতে পারে না? এইবার কেদারবাবুর সেই অপাঙ্গ ভঙ্গির কথাটা আমার মনে পড়িল; অমনি সকল ব্যাপার জলের মত তরল হইয়া উঠিল। হায়, হায়, এত-ক্ষণ যে চর্ব্বা-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কত কি উপাদেয় পদার্থের আশায় রসনা আমার অসংযত হইয়া উঠিতেছিল! নিজের কাছেই নিজের দারুণ লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। কোথায় কত যত্নে আহার করিব ভাবিয়া মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করিতেছি,—আর কোথায় একবারে অরন্ধন,—স্নানের তৈলটুকু পর্য্যন্ত নাই!

ঘরে তৈল না থাকা, এবং অহিফেন-সেবনের অভ্যাস থাকা, এই দুইটী অগৌ-রবের ব্যাপার যুগপৎ আমার গোচরীভূত করাতে শ্যামলালবাবু কানাইয়ের উপর —"যা, যা, বেটা গোবরগণেশ, দূর হয়ে যা,—বুদ্ধির ঢেঁকি বেটা,—যা দেখ্‌ বিনুর বাসায় তেল আছে কি না,—থাকে ত একটু তেল এনে দে—"। বিনোদ দে শ্যামলালবাবুর জমাদারের নাম,—সে শ্যামলালবাবুর অধীনে টাউন-চৌকিদারী, কনষ্টেবলী এবং বক্সীর কাজ করিতে করিতে বাইশ বৎসর পরে এতদিনে জমাদারের পদে প্রোমোশন পাইয়াছে,—শ্যামলালবাবু কিন্তু এত পদোন্নতিতেও বিনোদকে সেই সাবেক আদরের নাম "বিনু" বলিয়াই ডাকেন,—অবশ্য বিনোদ ইহাতে তেমন সন্তুষ্ট নহে,—অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারে না। কানাই বিনোদবাবুর বাসায় তৈল আনিতে যাইবার পূর্ব্বেই বিনোদবাবু স্বয়ং তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্যাম-লালবাবু অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত বলিলেন, "দেখেছ বিনু, আমার কপাল,—ভায়া ত (আমার দিকে তাকাইয়া) কোন দিন এদিকে পদার্পণ করেন না,—আজ যদিও-বা ভাগ্যগুণে শুভাগমন হলো, তাও কি না একাদশীর দিনে, যেদিন আমাদের ঘরে হাঁড়ীই চড়ে না! কথায় কথায় বেলাও হয়ে গেছে ঢের,—ভায়া যে কোথায় কি খাবার যোগাড় করেছেন, তার কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। একটু স্নানের তেল যে দেব কানাই বেটা সে উপায়ও রাখেনি। তুমি বাবা একটুখানি তেল তোমার ঘর থেকে ঝট্‌ করে ভায়াকে এনে দাও ত!" ক্রোধে ও ঘৃণায় আমার আপাদমস্তক

দমন করিয়া বলিলাম, "না, না, না, আর তেল আন্‌তে হবে না,—একেবারে বাজারে গিয়েই স্নানাহার কর্‌ব, তেল সেখানেই পাওয়া যাবে।" বিনোদ বেচারী আমার কথায় বড়ই অপ্রতিভ হইয়া গেল,—সে বোধ হয় জানিত না যে দারোগার গৃহে সেদিন "অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ"। তেল দিতে সে আর সাহস করিল না; তবে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমার সহিত বাজার পর্য্যন্ত গিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত হইল। আমি ধন্যবাদের সহিত সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া নৌকা খুলিয়া নদীর অপর পারে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে ভাল খাবার কিছুই নাই,—সামান্য কিছু বাতাসা ও মুড়ি পাওয়া গেল, তাহা দিয়াই একটু জল খাইয়া রামদীনকে লুচি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলাম।

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

চয়ন

মার্কিন-কবি উইল্‌কক্স

এলা হুইলার উইলকক্স মার্কিন দেশের জনপ্রিয় মহিলাকবি। উইলকক্সের জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার সাহিত্যানুরাগিনী জননীর প্রাণে একটা অদ্ভুত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, এবারে তাঁহার কন্যা-সন্তান জন্মিবে, এবং সে বড় হইয়া সাহিত্যের সেবাতেই জীবন সমর্পণ করিবে। তাহার ফলে কুমারী এলা আপনার শৈশবচাপল্যে ও নবআয়ত্ত বিদ্যার উৎসাহে যেখানে-সেখানে যাহা-কিছু লিখিতেন তাহাতেই পরিবারের সকলের একটা উৎসাহ দেখা যাইত।

তিনি নিজেও বলেন—"বাস্তবিক, ছেলে-বেলায় আমার মা আর বাবা আমাকে কি উৎসাহটাই দিতেন! সাত বৎসর বয়সের সময়—তখন বছর-দুই সবে লিখতে শিখেছি আর কি,— আঁকা-বাঁকা, ছোট-বড় অক্ষরে যেখানে সুবিধা পেতুম, আপনার খেয়ালে দু-চার লাইন ছাইভস্ম লিখে ফেল্‌তুম; আমার বাবা ও মা সেগুলো দেখলেই ভারি খুসি হয়ে আমাকে আদর করে, পিঠ চাপড়ে নানা রকমে খুব উৎসাহিত করতেন; বাবার অবশ্য আমার সম্বন্ধে যে বিশেষ উঁচু ধারণা ছিল তা নয়; মা কিন্তু মনে করতেন আমি সেক্সপীয়র বা এমার্সন বা অমনি একটা-কিছু হব। আমাদের বাড়ীর আর সকলেও তাঁদের দেখাদেখি আমার বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন।"

এই রকমে পরিবারের সকলের নিকট হইতে সতত উৎসাহ লাভ করিয়া কুমারী এলার মনে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব

বেশ সুস্পষ্টরূপে জাগরূক হইয়া ছিল। তিনি আট বৎসর বয়সের সময় রীতিমত খাতা বাঁধিয়া সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দেন; পনেরো-ষোল বৎসর বয়সের সময় এই শিশু, পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। স্থানীয় কোনও একখানি কাগজের অফিসে তিনি ছোট ছোট তিনটি কবিতা লুকাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কয়দিনের ভিতরেও কোন উত্তর না পাইয়া নবীন কবি যখন কবিতা-প্রকাশের আশা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছেন, তখন একদিন সকালে খাইতে বসিয়া একান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সম্পাদকের জবাব পাইলেন। তাঁহার কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া, সম্পাদক মূল্যস্বরূপ একখানি চেক পাঠাইয়া দিয়াছেন!

কাগজে কবিতা প্রকাশিত হইলেই যথেষ্ট, —আবার তাহার উপর টাকা, কেন—কিসের জন্য? তিনি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! তাড়াতাড়ি পিতা মাতাকে সেই চিঠিখানি দেখাইলেন—ওঃ! সেদিনকার আনন্দ তিনি জীবনেও ভুলিবেন না! এই বয়সে লিখিয়া একেবারেই টাকা পাওয়াতে বাড়ীর সকলেই অবাক হইয়া গেলেন! মাতা চুম্বনে চুম্বনে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পিতা এতদিন মাত্র আমোদ উপভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহ দিলেও, তাঁহার কন্যা যে কেবল দখিণ হাওয়া, জ্যোৎস্না আর পুষ্প-সৌরভ লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিবে—মনে মনে এটা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। আজ কিন্তু তিনিও কন্যার এই অভাবনীয় সাফল্যে পুলকিত হইয়া উইলকক্সকে পুরস্কার দান করিলেন। ফলে, কবির উৎসাহ এত বাড়িয়া গেল যে, তিনি যখনই একটু সময় পাইতেন, তখনই কবিতা লিখিতে বসিতেন। কিন্তু যাহা লিখিতেন তাহাই ছাপা হইত না; অনেক সময় তাঁহার ডাকটিকিট খরচ করিয়া সম্পাদকদের কাছে লেখা পাঠানোই সার হইত। এজন্য তাঁহার পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া মেয়েকে এত বাজে খরচ করিতে মানা করিতেন।

একবার উপর-উপরি তিনমাস দেশের কোন সম্পাদক তাঁহার কবিতা না ছাপাতে মিঃ হুইলার মেয়েকে আবার তিরস্কার করিলেন। কিন্তু চতুর্থ মাসের প্রথম সপ্তাহে উইলকক্স আবার কবিতার জন্য একখানি চল্লিশ ডলারের চেক পাওয়াতে, তাঁহার পিতার সকল অসন্তোষ দূর হইয়া গেল। কন্যার কবিত্বশক্তি বুঝিয়া তিনি আর কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।

মিসেস উইলকক্স বলেন—"একদিন বাবা সহরের বাহিরে গিয়েছিলেন; যখন ফিরলেন তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। বাবা ফিরে এসেই তাড়াতাড়ি একেবারে আমার ঘরে হাজির—আমার তখনও ভাল করে ঘুম ভাঙ্গেনি—তাড়াতাড়ি আমাকে তুলেই তিনি সেই রাত্রে আমার কবিতার পক্ষপাতী একজন পাঠকের কথা আমাকে বল্লেন। তাঁর সঙ্গে এই লোকটির ট্রেণে আলাপ হয়েছিল। মেয়ের সুখ্যাতি শুনে বাবা আমার এমনই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, নিজে ত সারা বাড়ি একবার চোখের পাতা বোজেননি

আর তাকেও ঘুমতে দেননি! লোকটাও এমনি পাগল যে, সে নাকি আবার আমার কবিতার লাইন তুলে তুলে বাবাকে শুনিয়েছে! জীবনে প্রশংসা আমি অনেক পেয়েছি, কিন্তু এর চেয়ে বড় প্রশংসা আমি আর কখনও পাই নি।"

জীবনে নিন্দাও তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে যখন তিনি আপনার স্নেহপূর্ণ পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়া বাহিরের পৃথিবীর সহিত প্রথম পরিচয় লাভ করিলেন, তখন হইতেই লোকে তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া আসিয়াছে। লোকে ক্রমাগতই তাঁহার মনের মধ্যে এই কথা বেশ করিয়া গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে যে, তিনি যাহা-কিছুই লিখুন না কেন, তাহা তাঁহার বহু পূর্ব্বে বলা হইয়া গিয়াছে, তিনি নূতন কিছুই বলিতে পারিবেন না—কেবল চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিবেন মাত্র;—এমন কি যখন তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না, যখন তাঁহার নাম আমেরিকার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তখনও অবধি লোকে তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কবি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে চাহে নাই। বড় বড় সমালোচক পর্য্যন্ত তাঁহার কবিতা কেবলমাত্র পদ্য, এই আখ্যা দান করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তার পর এমন দিন আসিল, যখন এই সকল সমালোচকই আবার বলিতে বাধ্য হইলেন যে, মিসেস উইলকক্সের কবিতা মার্কিণ-সাহিত্যে নবযুগের the world laughs with you" পড়িয়া আমেরিকাবাসী মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নাম দিয়াছিল The poet of everlasting laughter বা চিরহাস্যের কবি। তাঁহার কবিতা পড়িলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যত মন্দই হউক না কেন তাহার মধ্যে যে ভালর অঙ্কুর নিহিত আছেই;—এ-কথা তিনি নিজেও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এবং বারবার উচ্চকণ্ঠে এই সত্যই তিনি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা যেমন সরল, তেমনি কোমল।

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলেন—"আমার মনে হয় বিশ্বস্রষ্টার এই বিরাট সৃষ্টির অংশরূপে আপনাকে মিলাইয়া লইতে পারা, তাঁহার বাণী উচ্চারণ করিবার শক্তি লাভ করা এবং তাঁহার কর্ম্মের কর্ম্মী হইতে পারাই আমাদের জীবনে পূর্ণতা লাভ এবং পরিপূর্ণরূপে সন্তোষলাভ করিতে পারিবার একমাত্র উপায়, ইহাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। জীবন বলিতে আমি কেবলমাত্র এই পার্থিব জীবনটুকু মনে করি না। আমি জীবনের উপাসক, নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, ফুলফলে আমি জীবন দেখিতে ভালবাসি, পার্থিব এই জীবন, লোকান্তরের সেই মহাজীবনের উপক্রমণিকা মাত্র, ইহাই আমার বিশ্বাস, ইহাই আমার বক্তব্য—।"

মিসেস্ উইলকক্স পরমেশ্বরকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তিনি সহমর্ম্মিতা, মঙ্গলানুভূতি ও মানবতা পরিস্ফুট

নানা ধর্ম্ম নানা জাতি
নানা পন্থা নানা গতি
করে খালি গণ্ডগোল
বুঝিবে না হায়,
কণামাত্র দয়া শুধু
ধরা যাহা চায়।

মিসেস উইলকক্সের মতে এই কবিতাটিই তাঁহার সর্ব্বোত্তম রচনা। ইহা যতবার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহার আর কোনও কবিতা ততবার হয় নাই।

সৌন্দর্য্য না থাকিলে জীবন সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় না, তাই তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসনা করেন। তাঁহার বয়স এখন যথেষ্ট হইলেও তাঁহাকে অতি তরুণীর মত দেখায়; সেইজন্য আমেরিকার লোকে তাঁহার নাম দিয়াছে, "চিরযৌবনা।" এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন— "সৌন্দর্য্যই জীবনের চিহ্ন, জীবনের লক্ষণ, যাহাতে জীবন নাই, তাহাতে কোন সৌন্দর্য্যও নাই, প্রকৃতির মধ্যে চাহিয়া দেখিলেই এ-কথা বুঝা যাইবে; কাজেই আমি মনে করি, প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিরই সুন্দর হইবার এবং সৌন্দর্য্যের সাধনা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহাই আমার Philosophy বা দর্শন, আমি ইহা বর্ণে বর্ণে পালন করিবার জন্য সারা জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছি। যে ব্যক্তি সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার সুন্দর হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক। কারণ আমরা সকলেই চিন্তার ফলমাত্র, উপর সেই চিন্তার হুবহু ছাপ পড়িয়া যায়। আমার মতে সৌন্দর্য্যলাভের জন্য তিনটী পথ আছে। প্রথম আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় মানসিক ও তৃতীয় শারীরিক। সর্ব্বদা পূতচরিত্র হইয়া শুদ্ধান্তঃকরণে সকল প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিতে, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে এবং সকল জীবে ভ্রাতৃভাব দেখিতে হইবে। অসৎ সংসর্গ ত্যাগ করিবে, কিন্তু অসৎ লোককে ত্যাগ করিলে চলিবে না; প্রাণ খুলিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার পতনে দুঃখবোধ করিতে হইবে,—ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের সাধন-প্রণালী। দ্বিতীয় প্রণালী মানসিক:—মনকে সর্ব্বদা বিভিন্ন ভাব ও উপভোগ্য বস্তু লাভ করিতে অবসর দেওয়া আবশ্যক। তৃতীয়, শারীরিক সাধনা:— অল্পাহার, গভীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও বিশেষ বিবেচনার সহিত সামর্থ্যানুসারে ব্যায়াম অভ্যাস। ইহাই সৌন্দর্য্যলাভের উপায়।

বিশ্ব-মানবতার গতির সহিত সম্পূর্ণরূপে যোগ রাখিয়া সুন্দরভাবে জীবন যাপন করাই আমার মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য, মানুষের জীবনে কেবল বসন্ত, ফুল ও জ্যোৎস্না নাই, সেখানে মাঝে মাঝে দুঃখ-শোকের অবসাদে প্রাণমন আচ্ছন্ন হইয়া যায় বটে, কিন্তু ভগবান মঙ্গলময়। তিনি দুঃখ দেন একগুণ, আর সুখ দেন তার তিন-গুণ। জীবনে আমি ঢের জ্বালা সহিয়াছি; কিন্তু দুঃখের পর আমি আবার সুখের যে স্বাদ পাইয়াছি, মুখে তাহা বলিয়া

ওজন কাঁটায় কাঁটায় সমান হইবেই-হইবে। যখন বালিকা ছিলাম, তখন অসীম সুখে পিতামাতার আদরিণী হইয়া কালযাপন করিয়াছি; তারপর যখন তাঁহাদের স্নেহনীড় ছাড়িয়া আর একজনের সহিত আমার জীবন-সূত্র গ্রথিত করিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম বুঝি বিশ্বে আমি এবার একেবারেই নিঃসহায় হইয়া পড়িব। কিন্তু আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। আমার জীবন-দেবতার সুন্দর মন, উদার হৃদয়, ও মহাপ্রাণতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার সবল বাহুর সতর্ক প্রহরায় আমি এতদিন যে সুখ, যে নির্ভরতার সহিত কালযাপন করিয়াছি তাহা আমার শৈশবের মায়ের কোল হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।"

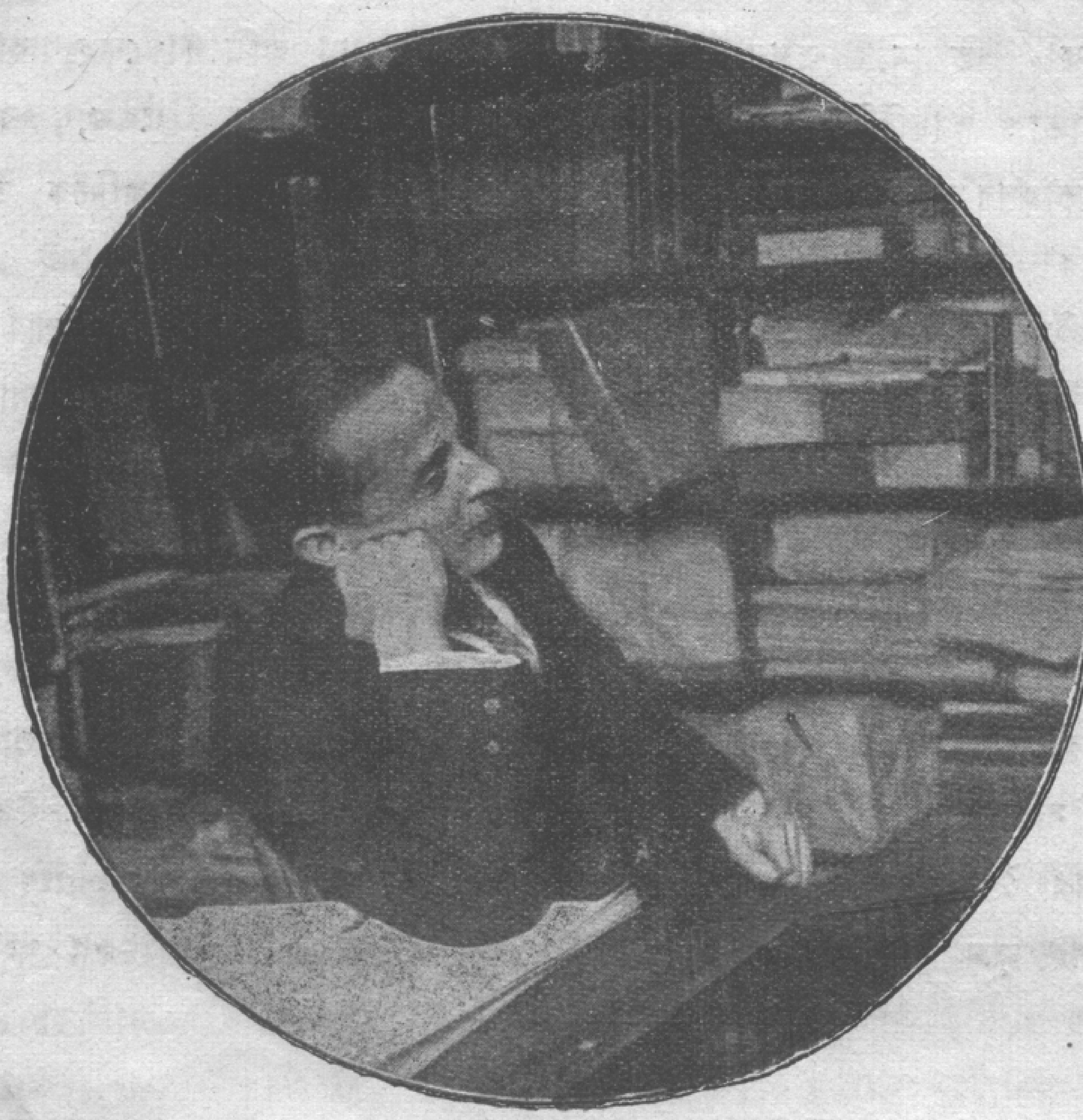
মিসেস উইলকক্স বিশ্বাস করেন যে, কবি হইয়া না জন্মিলে কেহ কবি হইতে পারে না। তিনি বলেন, কবিমাত্রই "Inspired", পরমেশ্বর কবিকে ভাবসম্পদ দান করিয়া থাকেন, তিনিই তাহাকে কাব্য-রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়া থাকেন, সে অনুপ্রেরণা কবি ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লাভ করে এবং চিরজীবন তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না।

মিসেস উইলকক্স গদ্য-রচনাও করিয়াছেন; তবে তাঁহার কাব্যের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। তাঁহার মতে The woman of the world নামক বইখানিই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গদ্য-রচনা।

শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত।

জ্ঞানের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি

বি, ম্যাসন হেডিকার বিলাতের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। মিঃ হেডিকারকে বাস্তবিকই জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিঃ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি যে পরিমাণ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কল্পনা করিলেও, বিস্ময়-বিহ্বল হইতে হয়। অধুনা সাধারণের মধ্যে "জ্ঞানী" আখ্যার যোগ্য হওয়া বড়ই কঠিন; কারণ, জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা আজকাল এতই অধিক, যে তাহার ইয়ত্তা হয় না; মিঃ হেডিকার বিশিষ্টরূপে অপূর্ব্ব প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁহার প্রতিভা যে কেবল মধ্যে আবদ্ধ, তাহা নহে; তিনি অনেকগুলি বিষয়েই তুল্যরূপে পারদর্শী। জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্নিহিত যে-কোনও প্রশ্নের মীমাংসা, তিনি অতি অল্প আয়াসেই করিতে পারেন। দেশ-দেশান্তর হইতে, প্রশ্নমীমাংসার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সুধী-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রত্যহই তিনি নানা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্র পাইয়া থাকেন এবং স্বীয় অদ্ভুত জ্ঞান-প্রভাবে সেগুলির যথাযথ সদুত্তর-দানে প্রত্যেকেরই প্রীতি, আনন্দ ও ভক্তি আকর্ষণ করেন। ইহার জন্য তিনি কোনরূপ মূল্য বা পারিশ্রমিক গ্রহণ



বি, ম্যাসন হেডিকার

আসিয়াই হউক, এ-পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য তাঁহার নিকটে আবেদন করিয়া বিফলকাম হন নাই। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে অষ্ট্রীয়া, ইটালী, ফ্রান্স, রুষিয়া, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য অনেক রাজ্যের বিভিন্ন প্রকারের পারিভাষিক তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

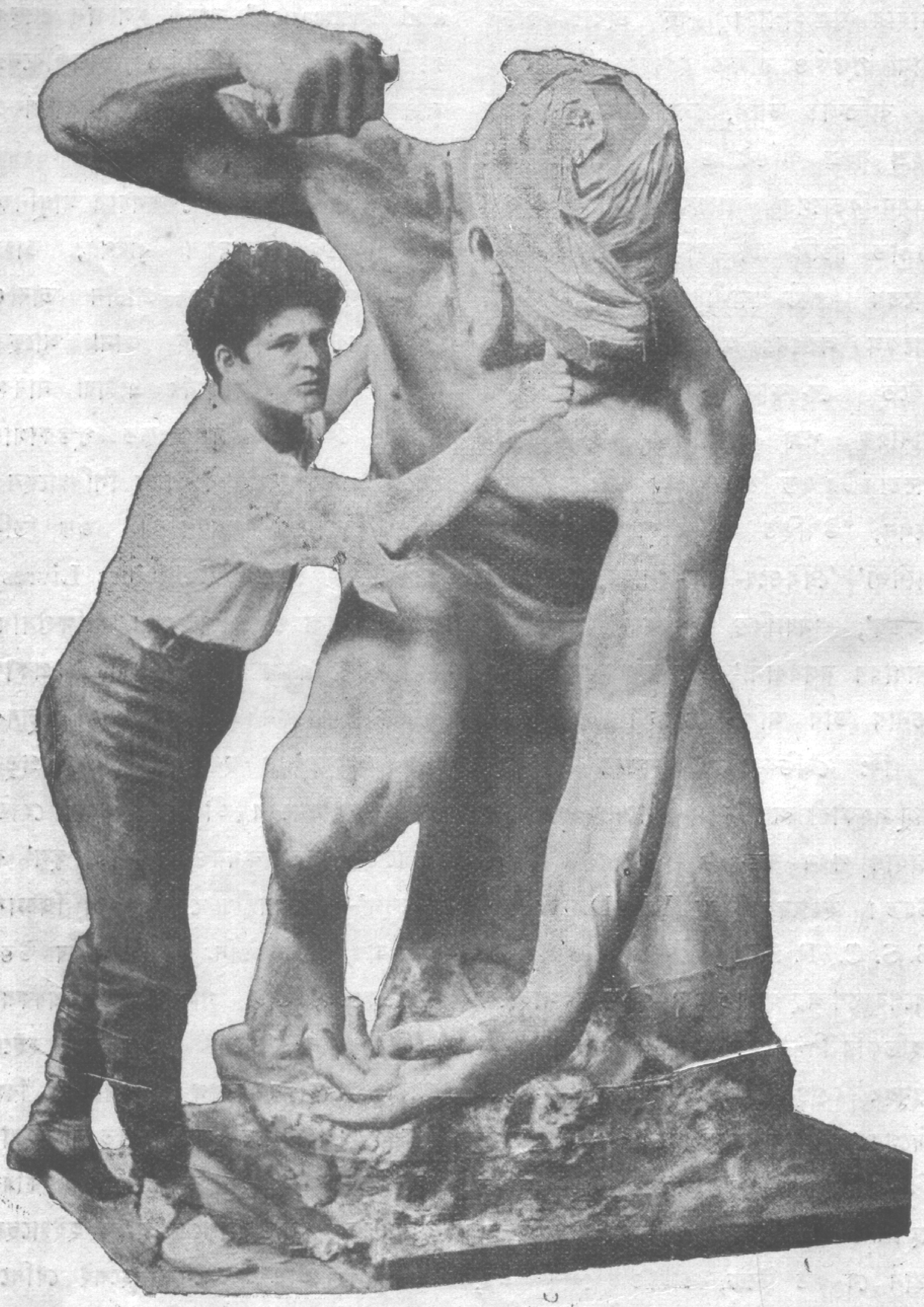
মিঃ বি, ম্যাসন হেডিকার লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতি বিজ্ঞান-বিভাগের লিনীয়ান্-সমাজের একজন সভ্য। অর্থশাস্ত্রে ও রাজনীতি-বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহুব্যক্তি তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মত অনেক সময়ে মন্ত্রীসভার শাসন-প্রণালী ও 'পার্লামেণ্টে'র আইন-গঠনোদ্দেশ্যে বিশেষরূপে সহায়তা করে। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তকাগারের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক পুস্তকাবলী তাঁহার রীতিমত অধীত। তাঁহার নিজেরও একটী পুস্তকাগার আছে। এই পুস্তকাগারে বিবিধ বিষয়ের অসংখ্য পুস্তক ও চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকাগারের উপস্থিত পুস্তক-সংখ্যা ২৫০,০০০। হেডিকার এই সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে ১,০০০ করিয়া নূতন পুস্তক ক্রয় করিতেছেন। অর্থ-শাস্ত্র-বিষয়ক যে সকল অমূল্য গ্রন্থ পৃথিবীর অন্য কোনও পুস্তকাগারে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার পুস্তকাগারে তাহা অনায়াস-

লভ্য। তিনি নিজে বহুভাষাবিদ্, সুতরাং তাঁহার পুস্তকাগারে বহু ভাষায় রচিত নানা পুস্তকও রক্ষিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগত ভাবে, পত্রদ্বারা বা তারযোগে সহস্র সহস্র ব্যক্তির ও বহু সম্প্রদায় এবং শাসন-বিভাগের প্রশ্নের সমাধান করা ব্যতীত তিনি তালিকাভুক্ত প্রায় দ্বিসহস্র ছাত্রের পাঠ-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। লণ্ডনের অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণের ভিতর হইতে যে-কোন প্রবন্ধ, পুস্তক বা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার প্রত্যেকটির জন্য তিনি দায়ী। মিঃ হেডিকার বলেন, "উপস্থিত আমার হাতে 'সময়োচিত বাণিজ্য' 'রেলওয়ে-নিয়ম-প্রণালী,' 'ঐশ্বর্য্যের মূলতত্ত্ব', 'মধ্যবিত্ত অর্থশাস্ত্র', 'যুদ্ধ' ও 'সাধারণ নগরবাসী' প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক-রচনার ভার অর্পিত আছে।

মিঃ হেডিকারের জনকয়েক প্রতিভা-বান্ সহকারী আছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার পরম ভক্ত ও তাঁহারই শিক্ষায় উন্নত। ইঁহাদের মধ্যে W. D. Webb, B. S. C., F. S. S., হেডিকারের শক্তিতে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত এবং এই সঙ্গীর সাহায্যে হেডিকার বিগত কয়েক মাসের মধ্যে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়াছেন। পাঠক-দিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় ভুবন-বিখ্যাত অমূল্য গ্রন্থ "Britannica"র সহিত সুপরিচিত এবং জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে উহার স্থান যে কত উচ্চে, তাহাও বোধ হয়, তাঁহারা সকলে উত্তমরূপে অবগত আছেন। হেডিকারের আনুকূল্যে ওয়েব-রচিত এই অংশেই ন্যূন নহে। "Unemployment and Insurance" নামক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা Mr I. G, Gibbon, ছাত্রজীবনের অধিকাংশ পাঠই হেডিকারের পরামর্শমত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মিঃ হেডিকার যে কেবলমাত্র আধুনিক ভাষাগুলিতেই বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন, তাহা নহে; অধিকন্তু বিবিধ প্রাচীন ভাষাও তাঁহার বেশ ভালরকমই জানা আছে। সংপ্রতি তিনি ভারতবর্ষের এটোয়া নামক স্থানের কোন একটী সংস্কৃত পুস্তকাগার সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির অবগতির জন্য তিনি প্রতিমাসেই "Les Meilleiurs Livres" নামে শ্রমসাধ্য ও বহু পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার-সম্বলিত একখানি তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বহু উপাধি-ভূষিত এবং 'কলেজ' ও সুধী-সমাজ-প্রদত্ত প্রভূত পদকপ্রাপ্ত, জ্ঞানের জীবন্ত মূর্ত্তি মিঃ হেডি-কারকে যদি কখনও, তাঁহার 'স্কুল' বা 'কলেজ'-জীবন-সম্বন্ধীয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তিনি তাহার যে উত্তর দান করেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তিনি বলেন, "বারো বৎসর বয়স হইতে আমি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছি।" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি ভূষণে ভূষিত না হইয়াও যে অনেকে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ কথা ইতিহাসের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু হেডিকারের ন্যায় এত অল্প বয়সে বিদ্যালয় হইতে



ভাস্কর জর্জ গ্রে বার্ণার্ড

সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, ইহা কল্পনা করাও কঠিন।

অল্পদিন হইল, তিনি অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রীসভা, ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় ও জনকয়েক প্রখ্যাতনামা 'পার্লামেণ্টে'র সভ্য এবং সেণ্ট ম্যাণ্ডুর নামক জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, "কি প্রকারে জার্ম্মানী, ফ্রান্সের নিকট হইতে প্রাপ্ত যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণের অর্থ ব্যয় করিয়াছিল," তাহার বিস্তৃত ও নির্ভুল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

হেডিকারের মানচিত্র-রচনা-শক্তিও অদ্ভুত। তিনি বলেন, "দেশের বিংশতিখানি মানচিত্রের মধ্যে উনবিংশখানি একেবারেই ভুল।" সম্প্রতি তাঁহার সম্পাদকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কয়েকখানি ভারতবর্ষ, মধ্য-য়ুরোপ ও ট্রান্স-সাইবিরিয়ার বিশেষ মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

মিঃ হেডিকারের বর্ত্তমান বয়স ৩৭ বৎসর মাত্র হইলেও, তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যেই এরূপ একটী পুস্তকাগার গঠন করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির, সকল প্রকার প্রশ্নের অভ্রান্ত উত্তর প্রদান করিতে পারে।

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ মিত্র।

মানবতার উপাসক

জর্জ গ্রে বার্ণার্ডকে লক্ষ্য করিয়া এক-জন ফরাসী কলাবিদ্ বলিয়াছেন, "শিল্পরাজ্যে তিনিই একমাত্র লোক, যাঁহার সম্বন্ধে বিশেষরূপে কিছু চিন্তা করা যাইতে পারে।" বার্ণাড নিজের সম্বন্ধে বলেন, "আমি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা।" সত্য কথা। যে-সকল শক্তিধর পৃথিবীকে বিচলিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বপ্ন দেখিয়াছেন; এবং যাঁহাদের স্বপ্ন সত্য হইয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রতিভাবান।

বার্ণার্ড যে কি-রকম উঁচুদরের শিল্পী, সে-কথা বুঝাইতে বসা বিড়ম্বনা। পারি-নগরীর "গ্র্যাণ্ড প্যালেসে" যাঁহারা তাঁহার হাতে-গড়া মূর্ত্তিগুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা কেহই বার্ণার্ডের অসাধারণ শক্তিসম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না।

বার্ণাড বয়সে প্রৌঢ়, আকারে মাঝারি। তিনি সামাজিকতার কোন ধার ধারেন না; কারণ সমাজে গিয়া মেলা-মেশার সুযোগ তাঁহার নাই। তিনি কথা কন তাড়াতাড়ি; সাজগোজের জাঁকজমক তিনি মোটেই ভালবাসেন না। আমেরিকার "বেলেফোণ্টি" নামক স্থানে তাঁহার জন্ম।

তিনি খুব গোঁড়া ধার্ম্মিক নন। তিনি পশুপক্ষী ভালবাসেন, নদীর জলে লীলা-চপল মাছগুলি ভালবাসেন, বাতাসে-উড়ন্ত পতঙ্গদলকে ভালবাসেন। স্কুল, পড়ার বই ও মাষ্টার-পণ্ডিত চিরকালটাই তাঁহার চোখের বালি। একমাত্র প্রকৃতিকে তিনি আপনার শিক্ষয়িত্রীর আসনে বরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বজীবনে তিনি বছরে একবার করিয়া

সহরের জনতা ছাড়িয়া মিসিসিপির গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে পলায়ন করিতেন। সেখানে গেলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত—শান্তি, আনন্দ, নীরবতা ও দৈব-প্রেরণার মধ্যে তিনি দিনের পর দিন ও রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া নদীর ধারে বসিয়া থাকিতেন এবং পাখী, বীবর, ইঁদুর ও খরগোশদের অপূর্ব্ব স্বাধীন জীবনকে প্রাণ-মন দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। জীবজন্তুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হইলেও, তাহাদের শরীর-তত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মাঝে মাঝে পশু-পক্ষী বধ করিতে হইত। তখন সৌন্দর্য্যের চেয়ে সত্যের প্রতি তাঁর বেশী ঝোক ছিল; এখন দুয়েরই প্রতি তাঁহার সমান টান। সে-সময়ে শিল্পশাস্ত্রে কোন অভিজ্ঞতা বা শিল্পী হইবার কোন বাসনা তাঁহার ছিল না। কিন্তু আঁকিবার কোন নিয়ম না জানিয়াও যে-সব পশু-পক্ষী তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহাদের ছবি তিনি আপনা হইতে বেশ ভালরূপই আঁকিতে পারিতেন।

এই-সব ছবি দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক 'এন্‌গ্রেভারের' কাছে কাজ শিখিতে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে দুই বছর ধরিয়া তিনি একেবারে নিজের মনের মত করিয়া আঁকিতে শিখিলেন। কোন সামান্য ব্যাপারেও তিনি এমন উচ্চশ্রেণীর কলা-পটুতার পরিচয় দিতেন যে, তাঁহার ওস্তাদও তাঁহাকে তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না!



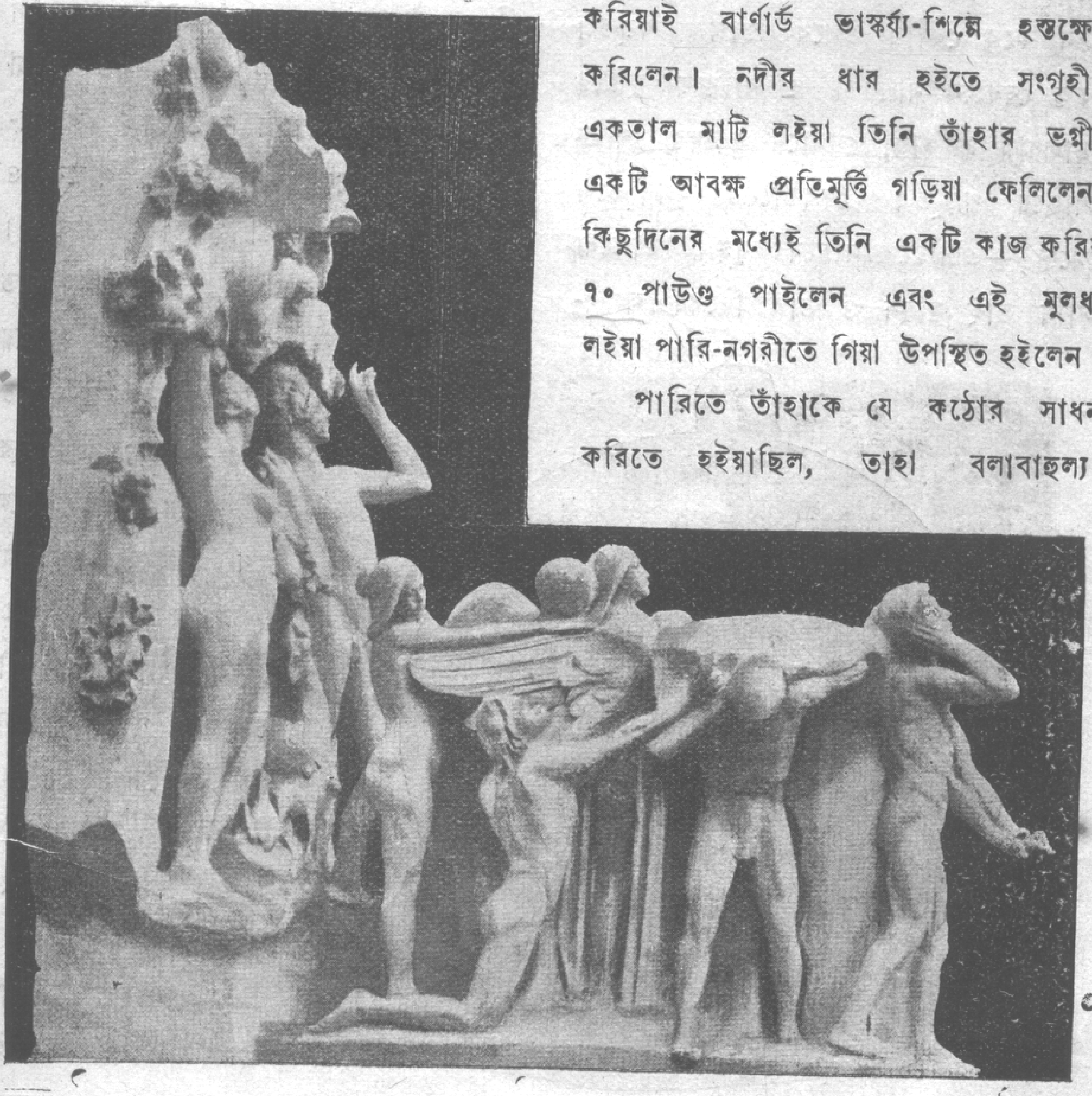
কর্ম্ম ও ভ্রাতৃত্ব

তাঁহার হাতে যখন কিছু-কম আড়াই শো টাকা জমিল, তখন তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য শিল্পকে অবলম্বন করিলেন। ঐ সামান্য টাকার উপর নির্ভর করিয়া তিনি অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে কায়ক্লেশে একটি বৎসর কাটাইয়া দিলেন। এমনি কঠোর জীবন-সংগ্রামের পর তিনি "শিকাগো-আর্ট-ইন্‌ষ্টিটিউটে" রক্ষিত কয়েকটি 'প্ল্যাষ্টারে'র ছাঁচ, আদর্শরূপে ব্যবহার করিবার হুকুম পাইলেন। গ্রীক আর্টের সঙ্গে এই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পরিচয়।

বার্ণার্ড বলেন, "স্কুলের কয়েকটা বদ্‌ছেলে ছাঁচগুলির প্রতি কু-ব্যবহার করেছিল, কর্ত্তারা তাই প্রথমটা কিছুতেই আমাকে ছাঁচগুলি ব্যবহার করতে দিতে চাননি। আমি কিন্তু জোর করে তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম যে, ঐ ছাঁচগুলি ব্যবহার করবার একমাত্র যোগ্যপাত্র আমিই। শেষটা অবশ্য আমি অনুমতি পেলাম; এবং ছাঁচগুলির ভিতর গ্রহণযোগ্য যা-কিছু ছিল, অবিলম্বেই তা একেবারে আয়ত্ত করে ফেল্‌লাম।"

অতঃপর, কোনরূপ শিক্ষালাভ না করিয়াই বার্ণার্ড ভাস্কর্য্য-শিল্পে হস্তক্ষেপ করিলেন। নদীর ধার হইতে সংগৃহীত একতাল মাটি লইয়া তিনি তাঁহার ভগ্নীর একটি আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি কাজ করিয়া ৭০ পাউণ্ড পাইলেন এবং এই মূলধন লইয়া পারি-নগরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পারিতে তাঁহাকে যে কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল, তাহা বলাবাহুল্য।

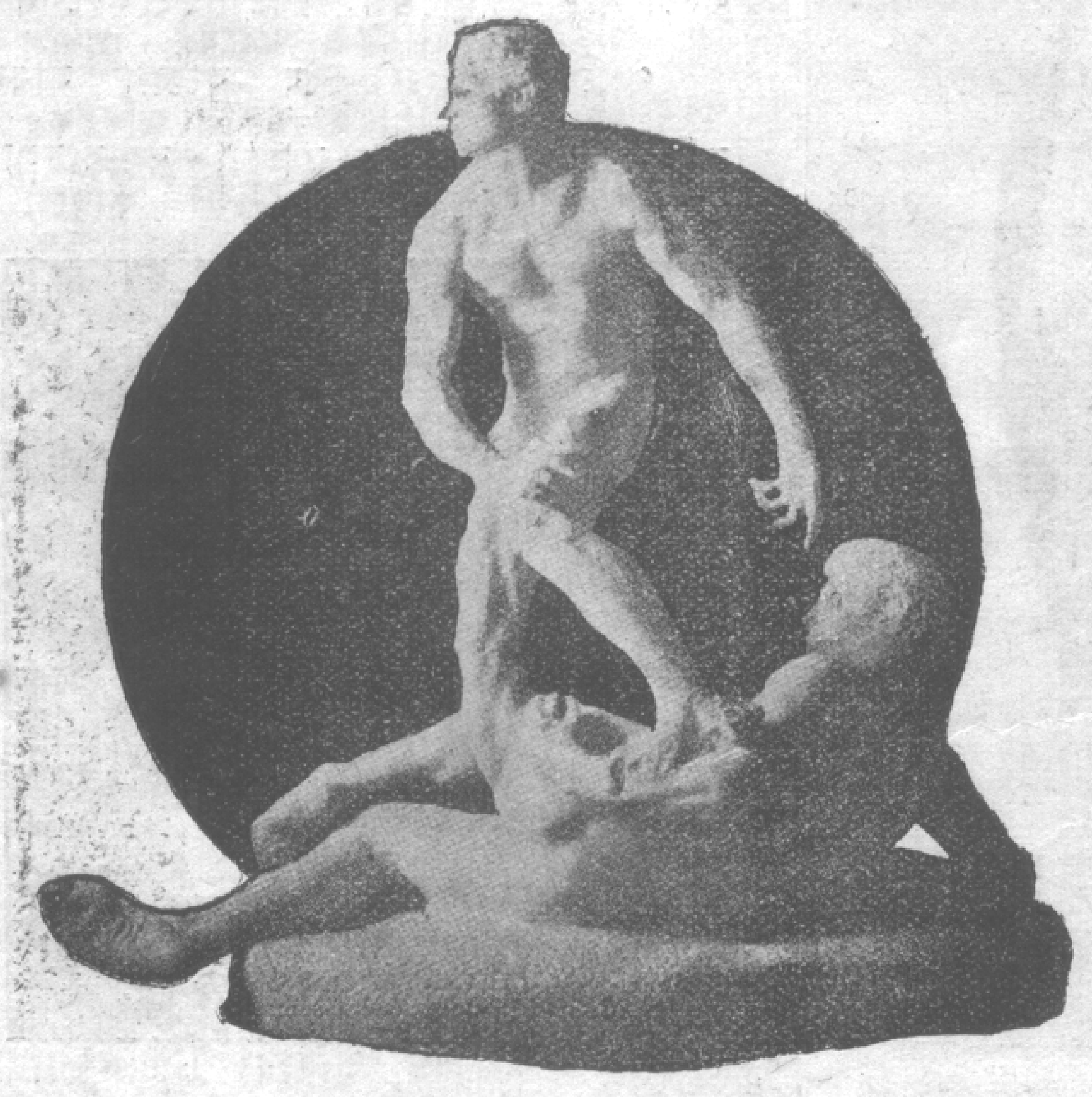


জীবনের বোঝা

প্রতিদিন নানা শিল্পশালায় গমন করিয়া তিনি নূতন নূতন শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। গ্রীক আর্টের অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়া ললিতকলার গূঢ় কথাটি তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কেবল গ্রীক আর্ট লইয়াই বার্ণাড তুষ্ট রহিলেন না—কারণ তিনি এই উন্নত বিজ্ঞানের যুগে জন্মিয়া আধুনিকতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি দেখ্‌লাম, গ্রীক আর্টের আদর্শ, দেবতা-গড়া। গ্রীকেরা সুন্দর আকার, সুন্দর প্রতিরূপ গঠন করে বেদীর উপরে স্থাপন করত। কিন্তু যেখানে মানবতা ও ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলবার দরকার, সেখানে তাদের শক্তি পিছিয়ে পড়্‌ত। দেবতাদের যুগ চলে গেছে;—এটা হচ্ছে মানুষের যুগ। ভাস্কর্য্যে আমি তাই মানুষ ও তার বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই। লোকে বলে, 'মূর্ত্তি গড়ে লাভ কি? যা কর্‌বার তা হয়ে গেছে,'—আমি উত্তর দি, 'না। ভাস্কর্য্যে আমরা এই সবে হস্তার্পণ করেছি মাত্র—পাথরে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্যে সমগ্র মানবতা এখনো পড়ে আছে'।"

বার্ণার্ডের শিল্পে এই মানবতাই হইতেছে গোড়ার কথা ও আসল বিশেষত্ব। এইটুকু বুঝিলেই বার্ণার্ডের গড়া মূর্ত্তিগুলির সৌন্দর্য্য ও রহস্য সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

Salonএ তাঁহার গঠিত যে-সকল মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে, সেগুলি দেখিতে গেলে দর্শককেও যেন চিত্রার্পিতের মত হইয়া যাইতে হয়। মূর্ত্তিগুলি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব-বিচিত্র। তাহাদের মধ্য হইতে শক্তি ও কাব্য যেন মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। অতীতের মাপকাটিতে তাহাদিগকে মাপিতে গেলে তাহারা অপ্রিয় সমালোচনার বস্তু হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমানের কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাহারা সুন্দর ও ভাবাভিরাম।



যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন

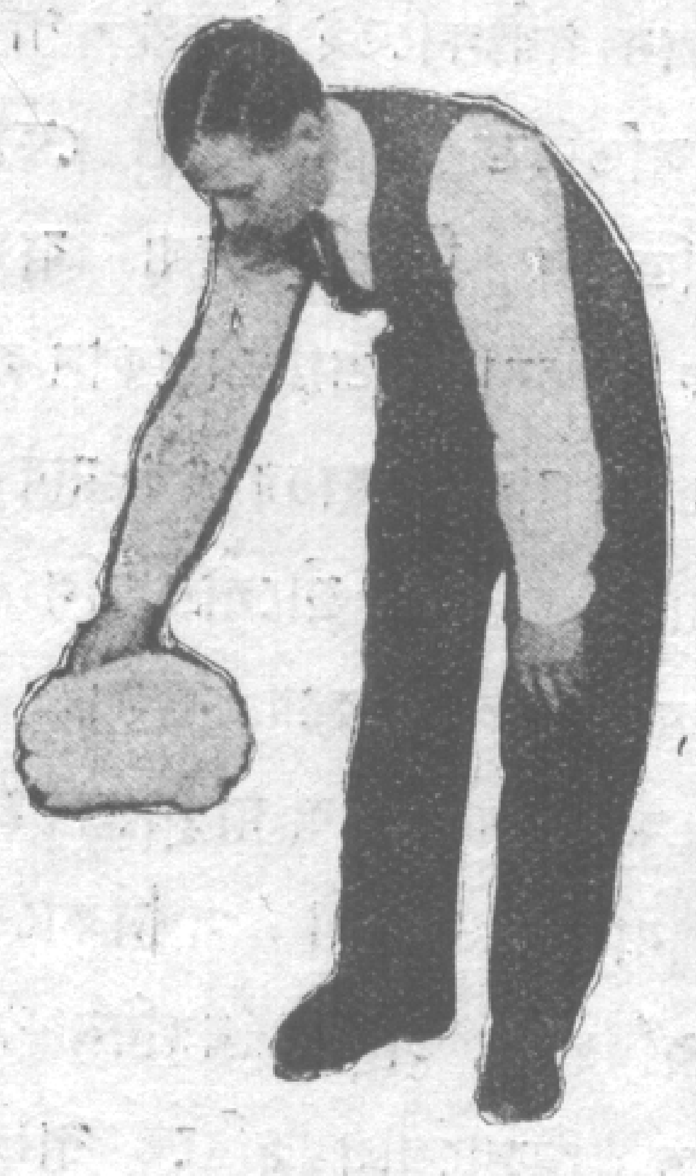
সুবিখ্যাত ফরাসী-চিত্রকর পল লরেন্স, বার্ণার্ডকে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন, উপসংহারে আমরা তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম:—

"আপনারা কাজ আমাকে আনন্দদান করে। আপনি আপনার বিজ্ঞান

ও কলাকে করায়ত্ত করিয়াছেন; না—আপনি তার চেয়েও বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছেন,—প্রকৃতির সামনে মুখোমুখী হইয়া আপনি দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। আমরা—ফরাসী শিল্পীরা—প্রচলিত রীতি-নীতি ও বাঁধা আইন-কানুনের অধীন; আপনি যেমন সমস্তই নিজের মত করিয়া লইয়া দেখিতে পারিয়াছেন, আমাদের মধ্যে একজনও তেমনটি পারেন না। আপনি শুধু নিজের চোখে দেখিয়াই থামিয়া যান নাই; পরন্তু, দৃষ্ট বস্তুটিকে আকারও প্রদান করিয়াছেন।”

বিনা যাতনায় মাতৃত্ব

বর্ত্তমান য়ুরোপ-ব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে সমগ্র ফরাসীজাতি এক সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। সংবাদটি এই:—বিখ্যাত রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ জর্জ্জেস পলিন বহুবৎসর



জর্জ্জেস পলিন

গবেষণার পর এক অপূর্ব্ব ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধগুণে ভবিষ্যতে রমণীগণকে আর প্রসব-যাতনায় কাতর হইতে হইবে না!

সন্তান-সম্ভাবনার সময় রমণীকে বেদনা-নাশক ঔষধ-সেবন করানো, কিছু একটা নূতন কথা নহে;—কিন্তু আসন্নপ্রসবা রমণীকে আফিমের সার বা অন্য কোনরূপ ব্যথাহারী ঔষধ সেবন করাইলে যথেষ্ট বিপদ-ভয় আছে। এমন-কি, সময়ে সময়ে তাহাতে ব্যথা না কমিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। শ্রীযুত পলিনের আবিষ্কৃত ঔষধের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে কোন অনিষ্টকর পদার্থ নাই এবং তাহা সেবন করিলে স্বাভাবিক প্রসবে কোনরূপ বাধা হয় না। শ্রীযুত পলিনের বহুদিনব্যাপী পরীক্ষার পর আফিমের সার হইতে বিষাক্ত অংশ প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আজ কিছু-বেশী দুই বৎসর পূর্ব্বে এই ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারের পরে শ্রীযুত পলিন ও তাঁহার সহকারী ডাক্তার পিয়ের লরেণ্ট কুকুর, বিড়াল ও খরগোশ প্রভৃতি জন্তুদের উপরে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চূড়ান্ত মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন। এক বৎসর পরীক্ষার পর তাঁহারা Beanjon Hospital-এর বিখ্যাত ডাক্তার Ribemont-

Dessaigne-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই নবাবিষ্কৃত ঔষধের কথা গোপনে খুলিয়া বলিলেন।



ডাঃ রিবেমণ্ট

ডাক্তার Dessaigne যখন বুঝিলেন, এই প্রায়-বিষহীন আফিমের সার ক্লোর‍্যাল ও ক্লোরোফর্ম্ম প্রভৃতি তথাকথিত বেদনানাশক ঔষধের মত প্রসূতি বা গর্ভস্থ সন্তানের কোন অনিষ্টসাধন করে না, তখন তিনি বিনা-বাক্যব্যয়ে এক গর্ভবতী রমণীর উপর ঔষধটি প্রয়োগ করিলেন। বলাবাহুল্য তাঁহার পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে সফল হইল।

প্রথম পরীক্ষার পর সর্ব্বসমেত একশত বারোজন রমণী এই অপূর্ব্ব ঔষধের গুণে বিনা যন্ত্রণায় মাতৃত্বের সম্মানলাভ করিয়াছেন।

এই নূতন ঔষধ সম্পূর্ণরূপে বিষহীন নয় বটে, কিন্তু ইহা ব্যথা নাশ করে। ইহা সেবন করিলে প্রসব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না এবং গর্ভস্থ সন্তানেরও সামান্যমাত্র অনিষ্ট-ভয় থাকে না। প্রসবকালে গর্ভিণী সজ্ঞান থাকিবেন—কেবল মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইবে, তিনি যেন কি-এক সুখের স্বপ্নলোকে বাস করিতেছেন! তাঁহাকে ডাকিলে তিনি চোখ তুলিয়া চাহিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে দেখা যাইবে বিস্ময়, আনন্দ ও মাতৃপ্রেম! তাঁহার কণ্ঠ দিয়া আর্ত্তনাদের একটি ধ্বনিও বাহির হইবে না—পরন্তু, প্রসবকালে তাঁহার প্রসন্ন মুখ উজ্জ্বল হাস্যে উদ্ভাসিত থাকিবে!

পূর্ব্ব-উক্ত একশত বারোজন রমণীর ভিতর তিন জন যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন—কিন্তু, তথাপি সামান্য যন্ত্রণা-ভোগও করেন নাই! ডাক্তার Ribemont-Dessaigne বলিতেছেন:—

"কোন পরীক্ষাতেই কুফল পাওয়া যায় নাই; অতিরিক্ত উদ্যমের বা কোনপ্রকার কু-প্রতিক্রিয়ার চিহ্নও দেখা যায় নাই। মানসিক যাতনা বা শ্রান্তির কোন লক্ষণও—প্রসবের পর যাহা সচরাচর দেখা যায়—প্রকাশ পায় নাই। এই স্ত্রীলোকগুলি কিছুমাত্র শারীরিক কষ্টভোগ করে নাই। একজনের দেহেও আমি অবসাদ বা স্নায়ুসংক্রান্ত উত্তেজনা দেখি নাই। যাহারা সন্ধ্যাকালে সন্তান প্রসব করিয়াছে, তাহারা পরদিন পর্য্যন্ত পরম শান্তিতে নিদ্রাভোগ করিতে পারিয়াছে।"

ফরাসী-বিজ্ঞান-সভা প্রকাশ্যভাবে নিম্ন-লিখিত মত জ্ঞাপন করিয়াছেন:

১। আজকাল একটুও বিপদ-ভয় না করিয়া প্রত্যেক জননীর পক্ষে বিনা যন্ত্রণায় সন্তান প্রসব করা সম্ভব।

২। এই চিকিৎসায় সন্তান-প্রসবে কোন বাধা বা বিলম্ব হয় না ; পরন্তু অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, এই ঔষধ-সেবনে শীঘ্র সুপ্রসব হইয়াছে।

৩। জন্মকালে প্রতি তিনটি সন্তানের মধ্যে গড়ে একটি করিয়া নীরব থাকে—এই নীরবতা বাস্তবিকপক্ষে সুবিধাকর।

৪। এই ঔষধে প্রসবান্তেও বেদনাবোধ হয় না।

৫। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যে, অতঃপর রমণীরা বিনা যাতনায় মাতৃত্ব লাভ করিবেন।

ফ্রান্স ও রুষিয়ার বাণী

একজন সুবিখ্যাত আমেরিকান লেখক বলিতেছেন :—"পৃথিবীকে সহজ জ্ঞান, রুচি ও বিচারবুদ্ধি শিক্ষা দিয়াছেন—ফরাসী জাতি। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা এবং গদ্য রচনা-ভঙ্গীতে ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

ইংরাজ গদ্য লিখিতে শিখিয়াছে ফরাসীদের কাছ হইতে। চতুর্দ্দশ লুইয়ের রাজত্ব-কালে ইংরাজী সাহিত্য যখন ফরাসী-প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অবশ্য ইংরাজেরা তখন গদ্যেই কথা কহিতেন ও রচনা করিতেন ; কিন্তু সে গদ্যের ভঙ্গীটি ঠিক এখনকার মত স্বচ্ছন্দ ও সুষ্ঠু ছিল না। ফরাসী লেখকেরাই ইংরাজদিগকে গদ্য লিখিবার সুসঙ্গত ভঙ্গী দেখাইয়া দিয়াছিলেন ; এবং এই ভঙ্গী ইংরাজদের এতটা মুগ্ধ করিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের কবিরা পর্য্যন্ত তাহার প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাই ড্রাইডেন ও পোপের পদ্যছন্দেও ফরাসী গদ্যের গন্ধ পাওয়া যায়!

ফরাসীরা দুটি বিষয়ে তাহাদের দুই নিকট-প্রতিবেশীর কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য। কাব্যে ইংরাজ ও সঙ্গীতে জার্ম্মাণ জাতি ফরাসীদের অপেক্ষা সমুন্নত।

জাগতিক সভ্যতার যাহা-কিছু মহৎ, তাহার অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র হইতেছে, ফ্রান্স। সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে যদি কোন সভ্যজাতির বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন হয়, তবে সে ফরাসী জাতির। মধ্যযুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর চিন্তা-রাজ্যে ফরাসীরা অটলভাবে প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। এ-যুগের ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রান্সের উপন্যাসগুলি পাঠ কর। পৃথিবীর মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন বটে, কিন্তু এমন কোন ইংরাজ, জার্ম্মাণ বা রুশ ঔপন্যাসিক দেখাইতে পার কি, যাঁহার উপন্যাস ভবিষ্য সভ্যতার দিকে হৃদয়কে এতটা অগ্রসর করিয়া দিতে পারে ? হেন্‌রি ডি বোর্ণিয়ার যে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ :—

"প্রতি মানুষের দুইটি দেশ আছে—তাহার জন্মভূমি এবং ফ্রান্স!"

কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকাকে ফ্রান্স সর্ব্বপ্রধান কি শিক্ষা দান করিয়াছে ? রাষ্ট্রবিপ্লবের মহা শিক্ষা।

দুইটি বিষয়ে ফরাসীরাষ্ট্র-বিপ্লব দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে—গিলোটিন এবং নেপোলিয়ন!

কিন্তু, ফল কি হইল, দেখ।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবরে প্রুশিয়ার রাজা হুকুমজারি করিলেন,

"আমাদের রাজ্যে সকলকার দাসত্ব ঘুচিয়া গেল;—এখানে কেবল স্বাধীন ব্যক্তিরা থাকিবেন।"

কেন? প্রুশিয়া ফরাসীদের পদদলিত হইয়াছিল বলিয়া। নেপোলিয়নের শাসন-কালে ফরাসী কৃষক-সমাজ স্বাধীন ছিল। নেপোলিয়নের পূর্ব্বে সাধারণ-তন্ত্রের সময়েও কৃষকেরা স্বাধীন ছিল, কিন্তু পুরাতন রাজবংশের শাসন-সময়ে তাহাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। এই স্বাধীনতা রাষ্ট্রবিপ্লবের মহাপ্রসাদ। স্বাধীন কৃষকেরা সানন্দে তেজের সহিত চাষ-বাস করিত—তাহাদের ভাণ্ডার ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। বিদ্রোহের মানসপুত্র নেপোলিয়ন এই স্বাধীনতার অগ্রদূত।

প্রুশিয়ার রাজ্ঞী লিখিয়াছিলেন:—

"নেপোলিয়নের কাছ হইতে আমরা অনেক বিষয় শিখিতে পারি। 'ভগবান তাঁহার সঙ্গে থাকুন'—এ কথা বলিলে ঈশ্বর-নিন্দা করা হইবে; কিন্তু এ কথা ঠিক যে সর্ব্ব-শক্তিমানের হস্তে তিনি চালিত যন্ত্রের মত,—এ যন্ত্র প্রাচীন ও জীবনহীন যাহা-কিছু স্পর্শ করিত, তাহা ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিত।"

য়ুরোপের অধিকাংশ স্থল হইতে নেপোলিয়ন যে শুধুই দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু বিপ্লবের আর এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন,—কি ব্যক্তিগত আর কি ব্যবসায়-গতভাবে আইনের সম্মুখে সকল লোকের সমান অধিকার।

নেপোলিয়ন যে-ভাবে এই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, প্রুশিয়ার রাজাও ঠিক সেইভাবেই রাজত্ব হইতে দাসত্বকে বিদায় দিলেন। ফলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও কৃষকের মধ্যে আর কোন পার্থক্য রহিল না। ইচ্ছা হইলে কৃষকেরাও সম্ভ্রান্ত হইতে পারিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও সাধারণ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিত।

ফরাসী বিপ্লবের মহাদান,—এই সাম্য-নীতি।

চিন্তারাজ্যে রুশিয়া এখনও অপরের নিকট ঋণগ্রস্ত। তাহার ছাত্রত্ব অত্যন্ত অধিক—তাহার শিক্ষকত্ব অতি সামান্য। বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প বা শাসনতন্ত্রে, সভ্যতার ক্ষেত্রে রুষিয়ার দান খুব অল্প—কিন্তু ললিত কলায় সে একটি স্থায়ী আসন দখল করিয়াছে। সঙ্গীত-রচনায় Tschaikowsky, চিত্রাঙ্কনে Verestchagin, নৃত্যে Mordkin বা Pavlowa-কে আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। কিন্তু ইহারা সকলেই স্ব স্ব বিভাগে সমগ্রের মধ্য দিয়া আপনার ব্যক্তিত্বই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

রুষিয়ার সকল শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মধ্যেও বিশেষ করিয়া যেন এই গুণটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া রুষ ঔপন্যাসিক আপনার উদ্দেশ্যই প্রকাশ করেন। পৃথিবীর উপর **আমার** প্রতি-ক্রিয়া——**আমার**!

টলষ্টয়ের নভেলগুলি হইতে পরিণামে আত্মপ্রকাশ করেন **টলষ্টয়**! তিনি একজন অপূর্ব্ব কলাবিদ নন,—কিন্তু তিনি স্বয়ং একটি অপূর্ব্ব কলা-বস্তু!

এই ঔপন্যাসিকদের সাহায্যে রুষিয়া পৃথিবীর উপর এক অসীম প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ইংলণ্ড ও অন্যান্য সকল দেশের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রুষিয়ার কথা-সাহিত্যের মহিমায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রুষিয়ার ঔপন্যাসিকগণই জাগতিক সাহিত্যে সমধিক প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

পাগল ভাষাতত্ত্ববিদের কথা

সার জেম্‌স্ ম্যারের নাম বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং এক খ্যাতনামা অভি. ধানের সম্পাদক। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সময় ইনি অদম্য উৎসাহে তাঁহার নূতন অভিধানের জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ম্যরে তাঁহার অভিধান-গ্রন্থের জন্য বহু লোকের সাহায্য পাইতেছিলেন। তিনি এক-একটি শব্দ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাঠকদের নিকট প্রেরণ করিতেন এবং তাঁহারা সেই সকল শব্দের নানা প্রকার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইতেন।

ম্যরে তাঁহার অভিধানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার মাইনর এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হেডেন চার্চ্চ মহাশয় উক্ত ডাক্তারের সম্বন্ধে এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

সার জেম্‌সের সঙ্গে মাইনরের পত্র দ্বারাই আলাপের সূত্রপাত হয়। ডাক্তার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ইংরাজী শব্দ সম্বন্ধে গবেষণা-পূর্ণ নিবন্ধ পাঠান। ম্যরে তাহা পড়িয়া দেখিলেন, ডাক্তার অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তি এবং ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানও অপরিসীম। সার জেম্‌স্ তাঁহার এই অজ্ঞাত সাহায্য-কারীর প্রকৃষ্ট পরিচয় জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তবে উভয়ের মধ্যে পত্র লেখালেখি পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিল। মাইনরের চিন্তাশীল টিপ্পনী ও শ্রমলব্ধ অনুশীলন ক্রমেই সার জেম্‌স্‌কে মুগ্ধ করিতে লাগিল।

ম্যরে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি মাইনরের কথা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতব্বর লোক-দিগকে জানাইলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তখন মাইনরকে কয়েকদিন অক্সফোর্ডে থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। উত্তরে মাইনর লিখিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার উপর এতাদৃশ দয়া প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অক্ষম।

ম্যরে ভাবিলেন, মাইনরের আর্থিক অবস্থা বোধ হয় ভাল নয়, সেই জন্য

তিনি অক্সফোর্ড পর্য্যন্ত আসিবার ব্যয়-সংকুলানে অপারগ। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, আর্থিক অসচ্ছলতাই যদি মাইনরের না আসিবার কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভাবনার প্রয়োজন নাই; বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিবে। তদুত্তরে মাইনর লিখিলেন, আর্থিক অবস্থাই তাঁহার না-যাওয়ার কারণ নয়, কারণ, তাঁহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য। তাহার চেয়ে ম্যরে যদি দুই দিনের জন্য তাঁহার অতিথি হন তবে তিনি বিশেষ আপ্যায়িত হইবেন।

ম্যরে ডাক্তারের সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিঠি পাইয়া তিনি ভাবিলেন, মন্দ কি! একবার না-হয় দেখিয়া আসাই যাক্ না! মাইনরকে তিনি লিখিয়া দিলেন, তিনি যাইতে প্রস্তুত।

মাইনরের বাড়ী ক্রোথর্নে। ম্যরে আসিয়া অক্সফোর্ড হইতে ওয়েলিংটন কলেজ ষ্টেশনে নামিলেন। ষ্টেশনে তাঁহার জন্য মাইনর-প্রেরিত ভৃত্য ও একখানি জুড়ি-গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। ভৃত্যের মুখে মাইনর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে কোন কারণবশতঃ তিনি ষ্টেশনে সার জেম্‌সের সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না।

সার জেম্‌স্ গাড়ীতে উঠিলেন; দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ী আসিয়া এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে থামিল। ভৃত্য পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল; অবশেষে এক সজ্জিত কক্ষে সার জেম্‌স্‌কে প্রবেশ করিতে বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়া ম্যরে দেখিলেন, এক ব্যক্তি ডেস্কের ধারে বসিয়া কি লিখিতেছেন। তিনি ঢুকিতেই লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদন করিল।

প্রতিনমস্কার করিয়া ম্যরে কহিলেন, "আপনি বুঝি ডাক্তার মাইনর?"

লোকটি বলিলেন, "না, আমি ডাক্তার মাইনর নই, তাঁর সঙ্গে আপনার শীঘ্রই দেখা হবে—তার আগে আমার বলে রাখা ভাল যে, এই জায়গাটা হচ্ছে ব্রড্‌মুরের বিখ্যাত পাগ্‌লা গারদ, আর আমি হচ্ছি এর অধ্যক্ষ।"

বিস্ময়-বিহ্বল বৃদ্ধ ম্যরে কহিলেন, "ব্রড্‌মুরের পাগলা গারদ! মাইনর তাহলে—"

"হাঁ, তিনি পাগল। আর তিনি একটা খুনও করেছেন। বিচারের পর থেকে তাঁকে এইখানেই রাখা হয়েছে। আমি আপনাকে তাঁর জীবনের সমস্ত কথা খুলে বল্‌ছি, শুনুন।" এই বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—

"ডাক্তার মাইনর আমেরিকা-নিবাসী; এখানে তিনি যখন প্রথম আসেন, তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তবে এখন বেশ ভালই আছেন ও আমাদের অনুরোধে তাঁকে বেশ সুন্দর ঘরই দেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি দেশ থেকে যত ভাল ভাল বই আনিয়ে লাইব্রেরী সাজিয়েছেন। ইনি বেশ পয়সাওয়ালা লোক। সেই জন্য তাঁর কোন অভাবই নেই। কি করে ডাক্তার মাইনর এখানে এলেন, সে কথা আপনাকে আমি সব বল্‌ছি।"

সার জেমস্ মন্ত্রমুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়া গেলেন—

"১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় ডাক্তার মাইনর তাহাতে যোগ

দেন। উঁহার বয়স তখন ২৬ বৎসর মাত্র। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি অস্ত্র-বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইঁহার অগাধ পয়সা—কোন ভাবনা-চিন্তা নাই। অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, চিত্র-বিদ্যাতেও তাঁহার পারদর্শিতা বিলক্ষণ।

"এই সময় একজন পলাতক সৈন্যকে দাগী করিবার জন্য ডাক্তার মাইনরের নিকট আনা হয়। কষ্টকর হইলেও মাইনরকে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপার তাঁহার মনের মধ্যে সুদৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিল। ইহার ফলে সময়ে সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত হইতে দেখা যাইত।

"কিছুদিন পরে ডাক্তারের একবার সর্দ্দিগর্ম্মি হয়। ইহার পর তাঁহার মন এতদূর খারাপ হইয়া পড়ে যে তাঁহাকে পড়াশুনা একেবারেই বন্ধ করিতে হয়! এবং ঐ কারণে ডাক্তারী কার্য্যও তাঁহাকে ছাড়িতে হয়।

"এই সময় তিনি সর্ব্বদা কাল্পনিক ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। সর্ব্বদা তাঁহার মনে হইত, যেন কতকগুলি আইরিশ্ তাঁহাকে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে; এই কাল্পনিক ভয় তাঁহার মনে এতদূর আঁটিয়া গেল যে তাহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

"এইরূপে কিছুদিন গেল। মাইনরের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ইউরোপে ঘুরিয়া আসিবার পরামর্শ দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাইনরের টাকার অভাব ছিল না। যথেষ্ট টাকাকড়ি সঙ্গে লইয়া তিনি

গুলি পরিচয়-পত্র ছিল। পত্রগুলি আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকদের লেখা। মাইনর আমেরিকায় থাকিতে বিদ্বৎ-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ঐ পত্রগুলির মধ্যে ইয়েল-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-লিখিত বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্যিক্ জন্ রাস্কিনের নামে একখানি পরিচয়-পত্রও ছিল।

"মাইনর প্রথমেই ইংলণ্ডে আসিলেন। লণ্ডনে টেম্‌সের নিকট টেনিসন্ ষ্ট্রীটে তিনি থাকিবার জন্য ঘর ভাড়া লইলেন।

"এখানে আসিয়া মাইনর তাঁহার গৃহ-কর্ত্রীকে নানারূপ অসংলগ্ন কথা বলিয়া ভীত করিয়া তুলিলেন। এমন-কি একবার তিনি পুলিশে চিঠিও লিখিলেন, 'আমার প্রাণ লইবার জন্য অনেক লোক ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহারা আমাকে যে-কোন দিন খুন করিতে পারে।' পুলিশ কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিল না।

"ইহার পর এক ভয়ানক ঘটনা ঘটল। মাইনর যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেই বাড়ীর কিছু দূরে মদ চুয়াইবার এক আস্তানা ছিল। এই বাড়ীটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি দুইটার সময় ডাক্তার মাইনর বাড়ী ফিরিতেছিলেন। মাথার উপর পরিষ্কার নক্ষত্র-খচিত আকাশ। মদের আড্ডার কাছেই মাইনর জর্জ্জ মেরিট্ নামক ঐ স্থানের একজন কর্ম্মচারীর দেখা পাইলেন। তারপর হঠাৎ সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ রাস্তায় তিনবার পিস্তলের আওয়াজ হইল। সেই

নিদ্রায় ঢুলিয়া পড়িল। নিকটস্থ পাহার-ওয়ালা রঙ্গস্থলে ছুটিয়া আসিয়া দেখে, ডাক্তার মাইনর পিস্তল-হস্তে দণ্ডায়মান, আর কর্ম্মচারীর দেহ ভূতলে পড়িয়া আছে। পাহার-ওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, 'কে গুলি ছুড়লে?'

"মাইনর উত্তর দিলেন, 'আমি—আমিই ঐ লোকটাকে খুন করেছি।'

"ইতিমধ্যে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া আর একজন পুলিশ কর্ম্মচারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরস্ত্র করিয়া ডাক্তারকে সাউথওয়ার্ক নামক থানায় আনা হইল।

"অনুসন্ধানের ফলে মাইনরের নিকট একখানা ছোরা পাওয়া গেল। পুলিশ তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া রাস্কিনের নামের পরিচয়-পত্র পায়; মাইনর-অঙ্কিত অনেকগুলি সুন্দর ছবিও সেই সঙ্গে বাহির হইল।

"পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে প্রবীণ বিচারপতি লর্ড বভিলের নিকট মাইনরের বিচার হয়। স্যর (তখন মিষ্টার) এডওয়ার্ড ক্লার্ক মাইনরের পক্ষে কৌঁসুলী ছিলেন। জুরীগণ মাইনরকে নির্দ্দোষ বলিয়া মত দিলেন। বিচারপতি জুরীগণের সহিত একমত হইয়া মাইনরকে এই পাগলা গারদে বদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা দিলেন।

"তারপর হইতে ডাক্তার মাইনর এই-খানে বাস করিতেছেন। এখন তাঁহার মাথার অবস্থা অত্যন্ত আশাপ্রদ। ভাষার ইতিহাস-অনুসন্ধানে ইঁহার বড়ই আগ্রহ সম্প্রতি আমেরিকা হইতে তাঁহার অনেক পুস্তক আসিয়াছে।"

ম্যরে নিস্তব্ধ হইয়া অধ্যক্ষের গল্প শুনিয়া গেলেন। গল্প শেষ হইলে মাইনরের সহিত ম্যরের দেখা হইল। দুইজন বিদ্বান, ভাষাতত্ত্ববিদ্ সানন্দে পরস্পরের কর-কম্পন করিলেন। ইহার পর ম্যরের মৃত্যু পর্য্যন্ত উভয়ের বন্ধুত্ব অটুট ছিল এবং মাইনর শেষ পর্য্যন্ত অভিধান-গ্রন্থ-প্রণয়নে ম্যরের সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

সার জেমস্ ভূমিকায় লিখিয়াছেন, প্রায় ৮০০০ কথার বিভিন্ন ব্যবহার মাইনর একা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

এই কাহিনীর এক বর্ণও মিথ্যা বা কল্পনা-রঞ্জিত নহে। ম্যরে নিজে ইহার সত্যতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত হেডেন চার্চ্চ মহাশয় মাইনরের পক্ষে নিযুক্ত কৌঁসুলী সার এড-ওয়ার্ড ক্লার্ক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ অবধি সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মাইনরের বিচার হয়। ঐ সময়কার টাইম্‌স্ পত্রে এই মকর্দ্দমার আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। মাইনর এখনও জীবিত। তবে, তিনি ব্রড্‌মুরের পাগলা গারদ হইতে আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বিপর্য্যয়

ওলো ননদিনী—তোর এ কি হ'ল আজ কেন এ নূতন ধারা
গঞ্জনা কেন নীরব কেনগো বিভল আপনাহারা ?
নিশিদিশি বাজে শ্যামের বাঁশরী তোর সে কঠোর বাণী
দোঁহে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে পূরেছে মরমখানি।
শ্যামের বাঁশীর মাঝারে গঞ্জে তোর সে দারুণ কথা
তোর গঞ্জনার পরাণে গুঞ্জে বাঁশীর বিপুল ব্যথা।
ওলো ননদিনী এ ব্রজ-মণ্ডলে সবাই বধির আর
শুনেনি শ্রবণে বাঁশীর মিনতি বুঝেনি মরম তার।
সবার মাঝারে মোদের দোঁহারে বেঁধেছে বাঁশীর ডোর
তোমার কণ্ঠে গঞ্জনা ফুটে আমার চক্ষে লোর।
মনোচোর তোর মনেতে পশেছে সারা মনে জাগে রোল—
"গেল গেল সব সামাল সামাল মনেরে জাগায়ে তোল্,
সকল রন্ধ্র রুদ্ধ ক'রে দে—বাঁশীর প্রবেশ-দ্বার
পাষাণ প্রাচীর কুলের ধরমে ঘিরি দেরে চারিধার।
মনে মহাভয় কোলাহল জাগে মুখে বাণী নিদারুণ—
আপনি জান না অন্তরে তার বাজে বাঁশী সকরুণ।
মনোহর শুধু পশিয়াছে মনে হরে নাই সারা মন
মনের ধরম জেগে উঠে' তাই বাধায় তুমুল রণ।
জানিতাম আমি জানিতাম মনে আসিবেই হেন দিন
রসের সায়রে তলাইয়া যাবে বাধা ব্যবধান—ক্ষীণ।
আমার মতন তোরো হ'বে দশা দুকুলে রবে না ঠাঁই
সুধার লহরে ভাসিতে ভাসিতে ঠেকিবি শ্যামের পায়।
শ্যামকলঙ্ক রাণীর টীকাটি উজল জ্বলিবে ভালে
লাজ ঘোমটায় কেমনে ঢাকিবি নিবিবে না কোনও কালে।
যতেক গঞ্জনা দিয়েছিস্ মোরে ফিরে তা শুনিতে হবে
কানে যদি পশে শ্যামের বাঁশরী প্রাণে সব ব্যথা স'বে।
মহাক্ষণ যদি এসে থাকে আজ লাজ কিবা তাহে বোন্,
কে কবে মরণ এড়ায় শ্যাম সে মরণ-অধিক ধন!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

দাগী

(গল্প)

তখন আমার জুনিয়ারির পালা। সারাদিন কোর্টে ঘুরিয়া রৌদ্র ও ধূলা খাইয়া গৃহে ফিরি ; প্রাণে বৈরাগ্যেরও বাসনা দেখা দিয়াছে।

বেশ মনে পড়ে, সেদিন সকাল হইতে বাদলা সুরু হইয়াছে—পথে কাদা, আকাশে মেঘ, চারিদিকে বিষম নিরানন্দ ভাব,—হাতে কোন কাজ ছিল না। হাকিম সদানন্দ সেন একটা একশ'-দশ ধারার মামলা করিতেছিলেন। একটু রস পাইবার আশায় তাঁহার এজলাসে আসিয়া বসিলাম।

আসামী এক বাঙ্গালী যুবক—গায়ের রঙ তামার মত, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরণে ময়লা কাপড়, অঙ্গে একটা তালি দেওয়া ছিটের কামিজ! কাঠগড়ার রেলিঙে মাথার ভর রাখিয়া মুখ গুঁজিয়া সে দাঁড়াইয়া ছিল। পুলিশ হইতে প্রায় ত্রিশ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইতেছিল। কয়েকজন দোকানদার, কয়টা পতিতা নারী, দুই-চারিজন পানওয়ালা—সকলেই হলফ লইয়া সাক্ষ্য দিতেছিল, আসামী একটা গুণ্ডা, কোন কাজ-কর্ম্ম করে না—যখন-তখন তাহাদের কাছে আসিয়া জুলুম করিয়া ভয় দেখাইয়া নেশা-ভাঙ্ করিবার জন্য পয়সা আদায় করে—বে-গোছ দেখিলে না কি ছুরিও উঁচাইতে ছাড়ে না। প্রাণের ভয়ে সাক্ষীর দল কেহ চার আনা, কেহ সাত পয়সা, কেহ দিয়া ফেলিয়া প্রাণে খুব রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। এই পয়সা কেহ দিয়াছে, এক মাস পূর্ব্বে ; আবার কেহ-বা সাত-আট মাস পূর্ব্বে। ইহার বিরুদ্ধে কোন দিন কেহ আদালতে নালিশ করে নাই ; বা পুলিশেও কোন ডায়েরী লেখায় নাই!

লোকটার চেহারা দেখিলে মনে হয়, সে চিররুগ্ন,—অত্যন্ত কৃশ দেহ, পেশীগুলা নিতান্তই ক্ষীণ, দুর্ব্বল! অথচ সে এমন জুলুম-জবরদস্তি করিয়া এই-সব ষণ্ডা জোয়ান দোকানদার ও ভীমা বারাঙ্গনাদের কাছ হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে,—শুনিয়া প্রাণে কেমন একটা বিস্ময়-কৌতূহলের সঞ্চার হইল।

একজন বন্ধু কহিলেন, "এস না হে, এর হয়ে দাঁড়ানো যাক্!"

আমি কহিলাম, "পয়সা দেবে কে?"

বন্ধু কহিলেন, "কি এমন পাঁচশ' দশ রোজগার করা যাচ্ছে যে পয়সার দুঃখে মরে যাব! অমনিই একবার পরখ করি—এই ত রাবিশ সাক্ষী—"

অপর বন্ধু কহিলেন, "বিনা পয়সায় দাঁড়িয়ে লোকটাকে জেলে ঠেলব? পয়সা পেলে তবু নেমকহারামী পাপটা ঘটত না!"

আমি কহিলাম, "মন্দ নয়—শাস্ত্রেও আছে, শতমারী ভবেৎ বৈদ্য! তা এ নয় হবে আমাদের নম্বর ওয়ান্।"

বিরক্ত চিত্তে কহিলেন, "ওর আবার উকিল দেওয়া কি! পাঁচবারের দাগী—"

আমরা নাছোড়বন্দা—আসামীকে জনান্তিকে রাজী করাইয়াছিলাম; হাকিম অগত্যা অনুমতি দিলেন। আমরা আসামীর জামিন প্রার্থনা করিয়া বসিলাম। হাকিম বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া জামিনের আদেশ দিলেন। আমরা অমনি মোক্তার নারাণবাবুকে আনিয়া গাঁটের পয়সা ব্যয় করিয়া তাহার জামিন করাইয়া লইলাম।

পুলিশের দারোগা তখন কোর্ট বাবুকে কি-একখানা মোটা কাগজ দেখাইতেছিল। হাকিমের সেদিকে নজর পড়িল। হাকিম কহিলেন, "কি ওটা?"

দারোগা সসম্ভ্রমে সেটি হাকিমের হাতে দিয়া কহিল, "আসামীর কাছে সম্পত্তির মধ্যে এই ছবিখানা শুধু পাওয়া গেছে।"

হাকিম ছবিখানার পানে চাহিয়া পর ক্ষণেই আসামীর দিকে চাহিলেন। চোরের মতই কুণ্ঠিত দৃষ্টি! মুখ তাঁহার নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল—কপালে বেশ স্পষ্ট স্বেদ-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপনার খাস-কামরায় উঠিয়া গেলেন; কোনদিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।

আমরা অবাক হইয়া গেলাম। কি এমন ফটোগ্রাফ—কাহার ফটোগ্রাফ যে মুহূর্ত্তে এ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি!

ফটোখানা হাকিমের টেবিলেই পড়িয়াছিল। কোর্ট বাবুর খোসামোদ করিয়া চাহিয়া লইলাম। এক স্ত্রীলোকের ফটো—সুন্দর। কুঞ্চিত সজ্জিত কৃষ্ণ কেশদামের মধ্যে অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরীর মুখ! ছবিখানি অত্যন্ত পুরাতন—কালের নিশ্বাসে ঈষৎ অস্পষ্ট ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

পেস্কার, আমলা সকলেই কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কড়া হাকিম—সাজা দিতে অদ্বিতীয়—সে বিষয়ে বাপের খাতিরও যিনি রাখিতে জানেন না, এ ছবিতে হঠাৎ তাঁহার এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন?

সকলেই আসামীর পানে চাহিল—এ দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না! জামিনের কাগজ সহি করিয়া নারাণ মোক্তারের সহিত এক কোণে বসিয়া সে তখন দিব্য গল্প জুড়িয়া দিয়াছে।

২

পরদিন সকালে আসামীকে ধরিয়া পড়িলাম, ও ছবি কাহার? বলিতে হইবে। আসামী প্রথমটা কিছুতেই বলিতে চাহে না—শেষে বিস্তর পীড়াপীড়িতে কহিল, ও ছবি তাহার মৃতা জননীর!

তারপর সে আপনার জীবনের কাহিনী বলিল। তাহার নাম, মাখন।

মাখন বলিল, "আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আমার মা মারা যান। বাবা পাগলের মত হইলেন। তিনি তখন এম, এ পড়িতেছেন—পরীক্ষা পড়া সব ছাড়িয়া আমায় বুকে টানিয়াই বাহিরের ঘরে দিবা-রাত্র তিনি পড়িয়া থাকিতেন। আত্মীয় বন্ধুর দল ঘাড়ে পড়িয়া তাঁহার সে ভীষণ শোকাগ্নি নিবাইবার চেষ্টা জুড়িয়া দিল।

পুরুষমানুষের শোক, তায় আবার স্ত্রীবিয়োগের—সে মুছিতে বড় বিলম্ব হয়

না—তবে ঠিক ঔষধটি দেওয়া চাই। শেষে সেই ঔষধেরই ব্যবস্থা হইল। বাবা আবার বিবাহ করিলেন। নূতন মা এক বড় চাকুরের কন্যা। সমস্ত দুঃখ-বেদনা নিরানন্দ, মুছিয়া তিনি একদিন আমাদের গৃহে সম্রাজ্ঞীর আসন পাতিয়া বসিয়া গেলেন। বাবার মুখে অচিরেই আবার হাসি দেখা দিল—মাত্রা যেন পূর্ব্বেকার চেয়েও বেশী!

আমি কিন্তু তাঁহার পানে আর ঘেঁস দিলাম না। প্রথম হইতেই কি যে কুবুদ্ধি ঘটিল! নূতন মার উপর রাগ ধরিয়া ছিল। নিজের মাকে হারাইয়াও একটা সান্ত্বনা ইহাই ছিল, বাবাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিয়াছি! এতখানি লাভের মুখে মা-হারাণোর লোকসানটা মনেও উঠে নাই! কিন্তু নূতন মা বাবাকে আমার কাছ হইতে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! আমার পানে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশও বাবাকে তিনি দিতে পারিতেন না! আমার বেশ মনে পড়ে, মা তখন বাঁচিয়া ছিলেন, দুপুর-বেলা তিনি নিদ্রা গেলে আমি বাহিরের ঘরে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতাম, দেখিতাম, ঠিক পথের অপর পার্শ্বে একটা নিমগাছের তলায় একটু ছায়ার আড়াল পাইয়া একটা রুগ্ন কুকুর আসিয়া তথায় পড়িয়া আছে—অত্যন্ত রুক্ষ তাহার মূর্ত্তি—নিতান্ত নিঃসঙ্গ বেচারা! বাবার এই পরিবর্ত্তনে আমার নিজের মনটা ঠিক সেই কুকুরটার মতই যেন এক অসীম বেদনার ঘা খাইয়া তেমনই নিঃসঙ্গ কুণ্ঠিতভাবে পড়িয়া থাকিত। অথচ উপায়ও ছিল না। একদিন জোর করিয়া বাবার আদর

কাড়িতে গিয়াছিলাম—নূতন মা তাড়া দিলেন, "পড়া নেই, শোনা নেই, বুড়োধাড়ি ছেলে, খালি ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছেন!" দুঃখে আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু জোর করিয়া কান্নাটাকে রোধ করিলাম—এই পাষাণীর কাছে চোখের জল ফেলিব? না, কখনও না! বাবার পানে একবার চাহিলাম, বাবার মুখ নিরুপায় কুণ্ঠায় একেবারে যেন সাদা হইয়া গিয়াছে! গতিক বুঝিয়া আমি সে ঘর ত্যাগ করিলাম।

বাড়ীতে আত্মীয়ও যে কেহ না ছিল, এমন নহে। তবে সকলেই নিজেদের লইয়া ব্যস্ত। স্কুলে যাইতাম—ইংরাজী বইয়ে একটা গল্প পড়িয়াছিলাম—কি একটা দেশের তখন অত্যন্ত অরাজক অবস্থা! যে যেমন করিয়া পারে, শুধু নিজেদের জিনিস-পত্র সামলাইতেই দারুণ ব্যস্ত, আশে-পাশে কত নিরীহ দুর্ব্বল অত্যাচারে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু সেদিকে মন দিবার কাহারও অবসর নাই—আমাদের বাড়ীর দশাটাও তখন ঠিক সেই রকম! মাথার উপর শক্ত অভিভাবক নাই,—বাবা বাড়ীর বড় ছেলে—অপরে জ্ঞাতিকুটুম্ব মাত্র, তাহারা উৎসব-আমোদের সময় দন্ত মেলিয়া সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে জানে—বিপদের লক্ষণ বুঝিলে নিমেষে কোথায় অন্তর্ধান হয়!

এইভাবেই ভাঙ্গা নৌকার মত জীবনটাকে যখন টানিয়া লইয়া ফিরিতেছি—তখন সহসা একটা দমকা হাওয়া দেখা দিল। বাবা এম-এ ফেল করিয়া বসিলেন—এবং তাহার দুই-চারি মাস বাদেই শ্বশুরের সুপারিশ ও জোগাড়ের জোরে

একদিন হাকিম হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমাকেও বাবার সঙ্গে লইয়া যাইবার কথা ছিল—কিন্তু হঠাৎ যাত্রাকালে নূতন মা বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিলেন, তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে না। কারণ, হাকিমি চাকুরি লইয়া বাবাকে সাত ঘাটে জল খাইয়া ফিরিতে হইবে—আমি সঙ্গে থাকিলে আমার পড়াশুনার বিষম ব্যাঘাত ঘটিবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটুকু একদম মাটি হইয়া যাইবে! স্ত্রীলোকের দূরদর্শিতাসম্বন্ধে সহসা বাবার বড়ই আস্থা দেখা দিল। কাজেই তিনি মাসহারার আশা দিয়া আমাকে জ্ঞাতির দলে রাখিয়া গেলেন।

আমি কোন কথা কহিলাম না। আমার কেমন তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল! মনে হইতেছিল, এ বিশ্ব-রঙ্গভূমে কোথায় কি অভিনয় চলিতেছে, আমার যেন শুধু তাহা দেখিবারই পালা! এ অভিনয়ে আমায় নামিতে হইবে না—আমার জন্য এখানে কোন ভূমিকাই নির্দ্দিষ্ট নাই! স্থাণুর মতই অচপল চিত্তে আমি বাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম।"

৩

মাখন বলিতে লাগিল, "দুই-তিন বৎসর এক রকমে কাটিয়া গেল। তারপর একদিন বড় কাকা বলিলেন, "বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে, তোমার বাবাই এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। আমরা নানান্ দিকে ছড়িয়ে পড়ছি—তোমার পক্ষে এখন তোমার বাবার কাছে যাওয়াই উচিত।" বড় কাকার কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সাধারণ দশ বৎসর বয়সের বাঙ্গালীর ছেলেরা এ-সব বিষয় বড়-একটা বুঝিতে পারে না—কিন্তু মা-মরা ছেলে—বিশেষ আমার মত অবস্থায় পড়িলে—বুদ্ধি তাহার একটু চট্ করিয়াই বাড়িয়া উঠে!

সে রাত্রে নিদ্রা হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিলাম,—কোথায় যাই, কি করি! একবার ভাবিলাম, বাবার কাছে যাই। বাবা তখন খুলনার ওদিকে কোথায় এক মহকুমার হাকিম—কিন্তু পরক্ষণেই বিমাতার সেই রোষ-রুদ্র মুখ ও কঠিন দৃষ্টির কথা মনে পড়িতেই সে বাসনা কর্পূরের মত উবিয়া গেল! ভাবিলাম, সেখানে যাওয়ার চেয়ে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোতেও ঢের আরাম, ঢের সুখ! ঘরের দেওয়ালে মার একখানি ফ্রেমে-আঁটা ছবি টাঙ্গানো ছিল। সারা রাত্রি প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় সেখানার পানে চাহিয়াই চোখের জল ফেলিলাম। মার শোক সে রাত্রে যেন নূতন করিয়া বুকে বাজিল! শেষে সেই ছবিখানাকে মাত্র সম্বল করিয়া পরণের দুই-চারি-খানা কাপড় লইয়া ভোরের দিকে বাড়ী ছাড়িলাম।

সম্মুখে দীর্ঘ পথ পড়িয়া আছে। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত সেই পথে চলিতে সুরু করিলাম! মাথার উপর তরুণ স্নিগ্ধ সূর্য্য ক্রমে রুদ্র মূর্ত্তিতে রক্ত আঁখি মেলিয়া দেখা দিল—সেদিকে দৃক্পাতমাত্র না করিয়া আমি চলিতে লাগিলাম—সূর্য্য হার মানিয়া শেষে আবার শান্ত শীতল মূর্ত্তি ধরিয়া মৃদু হাসিয়া দিগন্তের কোলে সরিয়া পড়িল—তবুও আমি চলিয়াছি! হাঁটু পর্য্যন্ত ধুলায় ভরিয়া

গিয়াছে, দারুণ পিপাসায় গলার মধ্যে যেন সূচ ফুটিতেছে, এমনই বেদনা বোধ হইতেছিল! কিন্তু কোথায় বসিব—আমার যে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তিলার্দ্ধ স্থান নাই!

যাক্, সে পথের কষ্ট আর খুলিয়া বলিয়া কাজ নাই। শেষে আশ্রয় মিলিল। এক গৃহস্থের বাড়ী বাসন-মাজার কাজে লাগিয়া গেলাম। চার বৎসর কাজ করিলাম—মন্দ লাগিত না, আরামও পাইতাম! এক একবার মনে হইত, আমার বাপ হাকিম,—তখনই হাসি আসিত। কিন্তু একদিনের জন্যও ক্ষোভ জাগে নাই।

আমার নিশ্বাসে বুঝি কি বিষ ছিল! নহিলে বাড়ীর কর্ত্তা একদিন গ্রামান্তর হইতে জ্বর গায় গৃহে ফিরিয়া যে বিছানা লইলেন—সে বিছানা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় না কেন? মৃত্যু তাঁহাকে আপনার কোলে টানিয়া লইল। পাখীর বাসায় ঢিল ছুড়িলে মুহূর্ত্তে যেমন তাহা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়—মনিবের গৃহের দশা ঠিক তেমনই ঘটিল। আমি আবার পথে বাহির হইলাম। বাবা তখন কটকে আমার এক ভাইয়ের জন্মোৎসবের ধূমে আত্মহারা!

তার পর এই সহর কলিকাতায় আসিলাম। এ এক মজার দেশ! যাহারা এখানে সুখী, যাহারা বড় লোক, তাহারা কাহারও পানে ফিরিয়া না চাহিলেও দুঃখী-গরিবের দল সাধিয়া কথা কহে, ডাকিয়া দুই মুঠা খাইতেও দেয়! এক ঠাকুরবাড়ীতে আস্তানা মিলিল। কিছুদিন সেখানে পূজারীর মন জোগাইয়া কাটাইয়া দিলাম; কিন্তু টিঁকিয়া থাকিতে পারিলাম না ...

হইতে যেন এক অদৃশ্য রজ্জু কোন্ এক অজানা পথে আমায় টানিতেছিল। তিন-চার বৎসর এখানে-ওখানে ঘুরিয়া একটা হোটেলে চাকরি করিতে আসিলাম। সেখানে বিশ্বের যত বিদ্বেষ, কলহ, নীচতা, স্বার্থ এক বিপুল ষড়যন্ত্র পাকাইয়া বসিয়া আছে, হিংসার জোট বিছানো আছে—তাহাতে পা বাধিল। সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া একেবারে আদালতের দ্বারে গড়াইয়া পড়িলাম। হোটেলের কর্ত্তার এক প্রৌঢ়া প্রণয়িনী ছিল—আমার উপর না কি তাহার একটু অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল! নেপথ্যেই ইহার ইঙ্গিতাভিনয় চলিতেছিল, তাহার আভাষমাত্রও আমার পাইবার সুযোগ ঘটে নাই—ইতিমধ্যেই কর্ত্তার মনে কেমন করিয়া সন্দেহ হয়—সে একেবারে থালা-ঘটি-সমেত চুরির চার্জ্জ দিয়া আমাকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দিল। আমি কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম। ব্যাপারখানা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই হাকিমের রায় বাহির হইয়া গেল—তিন মাসের জন্য আমার জেলের ব্যবস্থা। জেলের গাড়ীতে বসিয়া সত্যই সেদিন প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া ছিলাম—বাঃ, আশ্রয়হীন আমি, আজ এখানে, কাল সেখানে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম, ভগবান আজ আমায় দিব্য আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন ত! আর অন্নের ভাবনা ভাবিতে হইবে না, পড়িয়া ঘুমাইবার জন্য ছাদ-ঢাকা একটু ঠাঁইও অনায়াসে মিলিবে!

তিন মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। ভিক্ষা মাগিয়া দিন কাটিত।

শুনিয়া সেই দিকে চলিলাম—পথে পাহার-ওয়ালা পাকড়াও করিয়া থানায় চালান দিল। দাগী চোর রাত্রে রাস্তায় ঘোরা অপরাধে হাকিমের বিচারে আবার চারি মাসের জন্য জেলের দণ্ড হইল। যাত্রার কথা হাকিম আমলই দিলেন না, পুলিশ ত সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। কোথায় যাত্রা! ও শুধু একটা মিথ্যা ছল!

এবার জেলে বসিয়া স্থির করিলাম, এই পথই ভাল। বাহিরে যখন নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই,—কাজ করিতে গেলে লোকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে, কাজের চেষ্টায় পথে বাহির হইলে পুলিশে ধরিয়া চালান দিবে! তাহার চেয়ে জেলে থাকিলে বাঁধাবাঁধির আর ভয় থাকিবে না, রুলের গুঁতা হইতেও রক্ষা পাইব!

এবার জেল হইতে ফিরিলাম,—অদৃষ্ট প্রসন্ন মূর্ত্তিতে অভ্যর্থনা করিল। এক বড়লোকের কাছে চাকরি মিলিল। জেলেই এক বন্ধু জুটিয়া ছিল—আমারই সমবয়সী। সে তাহার মনিবের খুব সুখ্যাতি করিত। মনিব কোকেন-ওয়ালা। সে তাহার অধীনে থাকিয়া লুকাইয়া কোকেন বেচিত। মনিবের যত্নের ত্রুটি নাই। কোকেন-বেচায় আশঙ্কা খুবই, অথচ লাভেরও সীমা নাই। ধরা পড়িলে মনিব বেশ মোটা টাকা ব্যয় করিয়া বড় উকিল লাগাইয়া বাঁচাইবারও যথেষ্ট চেষ্টা করে। বরাতে যদি জেল ঘটে, ঘটুক—ফিরিয়া কিন্তু মনিবের কাছে রীতিমত বখশিস্ মিলিবে!

সেই চাকরিই ধরিলাম। দুঃসাহসের কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধু ঠিকই বলিয়া-ছিল, লাভ ইহাতে বিলক্ষণ! এই কোকেন লইয়া দুইবার আরও জেল খাটিয়া আসিলাম।

শেষবারে ফিরিয়া কিন্তু পুনর্মূষিক! কোকেন-ওয়ালা মনিব এক খুনী মামলার আসামী হইয়া বিচারে দ্বীপান্তরে চালান হইয়া গিয়াছে। চারিধার অন্ধকার দেখিলাম। হাতে টাকা ছিল না। কোনমতে কিছু জোগাড় করিয়া একবার ভদ্রলোক সাজিয়া বাবার সহিত দেখা করিব, ভাবিলাম। তাহার পর একবার এমন একটা কীর্ত্তির কাজ করিব, যাহাতে দেশের বুকে আমার নাম চিরকালের জন্য খোদা থাকে! বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়!

একটা দল জড় করিলাম। রাত্রে উল্টাডিঙ্গির বিখ্যাত মহাজন ঘনশ্যাম সাধু-খাঁর তহবিল চলিয়াছিল, লোকের মাথায়। তাহাদের ঘাড়ে পড়িয়া সেই তহবিলে ছোঁ দিলাম। বেশ মোটা টাকা হাতে আসিল।

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবারও অবকাশ মিলিল না, পুলিশ আসিয়া গ্রেপ্তার করিল—এই হাকিমেরই কাছে চালান দিল। এ হাকিম বড় কড়া—ভাল লোক বলিয়া নাম-ডাক আছে—আমার পূর্ব্ব-শাস্তির বহর দেখিয়া একেবারে দেড় বৎসরের জন্য জেলে আমার নিরাপদ নীড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তাহার পরই এই উৎপাত! এবার কিন্তু এ সবই কাল্পনিক ব্যাপার! দেড়মাস জেল হইতে ফিরিয়াছি—শরীর ত এই—দেহে বল নাই—মনে স্ফূর্ত্তি নাই। মার ছবি লইয়া একেবারে দেশে গিয়া সেই

শ্মশানে পড়িয়া সব শেষ করিব ভাবিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু গোলযোগ ঘটিল। রাস্তার মোড়ে একটা থার্ড ক্লাশ গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। এক জমাদার আসিয়া গাড়োয়ানের উপর তম্বি করে! গাড়োয়ান বেচারা সন্ত্রস্ত। আমি গায়ে পড়িয়া তাহার পক্ষ লইলাম। জমাদারের কোপ পড়িল, আমার উপর—তাহার এক জুড়িদার নিমেষে কোথা হইতে আসিয়া আমায় সনাক্ত করিল, এ বেটা পুরানো দাগী! জমাদার আমায় ধরিয়া থানায় আনিল! দুই দিন কোমরে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইয়া এই এক শ' দশ ধারায় শেষে চালান দিয়াছে। সাক্ষীগুলা কোথা হইতে আসিল, জানি না। আমি উহাদের চক্ষেও কখনও দেখি নাই, যে পাড়ার লোক উহারা, সে পাড়ার পথেও কোনদিন হাঁটি নাই! অথচ উহারা সকলেই হলফ লইয়া সটান্ জুলুম-জবরদস্তির কথা বলিয়া গেল।"

মাখন চুপ করিল।

আমি কহিলাম, "তোমার বাবার নাম কি? তিনি এখনও বেঁচে আছেন ত?"

মাখন বলিল, "সে খপরে কি হবে, বাবু?"

আমি কহিলাম, "হাকিমের কাছে প্রকাশ করে বললে সুবিচার প্রত্যাশা করতে পারি।"

মাখনের চোখ-দুইটা সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল,—বজ্র স্বরে সে কহিল, "কি বললেন, সুবিচার? এই হাকিমের কাছে? অসম্ভব! যদি সে আশা থাকত, তাহলে আজ এজলাসে ওর ঠাঁই না হয়ে আমার পাশে সেই আসামীর কাঠগড়ায় ওকে দাঁড়াতে দেখতুম। আমার এ দুর্দ্দশার জন্য কে দায়ী,—আমি, না, ও? যদি ভগবান থাকেন, তিনি এর বিচার করবেন! হাকিম হয়ে বসে লোকের বিচার করছেন,—উনি?" মাখন ফুঁসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "যাক্—ও কথা। তোমার বাপের নামটা বলই না! কিছু উপায় হবেই—"

"কিসের উপায়? কোন উপায় করতে হবে না, বাবু! যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন! ও কি করবে—আমার? না হয় আমায় জেলে দেবে! দিক্—ভগবান সব লিখে রাখছেন! ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে যদি ওঁর পৌরুষ হয়, হোক—"

আমি কহিলাম, "এ আবার কি বকতে সুরু করলে, মাখন?"

"তবু বুঝতে পারছেন না, বাবু? ওই ত আমার বাপ, ঐ সদানন্দ সেন—আপনাদের হাকিম—"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। হাকিম সদানন্দ সেন! সেদিন ছবি দেখিয়া হাকিমের সে চিত্ত-বিকারের কথা অমনি আমার মনে পড়িল। ব্যাপারটা জলের মত সাফ হইয়া গেল! আমি মাখনের পানে চাহিলাম। তাহার চোখ দিয়া তখনও যেন আগুন বাহির হইতেছে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

ভূতপত্রীর দেশ। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ,—কলাকুশল লেখকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পড়িতে পড়িতে পাঠকের চিত্ত কল্পনার লঘু পক্ষে ভর করিয়া বিস্ময়-কৌতূহলের অপরূপ উজ্জ্বল মায়ালোকের মধ্য দিয়া এক অজানা রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়—বই শেষ করিয়া কেবলই মনে হয়, এখানেই থামিলাম কেন! আরও চলি! শিশুদিগের চির-পরিচিত অত্যন্ত সাধারণ গল্পের খেই ধরিয়া নব নব ভাব, নব নব চিন্তা শিশু-চিত্তে বেশ-একটু মৃদু দোল দিয়া যায়। প্রতি ছত্রে এমন বিরাট আগ্রহ, অপূর্ব্ব কৌতুহল জাগিয়া উঠে যে বইখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। ভাষা জলের স্রোতের মত উধাও বহিয়া চলিয়াছে, সে স্রোতে ভাবের মুক্তা অজস্র ধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে—তাহা যেমন শুভ্র, তেমনই উজ্জ্বল। ইহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসটুকুও এক নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া—অতীত ও বর্ত্তমানে মিশিয়া—দিব্য বিচিত্র রসের সৃষ্টি করিয়াছে। একাধারে এতখানি খাঁটি আনন্দ, শিক্ষা ও কৌতুকের অবতারণা শিশুপাঠ্য গ্রন্থে বিরল। বইখানিতে চিত্রশিল্পী গ্রন্থকারের কয়েকখানি স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে—সেগুলিও যেন কৌতূহল ও কৌতুকের ফোয়ারা! Pen-and-ink sketch হইলেও সেগুলি জীবন্ত, প্রাণময়। বইখানির ছাপা সুন্দর, ইংলিশ অক্ষরে—বাঁধাই মনোরম—অর্থাৎ ভিতর ও বাহিরের সৌষ্ঠব—সর্ব্বাংশেই গ্রন্থখানি শিশু-সাহিত্যে অভিনব, অমূল্য।

নয়ন-তারা। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম,এ, প্রণীত। কলিকাতা এস. কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কটন প্রেসে মুদ্রিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। এখানি পারিবারিক উপন্যাস। বঙ্গভাষায় যে কয়খানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আছে, এখানি তাহার অন্যতম। এতদিনে যে এ উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল, ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকের লজ্জিত হওয়া উচিত। শাস্ত্রী মহাশয় একজন বহুদর্শী সুলেখক। এ উপন্যাসে তিনি যে কয়টি আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশের উপযোগী। উপন্যাসের প্লটটি যেমন সরল, অনাড়ম্বর, ভাষাও তেমনই সহজ এবং মর্ম্মস্পর্শী। রায় মহাশয়ের ক্ষুদ্র গৃহটি এমনই শান্তি-সুখে পরিপূর্ণ যে তাহার পানে চাহিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। রায় মহাশয়ের শিক্ষা-প্রণালী এমনই মধুর, পুত্র-কন্যাগুলির চরিত্রে এমন একটি রমণীয় স্নিগ্ধতা আছে, যাহা বাঙ্গলার মকর্দ্দমা-পীড়িত কোলাহল-মুখরিত গৃহে একান্ত প্রার্থনীয়। দরিদ্র হরেন্দ্রের চরিত্রে যে তেজ ও মনুষ্যত্ব প্রতিফলিত, প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে তাহা শিক্ষণীয়। নয়ন-তারা লেখকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি—সারল্যে ও দৃঢ়তায়, কোমলতায় ও তেজে এমন মিশ খাইয়াছে যে কোথাও তাহার নারীত্বে ব্যাঘাত ঘটে নাই। অথচ চরিত্রটিতে রোমান্সও প্রচুর। বাঙ্গালীর সংসারে নিত্য যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহারই সাহায্যে লেখক অপরূপ চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন—জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ব-প্রদর্শনের প্রচুর সুযোগ বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনায় কেমন অনায়াসলব্ধ, উপন্যাসখানি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ উপন্যাস-পাঠে বিশ্রাম-ক্ষণ ত আনন্দে কাটিবেই, তদ্ভিন্ন ইহার চরিত্রগুলি পাঠকের চিত্তে যে সুদৃঢ় উজ্জ্বল রেখাপাত করিবে, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালী মহত্তর আদর্শের সন্ধান পাইবেন। উপন্যাসখানির ইহাই একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব! গ্রন্থের ছাপা, কাগজ সুন্দর। এ উপন্যাস বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য।

পসরা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। 'পসরা' ছোট গল্পের সমষ্টি—'কেরাণী', 'স্মৃতির শ্মশানে,' 'কপোতী', 'যশের মূল্য', জীবন-যুদ্ধে', 'অন্ধ' ও 'সোণার চুড়ি'—এই সাতটি গল্প পসরায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে, 'সোনার চুড়ি' গল্পটি। অমলার হৃদয়ের দ্বন্দ্বটুকু লেখক বেশ দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—আমরা অত্যন্ত ত্রস্ত হৃদয়ে তাহার চিত্ত-বৃত্তির অনুসরণ করিয়াছি; তাহার পরিণাম ভাবিয়া যথেষ্ট চিন্তিতও হইয়াছিলাম। কিন্তু লেখক শেষ রক্ষা করিয়াছেন—শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটির পরিণাম খুব সরল, খুব সহজ এবং খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। কোন অক্ষম লেখকের হাতে পড়িলে গল্পটি মাটি হইয়া যাইত! এই গল্পটির সম্বন্ধে প্রকাশক 'মুখবন্ধে' যথেষ্ট কৈফিয়ৎ কাটিয়াছেন। এ কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মৌখিক-রুচি-বাগীশ অকালপক্ক সমালোচক আছেন, যাঁহারা vulgar বা দুর্নীতির অর্থ না বুঝিয়া যখন-তখন যা-তা বলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠেন,—নারী-হৃদয়ের ক্ষুদ্র একটু চিন্তা, সামান্য একটু ভাবান্তর একেবারে প্রলয়-হুঙ্কারেরই রূপান্তর বলিয়া তাঁহাদের মনে হয়। তাঁহারা চাহেন, পদাহতা উপেক্ষিতা স্ত্রী পদাঘাত খাইয়া পরক্ষণেই অশ্রু মুছিয়া স্বামীর চরণে গরম তৈল মালিশ করিতেছে, শুধু এমনই চরিত্র আঁকো। স্বামী স্ত্রীকে অভদ্র, কট বা কুৎসিত গালি দিলে, স্ত্রী যদি রাগ করে ত তাঁহারা অমনি বলিবেন, 'খবরদার, চোখ রাঙাইও না, দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইবে।' সৌভাগ্যক্রমে এ শ্রেণীর কাণ্ড-জ্ঞানহীন সমালোচকের সংখ্যা অল্প—এবং তাঁহাদের মতামতে বাঙ্গলা সাহিত্যের কিছুই আসিয়া যায় না—তাঁহাদের ভ্রূকুটি-ভঙ্গকে উপেক্ষা করিবার মত শক্তি ও সাহস, 'পসরার' লেখকের আছে—কাজেই 'মুখবন্ধে' এ ভণিতার কোনই প্রয়োজন ছিল না। Art ও vulgar-

'স্মৃতির শ্মশানে' গল্পটিতে বেশ বৈচিত্র্য আছে। 'কেরাণী' ও 'জীবন-যুদ্ধে' গল্প দুইটি Realistic, 'অন্ধ' চলনসই। 'যশের মূল্য' গল্পটি অস্বাভাবিক, এ গ্রন্থে স্থান না পাইলেই ভাল হইত। 'কপোতীতে, কাব্যের মাত্রা কিছু বেশী। যাহা হৌক, গল্প-রচনায় লেখকের হাত আছে—ভাষাও সরল। দুই-একটি ত্রুটির এবার উল্লেখ করিব। গল্পগুলিতে উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্য খুবই—সেজন্য বহু স্থলেই রসভঙ্গ হইয়াছে। লেখক এ উচ্ছ্বাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, প্রকাশক মহাশয় 'মুখবন্ধে' তাহার আভাষও দিয়াছেন—এবং এ কথাও বলিয়াছেন, "নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য লেখক ইচ্ছাসত্ত্বেও ঐ সামান্য ত্রুটিটুকু সংশোধনের অবকাশ পান নাই।" এ ত্রুটির জন্য ক্ষমাও তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট সাফাই বলিয়া আমরা মনে করি না। দ্বিতীয় ত্রুটি, ভাষায় বহু স্থানে মুদ্রাদোষ আছে। তাহার উপর কথোপকথনের ভাষায় ও বর্ণনার ভাষায় মধ্যে মধ্যে মিশ খাইয়া রসভঙ্গ ঘটাইয়াছে। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এ সকল ত্রুটি সংশোধিত হইবে। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল।

শ্রীঅদ্বৈত বিলাস। অর্থাৎ শ্রীমদাচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর পবিত্র চরিতাখ্যান। প্রথম খণ্ড। আদি ও মধ্যকাণ্ড। মূল্য এক টাকা দুই আনা। দ্বিতীয় খণ্ড। উত্তর কাণ্ড। মূল্য এক টাকা দুই আনা। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক গ্রথিত। কলিকাতা, ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। "শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরিত সম্বন্ধে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—গদ্যে পদ্যে যত প্রকার গ্রন্থ আছে, তৎসমুদয় হইতে বিবরণ সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।" বিস্তর পুথি ও গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত এই গ্রন্থখানি লেখকের অসীম অধ্যবসায় ও অসাধারণ পরিশ্রমের ফল। গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত, প্রাঞ্জল। বৈষ্ণবদিগের নিকট এ গ্রন্থের মূল্য যথেষ্ট হইবেই; তাই বলিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর নিকটও ইহার মূল্য সামান্য নহে। চৈতন্যদেব-সম্বন্ধে এখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ-স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। তাহার উপর ইহার আরও বিশেষ মূল্য এইজন্য যে,

গতি। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ১০০ নং অপার চিৎপুর রোড, রামময় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীহরিপদ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা। এখানি উপন্যাস—অর্থাৎ লেখকের কথায় "গার্হস্থ্য চিত্র।" নিতান্তই বিশেষত্ব-হীন রচনা। লেখক 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, "পুণ্যের জয় পাপের শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শন করাই 'গতির মুখ্য উদ্দেশ্য।" সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তিনি এক দুর্বৃত্ত মাতাল স্বামীর অবতারণা করিয়াছেন। মাতাল স্ত্রীকে কেবলই প্রহার করিয়াছে, দেখিলাম; তদ্ভিন্ন তাহার আর অপর কোন কাজ নাই! আর স্ত্রী বেচারীও পড়িয়া পড়িয়া মার খাইয়াছে। তাহার মুখে একটা কথা নাই, চিত্তবৃত্তিরও কোন আভাষ পাওয়া গেল না—অথচ মৃত্যুর পূর্ব্বে হঠাৎ দেখা গেল, এই স্ত্রীটি স্বামীর চরণ দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। দৈবক্রমে স্বামী যেমন আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি স্ত্রী একবার কাশিল ও রক্তবমন করিল এবং স্বামীর "দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল।" গ্রন্থকার পরে টিপ্পনী কাটিয়াছেন, "লীলা সতীলক্ষ্মী, তাই মৃত্যু-সময়ে স্বামী সন্দর্শনে বঞ্চিতা হইল না।" চমৎকার! এই একটি ঘটনাতেই এক-দম সতীলক্ষ্মী! ইহাকেই বলে, আদর্শ সৃষ্টি। সীতা, সাবিত্রীর দেশে এ কথা লিখিতে যাহার লজ্জা হয় না, মামুলি জঘন্য রসোদ্গারেই যাহার আনন্দ, তাহারও উপন্যাস লিখিবার সাধ হয়! —আশ্চর্য্য! এমন অদ্ভুত ভাব লইয়া উপন্যাস-নাটক লেখার চেষ্টা শুধু ধৃষ্টতা দেখান। দার্শনিক বক্তৃতা ছাড়া উপন্যাসখানিতে মানুষ-চুরি ডাকাতি আত্মহত্যা খুন, জালিয়াতি সবই আছে—অর্থাৎ ফৌজদারী অপরাধের এমন ফিরিস্তি বাঙ্গলার বাজে উপন্যাসেও ক্বচিৎ দেখা যায়। ভাষাও অবিকল ভাবের অনুরূপ—ইনি বলেন, আমায় দেখ, উনি বলেন, আমায় দেখ!

কেতকী। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব ভবন, বারো আনা, বাঁধাই এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। এ গ্রন্থে "জ্যোতিঃহারা," "মিলন," "নির্ব্বন্ধ," "ট্রেনে," প্রভৃতি তেরটি ছোট গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পই পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি বিদেশীয়ের অনুবাদ ও অপরগুলি মৌলিক। 'অপঘা,' 'ট্রেনে,' 'জ্যোতিঃহারা,' প্রভৃতি মৌলিক গল্পগুলি আমাদের মন্দ লাগে নাই—সেগুলির ভাব স্বচ্ছ, প্রাণময়; ভাষাও নির্দ্দোষ, অনাড়ম্বর। বিদেশীয় গল্প গুলির মধ্যে 'বিচারে,' কোন বিশেষত্ব নাই—অপর গুলির নির্ব্বাচন ও রচনা প্রশংসনীয়। অনুবাদ-গল্পগুলির ভাষায় বেশ স্বচ্ছতা আছে, পড়িতে বাধে না, কোনখানে অনুবাদ বলিয়াও মনে হয় না। যাঁহারা বাঙ্গলায় বিদেশীয় গল্পের অনুবাদ করেন, তাঁহাদিগকে এগুলি বিশেষ করিয়া পাঠ করিতে বলি। বহিখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

বারুণী। শ্রীযুক্ত এম, এ, বি-এল, সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। 'বারুণী,' 'অনাদৃত,' 'আমার চাকরি,' প্রভৃতি এগারটি ছোট গল্প ইহাতে সংগৃহীত এবং প্রথম গল্প 'বারুণীর' নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলির ভাষা ভাল,— সরল এবং অনাড়ম্বর, তবে ছোট গল্পের আর্টের দিক দিয়া দেখিলে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, গল্পে ত্রুটি আছে, বিস্তর। "আমার চাকরি" গল্পটি ছোট গল্প হিসাবে আমাদের বেশ লাগিয়াছে। অপরগুলি সুখপাঠ্য—ছোট গল্পের রসও অনেকগুলিতে আছে, তবে সে রস তেমন ফুটিতে পায় নাই; তাহার কারণ, গল্পগুলি তেমন স্বাভাবিক বা সুসমঞ্জস হয় নাই। 'বারুণী' গল্পে কন্যা বারুণীকে লইয়া হরনাথ ও নীরদাসুন্দরীর মনোমালিন্যের মাত্রা এতদূর গড়াইয়াছে যে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকে—কারণ নীরদাসুন্দরীর চরিত্রে অভিমানের সহসা এতখানি কাঠিন্য

গল্পটিতে ছোট গল্পের উপাদান বেশ ছিল,—তবে শাশুড়ীকে অতখানি রুদ্রাণী সাজাইবার পক্ষে লেখক পূর্ব্ব হইতে কোন আয়োজন করেন নাই। 'অনাদৃত' গল্পের গোপীমোহন কতকটা বেকুব জড়ভরত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—লেখকের লেখনীতেই তাহার অস্তিত্ব পর্য্যবসিত, তাহার যেন স্বতন্ত্র প্রাণ নাই। 'স্মৃতিরক্ষা' গল্পটি একটু অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়াছে। 'রেলযাত্রী'ও অনাবশ্যক ভারে আক্রান্ত। "স্নেহপাশে" বৃদ্ধার বক্তৃতায় ভগবতীর স্নেহাধিক্য না বুঝাইয়া অন্য উপায়ে তাহার পরিচয় দিলে গল্পটি জমিতে পারিত। যেগুলির নাম করিলাম, সেগুলিতে ছোট গল্পের উপাদান আছে; সেগুলি একটু চেষ্টাতেই ফুটিতে পারিত! শুধু লেখকের অবহেলায় ফুটে নাই। লেখকের হাত ভাল, লিখিবারও শক্তি আছে, তাই এত কথা, অপ্রিয় হইলেও, খুলিয়া বলিলাম। আশা করি, লেখক বিরক্ত না হইয়া বুঝিয়া দেখিবেন।

প্যারাডাইস লষ্ট্। শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রথম সংস্করণ। প্রকাশক, এস, ঘোষ, মাগুরা বারুই-পাড়া পোঃ আঃ, জেলা খুলনা। কলিকাতা বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত। এখানি মিলটনের প্যারাডাইস লষ্টের প্রথম সর্গের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ পদ্যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে। অনুবাদের নমুনা দিতেছি,

> "মানবের অবাধ্যতাপ্রসঙ্গে প্রথম,
> নিষিদ্ধ তরুর ফল-বিষম-আস্বাদ
> ভূতলে আনিল যার মরণ-সন্তাপ,
> নন্দন-বিচ্যুতিসহ—আবার যাবৎ
> না স্থাপেন পূর্ব্বভাবে নরোত্তম নর
> নিখিল-মানবে, না লভেন সুখাবাস,
> গাহ ওহে ঈশদূতে, হোরেব-সিনাই-
> নিভৃত চূড়ায়, অনুপ্রাণিলেন যিনি
> সে মেষপালকে, শিখালেন পুরাকালে
> নির্ব্বাচিত জাতে যিনি প্রথমে আরম্ভে
> কারণ-সলিল হতে উঠিল কেমনে
> পৃথ্বী-গ্রহ-তারা।"—ইত্যাদি

লেখক অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না; তবে একটা কথা লেখককেই জিজ্ঞাসা করি—এ অনুবাদ কি মূলের চেয়েও কঠিন, দুর্ব্বোধ ঠেকিতেছে না? গ্রন্থের উপক্রমণিকায় মিল্‌টনের জীবনী ও তাঁহার রচনার আলোচনা এবং পরিশিষ্টে টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্টম্। শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-কোচবিহারাধিপতি-মন্ত্রিমহোদয় স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ শর্ম্মণা সঙ্কলিতং। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যেণ এম এ বিদ্যারত্নোপাধিকেন সম্পাদিতং। জ্ঞানোদয়যন্ত্রে মুদ্রিত প্রথমসংস্করণাৎপেরং রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদানর্ম্ম্রিতম্। অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্রং মূল্যং। গ্রন্থখানি সংস্কৃতে বিরচিত, তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। এই গ্রন্থে প্রাতঃকৃত্য, শৌচাদি, প্রাতঃস্নান, তর্পণ, ও পূজাদির মন্ত্র প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

সরল প্রসূতিদর্পণ ও শিশুপালন।—মিসেস পি, দাস প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। গৃহস্থ ও অল্পশিক্ষিত ধাত্রীদিগের জন্য এ গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। লেখিকা লেডি ডফরীন্ হাসপাতালের ধাত্রী ছিলেন। অল্পের মধ্যে বিস্তর প্রয়োজনীয় কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্য কয়েকটি চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের ভিত্তি ইংরাজী, উর্দ্দু ও বাংলা গ্রন্থ এবং লেখিকার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। গ্রন্থখানি বিশেষ সতর্কতার সহিত লিখিত। এ গ্রন্থ যাঁহাদিগের জন্য রচিত, তাঁহারা ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। তবে গ্রন্থের মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে—'আট আনা' হইলেই ঠিক হইত।

ডাক্তার।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বিশ্রাম

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২২ [৯ম সংখ্যা

প্রত্যাবর্ত্তন

তৃতীয় খণ্ড

১৩১০ সালের ভারতীতে এই প্রসঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রকাশিত অংশের চুম্বক দেওয়া গেল :—বর্দ্ধমান জেলার বাঁকা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমে উত্তরায়ণে স্নান করিয়া অনন্ত ও জয়রাম প্রভৃতি গ্রামবাসী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে লইয়া স্বগ্রামে ফিরিতেছেন। অনন্ত, সুলক্ষণার স্বামী। অনন্তের চরিত্র-সম্বন্ধে মাঝে গ্রামে দুর্নাম রটে। এই বিষয় লইয়া একবার শ্বশুরবাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বাদানুবাদ হয়, ফলে অনন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করে। সুলক্ষণা বহির্দ্বারে আসিয়া স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু অনন্ত সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া রাত্রির অন্ধকারে মিশিয়া যায়। সেই হইতে অনন্ত আর শ্বশুরবাড়ী যায় না বা স্ত্রীকে আনিবার নামও করে না। সুলক্ষণার বয়স পনেরো। হেমার বয়স চব্বিশ, চঞ্চল প্রকৃতি। সে যুবতী ব্রাহ্মণকন্যা, বড় ডানপিটে, হাসিতে ও হাসাইতে পটু। হেমা, পাড়ার যুবতী ও কিশোরী বউঝির সঙ্গিনী ও উপদেষ্টা ছিল। পার্ব্বতী ও রক্ষা সহোদরা। তাহারা বিধবা কুলিনকন্যা। যাত্রীদলের মধ্যে কেবল ফণের মা ও হাবুর মা জাতিতে শূদ্র। জয়রামের বয়স ১৮।১৯—গ্রামসম্পর্কে অনন্তের ভাই।

উত্তরায়নে গঙ্গাস্নান শেষ করিয়া অপরাহ্নে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যাত্রীগণ হাটতলা পরিত্যাগ করিয়া আবার গ্রাম্য পথ ধরিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। অনন্ত ও জয়রাম ইতিপূর্ব্বেই অগ্রগামী হইয়াছিল। এক্ষণে কেবল দলস্থ স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার গল্প করিতে করিতে চলিল। পথে ভূতোর মা জিজ্ঞাসা করিল, “গিন্নি, তুমি কি কিন্‌লে ?”

হাবুর মা বলিল

হাবুর নেগে ফুটকলাই মুড়কি আর জিলাপী নিলাম।”

“আর বোয়ের নেগে কি নিলে ?”

“বোয়ের নেগে আবার কি নেবো ? বুড়মাগী তার আবার কি চাই ? বাড়ী যাব কতক্ষণে গো ?”

হেমাঙ্গিনী কহিল, “বাড়ী যেতে ঘোগা ডাকবে ; এইখানেই ত বেলা গেল।”

আরও খানিকদূর অগ্রসর হইয়া যাত্রীরা দেখিল তাহাদের পরিচিত আর একদল যাত্রী আসিতেছে। পরস্পরে সাক্ষাৎ হইলে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের ধূম পড়িয়া গেল। তারপর হেমা ও পার্ব্বতী কহিল, “মাউইমা আমাদের বউ কই বল।”

গৌরবর্ণা স্থূলকায়া একজন প্রৌঢ়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “এই যে আমার বউমার কাছে, ‘আয়গো সুলক্ষণা,’ তোর ননদেরা তোকে খুঁজছে।”

প্রৌঢ়ার কথা শুনিয়া তুইটী অবগুণ্ঠিতা সুন্দরী আসিয়া হেমা ও পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইল। নবাগত যাত্রীদের আর পরিচয় দিতে হইবে কি ? স্থূলকায়া গৌরবর্ণা প্রৌঢ়া, অনন্তের শ্বশ্রূঠাকুরাণী। সুলক্ষণা অনন্তের সেই অভাগিনী পত্নী। আর “বৌ”, সুলক্ষণার ভ্রাতা গোবিন্দের স্ত্রী। ইহারাও আজ স্বদলবলে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল। মেলাতলায় জয়রাম ইহাদের সাক্ষাৎ পাইয়া সে কথা অনন্তের কর্ণগোচর করে, তাহা বোধ হয় পাঠকগণের মনে আছে। বামুনবেড়ের বউ ও কোঁদার বউ এতক্ষণ ঘোমটা খুলিয়া বাজারের

কুটুম্ববাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে পাইল, অমনি একহাত ঘোমটা টানিয়া আবার বউ সাজিল। ইহাই পল্লীগ্রামের রীতি, ইহাই পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা। এই প্রকার লজ্জাশীলা পল্লীবাসিনীরা সহরের মেয়ে-ছেলেকে “বেহায়া” বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। একটা কারণও আছে। পল্লীগ্রামের বারয়ারি পূজা অথবা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে সহর হইতে বাই-খেমটা, মেয়েযাত্রা এবং মেয়েকীর্ত্তন গিয়া থাকে। এই সকল নষ্টচরিত্র কুলটাগণকে দেখিয়াই পল্লীবাসিনীরা সহরের স্ত্রীলোকের আচার-ব্যবহার ও লজ্জা-শরমের পরিমাণটা আন্দাজ করিয়া লইয়া থাকে। ইত্যবসরে মেলাতলার সেই কাঠওয়ালী কলহপ্রিয়া বৃদ্ধা মেঘার শ্বাশুড়ীও তাহাদের সহিত আসিয়া যোগ দিল। তাহাকে দেখিয়া হেমা, পার্ব্বতীকে কহিল, “দাঁড়া ভাই, মাগী যখন এসে জুটেছে তখন একটা কাজ করিয়ে নিই।”

এই বলিয়া সেই বৃদ্ধাকে বলিল, “এইযে বেয়ান্, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? আমি তোমাকে কত খুঁজলাম”—

বৃদ্ধা বাধা দিয়া কহিল, “তোমরা কোথায় বাসা কোরে ছিলে, আমি খুঁজে খুঁজে হালাক হলাম। তাই ভাবলাম যে, বাইতো মোয়ানে বাগে, এই বাগ দিয়েত তানারা যাবে তাই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। আমি মনে করলাম—আর জামাইবাড়ী যাব না, তা বেয়ান ঠাকরোন্ বল্লে, তা সে কথা কি ঠিলতে পারি ?”

কথা? তোমরা হলে গোতুরে লোক, কাজের লোক, যাবে বইকি। দেখ পার্ব্বতী, বেয়ান বড় কাজের লোক, এই মোটটা বইতে আমাতে আর তোতে হিম সিম খেয়ে যাচ্ছি, ওনারা কি এসব গেরাজ্জি করে?"

"আর গতর কি আছে বেয়ান ঠাকরোন? দাওনা পুঁটুলিটে, আমার হাতে খানিক দাও"—

বাধা দিয়া হেমা বলিল "ওমা সেকি কথা? তুমি কুটুমমানুষ, ভদ্দরলোকের মেয়ে (বুড়ী জাতে দুলে) তুমি আমার মোট নেবে কেন?"

আর যায় কোথা! ব্রাহ্মণকন্যা একে বলিয়াছেন "কুটুম্ব" তার উপর আবার "ভদ্দর লোকের মেয়ে" আর কি রক্ষা আছে! মাগী বিনাবাক্যব্যয়ে হেমার হাত হইতে মোট লইয়া নিজে মাথায় করিয়া চলিল।

দেখিয়া পার্ব্বতী সহাস্যে হেমাকে বলিল, "চুপ কর না, মাগী যাচ্ছেত ঘাড়ে করেই নিয়ে যাক্।"

এদিকে অনন্তের শাশুড়ী যাইতে যাইতে রক্ষাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁগা মেয়ে, বল্‌তে পার জামাই আনতে লোক পাঠালে বিয়ান জামাইকে পাঠায় না কেনে? লোক ফিরিয়ে দেয়।"

রক্ষা জিভ কাটিয়া বলিল, "বাপরে অমন কথা বোলনা মাউই-মা, তোমার বিয়ানের তুল্লি মানুষ কি আর আছে? তাকে একটা দোষ দিচ্ছে লোকে।—"

অনন্তের শাশুড়ী শুনিয়া সবিষাদে কহিলেন, "হেইমা, কি হবে গা! আমার শুনে বড় ভয় নাগ্‌ছে।"

"ভয় কি?"

"ভয় আবার কি? তোরা কাঁচা মেয়ে, জানিস না মা ভয় ষোলআনা। একে ছেলেমানুষ, সোমত্ত বয়েস, মাথার উপর বাপ নাই, খুড়া জেঠা মামা কেউ নাই, তাতে বিষয়ওয়ালা লোক, ওর যদি দোষ হয়ে থাকে তাহলে বড় মুস্কিল। যা খুসি তাই কর্ব্বে কাকেও আর মানবে না, আর মান্‌তেই বা আছে কে? মাগীতুটোকে কি আর গেরাজ্জি করবে? এক একটা ধমক দিলেই হল।"

"কয়, এমন কি বয়ে গেছে বাছা, তা ত কিছুই দেখতে পাই না। তবে বেটাছেলে কোথায় কি কল্লে না কল্লে সে আলাদা কথা। এইতো আমরা রাড় হয়েছি, বাড়ীর পাশে বাস করছি কখনও উঁচু নজরটি নাই। বরঞ্চ আমাদিগকে কত মাণ্যি করে, কত সাহায্য করে, অবিশ্যি আমাদেরই নিয়ে আমাদের করে, তাই-বা আমার করে কে? তাই-বা না করবে কেন? পাড়া পিল্লিবাসী কত্তে হয় বই কি। যদিই তোমার জামাই মন্দ হয়ে থাকে তাতেই বা তোমার দুঃখু কি? তোমার মেয়েকেত আর অনাদর করে নাই। আর করেই যদি? আমরা এই যে কখনও সোয়ামীর মুখ দেখতে পেলাম্ না, তা কি কর্ব্ব সব সহিই কর্ত্তে হয়।"

অনন্তের শাশুড়ী আর রক্ষার কথায় উত্তর দিলেন না। এদিকে সুলক্ষণা প্রিয়সঙ্গিনী হেমাঙ্গিনী ও পার্ব্বতীকে পাইয়া অনেক দিনের পর মনের কবাট খুলিয়া ফেলিল। দশমাস বাপের বাটীতে আছে,

কিন্তু একদিনও সুখে কাটায় নাই বরং বিশেষ মনের কষ্টেই আছে. তাহা সমদুঃখিনীদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুলক্ষণা যে নীরবে কাঁদিতেছিল, তাহা বলা বাহুল্য। রাঙা ঠাকুরুণ, ভুতোর মা প্রভৃতি গৃহিণীদিগকে দেখিয়া সুলক্ষণা ঘোমটা দিয়াছিল। পার্ব্বতী সকলের দুঃখের দুঃখিনী, সেও সুলক্ষণার দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল এবং একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হে হরি, যে যে কয়দিন বাঁচে সে যেন হাসিমুখে থাকৃতে পায়। কাকেও কষ্ট দিও না হরি! মেয়েমানুষের এর বাড়া আর কষ্ট নাই। বলে—

আপনার দুঃখে অসংসারী,
পরের দুঃখ দেখতে নারি।

মেয়েমানুষগুলো মরে যায়ত বেশ হয়।"

হেমা বাধা দিয়া কহিল, "বালাই, মর্ব্বে যদি তবে মাসে মাসে গোটা পাঁচ ছয় একাদশী করবে কেলা নেকি? মর্ত্তে হয় তুই মরিস্, আমি তো কখনও মরব না। একাদশীর সংখ্যে দেখে তবে মরবো; নইলে বুঝি মলেই হল?"

সুলক্ষণা সাশ্রুনেত্রে বলিল, "আমার ভাই মর্ত্তেও ইচ্ছা হয় না আর একবার দেখা না করে!"

সুলক্ষণার কথায় হেমা রাগিয়া বলিল, "তোর দুঃখটা কি বল্‌ত শুনি।"

তখন সুলক্ষণা প্রথম হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত খুলিয়া বলিল। তারপর কহিল, "আমি পায়ে ধর্‌তে গেলাম আমাকে নাতি মেরে পাঁচ হাত দূরে ফেলে দিয়ে গেল।"

সদাকৌতুকময়ী হেমাও চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আঃ! এই মোটে পাঁচ হাত, তবেত ভারি ফেলে দিয়েছে! আমি থাকলে শিখিয়ে দিতাম, তোকে দশ হাত দূরে ফেলে দিত।"

সুলক্ষণা আবার সারোদনে বলিল, "তা পারে, তাতেই পটু। যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে পথে যাচ্ছি ততক্ষণ তোমাদিগকে দেখি নিই। বোধ হয় এজন্মে আর দেখা হবে না।"

পার্ব্বতী বলিল, "ছি ভাই, ওকথা বলতে নাই।"

"না হয় না বল্লাম কিন্তু ভাই, আর সহ্য হয় না।"

এইবার হেমা রাগিয়া বলিল, "সে ডেকরা বামুন এমন? লঘু পাপে গুরু দণ্ড কর্‌তে কবে শিখেছে সে বিটলে বামুন? সুহু সুহু তোকে এমন জ্বলন করছে কেনে? সে হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া উড়্ পেয়ে, তাতেই বুঝি গঙ্গাতীরে বসে এত জারিজুরি হচ্ছিল? আমি তখনই বুঝেছি—তোর মাথা খাচ্ছে হতভাগা! কি বলব ভাই হয়!"

পার্ব্বতী কহিল, "আ মরণ! ভেয়ের খাতির ত কত হোচ্ছে।"

"ঐ রকম ভেয়ের ঐ রকম খাতির।"

তারপর সকলে অনেক কথা কহিতে কহিতে অনেক পরামর্শ করিতে করিতে যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ হেমা উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, "ভাই, যদি তোর কালো মাণিককে মিলিয়ে দিই, তা হলে তুই কি দিস্?"

সুলক্ষণা হাসিয়া কহিল, "তা হলে একদিন ভাগ দিই।"

হেমা সুলক্ষণাকে চিমটি কাটিয়া কহিল—"মরলো মর, আপনি শুতে যায়গা পায়না শঙ্করাকে ডাকে।"

অনন্ত, জয়রাম ও অনন্তের সম্বন্ধী গোবিন্দ, তিনজনে একত্র হইয়া অগ্রগামী হইয়াছিল। তাহারা তেমহলার উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। অনন্ত বলিল, "কইরে, তাদের যে দেখা নাই, কোথায় ফেলে এলি তাদিকে ?"

জয়রাম বলিল, "যেখানেই থাকনা, তোমার একলাকার ত নয়! এই একজন ভদ্রলোকের ভগ্নী।"

গোবিন্দ সহাস্তে কহিল, "শালা আমার।"

জয়রাম বলিল "ঐ রথের ধ্বজা দেখা গিয়েছে। অনন্ত আসুন আমরা এগিয়ে যাই" বলিয়া তিনজনে আগাইয়া চলিল।

যাইতে যাইতে গোবিন্দ কহিল, "আগে আমাদের বাড়ী হয়ে যেতে হবে, তারপর খাওয়া শোওয়ার বিবেচনা।"

অনন্ত করযোড়ে কহিল, "আজকের মত মাপ করুন। দেখছেন ত, এ পল্টন নিয়ে কি কোথাও যেতে আছে ?"

"তবে কবে আস্‌বে ?"

"এখনও ঢের হাঙ্গামা রয়েছে—মাঠে ধান রয়েছে বওয়া হয় নাই, এই সব ঝঞ্ঝাট ফেলে আমার গঙ্গা নাইতে আসাই অন্যায় হয়েছে।"

"তা বটে ভাই, তবে কি না অনেক দিন যাও নাই তাই বড় মন-কেমন করে, সে যা-হক রাত্রে উঠে পালিয়ে এসেছিলে কেন ?"

অনন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "পালিয়ে আসব কেন ?"

"পালিয়ে না হয় লুকিয়ে ত বটে।"

অনন্ত আর কোনও কথা কহিল না। জয়রাম আপন মনে গান করিতে করিতে চলিল।

এদিকে স্ত্রীলোকেরা পরস্পর গল্প করিতে করিতে চলিতেছে; প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় হাবুর মা কহিল, "দিদি ঠাকরোণ, মুরি না খেলে ত চলতে নারবো।"

রক্ষা বলিল, "আ মর, এই ভাত খেয়ে এলি, এখনও গলায় ভাত উঠছে এর মধ্যে মুড়ী খাওয়া ?"

"ক্ষিদে কি আমার লাগো গা ? এই নড়ি গাছটা বেয়ে আমার আরও ক্ষিদে নেগেছে" এই বলিয়া সেই তৈলপক্ব লাঠি গাছটা দেখাইল।

রাঙা ঠাক্‌রুণ বলিল, "তাইত, তুই আবার লাঠি কোথায় পেলি ?"

বামুনবেড়ের বউ বলিল, "এই লাঠি যে ঠাকুরপোর, সে ফেলে গেছে বুঝি ?"

কোঁদার বউ বলিল, "হাবুর মার পতিভক্তি আছে, দেখ সে ফেলে এসেছে ও ত ফেল্‌তে পারে নাই বাবু।"

হাবুর মা বলিল, "তোমরা গর্দ্দিই কর আর যাই কর আমি ত মুরি না খেয়ে নর্‌তে নার্‌ব।"

সন্ধ্যার আগেই সকলে কর্পূরডাঙ্গার মাঠে উঠিল। সেই কাঠওয়ালি বুড়ী বিধু কহিল, "দিঠাকরুন, সন্ধে হলে আমারও একটু রাত বাদে।"

হেমা কহিল, "এই মরেচেরে পোড়া-কপালী! তা হলে তুই এলি কেন?"

"তুমিইত বল্লে যে তোর নাতনীর বিয়ে, তা তোকে না বলুকগে, তুই চ আমি বলে কয়ে দিব তোর জামাইকে।"

"তবেই হয়েছে! নারদ শেষে ঢেঁকি ঘাড়ে করবে নাকি? তুই বল্লি আমি পুঁটুলি নিয়ে যাব—আর তুই সুধুই চল্‌তে পার্‌চিস না, তা আর পুঁটুলি নিবি কি করে?"

সকলে নিকটস্থ একটা বটবৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল এবং মুড়ি খাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর অনন্তের শ্বাশুড়ী কহিলেন, "মেয়ে, তোমরা আজ আর বাড়ী যেয়ো না, সবাই আমাদের বাড়ী থাকবে চল।"

রক্ষা কহিল, "সে কি হয় মা, বাড়ী যাব বইকি, সব ঘরকন্না ফেলে এয়েছি দুদিন বাড়ী-ছাড়া।"

"তা একটা রাত বইত নয় কাল সকালে উঠে বাড়ী যেয়ো।"

"আর তোমার জামাইয়ের যদি মত না হয়? সে সঙ্গে থাক্‌লে যা হয় হোত।"

"জামাইও চলুন তিনি না গেলে কি হয়? সেই অবধি বাছা যান নাই আর শ্বশুরবাড়ীর দোর দিয়ে কি রাত্রে বাড়ী যেতে আছে?—"

রাঙা ঠাকরুণ বলিলেন, "আর বউ সোমত্ত? তা তোমরা যা বল বাছা তোমাদের বলবার সম্বন্ধ।"

সহরের পাঠিকারা শুনিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন, যে উদ্যোগ আয়োজন

অকস্মাৎ দশ বার জন কুটুম্ব লইয়া যাইতে চাহিতেছেন কোন্ সাহসে?

অসময়ে একজন কুটুম্ব আসিলে আমরা বিরক্ত হইয়া উঠি আর পল্লীগ্রামের লোকে অর্দ্ধরাত্রে একপাল কুটুম্বকে নিজের গৃহে লইয়া যাইতে উদ্যত! সহরের লোকে পয়সা খরচে কাতর নহেন, কাতর একটু শারীরিক পরিশ্রমে। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর কেহ বই অথবা পশম্ লইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় কুটুম্ব আসিলে সেই বিশ্রামে ব্যাঘাত হয়, রাত্রে কুটুম্ব আসিলে লেপ ছাড়িয়া উঠিতে কষ্ট হয়! সেইজন্যই সহরের স্ত্রীলোকেরা অতিথির উপর বিরক্ত। তাঁহারা বলেন, "পাড়াগাঁয়ের লোক কি অসভ্য! তা না হলে এমন অসময়ে কি কুটুম্ববাড়ী আসতে হয় গা?—কিন্তু তাঁহারা এটুকু বুঝিতে পারেন না যে, পল্লীগ্রামবাসিনীরা কুটুম্ব বা অতিথি আসিলে কত দূর আপ্যায়িত হন; তাই তাঁহারা মনে করেন, আমরা যেমন কুটুম্ব পাইলে কৃতার্থ হই, আমাদের সহরবাসিনী ভগ্নীরাও বুঝি সেইরূপ হন, সেইজন্যই পল্লীগ্রামের লোকে সময়-অসময়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কুটুম্ববাড়ী যাইয়া থাকেন। কিন্তু সহরে কুটুম্বের বাটীতে অসময়ে উপস্থিত হইলে, প্রায়ই গৃহিণীর বিরক্তির সহিত দোকানের মিষ্টান্ন উপভোগ করিতে হয়। আর এক কথা; সহরের কুটুম্বিনীদিগের সেবার জন্য নানাবিধ দ্রব্য আয়োজন করিতে হয়, এমন কি, অনেক স্থলে ঋণ করিয়াও। পল্লীগ্রামের কুটুম্বিনীদিগের জন্য সে সকল কিছুই করিতে

পল্লীগ্রামবাসিনীরা নিজে যাহা নিত্য খাইয়া থাকেন, কুটুম্বিনীদিগকেও তাহাই দিতে সঙ্কুচিত হয়েন না এবং কুটুম্বিনীও তদপেক্ষা বেশী কিছু আশা করেন না। এটা সকলেই স্বীকার করেন যে, সহর অঞ্চলে মৌখিকতা অধিক আর পল্লীগ্রামে আন্তরিকতা অধিক। সহরের কোনও রমণী দুই এক দিনের জন্য কুটুম্ববাড়ী গিয়া জলের ঘটি লইয়া অথবা আহারের স্থান করিয়া লইয়া আহারে বসিতে অপমান বোধ করেন, কিন্তু পল্লীবাসিনীরা এক বেলার জন্যও কুটুম্ব-বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিতে অপমান বোধ করেন। কুটুম্বের বাটী গিয়া যদি তাঁহাদের আপনজনের মত রাঁধিতে, কুটনা কুটিতে, জল তুলিতে, উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে,—এমন কি গো-সেবা করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আর আত্মীয় কি ?

অনন্তের শ্বাশুড়ী জানিতেন, বাড়ীতে যথেষ্ট মুড়ি আছে, খেজুর গুড় আছে, একটা মহিষ এবং পাঁচ-ছয়টা গরুর দুধ প্রায় ১২।১৩ সের বাড়ীতে মজুত আছে, সুতরাং কুটুম্ব গেলে ভাবনা কি ? জামাতা এবং তৎসহচরের জন্য ক্ষীর হইবে ছানা হইবে এবং অন্যান্য সকলের জন্য মুড়ী, দুগ্ধ ও গুড়ই যথেষ্ট, তবে আর অতিথি-সেবায় ভাবনা কি ? সহজপুরে অর্থাৎ অনন্তের শ্বশুরবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলে অনন্তের শ্বাশুড়ী আর একবার সকলকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

তখন হেমা চুপে চুপে কহিলেন, "অত জিদ্ করে আমাদিগকে তোমার বাড়ী নিয়ে না গিয়ে যদি আমার একটা পরামর্শ শুন তবে সকল দিক রক্ষা হয়।”

অনন্তের শ্বাশুড়ী আগ্রহের সহিত কহিলেন, "কিমা, বল যদি ভাল হয়, তবে তাই করব।”

"আমাদের বউকে পাঠিয়ে দাও চুপি চুপি নিয়ে যাই, নইলে তোমার জামাই আর সে জামাই নাই, একেবারে বয়ে গেছে ! সে পিতিজ্ঞে করেছে নিজে আর কখনও সহজপুরে আসবে না আর বউকেও কখন নিয়ে যাবে না, আর যদি তোমরা রেখেও এসো তাহলেও ফিরিয়ে দেবে ! সেইজন্যই ত ওর মামি বউকে নেযেতে পারে না, নইলে অমন বউ কি আবার বাপের বাড়ী ফেলে রাখে গা ?”

অনন্তের শ্বাশুড়ি একেবারে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "কি দোষ আমার মেয়ের ?”

"দোষ গুণ আবার কি ? আর তার সে বিবেচনা করবার শক্তি রেখেচে গা ভালথাকি !”

অনন্তের শ্বাশুড়ী কহিলেন, "আমি বলি কি জামাইকে একবার বাড়ী নিয়ে গেলে হোত।”

হেমা কহিল, "নিয়ে না-হয় গেলে, কিন্তু একদিন নিয়ে গেলে কি হবে ? আবার তার পরদিন বাড়ী ফিরে গিয়ে যে-কে-সেই হবে তখন তুমি কি করবে ? তার চেয়ে আমার কথা শুন, বউটিকে পাঠিয়ে দাও আমাদের সঙ্গে, তাহলে সব গোল মিটে যাবে কি বল পার্ব্বতী ?”

পার্ব্বতী সহাস্যে কহিল, "তা বটেত।" পরে হেমার গা টিপিয়া কহিল, "কি কোরে তোর অত মিছা কথা বেরুল, তুই সব পারিস্ ভাই।"

হেমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "যথার্থই আমি সব পারি, ঐরূপ মিথ্যা বলে জুয়াচুরি করতে আমি বড় ভালবাসি।"

অনন্তের শ্বাশুড়ী কহিলেন, "তা বটে, তবে যা আমার ভয় হচ্ছে পাছে লোকে নিন্দা করে।"

হেমা। সে ভার আমার, আমি তার জবাব দিব।

অ-শ্বা। বেয়ান যদি রাগ করে?

হেমা। কে, জেঠাই-মা? সে এমন লোক নয় গো! বউ পেয়ে সে বর্ত্তে যাবে, কেবল ভাগ্নের ভয়ে বউ নিয়ে যেতে পারে না। তা নইলে কি এত দিন বউ বাপের বাড়ী থাকে?"

অ-শ্বা। সবকে পারি, যদি অনন্ত কিছু বলে? সে হয়ত আরও চটে যাবে, আমার সেই ভয় করে বাছা।

হেমা। ওগো সে ভয় তোমার কিছুই নাই।

অ, শ্বা। সব শুনে আমি ত হতবুদ্ধি হয়েছি। যাতে ভাল হয়, নিন্দা না হয়, তাই তুমি কর মা।

হেমা। আমি ভালই বলছি তোমার কোন ভয় নাই।

অ, শ্বা। একবার কর্ত্তাকেও বল না?

হেমা। তাঁকে না বললেও ক্ষেতি নাই।

অ-শ্বা। একবার গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করি কি বলে! হাঁ গা ওর গহনা কাপড় চোপড় সব বাড়ীতে আছে যে।

হেমা। সে সব তোমার ছেলেকে দিয়ে পরে পাঠিয়ে দিও।

অ, শ্বা। মনে করেছিলাম তেল পান মশলা দিব, আর-বার দিই নাই বলে বেয়ান কত রাগ করেছিল।

হেমা। আর বাপু সে রেখে দাও গে, আর এত কর্ত্তে হবে না।

অ, শ্বা। মিষ্টি সঙ্গে না দিয়ে পাঠাতে আছে কি?

হেমা। সে কি না আদায় কর্ব্ব? সে তোমার জামাইয়ের কাছ থেকে আদায় কর্ব্ব।

এইপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সকলে সহজপুরে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা অনন্তের শ্বশুরবাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। ঐ সেই দ্বার দেখা যাইতেছে, যে দ্বারের নিকটে মর্ম্মপীড়িতা সুলক্ষণা ক্রুদ্ধ অনন্তের পদদলিত হইয়াছিল। যে দ্বারের বাহিরে আসিয়া মায়া দয়া স্নেহ ভালবাসা পরিত্যাগ করিয়া পাষাণ-হৃদয় নিষ্ঠুর অনন্ত—অনন্ত আঁধারে মিশিয়া গিয়াছিল; কালরাত্রে যে দ্বারের নিকট আসিয়া পাষাণহৃদয় দ্রব হইয়াছিল, জয়রামের পরিহাস-চীৎকারে আত্মহারা অনন্ত যেখানে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অনিচ্ছায় যে দ্বার পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় চলিতে হইয়াছিল, যে দ্বার দেখিয়া একখানি বিষণ্ণ প্রতিমা অনন্তের স্মরণ হইয়াছিল, এবং প্রস্তরোদ্ভবা পবিত্র গঙ্গাবারির ন্যায়, পাষাণে নির্ম্মিত হৃদয়

দ্রবীভূত করিয়া দুইবিন্দু পবিত্র অশ্রু অনন্তের বিস্ফারিত নয়নপ্রান্তে দেখা দিয়াছিল, ঐ সেই বদ্ধদ্বার তেমনই বদ্ধ রহিয়াছে। সেই দ্বারের নিকট আসিয়া, তিনজন যুবাপুরুষ থমকিয়া দাঁড়াইল, প্রথম যুবক গোবিন্দ কহিলেন, "সে কি হয়, যা বলেছ একবার, দ্বিতীয়বার বলিও না।"

অনন্ত করযোড় করিয়া কহিল, "আজ-কের মত ক্ষমা করুন।"

গো। কাল তোমাকে পাব কোথায়?

অ। আপনারই বাটীতে।

গোবিন্দ অনন্তের যুক্তকর ধারণ করিয়া বলিলেন, "শালা বদমাস্, এত চাতুরী কোথায় শিখেছিলে?"

জয়রাম তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বলব? আমি বলচি কোথায় শিখেছে। বলব অনন্তদাদা?"

অনন্ত একবার জয়রামের দিকে মুখ ফিরাইলেন, জয়রাম হাসিল।

অতিকষ্টে অনন্ত গোবিন্দের হাত হইতে নিজ হাত ছাড়াইলেন, কিন্তু কথা এড়াইতে পারিতেছেন না। আজি গোবিন্দ অনন্তকে আটাকাটিতে জড়াইয়াছেন।

গোবিন্দ কহিলেন, "সেটি হবেনা, আজ তোমায় কিছুতেই ছাড়বনা।

অ। আপনি যে অঙ্গীকার করতে বল্‌বেন, আমি তাই করব, পরশু নিশ্চয় অস্‌ব।

গো।. আর তোমাকে বিশ্বাস নাই।

অ। কাল কৃষাণদিগকে কাজ দেখিয়ে দিয়ে পরশু আমি নিশ্চয় আস্‌ব, আর আমাকে বার বার লজ্জা দেবেন না, আমি নিশ্চয়—"

জয়রাম অনন্তের কথায় বাধা দিয়া বাঁকুড়াজেলার সুরে বলিল, "তাত বটেই, ছোক্‌রা বড় ভদ্দর আছে। ঐ যে কালো-পারা মরদটী বড় ভদ্দর, কোথোনো মিছে কথা কহেক নাই, জানেক নাই, উহার হাত কোথোনো কাহার গায়ে উঠেক নাই, উহার সোকোলি গুণ, কেবল সত্য কথা কহিতে আকটুকু খাট আছে।" বলিয়া জয়রাম দুইবার মস্তক সঞ্চালন করিলেন।

অনন্ত জয়রামের পরিহাস বুঝিয়া হাসিলেন, সহাস্যে কহিলেন, "তুই থাক্ জয়া, আমি আগে বাড়ী যাই, তোকে একবার পাট কর্ব্বো ভাল কোরে রে। তুই বাড়ী হতে বাহির হয়ে অবধি আমার পিছনে বড় লেগেছিস্। তোর যা মুখে আস্‌ছে তাই বলছিস্। যা মনে অস্‌াচে তাই করছিস্।"

জয়রাম কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিল, "ওর খোসামোদে কাজ নাই, চক্রবর্ত্তী তুমি আমাকে নিয়ে চল। ও না যায় নাইবা গেল, ভারি ত জামাই।"

অনন্ত সহাস্যে কহিল, "সেই ভাল। আজ আমি বাড়ী যাই জয়রাম, তুই আমার প্রতিনিধি হয়ে শ্বশুরবাড়ী কোরে আয়।"

গোবিন্দ অনন্তের কাণ ধরিয়া কহিলেন, "শালা কাজে নাই কথায় আছে।"

এমন সময় ত্রস্তভাবে অনন্তের শাশুড়ী ঘোমটা দিয়া আসিয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন, তাহাকে দেখিয়া অনন্ত ও জয়রাম তাড়া-তাড়ি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

গোবিন্দের মাতা সংক্ষেপে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ...

গেলেন, যাইবার সময় গোবিন্দ বলিয়া গেলেন, "আমি না আস্‌লে যেন তোমরা যেও না।"

অন্তরালে লইয়া গিয়া মাতা, পুত্রকে হেমাঙ্গিনী প্রমুখাৎ যা কিছু শুনিয়াছিলেন সমস্তই বলিলেন, এবং হেমা যে সুযুক্তি দিয়াছেন তাহাও বলিলেন। গোবিন্দ একটু চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও কথা, কথাই নয়। অনন্ত যে অত বয়ে গেছে ওকথা আমার বিশ্বাস হয় না।"

গো, মা। অতগুলো লোকে কি মিছে কথা বল্‌ছে।

গো। তার আর আশ্চর্য্য কি? সকলেই ত মাগী, ওরা সব পারে।

গো, মা। তা যাই বল সুলক্ষণাকে পাঠাতেই হবে।

গো। তাতে আমার আপত্ত নাই, তবে একবার বাবাকে বোল্লে হোত না?

গো, মা। না বাছা তার দরকার নাই, তিনি তাতে রাগ কর্‌বেন না, তাঁকে বলতে গেলে অনন্ত শুন্‌তে পাবে, হেমা বলেছেন অনন্ত যেন না শোনে।"

গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, "সুলক্ষণা কি বললে, যেতে রাজি আছে?"

গো-মা। তারও বোধ হয় মত আছে, কেননা তার সঙ্গে পরামর্শ করেই হেমা আমাকে বল্‌লে, স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জন্মালে কোন্ রমণী স্বামীর কাছে থাকৃতে বাসনা করে না বাবা?"

গোবিন্দ আবার হাসিয়া বলিলেন, "অনন্ত সে ছেলেই নয়।"

গো-মা। সুলক্ষণা ছেলেমানুষ তাই আজও অনন্তকে চিন্‌তে পারে নাই, যাই হোক তুমি তাকে বারণ করে দিও এবার যেন অনন্তের সঙ্গে ঝগড়া না করে।

গোবিন্দ মনে মনে কহিলেন, "অনন্ত কোষ্টিপাথর আর সুলক্ষণা সুবর্ণ প্রতিমা। অনন্তের একটী বাক্যরূপ ঘর্ষণে সুলক্ষণার হৃদয় একটু ক্ষয় হইয়াছে ও তাহাতে সুলক্ষণা অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।"

গোবিন্দের মাতা কহিলেন, "বাড়ীতে গিয়ে অনন্ত যখন দেখতে পাবেন, তখন সুলক্ষণাকে কি বলবেন জানিনা, হয়ত বাছা কতই কাঁদবে।"

গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, "তুমিত আগে কাঁদ, তারপর তার ভাগ্যে যা হয় হবে। বাড়ীতে বোলবে আবার কি? সে এমনি ক্ষেপেছে কিনা তাই বোলবে।"

চক্ষু মুছিয়া মাতা কহিলেন, "কি জানি বাবা?"

মাতাপুত্রে ফিরিলেন, গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, "দ্বারে দাঁড়িয়ে কেও?"

অ। (সহাস্যে) আজ্ঞে আমরা অতিথি।

গো। এতরাত্রে আমরা অতিথিকে স্থান দিইনা, ফিরে দেখ।

গোবিন্দ দ্বারে আঘাত করিয়া বাবা, বাবা, বলিয়া ডাকিলেন। তাহাদের সাড়া পাইয়া গোবিন্দের পিতা আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন।

এদিকে জয়রাম ও অনন্ত অবাক হইয়া ক্ষণেক তথায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে প্রস্থান করিলেন।

গোবিন্দের ভয়ে তাঁহার মাতা প্রকাশ্যে কাঁদিতে পারিলেন না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে

অনন্তের শ্বাশুড়ী যাত্রীদের দলে যাইয়া মিশিলেন। যাইবামাত্র হেমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি মত হল গো তোমার ছেলের ?"

গো-মা। ছেলের অমত কিছুই নেই—তুমি যা মত কোরেছ তা বুঝেই করেছ। তবে আমি আর বেশী কি বলব ? তোমার সঙ্গে পাঠাচ্ছি তুমি একটু নজর রেখো, যেন বাছা আমার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদেনা।

হে। না আবুই-মা, তোমাকে সে ভাবতে হবে না।

সুলক্ষণার মাতা কাঁদিলেন, মাতার রোদন দেখিয়া সুলক্ষণাও কাঁদিল। তার পর প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ শেষ হইলে সকলে আবার চলিতে লাগিল, যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ সুলক্ষণার মাতা পথে দাঁড়াইয়া কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন, সুলক্ষণাও কাঁদিতে কাঁদিতে পিছনে চাহিয়া চাহিয়া যাইতে লাগিলেন।

ক্রমে যাত্রীমণ্ডলী সহজপুরের মাঠে পড়িলেন। যাইতে যাইতে হেমা কহিল, "ভাই পার্ব্বতী! আমরা যে বউকে নিয়ে যাচ্ছি তা ভাই কাকেও বলা হবে না।"

পা। সে কি করে হবে, এত পথ কি করে নিয়ে যাবি ?

হে। আমরা একটু পেছিয়ে পড়ব।

পা। তা হলে হতে পারে!

অনন্ত ও জয়রাম ধীরে ধীরে চলিতেছেন ও কথা কহিতেছেন।

অ। ব্যাপার বুঝতে পারলেম না।

জ। কি জানি দাদা, মায়ে বেটায় কি পরামর্শ করে এলো, আর অমনি আমাদিগকে ফিরিয়ে দিলে।

অ। ভাল হল—

"যাহারে ডরাও তুমি,
সেই সে যোগাস্থা আমি॥"

যে ভয়ে অনন্ত বলিলেন, ভালই হইল, সে ভয় আর কতক্ষণ থাকিবে ?

হেমাঙ্গিনী যাহা প্রতিজ্ঞা করে তাহা অলঙ্ঘনীয়, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই, হেমার প্রতিজ্ঞা কখনও কাহারও ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট সাধন করে না।

পশ্চাৎ হইতে ভূতোর মা হাঁকিল, "দাঁড়াও গো, আর ফেলে যেও না।"

জয়রামও সেই সুরে হাঁকিল, "এস এস চলে এস।"

অনন্ত। মাগীরা আদরে চলতে পারে না।

স্ত্রীলোকেরা আসিয়া জুটিল।

অনন্ত কহিলেন, "তোমরা যে অনেকগুলো দেখ্ছি, গোলমাল হয়ে দুই একটা বাজে লোক এসে পড়েনি ত ?"

হে। আসে যদি তবে তোমার বাড়ী অতিথি হবে।

অ। আমার বাড়ী অতিথি হলে বড় সুখ হবে।

রক্ষা। কেন ?

অ। তাহলে আজ রাত্রে বকুলতলে বসিয়ে রেখে দেব, তারপর কাল অতিথি সেবার ব্যবস্থা হবে।

হে। হবে বইকি! তাহলে তোমার নাক কেটে ঝামা ঘসে দোবো, জাননা বুঝি ?

দলস্থ সকলে হাসিয়া উঠিল।

রক্ষা কহিল, "মরণ আরকি, তোর না ভাই হয় ?"

হে। ভাই হল ত বয়ে গেল কি ? অন্যায় দেখবো চোটপাট বোলবো, ভাইত কোন ছার, গুরু কেননা হোকনা।

অনন্ত নীরব রহিলেন। ক্ষণেক পরে বিধু কহিল, "দিঠাকরোণ আমি আর চলতে নারবো।"

পার্ব্বতী কহিলেন, "চলতে নারবি ত কোথা থাকবি ?"

বি। যাবুনি কেনে ! যাবো, তবে আমার রাত বাদে, হাতটা ধর।

রক্ষা। ও জয়রাম, লক্ষি দাদা আমার, ওর হাতটা ধর ভাই।

জ। কে ও মাগী ?

হে। মেঘার শ্বাশুড়ী।

বিধুর কথা শুনিয়া অনন্তের অন্যমনস্কতা ভঙ্গ হইল। অনন্ত মনে করিলেন, এ ত দেখছি সেই কাঠওয়ালী মাগী !

প্রকাশ্যে কহিল, "মেঘার শ্বাশুড়ী ?"

বা-বৌ। তোমারই "বেয়ান", তোমার কিরসেনের শ্বাশুড়ী।

জ। অনন্তদা, তোমার উচিত বেয়ানের হাতটা ধরা।

অ। আমার সঙ্গে প্রথম চোটে বড় আলাপ হয়েছিল বেয়ানের সঙ্গে।

হে। কোথাও কাট কিনতে গিয়ে নাকি ?

ভূ-মা। আলাপটা কি রকম ?

অ। তা খুব ! আমি যে বলেছি কাঠ, অমনি বেয়ান আমার বলে উঠ্‌ল ঘাট এখানে কোতা রে ডেগোর, ঐ মড়া-ঘাটায় যা।

র। তবেত খুব আদর করেছে তোমাকে।

অ। আমার আর একটা কথায় বড় রাগ হয়েছিল।

জ। তোমার রাগ ত সকলকারি উপর।

অ। যথার্থ, আমি ওকে খুব ছেলে বেলায় দেখেছি, তারপর আর দেখি নাই, মাগীকে চেন-চেন করচি কিন্তু চিন্‌তে পারচি না, তারপর ওর সুমিষ্ট কথা শুনে আর দাঁতের বাহার দেখে অবাক হয়ে ওর মুখপানে চেয়ে আছি, আর তাই দেখে মাগী কিনা বলে "আমার ত চেঙ্গড়া বয়েস নয়রে ডেকরা, তুই কি দেখছিস্ হা করে ?' আমি যেন ওঁর বয়েস দেখ্‌ছিলাম।

রাঙ্গা। তা বটেত, ও মেয়েমানুষ আর তুমি পুরুষমানুষ ওর দিকে তোমার চাওয়া কেন !

অনন্ত কহিলেন, "ডানদিকে একটা খানা আছে কেউ যেও না।"

কিন্তু বলিতে না বলিতে বিধু সেই গর্ত্তে পড়িয়া গেল। অনন্ত কহিলেন, "বেশ হয়েছে, মাগী কালা নাকি ?"

বা-বউ। সত্যই ও কালা, আহা পড়ে গেল !

জয়রাম তাড়াতাড়ি আসিয়া বিধুকে তুলিয়া বলিল, "কেন, তোমার হাবুর মা পড়ুগ না, ও কেন পড়বে।

অ। তবে পড়চে কেন, ধরে রাখনা।

জ। না ধরে রাখবে না, এই ত ধরে নেযাচ্ছি, আরত পোড়তে দিব না। তোমার হাবুর মাকে কি করবে কর।

অনন্ত আর কোন কথা কহিলেন না, কেবল হাসিলেন।

হাবুর মা কহিল, "দিঠাকরুণ আমিত চলতে নারবো, মুরি চাট্টি না খেয়েত পরাণ বাঁচে না।"

হে। আ মর মাগী, ডণ্ডে ডণ্ডে মুড়ি খেতে হয় নাকি?

হা। আমি তখন দুটি খেয়েছেলাম শেষে বেঁধেছেলাম।

রা। তা বেশ করেছ এখন বসে বসে মুড়ি খেতে গেলে ত চলবে না, খেতে খেতে চ।

কাজেই হাবুর মা মুড়ি খাইতে খাইতেই চলিল।

জয়রাম কহিল, "অনন্তদা, ও আলোটা কিসের গা? কোথা জ্বলছে বল দেখি?"

অনন্ত হাসিয়া কহিল, "বোধ হয় বাঁকার ধারে। ও যে কিসের আলো তাকি আর বোলতে হয়!"

হাবুর মা মুড়ি খাইতে খাইতে ছুটিয়া আসিয়া অনন্তকে স্পর্শ করিল।

অ। পালিয়ে এলে যে?

হা। ও আলা ত আলা নয়। ও যে পেত্তার আলা।

অ। (কৃত্রিম ভয়ে) তাইত কি হবে? ঐটেই ত আমাদের যাবার পথ। হাবুর মা, তুমি এগিয়ে চল আমার বড় ভয় হচ্ছে।

হা। আর গিয়ে কাজ নাই তুমি ফিরে চল।

অ। কোথায়?

হা। সহজপুরে।

অ। বটে, সেই বুঝি সহজ কথা!

হা। হেই মা, আমি কেন মত্তে এসেছেলাম গা! আমি আত ঠাঁই থাকতে পেত্তার হাতে মলাম গা। ডবকা পরাণটাকে খোয়াতে এলাম গা? কেনে মত্তে গঙ্গা নাইতে এলাম গা?"

কাল প্রায় সমস্ত রাত মাঠে মাঠে সকলে হিমে হিমে চলিয়াছে, আজিও রাত্রে সকলে হিমভোগ করিতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সর্দ্দি হইয়া নাকের জলে চখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

হাবুর মার ভয় ও পেটের জ্বালা দুই সমান হইয়াছে; সে মনে করিল আজ যদি মরিতে হইবেই তবে মুড়ি কটা না খাইয়া কেন মরিব!

হাবুর মা যেমন এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরিল ওমনি তাহার নাক সম্বড়্ করিয়া হাঁচি আসিল ও হাঁচিয়া ফেলিল, আর যত মুড়ি হাবুর মার মুখ হইতে বাহির হইয়া তার সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িল, কতক অনন্তের গাত্রে, কতক জয়রামের গাত্রে ও কতক-বা বিধুর গাত্রে ছড়াইয়া পড়িল, অনন্ত তাহার দেশী আলোয়ান তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া ফেলিল।

জয়রাম ও গাত্র-বস্ত্র ঝাড়িয়া ফেলিলেন ও বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিলেন। রক্তনেত্রে কহিলেন "কেন বল্ দেখি মাগী, আমার সঙ্গ নিয়েচিস্, যেতে আস্তে কেবল আমার গায়ে লাল দিচ্চিস্? নে মাগী, চিমটে নে, বল মাগী বল্—

সত্ কুকুরে হেঁছে দিলে।
পত কুকুরে চেঁচে নিলে॥

বল্, বোলে চিমটে নে, নইলে দেখাব মজা, মাগী যেন আমাকে আঁস্তাকুড় পেয়েছে" এই বলিয়া জয়রাম

উঠাইল, কিন্তু অনন্ত তাহার হস্ত ধরিয়া ফেলিল। অগত্যা হাবুর মা হাঁচির প্রতিকার করিল। জয়রাম মুখভার করিয়া বলিলেন, "মহালক্ষ্মী আমার সঙ্গে নাইতে যাবে যদি জানতে, তবে আগে থাকতে সঙ্গে একটা জোলাপ নিতে হয়।"

অ। আঃ, আর বকিস্ নে জয়া।

হা। বলত দাঠাকুর, আমি ওকে আকড়েছি, না ঐ আমাকে আকড়াচ্ছে, এই মাঝ মাঠে আর আত্তির কাল আর ডাইনে বাঁয়ে সদবা বিটি ছেলে, আর এই তোমার নড়িহাতে আর ঐ আগে পাছে বামুন আর হাতে বেতে মা লক্ষ্মী, (মুখে মুড়ি) আমি যদি আগে আ কেড়ে থাকি তবে যেন ঝী-বোয়ের মাতা খাই।

জ। আমি যদি ওকে আগে রাকেড়ে থাকি তবে যেন সেই বুড়ো ভেড়ার মাথা খাই।

হে। আমর! তুই এখনও মা লক্ষ্মীকে জাবর কাটছিস্?"

জ। তুমি কি রাকেড়েছ, তুমি রাকাড়ার বাবা ঝেড়েছ।

সকলে বিট্‌বে ছাড়িয়া হরিণ-ডাঙ্গায় প্রবেশ করিল।

কোঁদার বউ। "আমিত আর চলতে নারব এই বস্‌লাম" বলিয়া বসিয়া পড়িল।

অ। তবেই হয়েচে, এই রকম চললেই আজ বাড়ী গিয়ে পৌঁচেচ।

বা-বউ। তা বল্লে কি হয়, তোমার পায়েত আমরা চলব না। আমাদের এই রকমই চলন্। বলিয়া সেও বসিয়া পড়িল; তখন একে একে সকলেই বসিল।

অবশেষে অনন্ত ও জয়রামও বসিলেন। হেমা ও পার্ব্বতী সুলক্ষণাকে অতি যত্ন করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মর্ম্মপীড়িতা সুলক্ষণা সভয়ে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, অনন্ত যে হাবুর মা, বিধু ও জয়রামকে লইয়া এত রহস্য করিতেছেন, তাহা কি সুলক্ষণার ভাল লাগিতেছে! যখন অনন্ত জানিতে পারিবেন যে সুলক্ষণা পদব্রজে তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, তখন যে তাহার অদৃষ্টে কি আছে তাহা ভয়বিহ্বলা সুলক্ষণা ধারণাতেই আনিতে পারিতেছিল না।

হেমা কহিলেন, "আর নয় উঠ"।

ভূ-মা। এরি মধ্যে উঠতে হবে? আমার যে কান্না আস্‌চে গা!

রা। ওলো আমারো তাই।

অ। তাইত ঠাকরুণ-দিদি, তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথা, তোমার যে সাড়া শব্দ পাই নাই।

রা। আমি? আমার এতক্ষণ ঢুল আস্‌ছিল।

অ। চল্‌তে চল্‌তেই নাকি?

রা। হাঁ ভাই, চলে চলে পা বেথা করছিল নাকি তাই ঘুম পাচ্ছিল।

জ। বেশ আরামের ঘুম বটে।

হে। আর দেরী করো না উঠ।

ধীরে ধীরে সকলে উঠিল এবং উহু আহা করিয়া চলিতে লাগিল,—সকলেরই পা ফুলিয়াছে।

রা। উহু মাগো, পা আর বাড়াতে পার্চ্ছিনা লো হিমি! তুই আর এমন করে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাস্‌নে,

এমন জানলে তোমার সঙ্গে আসতাম নালো!

হে। আমার দরকারে তোমাকে নে-যাচ্চি কি না? তোর নাকে দড়ি দেওয়ায় কাজ কি?

পা। আমরা এত মাগো বাবাগো বলচি কিন্তু বেটাছেলেরা বেশ চলছে। কই কেউ কিছুই ত বলে নাই, ধন্নি ওদের পা যাহোক!

রা। ওদের ভাবনা কি বল, ওরা ইষ্টাসিন পায়ে দেচে, জুতো পায়ে দেচে, ওদের ভাবনা কি বল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ অনন্ত চমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং পশ্চাৎদিকে চাহিলেন।

বা-বৌ। ঠাকুরপো, দাঁড়ালে যে, কি দেখ্‌চো?

অ। কিছু নয়।

কোঁ। আরত চলতে পারিনা, কেন যে মর্‌তে এসেছিলাম।

একটু অগ্রসর হইয়া জয়রাম হাঁকিল, "ওগো একটা মড়ার মাথা"।

পশ্চাৎ হইতে স্ত্রীলোকেরা হাঁকিল 'হুঁস্বো'। দুই একজন 'হুঁস্বো' বলাতে হেমা হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঠে আসিতে আসিতে সকলেই হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে আসিয়াছিল, তখন অনন্ত বিরক্ত হয় নাই, কিন্তু এবার হেমা হাস্য করাতে অনন্ত ধমক দিয়া কহিলেন, "অত হাস্‌চ কেন, চুপ করে কি আসতে পার না?"

রা। ওরে হাস্থগ হাস্থগ, ওদের এখন হাসবার বয়েস তা আমাদের না

অ। হাসবার আর কাঁদবার বুঝি আবার বয়েস আছে!

রা। আছে বই কি!

অ। তবে কাঁদবার বয়েস কোন্‌টা?

হে। পনর বৎসর।

অনন্তের গ্রহ, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে কাঁদবার বয়স কোন্‌টা?

হেমার উত্তরে অনন্তের বক্ষে যেন মুষ্ট্যাঘাত হইল; সে ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে রহিল। দশমাস পূর্ব্বের একটা নির্দ্দয় ব্যবহার তাহার মনে পড়িল, সে আপনাকে আপনি ধিক্কার দিল।

পা। হেমা, তোর শ্বশুড়বাড়ীর হতে গঙ্গা কতদূর?

হে। কি জানি ভাই! ও সব ধার ধারি না।

পা। তোর বিয়ে কিছুই মনে পড়ে না?

হে। কিছুনা, কখনও বিয়েও করি নাই, বরযাত্রও যাই নাই।

পা। শ্বশুরবাড়ী না হয় যাস্ নাই কিন্তু বিয়ের কি কিছুই মনে পড়ে না?

হে। পড়ে একটু একটু। একজনকার টোপর দেখিয়া একদিন কেঁদেছিলাম, তা ভাই টোপরটি আমায় দিলে না, একটা পাতি হাঁস না পাতি ময়ূর কি পরিয়ে দিলে। তাই মনে আছে।

এই সকল কথা পার্ব্বতী ও হেমা চুপে চুপে কহিতেছিলেন। সকলেই কথা কহিতেছেন কেবল অনন্ত নীরবে চলিতেছেন। চলিতে চলিতে অনন্ত আবার পশ্চাতে

বা-বৌ। এতগুলো মেয়ের দিকে বার বার তাকাচ্চ কেন বলত ?

অনন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল "তোমাদের দলের মধ্যে কাহার পায়ে মলের শব্দ পাচ্চি ? যাবার সময়ত কারো পায়ে মল দেখিনি !"

হেমা তাড়াতাড়ি সুলক্ষণার গা-টিপিয়া বলিলেন, "আমর পোড়ার মুখী, মল গুলোকে গোঁজ,—হেঁটোর উপরে তুলে রাখনা মড়া ! টের পেলে এখুনি এই মাঝ মাঠে তোকেও মারবে, আমাকেও বক্‌বে—জানিসনা নেকি ?"

ভয়ে ভয়ে সুলক্ষণা মল গুলাকে পায়ের উপর গুজিল।

সুলক্ষণা ! আজ তুমি নূতন হইয়া অনন্তের বাটী যাইতেছ নাকি ? তুমি কি অনন্তকে চেননা ? কোনদিন অনন্ত তোমাকে প্রহার করিয়াছে কি ? কিম্বা অনন্ত তোমাকে কোনদিন ধমক দিয়া কোন কথা বলিয়াছে কি ? তবে তাহাকে তোমার এত ভয় কেন ? যদি বল, তাহা হইলে জানিও সেইদিন তোমারই দোষে তুমি অপমানিত হইয়াছিলে, তোমারই দোষে তুমি পদদলিতা হইয়াছিলে।

"তুমি কি জান না যে, পুরুষ জাতি লেবুর সমান ; যে রমণী লেবুর অম্ল রস বাহির করিয়া লয়, সেই রমণী সুগন্ধি অম্ল রসে জিহ্বা পরিতৃপ্ত করে। আর যে রমণী লেবু হইতে অধিক রসের প্রত্যাশা করে সেই তিক্ত রসে পরিপ্লুত হয়। দেখ আট মাস পূর্ব্বে তুমি না হয় বুঝিতেই পার নাই, একটু বেশী নিঙড়াইয়াই ফেলিয়াছিলে, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত তুমি তিক্ত রসে প্লাবিত আছ। আজি হইতে জানিয়া রাখ, ডাবের জল যেরূপ ক্লান্তিনাশক ও শান্তি-জনক, লেবুর রস সেরূপ নহে। বিশ হাত উচ্চ হইতে ডাব ভূপতিত হয়, কিন্তু ডাবের তারতম্যের কিছু প্রভেদ হয় না। আর লেবু যদি দ্বিহস্ত উচ্চ হইতেও পতিত হয়, তবে তাহাতে অম্লরস কমিয়া গিয়া তিক্ত রস বৃদ্ধি পায়। একটী দুর্ব্বাক্যে পুরুষ হৃদয় যত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, শত অশ্রাব্য বাক্য শ্রবণেও রমণীর হৃদয় ততটা উত্তপ্ত হয় না অথবা কর্ত্তব্যপালনে বিরত হয় না।

সকলে বাঁকা পার হইয়া স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

কোঁদার বউ কহিল "আর কতদূর আছে জেঠাই-মা ! আমিত আর চলতে পারি না।"

বা। বাবা, শাস্তরে বলে :—

নাদাই
পথে বসে কাঁদাই।

তাকি মিথ্যা হবে ?

ভূতোর মা কহিল, "উহুঃ মাগোঃ ! পাটা ফেটে-চোটে আক্‌সা হয়ে গেছে, উতিই আমি গঙ্গা নাইতে যাই নাই, তা পাড়ার আবাগী রে কি বুঝে গা ? ক্যাবোল বলে গঙ্গা নাইতে যাও নাই কেনে ? উহুঃ মাগো ! পরাণ গ্যাল, এবার ত আগে বাড়ী যাই, আর কখন এমন কুকাজ কর্‌বনি।"

ভূতোর মায়ের মতন আরও দুই এক জনে কান্না ধরিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল, এমন কুকাজ তারা আর কখনও করিবে না।

হেমা কহিল, "রক্ষে দিদি, সেদিন তোর বিয়েটা হতে-হতে হোল না কেন?"

র। (সহাস্যে) বর পাওয়া গেল না যে!

বা-বৌ। আজ ত বর আছে, তবে বিয়েটা হয়ে যাক্।

কোঁ। হাঁ হাঁ সেই ভাল কথা, বর কই?

পা। বিধু বর হবে।

হে। না না, বিধু কনে হোক, আর জয়—

বা-বৌ। (বাধা দিয়া) না, না, বিধু কনে হক, আর ঠাকুর-পো, তুমি বর হও।

অ। (সহাস্যে) ওরে জয়া! তোর যে আবার বিয়ে উপস্থিত।

জ। বিয়ে যদি কর্ত্তেই হয় তবে মেয়ে-মানুষকে ত আর নয়। এ-জনমে বিয়ে? আমার ত আর কখনও নয়ই, বরং যদি দেখি কোন বেটাছেলে কোন মেয়েকে বিয়ে করছে তাহলে তখনি গিয়ে আমি সে বিয়ে ভাঙ্গিয়ে দেবো।

অ। কেনরে, মেয়েদের উপর তোর এত ঘৃণা কেন?

জ। তুমি আবার জিজ্ঞাসা করচ? কেন, মনে মনেই ভেবে দেখ না কেন।

ক্রমে ক্রমে সকলে স্বগ্রামে প্রবেশ করিলেন, আর কাহারও মুখে হাসি বা কোন কথা নাই, সকলেই নিস্তব্ধ।

রক্ষা কহিলেন, "হেমার মোটটা দাও বেয়ান, ঐ তোমার জামাইবাড়ী দেখা

ক্রমে ক্রমে একে একে ভূতোর মা, রাঙা ঠাকরুণ, হাবুর মা, বামুন-বেড়ের বৌ ও কোঁদার বৌ প্রভৃতি স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পরে জয়রাম বিদায় লইল; তারপর রক্ষে ও পার্ব্বতীও চলিয়া গেল। অনন্ত আগাইয়া গিয়াছে, আপনার বাড়ী ছাড়াইয়া বরাবর চলিয়াছে। সুলক্ষণাও নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে যেন হাড়কাঠে গলা দিতে যাইতেছে! হেমা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

হেমা ডাকিল, "অনন্ত! একটু দাঁড়াও।"

অনন্ত চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন; দেখিলেন হেমা ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটি স্ত্রীলোক আসিতেছেন।

হেমা কহিল, "অনন্ত, দাঁড়াও।"

অ। কেন দাঁড়াব?

হে। তোমাকে একটী কথা বল্‌ব।

অনন্ত দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ থাক, কাল কথা বলিও।"

হেমা ক্রমশ অগ্রসর হইতেছেন আর কথা কহিতেছেন। অবগুণ্ঠনবতী সুলক্ষণাও কম্পিত পদে হেমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতেছেন।

অনন্ত সুলক্ষণাকে ভাল চিনিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু সেই অপরিচিত রমণীর দিকে বিস্মিত চোখে চাহিয়া আছেন আর হেমাঙ্গিনীর সহিত কথা কহিতেছেন।

অনন্ত বলিলেন, "আজ থাক, কাল বোলো।"

হে। আজই বল্‌ব, এখনি তোমাকে

অ। আজ আমার বড় পা ব্যথা করছে, শীতে বড় কষ্ট হচ্ছে। আজ তোমার কথা শুন্‌তে পার্‌ব না।

হে। এখনি বল্‌ছি।

অ। তবে আর এগিয়ে এস না, ঐখান থেকেই বল, কি বল্‌বে।

হে। আর একটু কাছে যাব।

অ। আর না, যা বল্‌বে ঐখান থেকেই বল।

কৌতুকময়ী হেমা সহাস্যে কহিল, "বলি। তেলি হাত ফোস্‌কে গেলি," বলিয়াই সুলক্ষণাকে এক ধাক্কা দিয়া আবার বলিলেন, "তেলি যার ধন সে পেলি" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সরলা সুলক্ষণা চতুরা হেমাঙ্গিনীর মত্‌লব বোঝে নাই, অসাবধান হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, হেমার ধাক্কা খাইয়া সজোরে অনন্তের বক্ষে গিয়া পতিত হইল; এবং সে আঘাত সম্বরণ করিতে না পারিয়া অনন্তও দুই চারি হাত পিছাইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে আত্মহারা হইল, ক্ষণেকের জন্য উভয়ে বাক্যহারা হইল। উভয়েই অপ্রতিভ। স্পর্শেন্দ্রিয় অনন্তের নিকট সুলক্ষণাকে চিনাইয়া দিল।

হেমা তখন একেবারে অদৃশ্য!

এখন সুলক্ষণা আর যায় কোথা? বড় শীত এবং যাতায়তের পথশ্রমে উভয়েই কাতর হইয়াছে, অনন্ত আর দাঁড়াইতে পারিল না, সুলক্ষণাকে বলিল, "বাড়ী এস!"

সুলক্ষণা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্ত সুলক্ষণার হাত ধরিয়া কহিল, "বাড়ী এস!"

তথাপি সুলক্ষণা নড়িল না। অনন্ত সহাস্যে আবার কহিল, "যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিলেন তবে এ অধমের বাটীতে পদার্পণ করিলে কৃতার্থ হইব।"

সুলক্ষণা অধিকতর লজ্জিত হইল। মনে করিল, আপনি উপযাচিকা হইয়া পদব্রজে আসিয়া ভাল করি নাই।

সুলক্ষণা ভয়ে দুঃখে অভিমানে রাগে ও শীতে কর্ত্তব্যহারা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অবশেষে অনন্ত সুলক্ষণার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

সুলক্ষণা আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাতে অনন্ত মহা বিপদগ্রস্ত হইল এবং হেমার উপর তাহার বড় রাগও ধরিল।

অনন্ত আবার সুলক্ষণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে আস্‌বে না?"

কম্পিত কণ্ঠে সুলক্ষণা কহিল, "না।"

অ। তবে এলে কেন?

সু। তোমাকে একবার দেখতে এসেচি।

অ। দেখা ত হল, এইবার ফিরে যাও।

সুলক্ষণা নিরুত্তর, অনন্ত এইবার বাক-চাতুর্য্য ধরিল, সহসা কৃত্রিম ভয়প্রদর্শন করিয়া মৃদু চীৎকারে বলিল, "ঐগো! কে বকুল গাছে বসে পা দোলাচ্ছে।" বলিয়াই দৌড় দিল এবং প্রায় বিশ হাত দূরে ছুটিয়া গিয়া একটা দ্বারের নিকট দাঁড়াইল।

সুলক্ষণাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া অনন্তের আলোয়ান ধরিল এবং হাঁপাইতে লাগিল।

অনন্ত স্বহাস্যে কহিল, "এইবার পথে এস, সোজা আঙ্গুলে ত ঘি ওঠে না, এখন এলে ক্যান?

সু। তুমি যে ভয় দেখালে।

অ। (নাকিসুরে) আমি বুঝি ভয় দেখালাম? তুমিই ত আমাকে বল্‌লে যে আমি তোমার কাছে যাব না, ঐ বকুল গাছে বসে যে পা দোলাচ্চে আমি ওর কাছে যাব।

সু। আমি বুঝি তাই বল্লাম?

অ। (নাকিসুরে) তবে কি বল্লে?

সু। যাও!

অ। আচ্ছা ভাই! আমি সে দিন রাত্রে চলে এলে পর তোমার দাদা কি তোমায় বকেছিলেন?

সু। দাদা আবার কি বলবেন? তুমি যেমন, আমার উপর তোমার ত দয়া মায়া কিছুই নেই। আমার দুঃখ তুমি যেমন বোঝ না, দাদা তেমন নয়।

অনন্ত আর সুলক্ষণাকে কথা বলিতে দিল না—সেই গভীর রাত্রে জনশূন্য পথে হা-হা করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল এবং সুলক্ষণার শীতবস্ত্র হুস করিয়া খুলিয়া দিয়া বলিল, "বেশ, বেশ, তুমি তবে ভাল করে দেখেচ যে আমি যেমন, তোমার দাদা তেমন নয়, আমার চেয়ে—"

সুলক্ষণা অনন্তের মুখ চাপিয়া ধরিল, অনন্ত দন্তাঘাতে সুলক্ষণার হাত সরাইয়া দিয়া উচ্চস্বরে ডাকিল, "ওরে গদা, দোর খুলে দে!"

অনন্তের কৃষাণ গদা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া সুলক্ষণার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "উনি কে গা মশাই?"

অনন্ত কৃত্রিম ভয়ে শিহরিয়া কহিল, "ওকথা আর বলিস্ নে গদা! আমি রূপবান্ পুরুষ কি না! যেখানে যাই সেইখানেই বিপদ! বেনে-পুকুরের পাড় দিয়ে আস্‌ছিলাম, সেখানে একটা চাঁপা গাছ আছে জানিস্ ত?"

গদা। এজ্ঞে হাঁ, জানি বই কি, বল না তুমি, তেনাকে সবাই চেনে।

অ। (হাসিয়া) সেই চাঁপা গাছে বসে উনি পা দোলাচ্ছিলেন, আমি যেই সেখানে এসেছি, অমনি অনুগ্রহ করে উনি আমার স্কন্ধে পদার্পণ কল্লেন! আর রক্ষে নাই, আমি ত গেছিই—তুইও আর এদিকে চাস্‌নে, আবার তোকেও অনুগ্রহ করলে আমার আর মাঠের ধান বাড়ী আসবে না।

গদা মুচি অনন্তের অত কথা শুনে নাই, যেমন শুনিয়াছে "স্কন্ধে পদার্পণ—" অমনি সে "অ্যাঁ" করিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পথশ্রান্ত দম্পতী অনতিবিলম্বে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে গ্রামে প্রচারিত হইল, গঙ্গাস্নানে গিয়া লম্পট অনন্ত এক যুবতীকে ধরিয়া আনিয়াছে। এ কথা যে কে প্রচার করিল, তাহা অন্য কেহ না বুঝুক, অনন্ত ও সুলক্ষণার কিন্তু বুঝিতে বাকী রহিল না।

সমাপ্ত

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

অতএব

অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে অতি সহজ সহজ কথাগুলি অতএবএর শিকলে বাঁধা পড়িয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায় এবং সকল অর্থব্যয় নিরর্থক করিয়া তর্কের কারাগারে অদৃশ্য হয়। তুমি-আমি হয় ত একটা সামাজিক কথার বিচারের জন্য অনেকগুলি ঘটনা গণিয়া বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি,—সমাজে বিধবার বিবাহ হয় না, অথবা কাহারও কাহারও হয়, কেহ বা দুঃখ পায়, কেহ বা পায় না; তখন হয়ত একজন পণ্ডিত আসিয়া ঐ ছোট-খাট দুচারিটি কথা এমন করিয়া অতএব দিয়া জুড়িতে বসিবেন, যে তাঁহার মতবাদের জ্বালায় তোমাকে উদ্‌ভ্রান্ত হইতেই হইবে। ঘটনা বুঝিবার আগেই সিদ্ধান্ত আসে—গাছে না উঠিতেই আমরা এক কাঁদি পাড়িয়া ফেলি। বহু ভুল-সিদ্ধান্তের অব্যয় পিতাকে আমি একটু সংযম শিখাইতে চাই।

বিদ্যার বড় বড় কথা শুনাইয়া, শ্রোতা-দিগকে তাক্ লাগাইয়া, যে-ভাবে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয়, তাহা আমরা কিছু কিছু জানি,—ত্রিভুজের তিনটি বাহু আছে, বৈদ্যুতিক শক্তির একটা খেলা আছে, বিনা-তারে সংবাদ দেওয়া চলে প্রভৃতির সঙ্গে অতএব জুড়িয়া নিত্যই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রলয়কালের পিতৃপুরুষেরা নূতন যুগের বংশ রচিতেছেন। অতএবএর একটা পরিচিত উৎপাতের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মানুষ মরে, এ কথাটা হয়ত দ্বাপর যুগে কেহ কেহ ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং যুধিষ্ঠির সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সেদিন হইতে এ পর্য্যন্ত সকলেই কথাটাকে সত্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে। তবুও যখন বাউল ফকির, অতি কু-রচিত বীভৎস "বাঁশের দোলাতে উঠে" গাহেন, তখন বুঝিতে পারা যায়, যে একটা মতলব আছে,—ফকিরটি একটা অতএব জুড়িবার ফিকিরে আছেন; পয়সা-কড়ি সঙ্গে যাইবে না, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ দাও, অথবা ঈশ্বর-চিন্তা কর। ফকিরকে কিছু দিতে রাজি আছি, এবং ঈশ্বর-চিন্তায় কেহ মন বসাইয়া দিলে সুখী হইব, কিন্তু আমি "মরিব" এই সত্যের সঙ্গে অতএব জুড়িলে কিরূপে দান বা ঈশ্বর-চিন্তা আসে, সেইটিই বুঝিতে পারা যায় না। আমি হলধরকে এক-গাল মুড়ি দিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার পাখী পড়ে কি না, সে অজুহাতে কি করিয়া দিব? কেহ যদি বলেন:—

সংসারটা ফাঁকি রে
যেন ভোজের বাজী!
জীবাত্মাটা পাখী রে
উড়ে পালায় পাজী!
জমিয়ে টাকা সিন্ধুকে
ফেলে যাবে পিছে;
মাঝি ভব-সিন্ধুতে
বলবে ও সব মিছে।

অতএব ভোজনেই
ভাল ক'রে লাগো।
মেজাজখানার ওজনেই
ঘুমাও এবং জাগো।

তর্কের শিকল সর্ব্বত্রই সমান সবল। "ডেকে নাও দিন ফুরাল" এবং "হেসে নাও দুদিন বইত নয়" একই অর্থ-বোধক। ধার্ম্মিকেরা ক্রোধহীন এবং উপহাস-সহিষ্ণু; তাঁহারা আমাকে ধীরভাবেই বলিবেন, যে তাঁহাদের আত্মবাদ এবং আমার উদর-বাদে প্রভেদ আছে। তাঁহাদের কথা এই,—আমরা যখন মরিব এবং সকলই যখন অসার, তখন যাহা সার তাহাই ধরিতে হইবে। মূঢ় পদ্মলোচন শর্ম্মা তবুও বুঝিতেছেন না। যাহা মাৎ নয়,--যাহা সার,—যাহা অমৃত,—যাহা চিরসুন্দর, তাহাকে ধরিতে ত মন ছুটিবেই,—এ জীবন এবং সংসার অসার হইলেও ছুটিবে, সার হইলেও ছুটিবে। তবে কাণার উপযুক্ত নামের অধিকারী পদ্মলোচন যদি সে সৌন্দর্য্য দেখিতে না পায়, তবে তোমার তর্কশাস্ত্রের কোন্ যুক্তির বলে মরণের অন্ধকার দিয়া সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যকে বুঝাইবে?

আমরা এবং আমাদের এই সংসারটি যে অসার মায়ার ফাঁকি, কিংবা সর্ব্বনিয়ন্তার অঙ্গুলি-রচিত বিশ্বের সমগ্র পদার্থ অণুতে অণুতে সত্য, সে তর্ক তুলিব না। যে ব্যক্তি মরণের আতঙ্কে এবং সংসার সম্ভোগে পরাজিত অথবা বিতৃষ্ণ হইয়া, অল্পে সুখ নাই বলিয়া বৃহৎ ব্রহ্মকে ধরিতে চায়, পদ্মলোচন তাহাকে বিলাস-লোলুপ স্বার্থপর বলেন, ভাবে গড়া,—তোমার মন এমন ছাঁচে ঢালা,—যে আকাশের নীলিমায়,—পাহাড়ের উচ্চতায়,—সাগরের বিস্তারে, তোমাকে মুগ্ধ হইতেই হইবে। তোমার ঘরের কোণের কোন পুতুল বা চিত্রপট ক্ষুদ্র বলিয়াই যে উহারা সুন্দর, তাহা নয়; তোমার রোগ সারাইবার ডাক্তারের প্রয়োজনে নয়,—শূন্য ভাণ্ডারে কুবেরের ধন আনাইবার জন্য নয়,—ডুবু ডুবু লোলুপ আত্মাকে খানিকটা চিরস্থায়ী মধু খাওয়াইবার জন্য নয়, কেবল যদি সুন্দর দেখিয়া সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতে না পার,—সমগ্র শরীর ও মনের বিকাশের স্ফূর্ত্তিতে যদি তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পার, তবে ভণে পদ্মলোচন—তুমি সারের নামে মাৎ চাটিতেছ।

তপস্বী বলিতেছেন,—যাহারা কাছে ছিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে, তুমি তবে কাছে কাছে থাক। এবার ঠিক বুঝিয়াছি। উড়া-খই গোবিন্দকে নিবেদন করিলে, তিনি লইবেন কি? এবং খইয়ের ডালার পরিবর্ত্তে আমার ফাঁকিতে পড়িয়া চিনির মুড়কি দিবেন কি? চোখ্ গেল দেখিতে পাই না,—দাঁত গেল খাইতে পারি না; এবার হয় চোরের উপর রাগ করিয়া বাকি মেজের মাটিটুকুকেই আদর করিব, আর না হয় চোরকে আমার যথাসর্ব্বস্ব ফিরাইয়া দিতে বলিব। চোর যদি আমার ছেঁড়া যথা এবং ভাঙ্গা সর্ব্বস্ব ফিরাইয়া না দেয়, তবে আত্মরতি এবং আত্মক্রীড় হইয়া সাধক সাজিব। পদ্মলোচন! নীলে ভাস্বর সিন্ধু-সরিৎ গিয়াছে,—গাছের হরিৎ গিয়াছে,—

কিন্তু তাহা ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া যে মধু তুলিয়াছিলে, তাহা ত যায় নাই। তুমি হাসিতে পার না,—গাহিতে পার না,—তুমি দুর্ব্বল,—এবং অপটু; তোমাকে এখন উৎসবের মন্দিরে,—পরিহাসের মজলিসে যদি কেহ না ডাকে, তবে তুমি,—তোমার রাগ এবং অভিমানকে ভক্তি-বৈরাগ্য নাম দিয়া ঘরের কোণে তপস্বী সাজিয়া বসিবে কেন? যারা তোমাকে চায় না, তুমি কি প্রাণপণে তাহাদিগের সেবা করিতে পার না? তুমি মনে করিয়া দেখ, তোমার জন্ম এই সেবায়,—আত্মক্রীড়ায় এবং পরনিরপেক্ষতায় নহে; তুমি বাড়িয়াছ এই সেবায়,—তুমি প্রতিপদে পরের সাহায্য না লইয়া, পরকে সাহায্য না করিয়া বাড়িতে পার নাই; এই সেবায়,—এই অস্থিমাংসগত প্রাকৃতিক কর্ত্তব্যপালনে জীবন ক্ষয় কর। ঘড়িতে যতক্ষণ দম আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে যেমন টক্‌টক্ করিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য, তেমনি করিয়া তোমার ভাঙ্গা লাঠিখানা ঠক্‌ঠক্ করিয়া অগ্রসর হও। তোমার অতএব নাই,—উদ্দেশ্য নাই। মরিতে হইবেই অতএব আগেই মর,—উপবাস এবং তপস্যা করিয়া শরীর জীর্ণ করিয়া ফেল,—ফাঁসির হুকুমের আগেই দড়ি-কলসী সংগ্রহ কর—এ উপদেশ মানিও না। ভবপারে যাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে না; সিন্ধুটি বিনা ডাকেই তর্জ্জন করিয়া আসিবে, এবং দাঁড়ি-মাঝি না থাকিলেও তোমাকে পার হইতেই হইবে; তবে তুমি আগে গিয়াই অসময়ে নাকানি চুবানি খাইবে কেন? পদ্মলোচনের প্রতিজ্ঞা, সে মরিবে না,—আমি মরিব না।

বড় গোল করিয়াছি; আমি যে মরিব না, সে কথাটার বিজ্ঞাপন না দিলে ভাল হইত। ভীষ্ম তাঁহার না মরার প্রতিজ্ঞাটা প্রচার না করিলে দশজনে জোট করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিত না। কথাটা মহাভারতে নাই,—কিন্তু আমি জানি। ভীষ্ম বলিলেন যে, তিনি অগ্রহায়ণ পৌষের দারুণ শীতে গায়ে কম্বল জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মরিবেন না; সূর্য্য একটু মাথা তুলিলে অর্থাৎ উত্তরায়ণ হইলে ধীরে সুস্থে মরিবেন। এই জন্যই লোকে বলে, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উপায়ে শিশু-বধ করা হয়, শ্রীকৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতির তাহা জানা ছিল; তাঁহারা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ভীষ্মকে মারিয়া ফেলিলেন। উহাতে ব্যাসদেব, বৈশম্পায়ন এবং সৌতির কিছু লাভ হইল; কারণ মহাভারত ফুলিয়া ডবল হইয়া উঠিল এবং গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হইল; কিন্তু ভীষ্ম মরিলেন। পদ্মলোচনের চক্ষের দোষ থাকে থাকুক, তাহার বুদ্ধির দোষ নাই। এ প্রবন্ধের জন্য যদি কেহ কৈফিয়ৎ কাটিতে বলেন, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমার শান্তিভঙ্গ করিয়া শান্তিপর্ব্ব বাড়াইতে বলেন, অথবা সম্পাদকদের সুবিধার জন্য পত্রিকাগুলি ফাঁপাইয়া তুলিতে বলেন, তবে আমি সে কথায় কর্ণপাত করিব না।

শ্রীপদ্মলোচন শর্ম্মা

লুথার বার্ব্বাঙ্ক ও আধুনিক বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ

বরাহমিহিরের "বৃহৎ সংহিতা" সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বকোষস্বরূপ। খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবাসীরা জগৎসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য জানিত, তাহার অনেক কথাই বরাহমিহির ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঋতু-পরিবর্ত্তন হইতে উদ্ভিদের আকৃতি-পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত কোন বিষয়ই বাদ যায় নাই।

দণ্ডায়মান বৃক্ষকে লতায় রূপান্তরিত করিবার প্রণালী বরাহমিহিরের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি। অম্লজানযুক্ত ফলের পরিবর্ত্তে মিষ্ট ফল-সৃষ্টির উপায়ও ইনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলের আঁস, আঁটি, খোসা ইত্যাদি বদলাইবার রীতিও বৃহৎ-সংহিতায় আলোচিত হইয়াছে। এই সকল পাঠ করিবার সময় Harwood প্রণীত New Creation in Plant-world নামক পুস্তক চোখে পড়ে। তাহাতে ক্যালিফর্ণিয়ার লুথার বার্ব্বাঙ্ক-প্রবর্ত্তিত নানাবিধ অদ্ভুত কৃষিকৌশল বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য আমার কোন ইংরাজি রচনায় বরাহমিহিরকে "The Luther Burbank of Hindu India" রূপে বর্ণনা করিয়াছি। বরাহমিহিরের সঙ্কেতগুলি দেখিলে মনে হইবে তিনি কতকগুলি নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য ঐন্দ্রজালিক-সুলভ প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন। বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা লুথার বার্ব্বাঙ্ককে বাস্তবিকই "Plant-wizard" বা উদ্ভিজ্জগতে যাদুকর বলিয়াই জানেন।

প্রদর্শনীর Horticulture গৃহে লুথার বার্ব্বাঙ্কের উদ্ভাবিত কতকগুলি নূতন জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল উদ্ভিদ্ জগতে আপনা-আপনি জন্মিতে পারে না সেইরূপ বহু উদ্ভিদ ইনি তৈয়ার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

নূতন নূতন উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করা, নূতন ধরণের ফল-ফুল সৃষ্টি করা, সকণ্টক উদ্ভিদকে নিষ্কণ্টক উদ্ভিদে রূপান্তরিত করা, রসের পরিবর্ত্তন করা, বীজের আকার বাড়ান বা কমান—ইত্যাদি কার্য্য প্রথমতঃ অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সকল কার্য্যের জন্য অতি উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য বা দার্শনিকতার আবশ্যক হয় না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ বার্ব্বাঙ্ককে বিজ্ঞান-মহলের অন্যতম ধুরন্ধর বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা ইঁহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের প্রশংসা করেন মাত্র। যে কোন কৃষক ও উদ্যান-পালকই, বার্ব্বাঙ্কের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়শীল হইলে, এইরূপ বিস্ময়জনক ফল দেখাইতে পারে। "কলম" করা, বীজনির্ব্বাচন করা ইত্যাদি কার্য্যে অন্য কোনরূপ অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন হয় না।

লুথার বার্ব্বাঙ্ক প্রথমে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

আলু প্রস্তুত করিয়া মার্কিন দেশে প্রসিদ্ধ হন। সে আজ ১২।১৩ বৎসরের কথা। বার্ব্বাঙ্কের নামে সেই আলু আজকাল যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র প্রচলিত। উদ্ভিদসমূহকে কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই বার্ব্বাঙ্ক সর্ব্বপ্রথমে মনোনিবেশ করেন। এইদিকে কার্য্য করিতে করিতেই নানা বিষয়ে ইঁহার দৃষ্টি খুলিয়া যায়। আধুনিক বৃক্ষায়ুর্ব্বেদে বার্ব্বাঙ্ককে দ্বিতীয় "চরক"রূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সেদিন ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপকের নিকট সংবাদ পাইলাম— বার্ব্বাঙ্কের গৃহ স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর অতি সন্নিকটে। প্রায় ৫০ মাইল দূরে "স্যাণ্টা রোজা" বা "গোলাপ-নগর"। সেইখানে বার্ব্বাঙ্কের বাগান ও বাসস্থান।

গোলাপনগরে যাইয়া বার্ব্বাঙ্কের সহিত দেখা করিবার ব্যবস্থা করা গেল। একজন হিন্দু-হিতৈষিণী মার্কিন-রমণীর পত্রে জানিলাম —আজকাল স্যাণ্টারোজা নগরে Rose Carnival বা গোলাপ-উৎসব সুরু হইয়াছে। বার্ব্বাঙ্ক তাহাতেই বিশেষরূপে ব্যস্ত আছেন। অধিকন্তু স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর প্রদর্শনী-উপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদা লোকজনের সঙ্গে নানা কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়। কাজেই দেখা করিবার অবসর না হইতেও পারে। কিন্তু একজন কর্ম্মচারীর সাহায্যে বাগান দেখিবার ব্যবস্থা হওয়া সহজ।

বাগান দেখিবার জন্য রেলে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে চলিলেন স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর বেদান্ত-ভবনের স্বামীজি। একজন ইয়াঙ্কি-রমণীর গৃহে মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। ইনি মার্কিনদেশীয় সম্ভ্রান্তবংশে জাত বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। কথাবার্ত্তায় জানিলাম ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ইংরাজের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এজন্য ইনি "বিপ্লব-ললনা-সমিতি"র (Daughter of the American Revolution) সভ্য। বর্ত্তমান কালেও ইঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকর্ম্মচারী হইয়াছেন। ইঁহার খুল্লতাত ওহায়ো প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। একটি আঙটি দেখাইয়া রমণী বলিলেন—"আমার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন। যখন তাঁহারা বিলাতে বাস করিতেন—অর্থাৎ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসিবার পূর্ব্বে—তাঁহাদেরই একজন ফরাসী-সম্রাটের নিকট হইতে এইটি উপহার পান।"

এই মার্কিন-রমণী কিছুকাল হইতে নানাবিধ অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনায় সময় কাটাইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। বিবেকানন্দের বেদান্তব্যাখ্যা, বাহামত, থিয়জফি, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি সকল বিষয়েই ইঁহার "interest" (শুনিবার ও জানিবার ইচ্ছা) আছে। ইঁহার সঙ্গে আর একজন রমণী ছিলেন। ইনি স্পেনিশবংশে জাত। ক্যালিফর্ণিয়া দেশে স্পেনিশ জাতির বসতিই সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর স্যাণ্টা রোজা ইত্যাদি নগরের নাম স্পেনিশ জাতীয় লোকেরই উদ্ভাবিত। এই রমণীর পূর্ব্বপুরুষগণ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে আসিয়া প্রথম বাস করেন। সেই সময়ে ক্যালিফর্ণিয়ার সোণার খনি প্রথম আবিষ্কৃত

হয়। তাহার পূর্ব্বে এই প্রদেশে বেশী শ্বেতাঙ্গ নরনারীর বসতি ছিল না। এই রমণী গোলাপ-নগরের থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক—আনি বেসান্তের ভক্ত।

রমণীদ্বয় বার্ব্বাঙ্কের বাগান দেখিবার জন্য আমাদের সঙ্গে চলিলেন। বাগান দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম না। অতি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—ইহার মধ্যে ছোট-বড় নানা ক্ষেত। এক-একটার ভিতর এক এক প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। বার্ব্বাঙ্ক গৃহে ছিলেন না। তাঁহার সহকারী বাগানের সকল বিভাগ বুঝাইয়া দিলেন। গ্রন্থপাঠ করিয়া বার্ব্বাঙ্কের কৃষিকৌশল ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদজ্ঞতা যতটা জানিতাম, যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা অপেক্ষা বেশী-কিছু জ্ঞানলাভ করিলাম না।



লুথার বার্ব্বাঙ্ক ও কণ্টকহীন ক্যাক্‌টাস

একটা চেরি বৃক্ষে পাঁচশত চেরি ফল উৎপন্ন করা হইতেছে। একটা নাস্‌পাতি বৃক্ষে একশত পঁচিশ জাতের নাসপাতি উৎপন্ন করা হইতেছে। প্রণালী অতি সরল। কতগুলি নূতন বৃক্ষ হইতে শাখা আনিয়া মূল বৃক্ষের সঙ্গে কলম করা হয়। কতকগুলি সপুষ্পক চারা গাছ দেখিলাম। প্রদর্শক বলিলেন—"পূর্ব্বে এই সকল উদ্ভিদের ফুলগুলি ডাঁটার একধারে জন্মিত—তাহাতে পুষ্পের শোভা দেখা যাইত না। বার্ব্বাঙ্কের চেষ্টায় ফুলগুলি ডাঁটার দুইধারে জন্মিতেছে। পূর্ব্বে মাত্র একবর্ণবিশিষ্ট ফুল জন্মিত—বার্ব্বাঙ্কের উদ্ভাবিত চারায় একসঙ্গে নানা রঙের ফুল ফুটিতেছে।"

একস্থানে কতকগুলি ক্যাক্‌টাস উদ্ভিদের স্তূপ দেখিলাম। প্রদর্শক বলিলেন—"ঐ দেখুন, বার্ব্বাঙ্কের অদ্ভুত কীর্ত্তি। কাঁটাহীন ক্যাক্‌টাস্ (Caktus) কেহ পূর্ব্বে দেখিয়াছেন কি? কিন্তু দশ-বার-বৎসর-ব্যাপী অধ্যবসায়ের ফলে বার্ব্বাঙ্ক নিষ্কণ্টক

ক্যাক্টাস প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে ক্যাক্টাস দ্বারা জগতের কোন কার্য্য সাধিত হইত না। এক্ষণে এইগুলি খাদ্য-দ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বার্ব্বাঙ্কের বাগান হইতে এই নিষ্কণ্টক ক্যাক্টাসের চারা দুনিয়ার সর্ব্বত্র রপ্তানি হইতেছে।

বার্ব্বাঙ্কের বিশ্বাস ছিল ক্যাক্টাস উদ্ভিদের গাত্রে কণ্টকের উৎপত্তি নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী নয়। কাঁটাগুলি এই উদ্ভিদের ধ্বংসসাধনকারী জীবজন্তু হইতে আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বার্ব্বাঙ্ক ক্যাক্টাস সমাজে যৌন নির্ব্বাচন সুরু করেন। বহুলক্ষ নির্ব্বাচনের পর নিষ্কণ্টক জাতীয় ক্যাক্টাসের আবির্ভাব হইয়াছে।

বার্ব্বাঙ্কের বাসগৃহ এই বাগানের সম্মুখেই অবস্থিত। সংবাদ পাইলাম ব্যবসায়ের জন্য বার্ব্বাঙ্কের অন্যান্য বহু ক্ষেত্র আছে। এখানে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চলে মাত্র। পর্য্যটকগণকে এই বাগান দেখান হয়; কিন্তু ব্যবসায়-কেন্দ্রগুলি দেখান হয় না। বার্ব্বাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী অনুসারে ব্যবসায় চালাইবার জন্য এক বিরাট কোম্পানী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর নাম The Luther Burbank Society, কোম্পানীর বড় আফিস নিউ ইয়র্ক নগরে অবস্থিত। বার্ব্বাঙ্কের বৃক্ষায়ুর্ব্বেদতত্ত্ব সম্বন্ধে এই কোম্পানী কতকগুলি গ্রন্থও প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থ সচিত্র।

বার্ব্বাঙ্কের বাগান দেখা হইল। ইয়াঙ্কি-রমণী বলিলেন, "চলুন, আপনাদিগকে আমার আবাদ দেখাইয়া আনি। সেখানে দেখিবার অনেক কৃষিক্ষেত্র ও ফলের বাগান ইত্যাদি দেখিতে পাইবেন।" ইঁহার মোটরকারে বসিয়া ১০।১২ মাইল যাওয়া গেল। নির্জ্জন পল্লীপথ ও কৃষিভূমির পরিচয় পাইতে পাইতে অগ্রসর হইলাম। রাস্তায় একটা নগর-সদৃশ জনপদ চোখে পড়িল। নাম সেবাষ্টপল। রমণীদ্বয় বলিলেন —"এই অঞ্চল হইতে ইয়োরোপের নানাদেশে নাশপাতি রপ্তানি হয়। এ বৎসর যুদ্ধের জন্য রপ্তানি স্থগিত রহিয়াছে। ফলের বাগানওয়ালাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।"

খানিকক্ষণ সমতল ভূমিতে চলিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পার্ব্বত্য ভূমিতে উঠিলাম। কোন কোন আবাদে মুরগী পোষা হইতেছে। সর্ব্বত্র ফলের বাগানই দেখিতে পাইতেছি। নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর দিয়া মোটর চালাইয়া অবশেষে যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। এই বাগানে কেবল নাশপাতি গাছ। শুনিলাম এই সকল বাগানে জলসেচন করিতে হয় না। জমি চষিয়া দিতে হয় মাত্র। নাশপাতি গাছগুলিকে ছোট ছোট পেয়ারা গাছের মত দেখায়। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ অংশে এই বাগান অবস্থিত। এখান হইতে দূরে স্যাণ্টা রোজা নগর দেখিতে পাইতেছি। ইহার চারিদিকে নানাবিধ ফলের বাগান পাহাড়ের গায়ে সারি দিয়া নামিয়াছে। এই স্তরবিন্যস্ত বাগানগুলি হিমালয় প্রদেশের চা-বাগানের অনুরূপ। এখানকার সমগ্র অঞ্চলই সবুজতৃণপত্রমণ্ডিত। এক্ষণে পুষ্পের শোভা কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু সুশ্রী উদ্যানগুলি দেখিয় দক্ষিণ ফ্রান্সের সুষমা স্মরণে আসিল।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

নবাব

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম-অভিনয়-রজনী

কার্দ্দেলাকের নূতন থিয়েটারে লোক আজ ধরে না। মারাণের নূতন নাটক 'বিদ্রোহে'র আজ প্রথম-অভিনয়-রজনী। নানা সাজে সজ্জিত দর্শক, দলে দলে আসিয়া জমিতে লাগিল। থিয়েটারের সম্মুখে অনেকখানি পথ আলোর ঘটায় দিনের মতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ী ও লোকের ভিড়ে সে এক সমারোহ-ব্যাপার! সকলেরই মুখে ব্যস্ত আগ্রহের একটা ছাপ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

টিকিট-ঘরের পাশেই কার্দ্দেলাক দাঁড়াইয়া ছিল। আশার আনন্দে দুই চোখ তাহার দীপ্ত, উজ্জ্বল—সস্মিত মুখ। বিস্তর টাকা ধার করিয়া এই শেষবার সে তাহার ভাগ্য পরীক্ষায় উদ্যত হইয়াছে। গৃহটা নবাব এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে—সাজসজ্জা ও সরঞ্জামে কার্দ্দেলাকও প্রায় দেড় লক্ষ ব্যয় করিয়াছে! তিনবার দেনার দায়ে তাহার নামে দেউলিয়ার ছাপ পড়িয়াছিল—চতুর্থবার সে জীবন পণ করিয়া আবার লাগিয়াছে! মনটা সন্দেহে বেশই দোল খাইতেছিল। সময়টাও সুবিধার নহে। পারির থিয়েটারবাজ লোকেরা এখন পারি ছাড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়! তাহার উপর নাট্যকারটি একেবারে নূতন, সাধারণের সম্পূর্ণ অপরিচিত! 'বিদ্রোহ'ই আবার তাহার এই প্রথম নাটক! এমন ক্ষেত্রে আশা করিতে মন সরে না! যাহা হৌক, তবুও সে কপাল-ঠুকিয়া আয়োজনে ধূম বাধাইয়া দিয়াছিল। দলে দলে লোক আসিতেছে শুনিয়া কার্দ্দেলাক আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল—ভিড় দেখিয়া তাহার সকল সন্দেহ দূর হইল! এবার তবে জয়, জয়, নিশ্চয় জয়!

শঙ্কিত চিত্তে মারাণ কিন্তু ষ্টেজের এক নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়া ষ্টেজ-ম্যানেজারের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। বুক তাহার এক নৈরাশ্যের অজানা ভয়ে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অসম্ভব ভিড়ের কথা শুনিয়াও বাহিরে আসিতে তাহার সাহস হইল না। এতগুলা লোকের দৃষ্টির সম্মুখে বাহির হইতে প্রাণ তাহার একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তবু সকলের কথায় একবার সে কোনমতে যবনিকার অন্তরাল হইতে উঁকি দিয়া রঙ্গালয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—বিরাট গৃহে লোক একেবারে গিস্ গিস্ করিতেছে। তিল-ধারণের স্থান নাই! এমন লোকারণ্য পূর্ব্বে সে আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়াও তাহার মনে পড়ে না!

আর ঠিক পনেরো মিনিট বাকী আছে! ষ্টেজ-ম্যানেজারের কাজ শেষ হইয়াছে। অভিনেতা অভিনেত্রীর দল সাজিয়া প্রস্তুত! শুধু পট উঠিলেই হয়! দারুণ উদ্বেগে মারাণের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে এখন কি করিবে, কোথায় যাইবে? উপরে—বক্সে? চারিধার হইতে অসংখ্য চোখের নানারূপ

দৃষ্টির শর এখনই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইবে! তবে কি সে ষ্টেজের পাশে দাঁড়াইয়াই অভিনেত্রা অভিনেত্রীর দলকে উৎসাহ দিবে? কিন্তু এ উদ্বেগ লইয়া উৎসাহ দিবার শক্তিই বা তাহার হইবে কি করিয়া! তাহার নিজেরই প্রাণ যে দুই-একটা উৎসাহ-বাণী পাইবার আশায় উন্মুখ অধীর হইয়া আছে! সেটুকু না পাইলে প্রাণটাকে ঠিক রাখাও ভারী সমস্যার কথা! তবে—তবে?

কার্দ্দেলাক আসিয়া মহা-উৎসাহে মারাণের করকম্পন করিয়া কহিল, "যান, আপনি উপরে গিয়ে বসুন—দেখবেন, কেমন হয়।" মারাণ কোন উত্তর দিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। নীচে কাতার দিয়া দর্শকের দল বসিয়া গিয়াছে—অধীর আগ্রহের এক সুনিবিড় গুঞ্জনে সারা নাট্যগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—এসেন্সের বিচিত্র গন্ধে রঙ্গালয় এমনই সুরভিত যে মনে হয় সাজানো বাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়া গন্ধে যেন চারিধার ভরপুর করিয়া দিয়াছে! ষ্টলে পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ—বিচিত্র বেশ-ধারী নর-নারী মুখে চোখে তীব্র কৌতূহল মাখিয়া গল্প গুজব করিতেছে, গ্যালারিতে রঙ্গপ্রিয় সাধারণ লোক, উপরে বক্সে সৌখীন নর-নারীর দল! মারাণ আসিয়া একটি বক্সের পিছনে দাঁড়াইল—বৃদ্ধ জুজ এলিস ও আলিনকে লইয়া এই বক্সে সম্মুখের আসনে, আর মারাণের মা তাহাদেরই পিছনে উজ্জ্বল আলো ও লোক-চক্ষুর আড়ালে কোনমতে আপনাকে গোপন করিয়া বসিয়াছিল। উত্তেজনায় এই কয়টি প্রাণীর চিত্তও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মারাণ আসিয়া তাহার মায়ের কাছে বসিল।

বৃদ্ধ জুজ ঘড়ি খুলিয়া কহিল, "আর তিন মিনিট বাকি—" মারাণের বুকে কে যেন পাথর ঠুকিতেছিল। আর তিন মিনিট! এই অধীর দর্শকের দল, না জানি, কি করিবে? নীচে হইতে দর্শকের দল ক্ষণে ক্ষণে এই বক্সটির পানে সকৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। এ বক্সে ও কাহারা বসিয়াছে! পোষাক নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির মত,—দেখিলে একটুও সৌখীন বলিয়া মনে হয় না। এ বক্সের মূল্যও যে অনেক! দেখিলে মনে হয় না—যে ও বক্সের মূল্য দিবারও উহাদের সামর্থ্য আছে!

সহসা ঝম্ ঝম্ করিয়া অর্কেষ্ট্রায় বাজনা বাজিয়া উঠিল। মারাণের বুকে স্পন্দন ছুটিয়া গেল। তারপর একেবারে যবনিকা উঠিল ও নাটকের প্রথম দৃশ্য সজ্জিত সুন্দর বেশে দেখা দিল। মারাণ বিস্মিত দৃষ্টিতে মঞ্চের পানে চাহিল। পাত্র-পাত্রী কথা সুরু করিয়া দিয়াছে—মারাণ শুনিল, তাহারই লেখা কথা দিব্য দক্ষতার সহিত ইহারা বলিয়া চলিয়াছে! পক্ষী-মাতা তাহার শিশুকে প্রথম উড়িতে দেখিলে যেমন সতৃষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার প্রতি ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করে, মারাণ ঠিক সেই-ভাবেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাক ও চলিবার ফিরিবার প্রত্যেক ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করিতে লাগিল।

দর্শকমণ্ডলী স্থির চিত্তে অভিনয় দেখিতে-

ছিল। কোথাও এতটুকু সাড়া-শব্দ নাই! একটা সূচ পড়িলেও তাহার শব্দ শুনা যায়—বিরাট রঙ্গগৃহ এমনই স্তব্ধ, কোলাহল-হীন! সহসা নীচে ষ্টলের এক দর্শক মৃদু কণ্ঠে কহিল, "এ যে পদ্য!" আর একজন দ্রুত তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "চুপ, ভারী চমৎকার ত।" মারাণের প্রাণের মধ্য দিয়া আনন্দের একটি বিদ্যুৎশিখা ছুটিয়া গেল। দর্শকদের এই নিস্পন্দ পলকহীন দৃষ্টি—এই অধীর কৌতূহল—সে যেন নবীন নাট্যকারের কৃতিত্বকে ধ্যান-মৌনভাবে বরণ করিয়া লইবারই সঙ্কেত!

কবির ছন্দ রঙ্গমঞ্চে তখন নদীর শান্ত তরঙ্গের মতই নাচিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। সুদক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর কুশল কণ্ঠে সে ছন্দ বিচিত্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পারির সৌখীন সমাজের মহাসৌখীন ব্যক্তিগুলি হইতে গ্যালারির নিতান্ত ভাবহীন সাধারণ দর্শকের চিত্তটুকুও সে ছন্দের সলীল মৃত তরঙ্গে নৌকার মতই দোল খাইতেছিল!

ওধারের বক্সে বসিয়া হেমারলিঙ, ব্যারণেস ও ব্যারণেসের প্রণয়ী লি মার্কার দীপ্ত কৌতূহলে নাটকের প্রতি ছত্র অনুসরণ করিতেছিল,—তাহার পাশের বক্সে পারির বিখ্যাত বিলাসিনী সুজান্ ব্রক্ সাজসজ্জার দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ষ্টেজের পানে চাহিয়া ছিল—তাহার পাশে এমি ফেরাট। মশার্দ তাহার কুশ্রী নায়িকার সঙ্গে আর-এক বক্সে বসিয়া গল্প থামাইয়া অভিনয় দেখিতেছিল। পেণ্টে নায়িকা তাহার মুখের ধবল দাগগুলাকে ঢাকিয়া আসিলেও পাছে সেগুলা লোক-চক্ষে এতটুকুও আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে পট উঠিবার পূর্ব্বক্ষণ অবধি সেগুলার পানে সে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল; কিন্তু অভিনয়ে এমনই উত্তেজনা, রচনায় এমনই নূতনত্ব ছিল যে এখন সে কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল! সকলেই নাট্যকারের রচনা-কৌশলে ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়-দক্ষতায় একেবারে যেন তন্ময় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মারাণ স্মিত মুখে কম্পিত চিত্তে দর্শকের মুখের উপর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে আপনার ব্যাকুল দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেছিল!

সহসা দর্শক-দলে চাঞ্চল্যের মৃদু তরঙ্গ দেখা দিল। বিপুল জনসঙ্ঘ কিসের সাড়া পাইয়া উপরের দিকে ফিরিয়া চাহিল। কোণের যে বহুমূল্য বক্সটি এতক্ষণ খালি পড়িয়াছিল, সকলের দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিল। অমনি সকলের মুখে চোখে একটা সঙ্কেতের ঢেউ ছুটিয়া গেল! মারাণ ফিরিয়া চাহিল, শূন্য বক্সে একজন লোক আসিয়া বসিয়াছে। মারাণ মুহূর্ত্তে চিনিল, সে নবাব।

দশ দিনে নবাবের বয়স যেন কুড়ি বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। চুলে অসম্ভব পাক ধরিয়াছে। অত বড় দুর্ঘটনার পর নবাবকে এ কয়দিন কেহ পথে বাহির হইতে দেখে নাই। ক্ষুব্ধ, আশা-হত নবাব আপনাকে নিরাপদ গৃহ-দুর্গে বদ্ধ রাখিয়া-ছিল। দিনের আলো, মুক্ত আকাশ, মুখরিত পথ,—এ সবের মায়া নবাব দৃঢ় চিত্তে ত্যাগ করিয়াছিল। বাহিরে তাহারই নাম লইয়া পারির লোক কিরূপ তর্জ্জন করিতেছে

তাহার আভাসমাত্রও নবাবের কাণে পৌছায় নাই। ধ্বংসের একটা ভীষণ ছায়া নবাবের দীপ্ত প্রাণটাকে রাহুর মতই গ্রাস করিতেছিল। মাদাম জাঁহুলে এ সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া নিগ্রো বাঁদী-বান্দা লইয়া হাওয়া খাইতে দেশান্তরে গিয়াছিল—বোকাম্প তহবিলের দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রতিক্ষণেই দারুণ দুর্ভাগ্যের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। নবাবের বৃদ্ধা মাতা শুধু আসন্ন ধ্বংসের মুখে পুত্রকে আগুলিয়া বসিয়াছিল। নবাব একেবারে বাক্হীন ক্ষুব্ধ বেদনায় এক মহা সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাহিরের সহিত তাহার সব সম্পর্ক আজ চুকিয়া গিয়াছে!

এমন সময় মার্শেল হইতে গেরির টেলিগ্রাম আসিল, নবাবের দশ লক্ষ টাকা কোনমতে আদায় করিয়া সে ঘরে ফিরিতেছে। নবাবের মনে নৈরাশ্যের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, মুহূর্ত্ত কে যেন তাহা ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। আশার সূর্য্যালোক আবার মৃদু কিরণে জাগিয়া উঠিল। দশ লক্ষ টাকা! আঃ,—দেনাপত্র তবে শোধ হইবে; দেউলিয়া নামের কলঙ্ক হইতেও মুক্তিলাভ ঘটিবে! আবার নূতন করিয়া জীবনটাকে গড়িবারও সুযোগ মিলিবে! নবাব উঠিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা খবরের কাগজ টানিয়া লইল। এ দশ দিন নবাব খবরের কাগজও খুলিয়া দেখে নাই! কাগজ খুলিতেই কার্দ্দেলাকের থিয়েটারের বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। মারাণের নূতন নাটক লইয়া থিয়েটার খুলিতেছে! ভারী সমারোহ ব্যাপার। নবাবেরই টাকায় তৈয়ারি থিয়েটার, তাহারই বুকের রক্তে রাঙানো থিয়েটার। নবাব ভাবিল, একটু ঘুরিয়া আসা যাক! পারির লোকগুলাও দেখুক, তাহাদের বর্ব্বর নিষ্ঠুরতা নবাবকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই।

মা আসিয়া পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া নিষেধ করিলেন—পুত্র হাসিয়া মার সে উদ্বেগ কাটাইয়া দিল। মা শিহরিয়া নিবৃত্ত হইল।

বক্সে ঢুকিয়াই নবাব উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তাহার চোখে পড়িতে বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না। দর্শক-মণ্ডলী সে ভাব বুঝিল। তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা নির্লজ্জ তাহারা দুই-চারিটা কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়িল না।

একজন কহিল, "নবাব, না?"

"তাই ত নবাবই যে।"

"ইস্, কি বেহায়া হে!"

"মুখ দেখাতে লজ্জা হল না! ডাকাত বেটা—"

নবাবের একবার মনে হইল, উপর হইতে এই দণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এই সব অসভ্য বন্য জানোয়ারগুলার টুঁটি সে চাপিয়া ধরে! কিন্তু না, উহাদের মন্তব্য কানে শুনিয়াও না শুনার ভাব দেখাইয়া উহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া দিতে হইবে! ভিতরে ভিতরে নিষ্ফলতার দুঃখে ইহারা গুমরিয়া মরুক!

কিন্তু হায় রে—এমন করিয়া আপনাকে অবিচল রাখাও যে অনেকখানি শক্তির কাজ! নবাবের এ দুর্ব্বল হাড়ে অতখানি শক্তি যে আজ নাই। নবাব প্রাণপণে আপনাকে

সম্বরণ করিল। বর্ব্বরগুলা তবুও তাহাদের মন্তব্য-প্রকাশে ক্ষান্ত হইল না। নবাব আর কাহারও পানে ফিরিয়া চাহিল না! পথে কুকুর চীৎকার করিলে সাহসী পথিক যেমন সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া অটল ঔদাসীন্যে আপনার পথে চলিয়া যায়, সে-সকল নীচ মন্তব্যে নবাবও ঠিক তেমনই উদাসীন থাকিয়া অভিনয় দেখিতে লাগিল।

এমন সময় প্রথম অঙ্কের শেষে পট পড়িল। তখন সকলে হাঁফ ছাড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া নানাবিধ মিশ্র কোলাহলের সৃষ্টি করিল। কতকগুলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা শুধু নবাবের কানে গেল। আপনার বক্সে অটলভাবে বসিয়া সে সব কথার শর নবাব ঔদাসীন্যের দুর্জ্জয় বর্ম্মে রোধ করিতে লাগিল।

"চমৎকার বই! এরা প্লেও করচে খাসা—"

"একেবারে নতুন ধরণের বই!"

"নবাব কি বলে এল, এখানে? বুকের পাটাও ত কম নয়!"

"দেখা যাক—আগাগোড়া বইখানা কেমন দাঁড়ায়!"

"এইটিই প্রথম বই! নতুন নাট্যকার!"

"লি-মার্করটা একেবারে ব্যারণেস হেমারলিঙের খপ্পরে পড়েছে।"

"তাই হেমারলিঙের এত পসার!"

"আরে ছ্যা! বড়লোকের সবই খারাপ!"

"জেঙ্কিন্সটা গেল কোথায়?"

"টিউনিসে আছে। ফেলিসিয়াও তার সঙ্গে জুটে গেছে। বের কাছে দুজনেরই ভারী খাতির! বে'কে ঠেসে পার্ল খাওয়াচ্ছে! খুব পশার জমিয়েছে, সেখানে"।

"একের নম্বর—একেবারে, বুঝলে কি না!"

সহসা নবাবের বক্সের পিছনে মৃদু কোমল কণ্ঠে কে কহিল, "নাই বা আলাপ থাকল, বাবা,—তুমি যাও আলাপ করগে! আহা, উনি নেহাৎ একলা পড়েছেন—"

"কিন্তু আলিন, আমায় যে উনি মোটেই চেনেন না, মা—"

"নাই চিনুন, নিজে থেকে চেনা করে নাও গে! তুমি একটু কথা কওগে—উনিও জানবেন—ওঁর তবু একজন বন্ধুও এখানে আছে—"

পরক্ষণেই নবাব ফিরিয়া দেখেন, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহার বক্সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বৃদ্ধ জুল। সে কি আরাম—কি আশ্বাস পাইয়া নবাব সাগ্রহ বাহু বাড়াইয়া বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা করিল! বৃদ্ধের তপ্ত কর আপনার করে ধরিয়া নবাব এক অপরূপ স্নেহের সংস্পর্শে মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার সেই বর্ব্বর গ্লানির কথা ভুলিয়া গেল! তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে দুইজনে কত কথা কহিল। এমন স্নেহ-আশ্বাস-ভরা স্বর নবাব এ সহরে পূর্ব্বে আর কখনও শুনে নাই! আহা, এতদিন কোথায় তুমি ছিলে, বন্ধু! এই লুঠের আড্ডা, বর্ব্বরতার মজলিসের অন্তরালে এমন একখানি সুন্দর প্রাণ লইয়া লুকাইয়া তুমি কোথায় বসিয়াছিলে! এখানে যশের জন্য, টাকার জন্য দিবারাত্রি শৃগাল-কুকুরের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে—এই কদর্য্য রক্তাক্ত ক্ষেত্রের পশ্চাতে এমন একখানি স্নেহের নির্ম্মল নিরাময় নীড় আছে, জানিলে নবাব যে কবে সেখানে গিয়া মাথা গুঁজিয়া বাঁচিত!

ঘণ্টা বাজিল। দর্শকের দল যে যাহার আসনে স্থির হইয়া বসিল। পট উঠিল। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় সুরু হইল। দর্শকের দলে আবার সেই চোখে চোখে সঙ্কেতের বাণ ছুটিল।

নবাব ভাবিল, আমি ইহাদের কি করিয়াছি—যে ইহারা এমন বর্ব্বরের মত আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে! প্যারি কি আর আমায় চাহে না? আমার সহিত সব সম্পর্ক তাহার চুকিয়া গিয়াছে?

কিন্তু ছয়-মাস! শুধু ছয়মাস নবাব প্যারিতে আসিয়াছে। ছয়মাসেই রাক্ষসের মত নবাবকে তাহার লুব্ধ গ্রাসে পুরিয়া চিবাইয়া হাড়-জর-জর করিয়া প্যারি আজ পথে মাংসের হাড়ের মতই তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে! ছয় মাসেই সব নিঃশেষ হইল! নবাবের মাথার মধ্যে আগুন ছুটিতেছিল। দর্শকের দলে তখন অভিনয়-তারিফের সঘন করতালি-নাদ উঠিতেছিল। নবাব চিন্তার সূত্র কাটিয়া অভিনয়ে মনঃ-সংযোগ করিল। রঙ্গমঞ্চে নায়ক তখন বক্তৃতায় শ্লেষের পরাকাষ্ঠা তুলিয়াছে! এই যে সহরের বুকে বসিয়া রক্তপিপাসু বাঘের মতই সম্ভ্রান্ত সমাজ গরিবের রক্ত অহরহ শুষিয়া ফিরিতেছে—গরিবের রক্তে দেহ স্ফীত করিয়া সেই গরিবেরই ঘাড়ে পা দিয়া জুলুমের একশেষ করিতেছে, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

মুগ্ধ দর্শকের দল নবাবের পানে ঘন ঘন চাহিয়া দেখিতেছিল। যেন এই বিস্তীর্ণ সহরের মধ্যে নবাবই শুধু একমাত্র রক্তপিপাসু ব্যাঘ্র আর উপরে ঐ কেমারলিঙ লি-মার্কার ঐ সজ্জিত বক্সে অপরূপ সাজে সজ্জিত বড় বড় লোকগুলা সকলেই নিরীহ মেষ! লুণ্ঠ-তরাজের উহারা কিছুই জানে না। ক্রোধে নবাবের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত শরীর অসহ্য তাপে তাতিয়া উঠিল। দর্শকের সে দৃষ্টি নির্ব্বাক হইলেও যেন বলিতেছিল, "চলিয়া যাও, চলিয়া যাও নবাব, এখান হইতে তুমি চলিয়া যাও। আমাদের সহিত একগৃহে বসিবার এতটুকু যোগ্যতাও তোমার নাই!"

নবাবের চোখের সম্মুখে কাহারা যেন নৃত্য করিতেছিল। তাহারাও যেন ঐ সকল দর্শকের সহিত মিশিয়া রুদ্র স্বরে কহিতেছিল, "তুমি চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, নবাব, এখান হইতে চলিয়া যাও।"

নবাবের মন ঝড়ের মেঘের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"কি, অযোগ্য আমি! লক্ষ্মীছাড়া রাক্ষসের দল, তোদের চেয়ে হাজার গুণে আমি শ্রেষ্ঠ! আমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া তোরা খাক্ হইয়া যাইতেছিস—কিন্তু আমার এ ঐশ্বর্য্য, এ ছয় মাসে, লুটিয়া লইয়াছে, কাহারা? তোরা, তোরা কাপুরুষ বর্ব্বর, শাদা মনের ফাঁদ পাতিয়া, ভণ্ডামির ঝুলি লইয়া, ভিখারীর বেশ ধরিয়া, নানাভাবে আমার এ ঐশ্বর্য্য তোরাই ত লুণ্ঠন করিয়াছিস্! ঘৃণ্য পথের কুকুরের মত আমার এক কণা প্রসাদ পাইবার আশায় আমার ভারী জুতা মাথায় বহিয়াছিস্—আমার এতটুকু উচ্ছিষ্ট পাইবার লোভে আমার দোরের মাটি চাটিয়াছিস্,—

পরিয়া আমার পানে বর্ব্বর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতেছিস—আমি ডাকাত, আমি চোর, আমি লুঠবাজ! ঐ যে মার্কুইস জরির জামা গায়ে আঁটিয়া, এক চরিত্র-হীনা নারীকে পাশে বসাইয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখিতেছিস, তুইই ত সেদিন আমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়া এক লক্ষ টাকা ভিক্ষা লইয়াছিলি! না দিলে ক্লাব হইতে অপমান করিয়া তোকে তাড়াইয়া দিবে! আর তুই, বিলাসিনী নারী, যে সব মণিমুক্তা আঁটিয়া এখানে আজ তোর ঐশ্বর্য্যের বহর দেখাইতে আসিয়াছিস, ও ঐশ্বর্য্য ত আমারই খোসামোদ করিয়া আমারই হাত হইতে তুই ভিক্ষা লইয়াছিলি! আর তুই নির্লজ্জ মশার্দ—মাথায় শুধু কালো কালি-ভরা, তুই ত আমারই উচ্ছিষ্টে শরীরটাকে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছিস্; তারপর ভিক্ষা বন্ধ করিয়াছি বলিয়া আমায় আজ কুকুরের মত দংশন করিয়া ফিরিতেছিস—তোকে কি মানুষ বলিয়া ভাবি? সেদিন পথে আমার হাতের চাবুক খাইয়াও তোর লজ্জা হয় নাই, তাই তুই ঐ ধবল-রোগী গণিকাটাকে লইয়া এখানে আসিয়া বসিতে পারিয়াছিস্! আর এই তোদের প্যারির সমাজ তোদের মত পাষণ্ডদের মাথায় তুলিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে! আমাকে পরিহাস করিস, তোরা? আমার জুতা খুলিবার যোগ্যতাও যদি তোদের থাকিত! তোরা আমার কুৎসা করিস? তোদের চেয়ে আমার আসন অনেক, অনেক উপরে, তা তোরা জানিস্?"

ক্ষুব্ধ প্রাণের মধ্যে কথাগুলা বিরাট চীৎকারে গর্জ্জন করিতেছিল! একটা অস্থির উত্তেজনায় নবাবের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিতেছিল। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, আর না, আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। এখনই একটা বিরাট জলোচ্ছ্বাসের মত ঐ হতভাগা জনতার উপর লাফাইয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে সে আহত, বিধ্বস্ত করিয়া দেয়! দারুণ উন্মাদনায় নবাবের সারা চিত্ত মাতিয়া উঠিয়াছিল। শুধু নখ দিয়াই এই বর্ব্বর দর্শকদের একটি একটি করিয়া টুঁটি ছিঁড়িয়া ঐ নির্লজ্জ মুখগুলাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবার বাসনা মুহুর্মুহু তাহার প্রাণখানাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। নবাব ত গিয়াছেই! সঙ্গে সঙ্গে এ লোকগুলারও অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়া যাইতে হইবে!

নবাবের চোখের সম্মুখে রঙ্গালয়ের উজ্জ্বল আলোগুলা চকিতে সহসা ম্লান হইয়া গেল—অভিনেতার উচ্চ চীৎকার ক্ষীণতায় মিলাইয়া পড়িল। নবাবের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল, দেহ টুলিয়া আসিল। নবাবের মনে হইল, সহসা যেন পৃথিবীখানা ভীষণ ভূমিকম্পের বেগে দুলিয়া উঠিয়াছে—আসনে বসিয়া মাথাটাকেও আর খাড়া রাখা যায় না—কে যেন জোর করিয়া টানিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতে চাহিতেছে। বুকের কাছে কি যেন ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। সহসা পরক্ষণেই চোখ তাহার মুদিয়া আসিল। নবাবের শির হেলিয়া পড়িল।

চকিতে অমনি কে আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল, "নবাব, মসুঁ—"! এ যে বড় পরিচিত স্বর—বড় স্নেহ-কোমল! কিন্তু

বড় দূর হইতে এ সাড়া আসিতেছে না? মার্শেল—মার্শেল—সে যে বহুদূরে!

নিরুপায় মজ্জমানের মত নবাব শূন্যে হাত বাড়াইল—কাহার তপ্ত স্পর্শ উত্তেজিত শিরায় মুহূর্ত্তে অমনি স্নিগ্ধতার প্রলেপ সিঞ্চন করিল। তারপর ক্ষীণ, অতি-ক্ষীণ কণ্ঠে কে কহিল, "আমি এসেছি, নবাব, আমি—আমি গেরি!" নবাব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গেরি দুই হাতে টানিয়া নবাবকে বুকে তুলিয়া পাশের জনহীন অন্ধকার বারান্দায় লইয়া আসিল। অধীর দর্শকের দল উল্লাসে মাতিয়া তখন "সাবাস! সাবাস!" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। আলোর লহরে রঙ্গালয় একেবারে হাসিয়া সারা হইয়া যাইতেছিল।

* * * *

রক্ত-ক্ষরণ, ক্যাপিং-গ্লাস, পুলটিস কিছুতেই আর সে অচেতন শরীরে স্পন্দন ফুটাইতে পারিল না। দুইজন ডাক্তারও সুদক্ষ শুশ্রূষাকারী হিমসিম খাইয়া গেল, গেরি তাহার সকল শক্তি লইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিল; কিন্তু নবাবের চৈতন্য ফিরিবার কিছুমাত্র আশা দেখা গেল না। কার্দ্দেলাক নিজে দেখিতে আসিতে পারিল না; সে তখন ভারী ব্যস্ত, তবে লোক পাঠাইয়া দিল, সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়! আরও সে লোকের মুখে বলিয়া পাঠাইল, পঞ্চম অঙ্কের যবনিকা পড়িলেই সে ছুটিয়া আসিবে!

বারাণ্ডার একেকোণে থিয়েটারের যত কিছু পরিত্যক্ত আসবাব পড়িয়াছিল, ছিন্ন ভিন্ন দৃশ্যপট, কাঠের বড় বড় বাক্স, কাঠের ভাঙ্গা সিঁড়ি, ফুটা বালতি, পায়া-হারানো অকেজো টেবিল—আবর্জ্জনার স্তূপ! তাহারই মধ্যে গেরি কোথা হইতে একখানা সোফা টানিয়া আনিয়া নবাবের দেহ তাহার উপর শোয়াইয়া দিয়াছিল। এ যেন জল-গিরিশৃঙ্গে চূর্ণ একখানা জাহাজকে ডাঙ্গার এক ধারে কাহারা টানিয়া তুলিয়াছে! তেমনই বিশাল দেহ, সর্ব্বাঙ্গে তাহার বিরাট হৃদয়ভেদী ধ্বংসের তেমনই চিহ্ন!

কপালে হাত দিয়া গেরি নবাবের মুখের পানে চাহিয়াছিল। তাহার চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে! হায়, একটু দেরী হইয়া গিয়াছে—আর যদি কয়মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে পৌঁছিতে পারিত! রাক্ষসের গ্রাস হইতে কিছুও যে সে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, এ খবরটা সে নিজের মুখে নবাবকে দিতে পারিলে হয়ত এতখানি কাণ্ড নাও ঘটিত।

বাহিরে আবার করতালির বজ্রনাদ উঠিল, সারা রঙ্গগৃহ সে নাদে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পরক্ষণেই বাহিরে গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ ও লোকের কোলাহল মুহূর্ত্তে জানাইয়া দিল, অভিনয় শেষ হইয়াছে—বিভ্রম-দীপ্ত দর্শকের দল দারুণ সুখের উচ্ছ্বাসে মাতিয়া গৃহে ফিরিতেছে! নবীন নাট্যকারের ললাটে প্রশংসার জয়টীকা পরাইয়া, তাহার প্রাণে নব-জীবনের উন্মেষ-রাগ ফুটাইয়া দলে দলে যখন সব গৃহে ফিরিয়াছে তখন ও-ধারে এই থিয়েটারেই এক পরিত্যক্ত নিভৃত কোণে—কি এক শোচনীয় করুণ নাটকের অভিনয় সুরু হইয়াছে! কেহ জানে না, কেহ তাহার সন্ধানও রাখিতে চাহে না। হৃদয়-হীন বর্ব্বর সহর!

অথচ এই রাত্রিটিরই আগমন-কল্পনায় নবাব কতদিন অধীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে! এই আলো, হাসি ও গানের সমারোহ-দৃশ্য ভাবিয়া কতখানি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! হায়, ঘুণাক্ষরেও সে ভাবে নাই, একদিন এ আলো জ্বলিবে, তবে সে তাহাকে পুড়াইবার জন্য—হাসিও ফুটিবে, কিন্তু হায়, সে তাহারই এই শান্ত সহানুভূতিকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিবার জন্য!

সহসা নবাবের দেহ একবার কম্পিত হইল—ওষ্ঠ একবার নড়িল, মুদিত চক্ষু একবার গেরির মুখ লক্ষ্য করিয়া পল্লব মেলিল—মৃত্যুর পূর্ব্বে সে চাহনি গেরিকে যেন পারির এই নিষ্ঠুর বর্ব্বর ষড়যন্ত্র, এই দারুণ শোচনীয় হত্যা-ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষ্য থাকিবার করুণ মিনতি হানিয়া পরক্ষণেই আবার চিরকালের জন্য মুদিয়া গেল!

সমাপ্ত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারত

শিক্ষা

পূর্ব্বে যে নবপ্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে সেই বিধিব্যবস্থা অধিকাংশ লোকে তেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করে নাই বরং কতকটা বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিয়াছিল; কেননা, তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কারাদি অন্য প্রকারের ছিল। কিন্তু শিক্ষার প্রভাবে যখন এক নব্য-বংশের লোক গড়িয়া উঠিল তখন তাহাদের নিকট এই শিক্ষা খুব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। উনবিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, শিক্ষা-পদ্ধতিকে এমন নূতন করিয়া ঢালাই করা হইল যে, ভারতীয় সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতা—এই উভয় সভ্যতারই অংশ এই পদ্ধতির মধ্যে স্থান পাইল।

*
* *

প্রথমে, প্রাথমিক-শিক্ষা সমস্তই দেশীয় ভাষায় দেওয়া হইয়া থাকে। দুই রকমের পাঠশালা। এক রকম পাঠশালায় ছাত্রদিগের কোন প্রকার পরীক্ষা দিতে হয় না এবং সে সকল পাঠশালার কোন বিবরণ লেখা হয় না। ব্রাহ্মণেরা, গ্রাম্য গুরুরা প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্রদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকে।

আর এক রকমের পাঠশালা আছে যাহার ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় এবং যে-পাঠশালাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথাঃ—গবর্ণমেণ্টের পাঠশালা; রাজসরকার হইতে সাহায্য পায় এইরূপ স্বাধীন পাঠশালা; এবং রাজসরকার হইতে সাহায্য পায় না এইরূপ স্বাধীন পাঠশালা। এই সকল পাঠশালার বালকেরা পড়িতে শেখে, লিখিতে শেখে, অঙ্ক কষিতে শেখে। ১৯০০ অব্দে, এই প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রসংখ্যা ছিল সাড়ে-ত্রিশ লক্ষ, তন্মধ্যে চারি লক্ষেরও কম—বালিকা।

*
* *

তারপর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা ইংরাজিভাষা, জ্যামিতি বীজগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, ভৌতিক-বিদ্যার কতকগুলি স্থূলতত্ত্ব, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে।

কোন কোন স্কুলে ইংরাজি পড়ান হয় এবং কোন কোন স্কুলে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু এই শেষোক্ত বিদ্যাগুলি ক্রমশই দৈন্যগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৯০০—০১ অব্দে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ছিল—৫৪৫,০৫৪।

উচ্চশিক্ষা। এই বিভাগে, য়ুরোপে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয় এইখানেও সেই সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলিকাতা, বোম্বাই, আলাহাবাদ ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন "কালেজ" গুলিতে এই উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল লাহোর-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একটি শিক্ষকমণ্ডলী আছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই সাহিত্য, আইন, চিকিৎসা, শিল্পকলা ও ব্যবসায়-আদির জন্য পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞান-ব্যাচিলারের উপাধি এবং লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচ্য-শিক্ষার ডিগ্রী প্রদত্ত হয়। ১৯০০—১৯০১ অব্দে উচ্চশিক্ষার ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১,৮২০ (১৮৯৯—১৯০০ অব্দে ছিল ২০,৭৪৪; ১৮৯৮—৯৯ অব্দে ছিল ২১,০০৬); প্রায় ৬০০০ উপাধি-পত্র বিতরণ করা হয়।

১৮৯৯—১৯০০ অব্দে, সরকারী শিক্ষার আয়ব্যয়ের পরিমাণ ছিল, ৩৭,৭৫৩,০১৪ টাকা, এবং ১৯০০—১৯০১ অব্দে আয়-ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮,৪৪৬,০০৯।

*
* *

ভারত-গবর্ণমেণ্ট-কর্তৃক প্রদত্ত ভারতীয় লোক-শিক্ষার এইরূপ কার্য্যফল। এই কার্য্য ফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রাথমিক পাঠশালায় চারি লক্ষ, গ্রাম্য পাঠশালায় চারি লক্ষ ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে শতকরা দশজনেরও কম ভারতবাসী লিখিতে পড়িতে জানে। ইহা নিশ্চয়ই যথেষ্ট নহে। গভর্ণ-মেণ্টের আরও বেশী ত্যাগস্বীকার করা উচিত এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাপদ্ধতি অল্প অল্প করিয়া ক্রমশ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।

যে সকল ছাত্র স্কুলে যায় তাদের সংখ্যা অল্প; প্রায় ৩।৷০ লক্ষ; এবং যারা কালেজে শিক্ষা লাভ করে তাহাদের সংখ্যা ৫ লক্ষ। যে সময়ে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল সেই সময়েরই মত এই শিক্ষা এক শ্রেণীর যেন বিশেষাধিকার হইয়া দাঁড়া-ইতেছে। চীনের মান্দারীনদিগের ন্যায় শিক্ষিত লোকের একটা বিশেষ শ্রেণী হইয়া না দাঁড়ায় তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

যে হেতু মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং যেহেতু জমির খাজনাই রাজস্ব, অতএব মধ্যমশ্রেণীর শিক্ষায় যে ব্যয় হয়, সে ব্যয়ভারের অধিকাংশ কৃষকদিগকেই বহন করিতে হয়।

কতকগুলি বিশেষ জাতি, প্রায় সমস্ত শিক্ষিত লোকের যোগান দিয়া থাকে। যথা:—বাঙ্গালী, গুজরাটি, তামুল ও তেলুগু। ইহা আর একটা আশঙ্কার বিষয়; কেন না, প্রতিযোগিতার পরীক্ষা করিয়া তবে লোকদিগকে সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হয়।

অধিকাংশ ছাত্র শাসন-বিভাগের পদ, উকীল-কৌঁশুলি-পদ ও সংবাদপত্রের সম্পাদক পদের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহারা যাহাতে বিজ্ঞানের দিকে, বিশেষতঃ ব্যবসায়িক বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগী হয় তৎপক্ষে গভর্ণমেণ্টের প্রযত্ন আবশ্যক। ভারতে উকীল কৌঁশুলির সংখ্যা, সংবাদ-পত্র সম্পাদকের সংখ্যা খুবই বেশী; ভারতের অভাব—চিকিৎসকের, পশুবৈদ্যের, ইঞ্জিনিয়ারের, কৃষি-বিশেষজ্ঞের, কলকারখানা-ওয়ালার ও বণিকের। ভারতের মন উপনিষদের স্বপ্ন-কল্পনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আরবেরা যেরূপ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই শিক্ষা য়ুরোপীয়দিগেরও চালান উচিত; ভারতবাসীদিগের স্বপ্নদর্শিনী বুদ্ধিকে তথ্যদর্শিনী বুদ্ধিতে,—কার্য্যকরী বুদ্ধিতে পরিণত করা কর্ত্তব্য।

ভাষা সম্বন্ধেও অনেক প্রতিবন্ধক আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ছাত্রেরা দেশীয় ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি ব্যবহার করে। এই প্রবণতা ক্রমে বাড়িবে বৈ কমিবে না। কেন না, যদিও দেশীয় ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটাই রীতিমত ধর্ম্ম-নীতিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অথবা গণিত-শাস্ত্র শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। পক্ষান্তরে, লোকসংখ্যার হিসাবে যাহারা শতকরা ৯০ সেই কৃষিজীবীরা ইংরাজি কহিতে চেষ্টাও করে না। হয়ত এমন সময় আসিবে যখন প্রাথমিক পাঠশালাতেও এই ইংরাজি ভাষার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

*
* *

ইংরাজের ভারতবিজয়ে ইংলণ্ডের যে নৈতিক সভ্যতা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার স্থূল রেখাগুলি উপরে প্রদর্শিত হইল। অবশ্য এই কার্য্যটি আমাদের নিকট অনিশ্চিত ও অসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কেন না, যে জাতি আর এক জাতির অন্তরাত্মাকে বুঝিতে ও জয় করিতে চেষ্টা করে তাহার কার্য্য এইরূপ হওয়াই সম্ভব। ইংরাজের সম্পাদিত সকল কার্য্যই এইরূপ হইয়াছে। কেজোবুদ্ধি ও দৈনিক প্রয়োজনের উপযোগী বুদ্ধি ইংরাজের চরিত্রে সমধিক থাকায়, ইংরাজ সূক্ষ্ম তত্ত্বাদিতে বিশ্বাস করে না, আস্‌মানের উপর নিখুঁত গন্ধর্ব্বনগর নির্ম্মাণ করিতে ভালবাসে না। এই সকল অভাব সত্ত্বেও হিন্দ-ব্রিটানীয় রাজসরকার ভারতে সভ্যতা প্রচাররূপকর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি করে নাই। সুশৃঙ্খলা ও শান্তির দ্বারা ইংলণ্ড এই সভ্যতা ভারতে আনয়ন করিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী কাল হইতে ভারত, বিদেশীর আক্রমণ হইতে, যুদ্ধবিগ্রহ হইতে, কিংবা অন্য গুরুতর উৎপাত-উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। বিশেষতঃ ইংলণ্ড, স্বাধীনতার

দ্বারা ভারতকে সভ্য করিয়াছে। ভারত-বাসীর সামাজিক প্রথা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না ইহাই রক্ষণশীল রাজনৈতিকদিগের মূল নিয়ম; আবার উদারনৈতিকেরা ভারতকে সেই সমস্ত পৌরজনিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে যাহা স্বয়ং ইংরাজেরা ইংলণ্ডে উপভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্রোতের ফুল

(৪৪)

মালতী গঙ্গায় ডুবিতে গিয়া যাহাকে দেখিয়া ফিরিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সে বিপিন। বিপিন আর আপনার দ্বন্দ্ব লইয়া গুহার মধ্যে বন্ধ থাকিতে না পারিয়া সেইদিন প্রত্যূষে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিতে-ছিল। দেখিল মালতী সেই প্রত্যূষে গঙ্গার ঘাটে যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এত ভোরে মালতী গঙ্গায় যাইতেছিল কেন? তাহাকে দেখিয়া মালতী অমন করিয়া পলায়ন করিল কেন?

আশ্রমে ফিরিয়াই বিপিন শুনিল গুরু তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিতেছেন। বিপিন যে তপস্যা ভঙ্গ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এই লজ্জায় সে আর গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। গুরু তীর্থযাত্রা করিলেন—ওয়েলার জুড়ি ফীটন গাড়ী টানিয়া আশ্রমের উদ্যানের ফটক পার হইয়া গেল।

সূর্য্য উঠিল, বেলা চড়িল। বিপিন স্তব্ধ হইয়া তখনও আপনার ঘরে বসিয়া আছে। এমন সময় শান্তি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—রাধারাণীকে আশ্রমে পাওয়া যাচ্ছে না! আপনি চট করে ষ্টেসনে গিয়ে গুরুদেবকে খবর দিন!

বিপিনের মাথার মধ্যে রক্তধারা নাগর-দোলায় চড়িয়া আকাশ পাতাল একাকার করিয়া ঘুরিতে লাগিল, চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাতাণ্ডবে প্রমত্ত হইয়া উঠিল; কানের মধ্যে হাজার ঝিঁঝিঁর ঝঙ্কার বাজিতে লাগিল; সকল গণ্ডগোলের মধ্যে একটি ধ্বনি শুধু সুস্পষ্ট ছিল—মালতী আশ্রমে নাই! নাই নাই, সে আশ্রমে নাই! বিপিনের দৃষ্টি যেখানে তাহাকে ধরিতে পারে হয় ত সে তেমন জায়গায় কোথাও নাই! পৃথিবীতেই আছে কি না কে জানে!

বিপিনের মনের মধ্যে আত্মগ্লানি ধিকার দিয়া তাহাকে বলিতেছিল—কেন সে সেদিন মালতীর যাহা বলিবার ছিল তাহা শুনে নাই! কেন সে তাহাকে পদে পদে শুধু আঘাত করিয়াই আসিয়াছে। মালতী

কোথায় গেল, কেন গেল এ সমস্যার মীমাংসা কে করিয়া দিবে। জীবনে আর কখনো তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিনা কে বলিবে।...মালতী বাঁচিয়া আছে কিনা তাহারই বা ঠিক কি? অমন কূলে কূলে ভরাজল দীঘি, অমন উচ্ছ্বল-তরঙ্গা জাহ্নবী ...এদের লোলুপ গ্রাসের কাছে মালতীর সুন্দর কোমল জীবনটি কতটুকু? এক নিমেষে হয় ত সব শেষ হইয়া গেছে! সে যেন শতবর্ষ মালতীকে দেখে নাই। তাহার যুগযুগান্তের সঞ্চিত বিরহব্যথা আজ অকস্মাৎ তাহার অন্তরের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার হৃদয় ফাটাইয়া অশ্রুজলে বাহির হইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

আজকার এই দুঃখদারুণ দুর্দ্দিনে তাহার আবাল্যের বন্ধু, পরম নির্ভর নবকিশোরকে মনে পড়িল, আর মনে পড়িল তার সেই স্নেহময়ী মাকে। আজ তাহার নিরাশ্রয় প্রাণ সেই দুটি স্নেহের বন্দরে আশ্রয় লইয়া নিশ্চিন্ত হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে-সমস্ত আচরণে তাঁহাদের স্নেহকোমল প্রাণে সে আঘাত দিয়াছে আজ তাহারা সূচীর মতো তীক্ষ্ণ স্মৃতি দিয়া তাহার মনকে বারবার বিদ্ধ করিতে লাগিল। আজ সে বুঝিতে লাগিল তাহার জন্য যে সান্ত্বনা তাহা গুরুর চরণে নহে, শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য পুঁথির মধ্যেও নহে, তাহা আছে কেবল তাহার বন্ধুর স্নেহ-উদার বক্ষে আর মাতার স্নেহশীতল ক্রোড়ে! যে কৃত্রিম গুরুভক্তির উত্তেজনা ভিতরকার মানুষটাকে বন্দী করিয়া তাহার সম্মুখে ধর্ম্মের সঙ্গীন চড়াইয়া পাহারা দিতেছিল, তাহা সরিয়া পড়িবামাত্র ভিতরকার মানুষটা বিপিনকে দণ্ড দিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল; রাশি রাশি বচন-চাপা হৃদয় আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ ছিল, আজ চরম দুঃখের আঘাতে তাহা অপসৃত হইবামাত্র মুক্ত হৃদয় আপনার চিরকালের সকল সন্তাপহরণ স্নেহ-আশ্রয়ের দিকে ধাবিত হইল। তাহার আর তখন গুরুর রক্তচক্ষু, বা আশ্রমবাসীদের কৌতূহলী দৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ রহিল না, সে তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন সময় তারক তাহার দাঁতগুলি বাহির করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন তাহাকে লক্ষ্যও করিল না। কিন্তু তারক খুব টেঁকসই মানুষ, সে উপেক্ষা অবহেলায় দমিবার পাত্রই নয়। সে হ্যাঁই হ্যাঁই করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিতে লাগিল—কিহে ভায়া? আমরা মনে করছিলাম তোমার বাপ মা তোমাকে বনবাস দিলে, বাস, ঐখানেই দাঁড়ি। তা নয়, মহাকাব্যের কোনো অংশ বাদ পড়বে না; ··· লক্ষ্মণবর্জ্জনটা ত আগেই হয়ে গেছে, এবার সীতা হরণও হল! তারপর আর বাকী কি?

বিপিন একলম্ফে গিয়া তারকের টিকি ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিল—তারপর তাড়কা রাক্ষসী বধ আর হনুমানের মুখ পোড়ানো বাকী আছে।··· বেরো বাঁদর, নইলে তোকে দিয়েই বাকী অনুষ্ঠান সাঙ্গ হয়ে যাবে।

বিপিন এক ধাক্কায় তারককে ঘর

হইতে বাহিরের দালানে ফেলিয়া দিল। বিপিনের কথা ও কাজের বায়না-স্বরূপ তারক যাহা পাইল তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া ফাউএর প্রত্যাশা না রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলায়নের উপক্রম করিল।

বিপিন দেখিল তারকের হাত হইতে বারান্দার মার্ব্বেল মেঝের উপর তাহারই একখানি ফটোগ্রাফ পড়িয়া গেল। এই ফটোগ্রাফ তাহার মথুরাপুরের ঘরে ছিল। ইহা এখানে কেমন করিয়া আসিল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বিপিন তাড়াতাড়ি উহা কুড়াইয়া লইয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিল, —এ তুমি কোথায় পেলে?

তারক কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল—ঐটেই ত তোমায় দিতে এসেছিলুম। গুরুদেব তীর্থে যাচ্ছেন শুনে সকাল-সকাল তাঁকে প্রণাম করতে এসেছিলুম। এসে দেখলুম গুরুদেব চলে গেছেন, তাঁর ঘরে এইটে পড়ে আছে। শুনলুম এই ছবিখানি বুকে করে নাকি মালতী কাঁদছিল, তাই গুরুদেব তিরস্কার করেছেন, আর সেই রাগে মালতী আজ বেরিয়ে গেছে!

বিপিনের চোখের সম্মুখ হইতে বিশ্ব-চরাচর লুপ্ত হইয়া গেল… চোখের সম্মুখে কালো অন্ধকারের মধ্যে সবুজ নীল হলদে লাল আলোর কণা বিচিত্র ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোল-গোল ডোরা কাটিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার মনের ভিতর এমন একটা বিরুদ্ধ বিপ্লব জমিয়া উঠিল যে সে শূন্যদৃষ্টিতে তারকের দিকে চাহিয়া মর্ম্মর-খোদিত পাগলমূর্ত্তির মতো নিস্পন্দ নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪৫)

ক্ষণেক পরে চেতনা পাইয়া বিপিন ছুটিয়া ষ্টেশনে গেল। গিয়া দেখিল ষ্টেশনে প্রেমানন্দ বা মালতী কেহ নাই—শুধু আছে আফিস-যাত্রী ডেলী-প্যাসেঞ্জার বাবুদের ভিড়।

বিপিন নবকিশোরের কাছে যাইবার জন্য টিকিট কিনিয়া গাড়ীর আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর পদক্ষেপে প্ল্যাটফরমের এ-মুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ী আসিল। বিপিন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, পাশের কামরা হইতে যোগানন্দ নামিয়া আসিয়া বিপিনের কাঁধে হাত দিল। বিপিন পিছন ফিরিয়া যোগানন্দকে দেখিয়া স্তম্ভিত কুণ্ঠিত হইয়া গেল—সে যে অসময়ে তপস্যার গুহা ছাড়িয়া আশ্রম হইতে অন্যত্র শান্তির সন্ধানে চলিয়াছে। যোগানন্দ তাহাকে সে বিষয়ে কিছুমাত্র প্রশ্ন না করিয়া বলিল—গুরুদেব তীর্থে গেলেন, আমি তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। রাধারাণী কলকাতা চলে গেছেন ……তুমি যাও, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসগে।

বিপিন গাড়ীর পা-দান হইতে পা নাবাইয়া লইল, গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

যোগানন্দ আর কিছু বলিল না। বিপিনের হাত ধরিয়া লইয়া আশ্রমে ফিরিল। বিপিন গম্ভীর নির্ব্বাক; সে আপনার ঘরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন সে মাথা তুলিল, দেখিল তাহার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া

আছে নবকিশোর ও তাহার পশ্চাতে কুণ্ঠিতা মালতী। বিপিনের হৃদয় আনন্দে অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার বন্ধু ও মালতীকে এমন অপ্রত্যাশিত রকমে নিকটে পাইয়া তাহাদিগকে বাহুবেষ্টনে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা হইলেও দারুণ অভিমানে সে স্থির হইয়া বসিয়াই রহিল।

নবকিশোর প্রথম কথা কহিল—মালতীর এ আশ্রমে থাকা বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে; তাই খুড়িমার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে সে আমার কাছে গিয়েছিল—তুমি তখন গুহায় বসে তপস্যা করছিলে। কিন্তু ওকে আশ্রমে এনেছ তুমি, তোমাকে না বলে যাওয়া ওর উচিত নয়, তাই আমি ওকে রাখতে এসেছি। তুমি ত গুহা থেকে বেরিয়েছ—তোমার গুরুর অত্যাচার থেকে মালতীকে রক্ষা করতে না পার ওকে খুড়িমার কাছে রেখে এসো।

নবকিশোর বিপিনের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মালতী নতমুখে অসহায় দাঁড়াইয়া রহিল—সে না পারে থাকিতে, না পারে কোথাও সে যাইতে, সে যে এ আশ্রম হইতে পলাইয়া গিয়া ইহা হইতে ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিপিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল এই অনুপমা সুন্দরী তাহারই প্রতি অনুরক্ত বলিয়া সে গুরুর শাসনে লাঞ্ছিতা। সে আনন্দ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—মালতী, তুমি দাঁড়াও, আমি শান্তিকে ডেকে দিচ্ছি।

মালতী আসিয়াছে খবর পাইয়াই শান্তি তাড়াতাড়ি আসিতেছিল। বিপিন ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল শান্তি তাড়াতাড়ি আসিয়া মালতীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এস দিদি এস। আমি আর কখনো তোমায় চোখের আড় করব না। তুমি এস।

মালতী নত হইয়া শান্তিকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল—এমন স্নেহ সে ত মা ছাড়া আর কাহারো কাছে পায় নাই। মালতীর চোখে জল পড়িল।

শান্তি মালতীর চোখ মুছাইয়া তাহাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল; মুগ্ধ বিপিন প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মালতীর মনের মধ্যে জলতরঙ্গের সুরে বিপিনের কথার স্নেহ করুণা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল; যাহার জন্য সে এত সহিতেছে সে তাহার প্রতি একেবারে উদাসীন নহে, এই আশ্বাসে মালতীর অন্তরে প্রণয়প্লাবন দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল। গুরুদেব আশ্রমে নাই; পরম নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল মনে মালতী শান্তির সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুর ও আশ্রমবাসীর সেবা যত্নে আপনাকে একেবারে নিযুক্ত করিয়া দিল; এতকাল নিশ্চেষ্টতার পরে অকস্মাৎ তাহার নারীপ্রকৃতি ছাড়া পাইয়া নিপুণ সেবা-যত্নে সকলকে পরমাত্মীয় মুগ্ধ করিয়া তুলিল।

বিপিনও বাদ পড়িল না। মালতী নানান কাজের মধ্যে কতবার বিপিনের কাছাকাছি হইত; মালতীর চঞ্চল গতি, কর্ম্মে ব্যস্ততা, কর্ম্মে নিবিষ্ট তাহার সুকুমার কপোলের একটি অংশ, তাহার বসিবার বিশেষ ভঙ্গী, তাহার ...

কুঞ্চিত স্ফুরিত চুলগুলি—যাহা বিপিন দেখে তাহাতেই তাহার ব্যাকুল চিত্তের মধ্যে তুফান উঠে। কিন্তু বিপিন নিজের হাতে তাহার ও মালতীর মাঝখানে একটা এমন অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছিল যে তাহারা কিছুতেই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছিল না। যেমন একখানা বড় ষ্টিমার যাত্রী লইয়া ঘাটের কাছে আসিয়াও ডাঙায় ভিড়িতে না পারিয়া একবুক আগ্রহ লইয়া ডাঙার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, বিপিনও তেমনি করিয়া মালতীর দিকে তাকাইয়া থাকিত।—কে সে সেতু, কে সে খেয়া নৌকা যে স্রোতের মধ্যগতকে ডাঙার সহিত মিলন করাইয়া দিবে! বিপিন ও মালতীর এখন বহুবার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু দৃষ্টি একবার সম্মিলিত হইয়াই নত হইয়া পড়ে, দুজনেরই চক্ষু কি জানি কিসের অভিমানে ছলছল করিয়া উঠে।

মালতী আশ্রমের পরিচর্য্যার ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত আশ্রমের গৃহিণীপনা সম্পন্ন করিয়াও তাহার সময় কাটিতে চাহিত না। আর এই আশ্রমে তাহার থাকিবার হেতুই বা কি? যাহাদের সেবা করিতেছে তাহারা তাহার সেবার কাঙাল নহে; দেবতা বলিয়া যে বিগ্রহের সেবা হয় তাহার প্রতি তাহার ঈশ্বরপ্রত্যয় নাই; সুতরাং এখানে থাকার সার্থকতাই বা কি? মালতীর মনে হইতেছিল এর চেয়ে কোনো দীন আতুরের আশ্রমে সেবিকা হইলে অপেক্ষাও উপকার হইত তাহারও জীবনের

একটা অর্থ মিলিত। এই-সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার কল্পনায় গার্হস্থের একটি মোহিনী ছবি ফুটিয়া উঠিত—যেখানে সে বিপিনকে আর তাহার সন্তানগুলিকে প্রাণ মন দেহ দিয়া সেবা করিতে পারে এমন একখানি প্রণয়পবিত্র স্নেহসরস গৃহে স্থান পাইবার প্রলোভন তাহার বুকের ভিতর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া বাহির করিত।

(৪৬)

এমনই সুখদুঃখ কল্পনা নিরাশাতেই তাহাদের আরো কত দিন কাটিতে পারিত।

হঠাৎ উৎসব আসিয়া সকলের নিজের ভাবনা ভুলাইয়া দিল। আজ দোলপূর্ণিমা। তাহার উপর অকস্মাৎ গুরু তীর্থ হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাই আজ সমস্ত দিন আশ্রমে উৎসব চলিয়াছে। আবিরের ধূলায় পথ ঘাট ঘর দুয়ার আজ লালে লাল; শ্বেত পাথরের স্বচ্ছ মেঝেয় আবিরের ছোপ যেন উষার আকাশের মতো সুন্দর দেখাইতেছিল। আজ সকলের গৈরিক বাসের উপর আবিরের লালিমা দিবস-প্রারম্ভের ন্যায় লোহিতপীত শোভা ধারণ করিয়াছিল। সব চেয়ে সুন্দর দেখাইতেছিল আজ মালতীকে। রক্তচন্দন-লিপ্ত শ্বেতপদ্মকোরকের ন্যায়, নবোদ্গত-কিশলয়শোভিতা লতার ন্যায়, কন্দর্পের কুসুমকার্ম্মুকের ন্যায় সেই কৃশমধ্যমাকে আজ চমৎকার দেখাইতেছিল। আবিরের রক্তরাগ লোহিততর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার লজ্জার অরুণিমায়। আজ তাহার ও বিপিনের দৃষ্টি আবিরলুব্ধ কমকমের মতো কতবার

মিলিত হইয়াছে, প্রাণের মধ্যে তাহাদের ব্যগ্র বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, যে রঙে রঙে প্রিয়জনকে রঙাইয়া তোলা যায় তাহা ফাটিয়া পড়িতে চাহিয়াছে, কিন্তু লজ্জায় বাধিয়াছে, শুধু নিজেরাই নিজেদের প্রাণের রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছে।

এমনি করিয়া সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যা হইতে না হইতে পশ্চিমদিকের আকাশে আবির ছড়াইয়া সূর্য্য আকাশের অপর প্রান্তে সহস্রকর বুলাইয়া চুম্বন করিল, অমনি সে দিককার আকাশও জাফরান-গুঁড়ায়-মেশানো আবির মাখিয়া কমলারঙে ভরিয়া উঠিল।

যখন বিতায়মান জ্যোৎস্না আকাশ ঘিরিয়া সোনারূপায়-বোনা চন্দ্রাতপ ছড়াইয়া দিল, যখন কোকিল পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া স্নিগ্ধপরশ দক্ষিণা হাওয়া মথিয়া তুলিল, যখন বকুল চাঁপার গাছগুলি ফুলের নেশায় মাতিয়া উঠিল, তখন তালীকুঞ্জের পাশে শস্পক্ষেত্রে অবিররাঙা লালজলের ফোয়ারার ধারে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে লইয়া প্রেমানন্দ হোলির গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সে গান প্রথমে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে চিত্ত উদ্বোধিত করিয়া প্রকৃতির ভাষার মতো ক্ষরিত হইতে লাগিল—

কুসুম ভরে নব পল্লব দোল।
মধু পিবে মধুকরী মধুকর বোল॥
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়।
হুঁছজন আরতি চন্দন-বায়॥
পুর্ণমিক রাতি মোহন ঋতুরাজ।
বিদগধী বিদগধ মিলন সমাজ॥

তার পর বাহির হইতে আনন্দহিল্লোল যখন হৃদয় স্পর্শ করিল, তখন গুরু অন্তর-ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন—

আবিরে অবশ সব বৃন্দাবন
উড়িয়া গগন ছায়।
বন্ধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেহ না দেখিতে পায়॥
চপল নয়ন পিচকারি যেন
নিরখে নয়ন মোর।
নব অনুরাগ ফাগু ভরল
তনু মন করি ভোঁর॥

গানের উত্তেজনায় ভাব যখন আকার পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল তখন সেই সুদূর বৃন্দাবনের চিরন্তন নরনারীর প্রণয়-লীলার ভিতর দিয়া বৈষ্ণব কবির কণ্ঠস্বরে নিজের হৃদয়ভাব ঢালিয়া দিয়া গুরু গাহিতে লাগিলেন—

খেলত ফাগু বৃন্দাবন-চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ-মনমথ ছান্দ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী-নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়ানে॥

এইরূপে মানবহৃদয়ের সুপ্ত লালসার পিঠে গানের চাবুক মারিয়া মারিয়া গুরুজীর উৎসব-রথ খুব বিজয়গর্ব্বেই অনেক রাত পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল।

গুরু ক্লান্ত হইয়া থামিলে শিষ্যগণ গান ধরিতেছিল, শিষ্যগণ থামিলে গুরু গান ধরিতেছিলেন, আসর জুড়াইতে পাইতেছিল না। সকলেই আজ যেন মধুমত্ত।

মালতী সেখানে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। যখন সকলে কীর্ত্তনে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে আস্তে আস্তে সকলের অজ্ঞাতসারে সেখান হইতে উঠিয়া নির্জ্জনে আসিল। সে একবার

মাথার উপর চাহিল, তাহার মনে হইল আকাশখানি যেন প্রকাণ্ড একখানি মুক্তা-জননী শুক্তিপুটের মতো গোলাপি নেশায় বিভোর হইয়া আছে। আকাশে যেন হিমস্পর্শ আগুন লাগিয়াছে। একটা বাদুড় মাথার উপর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে-ছিল, যেন মাধবী যামিনীর ফুলশয্যার জন্য রূপালি-সোনালি জ্যোৎস্নার টানায় অন্ধকারের পোড়েন বুনিতেছিল, যেন নিশার অন্ধকার সঙ্কুচিত হইয়া ঝোপ ঝাড়ের আড়াল হইতে একটুকরা দূতকে আজিকার এই আলোক-উৎসব দেখিতে পাঠাইয়াছে। তরুলতাও আজ প্রবালকান্তি কিশলয়ে সাজিয়া, ভ্রমর-গুঞ্জনে প্রলাপ বকিয়া, দক্ষিণা হাওয়ায় টলিয়া টলিয়া উৎসবমত্ত মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

আজকার উচ্ছল জ্যোৎস্না, আম্রমুকুলের মদিরগন্ধ, আর উতলা-করা দক্ষিণা হাওয়া যেন তাহার প্রাণের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার অন্তর বাহির রসাবেশে আপ্লুত করিয়া তুলিতেছিল। আজকার এই রাত্রিটি যেন তাহার সমস্ত জীবনের আনন্দঘন মূর্ত্তি ধরিয়া অমৃতনির্য্যাসের মতো দেখা দিয়াছে... আজকার রাত্রি ব্যর্থ যাওয়া যেন সমস্ত জীবনটার ব্যর্থতা। তাহার মনে হইতেছিল আজকার এই মধুনিশা নেশার মতো ভালবাসায় ডুবিয়া যাইবার রাত...এরাত শুধু প্রাণ খুলিয়া ভালো বাসিবার আর প্রাণভরা ভালোবাসা পাইবার। এই নিঃশব্দ শুভরাত্রি যেন কিংখাবের ফরাশ বিছাইয়া তাহারই মতো বিরহিনীর বেশে জাগিয়া জাগিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—

মাধবী নিশার এই পরিপূর্ণ বাসকসজ্জার মাঝখানে যেদিনে কাঠেরও প্রাণ ভেদ করিয়া শোণিত-রাঙা পল্লবের রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিতেছে, গন্ধপাগল ফুলের ঠিকঠিকানা থাকিতেছে না, সেদিনে মানুষের প্রাণ ভেদ করিয়া প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মালতী নিজেকে আর সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না; তাহার অন্তর ভেদ করিয়া রক্তচোয়ানো অশ্রু চোখ চিরিয়া বাহির হইবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতেছিল। সে আস্তে আস্তে গঙ্গার ঘাটে গেল। সেখানেও শ্বেত পাথরের উপর জ্যোৎস্নার সোনালি প্রলেপ, গঙ্গার অভ্ররজত স্রোতের উপর চন্দ্রবিম্বের সোনালি প্রতিচ্ছায়া, ওপারে অদৃশ্য নৌকার সোনালি আলোক-বিন্দুর স্পন্দন, তাহার প্রাণের সমস্ত সৌন্দর্য্যরসকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। তাহার ব্যর্থ যৌবনশ্রী আজ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে তাহার ললিত অধরে, তাহার ভ্রমর-কালো চোখের আড়ালে, তাহার সদাস্মিত শান্ত দৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়া উঠিল—এবং মালতী এই আকস্মিক আবির্ভাব অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল। মালতী শ্বেত পাথরের সোপানে সোপানে আবিররাঙা পায়ের দাগ রাখিয়া রাখিয়া প্রায় জলের ধারে গিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল।

আজ বিপিনের চিত্তও নিশ্চিন্ত ছিল না। কোনো কল্পবৃন্দাবনের কল্পিত নরনারীর রসসম্ভোগের মধ্যে সে আপনারই বাস্তব চরিতার্থতার সম্ভাবনা অনুভব করিতেছিল। উন্মাদনা যখন চরম হইয়া উঠিতেছিল

তখন সে মনে করিতেছিল, আর নয়, এমন জীবন আর নয়। আজ সে গুরুকে আপনার অক্ষমতা নিবেদন করিয়া এই সন্ন্যাসের পথ হইতে চিরজন্মের জন্য বিদায় লইবে, মালতীকে আজ গভীর-দুঃখে-যাচাই-করা খাঁটি প্রাণ দান করিয়া সে সুখী হইবে। যে রমণীকে প্রথম দর্শনের দিনেই সে বরণ করিয়াছিল, যাহাকে প্রত্যেকবার যখনই সে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে তখনই সেই বাঞ্ছিতা বিচিত্র ঘটনাসংঘাতে তাহার দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই সুদুর্লভ প্রেয়সী নারীকে আজকার এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যরসের মাঝখানে একেবারে আপনার করিবার আনন্দ তাহার বুকের মধ্যে মহোৎসবের মতো ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আজ সকল সঙ্কোচ ভুলিয়া সেই প্রেয়সীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে এবং এজন্মে কোনো অপরাধের অবসর আর রাখা হইবে না,—এই চিন্তার দুঃখে ও সুখে, অধৈর্য্যে ও আশায় বিপিনের অন্তর-বীণার সমস্ত তারগুলি বিচিত্র রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এতক্ষণ মাথা নত করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। গান বন্ধ হইবামাত্র সে পুলকপূর্ণ দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিতে গেল, কিন্তু দেখিল মালতী সেখানে নাই, গীতসভার অদূরে দাঁড়াইয়া আছে নবকিশোর ও তাহার দু-পাশে দুহাত ধরিয়া বিনোদ ও বিনি।

বিপিন গুরু ভুলিয়া, গীতসভা ভুলিয়া, আশ্রম ভুলিয়া এক দৌড়ে ছুটিয়া গিয়া বাহুবেষ্টনে বিনোদ ও বিনিকে একসঙ্গে বুকে টানিয়া লইয়া চুম্বনের পর চুম্বন করিতে লাগিল। তাহার অন্তরে সঞ্চিত যে ভাবরাশি প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা দীর্ঘ অদর্শনের পর ভাই-বোনদের বুকে পাইয়া অশ্রুপ্লাবনে মুক্তি পাইয়া বাঁচিল। নবকিশোর বিপিনের কাঁধে হাত রাখিয়া বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—তোমার বাবার খুব অসুখ; মা তোমায় নিতে এসেছেন; বাগানের বাইরে গাড়ীতে আছেন।

বিনোদ ও বিনিকে দুই হাতে দুই কোলে উঠাইয়া বিপিন ছুটিয়া চলিল মায়ের কোলে এতদিন পরে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিতে। বিপিন গাড়ীর দরজা খুলিয়া মায়ের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, গিন্নি দুই হাতে পরিত্যক্ত পুত্রকে তুলিয়া ধরিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া অশ্রুধৌত চুম্বনে এতদিনকার সকল গ্লানি মোচন করিয়া ফেলিলেন।

ক্ষণেক নীরব ক্রন্দনের পর গিন্নি অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—বিপিন, উনি আর এ যাত্রা রক্ষা পাবেন না; তোকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন; যা, বৌমাকে ডেকে নিয়ে আয়, এই গাড়ীতেই আমি তোদের নিয়ে তবে ফিরব।

বিপিন মায়ের আদেশে প্রফুল্ল অন্তরে মালতীকে ডাকিবার জন্য বালকের মতো ছুটিয়া আশ্রমে ফিরিল। কিন্তু গীতসভার কাছাকাছি হইয়া তাহার অত্যন্ত লজ্জা হইতে লাগিল, কেমন করিয়া সে গুরুর নিকটে বিদায় লইবে, কেমন করিয়া সে অপর সন্ন্যাসীদের দৃষ্টির ধিক্কার সহ্য করিবে।

বিপিন যতই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল তাহার গতি ততই মন্থর ও মন ততই কুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

অনেক বাঁকা পথে ঘুরিয়া অনেক ইতস্তত করিয়া বিপিন যখন গীতসভায় ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল যে গীতসভায় মালতীও নাই, গুরুও নাই। বিপিন আনন্দিত হইল—নির্জ্জনে গুরুর নিকটে বিদায় লইয়া মালতীকে চুপিচুপি ডাকিয়া লইয়া সে মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

বিপিন আশ্রমবাটিকার ঘরে ঘরে খুঁজিল, কোথাও গুরু বা মালতী নাই। তালীবন, লতাবিতান ঘুরিয়া বিপিন গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিল। দূর হইতে দেখিতে পাইল গুরু ধীরে ধীরে সোপানে অবতরণ করিতেছেন। বিপিন লজ্জিত কুণ্ঠিত হৃদয়ে গুরুর কাছে বিদায় লইবার জন্ম অগ্রসর হইতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির চাতালে আসিয়া দাঁড়াইয়া বিপিন দেখিল মালতী দুই পা জলে ডুবাইয়া সিঁড়ির একটা ধাপে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে, আর ক্রন্দনাবেগে তাহার দেহখানি রূপের ঢেউ-টির মতন আন্দোলিত হইতেছে; এবং তাহারই চরণস্পর্শে গঙ্গাস্রোত একগাছি বড় রূপালি তাবিজের মতন কুঞ্চিত হইয়া শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। জ্যোৎস্নার আলিঙ্গন-বদ্ধা রূপসীর ক্রন্দন দেখিতে দেখিতে প্রেমানন্দ এক পা এক পা করিয়া ধাপের পর ধাপ নামিয়া ক্রমে ক্রমে একেবারে মালতীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন—গঙ্গার কলধ্বনি ও নিজের ক্রন্দনশব্দে মালতী প্রেমানন্দের ধীর পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

প্রেমানন্দ নত হইয়া ধীরে ধীরে দুখানি হাত মালতীর দুই কাঁধে রাখিলেন। মালতী চকিত চমকিত হইয়া ঝটিতি দুই হাত দিয়া দৃষ্টির উপর হইতে অশ্রুজাল অপসৃত করিয়া চাহিয়া দেখিল—প্রেমানন্দ একেবারে তাহার মুখের কাছে অবনত হইয়া আসিয়াছে। মালতী চীৎকার করিয়া দুই হাতে তাহাকে জোরে ঠেলিয়া দিয়া গঙ্গার জলে সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। অমনি মালতী দেখিল চাতালের উপরে বিপিন স্থির নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া আছে।

মালতীর মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—দেখুক, বিপিন দেখুক, তাহার গুরুর আচরণ! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, বিপিন যদি তাহাকে ভুল বুঝে! এই আশঙ্কায় তাহার সমগ্র জীবনের সমস্ত আশা ভরসা কল্পনা আনন্দ এক আঘাতে ভঙ্গুর কাচপাত্রের মতো ঝমঝম করিয়া ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল; তাহার প্রাণের মধ্যে শ্মশানের হাহাকার দারুণ অট্টরোলে তাহাকে বধির করিয়া তুলিল। আজিকার আকাশভরা জ্যোৎস্নায় কালি ঢালিয়া দিয়া বসন্তরাত্রির সমস্ত সুধারস এক নিমিষে উবিয়া গেল। সেই কেয়ারি-করা বাগান, সেই মার্ব্বেল পাথরের স্বচ্ছ নির্ম্মল ঘাট, সমস্তই আজ অসুন্দর! গঙ্গার জল শাণিত ইস্পাতের তরবারির মতো তাহার সমস্ত আশা উত্তম শক্তি ছিন্ন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এতকালের এত অপেক্ষা, এত আকাঙ্ক্ষা,

এত সাধনা সমস্ত আজ নিষ্ফল। সে নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতার মধ্যে আমরণ ডুবিয়া থাকিবে, আর নির্ম্মম বিচারক বিপিন যেমন দূরে ছিল তার চেয়েও দূরে সরিয়া গিয়া তাহাকে ভুল বিচার করিবে! মালতীর চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে এতদিন বুক দিয়া যে পাথর সরাইতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই পাথরে বুকের সমস্ত বল ও আশা পিষিয়া গিয়া শুধু রক্তপাতই তাহার সার হইল, সেই কঠিন পাথর সূচ্যগ্র পরিমাণও সরিয়া বসিল না। কী ভীষণ ব্যর্থতা! ওঃ এ কী ভীষণ পরিণাম! এতদিন ধরিয়া দুরাশার গোড়াতেই কি সে হৃদয়ের রক্ত সেচন করিল শুধু নিষ্ফলতা পাইবার জন্য! হায় হায় এ কি লজ্জা, এ কি দুঃখ, এ কি নিষ্ঠুর নিয়তি!

প্রেমানন্দ মালতীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া যখন দেখিল সোপানের উপরে বিপিন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন তিনিও মর্ম্মান্তিক লজ্জায় আড়ষ্ট অভিভূত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একবার মনে হইল জাহ্নবীর অতল গর্ভে তাঁহার নিতল নীচতার সকল লজ্জাগ্লানি ডুবাইয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে যুগল বিচারকের চরম দণ্ডবিধান না শুনিয়া মরিতেও তাঁহার সাহসে কুলাইতেছিল না। তিনি বজ্রাহতের ন্যায় নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিপিন গুরুকে গ্রাহ্যমাত্র না করিয়া শান্ত স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—মালতী, এস, মা আমাদের নিতে এসেছেন। আজ আমাদের বিবাহরাত্রি।

বিপিনের বাক্যে মালতীর সর্ব্বাঙ্গে মূর্চ্ছা সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এ কি স্বপ্ন, না মোহ, না মতিভ্রম! এ যে বিশ্বাসেরও বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না! এত সৌভাগ্য কি তাহার! স্রোতের ফুল কি এতদিনে কূল পাইল!

মালতীর মনে হইতে লাগিল যেন চন্দ্রলোক হইতে সুরগায়কেরা অমৃতধারা ঢালিয়া গাহিতেছে বিবাহরাত্রির অভিনন্দন। —তাহার মনে হইতে লাগিল—আজ জল স্থল আকাশ মধুময়! অন্তরীক্ষ বায়ু মধুময়! পত্র পুষ্প মধুময়! পৃথিবীর ধূলি পর্য্যন্ত আজ মধুময়! ভগবান কি দুঃখকে চরমে তোলেন সুখকে এমনি পরিপূর্ণভাবে সম্ভোগ করাইবার জন্য? মালতী মনে মনে সকল ভয়ের ভয় ও সকল প্রাণীর গতি যিনি অন্তরদেবতা তাঁহাকে একইকালে দুঃখবিধাতা ও সুখবিধাতা জানিয়া মনে মনে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। সে আনন্দবাহুল্যে বিপিনের দিকে চাহিতেও পারিল না। তাহার সমস্ত হৃদয় আনন্দের অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গেল।

প্রেমানন্দ এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—বিপিনবাবু, মালতী, আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা পেলাম যে গুরু হওয়া মানুষের সাজে না। আমার গুরুগিরির আজ এই শেষ। আমি এখনই আমরণ তীর্থপর্য্যটনে চল্লাম। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

সমাপ্ত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবঘুরে

(নাটিকা)

দৃশ্য ঃ—কুটীরস্থ প্রাঙ্গনে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। নিকটেই একটি বালক খেলা করিতেছে।

বালক।—মা, আজকে তুমি এ ঘরগুলো এমন করে সাজাচ্ছ কেন?

মা।—আজকের দিন যে আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন বাবা!

বালক।—কেন মা?

মা।—সাত বছর আগে ঠিক এই দিনে তারা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল,—আমি তাদের বাড়ীর দাসী ছিলুম।

বালক।—সত্যি? সে বাড়ী কোথায় মা?

মা।—সে অনেক দূরে বাবা!—তার কাছেই একটা ছোট পাহাড় ছিল—লোকে সেটাকে সোনার পাহাড় বল্‌ত।

বালক।—সোনার পাহাড়! বাঃ! তা'লে জায়গাটা কি চমৎকার!

মা।—হ্যাঁ বাবা, জায়গাটি চমৎকার বটে। কিন্তু আমি যখন পথে বসলুম তখন শীতের কন্‌কনে হাওয়া বইচে। সেই দারুণ শীতে আমার কোনো আশ্রয় ছিল না। কতকগুলো লোক আমার নামে লাগালে তাইতেই তারা আমাকে তাড়িয়ে দিলে—তুমি তখন খুব ছোট—তোমাকে বুকে

বালক।—(নিকটে আসিয়া) সত্যি? শীতে তোমার খুব কষ্ট হ'ল?

মা।—কষ্ট হয়েছিল বৈ কি বাবা! কিন্তু কি করব বল? তোমাকে নিয়ে আমি সেই ঠাণ্ডায় খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে চল্‌তে লাগলুম। শীতে আমার সমস্ত গা একেবারে হিম হয়ে গেল—তোমার সমস্ত শরীর নীল হয়ে উঠল। আমি কত লোকের পায়ের কাছে কেঁদে পড়ে বল্লুম—"ওগো আজ রাতের মতন আমার বাছাটিকে একটু থাক্‌বার ঠাঁই দাও, ওর তো কোনো অপরাধ নেই!—আমি না-হয় রাস্তায় পড়ে থাকি!" কিন্তু কেউ সে কথা কানে নিলে না। আমি ছুটে ছুটে বীরপুর পর্য্যন্ত এলুম...

বালক। অ্যাঁ, বীরপুর? সে ত কাছেই। ঐ যে খাবারওলা এখানে খাবার বেচতে আসে, সে বলে তার বাড়ী সেইখানে।

মা।—তা হবে। কিন্তু সেদিন কারও দরজা খোলা পাইনি। রাত্তির অনেক হয়েছে—যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে! আমার পা আর চল্ল না, আমি রাস্তার ধারে পাথরের উপর ঘুরে পড়ে গেলুম।

বালক।—আমিও যে একবার পাথরের উপর পড়ে গিয়েছিলুম...আমার পা ভেঙে গিয়েছিল—এই দেখনা!

মা।—পড়ে গিয়ে আমি তোমাকে

অন্ধকারে দেখ্‌লুম একজন লম্বা লোক আমার দিকে আস্‌ছেন। সেই ভয়ানক অন্ধকারেও আমি তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম। তাঁর হাতে একটি মালা দেখেছিলুম,—সে মালাটি যেন এখনও আমার চোখের সামনে রয়েচে।

বালক।—সে কে মা?

মা।—তা তো জানিনে বাবা! তাঁকে আমি কেবল সেই একদিন মাত্র দেখেছিলুম, তার পর আর কখনও দেখি নি। তিনি আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে তুলে বল্‌লেন "ঐ সাম্‌নের রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলে একটা বাড়ী পাবে, সেখানে যাও। সেখানে তুমি থাকবার জায়গা পাবে।"

বালক।—তারপর?

মা।—তারপর আমি তাঁকে আর দেখ্‌তে পেলুম না। আস্তে আস্তে উঠে আমি এখানে চলে এলুম। এ বাড়ীতে তখন একটি বুড়ো থাকতেন। তিনি আমাকে আদর করে ঘরে এনে বসালেন...আমি তাঁকে আমার দুঃখের কাহিনী বল্লুম—তিনি সব শুনে আমাকে এই বাড়ীতেই থাক্‌তে বল্লেন...তারপর তিনি মারা যাবার সময় আমাকে এই বাড়ীটা দিয়ে গেলেন।

বালক।—মা, সেই লোকটি আবার কবে আসবে?

মা।—তা তো জানিনে বাবা! তিনি বলেছিলেন আবার দেখা হবে, কিন্তু কবে তা তো ঠিক করে বলেন নি; তাঁর অপেক্ষায় তো আছি। কতবছর ধরে আজকের দিনে ঘর সাজিয়েছি, কতবার রাত্তির বেলা দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখেছি...কিন্তু কৈ তাঁর দেখা তো এখনো পেলুম না!

বালক।—মা, তিনি এলে যদি আমি ঘুমিয়ে থাকি, তবে আমায় জাগিয়ে দিও। আমি তাঁকে দেখব।

মা।—আচ্ছা দেব। কিন্তু এখন তুমি কোথাও যেও না, লক্ষ্মীটির মতন ঘরে বসে থাকো—বুঝেছ, আমি পাশের বাড়ী থেকে এখুনি আস্‌ছি।

বালক।—আমি ঐ গাছটার কাছ পর্য্যন্ত যাব মা? ঐখানটিতে খেল্‌তে আমার বড় ভাল লাগে।

মা।—না বাবা, তুমি ঘর থেকে বেরিও না। আজ সকাল থেকে নদীটা কেমন ডাকছে। আমার কেমন ভয় হয়,—বাইরে বেরিয়ে পাছে তুমি নদীর ধারে গিয়ে পড়! আমি এখুনি ফিরে আস্‌ব।

বালক।—আচ্ছা মা, আমি এখানেই বসে-বসে খেলব। তুমি কিন্তু বেশী দেরী করো না।

মা।—না আমি এখুনি আস্‌ব।

[প্রস্থান]

বালক।—(কতকগুলি গাছের ডাল লইয়া ভাঙিতে ভাঙিতে) একটা...দুটো ...ওঃ এটা কি শক্ত...এটা আবার ভিজে, ...তিন্‌টে...পাঁচটা হলেই চলবে...একটা ছোট কেল্লা তৈরি করতে হবে...এবার ঐ বড় ডালটা ভাঙা যাক্...ওঃ কি শক্ত! আমি পারব না...না...

(দরজা খুলিয়া একটি লোকের প্রবেশ। পা খালি, কাপড়ে কাদা মাখা—গায়ে কাপড় নাই। বালক কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।)

বালক।—কে তুমি?

লোক।—আমি ভবঘুরে।

বালক।—ভবঘুরে! সে আবার কি?

লোক।—আমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই।

বালক।—ওঃ তুমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াও? তাহলে তুমি সোনার পাহাড় দেখেছো?

লোক।—দেখেছি বৈকি! সেইখান থেকেই ত আস্‌ছি। তাই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি এখানে একটু বস্‌তে চাই।

বালক।—বেশ বেশ, তুমি এখানে আমার কাছে বোস। আমি তোমার কাছ থেকে সোনার পাহাড়ের গল্প শুন্‌ব।

লোক।—(বসিয়া) বেশ। সোনার পাহাড়? সে একেবারে সোনার পাহাড়! তার মাঝখানটিতে একটি সুন্দর বাগান আছে—সেখানকার গাছে কেবল ফুল আর ফল!

বালক।—আর কি আছে?

লোক।—আর?—কত রঙের যে পাখী! লোকে সেখানে পুজো দিতে যায়। চারদিকে উঁচু উঁচু পাঁচিল দিয়ে বাগানটা ঘেরা।

বালক।—পাঁচিল দিয়ে ঘেরা? তবে লোকেরা কি করে তার ভিতর যায়?

লোক।—বাগানের চারটে বড় বড় দরজা আছে—একটা সোনার, একটা রূপোর, একটা পিতলের আর একটা পাথরের।

বালক।—আচ্ছা আমরা এই কাঠি-

লোক।—আচ্ছা, বেশ।

(উভয়ে কাঠি দিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে লাগিল।)

বালক।—সোনার পাহাড়ের বাগানে আর কি আছে?

লোক।—সেখানে চারটে বড় বড় পুকুর আছে—তার জল পরিস্কার—তক্‌-তক্‌ করচে—একেবারে তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়। কত রকমের রঙিন মাছ সেখানে খেলে বেড়াচ্চে।

বালক।—আমাকে ঐখান থেকে ঐ মাটির পেয়ালাগুলো পেড়ে দাও না··আমি ঐগুলো দিয়ে পুকুর তৈরি করব।

(লোকের তথাকরণ।)

লোক।—বাঃ এখন দিব্যি একটি বাগান হয়েছে।

বালক।—আচ্ছা, কি করে আমরা সোনার পাহাড়ের কাছে যাবো?

লোক।—কেন আমার ঘোড়ায় চোড়ে যাবো।

বালক।—আমাদের ত ঘোড়া নেই।

লোক।—আমি তোমাকে ঘোড়া এনে দেব। এখনকার মতন তুমি আমার পিঠে চড়—আমি তোমার ঘোড়া হই।

বালক।—বাহবা, সে বেশ মজা হবে।

(বালক লোকটির পিঠে চড়িল)

লোক

গান।

আমি তোমায় নিয়ে যাব
কত দূরের সেই অজানা দেশে···

[বালকের মাতার প্রবেশ। লোকটি

মা।—[লোকের দিকে কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া বালককে কোলে উঠাইয়া লইয়া] তুমি কি রকম লোক গা? এই রকম করে ঘরের ভিতরে এসে ছেলের গায়ে হাত দাও? তোমার আস্পর্দ্ধা ত' কম নয়। যাও—এখুনি বেরিয়ে যাও!

বালক।—ওকে তাড়িয়ে দিও না মা! ও বেশ লোক। আমাকে কতরকম গল্প বল্লে—আমার ঘোড়া হয়ে কেমন খেল্‌ছিল।

মা।—তোমার সঙ্গে খেল্‌ছিল? ওকি তোমার সমযুগ্যি লোক বাছা? দেখদিকি, তোমার কাপড়খানায় কি রকম ধুলো কাদা লাগিয়ে দিয়েছে—তোমার কি কিছু আক্কেল নেই বাপু—যাও, এখনও বল্‌ছি যাও—

বালক।—ও অনেক দূর থেকে আস্‌ছে মা, আজকের মতন ওকে ওখানে থাক্‌তে দাও।

লোক।—হ্যাঁ বাছা, আজকের মতন আমাকে থাকতে দাও—আমি বড় ক্লান্ত।

মা।—তুমি কতদূর থেকে আস্‌ছ গা?

লোক।—অনেক দূর, এই নদী যেখানে শেষ হয়েছে—সেইখান থেকে—সোনার পাহাড়ের কাছ থেকে। গ্রামে আমাকে কেউ থাক্‌বার জায়গা দিলে না—তাই ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষটা এখানে এসেছি—

মা।—না বাপু, এখানে তোমার থাকা হবে না—আমার এখানে অন্য লোক আসবেন—এখানে জায়গা হবেনা। সহর এখান থেকে ত বেশী দূর নয়। সেইখানে যাও না।

বালক।—মা, দেখ আমরা একটা কেমন বাগান তৈরী করেছি।

মা।—আমার এই সব পেয়ালাগুলো কে নাবালে? আমি তোমাকে বুঝি বসে-বসে এই করতে বলে গিয়েছিলুম?

(বালককে চপেটাঘাত)

লোক।—(অগ্রসর হইয়া) আহা, মেরোনা, ওর কিছু দোষ নেই, ও-সব আমিই ওকে পেড়ে দিয়েছি?

মা।—তুমিই দিয়েছ? ভারি কাজই করেছ! তোমার এসবে কি দরকার ছিল বাপু? এ ভদ্রলোকের বাড়ী—তোমার মতন বদমাস্‌দের তো আড্ডা নয়—এখান থেকে যাও, বেরোও বলছি, এখানে তোমার কিছুতেই থাকা হবে না—

লোক।—আচ্ছা তাই যাচ্ছি বাছা! আমার দুঃখ নেই, আমাকে প্রায়ই রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাতে হয়, লোকের বাড়ীতে আশ্রয় আমার ভাগ্যে খুব কমই ঘটে।

মা।—তার আর আশ্চর্য্যটা কি?—তোমার মত লোককে বাড়ীতে কে আশ্রয় দেবে বল? তোমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাও—যত রাজ্যের মাতাল, বদমাস্, চোর—

লোক।—ঠিক বলেছ। যত রাজ্যের মাতাল বদমাস্ আর চোরই আমার বন্ধু—আমি তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে থাকি—তোমরা যাদের ঘৃণা কর, যাদের তোমরা ঠাঁই দাও না, না খেতে পেয়ে যারা মরে—যত অভাগা, পতিতা—সকলেই আমার সঙ্গী—যত গরীব, যত পাগল, যত খারাপ লোক, আমারই সঙ্গে তারা থাকে।

মা।—আচ্ছা, খুব বক্তৃতা হয়েছে—এখন

যাও, তোমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাও—যাও বল্‌ছি! এখুনি যাও, নইলে—

(ধীরে ধীরে লোকটি চলিয়া গেল)

কোথাকার হতভাগা লোক এসে আমার সমস্ত জিনিষ একেবারে ওলট্‌ পালট্‌ করে দিয়ে গেল। দেখ দিকিনি, ঘরে একরাশ ধুলো জমে গেছে—

(জিনিষগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল)

বালক।—(ভূমি হইতে একটি মালা তুলিয়া লইয়া স্বগত) এটা নিশ্চয়ই সেই ভবঘুরে ফেলে গেছে। ওটাত এখানে ছিল না.....যাই, এটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

(মায়ের অলক্ষ্যে বালক কাপড়ের ভিতরে মালা লইয়া বাহির হইয়া গেল।)

মা।—আমার এই ভাল ভাল চক্‌চকে তক্‌তকে পেয়ালাগুলোকে কি-রকম যাচ্ছেতাই নোংরা করে দিয়ে গেছে...আমার সব খারাপ করে দিলে—মাগো, দেখে আমার কান্না পাচ্চে!

বালক।—(ফিরিয়া আসিয়া) না, ভবঘুরে চলে গেছে, তাকে খুঁজে পেলুম না।

মা।—কাকে খুঁজে পেলি না?

বালক।—ভবঘুরেকে।

মা।—সে কে?

বালক।—ওই যে ঐ লোকটা, যাকে তুমি এখুনি তাড়িয়ে দিলে! ও বল্লে ওর নাম ভবঘুরে—ও খালি ঘুরে-ঘুরেই বেড়ায়।

মা।—সে হতভাগাকে খুঁজতে গেলি কেন?

বালক।—সে যে এই মালাটা ফেলে গেছে, তাই আমি তাকে ওটা ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিলুম! সে বোধ হয় অনেক দূর চলে গেছে মা,—আমি তাকে দেখতে পেলুম না। অন্ধকার হয়ে এল।

মা।—দেখি দেখি, কি মালা!

বালক।—(কাপড়ের ভিতর হইতে মালা বাহির করিয়া) এই যে!

মা।—অ্যাঁ! এ ত সেই মালা!

বালক।—কোন্‌ মালা মা?

মা।—এ সেই মালা—এ তাঁরই মালা!—এ মালা আমি ভুলিনি! আজ তবে তিনি এসেছিলেন! আমি অভাগী তাঁকে চিন্‌তে পারলুম না—চিন্‌তে পারলুম না! এ আমি কি করলুম—তাঁর-দেওয়া ঘর থেকে তাঁকেই তাড়িয়ে দিলুম! আমার দুয়ারে এসে তিনি ফিরে গেলেন—আমি তাঁকে এই ঘরে বসাতে পারলুম না। পোড়া মন আমার এই মাটির জিনিষগুলো নিয়ে মেতে রইল—ওরই পানে চেয়ে রইল—তাঁর মুখের দিকে একবার চাইলে না। দূর হোক্‌! এ ছাই জিনিষ! দূর হোক্‌!

(বলিতে বলিতে জিনিষগুলি ভূতলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল)*

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

* বিদেশী নাটিকার ভাবানুসরণে।

হৃদয়ের বিকাশ

হৃদয় কথাটি একদিকে অতি সহজ। কিন্তু অপর দিকে ইহা তেমনই অতীব জটিল। সেই জটিলতার সরলতা সম্পাদনের জন্যই আমাদের উপস্থিত প্রয়াস।

আমাদের শরীরে রক্তের আধার যে একটী যন্ত্র আছে তাহাকেই সাধারণতঃ হৃদয় বা হৃদযন্ত্র বলা হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে এই যন্ত্রের বিকাশ হইতে বহু সময় লাগিয়াছে। ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যতেই ইহার পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে। ইতর প্রাণীতে এই হৃদযন্ত্র কেবল যে অপরিণত তাহা নহে কিন্তু কোন কোন ইতর প্রাণীতে ইহার সম্পূর্ণ অভাবই পরিদৃষ্ট হয়। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা পতঙ্গ-জাতিতে হৃদযন্ত্রের প্রথম সূচনা-মাত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। (১) পশু পক্ষী মনুষ্য মাত্রেই হৃদযন্ত্রের প্রকৃত পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে হৃদযন্ত্রের পরিণতির সঙ্গে যে প্রাণীদিগের বিকাশের একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ নিম্নতম জীব-শ্রেণীতে হৃদযন্ত্রের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি উচ্চতর মেরুদণ্ডী জীব মৎস্য-জাতিতেও ইহার অঙ্কুরাবস্থামাত্র দেখা যায়। (২)

আমরা হৃদযন্ত্রকে রক্তের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। সুতরাং রক্তের পরিণামের সহিতই যে ইহার সম্বন্ধ হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। দেহগঠনে আমরা রস ও রক্তকেই মূল উপাদানরূপে দেখিতে পাই। ইহা হইতে আমরা রসজীবী দেহ ও রক্তজীবী দেহ—দেহের এই দুই প্রকারের বিভাগ প্রাপ্ত হইতে পারি। উদ্ভিজ্জাদি যে রস দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া জীবিত থাকে তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। নিম্নতম জীবের মধ্যেও দেহের প্রধান উপাদানরূপে একমাত্র রসকেই বিদ্যমান দেখা যায়—তাহাতে রক্তের কোনও সম্পর্কই দেখিতে পাওয়া যায় না। কীটাদি ক্ষুদ্রতম জীব এই শ্রেণীভুক্ত। উদ্ভিজ্জাদির সহিত জীবের পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্য হইতে জীব ও উদ্ভিদ যে একই ক্রমবিকাশ-শৃঙ্খলে গ্রথিত তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। উচ্চতর জীবের রক্তও রসেরই পরিণতি। কারণ ভুক্তদ্রব্য প্রথমতঃ রসেই পরিণত হয়; তাহা হইতেই পরে রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জীবদেহের রক্ত আবার শীতল ও উষ্ণ এই দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এই দুই প্রকারের রক্ত বিশিষ্ট জীবদিগকে

(1) "The first indication of an organ like the heart is seen in insects. National Encyclopædia.

(2) "Among vertebrate animals the simplest form of heart is found in fish. National Encyclopædia."

আমরা "শীতলশোণিতধারী" ও "উষ্ণশোণিতধারী" এই দুই নামে অভিহিত করিতে পারি। রসও শৈত্যগুণবিশিষ্ট বলিয়া শীতল শোণিত অনেকটা রসেরই প্রকৃতিযুক্ত। তাহাতেই শীতল শোণিতজীবী দেহের রসজীবী দেহেরই সহিত অধিক সাদৃশ্য। সুতরাং শীতল শোণিতধারী জীব বিকাশক্রমে রসজীবী অপেক্ষা উন্নত হইলেও উষ্ণ শোণিতধারী জীব অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে শীতল ও উষ্ণ শোণিত যে জীববিকাশের বিশেষরূপ নির্দ্দেশক হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

রক্ত যে এইরূপে বিকাশের লক্ষণ হইয়াছে, তাহার কারণ এই বলিয়াই আমাদের মনে হয় যে রক্তের মধ্য দিয়াই চৈতন্যের প্রথম প্রকাশ হইয়া থাকে। এই জন্যই রসোপজীবী উদ্ভিদ ও নিম্নতম জীবে আমরা চৈতন্য বিশেষরূপে অস্ফুট দেখিতে পাই এবং শোণিতধারী জীবে আমরা চৈতন্যের অধিক সঞ্চার দেখিতে পাই। শোণিতধারী জীবের মধ্যেও আবার শীতল শোণিতধারী জীব অপেক্ষা উষ্ণ শোণিতধারী জীবে চৈতন্যের অধিক স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে শোণিত চৈতন্যের প্রকাশক বলিয়া শোণিতের উৎকর্ষই যে বিকাশের উৎকর্ষ হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আমাদের সমাজে বংশোৎকর্ষের যে বিচার দেখিতে পাওয়া যায় মূলে তাহা রক্তোৎকর্ষের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

শোণিত চৈতন্যের আধার বলিয়া জীব দেহে শোণিতের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। যে সমস্ত জীবে হৃদযন্ত্র নাই তথায় রক্ত কোন নির্দ্দিষ্ট আধারে সঞ্চিত হইতে না পারায় সর্ব্ব দেহেই ব্যাপ্ত হয় সুতরাং ইহাদের মধ্যে চৈতন্যও সর্ব্ব দেহেই ব্যাপ্ত থাকে। তাহাতেই ইহাদের কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে তাহাতে চৈতন্যের লক্ষণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত জীবে রক্ত হৃদযন্ত্রে সঞ্চিত হয় চৈতন্যও তথায় বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। তাহাদের চৈতন্য বিশেষরূপে হৃদযন্ত্রে সন্নিবিষ্ট থাকায় তাহাদের কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে তাহাতে কোন চৈতন্যই বিদ্যমান দেখা যায় না। রক্ত হৃদযন্ত্রে পিণ্ডীভূত হয় বলিয়াই ইহার নাম হৃৎপিণ্ড হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডকে যেমন সমস্ত রক্তের কেন্দ্রস্থান বলা যায় তেমনই ইহাকে সমস্ত চৈতন্যেরও কেন্দ্রস্থান বলা যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ড হইতে যেমন রক্ত সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয় তেমনই হৃৎপিণ্ডের কার্য্য হইতেই সমস্ত ভাবেরও উৎপত্তি হয় বলিয়া আমরা মনে করি। ভাবপ্রকাশের ইন্দ্রিয়ের নাম আমাদের ভাষায় "অন্তঃকরণ"। অন্তঃকরণ শব্দে আমাদের মনকেই বুঝাইয়া থাকে। মনই আমাদের মধ্যে সাধারণ চেতনতত্ত্ব। হৃদয় বা হৃৎ শব্দেও আমাদের মনকে বুঝাইয়া থাকে। এই প্রকারে হৃদয় বা হৃৎ যেমন রক্তাধাররূপ হৃৎপিণ্ডকে বুঝায়—তেমনই ইহার কার্য্যরূপ মনোব্যাপারকেও বুঝায়। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে মন, জড় ও চেতন উভয় প্রকৃতিরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ড ও ইহার কার্য্যে

আমরা সেই উভয় প্রকৃতির স্পষ্ট ব্যাখ্যাই প্রাপ্ত হই। সুতরাং হৃৎ ও মন কিরূপে অভিন্ন হইয়াছে তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

হৃৎপিণ্ড ও মনের পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধ হইতে হৃৎপিণ্ডই যে মনের প্রকৃত স্থান এই গূঢ় রহস্যটী আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছি। হৃৎপিণ্ড চৈতন্যতত্ত্ব বা মনের স্থান বলিয়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে চৈতন্য ও জীবন উভয়ই বিলোপ পায়। আমরা এস্থলে হৃদয় ও মনকে যে একার্থক প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহা আমাদের ভাষায় আবহমানকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাতেই অমর-কোষ অভি-ধানে আমরা উভয় শব্দকেই একই পর্য্যায়-ভুক্ত দেখিতে পাই যথা—"চিত্তন্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ।" এখানে চিত্তও যে হৃদয় বা মনেরই নামান্তর তাহাও আমরা পরিষ্কারই বুঝিতে পরিতেছি। এই প্রকারে এক হৃদয়েই যেমন অমরা বৈজ্ঞানিক শরীরযন্ত্র প্রাপ্ত হইতেছি—তেমনই দার্শনিক হৃদয়, মন, চিত্ত প্রভৃতি চৈতন্যতত্ত্বও প্রাপ্ত হইতেছি। এই প্রকারে হৃদযন্ত্র যেমন একদিকে মনপ্রভৃতির আধার হইতেছে তেমনই অপরদিকে মন প্রভৃতিও হৃদযন্ত্রেরই ব্যাপার হইতেছে।

হৃদযন্ত্রের সহিত মনোভাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—ভাষায় ও সাহিত্যে তাহা আশ্চর্য্য-রূপেই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। কোন লোকের হৃদ্‌বৃত্তির বিশেষ পরিচয় পাইলে আমরা তাঁহাকে 'হৃদয়বান্,' 'সহৃদয়' বা 'হৃদয়ালু' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। আবার কোন ব্যক্তিতে হৃদ্‌বৃত্তির পরিচয় না পাইলে আমরা তাহাকে 'হৃদয়হীন' বলিয়া অভিহিত করি। ইংরাজীতে এরূপ-স্থলে 'possessed of good heart', 'heartless' প্রভৃতি কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে হৃদযন্ত্রের উৎকর্ষের সহিতই যে উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির যোগ এবং হৃদযন্ত্রের অপকর্ষের সহিতই যে নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির যোগ তাহাই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

কাহারও উদার মনোভাব দেখিলে আমরা তাঁহাকে 'প্রশস্তহৃদয়', 'উদারচেতা', 'মহামনা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকি। আবার তদ্বিপরীত অনুদারভাব দেখিলে 'সঙ্কীর্ণ হৃদয়', 'ক্ষুদ্রচেতা', 'নীচমনা' প্রভৃতি বিশেষণে তাহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকি। ইংরাজীতেও এতদনুরূপ 'large hearted', 'broad minded', 'high minded' এবং 'narrow minded', 'small hearted,' 'low minded' প্রভৃতি কথার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা হইতে হৃদযন্ত্রের প্রশস্ততার সহিতই যে উন্নত মনোভাবের সম্বন্ধ তাহাই বুঝিতে পারা যায়। 'নীচ' শব্দের মধ্যেও হৃদযন্ত্রের অবস্থানের রহস্যই আবিষ্কার করা যাইতে পারে। মনুষ্যব্যতিরিক্ত প্রাণী সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া চলিতে পারে না বলিয়া—তাহাদের মধ্যে হৃৎপিণ্ড নিম্নমুখে অবস্থিত থাকে। মনুষ্য সোজাভাবে দাঁড়াইতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাহাতে হৃৎপিণ্ড ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে। মনুষ্যের হৃৎপিণ্ডের এই ঊর্দ্ধমুখ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌বৃত্তির উৎকর্ষ...

হওয়াতেই মনুষ্যের সম্বন্ধে এই উন্নত ভাবের প্রকাশক, 'উচ্চহৃদয়', 'উচ্চান্তঃকরণ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত মনুষ্যের হৃদ্‌বৃত্তি ইতর প্রাণীর ন্যায় অনুন্নত তাহাদিগের সম্বন্ধে ইতর প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের অবস্থাজ্ঞাপক "নীচ হৃদয়", "নীচান্তঃকরণ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

হৃদযন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে পদ্মসদৃশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতেই 'হৃদয়কমল' 'হৃৎকমল', 'হৃৎপুণ্ডরীক' প্রভৃতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

হৃদয় ভাবের আধার বলিয়াই অত্যধিক হর্ষস্থলে আমরা বলিয়া থাকি 'হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না' আবার অত্যধিক কষ্টের সময় বলি 'হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।' ইংরেজীতে 'heart-rending' কথাটীও এই অর্থই প্রকাশ করে। আমাদের 'ভগ্নহৃদয়' ও ইংরেজী 'broken hearted' প্রভৃতি কথার যথার্থ অর্থ হৃদ্‌যন্ত্রের সহিত যোগের দ্বারাই পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি হইতে পারে।

ইংরেজী 'heart' শব্দ সংস্কৃত 'হৃৎ' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। তাহাতেই উভয় শব্দের মধ্যে অর্থগত এরূপ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের সুহৃদ্ কথাটিতে মিত্রভাবের দ্বারা যে আমাদের হৃদয়ের প্রসন্নতা উৎপাদন হয় তাহাই বুঝিতে পারা যায়। তদ্বিপরীতে 'দুহৃদ্' কথাটিতে অমিত্রভাবের দ্বারা হৃদয়ের অপ্রসন্নতা উৎপাদন হয় হৃদযন্ত্রের স্ফূর্ত্তির ভাব ও অস্ফূর্ত্তির ভাব তাহাতে সন্দেহ নাই।

হৃদযন্ত্র রক্তেরই আধার সুতরাং ভাবের সহিত হৃদ্‌যন্ত্রের যেমন সম্বন্ধ রক্তের সহিতও যে ভাবের তদ্রূপ সম্বন্ধই হইবে তাহা সহজবোধ্য। আমাদের একটী কথা আছে "রক্তের টান্", তাহাতে রক্ত সম্বন্ধমূলে যে একটী ভাবের বন্ধন ঘটে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ইংরাজীতে অসদ্ভাব বুঝাইতে 'ill-blood' কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ক্রোধের ভাব উদিত হইলে "blood is up" কথার দ্বারা প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে রক্তের উপর ভাবের কিরূপ প্রভাব তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইংরাজীতে 'warmth of feeling', 'warmth of love' প্রভৃতি যে সকল কথা আছে তাহাতে উষ্ণ শোণিতের সহিতই যে এই সমস্ত ভাবের বিশেষ যোগ তাহাই যেন প্রমাণিত হয়। আমাদের "অনুরক্ত" কথার সহিত রক্ত কথার যে মূলগত সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে তাহাও রক্তের সহিত অনুরাগের সম্বন্ধেরই যেন প্রমাণ দিয়া থাকে। রক্ত শব্দ রঞ্জিত অর্থের প্রকাশক। অনুরাগের দ্বারা রক্তের বর্ণ বিশেষরূপে উজ্জ্বলতা ধারণ করে—ইহাই রঞ্জনার্থের তাৎপর্য্য বলিয়া বোধ হয়। 'বিরাগ' 'বিরক্ত' শব্দের দ্বারা ইহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ রক্তের বিবর্ণ ভাব প্রকটিত হয়—ইহাই যেন তাৎপর্য্য বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ সুখ, দুঃখ, হর্ষ, শোক প্রভৃতিতে

—তাহা বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে রক্তের মধ্যে কিরূপে প্রথম চৈতন্যের অঙ্কুর সঞ্জাত হইয়া রক্তের হৃৎপিণ্ডের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা জড় হৃদযন্ত্র ও চেতন হৃদয়-তত্ত্বে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহা আমরা ভাষা ও সাহিত্যে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভারতের খনিজ পদার্থ

আমাদের স্বর্ণ-প্রসূ ভারত চিরকাল বহু রত্নের আকর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। আমাদের দেশের সুবর্ণ এবং হীরক সৌন্দর্য্য-প্রভায় জগৎ আলো করিত। কিন্তু সেই প্রাচীন কালে খনিজ পদার্থ খনি হইতে উপরে তোলা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ছিল। সুবর্ণের কষিত-কান্তি চিরকালই মানব-সমাজকে প্রলুব্ধ করিয়া আসিয়াছে। সুবর্ণ ব্যতীত ভারত ইস্পাতের জন্যও বিখ্যাত ছিল। আমাদের গ্রাম্য কর্ম্মকারগণ যে সমস্ত ইস্পাত তৈয়ারি করিত, য়ুরোপের কারিকরেরা বহুদিন পর্য্যন্ত তাহা জানিত না। আমাদের কাঁসার এবং অন্যান্য ধাতুর কার্য্য অনেকদিন অবধি জগতের নিকট আদর্শস্থানীয় ছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের নেতৃত্ব বহুদিনস্থায়ী হইল না। য়ুরোপ কাজের সুবিধার জন্য Steam power এবং electric power আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ লোকের যাতায়াত এবং বিভিন্ন প্রদেশে জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী সুবিধাজনক করিয়া তুলিল। আমাদের ভারতীয় শিল্পিগণ বহুদিন ভারতের বাহিরের কোন খবর না রাখায় ক্রমশঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটিয়া আসিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি আমরা কোন খনিজ পদার্থ বিদেশ হইতে আমদানী করি নাই; দেশোৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যেই আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্যই বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইয়া লইতে পারিতাম। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডের প্রভুত্ব ভারতে অটুট হইয়া উঠে। ভারতও ক্রমশঃ ইংলণ্ডের সহিত আদান-প্রদান করিতে আরম্ভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কারণ এই সময়েই steam power আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ্ ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। দীর্ঘকালব্যাপী ফরাসী-রাষ্ট্র-বিপ্লব য়ুরোপের জনসাধারণের প্রাণে নবোৎসাহ ও কর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রৎ করিয়া তুলে।

ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ এখানে ইংরাজী সভ্যতার ছায়াও

বিশালতর হইয়া উঠিতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড কৃষিকার্য্য প্রায় ছাড়িয়া দিয়া কলকারখানার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। ১৮৪৪ সালে যখন free trade principles গ্রাহ্য হয় এবং Cornlaw একেবারে তুলিয়া দেওয়া হয় তখন হইতেই ইংলণ্ড প্রকৃত পক্ষে কারখানার জীবন গ্রহণ করে।

আমাদের দেশে ক্রমশঃ ইংলণ্ডের কারখানায় প্রস্তুত সুলভ মূল্যের দ্রব্যের আমদানী হইতে লাগিল। য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞের উদ্ভাবিত যন্ত্র যেমন আমাদের তাঁতীদের ব্যবসা অচল করিয়া দেয়, সেইরূপ সস্তায় প্রস্তুত য়ুরোপীয় লৌহ ভারতে আসিয়া আমাদের কামারদের ব্যবসায়েও ঘা দিল। কারখানায় একসঙ্গে একেবারে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারা যায়। একেবারে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিলে নানা কারণে খরচও খুব কম পড়ে। কাজেই হাতে প্রস্তুত দ্রব্য কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর মহার্ঘ্য হয়।

১৯০১ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের statistical report দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গড়ে প্রতিবৎসর ১০,১৫৮,২৫২ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য আমরা ভারতে আমদানী করিয়াছি। কাঁচের দ্রব্য, মাটীর ও চীনা মাটীর খেলনা ইত্যাদি, লোহার দ্রব্য, ছুরি কাঁচি ইত্যাদি এবং রেলওয়ের কলকব্জা প্রভৃতি একসঙ্গে ধরিলে ৮০ লক্ষ পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, আমরা প্রতিবৎসর প্রায় এক কোটী টাকার খনিজ-পদার্থ আমাদের ব্যবহারের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী করি। আমরা কোন্ কোন্ দ্রব্য আমদানী করি, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল।

খনি হইতে উৎপন্ন তৈল	২৪৫৬৮৭৫ পাউণ্ড।
লৌহ	২২৪৪৯০৮ ,,
ইস্পাত	১৫১৭৯৬৯ ,,
তামা	১০৯০৮৫৩ ,,
হীরা, মুক্তা ইত্যাদি	৮৩৫৩১৯ ,,
ডাক্তারি ঔষধপত্র	৩৭৭৪৯৭ ,,
কয়লা ইত্যাদি	৩০২৩১৪ ,,
মার্‌বেল পাথর প্রভৃতি	১৭৪৯৭০ ,,
সীসা	১৩৬৪৪৪ ,,
জারমান্ সিল্‌ভার্	১২৭৬১৪ ,,
পিতল	৬৬০৮৪ ,,
অন্যান্য খনিজ পদার্থ	৭১৬৫১ ,,
দস্তা	৮৭৯৮৯ ,,
কুইক্ সিল্‌ভার	২৮২৬০ ,,

উপরিউদ্ধৃত তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা যত জিনিষ আমদানী করিয়াছি তাহার মধ্যে লৌহের ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লৌহ ও ইস্পাত শতকরা ৩৭, তামা ১০, খনিজ তৈল ২৪·৩, হীরা মুক্তা ইত্যাদি ২৪·২ এবং লবণ ৪·৪ ভাগ।

আমাদের ভারতের খনিগুলিও অনর্থক পড়িয়া নাই। সভ্য-জগতের demand যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, মানবের কার্য্যক্ষেত্রও সেই অনুপাতে প্রসারিত হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বে যে পরিমাণ খনিজপদার্থের ব্যবহার করিতাম, এখন

তাহাদের ব্যবহার অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা প্রতিবৎসর ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করি এবং তাহাছাড়া আরও অনেক টাকার দ্রব্য আমাদের দেশেই উৎপন্ন করিতেছি। নিম্নের তালিকাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমাদের খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ কেমন বাড়িয়া চলিয়াছে। *

কয়লা। আমাদের দেশের লোক পূর্ব্বে কয়লার ব্যবহার জানিত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহার কার্য্যকারিতার বার্ত্তা মানব-সমাজে প্রচারিত হইলে, ভারতেও কয়লার খনি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইতে থাকে। কয়লা, ভারতের প্রধান খনিজ পদার্থ। মূল্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে, সমস্ত উৎপন্ন কয়লার মূল্য সমস্ত উৎপন্ন সুবর্ণের মূল্যের নীচেই। আমরা যত কয়লা উৎপন্ন করি তাহার শতকরা ৯৪ ভাগ আমাদের দেশেই নানা-কার্য্যে খরচ হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের খনিসমূহ হইতে ১,৩৯৭,৮১৮ টন্ কয়লা পাওয়া যায়; ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৭,৪৩৮,৩৮৬ টনে গিয়া দাঁড়ায়।

কয়লা বহু কার্য্যে লাগে। আমাদের রন্ধনের জন্য, কয়লা নিত্যপ্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে কল-কারখানাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেগুলি চালাইবার জন্যও কয়লার অত্যন্ত আবশ্যক। রেলওয়ে-গুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা খরচ হয়।

ভারতের কয়লার খনিগুলি যখন সুন্দর ভাবে চালিত হইত না, তখন আমরা বিলাত হইতে কয়লা আমদানী করিতাম। যদি আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে কয়লা না মিলিত, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, আজ এ দেশে এত কল-কারখানা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত কিনা! ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের এ বিপদে পড়িতে হয় নাই। জগতে যেমন কল-কারখানার কার্য্যকারিতা প্রতিপাদিত হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকে কয়লারও কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিল। ভারতবর্ষ প্রথমে উপযুক্ত অর্থ এবং চেষ্টার অভাবে কিছু পিছাইয়া পড়ে। ক্রমশঃ যেমন অর্থ এব

* খনিজ পদার্থ	১৮৯৮ পাউণ্ড	১৯০০ পাউণ্ড	১৯০৩ পাউণ্ড	গড়পড়্তা পাউণ্ড
সোনা	১৬০৮৫০৪	১৮৯১৭৬৭	২৩০২৪৯৩	১৯০৪৭১৯
কয়লা	৯৫৭১৬২	১৩৪৩০৮১	১২৯৯৭১৬	১২২৫৬৭৭
লবন	৩৫৮৯৩৩	৩২৫৯৭০	৩৩৬১৪৭	৩৪৭৮৯৭
পেট্রোলিয়ম্	৬৭৮৯৭	২৪৮৭৫৫	৩৫৪৩৬৫	১৮৫৪১০
রুবি	৫৭৯৫০	১০৪৪০৬	৯৮৪৭৫	৮৯৩৪৫
পারদ	৫৩৮৯০	১০৯৫৫৪	৮৬২৭৭	৮০১২০
লৌহ	১২৪০৩	১১১৭১	১৬৯৭০	১১৯৮১
টিন	২৫৫৩	৮৫৩৪	৫৫০	৫১৯

চেষ্টা হইতে লাগিল, তেমনি ভারতবর্ষেও কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা এবং কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে কয়লা-খনির আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশ হইতে কয়লার আমদানী ক্রমশঃই কমিয়া আসিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমরা ৮৪৮৩৬৭ টন কয়লা আমদানী করি, কিন্তু ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমরা মাত্র ১৯২৭২৯ টন আমদানী করি। এখনও আমাদিগকে কিছু কিছু কয়লা বিলাত হইতে আনিতে হয়। তাহার কারণ Welsh coal, navigation এর পক্ষে বড় সুবিধা-জনক। এরূপ উৎকৃষ্ট কয়লা আমরা এখনও ভারতে উৎপন্ন করিতে পারি নাই। যতদিন, Welsh coal এর মত ভাল কয়লার খনি আমরা আবিষ্কার করিতে না পারিব, ততদিন কার্য্যের সুবিধার জন্য বাধ্য হইয়া আমাদিগকে Welsh coal ক্রয় করিতেই হইবে। আবার যেমন কিছু পরিমাণে কয়লা আমরা আমদানী করি, তেমনি কিছু পরিমাণে কয়লা আমরা রপ্তানীও করি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমরা ৪৪১৯৪৮ টন্ কয়লা রপ্তানী করি। আমাদের রপ্তানী কয়লা প্রধানতঃ সিংহল, আন্দামান, জাভা প্রভৃতি ভারত-মহাসাগর-স্থিত দ্বীপ-সমূহে গিয়া থাকে। কিন্তু, সমস্ত উৎপন্ন কয়লার, শতকরা ৯৪ ভাগ আমরা দেশেই ব্যবহার করি। আমাদের রেল-গুলির বাৎসরিক কয়লার খরচ প্রায় ৬,০০,০০০০ টন্।

কয়লার উৎপত্তি স্থল। কয়লার উৎপত্তি স্থল দুই ভাগে বিভক্ত। Gondwana coal-fields এবং Tertiary coal-fields.। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য-ভারতবর্ষ মধ্য-প্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ, Gondwana coal-fields এর মধ্যে পড়ে। বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজ-পুতানা এবং আসাম, Tertiary coal-fields এর মধ্যে পড়ে। Gonwdana coal-fieldsই বিখ্যাত। শতকরা ৯৭·৬ ভাগ কয়লা Gondwana কয়লার খনি-গুলি হইতে পাওয়া যায় এবং মাত্র ২·৪ ভাগ কয়লা, Tertiary কয়লার খনিগুলি হইতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কয়লার খনি হইতে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৬,২০৮,০০০ টন্ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। ৩২৪০০০ টন্ কয়লা, খনির সত্বাধিকারীগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৫৩২০০০ টন্ কয়লা পাওয়া গিয়াছে।

Gondwana কয়লার খনির মধ্যে এক দামোদর উপত্যকাতেই শতকরা ৮৬ ভাগ কয়লা উৎপন্ন হয়। রাণীগঞ্জ এবং ঝেরিয়া-ই কয়লার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, রাণীগঞ্জেই বাঙ্গালার প্রথম কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়। রাণীগঞ্জও যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা উৎপাদন করিয়া ভারতের কয়লার খনি-গুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে হইতে রাণীগঞ্জ, ঝেরিয়ার খনিগুলির কাছে হার মানিয়াছে। উৎপাদিকা-শক্তি ধরিতে গেলে, এখন ঝেরিয়াই প্রথম। রাণীগঞ্জ এখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, ঝেরিয়ার খনি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ঝেরিয়া উৎপাদিকা-শক্তিতে রাণীগঞ্জকে পরাস্ত করে। রাণীগঞ্জের খনিগুলি প্রায় এক

শতাব্দী কাল ধরিয়া কয়লা যোগাইয়া আসিতেছে। সুতরাং, এখনও রাণীগঞ্জ যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

স্বর্ণ। প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে প্রচুর স্বর্ণের খনি ছিল। ভারতের নদীসমূহও বালুকণার সহিত স্বর্ণ-রেণু বহিয়া লইয়া যাইত। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র হইতে এখনও অনেক আউন্স স্বর্ণ প্রত্যেক বৎসর উৎপন্ন হয়। এই বালুকারাশি হইতে সঞ্চিত স্বর্ণের তালিকা রাখা বড় শক্ত। তাহাদের অধিকাংশ ভাগই স্থানীয় লোকজনকর্তৃক গহনারূপে ব্যবহৃত হয়। এখন মহীশূরের Kolar gold-fieldই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, ইংরাজ-মহাজনদের নজর এইদিকে প্রথম পতিত হয়। তাহার পর, তাঁহারা বহুমূল্যের কল লইয়া আসিয়া এই সোনার খনিতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। ইংরাজ-বণিকগণের হস্তে যাইবার পূর্ব্বেও, দেশীয় ব্যবসায়ীগণ এই খনিতে কার্য করিতেন। কিন্তু, তাঁহাদের উৎপন্ন স্বর্ণের মূল্য আজ-কালকার তুলনায় নগণ্য ছিল। ১৮৮০ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া তাঁহারা মাত্র ১৯,৮০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ উৎপাদন করেন। আর এদিকে ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াই, ইংরাজ কোম্পানী তাঁহাদের অংশীদারগণকে ৮,২৫০,০০০ পাউণ্ড ভাগ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, মহীশূররাজও ১,০০০,০০০ পাউণ্ড loyalty পাইয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই কোলার ফিল্ডএ ৫৫৯,১৯৮ আউন্স স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। উহার মূল্য ৩২২৫২৯০৩ টাকা। Kolar gold-field-এর পরই হায়দ্রাবাদের হুতি প্রদেশের খনি উল্লেখযোগ্য। গত বৎসরে, এই খনি হইতে ১১৫৮৪১৮ টাকা মূল্যের, ২০০১২ আউন্স স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটী ছাড়া, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোনার খনি আছে। সেগুলি হইতেও অল্পবিস্তর স্বর্ণ পাওয়া যায়।

লৌহ। য়ুরোপ হইতে সস্তা লৌহ আমদানীর সহিত, ভারতের লৌহ-ব্যবসায় এক প্রকার নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের খনিসমূহে প্রচুর পরিমাণে লৌহ নিহিত আছে। এই লৌহের খনিসমূহ ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। মান্দ্রাজ প্রদেশের সাহুই ষ্টেট এবং বেলারী জেলায়, মধ্য প্রদেশের রায়পুর এবং জব্বলপুর জেলাতেই অধিক পরিমাণে লৌহখনি বিদ্যমান। বর্দ্ধমানের উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং মানভুমের মাটির সহিত যথেষ্ট লৌহ মিশ্রিত আছে। বরাকর iron-works-এ এই মাটী বিশ্লেষণ করিয়া iron-ore তৈয়ারী করা হয়।

এতদিন, বরাকর লোহার কারখানায় pig-ironই তৈয়ারী হইয়া আসিতেছিল। এখন, basie steel তৈয়ারী করিবারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কালীমাটিতে টাটার লোহার কারখানা বেশ কাজ করিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, এই কারখানা হইতে ৩০০,০০০ টাকা দামের ৩০০,০০০ টন্ লৌহ উৎপন্ন হয়। ১৯১২ সালে, ৪৭১২৩২ টন্ টাকা দামের ৪৭১২৩২ টন্ লৌহ উৎপাদিত

হয়। টাটার এবং বরাকরের লোহার কারখানা বাঙ্গালা বা ছোটনাগপুর হইতেই কাঁচা লৌহ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই সমস্ত কারখানা, কাঁচা মাল সস্তায় পায় বলিয়া সুবিধামত কার্য্য করিতে পারে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ একটন্ লোহার দাম ১।/০, কিন্তু ভারতের অন্যত্র উহার মূল্য ৪৲ টাকা। এইজন্য, যুক্ত-প্রদেশে, মধ্য-ভারতবর্ষে, মান্দ্রাজে, হায়দ্রাবাদে, মহীশূরে, রাজপুতানায়, ব্রহ্মে এবং পাঞ্জাবে, লোহার কারখানাগুলি নগণ্য অবস্থায় আছে। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও যৎ-সামান্য।

পেট্রোলিয়ম। এখন আর রেড়ীর তেল আমাদের ঘরে আলো জ্বালায় না। এখন হয় আমরা কেরোসিন তৈল ব্যবহার করি, না-হয় ব্রহ্মদেশে প্রস্তুত মোমবাতি ব্যবহার করি। ১৯০০-০১ খৃষ্টাব্দে আমরা মাত্র ৭১,০০০,০০০ গ্যালন কেরোসিন তৈল পুড়াই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, সেই জায়গায় ১৭৪,০০০,০০০ গ্যালন তৈল পুড়াইয়াছি। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কেরোসিন তৈলের ব্যবহার আমাদের দেশে ধীরে ধীরে কেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কেরোসিন তৈলের কতক আমরা আমেরিকা এবং রুশিয়া হইতে আমদানী করি এবং বাকি ভাগটা আমাদের দেশ হইতেই প্রাপ্ত হই। পশ্চিমে বেলুচিস্থান ও পাঞ্জাবে, এবং পূর্ব্বে, আসাম ও ব্রহ্মে কেরোসিন তৈলের খনি আছে। আসাম এবং ব্রহ্মের তৈলের খনিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইংরাজকর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের খনিগুলি হইতে দেশীয়গণকর্ত্তৃক বৎসরে ২,০০০,০০০ তৈল উত্তোলিত হইত। সত্বাধিকারীর অধীনে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে, এই খনিগুলি, য়ুরোপীয় প্রথায় চালিত হইতে থাকে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, এই খনিগুলি হইতে ১০,০০০,০০০, গ্যালন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪০,০০০,০০০ গ্যালন তৈল উৎপন্ন হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, ২০০,০০০,০০০ গ্যালন তৈল পাওয়া হইয়াছে।

লবণ। মধ্য-আফ্রিকায় লবণের অভাব হইতে পারে, মধ্য-রুশিয়ায় লবণের অনটন সম্ভব, কিন্তু সাগর-বলয়িতা ভারত-ভূমিতে কখনও লবণের অভাব হইতে পারে না। আমাদের বাৎসরিক লবণ-খরচ ১,৪০০,০০০ টন্। ইহার শতকরা ৪৪ ভাগ ভারত-সমুদ্রের জলরাশি হইতে প্রস্তুত হয়। ৪৩৫,০০০ টন্ ভারতের বাহির হইতে আমদানী করা হয়। অবশিষ্ট লবণ রাজপুতানা এবং পাঞ্জাবের লবণের পাহাড় হইতে সংগৃহীত হয়।

পারদ।—ভারতবর্ষে পারদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আমরা প্রত্যেক বৎসর ৭৮,৮৮৮ পাউণ্ড মূল্যের পারদ ইংলণ্ডে পাঠাই। ইংলণ্ড আবার এই পারদ, জর্ম্মানি এবং আমেরিকাকে বিক্রয় করে।

পূর্ব্বোক্ত জিনিষগুলি ব্যতীত আরও বহু প্রকার খনিজ পদার্থ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। সেগুলির কথা সকলের তেমন ভাল লাগিবে না বলিয়া এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

ভেইয়া

নন্দবেহারা যখন রাগারাগি করিয়া চলিয়া গেল খোকাকে লইয়া ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। খোকা নন্দর বড় ন্যাওটা; সে এমন কান্নাকাটি আরম্ভ করিল যে বাড়িসুদ্ধ-সকলে অস্থির হইয়া উঠিলাম। এমনও মনে হইতে লাগিল দূর-হক ছাই, না-হয় হাতে পায়ে ধরিয়া নন্দকে ডাকিয়া আনি। কিন্তু সে যে কোথায় উধাও হইয়া গেল কোনো সন্ধানই পাইলাম না। খোকাকে লইয়া বিষম আতান্তরে পড়িয়াছি এমন সময় ছোট্টু বেহারা তার গ্রাম-সম্পর্কে এক সাত-বছরের ভাই-পোকে লইয়া হাজির। বলিল—"হুজুর! একে আপনার খোঁকার নকর রাখুন।"

আমি তো অবাক! এতটুকু বাচ্ছা চাকরী করিবে কি! নিজেকে সামলাইতে পারে কিনা সন্দেহ, খোকার হেপাজৎ করিবে! আমি অমত করিলাম; কিন্তু খোকা দেখি বাড়ির কর্ত্তার উপরও কর্ত্তৃত্ব করে। সে নিজেই তার চাকর পসন্দ করিয়া লইল। মন্নুকে দেখিবামাত্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তার বড় বড় চুলের গোচ্ছা লইয়া দিব্যি খেলা সুরু করিয়া দিল।

মন্নু খোকার ভারে একেবারে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে বেঁকিয়া পড়িয়াছিল—খোকাকে ভালো করিয়া তুলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না,—পড়ে পড়ে এমন অবস্থা! কিন্তু খোকার তো তাতেই মজা—সে কিছুতেই মন্নুকে ছাড়িবে না; জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে গেলে কান্নাকাটি করে। কাজেই তখনকার মতো মন্নুকে রাখিতে হইল। মনটা খুৎখুঁৎ করিতে লাগিল—ছেলেমানুষ, খোকাকে লইয়া কখন্ কি-একটা কাণ্ড করিয়া বসে! কিন্তু নন্দর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকার অসুখে পড়িবার যো হইয়াছিল, এখন সে ভাবনা দূর হইল বলিয়া মনটাকে প্রবোধ দিলাম।

মন্নু ছেলেমানুষ। চোখদুটি বড় বড়, মাথাটি একরাশ কোঁকড়া চুলে ভরা। মুখখানির উপর এমন-একটি কোমলতা মাখানো যে মায়া করে। বেচারার মা বাপ নাই। থাকিলে কখনই এই ননীর পুতুলকে বিদেশ বিভুঁয়ে এমন করিয়া ছাড়িয়া দিত না—এই মনে করিয়া তার উপর একটা স্নেহের আকর্ষণ আপনা হইতেই জন্মায়।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম—মন্নুকে লইয়া বেশিদিন চলিবে না, ছেলেমানুষ কাজ কিছু পারিবে না কেবল পয়সাই গণিতে হইবে, এখন দিনকতক যাক্, পরে একটা ভালো দেখিয়া বেহারা রাখিয়া উহাকে বক্‌শিস দিয়া বিদায় করিলেই চলিবে। কিন্তু কাজে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। খোকা তো এক দণ্ড মন্নুকে ছাড়িবে না, গৃহিণীও আপত্তি করিতে লাগিলেন। আমি একবার জোর করিয়া তাহাকে তাড়াইতে গিয়াছিলাম কিন্তু তার মুখের সামনে গিয়া আর সে কথা বলিতে পারিলাম না।

(২)

মন্নু প্রায় এক বছর আমাদের বাড়িতে আছে। বেচারার কোনো গোল নাই সারাদিন যেন ভয়ে-ভয়েই থাকে—সর্ব্বদাই মুখটি নীচু করিয়াই আছে, কাহারো সামনে পড়িলে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে যেন বাঁচে। বাড়ির কাহারো সঙ্গে তার বড় ঘনিষ্ঠতা দেখিতাম না, একা-একাই কাটাইত, কেবল খোকার সঙ্গে সে খুব জমাইয়া লইয়াছিল।

আমার চোখে সে বড় পড়িত না,—সে যে কোথায় থাকে, কি করে তাহা আমি ভালোরকম জানিতাম না। এতদিন পরে একদিন আমি তাহার গলা পাইলাম। বাহির-বাড়ি হইতে ভিতরে আসিতেছি, চাকরদের ঘরের ভিতর কে যেন ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে, আর ছোট্টু মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে। আমি ছোট্টুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“ব্যাপার কিরে ছোট্টু ?”

ছোট্টু বলিল—“বাবুজি! আমি দেশ যাবো শুনে মন্নু কাঁদতে লেগেছে—বলে আমিও দেশ যাবো।”

আমি বলিলাম—“আহা ছেলেমানুষ! যাক না।”

ছোট্টু বলিল—“কার কাছে যাবে বাবু, ওর তো কেউ নেই!”

আমি ডাকিলাম—“মন্নু!”

মন্নু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

আমি বলিলাম—“তুই বাড়ি যাবি ?”

সে বলিল—“হ্যাঁ!” কিন্তু তার গলা হইতে যেন স্বর বাহির হইল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কার কাছে যাবি ?”

মন্নু একটা ফোঁপানির বেগ বুকের মধ্যে আটকাইয়া বলিল—“ভেইয়ার কাছে।”

—“ভেইয়া কে রে ?”—জিজ্ঞাসা করিতেই ছোট্টু বলিয়া উঠিল—“ওর ঠাকুর্দা! বুড়ো মারা যাবার সময় আমারই হাতে ওকে দিয়ে যায়।”

আমি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—“তবে যে বলে ভেইয়ার—?”

ছোট্টু বলিল—“বাবু, হাবা ছেলে কিছুতেই বুঝবে না ওর ঠাকুর্দা মরেছে!”

আমি মন্নুর পিঠের উপর হাতখানা বুলাইয়া বলিলাম—“তুই কার কাছে যাবি মন্নু! তোর ভেইয়া তো নেই।”

মন্নু ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বায়নার সুরে কেবলই বলিতে লাগিল—“ভেইয়ার কাছে যাবো।”

ছোট্টু চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—“তবে তাই যা তোর ভেইয়ার কাছে!”—বলিয়া একটা প্রচণ্ড কীল তুলিল।

মন্নুর মুখ দেখিয়া আমার মায়া করিতেছিল, আমি বলিলাম—“আহা, নিয়ে যা একবার ওকে দেশে।”

ছোট্টু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—“সে হবে না বাবু, আমি ঐ হতভাগাটাকে ঘাড়ে করে নিতে বাড়ি-সুদ্ধ লোক যেন আমায় মারতে এল--এখানে পালিয়ে এসে তবে বাঁচলুম।”

কৃপণ বলিয়া ছোট্টুর খ্যাতি ছিল, বোধ হয় সেটা ওর বংশেরই ধারা এই ভাবিয়া আমি বলিলাম—“তোর কিছু ভাবনা নেই, আমি

ওর সব খরচ-পত্র দেব—তুই ওকে নিয়ে যা।"

টাকার কথাতেও ছোট্টুর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না, সে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—"আচ্ছা বাবু!"

বলিল—'আচ্ছা বাবু!' কিন্তু হতভাগা ছোট্টু এমন পাজি, যাইবার দিন গোপনে চলিয়া গেল, মন্নুকে সঙ্গে লইল না।

মন্নু চাকরদের ঘরে তক্তাপোষের নীচে পড়িয়া সমস্ত দিনটা ফোঁপাইতে লাগিল!

(৩)

মন্নু সেদিন খোকাকে লইয়া খেলা করিতেছিল। একটা লাল-রঙের কাঠের গোলা সে খোকার হাতে তুলিয়া দিতেছিল, খোকা সেইটা লইয়া তাকে ছুড়িয়া মারিতেছিল। গোলাটা একবার মন্নুর কপালে গিয়া ঠক্ করিয়া লাগিল। শুনিলাম মন্নু বলিতেছে—"খোকাবাবু দুষ্টুবাবু, মন্নুকে মারে। আমার ভেইয়াবাবু ভালোবাবু, আমাকে মারে না। ভেইয়া কেমন পাখীর বাচ্ছা ধরে দেয়, কাঁধে উঠিয়ে কেমন ঘোড়া চড়ায়—আমি ঘোড়াকে চাবুক মারি, সে চাবুক ভেইয়ার গায়ে লাগে না। ভেইয়ার কেমন কালো ভৈঁস্ আছে—তার পিঠে ভেইয়া আমায় চড়িয়ে দেয়—খোকাবাবুর ভৈঁস নেই। ভেইয়ার বক্‌রী আছে, তার গায়ে আমি হাত বুলিয়ে দিই;—বক্‌রী পালায় না, আমার হাতে ঘাস খায়। ভেইয়া আমায় রোটি দেয়। খোকাবাবু রোটি পায় না, খোকাবাবু দুধ খায়, ভাত খায়। আমার ভেইয়ার কাছে যাবে খোকা বাবু? ভেইয়া রোটি দেবে!"

খোকা বলিল—"হু!"

আর-একদিন দেখি মন্নু আমার বড় ছেলেকে ধরিয়াছে। কোথা হইতে একটুকরা কাগজ ও একটা পেন্সিল জোগাড় করিয়া বলিতেছে—"দাদাবাবু, তুমি চিঠি লিখতে পার?"

দাদাবাবুর উৎসাহ দেখে কে! সে বলিয়া উঠিল—"হুঁ পারি!"

মন্নু বলিতে লাগিল, সে মাথানীচু করিয়া বড় বড় হরফে উচ্চকণ্ঠে বানান করিয়া লিখিতে লাগিল—"ভেইয়া তুমি জল্‌দি এস। খোকাবাবু তোমার ভৈঁস্ দেখবে, বক্‌রী দেখবে। খোকাবাবু বলে ভৈঁস্ দেখলে ডর লাগবে না।"

মন্নুর আরো অনেক কথা লিখিবার ছিল কিন্তু ঐ কথাগুলিতেই দাদাবাবু কাগজ ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন, কাজেই চিঠি শেষ করিতে হইল। মন্নু চিঠিখানা সযত্নে মুড়িয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল। খোকাকে বলিল —"খোকাবাবু তোমার জন্যে ভৈঁস্ আস্‌ছে। ভৈঁস্ দেখে ভয় করবে না ত? আমার কিছু ভয় করে না।"

একটু পরে আমার বড় ছেলে কোথা হইতে একখানা খাম জোগাড় করিয়া আনিয়া বলিল—"মন্নু! ঠিকানা লিখতে হবে। ইংরিজিতে লিখব, জানিস্! বল্ কি লিখব?"

মন্নু বলিল—"লেখ ভেইয়া!"

বড় খোকা খানিকক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া বিড়বিড় করিয়া বানান ঠিক করিয়া লইল, তারপর বড় বড় বাঁকা অক্ষরে

লিখিতে লাগিল— VA ভে E ভেই AA ভেইয়া VAEAA

—"তারপর ?"

মন্নু বলিল—"তারপর আবার কি ?"

—"দূর ! এতে কখনো চিঠি যায়! তোদের বাড়ি কোথায় বল্।"

মন্নু বলিল—"আমাদের বাড়ি ? সে দরিয়া কিনারে ! ও ভারী দরিয়া ! ও দরিয়ায় আমি চান্ করি, ভেইয়া চান্ করে, আমাদের ভৈঁস্ চান্ করে—ভিখ্‌খু পারে না ;—সে কাঁদে।"

বড় খোকা ইংরাজি অক্ষরে "দরিয়া" লিখিতে মাথা চুলকাইতে লাগিল। শেষে নিরুৎসাহ হইয়া বলিল—"মন্নু ও কথা ইংরিজিতে লেখা যায় না, বুঝলি ? তুই ইংরিজি করে বল্।"

মন্নু বলিল—"দাদাবাবু, আমি তো তোমার মতো ইংরিজি পড়িনি।"

—"তবে তোর চিঠি যাবে কেমন করে ?"

মন্নু বলিল—"ঠিক যাবে। ডাঁকওয়ালা ভেইয়াকে চেনে—সে কত চিঠি ভেইয়াকে দেয়। আমার চিঠি ঠিক ভেইয়াকে দেবে। তুমি দাওনা আমাকে—আমি ডাঁকে দেব।"

খবর পাইয়াছিলাম মন্নু সে চিঠি ডাকে দিয়াছে কিন্তু তার গতি কি হইল জানিনা।

প্রায়ই শুনিতাম খোকা কাঁদিলেই মন্নু তাকে সান্ত্বনা দিতেছে— "চুপ কর খোকাবাবু, তোমার জন্যে ভৈঁস্ নিয়ে ঐ ভেইয়া আসচে।"

(৪)

পূজার সময় সপরিবারে কাশী বেড়াইতে আসিয়াছি। মন্নু সঙ্গে আছে। দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া যে দিন কয়টা কাটিয়া গেল বলিতে পারিনা। ফিরিবার সময় কাছে আসিয়াছে। গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ির সকলেই এখন জিনিষ কিনিতে ব্যস্ত—দেশে গিয়া উপহার বিলাইতে হইবে। কেনার হেঙ্গাম আর কিছুতেই শেষ হয় না ;—উপহারের সামগ্রী বাক্সবন্দী করিয়া হঠাৎ মনে পড়ে ঐ যাঃ অমুকের জন্য কিছুই লওয়া হয় নাই,—অমনি ছুট্ দোকানে ! বাচবিচার রহিল না—নিকট, দূর, পাড়াসম্পর্কে সকল-প্রকার আত্মীয়ের জন্যই কিছু-কিছু লওয়া হইল। বাড়ির চাকর-নফররাও বাদ রহিল না। কাশী-ক্ষেত্রের মানচিত্র, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ, হরি-নামের মালা, তার ঝুলি প্রভৃতি গম্ভীর জিনিষও রহিল, আবার গালার চুড়ি, কাঁচপোকার টিপ, পানের স্ফুর্ত্তি, বিশকৌটা প্রভৃতি চুটকি জিনিষেরও অন্ত রহিলনা ;—খুলিয়া সাজাইলে একটা রীতিমত মনোহারীর দোকান পাতা যায়।

এই সব দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল, জিনিষ-কেনার বাতিকের একটা এপিডেমিক বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি, গরীব চাকরদাসীরাও নিস্তার পায় নাই। ছোট্টু যে অতবড় কৃপণ সেও নগদ দুই টাকা খরচ করিয়া এক লোটা কিনিয়াছিল। কেবল মন্নুকে কিছুই কিনিতে দেখি নাই—আহা, কার জন্যই বা কিনিবে ? সে কেবল অবাক হইয়া এই কেনা-কাটার ধূম দেখিত। কখনো কখনো দেখিতাম ফিরিওয়ালার এক

একটা জিনিষ সে হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছে, তারপর ধীরে ধীরে আবার রাখিয়া দিতেছে।

যাইবার দিন সকালে মন্নু আসিয়া বিরস বদনে বলিল—বাবুজি, আমার তো কিছু কেনা হল না।"

আমি বলিলাম—"তোর জন্যে কি নেব বল।"

সে বলিল—"আমার জন্যে কিচ্ছু চাই না;—ভেইয়ার জন্যে—"

আমি বলিলাম—"এইনে টাকা, তোর যা খুসী কিনে নিয়ে আয়।"

মন্নু টাকা হাতে লইয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুট দিল।

তাড়াতাড়ির সময়—যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত, এমন সময় দেখি ছোট্টুর সঙ্গে মন্নু বাজার হইতে ফিরিয়া আসিল—হাতে একটা পুঁটুলি। কি জিনিব আনিল দেখিবার অবসর হইল না।

(৫)

কলিকাতায় ফিরিয়াছি। দাসী চাকর-দের কেমন রোগ বিদেশ হইতে ফিরিলেই তারা বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। সকলেই সমস্বরে ছুটি চাহিয়া বসিয়াছে। গৃহিণী বাছিয়া বাছিয়া ছুটি মঞ্জুর করিয়া-ছেন;—একসঙ্গে সবাই গেলে চলিবে কেন?

ছোট্টু ছুটির দলে। সে বাড়ি যাইতেছে শুনিয়া মন্নুও বায়না ধরিল। আমি বলিলাম—"তা যাক।" কিন্তু ছোট্টুকে বিশ্বাস নাই, এবার তাকে একটু কড়া শাসন করিয়া দিলাম।

গোল বাধাইলেন গৃহিণী। তাঁর আপত্তি, মন্নু গেলে কিছুতেই চলিবে না, খোকাকে লইয়া ভারি মুস্কিল হইবে। এত লোক একসঙ্গে ছুটিতে যাইতেছে এ সময় মন্নুকে কিছুতেই ছাড়া যায় না। এবং কি করিতেই বা ও দেশে যাইবে? ওর সেখানে কে আছে?

আমি মন্নুর পক্ষ লইলাম কিন্তু হাকিমের হুকুম টলাইতে পারিলাম না। শেষে আমার সহিত তর্কে না পারিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"ও যদি যায় তো জন্মের মতো যাক—যেন আর এ বাড়ি-মুখো না হয়!"

মন্নু যাইবার হুকুম পাইয়া আহ্লাদে ছুটিয়া গিয়া ছোট্টুকে খবর দিতে গেল। হুকুমের সব অংশ সে তলাইয়া বোঝে নাই।

ছোট্টু আসিয়া বলিল—"মাইজি! মন্নুর কি ছুটি মঞ্জুর?"

ছোট্টুর মাইজি উত্তর দিলেন—"হাঁ একেবারে ছুটি!"

ছোট্টু মন্নুকে ধমকাইয়া বলিল—"যা! তোর যেতে হবে না!"

মন্নু খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল—তারপর তার চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

আমি গোপনে ছোট্টুকে ডাকিয়া বলি-লাম—"যা, তুই চুপি-চুপি মন্নুকে নিয়ে যা। আমি সব ঠিক করে দেব।"

মন্নু চলিয়া গেলে খোকাকে লইয়া সত্যই গোল বাধিল। আমি একটা ঠিকা লোক রাখিলাম—কিন্তু তার গোঁফের বহর দেখিয়া খোকা তার দিকে কিছুতেই ঘেঁসিল না। গৃহিণীর গর্জ্জন বাড়িয়া উঠিল—আমারই শয়তানীতে যে এমনটা ঘটিল

একথা দিনের মধ্যে পাঁচশ বার আমায় শুনিতে হইল। আমি বলিলাম—"আমার হাতে তো কোনো কাজ নেই—দাওনা আমিই ছেলের চাকরী করি।"

গৃহিণী ধপ্ করিয়া আমার কাছে ছেলেটাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন—"এই নাও, তাই কর!"

আমি ঘণ্টাকতক ছেলের পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। তার পর ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। জাগিয়া দেখি খোকা কাছে নাই। তার পর কি হইল জানিনা—খোকার পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আর কোনো নালিশ শুনিতে পাইলাম না; খোকাকেও আমার কাছে পাঠানো হইল না,—বুঝিলাম, চাকর-নফরদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা আমাকেও চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন।

(৬)

সপ্তাহ না ঘুরিতেই দেখি মন্নু ফিরিয়া আসিয়াছে। ছোট্টু তো রাগিয়া অস্থির! সে বলে—"হতভাগা ছোঁড়ার জন্যে এক দণ্ডও দেশে থাকা হ'ল না, কেবল পয়সা নষ্ট, কান্নাকাটি করে ফিরে এল—কিছুতেই রইল না। রোসোনা আমি মজা দেখাচ্চি!"

গৃহিণীর রাগ বোধ হয় পড়িয়াছিল, মন্নুকে দেখিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল। কাজেই মন্নু খোকাকে লইবার হুকুম পাইল না। হুকুম হইল বাবুর যা-খুসী মন্নুকে লইয়া করিতে পারেন, আমার এবং আমার ছেলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই। মন্নু এ সব কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিল কি না জানিনা। সে দেখি একবার ফাঁক পাইয়া ধাঁ করিয়া খোকাকে লইয়া একেবারে বাহির-বাড়িতে ছুট্ দিল। তার পর তার সঙ্গে রীতিমত জমাইয়া লইল। তখন খোকাকে তার কাছ-ছাড়া করে কার সাধ্য! গৃহিণী নিরুপায়ের ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন —"হতভাগা ছেলেটা বাপেরই ধারা পেয়েছে। নিজের গোঁ কিছুতেই ছাড়বে না!"

আমি সেই দিন বৈকালে ইসিচেয়ারে হেলান দিয়া তামাক টানিতেছি, মন্নু ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—"কি রে মন্নু?"

মন্নু একটা উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলিল—"আমার ভেইয়া কোথায় গেল বাবুজি?"

ভেইয়ার কথা মন্নুর আঁতের কথা, হঠাৎ একটা উত্তর দিয়া তার আঁতে ঘা দিতে ইতস্তত করিতেছিলাম। এমন সময় সে আবার বলিল—"কোথায় গেল বাবুজি?"

আমি বলিলাম—"কেন বল দেখি?"

সে বলিল—"ভেইয়ার জন্যে লোটা কিনেচি, সে তো তাকে দেওয়া হয়নি। ভেইয়াকে যে দেখতে পেলুম না!—ভৈঁসও নেই, বকরীও নেই। দরিয়ায় গেলুম সেখানে তো ভেইয়া চান করতে যায়নি, মাঠে গিয়ে ডাকলুম সেখানেও তো জবাব পেলুম না! তবে কোথায় গেল বাবুজি।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

মন্নু বলিতে লাগিল—"ভেইয়াকে একটা চিঠি দিয়েছিলুম—খোকাবাবুর জন্যে ভৈঁস

আনতে। ভেইয়া তাই দেশ থেকে ভৈঁস নিয়ে আসচে—না ?"

আমি কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইলাম না—গম্ভীরভাবে শুধু বলিলাম—"হুঁ।"

মন্নু দৌড়িয়া গিয়া লোটাটা লইয়া আসিল, বলিল—"বাবুজি! তবে এই লোটা তোমার কাছে রেখে দাও, নইলে ছোট্টু নিয়ে নেবে। ভেইয়া এলে দিয়ো!"

বলিয়া সে খোকাবাবুর কাছে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাষা-সংস্কার

ভাষা নিয়ে আমাদের পাঁচজনের বাদ-প্রতিবাদটি যেমন পুরোনো তেমনি একঘেয়ে হয়ে আসছে। এ তর্ক করবার ধৈর্য্য লেখকদের থাকতে পারে—কিন্তু শোনবার ধৈর্য্য পাঠকদের সম্ভবতঃ আর নেই। অতএব এ তর্কে ক্ষান্ত দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তবে যে আমি আবার এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি তার কারণ—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতামত আমি উপেক্ষা করতে পারিনে, কেননা তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ্। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, এমন কি ছন্দ নিরুক্তেরও তিনি সন্ধান রাখেন। তাঁর মতামতসকল ভাষা-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমার মতামত ভাষাজ্ঞানের উপর। এ বিষয়ে তিনি জ্যেষ্ঠ অধিকারী, আমি কনিষ্ঠ অধিকারী। এ সত্ত্বেও মৌখিক ভাষার উপর তাঁর আক্রমণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

মজুমদার মহাশয় আমাদের নাম দিয়েছেন—ভাষা-সংস্কারক। আমরা এ নামের যোগ্য নই। কেননা, আমরা বাংলা ভাষা মুখে মুখে যেমন চল্‌ছে Book এ Book এও তেমনি চালাতে চাই। সংস্কারক হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁরা মৌখিক ভাষাকে সংস্কৃত করে সাধুভাষা রচনা করেছেন। আমরা সাধু ভাষার সংস্কার করতে চাইনে, ও বস্তু আমরা ত্যাগ কর্‌তে চাই। এ কথা মজুমদার মহাশয়েরও অবিদিত নেই। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি শুনেছিলেন যে আমরা হুতুমি বাংলা চালাবার প্রস্তাব করেছি এবং নিজেরাও ঐ রীতিতে রচনা প্রকাশ করছি। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝেছেন—যে আমাদের বিরুদ্ধে এ অপবাদ মিথ্যে। অর্থাৎ তিনি আলাপে বুঝেছেন যে আমরা প্রলাপ বকিনে। হুতুমি বাংলা—ভাষা নয়—Slang, সে উপাদানে standard prose গড়বার চেষ্টা বাতিকগ্রস্ত নয়—বিকারগ্রস্ত লোকেই করতে পারে। ইয়ারকির ভাষায় যে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, ইতিহাস লেখা চলে না —এ জ্ঞানটুকু যার নেই, তার সঙ্গে জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিরা কখনই ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন না। সুতরাং বাংলাদেশের এত

গুণী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র এবং শাস্ত্র ধারণ করেছেন, তখন মজুমদার মহাশয়ের বোঝা উচিত ছিল যে, ভাষাকে সংস্কার করে আমরা তা slang-এ পরিণত করতে চাইনে। সাধুভাষার উপর আমার অশ্রদ্ধার কারণই এই যে, ও বস্তু—ভাষা নয়—slang ;—ইয়ারকির slang নয়, পাণ্ডিত্যের slang। হুতুম পেঁচার ভাষা এবং লক্ষ্মী পেঁচার ভাষায় যে প্রভেদ, এ দুয়ের ভিতরও সেই প্রভেদ। এ ভেদ জাতিগত নয়,—সম্প্রদায়গত।

মজুমদার মহাশয় বলেন যে, সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে আমরা যে ব্যবস্থা করতে চাই—তাই নিয়েই মতভেদ। এ কথা সত্য। "করিয়া" এবং "করে"র ভিতর যে ব্যবধান, বইয়ের ভাষা এবং মুখের ভাষার ভিতর ঠিক সেই ব্যবধান, তার চাইতে এক চুল কমও না, একচুল বেশীও না। এই "ইয়ার" স্পর্শে ভাষা যে কেন এত সাধু হয়ে ওঠে তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা কঠিন, এবং যেখানে সহজ বুদ্ধিতে কুলোয় না, সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। মজুমদার মহাশয় তাই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যে নিয়ম অনুসারে "করিয়া" কালক্রমে "ক'রে"তে পরিণত হয়, তার ইংরাজি নাম, phonetic decay। তথাস্তু! কিন্তু ভাষার এই স্বাভাবিক অক্ষরচ্যুতি ক্ষয়-রোগ নয়—বরং অনেক ক্ষেত্রে তা উন্নতিরই লক্ষণ! "করিয়া" এই ক্রিয়াপদের "করে"তে পদোন্নতি হয়েছে—এই হচ্ছে আমার মত। "বাংলা ভাষা বনাম সাধুভাষা

আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি—এ স্থলে সে তর্কের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তার পর সর্ব্বনামের কথা। সর্ব্বনাম খর্ব্ব হলে যে তার সর্ব্বনাশ হয়, এর কোনরূপ প্রমাণ নেই। মজুমদার মহাশয় বলেন যে—"আমি, আমরা, তোমাকে, তোমাদের... প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া গিয়াছে। "সে" এবং "তিনির" বহুবচনে এবং কর্ম্মাদি কারকের রূপে যে "হা" এবং "হাঁ" আসে, তাহা লোপ করিলেই যে ভাষার গায়ের জোর অধিক হইবে এবং রচনার গাম্ভীর্য্য বাড়িবে, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত।"

এর নাম,—বাংলায় যাকে বলে, উল্টো চাপ। আমরা ত কস্মিন্‌কালে কোন শব্দের কোনও অঙ্গের হানি করতে চাইনি। আমরা বলি—সর্ব্বনামের প্রথম পুরুষের দেহ হতে যে "হা" কালবশে খসে পড়েছে—তাকে কুড়িয়ে নিয়ে জুড়ে দিলে, সে পুরুষের গায়ের জোর বাড়ে না—শুধু গা-ভারি হয়। ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি শব্দের স্মরণমাত্র যাঁদের লেখনী হতে স্বতঃই মসী-ক্ষরণ হয়, তাঁরাই উক্ত লুপ্ত "হা"কে রচনায় যুক্ত করবার পক্ষপাতী। শব্দের অক্ষর-সংখ্যার বেশি-কমের উপর যে ভাষার ব্যক্তি-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে—এ সত্যের পরিচয় আমরা কোন সাহিত্যেই পাইনি। যাঁদের সাহিত্যে লম্বাই-চৌড়াই করবার অভিপ্রায় আছে—কেবলমাত্র তাঁরাই লম্বা-চৌড়া কথার পক্ষপাতী। আর যদি শব্দে বর্ণাধিক্যে ভাষার গৌরব বাড়ে, তাহলে সাধুভাষায় "আস্তার" "তুস্তার"ও লেখা উচিত; তাতে যে ভাষার

নেই। হিন্দি ভাষার উপর একটু কৃপাদৃষ্টিপাত করলেই মজুমদার মহাশয় দেখতে পাবেন যে, তাঁর প্রিয় হকারের সংসর্গে সর্ব্বনাম সে ভাষায় গ্রাম্যতারই পরিচয় দেয়। "উন্‌কো" ভদ্রশব্দ—কিন্তু "উন্‌হিকো" দেহাতি বুলি এবং জেনানা বুলি। অবলীলাক্রমে শব্দ উচ্চারণ করবার ক্ষমতা মানুষে যুগ-যুগান্তরের সাধনার ফলে লাভ করেছে। যারা "উন্‌হিকো" বলে, হিন্দুস্থানীদের মতে তাদের "জবান্‌ দুরস্ত" হয় নি। তার কারণ ঝোঁক-মেরে শব্দ উচ্চারণ করবার ভিতর রসনা-ক্লেশের পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশেও স্ত্রীজাতির নিকট সর্ব্বনামের প্রথম পুরুষ গৌরবে "ওনারা" "ভেনারা" নামে পরিচিত। সাধুভাষায় যদি "হা" গ্রাহ্য হয়, তাহলে "না" গ্রাহ্য হবে না কেন? এর উত্তরে সাধুবাদীরা হয়ত বলবেন, যে "হা" পুরুষালি এবং "না" মেয়েলি। তা হলেই দাঁড়াল, জোর যার, সাহিত্য তার। এই ভাষা-সমস্যার যদি গায়ের জোরে মীমাংসা করা হয়, তাহলে অবশ্য আমাদের কিছু বক্তব্য নেই। সাধু ভাষার আক্রমণ থেকে মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে আমরা যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করা ব্যতীত অন্য কোনও উপায় জানিনে।

মজুমদার মহাশয় আসলে আমাদের এই যুক্তি-তর্ক-করা-স্বরূপ ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত হয়েছেন। তাঁর শেষ কথা এই—

"তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা যায় যে চৌধুরী মহাশয় যে পন্থা অবলম্বনীয় মনে করেন, তাহাই প্রশস্ত, তাহা হইলেও দশজনের অবলম্বিত পন্থা তিনি একাকী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যেখানে চরিত্রনিষ্ঠার কথা নাই, জীবন-মরণের কথা নাই, সেখানে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজের মতটি গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার মত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রচলিত প্রথাই মানিয়া চলিতে হইবে।"

অর্থাৎ অপরকে মৌখিক ভাষায় লিখ্‌তে উপদেশ দিয়ে নিজে সাধুভাষায় লেখাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য, কেন না সাহিত্যে "চরিত্র-নিষ্ঠার কথা নেই।" চরিত্র-নিষ্ঠা শব্দের অর্থ কি, তা আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ এটি হচ্ছে ইংরাজি character শব্দের সাধু-অনুবাদ। কিন্তু এ কথা কি ঠিক যে সাহিত্য-সমাজে character বলে কোনও পদার্থ নেই? সাহিত্য কি sincerity বঞ্চিত? যদি তাই হয়, তাহলে যে insincere লেখক সাহিত্য সম্বন্ধে মুখে বলবেন এক, এবং কাজে কর্‌বেন আর, তাঁর প্রচারিত মত সাহিত্যে সত্বর গৃহীত হবার কি কোনরূপ সম্ভাবনা আছে? মজুমদার মহাশয় বলেছেন, এ স্থলে জীবন-মরণের কথা নেই। এ কথা ঠিক। যদি জীবন-মরণের কথা থাকৃত, তাহলে বাঙ্গালী লেখকেরা ভাষা সম্বন্ধে এত যথেচ্ছাচারী হতেন না। জোর করে বঙ্গ সরস্বতীর ধাৎ বদলে দেবার অভিপ্রায়ে তাঁকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করায় যদি যথেচ্ছচারিতার পরিচয় দেওয়া না হয় ত কিসে হয়, তা জানি নে। এবং সাধু-পন্থীরা আজ একশ' বৎসর ধরে সেই কাজ করে আস্‌ছেন। ভাষার উপর অত্যাচার করায় বাঙ্গালী জাতির দৈহিক জীবন-মরণের কোনও কথা ...

কিন্তু মানসিক মরণ-বাঁচনের কথা আছে। বাংলা শব্দের যে একটা বিশেষ রকম ঝোঁক ও টান আছে, সেই কথাটা আমাদের জানিয়ে দেবার জন্য মজুমদার মহাশয় অনেক বাক্যব্যয় করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের যে সে জ্ঞান নেই আকারে ইঙ্গিতে তাও জানিয়ে দিয়েছেন! রবীন্দ্রনাথের যে ছন্দের কান নেই, এ অবশ্য বড়ই দুঃখের বিষয়; কেন না তিনি হচ্ছেন, বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু এও কম দুঃখের বিষয় নয়, যে, মজুমদার মহাশয়ের এ জ্ঞান নেই যে বাঙ্গালীর মনেরও একটা বিশেষ রকম ঝোঁক এবং টান আছে। সে ঝোঁক এবং সে টানের পরিচয় পাওয়া যায়—বাঙ্গালীর ভাষায় অর্থাৎ যে ভাষায় তাঁরা কথা কন, সেই ভাষায়। ভাষা শুধু কানের জিনিষ নয়, প্রাণেরও জিনিষ। বাঙ্গালী-মনের গড়নের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর ভাষা গড়ে উঠেছে। কি ভাব আমরা প্রকাশ কর্‌তে চাই এবং কি ভাবে তা প্রকাশ করতে চাই, তার পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের মুখের ভাষায় এবং প্রাক্‌ব্রিটীশ যুগের বাংলা সাহিত্যে;—এই সাধু ভাষা নামক "এক-পুরুষে বনেদি বড়মানুষ" ভাষায় নয়। এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, এ ভাষা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকদের হাতে তৈরি হয়েছে; বঙ্গভাষার স্বাভাবিক ইভলিউসনে তা এ-হেন সাধু আকার ধারণ করে নি। স্বাভাবিক ইভলিউসনে ভাষার কি রকম পরিবর্ত্তন হয়, তার পরিচয় কবি-কঙ্কণ চণ্ডীর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের যোগাযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন। সুতরাং দশজনেই লিখুন আর বিশজনেই লিখুন, এই সাধুভাষা অবলম্বন কর্‌তে আমি অপারগ, কেননা সে ভাষা যেমন আড়ষ্ট, তেমনি অশুদ্ধ। যদি কৃত্রিম ভাষা লিখতেই হয়, তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগের পণ্ডিতি বাংলায় ফিরে যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। সাহিত্যে আমার ব্রাহ্মণ-ভক্তি আছে। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামমোহন রায়, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির রচনায় সংস্কৃত শব্দের দুষ্ট প্রয়োগ নেই। সংস্কৃত শব্দ যদি ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে সে শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক, তার লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা দুইই জানা আবশ্যক এবং তার যথাযথ প্রয়োগ জানা আবশ্যক। সাধু ভাষায় এ সকলই উপেক্ষিত হয়। যদি কেউ বিভক্তিহীন সংস্কৃত লিখ্‌তে পারেন এবং সে রচনাকে বাংলা বলে চালাতে পারেন, তাহলে তিনি তা করুন। আমার আপত্তি—এই হঠাৎ-নবাব সাধু ভাষার বিরুদ্ধে। কেননা সে ভাষার বিশিষ্টতা বিভক্তি-হীনতা নয়, ভক্তিহীনতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাংলা এবং সংস্কৃত এই উভয় ভাষার প্রতি সমান অভক্তি থেকেই এ ভাষা জন্মগ্রহণ করেছে।

মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে, ভাষা অর্থ শব্দরাশি নয়। Vocabulary নয়, structure-এর উপরই সকল ভাষা প্রতিষ্ঠিত। এই কথা আমি অন্তত দশ বার বলেছি। বাংলা এবং সংস্কৃত এ দুই ভাষার গঠনের পার্থক্য এত বেশী যে

এর একটির ছাঁচে আর-একটিকে ঢালা যায় না। সুতরাং বাংলা ভাষা অপর ভাষার ছাঁচে ঢালাই করে নিতে গিয়ে সাধুপন্থীরা সে ভাষাকে সংস্কৃত নয়, বিকৃত করে ফেলেছেন। আমি প্রবন্ধান্তরে দেখিয়েছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রেরও সাধুভাষা শুদ্ধ ভাষা নয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেও যখন সাধুভাষা বিকারগ্রস্ত হয়েছে, তখন আমাদের হাতে তার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তা ছাড়া প্রতিভার সাত খুন মাপ, কিন্তু তোমার-আমার কলমের আঁচড়টুকুও সরস্বতীর গায়ে অসহ্য।

শব্দরাশি ভাষা নয়—কিন্তু সেই শব্দরাশির নির্ব্বাচন ও প্রয়োগের গুণেই style জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং বাংলা গদ্যে ততদিন style দেখা দেবে না, যতদিন আমরা লেখায় নির্ব্বিচারে একরাশ শব্দ জড় করবার লোভ সম্বরণ করতে না পারব।

মৌখিক ভাষার অনুরূপ ক্রিয়াপদ এবং সর্ব্বনামপদ লেখায় ব্যবহার কর্‌লে সকলেই দেখতে পাবেন, যে, খাঁটি বাংলার কাঠামোর ভিতর শব্দাড়ম্বের অবসর অতি বিরল। কেন না, সর্ব্বনামের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনের ঝোঁক ঝরে গিয়ে ভাষা অতিরিক্ত ঝরঝরে হয়েছে এবং ক্রিয়াপদের অতিরিক্ত স্বরের টান কমে গিয়ে ভাষা অতিরিক্ত সচল হয়েছে। বঙ্গ-সরস্বতী যে তন্বীশ্যামাশিখরদশনা,—স্থূলানীলাপ্রকটদশনা নন,—এ কথা তিনিই জানেন, যিনি তাঁর বীণাও শুনেছেন, তাঁকে চোখেও দেখেছেন। আমি প্রবন্ধান্তরে দেখিয়েছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য অবশেষে বাংলায় এসে উপনীত হয়েছিল। তিনি বাংলা গদ্যকে যেখানে এনে পৌঁছে দিয়েছেন, আমরা সেখান থেকে ক্রিয়াপদে আর-একটু অগ্রসর হতে চাই।

(২)

কিন্তু মাতৃভাষার দিকে ঐ আর এক পা অগ্রসর হতে গেলেই এত পণ্ডিত ব্যক্তি যে আমাদের পথ আগলে দাঁড়ান, তার একটি গূঢ় কারণ আছে। মানুষের মনে কোনও একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেলে, হাজার তর্ক-যুক্তিতে তার উচ্ছেদ করা যায় না। রোগ যেখানে psychologyর সেখানে logic-এর চিকিৎসা খাটে না। বাংলাভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা থাকাটাই আমাদের মনের পক্ষে স্বাভাবিক। এ অবজ্ঞা আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট উত্তরাধিকারী-সূত্রে লাভ করেছি। এই যুগ-সঞ্চিত সংস্কার বাংলার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে এতই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, প্রায় একশত বৎসরের নব-শিক্ষার বলেও সে সংস্কার আজও একেবারে নির্ম্মূল হয় নি। বাংলার পূর্ব্ব ইতিহাসের দিকে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করলেই এ সংস্কারের মূল কারণ আমাদের চোখে পড়্‌বে। প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বাংলার একমাত্র শিক্ষিত-সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁদের সকল শিক্ষা-দীক্ষার ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং তাঁরা চিরকাল বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করেছেন এবং নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছেন। বাংলা যে একটি ভাষা, এ কথাও তাঁরা কখন স্বীকার করেন নি, কেন না তাঁদের মতে ও বস্তু শুধু সংস্কৃতের অপভ্রংশ। গৃহ্যসূত্রে দেখ্‌তে

পাই যে, সেকালে আর্য্যেরা বাংলা দেশে পদার্পণ করবা-মাত্র তাঁরা ব্রাত্য হতেন, অর্থাৎ তাঁদের জাত যেত,—যেমন একালে বিলেত গেলে আমাদের জাত যায়।

সম্ভবতঃ ঐ একই কারণে সংস্কৃত ভাষার বাংলা দেশের মাটিতে পা ঠেকবা-মাত্র তা পতিত হয়েছিল এবং এই পতিত ভাষার নামই বাংলা ভাষা। এই কারণেই এ ভাষা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিকট চিরকাল অস্পৃশ্য ছিল। চৈতন্যদেব যে এ ভাষাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তার কারণ, তিনি পতিতকে উদ্ধার করবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যিনি আপামরচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে বাংলাভাষাকে কোলে তোলা ত অতি সামান্য কথা। এ যুগে আমরাও ইংরাজি শিক্ষার গুণে ব্রাত্যকে ফের জাতে তুল্‌তে চাই, কিন্তু তা শুদ্ধ করে। আমরাও বাংলা ভাষাকে সাহিত্যে টেনে তুলতে চাই, কিন্তু সে তার গলায় পৈতে দিয়ে। এই হচ্ছে সাধুভাষার জন্ম-বৃত্তান্ত। অপর পক্ষে যাঁরা বাংলা ভাষা যেমনটি আছে তেমনিটি ছাপার অক্ষরে তুলে নিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সাহিত্যকে পতিত করবার অভিযোগ আনা শুচিবাতিকগ্রস্ত সাহিত্যিকদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এ দু'দলের মধ্যে কোন্ দলের মত ঠিক, তা ফলেন পরিচীয়তে। এস্থলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি বাংলা ভাষা এতই অবজ্ঞার বস্তু ছিল, তাহলে প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগে বাংলা সাহিত্য কি করে রচিত হয়েছিল? সংক্ষেপে তার উত্তর দিচ্ছি।

প্রথমতঃ সে যুগে বাংলার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যে টীকা-ভাষ্যের বিপুল সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন, সে-সবই সংস্কৃত ভাষায়। কৃত্তিবাস প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদকেরা অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁরা কেউ আর স্বেচ্ছায় বাংলা লেখেন নি, সকলেই রাজ-আজ্ঞায়। নসরৎশা, হুসেনশা প্রভৃতি গৌড়ের পাঠান বাদশাদের এবং ছুটি-খাঁ, পরগল খাঁ প্রভৃতি পাঠান সেনাপতিদের দৌলতেই বাঙ্গালী জাতি রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতির ভাষায় পরিচয় লাভ করেছে। চৈতন্য-মতাবলম্বী কোনও কোনও পণ্ডিত অবশ্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি স্বল্প, দু'চার জনের অধিক হবে না। চৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন কি না, আমাদের জানা নেই। অপর-পক্ষে চৈতন্য-চরিতামৃতের রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। জাতিতে ইনি বৈদ্য; সম্ভবতঃ সেই কারণে তাঁর গুরু জীব গোস্বামী কবিরাজ মহাশয়কে চৈতন্যের জীবন-চরিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করেন, কেন না জীব গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, কিন্তু সে সব সংস্কৃত ভাষায়।

তা ছাড়া, যে বৈষ্ণব সাহিত্যের এ যুগে এত গৌরব করি, সে সাহিত্য—পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কতদূর অবজ্ঞার বস্তু ছিল, তার প্রমাণের জন্য আমাদের বেশী-দূর যেতে হবে না। বাংলা গদ্যের আদি গুরু স্বয়ং রামমোহন রায়ও ...

বশীভূত ছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন যে, চৈতন্য-পন্থীরা ধর্ম্মবিচারে অধিকারী নয়! কেননা তাদের শাস্ত্র ভাষায় লেখা।

এরূপ মনোভাবের মূলে অবশ্য একটি বৈধ কারণ ছিল—এবং সে কারণ এই যে, বাংলা ভাষা সেকালে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা ছিল না। বাংলায় দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, অলঙ্কার, ইতিহাস প্রভৃতি কিছুই ছিল না; ছিল শুধু ছড়া আর পাঁচালি, গান আর পদাবলী। রামমোহন রায় যে বাংলার বৈষ্ণবশাস্ত্রকে মোটে আমলেই আনেন নি, তার কারণ সে শাস্ত্র পয়ার লাচাড়িতে লিখিত। তিনি এ শাস্ত্রকে বরাবর "চৈতন্য মঙ্গলাদি পয়ার" বলেই উল্লেখ করেছেন। এ পয়ার যে দর্শন বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী ছিল তার বিশিষ্ট উদাহরণ "চৈতন্যচরিতামৃত।" এই কাব্য হচ্ছে মুসলমান-যুগের একমাত্র গ্রন্থ, যাতে দর্শনের ব্যাখ্যা এবং বিচার আছে। পাঠকের কথা দূরে থাক্, স্বয়ং গ্রন্থকারও স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, ভাষায় তিনি নিজের বক্তব্য কথা মোটেই স্পষ্ট করে বল্‌তে পারেন নি, কেননা একালের ইংরাজি শিক্ষিত অধ্যাপক মহাশয়েরা যেমন কথায় কথায় ইংরাজি quote করেন কবিরাজ মহাশয়ও তেমনি পাতায় পাতায় সংস্কৃত quote করছেন। ভাগবত, উজ্জ্বল নীলমণি, কর্ণামৃত এবং কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোক তিনি তাঁর বাংলার টীকা স্বরূপে ব্যবহার করেছেন। এরূপ ব্যবহার যে অসঙ্গত তা তিনি নিজেও জানতেন। কারণ তিনি লিখেছেন—

যদি কেহো ঐছে কয়ে গ্রন্থ কৈলে শ্লোকময়ে
ইতর জনে নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যে আচরণ সেই করি বর্ণন
সেই চিত্ত নারি আরাধিতে ॥

এই একই কারণে ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরাও মাতৃভাষাকে প্রথমে অবহেলা কর্‌তেন, আবার সেই ইংরাজি শিক্ষার গুণেই বঙ্গভাষা আমাদের সুনজরে পড়েছে। দেশ-ভাষায় যে কি অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যশালী সাহিত্য রচিত হতে পারে—তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, ইংরাজি সাহিত্য আমাদের চোখের সুমুখে অষ্ট প্রহর রয়েছে। আমাদের নূতন শিক্ষার প্রসাদেই আমরা মাতৃভাষাকে ভক্তি কর্‌তে না হোক্ চর্চ্চা কর্‌তে শিখেছি। আমরা যে বঙ্গভাষার ক্রিয়াকর্ম্মগুলি করায়ত্ত কর্‌তে চেষ্টা করছি, বর্ত্তমানের পক্ষে এই যথেষ্ট। ভক্তি পরে আস্‌বে তখন, যখন এ ভাষায় জ্ঞানের সাধনা করা যাবে। অর্থাৎ যখন এ ভাষা শুধু সাহিত্যের নয়, শিক্ষারও ভাষা হয়ে উঠবে। কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই ত্রিমার্গ অবলম্বন না করলে ভাষাও মুক্তিলাভ করে না।

যে ভাষা শুধু কাজের ভাষা তা অপভাষা; যে ভাষা কাজের এবং হৃদয়ের ভাষা তা উপভাষা, যে ভাষা জীবন মন এবং জ্ঞান এ তিনেরই ভাষা, তাই হচ্ছে পূর্ণাবয়ব ভাষা। যতদিন না বাংলা, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হয়ে উঠবে, ততদিন বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে না। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি যতদূরসম্ভব

অল্পকথায় এবং পরিষ্কার করে লেখা উচিত। যেখানে বিষয় কঠিন সেখানে ভাষা সহজ হওয়া একান্ত আবশ্যক। জ্ঞানের রাজ্য সকলের পক্ষে সুগম কর্‌বার জন্য একটি standard prose গড়ে তোলা দরকার, এবং আমার বিশ্বাস সে গদ্য মুখের কথা দিয়েই গড়তে হবে নচেৎ দর্শন বিজ্ঞান সুখপাঠ্যও হবে না, সহজ বোধ্যও হবে না। সাধুভাষায় লিখিত দর্শন বিজ্ঞানের পুস্তক পুস্তিকা প্রবন্ধ নিবন্ধাদি পড়ে দেখবেন যে, সে পাঠে না আছে কোনও আনন্দ, না আছে কোনও শিক্ষা। ভাষার শক্তি ও গতি তার পদের দীর্ঘতার উপর নয়, তার দেহগ্রন্থির উপর নির্ভর করে। মৌখিক ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল যে-কব্জায় যে-ভাবে গাঁথা আছে লেখার ভাষাও সেই কব্জায় সেই ভাবে গেঁথে নিতে হবে। সাধুপন্থীরা বাংলাভাষার পদমর্য্যাদা বাড়াতে গিয়ে তাকে শুধু আড়ষ্ট করে ফেলেছেন। মৌখিক ভাষা যে সাহিত্যে চল্‌বে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু সে ভাষা জীবন্ত সে কারণ চলৎ-শক্তি একমাত্র তারই আছে। প্রতি জীবন্ত ভাষার শুধু একটি বিশেষ ঝোঁক্‌টান্ নয়, একটি বিশেষ রোখ্‌ও আছে; সেই রোখেই তা এগিয়ে যাবে, কেউ তার উন্নতির পথ আট্‌কাতে পারবে না;—এর জন্য শোক করা নিষ্ফল।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

চয়ন

রোমাঁ রোলাঁ

এ-বছর সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছেন, ফরাসী ঔপন্যাসিক রোমাঁ রোলাঁ।

ফ্রান্সের মধ্যস্থলে ক্লেমেন্সি নামক স্থানে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রোমা রোলাঁ জন্মগ্রহণ করেন। প্যারি ও রোম সহরে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে তিনি মালউইজ ভন্ ওয়েসেন্‌বার্গ নামক একজন জার্মান রমণীর সঙ্গলাভ করেন। এই রমণী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লবের পর হইতে ইংলণ্ডে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিদুষী মহিলা মাজিনী, সঙ্গীত-রচনা-কুশল ওয়াগনার, বিখ্যাত লেখক নিটুশে, মহাবীর গ্যারিবল্ডী ও নাট্যকার ইব্‌সেন প্রভৃতি সেকালের চিন্তা, কলা ও কর্ম্মরাজ্যের অনেক প্রতিভাধরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে রোলাঁর যখন প্রথম আলাপ হয়, রোলাঁ তখন টলষ্টয়ের শিষ্য ছিলেন। তারপর জার্মান মহিলাটির অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি

তাঁহার নিজের স্বাধীন হৃদয়-ভাবটি শীঘ্রই আবিষ্কার করিতে পারেন। উক্ত মহিলা আপনার স্মৃতি-পুস্তকে রোলাঁ'র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :— "এই ফরাসী-যুবকের ভিতরে ঠিক তেমনি ভাববাদ, তেমনি উচ্চাকাঙ্খা, তেমনি প্রগাঢ় জ্ঞানের ধারণা-শক্তি দেখিতে পাইতেছি, যাহা আমি অন্যজাতীয় মহাপুরুষদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি।"

রোলাঁ'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক "জন ক্রিষ্টোফারে"র বীজ, তাঁহার মনে এই সময়েই অঙ্কুরিত হয়। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া



রোমা রোলাঁ

'সামাজিক যন্ত্র'-রূপে রঙ্গালয়ের পুনর্গঠনের দিকে তিনি মনোযোগ দেন ও কয়েকখানি নাটকও রচনা করেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি তিনি সঙ্গীত-সমালোচক এবং সঙ্গীত-কলাসম্বন্ধে বক্তারূপে সোর্বান নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

তিনি বীথ্‌হোভেন, মাইকেল এঞ্জিলো ও হুগো উল্‌ফের জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। রোলাঁ বীরত্বের একান্ত ভক্ত। তাঁহার চোখে মহাপুরুষেরা পূর্ণ-সত্যের অবতার। তাঁহার স্বষ্ট চরিত্র ক্রিষ্টোফার পরম সত্যবাদী;—সর্ব্ব অবস্থায়, এমন-কি, জীবন বিপন্ন হইলেও তিনি মিথ্যা-কথা কহিবেন না। ইহাই রোলাঁ'র নীতি। "জন ক্রিষ্টোফার" নামক উপন্যাসের সর্ব্বত্রই সঙ্কীর্ণ সামাজিক নীতিজ্ঞান ও ক্রিষ্টোফারের পবিত্র চরিত্রের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাত অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে, —ক্রিষ্টোফার সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত ও জাতীয় অসত্যের ভিতর গিয়া পড়িতেছেন এবং সমাজে যে কিরূপ মিথ্যাচারের প্রভাব, ক্রিষ্টোফার তাহাও সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

"জন ক্রিষ্টোফার" উপন্যাসের মধ্যে সাহিত্য-স্বষ্টির কোন-রকম কল-কৌশল, এমন কি একটা নির্দ্দিষ্ট ঘটনা-সংস্থান পর্য্যন্ত নাই। পদ-যোজনার সকল নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দগুলি একীকৃত হইয়া আছে এবং কোনরূপ সুশৃঙ্খল দার্শনিকতার ধার না ধারিয়া ইহার প্রত্যেক ভাব, অপর ভাবের ধারাকে ঠিক স্বাভাবিক রূপেই অনুসরণ করিয়া

চলিতেছে। সত্যের প্রকাশ হইলে জীবন যেমন সরল বলিয়া বুঝা যায়, এই উপন্যাস-খানিও তেমনি সহজ, তেমনি পরিষ্কার। নায়ক ক্রিষ্টোফারের নিজের জীবনে যাহার পরখ হয় নাই, জীবন লইয়াও এমন কোন-কিছু এই উপন্যাসে কথিত বা চিত্রিত হয় নাই। ক্রিষ্টোফারের নিকটে যাহা অসত্য, লেখকও তাহার অস্তিত্ব দেখাইতে যান নাই; মানবীয় উন্নতি-অবনতির এমন কথা খুব কমই আছে যাহা এই পুস্তকে আলোচিত হয় নাই,—বর্ত্তমান যুগের সকল পুস্তক অপেক্ষা 'জন ক্রিষ্টোফারে' আধুনিক জীবন লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ভাব-জগৎ হইতে 'জন ক্রিষ্টোফার' একটি বিশাল সেতুর মত বিংশ শতাব্দীর ভাব-জগতের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সকল ভাব ও কল্পনা যেখানে পুঞ্জীভূত, ক্রিষ্টোফার ঠিক সেইখানটি হইতেই ভবিষ্যতের পানে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিষ্টোফারের জীবন সরল ও সম্পূর্ণ বাস্তব; যাঁহার সুরুচি আছে, এই পুস্তক তাঁহাকে আনন্দ ও শিক্ষাদান করিবে এবং ক্রিষ্টোফারের সঙ্গে যাত্রা করিয়া পরিণামে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, পৃথিবীতে কান্নার পিছনেও হাসির ধারা আছে, দুঃখের মধ্যেও সুখের ছায়া আছে।

'জন ক্রিষ্টোফার' বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রধান গ্রন্থ। ইহাতে বিংশ শতাব্দীর আবাহন-সঙ্গীত আছে। আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, ইহা তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহা অতীত ও বর্ত্তমানকে প্রকাশ করিয়া আমাদের চোখের সামনে ভবিষ্যতের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

সারা বার্ণাড্

সারা বার্ণাড্ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। গত অর্দ্ধশতাব্দী-কালের মধ্যে আর কোন অভিনেতা তাঁহার প্রতিভাকে মলিন এবং জনসাধারণের উপরে তাঁহার মত এত প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই। আজ তাঁহার বয়স সত্তর বটে; কিন্তু বৃদ্ধ কালও তাঁহার চির-যৌবনের কাছে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও সারার মুখে যুবতীর লাবণ্য এবং কণ্ঠস্বরে যৌবনোচিত কোমলতা আছে।

জনসাধারণে তাঁহার নাম দিয়াছে 'স্বর্গীয় সারা'। কিন্তু কেবলমাত্র অভিনেত্রী বলিয়া সারা সুপরিচিত নন, মানসিক শক্তি ও আদর্শ-চরিত্রের জন্যও তিনি সকলকার শ্রদ্ধা-ভক্তির অঞ্জলি পাইয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহু যুগের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে। সারার আলাপ আলোচনা ক্ষমতাও বড় অল্প নহে।

আমরা এখানে তাঁহার আত্ম-উক্তি তর্জ্জমা করিয়া দিলাম :—

"সকলেই আমাকে আজকাল জিজ্ঞাসা করেন যে, 'কিরূপে আমি আমার যৌবন রাখিতে পারিয়াছি' "—

কিরূপে? হৃদয়ে সর্ব্বদাই আমি যৌবনের

সাড়া পাই বলিয়া। মানসিক যৌবনই আমার দেহকে জরাগ্রস্ত হইতে দেয় নাই। তারপরে, কাজের দিকে আমার টান বড় বেশী। আমার ডাক্তার যদি আমাকে কিছু করিতে বলেন, তবে আমি কিছুতেই তা করি না!

প্রতিদিন আমাকে যথেষ্ট খাটিতে হয়। সকালটা চিঠিপত্রের উত্তর দিতে দিতে কাটিয়া যায়। এই সেদিনে আমাকে সারা সকালটায় আমার সেক্রেটারীকে লইয়া একশত আট-চল্লিশ খানা পত্র পাঠ করিয়া উত্তর দিতে হইয়াছিল।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে দু-চার জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমি আহার করিতে বসি। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে রঙ্গালয়ে যাইতে হয়; সেখানে আমিই সর্ব্বেসর্ব্বা। রঙ্গালয়ে আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকি। যবনিকা পড়িলে সেখান থেকে বাহির হইয়া হোটেলে যাই। তাহার পর মধ্যরাত্রে শ্রমক্লান্ত দেহ লইয়া আমি স্বপ্নহীন নিদ্রায় অচেতন হই।

কৃত্রিম উপায়ে বার্দ্ধক্যকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। যৌবন বাহির হইতে আসে না; আসে মনের ভিতর হইতে। মনকে তরুণ রাখ, কঠোর পরিশ্রম ও মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম কর, সৎসাহিত্য ও সুচিন্তা দ্বারা প্রাণের খোরাক যোগাও, দেখিবে অচির-যৌবন সুচির হইয়া উঠিয়াছে।

ত্রিশ বৎসর আগে যখন আমি সব-প্রথমে লণ্ডনে আসি, তখন এ-সহরটির আর এক রূপ ছিল। এখন এখানে যত রঙ্গালয় ও সঙ্গীতশালা (varicty house) হইয়াছে তখন ইহার দশাংশের এক অংশও ছিল না। শুনিতে পাই, প্রমোদ-ভবন অসংখ্য হইলেও তাহার সকলগুলি জনতায় একেবারে পরিপূর্ণ থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বিলাতের বাসিন্দারা আগেকার চাইতে এখন বেশী আমোদ-প্রমোদ করিতে ভাল বাসে।

বিলাতি রঙ্গালয়গুলির আদর্শ বরাবরই উন্নত; সুতরাং এদিকে আমি বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি না।

কিন্তু, বিলাতে কোন জাতীয়-রঙ্গালয় নাই কেন? সাধারণের চাঁদায় অবিলম্বে এখানে একটি জাতীয়-রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের সঙ্গে আমার অনেকবার সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য হইয়াছে;—তাঁহারও ঠিক এই মত ছিল।

শুধু জাতীয়-রঙ্গালয় নয়,—বিলাতে নাট্যকলা শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়েরও অভাব আছে। বিদ্যালয় না থাকিয়াও এতদিন যে অভিনেতাদের কি-করিয়া চলিতেছে, সেকথা ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হই। এরূপ বিদ্যালয় যথেষ্ট সুফল প্রসব করে।

বিলাতি অভিনেতাদের আসল দোষ এই, তাঁরা সকলেই আপন আপন খেয়াল-মত অভিনয় করেন। ফলে, অভিনয়ের সাধারণ গুণটি একেবারে মাটি হইয়া যায়। অবশ্য সকলেই এ দলের নন; এমন অনেক বিলাতি অভিনেতা আছেন, যাঁহাদের শক্তি অসামান্য।

নাট্যকলার বিদ্যালয়, কোন অভিনেতার উপরে তাঁহার ব্যক্তিগত নিজত্বের ছাপ

মারিয়া দিতে পারে না বটে, কিন্তু এখান হইতে অভিনেতারা সৌন্দর্য্য ও নির্দ্দোষ আবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারেন। সর্ব্বোপরি এখনকার ছাত্র তাঁহার সহযোগী অভিনেতাগণের সহিত স্বরমিল করিতে শিক্ষিত হন। আবৃত্তিতে স্বরমিলশূন্য কোন কণ্ঠ, ঐক্যতানবাদ্যে কোন বেসুরা যন্ত্রের মত শ্রোতাদের কাণে একটা বেখাপ্পা আওয়াজ করিতে থাকে।



হ্যামলেটবেশে সারাবার্ণাড্

সকল রকম চরিত্রেই কাহার কতটা সমদক্ষতা, সেটা বিচার করিয়া দেখিলে কোন্ অভিনেতা কোন্ শ্রেণীর, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমার নিজের কথাই যদি ধরি, তবে আমাকে বলিতে হয়, আমার নিজের কোন বিশেষরূপে প্রিয় ভূমিকা নাই। যদিও এটা ঠিক যে, রমণীর চেয়ে পুরুষের ভূমিকাই আমি বেশী পছন্দ করি। কিন্তু সেক্সপিয়ারের পোর্সিয়ার মত ভূমিকা ছাড়া আর কোন রমণীচরিত্রের ভূমিকায় সাধারণত চিন্তা করিবার মত বড়-একটা-কিছু থাকে না।

কিন্তু হ্যামলেট ও L'Aiglon এর চরিত্র! বাস্তবিক, এ দুটি চরিত্রের ভূমিকা বিচিত্র! হ্যামলেটের ব্যক্তিত্ব আমি সর্ব্বদাই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া থাকি। যে অপূর্ব্ব ভাবের ধারা তাঁহার ভিতরে থাকিয় তাঁহারা সকল কার্য্যে বাধা দেয়, আমি সর্ব্বদাই তাহা আলোচনা করিতে ভালবাসি। সেক্সপিয়ার এই চরিত্রে, একটি দুর্ব্বল দেহে মহান আত্মার আসন রচনা

করিয়াছেন। কারণ, আমার বিবেচনায় হ্যামলেটের মত ক্ষুদ্র চরিত্রের পক্ষে তাঁহার আবেগের ধারা অতিশয় বিশাল। অনেকে হ্যামলেটকে পাগল বলিতে চান; কিন্তু আমার মতে তিনি পাগল নন।

অনেকদিন আগে আমি ভারি রোগা ছিলাম আর আমার স্বাস্থ্যও ততটা ভাল ছিল না। সকলে ভাবিয়াছিলেন, আমার ক্ষয়রোগ হইয়াছে। একদিন এক বন্ধু আমাকে বলিলেন, 'আমি তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই।'

আমি বলিলাম, "বটে, তবে তুমি আমাকে একটি কফিন পাঠিয়ে দিও।"

কফিন আসিল। আমি সেটিকে আমার শয়ন-গৃহে রাখিয়া দিলাম। হঠাৎ আমার এক বোনের অসুখ হইল। তিনি আমার শয়ন-গৃহে ঘুমাইতে আসিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে শুইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু ডাক্তার আমাকে মানা করিলেন। অতএব আমি কফিনের ভিতরে গিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম!

এই শেষ কথার পর আর একটি কথা সকলকে আবার স্মরণ করাইয়া দিয়া আমি বিদায় লইব। যৌবনকে যিনি আমার মত চিরস্থায়ী করিতে চান, তিনি যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন কঠোর শ্রম, সবল ইচ্ছাশক্তি ও সৎচিন্তার ভাবনার মধ্যেই অক্ষয় যৌবনের মধুর উৎস আছে।

জাপানী রঙ্গিন ছাপা

জাপানের অনেক শিল্প-নিদর্শনের প্রতি প্রতীচ্যের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জাপানী রঙ্গিন ছাপা যেমন সকলকার মনোহরণ করে তেমন আর কিছুই নহে। জাপানীদের কাঠের উপরে খোদাই-করা ছবিতে রঙ্গের যেমন ললিত লীলা, খোদ্‌কারীর যেমন বিচিত্র হস্তচাতুরী দেখা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। য়ুরোপ ও আমেরিকার কলাবিদ্‌গণ তাই জাপানী রঙ্গিন ছাপাকে ললিত-কলার মধ্যে একটি উঁচু আসন দিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের কথা এই, জাপানী শিল্পের এ বিভাগটি য়ুরোপ ও আমেরিকায় নাম

এ বিভাগের ছবিগুলিকে জাপানে 'বাজারে ছবি' বলিয়া তাচ্ছীল্য করা হয়।

মানুষের দৈনন্দিন জীবন লইয়া ছবিগুলি আঁকা। নামজাদা অভিনেতা ও সহরের মেয়েরা পটুয়ার আদর্শ হন; কারণ তাঁহাদের বর্ণবিচিত্র অঙ্গচ্ছদ চিত্রার্পিত হইলে সকলেরই চিত্তরঞ্জন করে।

আগে জাপানী কলার প্রধান বিভাগ ছিল দুটি,—Kano ও Tosa চিত্রমালা। তখন সাধারণত রাজসভার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, ছাত্রের দল ও পুরোহিত-শ্রেণীর লোকেরা চিত্রাঙ্কন করিতেন। জাপানের মন্দিরে মন্দিরে যে-সকল প্রাচীন পট দেখা যায়,



'সামুরাই'-পুত্র
(প্রাচীন চিত্র)

শিল্পিগণের অঙ্কিত। উক্ত বৌদ্ধ পুরোহিত-গণের মধ্যে শদেংসু ও সেষু (১৫০৬) নামে পটুয়া-দুজনই প্রধান। এই সময়ে Kano-চিত্রকরেরা টাকা-কড়ি কিছুই পাইতেন না। তবে, তাঁহাদের পৃষ্ঠ-পোষকদের কাছ হইতে তাঁহারা পারিতোষিক-হিসাবে চাউল বা অন্য-কিছু জিনিষ গ্রহণ করিতেন। সেকালে জাপানে টাকার বড় কদর ছিল না। শিল্পীরা টাকা নেওয়া একটা অপমান বলিয়া ভাবিতেন।

তারপর Ukiyo-e চিত্রমালার চলন হইল। জাপানীরা পূর্ব্বকথিত রঙ্গিন ছাপারই নাম দিয়াছে Ukiyo-e বা উকিয়ো-ইয়া।

কিন্তু সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জাপানীরা এই নবীন শিল্পকে তখন একেবারেই আমোল দেন নাই। য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রশংসাবাদ শুনিয়া সংপ্রতি জাপানীরা তাহাদের রঙ্গিন ছাপার কিছু-কিছু আদর করিতে সুরু করিয়াছে বটে,—কিন্তু আসল শুভমুহূর্ত্ত এখন কাটিয়া গিয়াছে; কারণ, প্রাচীন রঙ্গিন ছাপার ভাল ভাল নমুনা এখন পাশ্চাত্য দেশে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ইয়োসা মাতাহেই নামে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় শিল্পী এই উকিয়ো-ইয়া বা রঙ্গিন ছাপার আবিষ্কার করেন। পুরাতন কলা-পদ্ধতির অনুসারীগণ পুরানের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মমূলক চিত্রাদি অঙ্কন করিতেন। মাতাহেই সে চিরাচরিত প্রথা ছাড়িয়া জাপানী চিত্রকলায় এক অপূর্ব্ব বৈচিত্রের সঞ্চার করিলেন। সকলেই যাহাতে সহজে সব বুঝিতে পারে, সাধারণকে

তিনি এমন একটা আটপৌরে জিনিষ দিলেন।

মাতাহেই রঙ্গিন ছাপার আবিষ্কারক হইলেও এদিকে প্রথম ও প্রধান ওস্তাদ হইতেছেন হিষিকাওয়া মোরোনোবু। সম্ভবত তিনি ১৬২৫ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ অঙ্কনপটুতা ছিল; তিনি বইয়ের জন্য শাদা ও কালো রঙ্গে ছবি আঁকিতেন। সে-সকল ছবিকে Sumi-e বা স্থমি-ইয়া অর্থাৎ 'কালো কালির ছবি' বলা হইত। মাঝে মাঝে কেহ কেহ হাতে করিয়া সেগুলির উপরে নানান্ রঙ্গের তুলি বুলাইতেন। কিন্তু সে বর্ণরঞ্জনে চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হইত না। মোরোনোবুর হাতে আঁকা ছবি এখন বাজারে বড় মেলে না। জাপানের অন্যান্য সকল শিল্পের মত, তাহার ছবি-ছাপার পদ্ধতিও চীনদেশ হইতে আসিয়াছিল।

উকিয়ো-ইয়া-শিল্প-পদ্ধতির ওস্তাদগণের আসল বিশেষত্ব হইতেছে, পরিকল্পনার প্রতি খুঁটিনাটিতে, আখ্যান-বস্তুতে এবং বর্ণবিন্যাসে তাঁহাদের অপূর্ব্ব কল্পনার খেলা। জাপানে এই শ্রেণীর হাজার হাজার রঙ্গিন ছাপার পট দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের সকলগুলিরই বিষয় নূতন নূতন,—একখানি ছবির সঙ্গে আর একখানি ছবির কোন সারূপ্য দেখা যায় না।

অভিনেতা ও সহুরে অন্যান্য লোকজনের ছবি ছাড়া চিত্রকরগণ চায়ের দোকানের ললনা, অপরূপ রূপবতী নর্ত্তকী ও সপ্ত ভাগ্যদেবতা প্রভৃতির ছবি আঁকিতেও

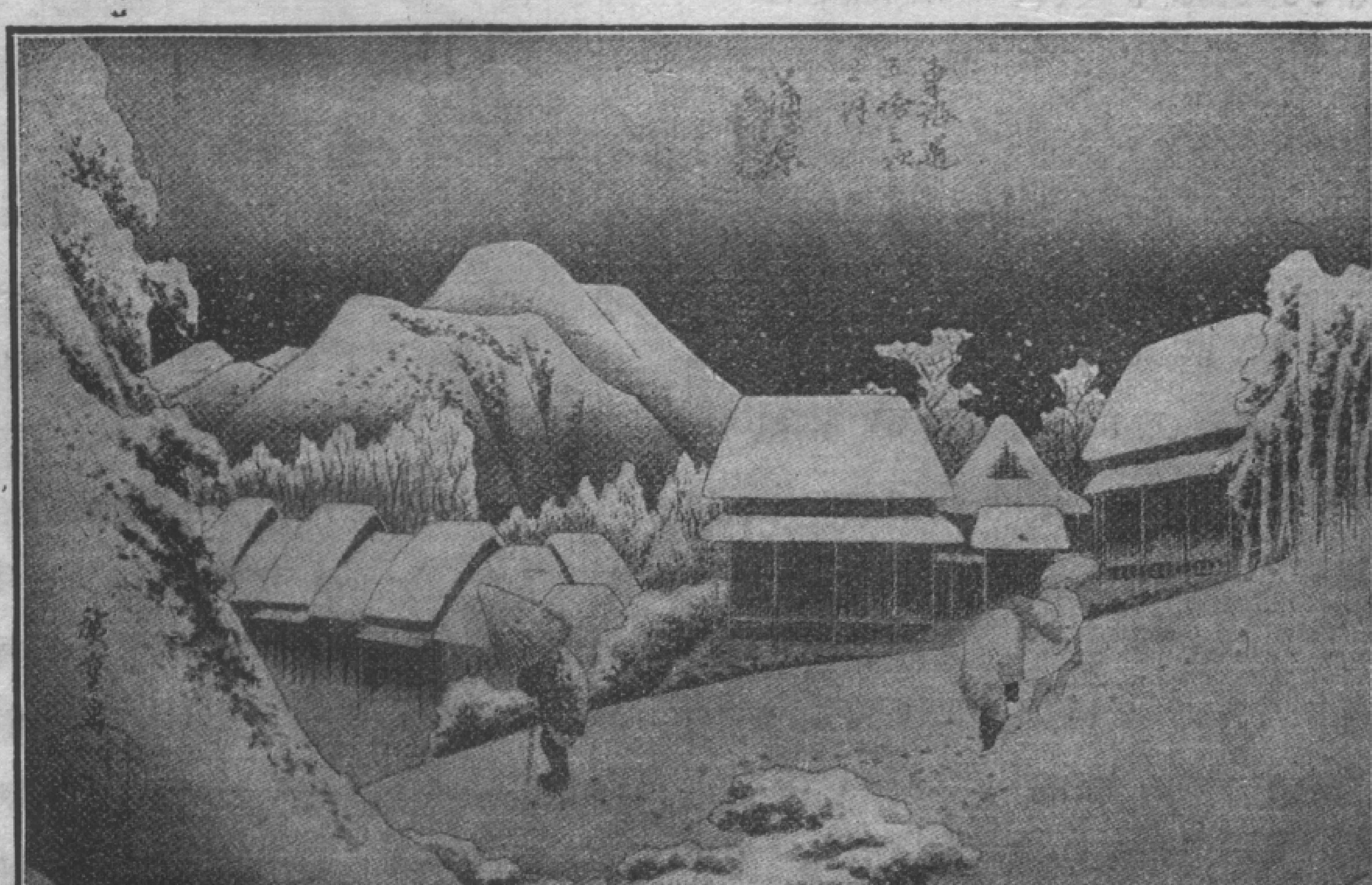


ফুলওয়ালী
(প্রাচীন চিত্র)

ভালবাসিতেন। হোকুসাই ও হিরোষিগ নামক শিল্পিদ্বয়ের চমৎকার নিসর্গ-চিত্রগুলি য়ুরোপ ও আমেরিকায় সকলের চেয়ে বেশী আদর পাইয়াছে।



উত্তাল তরঙ্গ (হকুসাই অঙ্কিত)



হিরোষিগের আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য

হিরোষিগ হাতপাথার জন্য অনেক সুন্দর পরিকল্পনা করিয়াছেন। সেকালে জাপানের সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকেরা যখন সমারোহের সহিত কোন ভোজের আয়োজন করিতেন, তখন উৎসবের সচিত্র তালিকা অঙ্কনের ভার শিল্পিগণের উপরে অর্পিত হইত। অতিথিরা সেই সচিত্র তালিকা দাতার স্মরণচিহ্নস্বরূপ উপহার লাভ করিতেন। হোকুসাই ও গাকুতেই নামে দুজন শিল্পী এইরূপ অনেক প্রসিদ্ধ সচিত্র তালিকা বা 'সুরিমোনো' অঙ্কন করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হোকুসাই অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তখনকার উপন্যাস-লেখকগণ আপনাদের পুস্তক সচিত্র করিতে হইলে হোকুসাইএর সাহায্য লইতেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মাঙ্গোয়া' নামে একখানি পট-পুঁথি প্রকাশ করিয়া যশবান হইয়া উঠেন। হোকুসাই রসিক চিত্রকর ছিলেন; কোন জিনিষেরই সরস অংশটি তাঁহার খরচোখ এড়াইয়া যাইতে পারিত না। প্রতি ছবিখানির উপরেই তাঁহার তুলি লইতে যেন তরল হাস্যরসের বিন্দু ঝরিয়া পড়িত। তিনি কখনও একটা আদর্শ খাড়া করিতে যাইতেন না, বাস্তবতা তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিল। অনেক ছবির তলায় তিনি এই বলিয়া নিজের নাম লিখিতেন—"চিত্রপাগল বৃদ্ধ লোক"!

হোকুসাই ও হিরোষিগের মৃত্যুর পর হইতে জাপানী রঙ্গিন ছবি-ছাপার কাজ খারাপ হইতে সুরু হয়। তাঁহাদের আগে আরও অনেক ওস্তাদ-পটুয়া ছিলেন,—সকলকার পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব।

প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের শিল্পিগণের মত জাপানী চিত্রকরেরাও, দর্শককে কর্ম্মকঠোর পৃথিবীর হৈ-চৈ ভুলাইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্বপ্নলোকে লইয়া যাইতে চাহিতেন,—প্রাচ্য তথা জাপানী কলার এইখানেই বিশেষত্ব।

কাইসারের চরিত-চিত্র

স্পেনের রাজকুমারী ইন্‌ফান্তা য়ুলেলিয়া ইংরাজী সাহিত্যে অল্পবিস্তর নাম করিয়াছেন। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তিনি জার্ম্মান-সম্রাটের একটি চরিত-চিত্র লিখিয়াছিলেন; সংপ্রতি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার কয়েকটি স্থান তুলিয়া দিলাম :—

"রাজকীয় শোভাযাত্রার সঙ্গে আমি প্রাসাদের ঘরের ভিতর দিয়া বেশ প্রফুল্ল প্রাণেই যাইতেছিলাম। আমার বয়স তখন বেশী নয়। উপস্থিত জনতাকে প্রতি-নমস্কার করিবার জন্য যখনই আমি মাথা তুলিতেছিলাম, শোভাযাত্রার সর্ব্বাগ্রে জমকালো পোষাক-পরা কাইসারকে তখনই সমুজ্জ্বল রৌপ্যমূর্ত্তির মত দেখিতে পাইতেছিলাম। তাঁহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ আলোক-পাতে যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সম্রাটের সম্মুখে মধ্যযুগের পরিচ্ছদধারী

চারিজন ভেরীবাদক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

সম্রাট যখন চন্দ্রাতপের তলায় সিংহাসনের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া বিশাল সভার দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন, আমি তখন তাঁহার নীল চক্ষুতে রাজার স্বর্গীয়ত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসের চিহ্ন পরিস্ফুট হইতে দেখিলাম।

সেদিন সকালে কাইসারকে দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের ছাপ্ পড়িয়াছিল, তাহা নূতন নহে। বহুবৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন কুমার উইলহেল্‌ম্ রূপে পরিচিত ছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে সাদাসিধে একটি যুবার বেশে দেখিয়াছিলাম। তারপর যেদিন হইতে তিনি 'ক্রাউন প্রিন্স' হইলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার স্বভাব বদলাইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার আচার-ব্যবহারে কেমন গর্ব্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার ভাব আসিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর যতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, ততবারই আমার মনে হইয়াছে যে, তিনি যেন আপনাকে স্বয়ং বিধাতার হস্তচালিত, সাম্রাজ্য-শাসনের একটি স্বর্গীয় যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন।

বার্লিন নগরকে সম্রাট ঠিক তাঁহার সন্তানের মত ভালবাসেন। একদিন সকালে তিনি আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ বড়ই বৃষ্টি হচ্ছিল, এই সবে থেমেছে। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে একটি চমৎকার ব্যাপার দেখাব।"

আমাদের জন্য নীচে যে রাজশকট অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল।

সম্রাট আমাকে এমন-কি-আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইবেন, বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময়ে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ! রাস্তার দিকে একবার চেয়ে দেখ! এমন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল—এই মিনিট-কতক আগে আকাশ সবে ফরসা হয়েছে—কিন্তু তবু তুমি রাস্তায় এক ছিটে কাদা দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?"

বাস্তবিক, রাস্তাগুলি আশ্চর্য্যরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সম্রাট বলিলেন, "রাস্তা ঝাঁট দেবার জন্যে আমি মস্ত ফৌজের মত একদল লোক পুষ্‌ছি। বার্লিনকে আমি কত পরিষ্কার রাখি, তোমাকে তাই দেখাতে এনেছি।"

—"কেবল এই দেখাতে এনেছেন—আর কিছু নয়?"

"আর কিছু নয়।"

আমরা দুজনেই হাসিতে লাগিলাম।

সম্রাট আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। নিচের ঘটনাটিতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

আমি তখন স্বদেশে। প্যারিতে একটি তুর্কী মহিলার সহিত আমার আলাপ হয়,—একদিন তিনি আসিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তুরুস্কের সুলতান আবদুল হামিদ, ইজ্জত্ পাসা নামে একজন লোকের প্রাণদণ্ড দিতে চান। জার্ম্মান-সম্রাট শীঘ্রই কনস্তান্তিনোপলে যাইবেন, আমি যদি বন্দীর মুক্তিপ্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে একটু

খানি পত্র লিখি, তবে তাঁহার অনুরোধে সুলতান প্রাণদণ্ড রদ্ করিতে পারেন।

ইজ্জত্ পাসা যে কে, আমি কোন জন্মে তাহা জানিতাম না। কিন্তু তুর্কী মহিলাটির কাতর প্রার্থনায় সম্রাটকে আমি একখানি পত্র না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পত্রের উত্তর আসিল। কাইসার আমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। কাইসারের অনুরোধে সুলতানও বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইয়া গেল না। দুই বৎসর পরে একদিন আমি ভ্রমণের পরে মাদ্রিদে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। গাড়ী হইতে নামিবামাত্র দেখিলাম, রাণী-মা ও আমার বোন রাজকুমারী ইসাবেলা আমাকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

আমাকে দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "য়ুলেলিয়া, তুমি যে তুর্কী লোকটিকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছ, তিনি কে?"

—"তুর্কী? আমিত কোন তুর্কীকে চিনি না!"

ইসাবেলা বলিল, "এঁকে তুমি তোমার কাছে রাখ্তে চাও, তাই ইঁনি এখানে এসেছেন।"

আমি চটিয়া বলিলাম, "কি সব বাজে বোক্‌চ, তার ঠিক নেই! তোমরা দুজনেই কি পাগল হয়ে গেছ?"

রাণী বলিলেন, "উঁহু, পাগল হতে যাব কেন? তুরুস্কের সুলতান চিঠি লিখেছেন যে, তোমাকে খুসী রাখবার জন্যে তিনি এই লোকটিকে তুর্কী মন্ত্রীরূপে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন!"

এতক্ষণে সব কথা বুঝিলাম। আবদুল হামিদ নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন আমার প্রার্থনাতেই জার্ম্মান-সম্রাট ইজ্জত্ পাসার মুক্তির জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। নারী-চরিত্র সম্বন্ধে সুলতানের যতটুকু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বন্দীর এই মুক্তিকামনার মধ্যে নিশ্চয়ই আরব্যোপন্যাসের মত একটি প্রণয়-কাহিনী লুকানো আছে; অতএব আমার হৃদয়কে প্রসন্ন করিবার জন্য সুলতান তাঁহার কল্পিত রোমান্সের নায়ককে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন!

ফরাসীরা ভাবিয়া থাকেন, কাইসারের হৃদয়ে কেবল জার্মান আদর্শের স্থান আছে। এ ধারণা ভুল। কারণ, ফরাসী সাহিত্যে তাঁহার রুচি অত্যন্ত অধিক। ফরাসী ভাষার ভাল ভাল বইগুলি তিনি সব পড়িয়া ফেলিয়াছেন। ফরাসী ভাষা, কলা ও নাট্যে তাঁহার কতটা ভক্তি, তিনি একদিন আমাকে তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন।

পোট্‌সডামের প্রাসাদে যে বিস্তৃত কক্ষে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের লাইব্রেরী আছে, সম্রাট একদিন আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। ফ্রেডারিকের বন্ধু ভলটেয়ারের স্মৃতিচিহ্নগুলি আগে দেখিয়া আমি পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলাম। আমার পিছনে যখন ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল, তখন দেখিলাম আমার চারিদিকে অনন্ত পুস্তকের

শ্রেণী রহিয়াছে। বইগুলি সব ফরাসী ভাষায় লেখা।

আমি বড়ই ফরাসী-ভক্ত ছিলাম। তাই আমার দিকে চাহিয়া কাইসার হাসিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "এখানে এলে তোমার মনে হবে, তুমি তোমার প্রিয় ফ্রান্সে ফের ফিরে এসেছ।"

কাইসার, তাঁহার সাম্রাজ্যমধ্যে সামরিকতাকেই প্রাধান্যদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রবল সৈন্যদল ও নৌশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রয়াস, সমগ্র জার্ম্মান জাতির মধ্যেও যে একটা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজাকে ভক্তি করিতে শিখিয়া জার্ম্মান প্রজাগণ কাইসারের সমস্ত কাজেই সায় দিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। বণিজ্য-বিস্তারের জন্য জার্ম্মান-সম্রাট সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রজারাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, সম্রাটের চেষ্টায় তাহারা কতটা উপকৃত হইয়াছে। কাইসার নৌশক্তি ও সৈন্য বৃদ্ধি করিতে চান; অতএব, তাঁহার প্রজাগণও কোন কারণ জিজ্ঞাসা করে না অথবা বৎসরে বৎসরে বর্দ্ধিতহারে টেক্স দিতেও বিদ্রোহ প্রকাশ করে না। সম্রাট উইলিয়মের মত এই, যে, শান্তিরক্ষায় বাহুবলই শ্রেষ্ঠ বল।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

সমালোচনা

ভিনাস্‌চিত্র ও অন্যান্য গল্প। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। প্রসিদ্ধ মার্কিন হাস্যরসিক মার্ক টোয়েনের কয়েকটি রচনা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ভূমিকায় মার্ক টোয়েনের সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় আছে—সেটুকু বেশ উপভোগ্য। তদ্ভিন্ন 'ভিনাসচিত্র' 'অপ্রস্তুত' প্রভৃতি কয়েকটি লেখা আছে। সেগুলি কৌতুক রসে পূর্ণ—তবে ভাষা সব জায়গায় সমান ঝরঝরে হয় নাই. অনুবাদের কটু গন্ধ রহিয়া গিয়াছে। একটু নমুনা দিতেছি, "হ্যারিস কতকগুলি অভিমত ব্যক্ত করিল—তারপর তাহার শয়ন ঘরের দিকে গেল। কতকগুলি আসবাবপত্র চুরমার করিতে যাইতেছে বলিয়া গেল ("অপ্রস্তুত)।" লাইন ধরিয়া অনুবাদ করিলে এ দোষ অপরিহার্য্য—লেখক এইটুকু বুঝিয়া ভবিষ্যতে সতর্ক হইলে আমরা সুখী হইব। যাহা হৌক, মোটের উপর গ্রন্থখানিতে বৈচিত্র্য আছে।

কার্ত্তিক-চরিত। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি,-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। শ্রীপাঁচুগোপাল ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। বিনামূলে বিতরিত। এ গ্রন্থে শান্তিপুর-সূতরাগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবনী-পরিচয় ও তৎ-প্রসঙ্গে উক্ত গ্রাম ও তত্রস্থ মোদকজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুলিখিত, জীবনীটি সুখপাঠ্য এবং ইতিহাসটুকুও কৌতূহলোদ্দীপক। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু—সঙ্কলনেও তিনি যথেষ্ট অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে



আলোর উদয়
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]　　　　মাঘ, ১৩২২　　　　[১০ম সংখ্যা

আধুনিক ভারত

সরকারী কোষ ও পূর্ত্তকর্ম্ম

নৈতিক সভ্যতা ও ভৌতিক সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি একই সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত; তাছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপ যে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছিল দ্রুত ধনবৃদ্ধিই তার বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। তাই ৫০ বৎসর হইতে ভারত-সরকার ভারতের ভৌতিক উন্নতির পরিবর্দ্ধনে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিবার দুইটি উপায় আছে:—রাজস্ববৃদ্ধি ও বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান।

সরকারী কোষ

কোম্পানী ভারতকে মুস্কিলের অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন:—লর্ড ডেলহৌসির বিজয়-সাধন ও সিপাহিবিদ্রোহ দমনের ফলে ভারত-সরকারকে বহুল ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছিল, এবং ইহার দরুন ভারত সরকার করস্থাপন করিতে ও ঋণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই করবৃদ্ধির জন্য পূর্ণমাত্রায় কোষের সংস্কারসাধন আবশ্যক হইল। "কেন্দ্রীকরণ" ও "নিষ্কেন্দ্রীকরণ" একযোগে এই দুই প্রণালী অনুসরণ করিয়া এই সংস্কার সাধিত হইল। স্বাধীনকল্প বোম্বাই ও মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সী সিপাহী-বিদ্রোহের খর্চ্চা দিতে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু তাহাদিগের নিকট হইতে জোর করিয়া খর্চ্চা আদায় করা হইল। ভারতের একটি রাজস্ব-বিভাগ ছিল এবং একজন রাজস্ব-সচিব ছিল। রাজস্ব-সচিব—মন্ত্রিপরিষদের শাসন-বিভাগের সদস্য। এইরূপ দুরূহ অবস্থায় সুপরীক্ষিত প্রবীন ইংরাজ কোষাভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

নিষ্কেন্দ্রীকরণ। একটা সাম্রাজ্যের মতই বৃহৎ ও লোকাকীর্ণ ভারত-প্রদেশগুলি স্বরাজশাসনের অনেকটা অংশ লাভ

করিয়াছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আয়ব্যয়ের পৃথক বজেট নাই কিন্তু ভারত-সরকার তাহাদের প্রত্যেকের জন্য যে আয়ব্যয় ধরিয়া দিয়াছেন তাহা তাহাদের আদায়ী রাজকরের অনুপাতী।

রাজস্বপ্রণালীও নূতন করিয়া গঠিত হইল। অনেকগুলি প্রদেশে, সমগ্র রাজস্ব একটি নূতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। পর্মিটের শুল্কহার নূতন করিয়া বন্দোবস্ত হইল। প্রথমে ভারত-সরকার শুল্ক সম্বন্ধে রক্ষিণী নীতি—পরে অবাধ বিনিময়ের নীতি অবলম্বন করে; শেষে সীমাবদ্ধ রক্ষিণী নীতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অনেকবার পরিবর্ত্তন হইবার পর, আজকাল সুরা-দ্রব্য ছাড়া আর কিছুরই উপর অপ্রত্যক্ষ কর বসান হয় নাই এবং বিবিধ পরীক্ষার পর, এক্ষণে প্রত্যক্ষ করের হিসাবে আয়-কর আদায় করা হইয়া থাকে। এইরূপ ইতস্তত করা হইতেই বুঝা যায়, কোন এক দেশের রাজস্ব-প্রণালী স্থির করা ও নূতন করের কার্য্য-ফল নির্ণয় করা কত কঠিন। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি য়ুরোপীয় সভ্যতার দ্বারা ভারতের রূপান্তরীকরণ কেন এত বিলম্বে সংসাধিত হইয়াছে।

এইরূপ ইতস্তত করা সত্ত্বেও, যে জায়গায় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২১ ক্রোড় টাকা ছিল, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪০ ক্রোড় টাকা রাজস্ব ছিল, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেই জায়গায় উহা ৭১ কোটি টাকায় উঠিয়াছিল। তাই অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা, ও রাষ্ট্রপরিচালক রাজনৈতিক পুরুষেরা বলেন যে ভারত-রাজকোষের বিলক্ষণ স্থিতিস্থাপকতা আছে। দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও, কৃষকশ্রেণীর দারিদ্র্যসত্ত্বেও, প্রতি বৎসর প্রভূত রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। এই রাজস্বের স্থিতিস্থাপনতা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, কতকগুলি বিপরীত বাহ্য লক্ষণ সত্ত্বেও, ভারত স্বাভাবিক নিয়মে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

*
* *

যে দেশ রূপান্তরিত হইতেছে, সে দেশ রাজস্ব-প্রসূত মূলধনেই কখন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। দেশের ভিতরকার ও বাহিরের প্রয়োজনের দরুন পূর্ব্বেই অনেক টাকার ঋণ হইয়াছিল,—সিপাহী-বিদ্রোহের পর আবার এই ঋণ আরো বাড়িয়া গেল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় ঋণ তিন মুখ্য বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে:—কোম্পানী-দত্ত মূলধনের পরিশোধার্থ ঋণ, ১৮৫৭ অব্দের পূর্ব্বেকার ঋণ এবং দেশবিজয়ের খর্চ্চার হিসাবে ঋণ এবং সিপাহী-বিদ্রোহের খর্চ্চা বাবৎ ঋণ। মনে হইতে পারে, অন্য জাতির কোষসংক্রান্ত ইতিহাসে এরূপ ঋণের দৃষ্টান্ত ত দেখা যায় না। কিন্তু সেটা শুধু বাহ্য অবভাস মাত্র। বহির্যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও বহুব্যয়সাপেক্ষ সংস্কারাদি ব্যতীত কোন জাতি গড়িয়া উঠে নাই; হাজার হাজার উপনিবেশ-বাসিন্দার খর্চ্চা, উচ্চবংশীয় জাপানীদিগের ও ভূসম্পত্তি-চ্যুত আইরিশ ভূস্বামীদিগের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সকল দেশেরই জাতীয় ঋণের কিয়দংশ, উহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক একতা সাধনের মূল্যস্বরূপ ধরা যাইতে পারে।

ইংরাজকৃত দেশজয়ের খর্চা ও ভারতীয় ঋণের পরিমাণ এই উভয়ের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। কারণ ভারতের শত্রু-জাতি ও শত্রু-রাজ্য হইতেই ইংরাজেরা একটা সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে।

পক্ষান্তরে নিজের দোষপ্রমাদ হইতে, এবং অনাবশ্যক যুদ্ধ বিপ্লবাদি হইতেও, দেশ ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকে। ১৮৭৭ অব্দের সামুরাইদের বিদ্রোহের ন্যায়, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহ—বর্ত্তমান রীতিনীতির বিরুদ্ধে অতীত-ভক্তদিগের একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। বুদ্ধির ভুলই ইহার কারণ। এই সকল ঘটনায় উত্তরবংশীয় লোকেরা বিপুল ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়াছে।

আর দুই কারণে ভারতের ঋণ আরো বাড়িয়া গিয়াছে। একটা কারণঃ—সকল সভ্য জাতির মধ্যেই সামরিক ব্যয় একটা প্রধান ব্যয়ের বিষয়। তবে তাহাদের সহিত ভারতের এই প্রভেদ যে, ভারতের বৈদেশিক সৈন্য এবং ভারতের সামরিক রাষ্ট্রনীতি, প্রায়ই ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা, ইংলণ্ডের স্বার্থসাধনেই ব্যাপৃত। ঋণের দ্বিতীয় কারণঃ—পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব। য়ুরোপীয়-শাসিত দেশে এইরূপ দুর্ভিক্ষ অতীব বিরল; ইহা হইতেই বুঝা যায়, ভারতের সভ্যতা কতটা অধ্রুব ও অনিশ্চিত।

ভারতের অধিকাংশ ঋণের টাকা উৎপাদক কাজে খাটান হইয়া থাকে। দেশের ধনবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ভারত-সরকার বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ভারতের বেশী মূলধন নাই, অনুন্নত সভ্যজাতিদিগের ন্যায় ভারতের মূলধন নিধির আকারে স্থাবরভাবে পড়িয়া থাকে। কাজেই ভারত-সরকারকে ইংলণ্ডীয় বাজারের শরণাপন্ন হইতে হয়। এই উদ্দেশে দুই প্রণালী অনুসৃত হয়। একপক্ষে সরকারী কোষ হইতে মূলধন বাহির করা হয়; এবং পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে যাহার মূল-পত্তন—সেই সব রেল-কোম্পানী একটা ন্যূনতম হারের সুদ নিশ্চয়ই পাইবেন বলিয়া ভারত-সরকার তাহার প্রতিভূ থাকেন। সুপরিচালিত আয়ব্যয়ের গুণে, ভারত কতক-গুলা সুবিধামত ধার পাইয়াছিল এবং অনেক বার তাহা লভ্যজনক কাজে খাটাইয়াছিল। ভারত এখন শতকরা ২½ হইতে ৪ পর্য্যন্ত হারে সুদ দিয়া থাকে, তাহার বেশী নহে। খাল ও রেল হইতে ভারতরাষ্ট্রের প্রভূত আয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু পূর্ত্তকর্ম্মের দ্বারা কৃষি, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তৎপ্রতিও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

*
* *

ভারত যে ইংলণ্ডের নিকট লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করিয়াছে, তাহাতে ভারতের বিশেষ অবস্থাটা বেশ বুঝা যায়। যে জাপান য়ুরোপীয় প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে সভ্য করিয়াছে,—ভারতের অবস্থা সেই জাপানের মত নহে; ভারতকে য়ুরোপ বলপূর্ব্বক সভ্য করিয়াছে। ইংরাজকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ভারতের ঋণ-ধন ইংলণ্ডে ব্যয়িত হয়, এবং উহা এরূপ কাজে নিয়োজিত হয় যে-কাজ কেবল ইংলণ্ডকর্ত্তৃকই স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রথমোক্ত কারণে এই সকল বড় বড় কাজে কখন-কখন ভারত অপেক্ষা

ইংলণ্ডেরই উপকার হয়, অথবা ঐ সকল কাজের মতলবগুলা ভারত অপেক্ষা ইংলণ্ডেরই বেশী মনোমত ও অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়োক্ত কারণে, অনেক সময় দেশের সাধারণ উন্নতি হইবার পূর্ব্বেই এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার দরুন কয়েক বৎসর ধরিয়া উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। জাপানীরা রেল-পথ নির্ম্মাণ করিয়াছে, কেন না, তাহারা উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝে, এবং তাহার দ্বারা লাভও করিয়াছে। ভারত রেল পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই, ইংরাজ ভারতকে রেলপথ দিয়াছে; সেইজন্য উহা হইতে যতটা লাভ আদায় করা উচিত ভারত তাহা করে নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা, এই অনুযোগ করিয়া থাকে যে, রেলপথ ভারতবাসীদিগের উপর বিপুল ঋণভার চাপাইয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে, কি আর্থিক হিসাবে, কি রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে, ভারতের এই ঋণ ভারতকে ইংলণ্ডের করদ করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপ পরাধীনতা কতটা দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে পারে একটা তথ্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। সে তথ্যটি রৌপ্য-মূল্যের অবনতি প্রযুক্ত বিনিময়ের অধঃপতন। রৌপ্য-আদর্শ-মুদ্রাই ভারতের আদর্শ-মুদ্রা এবং যে ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রাই আদর্শ মুদ্রা সেই ইংলণ্ডকে ভারতের দিতে হয় প্রতি বৎসর ১৫ হইতে ২০ কোটি পৌণ্ড। তাই, যে স্থলে এক টাকার বিনিময়ে দুই শিলিং পাওয়া যাইত, সেই স্থলে প্রায় এক শিলিং পাওয়া যায়, কাজেই ভারতের ব্যয়ভার দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বিপরীতে, টাকার ঘাট্‌তি ভারতের রফ্‌তানী বৃদ্ধির পক্ষে কতকটা সহায়তা করিয়াছে।

ভারত সরকার বিবেচনা করিলেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, পুনর্ব্বার ভারতীয় মুদ্রার চলাচল (circulation) প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আনা। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, টাকশালে অগাধ রৌপ্যমুদ্রার মুদ্রণ বন্ধ করা হইল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকার স্বর্ণমুদ্রার আদর্শ গ্রহণ করিলেন। ইংরাজি পৌণ্ডের মূল্য ১৫ টাকা স্থির নির্দ্দিষ্ট হইল। তথাপি ভারতের মুদ্রাপ্রণালী, ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের মুদ্রাপ্রণালীকেই বেশী স্মরণ করাইয়া দেয়। কেননা, ভারতে রূপার টাকাই মুদ্রাসংক্রান্ত পূর্ণমাত্রিক এককত্বের আদর্শ।

বজেট্‌

ভারতীয় বজেট্‌ হইতে নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির কবিবার উদ্দেশে, প্রথমে বজেটের স্থূল রেখাগুলির নির্দ্দেশ করিব।

প্রথম, আয়ের হিসাব। তিনটি বিষয় বিশেষ করিয়া দেখান আবশ্যক। ফলত অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন পল্লীগ্রামে বাস করে। ইহা আর একটা প্রমাণ যে, এ পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপর আধুনিক সভ্যতা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা অতীব ক্ষীণ।

ভারতীয় রাষ্ট্র, এসিয়িক রাষ্ট্রসুলভ পিতৃশাসনের প্রকৃতিটাই বজায় রাখিয়াছে। সমস্ত ভূমিতেই রাষ্ট্রের সত্বাধিকার; এবং ভূমির খাজনা ও রাজস্ব এক সামিল হইয়া গিয়াছে। আয়ের একটা বৃহৎ অংশ, ভূসম্পত্তি অথবা

একচেটিয়া দ্রব্য হইতে উৎপন্নঃ—বন জঙ্গল, আফিম ইত্যাদি; ইহার সহিত আর একটা যোগ করিতে হইবে—সামন্ত রাজ্যাদি হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক কর। কিন্তু রুষিয়ার ন্যায় ভারতেও, আধুনিক রাষ্ট্রের আদর্শ-কল্পনা, ও এসিয়িক রাষ্ট্রের আদর্শ-কল্পনা—এই দুইকে একত্র মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, অধিকাংশ খাল এবং রেলপথের লাইনগুলা—এ সমস্ত রাষ্ট্রের নিজস্ব।

যে সকল রাজকর য়ুরোপীয় বজেটের মূলভিত্তি সেই সব রাজকর ভারতে প্রতিষ্ঠিত করা বড়ই কষ্টকর। অপ্রত্যক্ষ করের মধ্যে যে করটি আর সমস্ত য়ুরোপীয় দেশ হইতে দূরীকৃত হইয়াছে,—ভারতে সেই লবণ-কর হইতে প্রভূত আয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারত এখনো এরূপ দরিদ্র যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সেই একমাত্র খাদ্যের উপরেই কর স্থাপন করিতে হইয়াছে। অন্যান্য খাদ্যের উপর যদিও নগর-শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু সরকারের কোষাগার পূর্ণ করিবার জন্য কেবল সুরা দ্রব্যাদির উপর কর স্থাপিত হইয়াছে। যদিও উক্ত করের হার একপ্রকার নিষেধক বলিলেও হয় তথাপি ঐ করোৎপন্ন বার্ষিক আয়ের অঙ্ক দেখিলে বুঝা যায় কতটা সুরাসেবনের বৃদ্ধি হইয়াছে। অনুন্নত জাতিরা, উন্নত সভ্যতার ভাল ফল গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই মন্দ ফলগুলা গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ করগুলাও সহজে স্থাপিত হয় না। ঐ করের আকারটা ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়:—যথা, দানসাহায্য, পেটেণ্ট, লাইসেন্স, পরিশেষে আয়ের উপর কর। এই আয়করের ভাগবাটোয়ারা হইতে ভারত সমাজের অনুন্নত আদিম অবস্থা আমরা অবগত হই। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে, কেবল ৪৮২,০০০ জনের ৫০০ টাকার এবং ৭০ হাজার লোকের দু হাজার টাকার অধিক আয়। সমস্ত আয়ের অঙ্ক ৫০০৫০০০০০ পৌণ্ড। তথাপি যাহাদের উপর আয়কর ধরা হয়, ১৮৮৬ হইতে তাহাদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা একটা উত্তম সূচনা বলিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত মোটের উপর বেতন ও পেন্‌শান—শতকরা ২৯½। কেবল বণিক কোম্পানীদিগের বিবিধ আয়—শতকরা ১২। চতুর্থ তালিকার মধ্যে (ব্যক্তি বিশেষের আয়) উৎপন্ন আয়ের তৃতীয়াংশ বেঙ্কওয়ালা ও কুসীদব্যবসায়ীরা যোগাইয়া থাকে। অতএব মোটের উপর ধরিতে গেলে, আদায়ী টাকার বজেট—এসিয়া ও য়ুরোপীয় এই দুই সভ্যতার প্রভাবই প্রাপ্ত হইয়াছে।

*
* *

ইহার বিপরীতে খরচের বজেট্‌টা সমস্তই য়ুরোপীয় ধরণের।

বনের চাষ, আফিম প্রস্তুত করা, খাল কাটা ও খাল রক্ষা করা—এই সকলের খরচ ছাড়া আর কোনো বিষয়ের খরচে এসিয়িক রাজ্যসুলভ অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

কিন্তু বজেটের এই একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যে, ১৪ হইতে ১৬ লক্ষ পৌণ্ড

প্রতিবৎসরে ইংলণ্ডে ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হয়। উহার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী, ঋণের সুদ পরিশোধার্থ নিয়োজিত হইয়া থাকে। যে সকল রাষ্ট্র বাহির হইতে ধার করে তাহাদের যে অবস্থা, এই বিষয়ে ভারতেরও সেই অবস্থা। যে সকল উৎপন্ন দ্রব্য ভারত-সরকার ভারতে সংগ্রহ করিতে পারে না, সেই সকল দ্রব্য খরিদের জন্য একটা আনুমানিক অঙ্ক লিখিয়া রাখা হয়।

যে সময়ে রেলপথ নির্ম্মাণ ও পরিচালনের সমস্ত উপকরণ ইংলণ্ডে খরিদ করিতে হইত, সেই সময় এই ভারতের খরচ আরো অনেক বেশী পড়িত। অতএব এই খরচের লাঘবে ভারতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতি সূচিত হয়।

এছাড়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মচারীদিগকে অবসরবৃত্তি দিতে হয়, ভারতীয় ইংরাজ সৈন্যদের বেতনের খরচ দিতে হয়। অতএব এই বজেট হইতে আমরা জানিতে পারি, ইংলণ্ড ভারতের কি কি উপকার করিতেছে এবং আরো জানিতে পারি, ভারতের অধীনতা হইতে ইংলণ্ডের কি সুবিধা হইয়াছে, ইংলণ্ড কিরূপ লাভবান্ হইয়াছে। ভারতের অধীনতার এই একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ইংলণ্ডের ভারতীয় মন্ত্রণা-সভার খর্চ্চা ভারতকে দিতে হয়।

সরকারী পূর্ত্তকর্ম্ম

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী পূর্ত্তকর্ম্মও বিস্তার লাভ করে। য়ুরোপীয় দেশে, শত শত বৎসর ধরিয়া এই সকল পূর্ত্তকর্ম্মের উন্নতি ক্রমশঃ সংসাধিত হয়, এবং সরকারের সহিত ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টাও চলিতে থাকে, অথবা সরকারী চেষ্টার পূর্ব্বেও ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টা আরম্ভ হয়। ভারতে, সকল বণিক্-সমাজের ন্যায় কোম্পানী উপস্থিত স্বার্থ লইয়া এরূপ ব্যাপৃত ছিল যে বহুসময়সাপেক্ষ ও বহুঅর্থসাপেক্ষ এই সকল বৃহৎ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহে, ভারতের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা হঠাৎ ইংরাজের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইংরাজ দেখিতে পাইল, অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতা-জনিত ধ্বংসকার্য্যের প্রতিবিধান করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই, য়ুরোপীয় সভ্যতায় ভৌতিক সুবিধা ও উপকারের কিছুই বিস্তার হয় নাই। ভারত-সরকার বুঝিলেন, যে-দেশে ব্যক্তি বিশেষের নূতন কোন অনুষ্ঠানের চেষ্টা অজ্ঞাত, সেদেশে সে কাজ সরকারকেই করিতে হইবে, শীঘ্র করিতে হইবে, এবং সকল বিভাগেই করিতে হইবে।

*
* *

প্রথমে ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ লক্ষ পত্র; ১৯০০ অব্দে প্রায় ৪ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পত্র ও পোষ্টকার্ড। ১৮৫৭ অব্দে ৮৩ হাজার টেলিগ্রাফ-লাইন; ১৯০০ অব্দে ৫৩,০০০ লাইন, ১৭১,০০০ তার।

তাহার পর বন্দর, রাস্তা, রেলপথ।

লর্ড ডেলহৌসি ভবিষ্যতে কিরূপ রেল-পথের জালবিস্তার করিতে হইবে তাহার একটা নক্‌সা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে মাদ্রাজ ও কলিকাতার সহিত, পরে লাহোর ও পেশোয়ারের সহিত বোম্বাইকে যুক্ত করা। এই মুখ্য পথগুলি তৈয়ার হইলে পর, উহা হইতে ছোট ছোট পথ প্রতিবৎসর বাহির করা হইতে লাগিল। উহার মধ্যে অধিকাংশই বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের সুবিধার জন্য গঠিত। কতকগুলি কেবল সামরিক কার্য্যকৌশলের মৎলবে গঠিত। যথা :— পেশোয়ারের প্রান্তসীমা অনুসরণ করিয়া একটা পথ মুল্‌তান ও করাচিতে গিয়াছে এবং তাহারই একটা শাখা বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া চমন্ পর্য্যন্ত গিয়াছে, কান্দাহারের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। একটা রেলপথ রেঙ্গুন হইতে ভামো পর্যান্ত—সমস্ত ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এখনো বড় বড় দুইটি পথ মাত্র খুলিতে বাকী আছে :— একটা মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত, আর একটা ব্রহ্মপুত্র নদী অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মদেশীয় রেলজালের সহিত মিশিবে। তার পর এমন সময় আসিবে যখন ভারতীয় রেলপথ পারস্যে, আফ্‌গনিস্থানে, তিব্বতে, চীনে ও শ্যামে প্রবেশ করিবে। ১৫০০ বৎসরের অবনতির পর আবার ভারত সমস্ত এসিয়াকে সভ্য করিয়া তুলিবে।

*
* *

ভারতের সমস্ত অঞ্চলে গতিবিধির সুবিধার জন্য কতকগুলি পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান

হইল—সেই সঙ্গে দেশ যাহাতে স্বাস্থ্যকর ও উর্ব্বর হয় তাহারও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইল। যথা :—নদীতে বাঁধ দেওয়া, জলাভূমির জল শোষণ করা এবং খাল কাটা।

কেবল নদীর বদ্বীপগুলিই সম্যকরূপে জলসিক্ত। অন্য সব অঞ্চলের ফসল বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু বর্ষার জল অনিশ্চিত। এখন দেখা যায়, দশ-অংশের নয়-অংশ লোকের কৃষিই জীবিকা; খারাপ ফসল হইলে,শত সহস্র লোকের দৈন্য-দুর্দ্দশা— অথবা দুর্ভিক্ষ। তাছাড়া কৃষিজাত-দ্রব্যের রফ্‌তানীর জন্য ভারত একটা মহাবিপণী। ইহা হইতেই খালের আবশ্যকতা।

সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীর অববাহিকা-ভূমিতেও অনেকগুলি খাল কাটা হইয়াছে। এই খাল হইতে প্রভূত আয় হয়। এইরূপ জলসিক্ত প্রদেশগুলিতে আর দুর্ভিক্ষ হয় না। সুবৎসরে ঐ জমিতে অনেকগুলি ফসল হয়।

আরও নূতন নূতন খাল কাটা আবশ্যক। এই সকল খাল কাটা হইলে, পঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ বাঙ্গালারই মত সমৃদ্ধ হইবে; রাজপুতনা ও দাক্ষিণাত্যের অনুর্ব্বর প্রদেশগুলিও দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা পাইবে। ভারতীয় কোম্পানীরা, মূলধন খাটাইয়া যাহাতে লাভ করিতে পারে এইরূপ বড় বড় কাজে তাহাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু ভারতবাসীদিগের সেরূপ নূতন কিছু করিবার উদ্যম চেষ্টা নাই— সেরূপ কার্য্যবুদ্ধি নাই। সুতরাং সমস্ত

গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট করিতেছেন না বলিয়া গভর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করা অন্যায়। অত বড় বড় কাজের ভার একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও রুসিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখ-দৈন্যগ্রস্ত, অজ্ঞ, দুর্ব্বল-প্রকৃতি, ধর্ম্মোন্মত্ত ভারতীয় প্রজাদের সহিত কি যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের তুলনা হয়? তাছাড়া রুস্-গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মানুষ্ঠান ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে।

এক্ষণে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের ইতিহাসের আবার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া উপসংহার করা যাক। তিনটা বড় বড় বড় কালবিভাগ। প্রথম কালবিভাগ :—এক বণিক-কোম্পানী ভারতে কুঠী স্থাপন করে; কালক্রমে সেই কুঠীর এলাকাগুলি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য রাজ্যে পরিণত হয় এবং সেই বণিক-সমাজ একটা রাষ্ট্র-শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। দেশের সাধারণ অরাজকতা ঐ কোম্পানীকে দিগ্বিজয়ের দ্বারা রাজ্য বিস্তার করিতে বাধ্য করে। অবশেষে কোম্পানী সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি হইয়া দাঁড়ায়। এই কৃতিত্বে রাজধানী-ইংলণ্ডের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় ইংলণ্ড স্বয়ং রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত ভারত জয় করিলেন।

দ্বিতীয় কালবিভাগ :—ভারতবিজয়ে দুই সভ্যতার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। স্বকীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস, ও লৌকিক প্রথাদির উপর হস্তক্ষেপ হইবার ভয়ে হিন্দু মুসলমান উভয়ই বিদেশী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের কোন একটা বাঁধাবাঁধি মৎলব ছিল না, এমন কি, বিশেষ কোন লক্ষ্যও ছিল না। কতকগুলা হতাশ "মরিয়া" লোকদের যেরূপ কাজ, তাদেরও কাজের ভাব সেইরূপ ছিল। ঐ বিদ্রোহের দমনে য়ুরোপীয় সভ্যতার জয় ধ্রুবভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

তৃতীয় কালবিভাগ :—কোম্পানীর জায়গায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদিন যে কাজ অজ্ঞাতসারে হইতেছিল, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এখন হইতে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে করিতে লাগিলেন। একটা শাসন-কর্ত্তৃত্ব-শক্তি, একটা ব্যবস্থা-কর্ত্তৃত্ব-শক্তি, একটা প্রবল অথচ রূঢ়তাবর্জ্জিত রাজকার্য্য-পরিচালনপদ্ধতি সৃষ্ট হইল। আইনের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা উত্তরোত্তর রীতিনীতির উন্নতি, এবং বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্মের দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইল; এবং এই পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রাজকোষের সংস্কার ও জন-সাধারণের মধ্যে সরকারী ঋণ-ধনের চলাচল (circulation) সম্ভবপর হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাণিরাজ্যে মনুষ্যের স্থান

প্রাণিজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মানবজাতিকেই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ দেখা যায়। প্রাণী যে পথে চলিয়া আধুনিক মানুষরূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, সে পথটি ত্যাগ করিলে প্রাণিরাজ্যের সিংহাসনে কোন্ জাতি বসিত তাহা অনুমান করা কঠিন। যাহা হউক, অভিব্যক্তির যে ধারা অবলম্বন করিয়া মানুষ প্রাণিশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তাহা আবিষ্কার করা আধুনিক প্রাণিবিদ্‌গণের একটি প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই ধরাতলে প্রাণের লীলা চলিতেছে; এই সুদীর্ঘ কালে যে কত প্রাণী নব নব মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব হয় না। গভীর মৃত্তিকান্তরে, সমুদ্রতলে এবং শিলাভ্যন্তরে এই শ্রেণীর অনেক লুপ্ত প্রাণীর দেহাবশেষ দেখা যায়; কিন্তু ইহাতে অভিব্যক্তির ধারা ঠিক বুঝা যায় না। নিজেদের অস্তিত্বের একটুও চিহ্ন না রাখিয়া যে সকল প্রাণী লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাহাদের আকৃতিপ্রকৃতি জানা না থাকিলে অভিব্যক্তির ধারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যে সকল বৈজ্ঞানিক নিকৃষ্টতম প্রাণী হইতে মানুষের অভিব্যক্তির সন্ধান করেন, তাঁহারা সকল লুপ্ত প্রাণীর পরিচয় একত্র না পাইয়া অনুসন্ধানের খেই হারাইয়া ফেলেন, কাজেই তাঁহাদের চেষ্টা সাহায্য গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্তির ধারা রক্ষা করিতে হয়।

কাল এবং স্থান উভয়ই অনাদি এবং অনন্ত। বর্ত্তমান সময়ে যে মানবজাতি কাল ও স্থানের উপরে আধিপত্য করিতেছে, তাহাও আদি-অন্তহীন; চিন্তা করিলে এই কথাটাই যেন মনে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ ইহারি ঠিক উল্টা কথা বলেন। তাঁহাদের মতে অনাদি ও অনন্তকাল ধরিয়া যে সৃষ্টি চলিতেছে, আমাদের পৃথিবী সেই সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার বয়স অধিক নয়। তারপরে, জন্মগ্রহণ করিয়াই পৃথিবী জীবের বাসোপযোগী হয় নাই; লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া নিজের দেহের উত্তাপ ত্যাগ করিয়া শীতল হইলে ভূতল জীবদিগকে আশ্রয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে জীব, সৃষ্টি-পর্য্যায়ের নিম্নতম স্থানে রহিয়াছে। তার পরে যেদিন ধরাতলে প্রাথমিক জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, মানুষ তাহার পূর্ণ মূর্ত্তি লইয়া সেদিনই জন্মগ্রহণ করে নাই; জড়প্রায় প্রাথমিক জীবই ক্রমোন্নত হইয়া অতি-আধুনিক কালে মানুষের সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, মানুষই জীব-পর্য্যায়ের সর্ব্বনিম্ন ধাপে অবস্থিত।

প্রোটোজোয়া (Protozoa) নামক যে জলচর প্রাণী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যে প্রাণিমাত্রেরই পিতামহ, এ-সম্বন্ধে

প্রোটোজোয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই, বিশেষ পাকযন্ত্র বা শ্বাসযন্ত্রও নাই। সেগুলি প্রায় জড়বৎ জলে ভাসিয়া বেড়ায়। এই অস্থি-মজ্জাহীন প্রাথমিক প্রাণীর বংশধরদিগের মধ্যে কতকগুলি কি-প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া ক্রমোন্নত হইয়াছিল, তাহা ঠিক্ বলা যায় না। কিন্তু প্রোটোজোয়ার বংশধরগণই যে, এখন অতিকায় হস্তী বা বুদ্ধিমান মানবের আকারে ভূতলে বিচরণ করিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া ভেকশাবক "ব্যাঙাচি"র আকার গ্রহণ করিয়া কিছুদিন জলে বিচরণ করে। "ব্যাঙাচি"র আকৃতি-প্রকৃতি দেখিলে সেই প্রাণীই যে পরে স্থলচর হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কল্পনা করা যায় না। "ব্যাঙাচি"র ফুস্‌ফুস্ থাকে না; কঠিন খাদ্য গিলিয়া খাইবার ব্যবস্থাও তাহাদের দেহে দেখা যায় না। জলে সাঁতার কাটিবার জন্য বড় বড় লেজ থাকে, জল হইতে বায়ুশোষণ করিয়া জীবনধারণ করিবার জন্য মৎস্যের ন্যায় "কান্‌কা" (Gill) থাকে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লেজ খসিয়া গিয়া চারিখানি পা গজাইয়া উঠে এবং "কান্‌কা"র স্থানে ফুস্‌ফুস্ জন্মিতে থাকে। তারপরে "বেঙাচি" যখন জল ছাড়িয়া স্থলে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহারা যে কোনো কালে মৎস্যের ন্যায় জলচর প্রাণী ছিল তাহা বুঝাই যায় না। ভেকগণ শৈশব-জীবনে এই প্রকারে পূর্ব্ব জীবনের কতকটা পরিচয় প্রদান করে; ইহা হইতে ভেকের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ যে

করা কঠিন হয় না। প্রোটোজোয়ার রূপ ত্যাগ করিয়া ভেকজাতি যে পথে উন্নতির সোপানে উঠিয়াছে, মানুষ সে পথ ধরিয়া উন্নত হয় নাই; এজন্য মানব-শিশুর দেহে তাহার প্রাচীন জলচরত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু মানবদেহ হইতে তাহার প্রাচীন অবস্থার চিহ্ন একেবারে লোপ পায় নাই। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ কি-প্রকারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় আধুনিক শরীরবিদ্‌গণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। যে সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া প্রাণিগণ তাহাদের বর্ত্তমান আকৃতি-প্রকৃতি পাইয়াছে, প্রত্যেক ভ্রূণের পূর্ণতাপ্রাপ্তির সময়ে সেই সকল পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায়। মানব-ভ্রূণ যখন হস্তপদাদিযুক্ত মানবের আকৃতি গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে পুষ্ট হইতে থাকে, তখন তাহাতেও একে একে পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস প্রকাশ পাইতে থাকে। মানুষের অতি বৃদ্ধ পিতামহ যে সত্যই এককালে জলচর প্রাণীর আকারে সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইত ভ্রূণ-পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়িয়াছে। মানব-ভ্রূণে প্রথমেই ফুস্-ফুস্ জন্মে না, মৎস্যাদি জলচরেরা যে "কান্‌কা" দিয়া জল হইতে বায়ু গ্রহণ করে, ভ্রূণে প্রথমে তাহাই জন্মে। পরে ঐ "কানকা" রূপান্তর গ্রহণ করিয়া ফুস্‌ফুসে পরিণত হয়। সুতরাং মানুষ তাহার বর্ত্তমান আকৃতি পাইবার অনেক পূর্ব্বে যে মৎস্যাদির ন্যায় খাঁটি জলচর প্রাণী ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন হয় না।

যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the

জড়প্রায় প্রোটোজোয়ার জন্মের কতদিন পরে তাহার বংশধরগণ পরস্পরের সহিত মারামারি হানাহানি করিয়া নিজেদের যোগ্যতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না; সম্ভবত বহু লক্ষ বৎসর পরে যখন অস্থিমজ্জাহীন প্রোটোজোয়ায় সন্তানদিগের দেহে অস্থিময় মেরুদণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখনই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংগ্রামের সূত্রপাত হইয়াছিল। তখন কেহ নিজের দেহ কঠিন চর্ম্মে আবৃত করিয়া শত্রু-জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিচরণ করিত, কেহ দেহটিকে তীক্ষ্ণ কাঁটায় আচ্ছাদিত রাখিয়া দুর্ব্বল প্রতিবেশীদের উপরে অত্যাচার করিত। এই প্রকার সংগ্রামে যাহারা জয়লাভ করিত, তাহাদেরই বংশ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া ক্রমোন্নতির ধাপে উঠিত, এবং পরাজিত দুর্ব্বল প্রাণীর অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া যাইত।

জলে যখন এই প্রকার সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন বৃশ্চিক-জাতীয় এক শ্রেণীর প্রাণী তাহাদের তীক্ষ্ণধার হুল লইয়া স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারাই আধুনিক স্থলচর বৃশ্চিকের আদিপুরুষ। ইহা ছাড়া, আর একদল জলচর জীব সম্ভবত এই সময়েই স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক পতঙ্গজাতীয় প্রাণীগণ এই স্থলচরদিগেরই বংশধর।

প্রাণি-জগতের এই পরিবর্ত্তনের পরে বহুদিন আর উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া মনে হয়। জলচরগণ জলের মধ্যে থাকিয়াই ক্রমাগত তাহাদের দেহের উন্নতি সাধন করিতেছিল এবং পতঙ্গগণ স্থলে বিচরণ করিয়া ক্রমে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকসিত করিতেছিল। এই চেষ্টায় কাঁকড়া এবং কুম্ভীরাদির ন্যায় কঠিন দেহবিশিষ্ট অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পতঙ্গগণও তখনকার প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

প্রাণীর ইতিহাসের এই যুগের পরবর্ত্তী কালকে উভচরের যুগ বলা যাইতে পারে। সমুদ্রের গভীর প্রদেশ সেই সময়ে তিমি মাছের ন্যায় বৃহৎ জলচর প্রাণী দ্বারা পূর্ণ ছিল। যে সকল স্থানে জল অগভীর ছিল, সেখানে ভীমকায় উভচর প্রাণিগণ বাস করিত। ইহারাই কিছুকাল জলে এবং স্থলে ইচ্ছামুরূপ বাস করিয়া শেষে একবারে স্থলচর প্রাণী হইয়া পড়িয়াছিল। স্থলের প্রাধান্য লইয়া বোধ হয় এই সময়েই প্রাণীর সহিত প্রাণীর এবং ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার প্রথম বিবাদ আরম্ভ; তখন হইতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে শোণিতপাত আরম্ভ হইয়াছে, তাহার আজও নিবৃত্তি হয় নাই। যাহা হউক, সেই অতি প্রাচীন যুগে স্থলভাগে বৃক্ষ-লতাদির অভাব ছিল না,—বড় বড় বনস্পতি এবং নানাজাতীয় তৃণগুল্ম পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত। জল হইতে উঠিয়া যে সকল প্রাণী স্থলচর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের খাদ্যের অভাব হয় নাই; ইহারা বেশ স্বচ্ছন্দেই ভূতলে বিচরণ করিত। কিন্তু এই সুখের জীবন দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই,—তাহাদের নিজেদেরি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কয়েক শ্রেণী মাংসাহারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কাজেই

উদ্ভিজ্জাহারী প্রাণীদিগকে সর্ব্বদাই মাংসাহারীদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইত এবং সময় সময় উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইত। টিকটিকি প্রভৃতি সরীসৃপের আকারবিশিষ্ট ডাইনোসর্ (Dinosaur) জাতীয় প্রাণীই তখন স্থলভাগে আধিপত্য করিত। ইহাদের যে সকল কঙ্কাল মৃত্তিকার গভীর স্তর হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় সেগুলির কোনোটি ৫০ হাত, কোনোটি ৬০ হাত লম্বা ছিল এবং উচ্চতায় কেহই ২০ হাতের কম ছিল না। এই বিশাল দেহ লইয়া যখন ডাইনোসর্-জাতীয় প্রাণীরা উদ্ভিজ্জভোজী ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদের আক্রমণ করিত,—তখন ডাইনোসর্গণই জয়ী হইত। এই প্রকারে এককালে পৃথিবীর এই বিশাল ভূভাগ ডাইনোসর্দিগেরই করতলগত হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাইনোসর্ এত পরাক্রমশালী হইয়া দাঁড়াইলেও উন্নত প্রাণীর পর্য্যায়ে তাহারা স্থান পায় নাই। মুখের কাছে প্রচুর খাদ্য পাইয়া তাহারা নিজেদের দেহগুলিরই উন্নতি করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটুও উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। বিপুল দেহের অনুপাতে তাহাদের মস্তিষ্কগুলি যদি বৃদ্ধি পাইয়া যাইত, তাহা হইলে হয়ত তাহারাই দীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীতে আধিপত্য করিত এবং ইহার ফলে মানুষের জন্মই হইত না। জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা আছে কি না জানি না, কিন্তু দেহের বিস্তারের যে একটী সীমা আছে ডাইনোসর্ জাতীয় প্রাণিগণ তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণী; কিন্তু ইহাদের দৈহিক উন্নতি চরমসীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনো যদি ইহাদের শরীর স্থূলতর হইতে চায়, তবে চারিখানি পায়ে ইহারা আর দেহের ভার বহন করিতে পারিবে না। কাজেই প্রকৃতির নির্দ্দেশে হস্তীর দৈহিক উন্নতি রোধ পাইয়া গিয়াছে। ডাইনোসর্দিগের অবস্থা হস্তীদিগের মতই হইয়াছিল, চারিখানি পায়ের উপরে যতটা ভার রাখা সম্ভব, তাহাদের দেহ ঠিক ততটা ভারবিশিষ্ট হইয়াছিল এবং তারপরে তাহাদের দৈহিক ও মানসিক উভয় উন্নতিই বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। যে জাতির উন্নতি অবরোধ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করে। ডাইনোসরের অবস্থাও অবিকল তাহাই হইয়াছিল, তাহাদের দেহের বিশালতা এবং বিপুল দৈহিক বল অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান প্রাণীদিগের নিকটে পরাভূত হইয়াছিল; কাজেই ইহারা একে একে পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

প্রকৃতির ন্যায় নিরপেক্ষ দাতা দুর্লভ। তাঁহার বিশাল শক্তি-ভাণ্ডারের দ্বার চিরদিনই উন্মুক্ত থাকে, যে জাতি এই ভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারে, কেবল সেই জাতি উন্নতির পথে নিরাপদে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়া যায়। ডাইনোসর কেবল দৈহিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন ইহাদেরি যে দুই ক্ষুদ্রকায় জাতি পৃথক পৃথক [illegible]

ছিল, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রাণিরাজ্যে আধিপত্য করিবে, ইহাই বিচার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই দুই শ্রেণীর একদলকে আধুনিক পক্ষিজাতির পূর্ব্বপুরুষ বলা যাইতে পারে। টিকটিকি গিরগিটির আকারবিশিষ্ট দেহে ইহাদের এক এক জোড়া ডানা গজাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ডানায় পালক ছিল না, তাহা বাদুড়ের ডানার ন্যায় চর্ম্মাচ্ছাদিত থাকিত। জলস্থলে ও আকাশে ইহারা অনায়াসে বিচরণ করিতে পারিত; কোনো শত্রুই ইহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিত না। এই প্রাণীই এককালে প্রাণিজগতের রাজপদে বসিবে বলিয়া আশা হইয়াছিল। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই; —ক্ষুদ্রকায় হইলেও ইহারা ডাইনোসরদিগেরই বংশধর। পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভুল করিয়া অধঃপাতে গিয়াছিল, ইহারাও সেই প্রকার ভুল করিতে লাগিল। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির দিকে ইহারা মন দিল না, কি প্রকারে গায়ের চর্ম্মে পালক গজাইবে এবং সহজে উড়িয়া বেড়াইবে ইহাই তাহাদের সাধনার বিষয় হইল। সাধনায় সিদ্ধি হইল,—বিচিত্র বর্ণের পালকে দেহ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল, কিন্তু বুদ্ধি একটুকুও উন্নত হইল না; পূর্ব্বপুরুষদের মস্তিষ্কটি যেমন ক্ষুদ্র ছিল, ইহাদেরও মস্তিষ্ক ঠিক সেই প্রকার ক্ষুদ্রই রহিয়া গেল। কাজেই প্রাণিরাজ্যের সিংহাসন লাভ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ডাইনোসরের আর এক দল বংশধর খেচর হইবার আকাঙ্ক্ষা না করিয়া স্তন্যপায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর সহিত আধুনিক কোনো স্তন্যপায়ীরই তখন ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। তাহারা সরীসৃপ ও আধুনিক পশুর এক কিম্ভূতকিমাকার প্রকৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক স্তন্যপায়ী হইতেই যে, আধুনিক যুগের ব্যাঘ্র-ভল্লুক গো-মহিষ বানর-মানুষ সকলেই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত।

এই সময়ে নবজাত স্তন্যপায়ীদিগকে বিনষ্ট করার মত প্রাণী ভূতলে ছিল না। তখন সেই ভীমকায় ডাইনোসরদিগের বংশ প্রায় লোপ হইয়া ছিল। যাহারা দুইখানি সুন্দর ডানা পাইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইত তাহারা ভূমির খবর বড় রাখিত না। জলে যে-সকল অতিকায় জলচর প্রাণী ছিল, তাহারাও ক্রমে ধ্বংসের পথে চলিতেছিল। কালক্রমে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, প্রাচীন প্রাণীদিগের মধ্যে কেহই সেই সকল পরিবর্ত্তনের সহিত যোগরক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই; কাজেই ইহাদের সকলেরই ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন স্তন্যপায়ী প্রাণিগণ এই শুভ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া সম্ভবত অল্পকাল মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট বহু বংশধর ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের দেহে আধুনিক ভেক ও সরীসৃপাদির ন্যায় শীতল রক্তের ধারাই প্রবাহিত হইত; উষ্ণ-শোণিত এবং উষ্ণ

দেহ কোনো প্রাণীরই ছিল না। নবজাত স্তন্যপায়ীদের মধ্যে হঠাৎ এক জাতি উষ্ণ-শোণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণের পরেই স্বাবলম্বী হইত না। মাতার তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল পালিত হইলে পর তাহারা কার্য্যক্ষম হইত। যে সন্তান স্নেহ মানুষের হৃদয়ে স্থান পাইয়া এই দুঃখ-দৈন্যময় জীবনকে মধুময় করিয়াছে, তাহার অঙ্কুর এই সময়েই দেখা গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের চিন্তা, পরার্থপরতা এবং করুণা প্রভৃতি উচ্চ ধর্ম্মগুলি একে একে পশুহৃদয় অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল উচ্চবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিলে মস্তিষ্ক অপরিপুষ্ট থাকিতে পারে না। কাজেই নব নব ভাবের জাগরণের সহিত স্তন্যপায়ী বংশধরদিগের মস্তিষ্কও পুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রকৃতি দেবী তাঁহার অপরিমেয় শক্তির ধারায় জল স্থল আকাশ প্লাবিত করিয়া, সেই শক্তি কোন্ ক্ষেত্রে কি প্রকার ফল উৎপন্ন করে, তাহা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। স্তন্যপায়ীরা যে পথ অবলম্বন করিয়া জীবনক্ষেত্রে নামিয়া ছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই প্রাণিজাতিরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কিন্তু জীবন-সংগ্রামে সার্থকতা-লাভের জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন স্তন্যপায়ীরা তাহা সহজে লাভ করিতে পারে নাই। যে পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বের প্রাণিগণ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, ইহাদের কতকগুলি সেই পথে চলিয়া নিজেদের দৈহিক বল বৃদ্ধি করিতেই মনোনিবেশ করিয়াছিল। ইহারা আকারে খুবই বড় হইয়াছিল এবং বলও যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের দন্তনখর প্রভৃতি সহজ অস্ত্রের নিকটে অপর স্তন্যপায়ীরা পরাভব মানিত। আধুনিক তিমি মাছ পূর্ব্বে স্থলচর প্রাণী ছিল; বলশালী অপর স্তন্যপায়ীদিগের সহিত প্রতি-যোগিতায় টিঁকিতে না পারিয়া এই সময়েই তাহাদিগকে সমুদ্র-জলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তখন স্থলে নিয়তই ভয়ানক সংগ্রাম চলিত। বিচিত্র আকৃতি-সম্পন্ন সহস্র সহস্র স্তন্যপায়ী দেহে বিচিত্র অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া জন্মিত এবং পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিত। এইপ্রকার পশুবলে কোনো জাতিই পৃথিবীতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না; ইহারাও পারে নাই। আজ পৃথিবী খুঁজিয়া সেই সকল ভয়ানক জন্তু-দিগের সন্ধান পাওয়া যায় না,—প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সহিত ইহারা যোগরক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই; কাজেই বংশ-লোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। এখন ভূস্তরে লুকায়িত কঙ্কালগুলিই তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাশব শক্তির লীলায় ধরাতল রুধিরপ্লাবিত হইতেছিল, তখন সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রজ কয়েক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির অদ্ভুত বিকাশ দেখা গিয়াছিল। পিপীলিকা ও মৌমাছি এই সময়ে যে প্রকার সুশৃঙ্খলায় নিজেদের সমাজগুলিকে নিয়মিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল

ভবিষ্যতে এই প্রাণিগণই পৃথিবীর অধিপতি হইয়া দাঁড়াইবে। ইহারা ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত, সমাজের অকল্যাণকারীদের দণ্ড দিত, আলস্যপরায়ণ স্বজাতিবর্গকে সমাজচ্যুত করিত। প্রাণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার জন্য যে সকল সদ্‌বৃত্তির প্রয়োজন, তাহা ইহারা একে একে সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু সংগ্রহ করিতে পারিল না কেবল দৈহিক শক্তি এবং শারীরিক উন্নতি। কাজেই প্রাণিজগতের নেতৃত্বের আসনপ্রাপ্তি ইহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না। অপর কোন্ সৌভাগ্যবান প্রাণীর অদৃষ্টে রাজ্যলাভের সম্ভাবনা আছে, প্রকৃতি দেবী অন্তরালে বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

প্রাণীর পরে প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাতল হইতে লোপ পাইতে লাগিল। তিমি মৎস্য জলে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল; দৈহিক শক্তির ক্রমোন্নতি করিয়া প্রাচীন ক্ষুদ্র স্তন্যপায়িগণ মহাকায় গণ্ডার ও জলহস্তীর আকার গ্রহণ করিল। হস্তীরও জন্ম হইল। এই অতিকায় প্রাণী দেহের উন্নতির সহিত বুদ্ধির উন্নতিও দেখাইল। বুদ্ধির সাহায্যে ইহারা যে নিজেদের বংশকে স্থায়ী করিতে পারিবে, তাহারও লক্ষণ দেখা গেল; কিন্তু প্রাণিজগতের সিংহাসনে বসিবার সকল গুণ ইহারা পাইল না। যে প্রকৃতি দেবী জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তিনি বুঝিলেন, দন্ত নখর প্রভৃতি সহজ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কোনো প্রাণীই প্রাণিজগতে রাজত্ব করিতে পারিবে না। পশুদিগের মধ্যে যাহারা পশ্চাতের দুই পদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের দুই অঙ্গে কৃত্রিম অস্ত্রশস্ত্র বুদ্ধির সহিত চালাইতে পারিবে, জগৎ তাহারই অধিকারে আসিবে। প্রাথমিক প্রাণীর সৃষ্টিকাল হইতে বিচিত্র আকার গ্রহণ করিয়া যে সকল বিচিত্র প্রাণী ভূতলে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোনটিই বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল না, কাজেই নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার একটুও চেষ্টা তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত না। প্রাথমিক মানুষ যখন তাহার নিভৃত গুহা হইতে বাহির হইয়া স্বহস্তনির্ম্মিত শিলাময় যন্ত্রাদির সাহায্যে ভীষণ বন্যজন্তুদিগকে বধ করিতে লাগিল, তখনি প্রকৃতি দেবী বুঝিলেন, এই পরিণত-মস্তিষ্ক বুদ্ধিমান প্রাণীই জগতের রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। সৃষ্টির সমগ্র প্রাণিসঙ্ঘের মধ্যে কনিষ্ঠ হইয়াও মানুষ এই প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

আহ্বান

(জালালুদ্দীন রুমী হইতে)

১

ডঙ্কা বাজিয়াছে ঐ পশেনি কি আত্মার শ্রবণে ?
চলিয়াছে চালকেরা সুসজ্জিত উষ্ট্রশ্রেণী সনে,
কণ্ঠে কণ্ঠে বাজিতেছে কিনি কিনি কিঙ্কিনী ঘুঙুর
ভিজা'তেছে শুষ্ক জিহ্বা, ওগো কা'রা নিঙাড়ি আঙুর ?
সুরাপানে জ্ঞানহারা তরুতলে পড়েছ ঢুলিয়া,
অহিফেন-নিদ্রাগত যাত্রাপথ কে গেছ ভুলিয়া ?
জাগো সবে, জাগো সবে জ্বলে ঐ মশাল-অনল !
এখনো চেতনা-হারা,—চারিদিকে এত কোলাহল ?
মরুর ভীষণ দাহে, পিপাসায়—কণ্টকের বনে
কে কোথা লভিল মৃত্যু কৃচ্ছ্র সহ যুঝি প্রাণপণে,
মহামিলনের রাজ্যে তবু সেই অনন্ত বিভব—
পথের ক্ষণিক মোহে কে ভুলিবে মহা মহোৎসব ?

২

লোহার পিঁজরে বদ্ধ পিপাসিত ওগো বুলবুল,
প্রিয়ের গোলেস্তাঁ ভরা গন্ধ তোমা করেনি আকুল ?
কোণ হতে কোণান্তরে ঝটপটি বেড়াইবে কত,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেল কেন আছ পেচকের মত ?
নয়নে কি পড়েনিক নৃপতির উচ্চতম তাজ
তাহার উদ্দেশে যেতে এখনও তবু ভয় লাজ ?
অস্ত্রত্রান চর্ম্মসম বুক দিতে হবে অসি মুখে ;
সামান্য বাজের ভয় এখনও বাজিছে কি বুকে ?
কে কোথা করেছে ভুল, কুসুমের মধুর তৃষায়
কণ্টকে দিয়াছে প্রাণ,—তাহে তব কিবা আসে যায় ?
প্রেমোৎসবে হে অতিথি, হে অমর গগননিবাসী,
উঠ তবে পক্ষভরে যদি প্রিয়-পরশ-পিয়াসী !

শ্রীকালিদাস রায়।

ভারতের শিল্প

প্রাচীন যুগে ভারতের শিল্প-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল কি না, এবং ভারতবাসীরা তৎকালীন সভ্যজাতিকে স্বদেশোৎপন্ন শিল্প যোগাইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিত কি না ইত্যাদি গবেষণামূলক আলোচনা পুরাতত্ত্ববিৎদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতের বর্ত্তমান শিল্পের বিষয়ই আলোচনা করিব। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেও ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখনও শতকরা প্রায় সাতষট্টি জন লোক জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কৃষিকার্য্যের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে। তবে আজকাল দেশের হাওয়া বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নবযুগের সূচনায় ভারতবর্ষেও কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে গত ১৮৮৯—১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের দেশের কারখানা ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা ১০·১ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কাঁচা মালের রপ্তানিও শতকরা ২৮ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে ভারতের শিল্প ও ব্যবসা ক্রমশই উন্নতির পথে চলিয়াছে। এই শিল্পের গতি ও বাণিজ্য ইত্যাদির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় হইলেও প্রথমেই ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

কেহ কেহ ভারতবর্ষকে একটি দেশ না বলিয়া ইউরোপের ন্যায় একটি মহাদেশের সহিত তুলনা করেন। এ-সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে। তবে একথা আমরা স্বীকার করি যে, আর কোন দেশে এত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি-বৃদ্ধ ভারত শত শত ধর্ম্মের উত্থান-পতনের স্মৃতি ধারণ করিয়া আছে। নানা কারণে ইহা একটি রহস্যবিশেষ; এইজন্যই হয়ত অনেকে ইহাকে একটি মহাদেশ বলিতে চান। কিন্তু বিচিত্র ও রহস্যময় ভারতের সর্ব্বত্রই একটা সামঞ্জস্য ও বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতেই তাহার অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য!

আমরা শান্তি-প্রিয় জাতি। পল্লী-জীবনই আমাদের আদর্শ। দ্বন্দ্ববহুল নাগরিক জীবন আমাদের দেশে একান্ত বিরল না হইলেও, কোনদিনই তাহা ভারতে প্রাধান্য লাভ করে নাই। একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বিস্তৃত জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া, আপনার সহিত তাহার কোন সংযোগের প্রত্যাশামাত্র না করিয়া অতি সহজে আপনার সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আপনিই উৎপন্ন করিয়া লয়,—ইংরাজিতে বলিতে হইলে এককথায় ইহা Self-sufficient। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের পতন হইল, আক্রমণকারীর পর আক্রমণকারী ভারতকে শোণিত-সাগরে ভাসাইয়া গেল, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আপনার সমস্ত স্বাতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ

দিনগুলি কাটাইয়া চলিয়াছে! বাহিরের কোন সংবাদও তাহার কর্ণে পৌঁছায় না, বাহিরের সহিত আলাপ করিবার জন্যও সে বিন্দুমাত্র চঞ্চল নহে। কথিত আছে, পলাশী-যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কথা সুদূর পল্লীসমূহে পৌঁছাইতে সুদীর্ঘ ত্রিশটি বৎসর লাগিয়াছিল। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। একটি ক্ষুদ্রপল্লীও বৃহত্তর জগতের ক্ষুদ্র সংস্করণ বিশেষ। কুম্ভকারগণ কেবলমাত্র গ্রামবাসিগণের জন্য পরিশ্রম করে, তাহাতেই সমস্ত পল্লীর সকল অভাব দূর হয়; এইরূপ কর্ম্মকার ও স্বর্ণকার প্রভৃতি সমস্ত শিল্পীর লক্ষ্য গ্রামের অভাব দূর করা মাত্র। এই division of labour পল্লী-জীবনের ভিত্তি; ইহাই আবার বংশ-পরম্পরানুক্রমে চলিয়া সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া দেয়। পল্লীগ্রামে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে হীন চক্ষে দেখে না; সেখানে ভ্রাতৃত্বের স্নেহ-পাশে সকলেই আবদ্ধ; সেখানে শান্তিময় জীবন মূর্ত্তিমান হইয়া কুটিরে কুটিরে বিরাজ করে। এইজন্য পল্লী-শিল্পই ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তবে-যে আমাদের নাগরিক শিল্প একেবারেই নাই বা ছিল না, এ-কথা বলি না। আগ্রার তাজমহল, সাজাহানা-বাদের মতি-মসজিদ, ঢাকার মসলিন প্রভৃতি এখনও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে।

ভারতের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে "ব্যবসা-সমাজ" বলিয়া কোন সম্প্রদায় কোনদিন স্থান পায় নাই। য়ুরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, একসময়ে ঐরূপ সমাজ-গঠনের চেষ্টা য়ুরোপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেখানে মধ্যযুগে এক একটি নগরে কয়েকটি করিয়া "ব্যবসা-সমাজ" থাকিত, কোন নূতন ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহা অত্যন্ত সাংঘাতিক প্রকৃতির ছিল; এক-একটি ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় এক-একটি ব্যবসায় এক-চেটিয়া করিয়া তাহার ক্রয়-বিক্রয় আপনা-দিগের ইচ্ছাধীন করিয়া লইত। কোন ব্যবসায়েই নূতন লোকের সমাগম হইতে পারিত না; ফলে সমস্ত ব্যবসায়গুলিই কেবল-মাত্র নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগের হস্তে থাকিত। এই প্রকারের ব্যবসায়-সমিতি ভারতে কোন দিন ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ব্যবসা-নুসারে জাতিভেদ হইয়াছিল কিনা জানি না, তবে এ-কথা সত্য যে, ভারতে এক-একটি জাতি যদিও এক-একটি ব্যবসায়েরই অনুশীলন করিত, তথাপি অন্য জাতির পক্ষে তাহা গ্রহণ করিতে কোন অন্তরায় ছিল না। তন্তুবায়গণ তাঁতের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইলেও, যুগী, জোলা ও নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমানগণ অনেক স্থলে এখনও তাঁত চালাইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মকারগণ লোহার কাজ একচেটিয়া করিয়া লইয়া-ছিল বটে, কিন্তু সমাজের অন্যশ্রেণীর লোকের তাহাতে একেবারে প্রবেশ-অধিকার ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। এখনও আমরা তাঁতিকে কর্ম্মকারের ব্যবসা এবং কর্ম্মকারকে তন্তুবায়ের ব্যবসা গ্রহণ করিতে দেখি।

ভারতের তৃতীয় বিশেষত্ব, তাহার মুসলমান জন-সংখ্যা। ৩৩ কোটি লোকের মধ্যে ৭ কোটি লোক মুসলমান। হিন্দু ২০

মুসলমানের মধ্যে জাতিগত বহু প্রভেদ বিদ্যমান। হিন্দু আর্য্যবংশীয়, মুসলমানগণ হয় সেমেটিকবংশসম্ভূত, না-হয় মোঙ্গলীয়। কিন্তু এই মুসলমানগণও একাদিক্রমে আটশত বৎসর কাল ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারতের উপর তাহাদিগেরও যথেষ্ট দাবী জন্মিয়াছে; অতএব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে মুসলমানগণকে বাদ দিয়া বলা চলে না। এইজন্যই ভারতের শিল্প-প্রসঙ্গে মুসলমান-শিল্পকে সেমেটিক-শিল্প বলিয়া বাদ দেওয়া সমীচীন নহে। ভারতবর্ষ মুসলমানেরও স্বদেশরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং তখন তাহাদের শিল্পও ভারত-শিল্পের একাংশে পরিণত হইয়াছে।

তাহা হইলে ভারত-শিল্পের শ্রেণী-বিভাগ কিরূপে সম্ভব? জাতিদ্বারা ভারতের শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর নয়, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। ভারতীয় শিল্পের শ্রেণী-বিভাগ করিতে হইলে, শিল্পগুলিকে বিভক্ত করিতে হয়। যে সমস্ত শিল্প কাঁচা মালের উপর নির্ভর করে, তাহা প্রথম স্তরের শিল্প। দ্বিতীয় স্তরের শিল্প কাঁচা মাল গুলিকে একটি আকার প্রদান করে। তৃতীয় স্তরের শিল্প তাহাকে কারুকার্য্যে মণ্ডিত করে। নিম্নে শিল্প-স্তর-গুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল:—

প্রথম স্তর। ক্ষেত্রজাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন গ্রাম্য শিল্প।

দ্বিতীয় স্তর। কারখানা সমূহে প্রস্তুত দ্রব্যাদি।

তৃতীয় স্তর। খনিজ পদার্থ।

চতুর্থ স্তর। বন-জাত পদার্থ।

ভারতের প্রত্যেক গ্রামের চারিধারে ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে ফসল জন্মে। গ্রাম্য শিল্পিগণ এই সমস্ত ফসল কাঁচা মালের আকারে গ্রহণ করিয়া, তাহা ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত করে। এই প্রকার শিল্পে বড় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খনিজ পদার্থ লইয়া যে শিল্প গঠিত, তাহাতে বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। গ্রাম্য শিল্প গ্রামে চলে, নাগরিক শিল্পের কেন্দ্র নগর, সেইরূপ অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার ব্যতীত তৃতীয় স্তরের শিল্প বৃদ্ধি পায় না। ভারতের এক-একটি প্রদেশ এইরূপ এক এক জাতীয় শিল্পে অলঙ্কৃত। এমন দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে সমস্ত স্তরের সমস্ত শিল্প সমভাবে বর্ত্তমান। আবার প্রয়োজনীয়তার ন্যায় নিয়ামকও আর কিছু নাই। যে শিল্প যে প্রদেশের উপযোগী, সেই প্রদেশেই সাধারণত সেই শিল্প বৃদ্ধি পায়। কোন্ শিল্প কোন্ প্রদেশের উপযোগী, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব:—

বাঙ্গালা ও আসাম—প্রথমে বাঙ্গালার কথাই ধরা যাউক। রবার (Indian Rubber), নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থের বীচি, লঙ্কা, নীল, পাট, কয়লা, কাগজ, গরুর চামড়া (Hide), ছাগল ইত্যাদির চামড়া (Skin), আফিম, চা, তামাক, চিনি, লৌহ, পারদ এবং নানাপ্রকার মাটীর খেলনা বাঙ্গালা দেশে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তর ভারতবর্ষ—উত্তর ভারতবর্ষ বলিতে, আমরা আগ্রা, অযোধ্যা, যুক্তপ্রদেশ,

পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশকে বুঝিব। রেসিন, লঙ্কা, নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থের বীচি, তামা, শীষা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, বাতি, সাবান, তুলা, রেশম, পশম, চামড়া, কারপেট, মাদুর, গম, আটা, বিস্কুট, নানা প্রকার মদ, চা, চিনি ও লবণ ইত্যাদি দ্রব্য তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কাঁচা মাল ব্যতীত এই দুই প্রদেশে চীনা মাটীর নানাপ্রকার দ্রব্য, লাক্ষার নানা প্রকার দ্রব্য, পিতল-কাঁসারের নানাপ্রকার বাসন, সোনারূপার নানাপ্রকার দ্রব্য, হাতির দাঁতের নানাপ্রকার দ্রব্য, নানা প্রকার কাষ্ঠে প্রস্তুত কারুকার্য্যবিশিষ্ট দ্রব্য ও নানারূপ মাটীর খেলনাও প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ মাল কাঁচা, এবং উত্তর ভারতের পণ্যদ্রব্যগুলির মধ্যেও কতকগুলি কাঁচা মাল এবং কতকগুলি তৈয়ারি জিনিস। (manufactured articles)

পশ্চিম ভারতবর্ষ—ইহার মধ্যে বৃটীশ বেলুচিস্থান, বেরার এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকেও ধরা গেল। গঁদ, নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থ, তুলা, পশম, গরুর চামড়া, ছাগল ইত্যাদির চামড়া, নানাপ্রকার ঔষধপত্র গম ও লবণ এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। সোনা, রূপা, চামড়া ও তুলা প্রভৃতির শিল্পকার্য্যও এখানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই-প্রদেশে ধোলাই মালের (manufactured articles) সংখ্যা অধিক।

ব্রহ্মদেশ—এখানে কাঁচা ও ধোলাই উভয়বিধ মালই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের কারুকার্য্যও খুব বিখ্যাত। গঁদ, বার্ণিস, তামাক চা, চুরুট, কেরোসিন তৈল ও কাষ্ঠ প্রভৃতি কাঁচামাল ব্যতীত সোনা, রূপা, তামা, পিতল, কাষ্ঠ ও কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্যে প্রস্তুত দ্রব্যাদিও তথায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কলিকাতার যাদুঘরে ভারতের উৎপন্ন কাঁচা ও ধোলাই মালগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

১। গঁদ, রেসিন ইত্যাদি।

২। তৈল ও নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থ, ঘৃত, চর্ব্বি প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাণীজ পদার্থ এবং নানাপ্রকার গন্ধ-দ্রব্য।

৩। নানাপ্রকার চামড়া ও নানাপ্রকার রং।

৪। নানাপ্রকার প্রাণীজ পদার্থ।

৫। সূতা প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষেত্রজ এবং লৌহ প্রভৃতি নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ।

৬। নানাপ্রকার ঔষধপত্র।

৭। নানাপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য।

৮। বরগা, কড়ি প্রভৃতি কাষ্ঠ।

৯। নানাপ্রকার ধাতু ও নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং কোন্ কোন্ দ্রব্যই বা কত পরিমাণে আমদানি রপ্তানি হয়, তাহার সঠিক তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশ ভাগই দেশেই ব্যবহৃত হয়। কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে আমদানি-রপ্তানি করা হয়, Indian

Gazeteer-এ তাহার একটি তালিকা আছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

কাঁচামালের (Raw material) হিসাব

বৎসর	আমদানি লক্ষমুদ্রা হিঃ	রপ্তানি লক্ষমুদ্রা হিঃ
১৮৭৬—৭৭	২০'৮২	৯১'২০
১৮৮৬—৮৭	২৮'৩১	১.০২'৮১
১৮৯৬—৯৭	৪০'৯৬	১৮৯'৯৩
১৯০১—০২	৫১'৪৭	১১৬'৩৬
১৯০২—০৩	৪৯'৮৯	২০২'৯১

নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থের বীচি ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির হিসাব—

১৮৭৬—৭৭	২৫'৭৬	৫৮৩'২৫
১৮৮৬—৮৭	৫৮'৮২	৯০০'২৮
১৮৯৬—৯৭	৭৯'৭৩	৮৯০'৬৫
১৯০২—০২	৯৬'১০	১৭৯১'০৬
১৯০২—০৩	৭৭'০৯	১৬২৮'৬৫

রং এবং চামড়ার হিসাব

১৮৭৬—৭৭	১২'৬৬	৩৫৩.১১
১৮৮৬—৮৭	২৬'১৩	৪৩৩'৫৬
১৮৯৬—৯৭	৭৩'১৩	৫০০'৯
১৯০১—০২	৭৯'০৫	২৪০'৮২
১৯০২—০৩	৮১'০৬	১৮৩'২

প্রাণীজ পদার্থের হিসাব

১৮৭৬—৭৭	৪৭'৯৫	৩১৬'৮৭
১৮৮৬—৮৭	৮৫'০৭	৫৫৩'২৮
১৮৯৬—৯৭	৮৩'১৬	৭১৫'১৮
১৯০১—০২	৮৬'৪২	৮৬০'১২
১৯০২—০৩	৯৮'৪৮	৮৯৩'৩০

তুলা, পশম, রেশম, মাদুর ইত্যাদি নানা প্রকার কাঁচা মাল ও পাকা মালের হিসাব।

১৮৭৬—৭৭	১৮৪'৭০	১৮৫৭'৯১
১৮৮৬—৮৭	৩৪৮৮'৭৭	২৬০৭'২৮
১৮৯৬—৯৭	৩৬৩৯'৫১	৫৯০৮'৯০
১৯০১—০২	৪৬১২'০৭	৪৮৭২'৪৮
১৯০২—০৩	৫৭০২'৩৫	৪৮২৫'১১

চা, কফি ইত্যাদি নানাপ্রকার পানীয় জিনিসের হিসাব।

১৮৭৬—৭৭	৩৩১'৯০	২৫৮৪'৭১
১৮৮৬—৮৭	৬৫১'৬৪	৩৭০৭'০৬
১৮৯৬—৯৭	৮৬৮'৩৮	৩০৫৪'৩১
১৯০১—০২	১১৪২'৮৬	৩৮১৮'৩৯
১৯০২—০৩	১০৩০'১৭	৪৪১৮'৯১

নানাপ্রকার ধাতু এবং খনিজ পদার্থের হিসাব।

১৮৭৬—৭৭	২০২২'৮২	৪৬২'৭৩
১৮৮৬—৮৭	২৫০৯'৫২	৩২৯'৯০
১৮৯৬—৯৭	৩৭২৮'৩১	৩১৪'৫১
১৯০১—০২	৪৭৮৪'৪৫	১৩০১'৭৩
১৯০২—০৩	৫৮৮২'৮০	১১৩১'৭৪

যাদুঘরে শিল্পদ্রব্য যেরূপভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক :—

প্রথম স্তর—গঁদ রেসিন প্রভৃতি কাঁচা মাল প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত। লাক্ষা ও লোম ব্যতীত এই শ্রেণীর সমস্ত দ্রব্যই ক্ষেত্রজাত। ইহাদের অধিকাংশভাগ এ-দেশেই ব্যয়িত হয়। এই শ্রেণীর দ্রব্যগুলির যে অংশ আমরা আমদানি করি, তাহার আবার এক-তৃতীয়াংশ আমরা বিদেশে রপ্তানি করি।

আরব ও পারস্যের মধ্য দিয়া য়ুরোপের গমনাগমনের বেশ সুবিধা না থাকায়, এই সমস্ত দ্রব্য আমরা খোলাই মালরূপে সেখান হইতে আমদানি করিয়া তাহার একাংশ আবার য়ুরোপে রপ্তানি করিয়া থাকি। পারস্য-উপসাগরের এবং লোহিত-সাগরের বন্দরগুলির উন্নতি সাধিত হইলে, মালগুলি আর বোম্বায়ে আসিবে না, বন্দর হইতে একেবারে য়ুরোপে প্রেরিত হইবে।

লাক্ষা—ইহার রং গাঢ় লোহিতবর্ণ বলিয়া সংক্ষেপে ইহাকে "লাক্ষা" বলে। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে একজন ভ্রমণকারী ইহার উপকারিতার কথা য়ুরোপে প্রথম প্রচার করেন। লাক্ষা পোকা বৃক্ষে বাস করে; মাদী পোকার মৃত্যু হইলে, তাহার উদর ফাটিয়া যায় ও বহু শিশু পোকা বাহির হয়। তাহারা গাছের পাতায় লাগিয়া থাকে এবং তথায় বৃদ্ধি পায়। মে ও জুন মাসে বা অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষা নানাজাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও বর্ণ গভীর লাল, কাহারও বা ফ্যাকাসে লাল। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল গাছের গুণানুসারে ইহার বর্ণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু গবেষণার পর এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহাদের নানা জাতি আছে। পূর্ব্বে ভারতে এই লাক্ষার কাজ একচেটিয়া ছিল, কিন্তু জাপান ও ব্রহ্মদেশে এই ব্যবসা এখন ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা বহু কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পিগণ লাক্ষার প্রস্তুত বার্ণিশ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশ বিখ্যাত। ব্রহ্মের পাগোডাগুলিও নানা কারুকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তথায় এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কাঁচের গায়ে থিসটী নামক একপ্রকার পদার্থের আবরণ (coating) দিয়া, তাহার উপর নানা চিত্র অঙ্কিত করা হয়।

মোম—ভারতবাসী কখনই আগ্রহের সহিত মোমের কারবার করে নাই। এখনও যাহা করা হয়, তাহার পরিমাণও খুবই সামান্য। বন্য লোকেরাই এ শিল্পের চর্চ্চা করে। এই শিল্প হইতে আমরা মোম ও মধু পাই। মধু পানীয়বস্তুরূপে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বৎসর কয়েক লক্ষ টাকার মোম ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত হয়। এই ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি বা অবনতি ঘটে নাই।

দ্বিতীয় স্তর—নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থ:—ভারতবর্ষে যে বিবিধপ্রকারের তৈল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়; খনিজ, প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ। ভারতবর্ষে, প্রত্যেক বৎসরে নানাপ্রকার তৈলের প্রায় সতেরো কোটী টাকার ব্যবসা হয়। বার্ণিশ প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্যে তৈল ব্যবহৃত হয়। ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই গাত্রে তৈল মর্দ্দন করে। তৈল নহিলে আমাদের একেবারে চলে না; কেননা সাবান ব্যবহার ভারতের অধিকাংশ লোকে জানে না বলিলেই হয়। একপ্রকার খনিজ তৈল হইতে বাতি প্রস্তুত হয়। এই প্রকার তৈলের খনি ব্রহ্মদেশে যথেষ্ট আছে।

অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর অনেক টাকার তুলার বীচি, সরিষা, তিল, রেড়ী ও পোস্ত বিদেশে চালান যায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আমাদের দেশে তেলের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হওয়ায়, কাঁচা মালের রপ্তানি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

ঘৃত। ঘৃত হিন্দুদিগের প্রধান ভোজ্য বস্তু। হিন্দুগণ কর্ম্ম-কার্য্যের জন্য এশিয়ার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জাভা, সুমিত্রা ও সিংহল প্রভৃতি ভারত-মহাসাগরের দ্বীপসমূহে অনেক হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই তাহাদের ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসরেই ২৫২ লক্ষ টাকার ঘৃত প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষ প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে ১৪ লক্ষ টাকার চর্ব্বি ইত্যাদি ক্রয় করে।

গন্ধতৈল। ভারতবর্ষ গন্ধতৈলের জন্য চিরকাল বিখ্যাত। আজিও জৌনপুর, কনোজ এবং গাজিপুরে প্রচুর পরিমাণে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য দিল্লী. অমৃতসহর এবং লাহোরের বাজারে নীত হইয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয়। বিদেশ হইতে আনীত গন্ধ-দ্রব্যের প্রধান আড়ৎ বোম্বাই। গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলি ব্যবহৃত হয়। গোলাপফুলের পাতা, লেবু, মৃগনাভি, পাতচেঠ্‌লি ও চন্দন ইত্যাদি।

রং। ভারতবর্ষে নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া হইতে রং প্রস্তুত হইত। সেই জ্যোতি তত উজ্জল ত ছিলই না, বেশীর ভাগ দামেও খুব চড়া ছিল। য়ুরোপ হইতে আনীত সস্তা রং আসিয়া ভারতের রংএর ব্যবসা নষ্ট করিয়া দেয়। য়ুরোপ হইতে আনীত রং, চাকচিক্যে ভারতীয় রংএর চেয়ে উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু ততটা স্থায়ী নহে। দামে শস্তা বলিয়া ইহা অত্যন্ত জন-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের নীল-চাষও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। জর্ম্মানি কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করায়, ভারতের একচেটিয়া নীলের ব্যবসায় ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা প্রত্যেক বৎসর প্রায় এক কোটী টাকার রং বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি করি।

প্রাণীজ পদার্থ। চামড়া ইত্যাদি। আমাদের চামড়ার আমদানি এবং রপ্তানির পরিমাণ এক; অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর যত টাকার মাল আমরা ভারত হইতে বিদেশে চালান দি, ঠিক তত টাকার মালই আবার বিদেশ হইতে ভারতে আনিয়া থাকি। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর দশ কোটী টাকারও অধিক চামড়ার দ্রব্য যেমন বিদেশে প্রেরিত হয়, সেইরূপ দশ কোটীরও অধিক টাকার চামড়ার দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আসে। চামড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এখন ৪৩টী ট্যানারি আছে এবং সেই ট্যানারি-গুলিতে প্রায় ৭,৯০০ জন লোক খাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। পূর্ব্বে লিখিত ট্যানারিগুলির মধ্যে সাঁইত্রিশটী, এক

ট্যানারি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সকল ট্যানারিতে জুতা ব্যতীত, ঘোড়ার লাগাম, জিন ও রেকাব ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে আনীত Boot এবং shoe এর পরিমাণও ভারতে দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। এখন আমরা প্রায় ২৭·৯ লক্ষ টাকার বুট ও সু বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করি। কারুকার্য্যবিশিষ্ট সৌখীন জুতাও ভারতে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। কটক, সারাণ, রামপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, ঝান্সি, সাহারাণপুর দেরাগাজীখাঁ, রাওলপিণ্ডি, বেসহাট, জয়পুর, বিকানীর প্রভৃতি স্থানগুলিতে জুতার উপর নানারকমের কারুকার্য্য করিবার জন্য অনেক নিপুণ কারিগর আছে। পেশওয়ার, বান্নু, বেসহাট, ডেরাজাট প্রভৃতি স্থানে তরওয়ালের উপর চামড়ার বিবিধ কারুকার্য্য করা হয়।

হাতীর দাঁত। হাতীর দাঁতের শিল্পের জন্য ভারতবর্ষ ভুবনবিখ্যাত। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল হইতেই সমস্ত সভ্য-জগৎকে এই শিল্প যোগাইয়া আসিতেছে। দিল্লী, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং মৌলমেন প্রভৃতি স্থানগুলি দন্ত-শিল্পের পীঠস্থান। হাতির দাঁত হইতে নানাপ্রকার খেলনা, চিরুণী, বাক্স, টেবিল ইত্যাদি প্রস্তুত হয়; তা ছাড়া হাতীর দাঁতে ছাপা ছবির জন্য দিল্লী খুব নাম কিনিয়াছে। হস্তীদন্তের এই ছবিগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ছবিগুলি প্রায়ই মোগল আদর্শে অঙ্কিত।

শিং। ভারতবর্ষে কিছু পরিমাণে শিংয়ের কার্য্যও হয়। কটক, সাতক্ষিরা, হুগলী প্রভৃতি স্থানগুলিতে শৃঙ্গ-শিল্পের কারবার আছে।

মণি-মুক্তা। মণিমুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যগুলির কতকাংশ ব্রহ্ম ও সিংহল প্রভৃতি দেশের নিকটে ভারত-মহাসাগর হইতে উত্তোলিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ সকল স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারাই ভারতের সমস্ত অভাব পূরণ হয় না। এইজন্য কয়েক লক্ষ টাকার মুক্তা, ইতালী, আরব এবং আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আইসে। এই সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য ভারতের ধনীলোকেরা অলঙ্কারাদিতে ব্যবহার করে। গরীবের ঘরে মণি-মুক্তার চলন নাই বলিয়া ইহার আমদানি-রপ্তানিরও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

তুলা, কাগজ, সিল্ক, ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থের এবং লৌহ, স্বর্ণ, প্রভৃতি খনিজ পদার্থের আলোচনা আমরা 'ভারতী'তে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি; কাজেই উহাদের বিষয়ে বলিবার আর নূতন কিছুই নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।



বেহুলা

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম (কলিকাতা) অধিবেশনের ইতিহাস-শাখায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস-সেবকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে;—এক শ্রেণী পৌরাণিক, আর এক শ্রেণী ঐতিহাসিক।" চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত নাম সকলের মনোমত নাও হইতে পারে, কিন্তু এদেশের ইতিহাস-সেবকগণের মধ্যে একটা মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। উভয় শ্রেণীর মতভেদের মূল কি, তাহার আলোচনা করা উচিত, এবং পাঠক-সমাজকে এই বিষয়ে মধ্যস্থতা করিবার অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, অগ্রহায়ণের "ভারতী" পত্রে প্রকাশিত "বাঙ্গালার ইতিহাস (আলোচনা)" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" উপলক্ষ করিয়া, এক শ্রেণীর সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিযোগ আছে, স্পষ্টাক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। আমি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উক্তি পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তরস্বরূপ এইশ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের সমর্থনে যাহা বলিবার আছে, তাহা নিবেদন করিব।

১। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

মহাভারতের এবং পুরাণের ঐতিহাসিকতা, মতভেদের একটী কারণ। এই বিষয়ে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অভিযোগ—

"যে মহাগ্রন্থ উল্লেখ করিয়া 'ইতিহাস' শব্দটী সংস্কৃত অভিধানে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই মহাভারতেরই ঐতিহাসিকতা তর্কের বিষয় মনে করিয়া রাখালবাবু উহা পরিহার করিতেছেন।" (৭৭৫ পৃঃ)

সংস্কৃত সাহিত্যে 'ইতিহাস'-শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং মহাভারতই বা কোন্ হিসাবে ইতিহাস, তাহার অবধারণ করিতে হইলে, 'ইতিহাস'-শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ক্ষীরস্বামী ইতিহাস-শব্দের এই প্রকার অর্থ লিখিয়াছেন—"ইতি হ আসীত্যত্রেতিহাস, ইতিরেবমর্থে, হঃ কিলার্থে।" এইরূপই ঘটিয়াছিল (ইতি—হ—আস) যেখানে, অর্থাৎ যাহাতে অতীত ঘটনার বৃত্তান্ত থাকে, তাহা ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বা পূর্ব্বচরিত। অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ যে ইতিহাসের বিষয়, 'ইতি'র সহিত "হ"'র যোগ তাহা সূচিত করিতেছে। সুতরাং বুৎপত্তির হিসাবে 'ইতিহাস'-শব্দকে history-শব্দের প্রতিশব্দরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যাহাই হউক, ঠিক সেই অর্থে ইতিহাস-শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই।

বৈদিক যুগ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস-শব্দের বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। অথর্ব্ব-বেদ-সংহিতায় (১৫।৬।৪) "পুরাণ", "গাথা", "নারাশংসী", এবং "ইতিহাস" একত্র উল্লিখিত

হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে (১১।৫।৬) পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত "ব্রহ্মযজ্ঞ" প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—"স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ", 'স্বয়ং (বেদ) অধ্যয়ন ব্রহ্মযজ্ঞ।'

তৎপরে বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়নের ফল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"পয়-আহুতয়োহবা এতা দেবানাম্ যদৃচঃ",—'ঋক্‌গুলি (ঋগ্বেদ) দেবগণের উদ্দেশ্যে দুগ্ধাহুতিস্বরূপ।' এইরূপ যজুস্-গুলিকে (যজুর্ব্বেদ) আজ্যাহুতি (ঘৃতাহুতি), সামগুলিকে (সামবেদ) সোমাহুতি, অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্রগুলি (অথর্ব্ববেদ) মেদ-আহুতি বলা হইয়াছে। তৎপরে বলা হইয়াছে—

"মধ্বাহুতয়োহবা এতা দেবানাম্ যদনুশাসনানি বিদ্যাবাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণং গাথা নারাশংস্যঃ স য এবং বিদ্বাননুশাসনানি বিদ্যা বাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণং গাথানারাশংসীরিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে মধ্বাহুতিভিরেব তদ্দেবাং স্তর্পয়তি।"

'অনুশাসন, বিদ্যা, বাকোবাক্য—(কথোপকথন), ইতিহাস, পুরাণ, গাথা এবং নারাশংসী দেবগণের উদ্দেশ্যে মধু-আহুতিস্বরূপ। যিনি এই তথ্য জানিয়া প্রতিদিন অনুশাসন, বিদ্যা, বাকোবাক্য, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা এবং নারাশংসী অধ্যয়ন করেন, তিনি মধু-আহুতি দান করিয়া দেবগণের তৃপ্তিসাধন করেন।'

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।১।৪) "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ আথর্ব্বণ শ্চতুর্থ ইতিহাস-পুরাণঃ পঞ্চমো" ইত্যাদি বচনে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদের পর ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের আরও অনেক স্থানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে। এই সকল অংশের আলোচনা করিলে মনে হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতে বৈদিক আর্য্য-সাহিত্যের "ইতিহাস" নামক একটি অঙ্গ প্রচলিত ছিল, এবং তাহার অধ্যয়ন বা আবৃত্তি পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্য বলিয়াছেন (১।১।৩), "সামর্গ্যজুর্বেদাস্ত্রয় স্ত্রয়ী। অথর্ব্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ।" 'সামবেদ, ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, এই তিন বেদ ত্রয়ী। অথর্ব্ববেদ এবং ইতিহাসবেদও বেদ। পুনশ্চ (১।৫) কৌটিল্য এই ভাবে ইতিহাসের বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্ম্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ।" অর্থাৎ, ইতিহাস বলিলে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র, এই সমস্ত বুঝায়। পুরাণাদি ইতিহাসের অঙ্গ। ইতিহাসের এই ষড়ঙ্গের মধ্যে, এখন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিলে যাহা আমরা বুঝি, তাহা ইতিবৃত্ত নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতে যাহা "ইতিহাসবেদ" নামে পরিচিত ছিল, ইতিহাস-শব্দের ব্যুৎপত্তি-অনুসারে বা এখনকার পাশ্চাত্য 'হিষ্টরি'শব্দে যাহা বুঝায়, সেইরূপ বিবরণ-পরিরক্ষণ তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তৎকালে ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং অর্থশাস্ত্রের অনুশাসনগুলির প্রচার। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঐতিহাসিকগণ পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ প্রভৃতি নানাবিধ প্রকৃত এবং

কল্পিত ঘটনার বর্ণন করিতেন। প্রকৃত ঘটনার বর্ণনসময়েও উহা হইতে যে উপদেশ বা শিক্ষা লাভ করা যায়, ঐতিহাসিকগণের লক্ষ্য থাকিত সেই দিকে; সুতরাং প্রাচীন ইতিহাসে যে সকল প্রকৃত ঘটনার বিবরণ স্থানলাভ করিত, কালক্রমে তাহাদের বিকৃতি ঘটিবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

কৌটিল্য ইতিহাসের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই লক্ষণাক্রান্ত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়া কথিত, এবং পঞ্চমবেদ বলিয়া এখনও পূজিত হয়। এই গ্রন্থ আমাদের 'মহাভারত'।

মহাভারতের সূচনায় ঋষিগণ সৌতিকে অনুরোধ করিয়াছেন—

দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।
সুরৈ ব্র হ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা যদভিপূজিতম্ ॥
তস্যাখ্যান বরিষ্ঠস্য বিচিত্রপদপর্ব্বণঃ।
সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈ ভূ ষিতস্য চ ॥
ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপবৃংহিতাম্ ॥
জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
যথাবৎ স ঋষিস্তুষ্ট্যা সত্রে দ্বৈপায়নাজ্ঞয়া ॥
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাং ॥
আদিপর্ব্ব, ১।১৭—২১ ॥

'পরমর্ষি দ্বৈপায়ন (ব্যাস) যে পুরাণ কহিয়াছেন, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ শ্রবণ করিয়া যাহার পূজা করিয়াছেন, মনোরম পদ এবং বিবিধ পর্ব্বে পূর্ণ, সূক্ষ্মার্থ-প্রতিপাদক-যুক্তিসংবলিত, বেদার্থ-সম্মত, অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাসবিরচিত সেই শ্রেষ্ঠ আখ্যান ভারত (মহাভারত) নামক ইতিহাসের (যে) গ্রন্থার্থযুক্ত, ব্যুৎপত্তিমত, সর্ব্বশাস্ত্রানুগত, চতুর্ব্বেদ-সংযুক্ত, সংচিত, পুণ্যকর, পাপভয়-হর কথা, যাহা দ্বৈপায়নের আজ্ঞানুসারে রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে ঋষি বৈশম্পায়ন যথাবৎ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।'

এখানে 'মহাভারত' পুরাণ আখ্যান এবং ইতিহাস বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং মহাভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ শান্তি পর্ব্বে এবং অনুশাসন পর্ব্বে, ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং অর্থশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ও নিবদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে "ইতিবৃত্তং, নরেন্দ্রাণাং ঋষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্"ও যথেষ্ট আছে। "বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং" এই বিশেষণ হইতে এবং অন্যান্য কারণে পণ্ডিতগণ মনে করেন, বৈদিক সাহিত্যে যে সকল ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ আছে, সেই সকল প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ অবলম্বনে মহাভারত রচিত হইয়াছিল। মহাভারতই আর্য্যগণের ইতিহাসবেদ, বা পঞ্চমবেদ। কৌটিল্য ইতিহাসের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, সেই হিসাবে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা তর্কের বিষয় নহে। কিন্তু গ্রীন (Green) বা ফ্রীম্যানের (Freeman) গ্রন্থ যে হিসাবে ইতিহাস, মহাভারত সেই হিসাবে ইতিহাসপদবাচ্য কি না, ইহাই তর্কের বিষয়।

মহাভারতে নানাপ্রকার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুরাণ বা সৃষ্টি-প্রলয়-মন্বন্তরের কথা; কতকগুলি আখ্যায়িকা; কতকগুলি উদাহরণ এবং কতকগুলি ইতিবৃত্ত। মহাভারতে "অত্রাপ্যুদা-

রন্তিমমিতিহাসং পুরাতনম্” এই প্রকার মুখবন্ধ করিয়া, অনেক পশুপক্ষীর গল্পও বলা হইয়াছে। পুণ্যকর, পাপভয়হর, উপদেশ-পূর্ণ ঘটনার বর্ণন করাই মহাভারতকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আদ্যোপান্ত মহাভারতকে এখনকার হিসাবে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা সঙ্গত নহে; কিন্তু ‘মহাভারতে’ যে ইতিহাসের অনেক “উপাদান” আছে, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু মহাভারতকে ইতিহাসের উপাদানের আকররূপে ব্যবহার করিবার প্রধান অন্তরায়, মহাভারত-বর্ণিত বৃত্তান্তের মধ্যে কোন্‌গুলি যে আখ্যায়িকা, কোন্‌গুলি যে উদাহরণ, এবং কোন্‌গুলি যে ইতিবৃত্ত, তাহা নির্ব্বাচনের দুরূহতা। কেহ কেহ বলিতে পারেন—“এই নির্ব্বাচন আর কঠিন কি? যে বৃত্তান্তে অলৌকিক ঘটনার সংস্রব নাই, এবং যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা সত্য ইতিবৃত্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।” কিন্তু উদাহরণার্থে যদি অলৌকিক ঘটনা কল্পিত হইতে পারে, তবে উদাহরণার্থ যে লৌকিক ঘটনা কল্পিত হয় নাই, এ কথা কে বলিবে? সুতরাং মহাভারতের ঐতিহাসিক স্তরের আবিষ্কার এখন একান্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। স্বতন্ত্র বাহ্য প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়া, এই কার্য্য কখনও সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। ঐতিহাসিক উপাদানের রত্নাকর ইতিহাসবেদ মহাভারত হইতে আমরা যে ইতিহাস বাছিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু তজ্জন্য পরিতাপে সময় নষ্ট না করিয়া ভাব, ভাষা এবং ছন্দের সূত্র ধরিয়া, মহাভারতের কোন্ অংশ কখন রচিত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ নিরূপণে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্যগণ তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের অন্তর্নিহিত ইতিহাসের উদ্ধারের জন্য যেমন Higher Criticism-এ প্রবৃত্ত হইয়া, অনেকটা সফলকাম হইয়াছেন, আমাদেরও মহাভারতের এবং পুরাণের সেইরূপ Higher Criticism (১) করিতে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। তবেই পঞ্চমবেদের প্রতি সম্যক্ সম্মানপ্রদর্শন করা হইবে, এবং ইতিহাসবেদের অন্তর্নিহিত ইতিহাস উদ্ধারের পথ সহজ হইবে।

২। কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা

কুলশাস্ত্রের, বিশেষতঃ রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের কুলজ্ঞগণের পরিরক্ষিত কুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইতিহাসসেবক-সমাজে মতভেদ লক্ষিত হয়। এই বিষয়ে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভাষায় অপর পক্ষের অভিযোগ এই—

“কুলশাস্ত্রের উপর রাখালবাবু, রমা-

(১) Criticism বা সমালোচনা শব্দের সাধারণ অর্থ দোষগুণবিচার। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে Criticism শব্দ অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই Criticism দুই প্রকার, Lower এবং Higher। Lower বা Textual criticism-এর উদ্দেশ্য প্রকৃত পাঠোদ্ধার; Higher Criticism-এর উদ্দেশ্য গ্রন্থবিশেষের রচনাকাল, রচনাকারী এবং রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে বিচার।

প্রসাদবাবু প্রভৃতি অনেকেই বীতরাগ; কিন্তু এগুলি একেবারে ফেলিয়া দিবারও জিনিষ নহে।......অতএব শাসন বা মুদ্রা-মাত্রেই যে গ্রহণীয় এবং কুলগ্রন্থমাত্রেই যে বর্জ্জনীয় তাহা বলা যায় না (৭০৩ পৃঃ)।”

কুলশাস্ত্রগুলি যে একেবারে ফেলিয়া দিবার জিনিষ, এ কথা কেহ কখনও বলে নাই, এবং বলিতেও পারে না। পক্ষান্তরে, কুলশাস্ত্র তাম্রফলকে বা শিলাফলকে ক্ষোদিত লিপির তুল্য মূল্যবান, এইরূপ মনে করাই সঙ্গত। তাম্রশাসনে এবং শিলা-লিপিতে রাজকুলের প্রশস্তি লিপিবদ্ধ থাকে বলিয়াই ঐতিহাসিকের নিকট উহাদের এত আদর। সুতরাং তাম্রশাসন এবং শিলা-লিপিও কুলপঞ্জিকা ভিন্ন কিছুই নয়—দাতার কুলের কুলপঞ্জিকামাত্র। তাম্রপট্টে বা শিলাফলকে ক্ষোদিত হউক, আর তুলট-কাগজে বা তালপত্রে লিখিত হউক, সকলপ্রকার কুলপঞ্জিকাই ঐতিহাসিকের আদরের সামগ্রী। কিন্তু সকল প্রকার কুলপঞ্জিকাই ঐতিহাসিকের আদরের সামগ্রী হইলেও, কোনপ্রকার কুলপঞ্জিকারই সকল অংশ সমান আদরের সামগ্রী নয়। তাম্র-পট্টে বা শিলাফলকে ক্ষোদিত অধিকাংশ কুলপঞ্জিকাতেই দুইটী অংশ লক্ষিত হয়। প্রথম অংশে চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি দেবতা এবং রাম-লক্ষ্মণ যদু প্রভৃতি পৌরাণিক নৃপতি হইতে দাতার বংশোৎপত্তির বিবরণ থাকে; এবং দ্বিতীয় অংশে দাতার বংশে যিনি রাজপদের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার সময় হইতে ধারাবাহিক বংশাবলী থাকে।

ঐতিহাসিকেরা এই দ্বিতীয় অংশ যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন, প্রথম অংশের প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধা কখনও প্রদর্শন করিতে পারেন না। তুলট-কাগজে লিখিত কুল-পঞ্জিকারও তদ্রূপ দুইটী অংশ আছে। প্রথম অংশে আদিশূর-আনীত রাজপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদা-লাভকারীর পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণ নিবদ্ধ হয়; দ্বিতীয় অংশে কৌলীন্য-প্রথার প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পুরুষের করণ-কারণের এবং মেল পঠি মত প্রভৃতির উৎপত্তির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হয়। কৌলীন্যের রক্ষার জন্যই কুলজ্ঞের অভ্যুদয়, এবং কুলজ্ঞের স্মৃতিশক্তির সহায়তার জন্য কুলপঞ্জিকার সঙ্কল্প। সুতরাং কুলপঞ্জিকার কৌলীন্যের বিবরণ অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশ যেরূপ আদরণীয়, প্রথম অংশে নিবদ্ধ তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বিবরণ ততটা আদরণীয় হইতে পারে না। কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন,—“আদিশূর বা আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ চন্দ্রসূর্য্যের মত দেবতা বা রাম-লক্ষ্মণ-যদুর মত পৌরাণিক ব্যক্তি নহেন; সুতরাং তাম্রশাসনের কুলপ্রশস্তির প্রথম অংশ অপেক্ষা কুলজ্ঞের কুলপঞ্জিকার প্রথম অংশের প্রতি অধিকতর আস্থা-স্থাপনের অন্তরায় কি?” কিন্তু একই উদ্দেশ্যে, রাজকুলের প্রশস্তিতে রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতার রাজপদে অধিকার যে পুরুষপরম্পরাগত, এবং কুলীন ব্রাহ্মণের বংশাবলীতে প্রথম কৌলীন্য-মর্য্যাদাভাগীর কৌলীন্য-মর্য্যাদার দাবীও যে পুরুষপরম্পরাগত, তাহা প্রতিপাদনের জন্য উভয়ে এই প্রথমাংশ সংযোজিত হইয়াছে; এবং উভয়েই কল্পনার অবকাশ তুল্যরূপ।

কৌলীন্যমর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বের এবং পরের বংশাবলীর যে ঐতিহাসিক মূল্য সমান নয়, তাহার একটি প্রমাণ এই—কৌলীন্য-প্রতিষ্ঠার পরবর্ত্তী বংশাবলীতে পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণের পুরুষ-পর্য্যায়ের সংখ্যায় অসঙ্গত পার্থক্য লক্ষিত হয় না; পক্ষান্তরে, তৎপূর্ব্বের বংশাবলীতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। কান্যকুব্জাগত বীজপুরুষ হইতে কৌলীন্য-মর্য্যাদাভাগীর ব্যবধান বাৎস্যগোত্রে আট পুরুষ, এবং শাণ্ডিল্যগোত্রে পনর পুরুষ। এই সকল কারণে কেহ যদি তাম্রশাসনের বংশাবলীর প্রথমাংশের মত কুলশাস্ত্রের বংশাবলীর প্রথমাংশ সন্দেহের চক্ষে দেখেন, তবে তাঁহাকে সমগ্র কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বীতরাগ বলা যাইতে পারে না। রাঢ়ীয় সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য কুলগ্রন্থ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী"তে এই প্রথম অংশটি বাদই দেওয়া হইয়াছে। রাখালবাবু প্রভৃতি যাঁহারা কুলশাস্ত্রের প্রতি বীতরাগ বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ এ-যাবৎ ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং সমগ্র কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে মত-প্রকাশের তাঁহাদের অবকাশই উপস্থিত হয় নাই।

গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে, ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে, চতুর্ভুজের "হরিচরিত কাব্যে", শীলিমপুরের শিলালিপিতে, এবং অন্যান্য প্রাচীন লিপিতে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাসের যে উপকরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহার সহিত কুলশাস্ত্রের ব্রাহ্মণা-গমনকাহিনীর অবিরোধ লক্ষিত না হওয়ায়, আমরা কেহ কেহ এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই ব্রাহ্মণাগমনকাহিনীও একেবারে ফেলিয়া দিবার জিনিষ, এ কথা কোথাও বলা হয় নাই। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তির অনুসন্ধানই চলিতেছে। কিন্তু আমরা কুলশাস্ত্রের একশ্রেণীর বচন-প্রমাণকে একেবারে ফেলিয়া দিবার জিনিষ বলিয়া মনে করিতেছি। এই বচনগুলি আদিশূর কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ-আনয়নের প্রতিপাদক প্রমাণরূপে পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যসভায় পঠিত "আদিশূর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই শ্রেণীর কতকগুলি বচনের মৌলিকতার আলোচনা করিয়াছিলাম। এই বিষয়টির আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়া, এই প্রবন্ধে ঐ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

লঘুভারত-কারের মতে, ৪২৩০ কলি-গতাব্দে অর্থাৎ ৯৫১ শকাব্দে আদিশূর রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। "সম্বন্ধ-নির্ণয়"-কারের মতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে উল্লিখিত আদিশূরের আহ্বানে কান্যকুব্জের পঞ্চব্রাহ্মণ-আগমনের কালজ্ঞাপক "নবনবত্যধিক-নবশতী শকাব্দ" বচনকে সংবৎ পাঠ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণডাঙ্গানিবাসী ৺ বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের উপদেশ-অনুসারে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-কার বেদবাণাঙ্কশাকে "তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" বচন প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই তিন জন লেখককে আমরা প্রাচীন কুলশাস্ত্রপন্থী বলিতে পারি। ইঁহাদের মধ্যে কার্য্যতঃ দুই প্রকার মত দেখা যায়! এক মতে, ব্রাহ্মণ-আগমনের

কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দ (অর্থাৎ ৯৫১, ৯৫৪, বা ৯৯৯ শকাব্দ), এবং অপর মতে, দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ (৯৪২ খৃষ্টাব্দ)।

ইদানীং যাঁহারা কুলশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া ইতিহাসের রচনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাচীন কুলশাস্ত্রপন্থিগণের উভয়প্রকার মত এবং তদনুকূল বচন-প্রমাণ একেবারে ফেলিয়া দিতে চাহেন, এবং নবাবিষ্কৃত বচন-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আদিশূর "সম্বন্ধ-নির্ণয়"-কারের নিরূপিত সময়েরও দুই শতাব্দী পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের মাঝামাঝি, ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই মতের প্রধান পোষ্টা তিন জন;—৺ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। এই সকল পণ্ডিত যে সকল বচনপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একে একে তাহার বিচার করিব।

১। ১৩০৪ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় প্রকাশিত "কৃত্তিবাস পণ্ডিত" শীর্ষক প্রবন্ধের একটী পাদটীকায় (১১৯ পৃঃ) লেখক ৺ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে,—"শাকে বেদকলঙ্কষট্‌ক-বিমিতে" অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হয়েন, এবং এই প্রমাণের বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, "রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকার "বেদবাণাঙ্ক" শাকের স্থানে নিশ্চয়ই "বেদবাণাঙ্গ শাকে" ছিল, কালবশে এবং হইয়াছে।" কিন্তু যখন কুলশাস্ত্রের এবং "ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে"র সময়জ্ঞাপক সকল বচন উড়িয়া যাইতেছে, তখন "বেদকলঙ্কষট্‌ক-বিমিতে" বচন কেন যে বেদবাক্যবৎ অবিচারে গৃহীত হইবে, তৎসম্পর্কে বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র যুক্তি,—ব্রাহ্মণবংশাবলীতে আদিশূর হইতে বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত যে পুরুষপর্য্যায়ের ব্যবধান কথিত হইয়াছে, তাহাতে "অন্ততঃ সাড়ে তিন শত বৎসর" ধরিতেই হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোনও গোত্রের বংশাবলীতে আদিশূর ও বল্লাল সেনের মধ্যে আট পুরুষের ব্যবধান, এবং কোনও বংশাবলীতে পনর পুরুষের ব্যবধান। আট পুরুষে এবং পনর পুরুষে সামঞ্জস্য বিধান যেমন দুষ্কর, এই দুইয়ের গড় করিয়া সাড়ে তিন শত বৎসর ব্যবধানের কল্পনা করাও তেমনই অসঙ্গত।

প্রফুল্লবাবুর আর একটি ত্রুটী,—তিনি বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার একটিমাত্র বচনের বলে চিরপ্রচলিত "বেদবাণাঙ্ক"কে "বেদবাণাঙ্গ" পাঠের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকামাত্রেই বল্লালসেনের সহিত শূর-রাজবংশের সম্বন্ধসূচক যে বচনপ্রমাণ আছে, তৎপ্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। আমার মনে হয়, কুলপঞ্জিকায় নিবদ্ধ সময়-জ্ঞাপক পরস্পরবিরোধী বচনের অপেক্ষা এই প্রকার ঐতিহ্য অধিক মূল্যবান। "গৌড়রাজমালা"য় (৫৮ পৃঃ) পুঠিয়া-নিবাসী ৺ মহেশচন্দ্র শিরোমণির ঘরের কুলগ্রন্থ হইতে এই সম্পর্কে একটি বাঙ্গালা বচন উদ্ধৃত হইয়াছিল। যথা—

করিয়া আদিস্থর রাজার সর্গারোহণ ঃ তদন্তে কিছুকালানন্তর তত দৌহিত্রকুলেত উদ্ভব হইলেন বল্লাল সেন।"

উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের ঘরের কুল-গ্রন্থের আর একটি ছিন্ন পত্রে আদিশূর ও বল্লালসেনের সম্বন্ধ এই ভাবে সূচিত হইয়াছে—

"রাজ্ঞঃ সপ্তমসন্তানস্ত দৌহিত্রোদ্ভূব-[ল্লালাখ্যঃ]।" "সপ্তম সন্তানে"র অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এই বচনটি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করি নাই। কিন্তু বিগত বৎসর মাঝগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিশেখর সিদ্ধান্ত এবং শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মুকুটমণি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিকে যে সকল কুলগ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কথা নানা আকারে পাওয়া যায়।

(ক) "ইত্তবকালে আদিস্থর রাজা পঞ্চ-গোত্রেতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাঅন করেন [পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র] আনাঅন করিআ আদিশূর রাজার শর্গারোহণঃ সপ্তম পুরুষান্তরে দইত্রকুলে জন্মিলেন॥ বল্লালসেনঃ।"

(খ) "এই সকল ক্রিয়া করিয়া আদিস্থর রাজার সর্গারোহণঃ॥ ব্রাহ্মণ দ্বিগের সপ্তম পুরুষ জায়ঃ রাজার সপ্তম পুরুষ জায়ঃ রাজা জুগ্য পাত্র পায় না জে য়বিসেক করিয়া রাজা করেঃ॥ কিছুকাল অন্তর দহিত্র সন্তানেত জর্ম্মিলেন বল্লালসেন।"

ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের বাড়ী হইতে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি যে "কুলদোষ" গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে "ক্রমশঃ স্থতবর্ণিত" সপ্তজন শূর রাজের নাম আছে। যথা,—আদিশূর, ভূশূর, ক্ষিতিশূর, অবনীশূর, ধরণীশূর, ধরাশূর এবং অনুশূর। সুতরাং এখানেও আদিশূরের সপ্তম পুরুষ যে শূর-বংশের শেষ নৃপতি, তাহা সূচিত হইয়াছে। বিজয়সেনের ৩৩ রাজ্য সংবতের একখানি তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে,—বিজয়সেনের মহিষী এবং বল্লালসেনের জননী বিলাসদেবী শূরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রমাণও উপরোল্লিখিত বচনপ্রমাণের একাংশ সমর্থন করে। সুতরাং বারেন্দ্র-কুলজ্ঞগণের রক্ষিত আদিশূর এবং বল্লাল-সেনের নয় পুরুষের ব্যবধান-বিষয়ক ঐতিহ্য অমূলক নাও হইতে পারে। যদি এই কথা অমূলক না হয়, তবে আদিশূর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের মধ্যভাগে, পালবংশীয় দ্বিতীয় গোপালের বা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সমসময়ে, "সম্বন্ধ-নির্ণয়"কারের অনুমতি ৯৯৯ সংবতের কিছুকাল পরে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ অনুমানও করা যায়। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপি হইতে জানিতে পারা যায়,—একাদশ শতাব্দের প্রথম পাদে, গৌড়াধিপ মহীপালের সময়ে, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর নামে একজন নরপতি ছিলেন। আদিশূর যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে দশম শতাব্দের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তবে হয় ত তিনি রাঢ়বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। কাম্বোজ-আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, এবং বারেন্দ্র যখন কাম্বোজগণের পদানত, তখন রাঢ়ে, এবং বঙ্গে কোনও পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতির অভ্যুত্থানের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। আদিশূর কি সেই সুযোগে অভ্যুত্থিত হইয়াই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া, কোনও

চিরোৎসন্ন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন? এইরূপ অনুমানের প্রলোভন সংবরণ করা সুকঠিন। কিন্তু কেবল আন্দাজের উপর এত কথা কোনও মতেই বলা যাইতে পারে না।

২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মা আদিশূরের অনুরোধে পঞ্চব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২) কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকার উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

Thirty years ago the theory was that Brahmans were brought to Bengal by Adisura either in 999 Samvat i.e. 954 A.D. or in বেদবেদাঙ্কশাক, i.e. 954 Saka or 1032 A.D. But since then careful study of all manuscripts of earlier genealogists has given more correct information on the subject. Hari Misra was a contemporary of Danauja-Madhava, who again was a conremporary of Ghiyatuddin Bulban (1266-1268 A. D.)...Hari Misra says,—that the Palas got ascendency in Bengal shortly after the coming of the five Brahmans, and it is now very nearly settled that they became rulers of Bengal between A.D. 760 and 770. So Adisura brought the Brahmans not in the eleventh century but in the eighth. —J. A. S. B. Vol. VIII. New Series, 1912. p.p. 347-398..

শাস্ত্রী মহাশয় এবং নগেন্দ্রবাবু হরিমিশ্রের এই কারিকার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা মহামূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-আনয়নের পরে পালরাজগণের অভ্যুদয়ের কথা আছে, পালরাজ দেবপালের কথা আছে, সেন-রাজগণের কথা আছে। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন এই গ্রন্থ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র দনুজমাধবের সভায় প্রায় ৫৫০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত (রাজন্যকাণ্ড ৯৯ পৃঃ)। লক্ষ্মণ সেন অন্যূন ৭০০ বৎসরের পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং লক্ষ্মণসেনের পুত্রের সভাসদ হরিমিশ্রের রচনাকাল "প্রায় ৫৫০ বর্ষ" না বলিয়া, মোটামুটি ৭০০ বৎসর বলাই কর্ত্তব্য। বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে নাকি "এই প্রাচীন পুথির দুই শত বর্ষের হস্তলিপি" আছে (রাজন্যকাণ্ড, ১৫৮ পৃঃ, ৪৬নং টীকা)। দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত, সাত শত বৎসরের পূর্ব্বে রচিত, শূর, পাল এবং সেনবংশের এবং ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস-সংবলিত এই মহাগ্রন্থ কেন যে শাস্ত্রী মহাশয় এবং নগেন্দ্রবাবু এতদিন প্রকাশ করিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সুধু যে কুলশাস্ত্রানভিজ্ঞ নবীন ঐতিহাসিকেরাই হরিমিশ্রের এই বচনগুলি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা নহে; প্রাচীন কুলশাস্ত্রাভিজ্ঞ সম্বন্ধ-"নির্ণয়"-কারও আদিশূরের ব্রাহ্মণ-আনয়নকাল সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বতন মত, ৯৯৯ সংবৎ, পরিহার করিয়া; নগেন্দ্রবাবুর ধৃত হরিমিশ্রের

বচনানুসারে কোনও নূতন মতের প্রচার করেন নাই, এবং "ভাষাপরিচ্ছেদে"র ভূমিকায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর "ভাষাপরিচ্ছেদ"-কারের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে ৯৯৯ সংবৎই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু হরিমিশ্রের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে দনুজ-মাধবের বিবরণ উদ্ধৃত করিব :—

"তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ।
সন্ধিং চাপ্যকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ॥
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রা স্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ॥
প্রাদুরভবদ্ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনোজমাধবঃ সর্ব্বভূপঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥
এতৎসভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তাঃ দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ॥
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া।
সম্বন্ধং কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধরপুঙ্গবাঃ॥"

নগেন্দ্রবাবুর অনুবাদ—'লক্ষ্মণ-পুত্র কেশবসেন যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া তাঁহাদের সহিত (কিছুদিন) দ্বন্দ্ব চালাইতেছিলেন। এ সময় ব্রাহ্মণেরাও তথায় তিষ্ঠিতে পারে নাই! অনন্তর সেন-বংশে দনৌজমাধব প্রাদুর্ভূত হন। সকল নৃপতিই তাঁহার পদসেবা করিত। এই মহারাজের সভায় দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভব নানাগুণসমাযুক্ত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আগমন করেন। পিতামহকেও হারাইবার অভি-প্রায়ে তিনি ধন দ্বারা ও রাজসম্মান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধনির্ণয় করিয়াছিলেন, কেশব সেনের প্রসঙ্গের পরে, "অনন্তরং সেনবংশাৎ দনৌজমাধবঃ প্রাদুরভবৎ" বলায়, উভয়ের মধ্যে কালব্যবধান সূচিত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণা নরাঃ" শুধু ব্রাহ্মণ বুঝাইতে পারে না, অন্য প্রকার নরও বুঝায়। শেষ শ্লোকটির অনুবাদ একে-বারেই মূলানুগত নহে। "কৃতবন্তঃ" ক্রিয়ার কর্ত্তা "ভূধরপুঙ্গবাঃ"। অনুবাদ এইরূপ হইবে,—সকল নৃপশ্রেষ্ঠগণ পিতা-মহকে জয় করিবার জন্য দানের দ্বারা এবং রাজসম্মানের দ্বারা সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। এই শ্লোক দনোজমাধবের ব্রাহ্মণের কোনও উল্লেখ নাই, কেননা ভূধর অর্থ ব্রাহ্মণ নহে, রাজা।

এইরূপ অসম্বন্ধ রচনাকে বাঙ্গালায় সংস্কৃতচর্চ্চার সেই গৌরবময় যুগের লক্ষ্মণ-সেনের উত্তরাধিকারীর সভাকবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন। নবীন ঐতিহাসিকেরা উনবিংশ শতাব্দের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের উদ্ভাবিত Critical Method বা ঐতিহাসিক বিচাররীতি-অবলম্বনে সত্যোদ্ধার করিতে চাহেন। বিচারশীল ঐতিহাসিক বা Critic কোনও বৃত্তান্তই অসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। "For the critic is one who, when he lights on an interesting statement, begins by suspecting it." যতক্ষণ না ঐতিহাসিক আলোচ্য বৃত্তান্তের মূল অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন, ততক্ষণ তাঁহার সন্দেহমোচন হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই পন্থা অবলম্বন করিলে, অতি অল্প তথ্যই আবিষ্কার করা যাইতে পারিবে, ধারাবাহিক ইতিহাসগঠন অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ইতিহাসসেবক অধিকতর লাভবান হইতে পারেন কোন্ পথ অবলম্বন করিলে—পরিমাণে বেশী তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে, না যথারীতি তথ্যোদ্ধারের শ্রমের ও সাধনার ফলে? লর্ড অ্যাকটন বলিয়াছেন—

"For our purpose, the main thing to learn is not the art of accumulating material, but the sublimer art of invastigating it, of discerning truth from falsehood, and certainty from doubt. It is by solidity of criticism more than by the plenitude of erudition, that the study of history strengthens. and straightens, and extends the mind." পুনরপি, "For us then the estimate of authorities, the weighing of testimony, is more meritorius than the potential discovery of new matter."

আমাদের এদেশের নবীন ঐতিহাসিকেরাও ধারাবাহিক কাহিনী গড়িয়া সৌখীন পাঠকের কৌতুহলনিবৃত্তি করিতে চাহেন না, পরন্তু যে বিচাররীতি মানুষের চিত্তকে প্রসারিত করিতে পারে, মানসিক শক্তি বিকশিত করিতে পারে, ইতিহাস-অনুরাগী জনসমাজে সেই বিচাররীতি প্রচলিত করিতে চাহেন। তাঁহারা কুলগ্রন্থের উপর বীতরাগ নহেন, কুলশাস্ত্রের নামে প্রচারিত এই প্রকার উদ্ভট বচনের উপর বীতরাগ। কুলশাস্ত্রাভিজ্ঞ প্রবীণগণের নিকট নব্য সম্প্রদায়ের সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা হাতের পুথিগুলি যথারীতি প্রকাশ করিয়া, ঐগুলির বিচারের অবকাশ দিন। যদি হরিমিশ্রের গ্রন্থের বিচার করিলে, ইহার ভিতর এমন সকল তথ্য পাওয়া যায়, যাহা নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক, তবে তাহার ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবার কোনও অন্তরায় থাকিবে না।

৩। গত বৎসর বড়দিনের অবকাশে সাহিত্য-সভায় "আদিশূর" নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—

নগেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণডাঙ্গার ৺বংশী বিদ্যারত্নের বাড়ী হইতে যে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নকল করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা হইতে ১৩২১ সালে প্রকাশিত "রাজন্যকাণ্ড" নামক গ্রন্থে (১০০ পৃঃ) এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥"

অর্থাৎ, ৬৫৪ শাকে আদিশূর রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন; এবং ৬৬৮ শাকে ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি "ব্রাহ্মণকাণ্ড" নামক পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থে আদিশূরের সময় লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন; উক্ত ব্রাহ্মণডাঙ্গার পুস্তক হইতে "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ" উদ্ধৃত করিয়াছেন, অথচ "রাজন্যকাণ্ড"-ধৃত এই অত্যাবশ্যক বচনটি উদ্ধৃত করেন নাই কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন।—আমরা উক্ত বিদ্যারত্ন ঘটকের বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া যে পুথি সাহিত্য-সভায় উপস্থিত করিয়াছিলাম,

তাহাতে নগেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক "রাঢ়ীয় কুল-মঞ্জরী" হইতে উদ্ধৃত সকল বচন অবিকল দৃষ্ট হয়, কেবল তিনটি পংক্তি বিকল অবস্থায় দৃষ্ট হয়। নগেন্দ্রবাবু যেখান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ", সেই প্রসঙ্গে আমাদের পুথিতে আছে,—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর-সুতেন চ।" আমাদের পুথিতে "বসুকর্ম্মাঙ্গকে (৮৯৮) শাকে" আদিশূরের রাজ্যলাভ এবং "বেদবাণাঙ্ক (৯৫৪) শাকে" গৌড়ে ব্রাহ্মণ-আগমন কথিত হইয়াছে। এইরূপ পাঠান্তরের কারণ কি?

প্রথম প্রশ্নের কোনও উত্তরই এ-যাবৎ আমরা পাই নাই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নগেন্দ্রবাবু সাহিত্য-সভায় বলিয়াছেন, আমাদের সংগৃহীত পুথি এবং তিনি যে পুথি নকল করিয়া আনিয়াছেন, তাহা এক পুথি নয়, দুইখানি ভিন্ন পুথি। আমরা নগেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার নকল করা পুথিখানি আদ্যোপান্ত প্রকাশিত করুন।

রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কোন কোন কুলশাস্ত্রের কতকগুলি বচন কেন যে ফেলিয়া দিবার জিনিষ মনে করি, তাহার কৈফিয়ৎ দিলাম। নগেন্দ্রবাবুর ব্যবহৃত আরও কতকগুলি কুলশাস্ত্রের বচনের প্রতি আমরা বীতরাগ। দৃষ্টান্তস্বরূপ টালা-নিবাসী ৺ গুরুচরণ বিদ্যাসাগরের বাড়ী হইতে সংগৃহীত ঈশ্বর-কৃত "বৈদিক কুলপঞ্জিকা" হইতে তিনি যদুবংশীয় সামলবর্ম্মার যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন (রাজন্যকাণ্ড ২৯১ পৃঃ), তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাখালবাবু "বাঙ্গালার ইতিহাসে" (১৩৫—১৩৬ পৃঃ), এই বিষয়টি বিশেষ দক্ষতার সহিত খুব সংযত ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ সন্দেহজনক আর একখানি গ্রন্থ—বটুভট্টের "দেববংশ"। যে "ক্ষত্রপ" শব্দ কোনও সংস্কৃত অভিধানে বা আর কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই, এই গ্রন্থের আরম্ভেই সেই "ক্ষত্রপ" শব্দটি আছে। সন্দেহের আর যে সকল কারণ আছে, রাখালবাবু তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ("বাঙ্গালার ইতিহাস"—১৩০-১৩২ পৃঃ)। এই কয়েকখানি কুলগ্রন্থ হইতে প্রকাশিত কতিপয় বচনের প্রতি আমরা নির্ভর করিতে পারি না বলিয়াই, বাঙ্গালার মুষ্টিমেয় ইতিহাস-সেবকগণের মধ্যে একটা অনর্থক দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। পাঠকগণকে এই দলাদলিতে মধ্যস্থতা করিতে আহ্বান করিবার জন্য এই প্রবন্ধ উপস্থিত করিলাম।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

মার্কিনের জাপানী "ম্লেচ্ছ"

ইয়োরোপ ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ জাতিপুঞ্জ এসিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ ব্যবসায়, শিল্প ও কার্য্য দখল করিয়া বসিয়াছেন। সমগ্র প্রাচ্য জনপদে শ্বেতাঙ্গেরা মুখ্য ও গৌণ ভাবে প্রভুত্ব করিতেছেন। White Peril বা "শ্বেতাঙ্গ-বিভীষিকা" একটা কল্পনামাত্র নয়। এসিয়া ও আফ্রিকার জনগণ ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া থাকে।

আজকাল ইয়োরোপে ও আমেরিকায় ঠিক একটা উল্টা সুরের কথা শুনা যায়। প্রতীচ্য জনপদের শ্বেতাঙ্গেরা কেহ কৃষ্ণাঙ্গ-বিভীষিকা দেখিতেছে, কেহ পীতাঙ্গ-বিভীষিকা দেখিতেছে, কেহ মুসলমান-বিভীষিকা দেখিতেছে! শ্বেতাঙ্গদিগের পরস্পরের ভিতরেও আবার এইরূপ বিভীষিকা দেখার বৈচিত্র্য আছে! ইয়াঙ্কিস্থানের শ্বেতাঙ্গেরা ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গসমাজকে দূরে রাখিতে চাহে। ইহাদের এই শ্বেতাঙ্গ-বিভীষিকার সূত্র Monroe Doctrine (মেন্‌রো-নীতি)। মার্কিন-দেশীয় লোকের দ্বিতীয় বিভীষিকার নাম Yellow Peril বা পীতাঙ্গ-বিভীষিকা। পীতাঙ্গ জাপানের ক্রমিক উন্নতি দেখিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জাপানীদের অভ্যুদয়ে চীনের পীত-জাতি এবং সমগ্র এসিয়ায় লোক-সমাজ ক্রমেই নব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। কাজেই জাপানের উন্নতিতে বাধা দেওয়া মার্কিনের বিশেষ লক্ষ্য।

১৯১৩ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে যুক্ত রাষ্ট্রের "রেপ্রেজেণ্টেটিভ" গৃহে একজন সভ্য, ইয়াঙ্কিস্থানের পীতাঙ্গ-বিভীষিকা প্রচার করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিকট কল্পনা শ্বেতাঙ্গ-সমাজের মহলে মহলে সুপ্রচলিত। বিশেষত ইয়াঙ্কিদের ভিতর ইহা একপ্রকার বদ্ধমূল। ইয়াঙ্কি-সমাজে ইয়োরোপ বিভীষিকা যতটা আছে তাহার অপেক্ষা এসিয়া-বিভীষিকা অনেক বেশী। পীতাঙ্গ-বিভীষিকা, প্রাচ্য-বিভীষিকা ইত্যাদি শব্দে ইহারা মোটের উপর জগতে এসিয়ার প্রভুত্ব বিস্তার বুঝিয়া থাকে। এই প্রভুত্ব বিস্তারে জাপানীরাই পথ-প্রবর্ত্তক—জাপানকে নবীন এসিয়া তাহার জন্মদাতা ও দীক্ষাগুরু বলিয়া বিবেচনা করে। এই কারণে জাপানের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতই মার্কিণ দেশে প্রাচ্য-বিভীষিকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সোজাসুজি জাপানী-বিভীষিকা বলিলেই ইয়াঙ্কিদের মনের কথা যথাযথ বিবৃত হয়।

ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে আসিয়া দেখিতেছি—জাপানীদের প্রভাব মার্কিন দেশে নিতান্ত নগণ্য নয়। রেলে, দোকানে, বাজারে, রাস্তায়, হোটেলে, প্রদর্শনীতে সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই জাপানীরা ঘর জুড়িয়া বসিয়াছে। বিশ্ব-মেলার যে-কোন সৌধে প্রবেশ করিলেই জাপানের কীর্ত্তি দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া জাপানী বাগান, জাপানী হোটেল, জাপানী কুস্তী-কছ্‌রত, জাপানী নাচ-গান-বাজনা,



জাপানী চা-গৃহ

জাপানী যাদু ইত্যাদি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের বিশেষ অঙ্গস্বরূপ। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো সহরের বড় বড় মহাল্লার আগাগোড়া সবই জাপানী লোকজনে পরিপূর্ণ। জাপানী দোকান-হোটেলের বিজ্ঞাপনপত্র এবং নাম ও বিবরণ জাপানী ভাষাতেই প্রচারিত হইয়া থাকে! জাপানী ব্যবসাদারেরা প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের নানারূপ সচিত্র পোষ্টকার্ড এবং চিত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে। এইগুলিতে ইংরাজী বিবরণের সঙ্গেসঙ্গে জাপানী বিবরণ দেওয়া আছে। ফলত বুঝিতে পারিতেছি যে, মার্কিণের জাপানী-সমস্যা সত্যসত্যই গুরুতর।

ভারতবাসীরা যাহাদিগকে পছন্দ করে না তাহাদিগকে "ম্লেচ্ছ" বলিয়া থাকে। বর্জ্জনীয়, বহিষ্কারযোগ্য সকল বস্তুই হিন্দু-সমাজে ম্লেচ্ছ নামে পরিচিত। বর্জ্জনের কারণ যাহাই হউক না, ম্লেচ্ছ জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি সমস্তই অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। খৃষ্টানেরাও এইরূপ অখৃষ্টানদিগকে "হীদেন" (heathen) বলিয়াছে। ইহাদের বিবেচনায় হিদেনেরা, দুশ্চরিত্র, বুদ্ধিহীন, নীতিহীন, ধর্ম্মহীন ও অসভ্য। আজকাল Asiatic বা "এসিয়াবাসী" শব্দটা ইয়োরোপীয় ও আমেরিকানদিগের নিকট "হিদেন" শব্দেরই নামান্তর রূপে ব্যবহৃত হয়। ম্লেচ্ছ বলিলে হিন্দুরা যাহা বুঝে, কাফের বলিলে মুসলমানেরা যাহা বুঝে, "এসিয়াটিক" বলিলে প্রাচ্য-জগতের খৃষ্টান শ্বেতাঙ্গেরা ঠিক সেইরূপ বুঝে। অভিধানের ভিতর যতগুলি অকথ্য গালাগালি থাকিতে পারে, "এসিয়াটিক" শব্দে বর্ত্তমান যুগে ঠিক তাহা বুঝায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে চীনাদিগকে ইয়াঙ্কিস্থান হইতে ম্লেচ্ছজ্ঞানে বহিষ্কার করিবার আইন প্রস্তাবিত হয়। সেই উপলক্ষে যুক্ত দরবারের সভায় একজন সেনেটার বক্তৃতা করেন। তাহাতে "এসিয়াবাসী" শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি।

ম্লেচ্ছ চীনা, ম্লেচ্ছ জাপানী, ম্লেচ্ছ হিন্দুস্থানী, সকলকেই ইয়াঙ্কিস্থান হইতে বহিষ্কার করা আবশ্যক। ইহা মার্কিন দেশের দ্বিতীয় মনুরো-নীতি।

চীনেরা বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বিদেশীয়গণকে স্বদেশের বাহিরে রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ম্লেচ্ছদেশের সঙ্গে ভারতবাসীর আদান-প্রদান অবরুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। ইয়াঙ্কিরাও এইরূপ বিদেশীয় বর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। দুনিয়ার প্রত্যেক দেশেই একটা করিয়া "চীনের প্রাচীর" দেখা যায়। সকল জাতিই প্রায় একই ধরণের যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিদেশীয়-গণের সঙ্গে স্বদেশীয় লোকজনের সংশ্রব বন্ধ করিতে চাহে। আজকাল ইয়াঙ্কিরা যে-সকল যুক্তি দেখাইতেছে, প্রাচীন কালে চীনেরা সেই যুক্তিই দেখাইত, মধ্য যুগে হিন্দুরাও ঠিক সেই যুক্তিই দেখাইত।

ইয়াঙ্কি-মতে জাপানীরা ধর্ম্মজ্ঞানহীন দুশ্চরিত্র জাতি। ইহাদের সমাজে পারি-বারিক বন্ধন অতিশয় শিথিল। ইহাদের কথার কোন মূল্য নাই। ইহাদের সঙ্গে লেন-দেন করা বড় কঠিন।

জাপানী-সমাজে নাকি বারবনিতার সংখ্যা অতিশয় অধিক। জুয়াখেলায় আসক্তিও জাপানীদের একটা বিশেষ দোষ।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আজকাল প্রায় ৭৫,০০০ হাজার জাপানী বাস করে। ইহাদের অধি-কাংশই ক্যালিফর্ণিয়ার অধিবাসী। জাপানী ছাত্র, অধ্যাপক, পর্য্যটক, প্রচারক, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইত্যাদি লোকের সংখ্যা বেশী নয়। ক্যালিফর্ণিয়ার শতকরা প্রায় ৯৫ জন জাপানী হয় কৃষক, না-হয় মজুর, না-হয় দাস-দাসী। এইখানেই ইয়াঙ্কিদের সঙ্গে জাপানীর বিশেষ বিরোধ।

মার্কিনের নরনারীগণ বলে যে, জাপানীরা নিতান্ত অল্পবেতনে কর্ম্মগ্রহণ করে। ইহারা অনাহার সহ্য করিয়াও কর্ম্ম করিতে পারে। দিনের ভিতর বহু ঘণ্টা খাটিবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই সকল কারণে শ্বেতাঙ্গেরা ইহাদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় জয়ী হইতে অপারগ। তাহার ফলে আমেরিকার লোক-জনের আর্থিক অবস্থা হীন হইবার সম্ভাবনা এবং বৈষয়িক ও সাংসারিক আদর্শেরও অবনতি ঘটিতে বাধ্য। ইহা নিবারণ করিবার জন্য জাপানী বহিষ্কার-নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

জাপানীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জানে না বলিয়া একটা অপবাদ মার্কিন-সমাজে রটিয়াছে। ইহারা একবার যে গৃহে বাস করে সেই গৃহে ভবিষ্যতে কোন শ্বেতাঙ্গ আসিতে চাহে না। এমন-কি সেই মহাল্লা হইতেও শ্বেতাঙ্গেরা সরিয়া পড়ে। কালে পাড়াটা খাঁটি জাপানীটোলায় পরিণত হয়। ইহা আমেরিকার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

জাপানী কৃষকদিগের একটা দোষ সর্ব্বত্র প্রচারিত। ইহারা নাকি ভূমি-কর্ষণ সম্বন্ধে

প্রথম প্রথম বড় অমনোযোগী থাকে। তাহার ফলে ভূমির উৎপাদনী শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা ভূমি বেচিয়া ফেলে। তখন জাপানীরা ইহা ক্রয় করিয়া লয় এবং মনোযোগের সহিত ভূমির উন্নতিবিধান করে।

ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্র স্যাক্রামেণ্টো নগরে। ইহার অতি সন্নিকটে ফ্লোরিণ নগর। কৃষিকার্য্যের জন্য এই অঞ্চল সুবিখ্যাত। এখানে জাপানীদের সংখ্যাও খুব বেশী। জাপানী-বিদ্বেষও এই অঞ্চলে অতি ঘোরতর আকারে দেখা দিয়াছে।

পরজাতি-বিদ্বেষ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিবার জন্য ইয়াঙ্কিস্থানের ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে আসা আবশ্যক। ইয়াঙ্কিদের নিগ্রো-বিদ্বেষও বোধ হয় এতটা তীব্র নয়।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মহর্ষির কথা

একবার যখন মহর্ষিদেব একাকী বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন, তখন আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দ মোহন বসু ও আমি পরামর্শ করিলাম যে মহর্ষিদেবকে সংবাদ না দিয়া শান্তি নিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইব। তদনুসারে একদিন প্রাতঃকালের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১০টার পরে শান্তি নিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চাকরের হাতে আমাদের নাম উপরে প্রেরণ করিলে দেখিতে পাইলাম যে মহর্ষি সিঁড়ির উপরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদিগকে উপরে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আমরা উপরে উঠিলে বলিলেন—"আমি খেতে যাচ্ছি, এস তোমরাও আমার সঙ্গে খেতে বসো।" আমি বলিলাম—"খাবার ত একজনের মত হয়েছে, আপনি আহার করুন, আমরা একটু অপেক্ষা করি, পরে খাব।" শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—"তোমরা কি মনে কর একজনের মতই খাবার প্রস্তুত হয়েছে? এস না, বসে দেখ না, কিছুরই অভাব হবে না।" আমরা গিয়া তাঁর সঙ্গে আহারে বসিলাম। তিন জনে বেশ আহার চলিল, কিছুরই অভাব হইল না। পরে ভৃত্যদের মুখে শুনিলাম যে, কে কখন আসে তাহা স্থির না থাকাতে প্রতিদিনই দুই একজনের মত অধিক রান্না হয়।

আহারান্তে মহর্ষি মুখ হাত ধুইতেছেন; ইতিমধ্যে আমরা দুজনে তাঁর বসিবার ঘরে গেলাম। গিয়াই দেখি যে ভূতত্ত্ব-বিদ্যা বিষয়ে একখানি নব-প্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহার টেবিলের উপরে রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থখানির প্রশংসা আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম। গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দ মোহন বাবু বলিলেন—এই বইখানার অনেক প্রশংসা কাগজে পড়েছি, মহর্ষি কি

এখানা আনায়ে পড়ছেন?" আমি বলিলাম —তাই ত মনে হয় কারণ বৈএর ভিতর হাড়ের কাগজ-কাটা রয়েছে, দেখলে মনে হয় কাটছেন ও পড়ছেন।" ইতিমধ্যে মহর্ষি আসিয়া উপস্থিত; সে বৈখানা আনন্দ-মোহন বাবুর হাতে দেখিয়া বলিলেন—"কি আনন্দমোহন, বৈখানা কি আগে দেখেছ?"

আনন্দমোহন।—না দেখিনি, তবে কাগজে অনেক প্রশংসা শুনেছি। এখানা কি আপনি পড়ছেন?

মহর্ষি। হাঁ, আমিও প্রশংসা শুনে আনিয়ে পড়ছি।

আনন্দমোহন। (বিস্ময়াবিষ্টভাবে) আপনি Geology পড়ছেন?

মহর্ষি। (হাসিয়া) সে কি আনন্দ-মোহন অমন করে জিজ্ঞাসা করছ যে! Geology কি অপাঠ্য? তোমরা কি জান না Geology আমার বহুদিনের পাঠ্য বিষয়; Geology বিষয়ে আমি একটা authority বল্‌লে হয়; বহু বৎসর পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরেছি ও Geology অনুশীলন করেছি।"

মহর্ষি যখন তাঁর পর্ব্বত ভ্রমণের ও Geology পাঠের কথা বলিতেছেন তখন আমি আনন্দমোহন বাবুর কানে কানে বলিলাম,—"আপনি কি মহর্ষির কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর "পৃথিবী" নামক গ্রন্থের ভূমিকা পড়েন নাই? তাতে দেখবেন স্বর্ণ কুমারী বলেছেন যে মহর্ষির ক্রোড়ে বসেই তিনি ভূতত্ত্ব-বিদ্যাকে ভালবাসতে শিখেছেন।"

ইত্যবসরে মহর্ষি হাসিয়া আনন্দমোহন বাবুকে বলিলেন, "কথাটা কি বুঝলে না? আমার যাবার সময় হচ্চে কি না; তাই মনের জাহাজে যত মাল বোঝাই নিতে পারি তার চেষ্টা করছি।"

মহর্ষির সেই হাসি ও সেই উক্তি কখনো আমি ভুলিব না। এই বার্দ্ধক্যে সেই মনের জাহাজ-বোঝাইয়ের কথা মনে হয় এবং আমাকে জ্ঞানালোচনাতে উৎসাহিত করে।

পরে রাত্রিকালের আহারের পর আমরা মহর্ষির বসিবার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত নানা আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কথা কহিতে কহিতে রাত্রি যখন সাড়ে নয়টা বাজিল তখন মহর্ষি আমাদিগকে বলিলেন— "আমি এখন একলা থাকব, তোমরা গিয়ে শয়ন কর।" আমরা নামিয়া আসিলাম, এবং শয়নগৃহে শয্যাতে গিয়া নানা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল, আমরা শুনিতেছি যে উপরকার বারাণ্ডায় মহর্ষি বেড়াইতেছেন। শুনিতে শুনিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি তিনটার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, চাহিয়া দেখি সেই পূর্ণিমার রাত্রে শান্তি-নিকেতনের বাগান মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছে। বাগানে বেড়াইবার জন্য আমি আনন্দমোহন বাবুকে জাগাইয়া তুলিলাম। বলিলাম, "উঠুন উঠুন, চলুন একবার পূর্ণিমার রাত্রে বাগানে বেড়াই।"

আমরা দুজনে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, মহর্ষিদেব তখনও উপরের বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন। আমি আনন্দ মোহন বাবুকে বলিলাম, "মহর্ষির ধ্যান-পরায়ণতার বিষয়ে যে শুনিয়াছেন, ঐ

তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখুন। এই পূর্ণিমার রাত্রে আনন্দ-সাগরে মগ্ন আছেন।”

একবার মহর্ষিদেব দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে বাস করিতেছিলেন। তখন আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে যাইতাম। একদিন আমি গিয়া বসিয়াছি, মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি গতবারের ‘ভারতী’ পড়েছ ?” আমি বলিলাম—“না, এখনও পড়িনি”। তখন মহর্ষি তাঁহার টেবিল হইতে একখানা “ভারতী” তুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—“এই দেখ গত বারের ভারতী।” আমি পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখি, মহর্ষি প্রবন্ধগুলির পাশে পাশে নিজের হাতে নিজের অভিপ্রায় লিখিয়াছেন। স্বর্ণকুমারীর লিখিত একটি প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, “স্বর্ণ, তোমার হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক।” কোনও প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, “বালকের ন্যায় যুক্তি”। কোনও প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, “রুচি-সঙ্গত নহে” ইত্যাদি। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে নিজ পরিবারের ব্যক্তিদের প্রবন্ধ বিষয়েই এরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বলিলেন—“আমার কাছে দুখানা ‘ভারতী’ আছে—একখানা আমার কাছে রাখি; আর একখানাতে আমার পরিবারের লোকদের লেখা সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করে ফেরত পাঠাই; সেখানা তাদের কাছে পাঠান হয়।” আমি বলিলাম, “ওঃ, আমি এতদিনের পর বুঝতে পারলাম কেন আপনার সন্তানেরা সাহিত্য চর্চ্চাতে দেশের অগ্রণী,—আপনি তার মূলে। স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার পশ্চাতে যে আপনি তা বুঝতে পারছি। “স্বর্ণ! তোমার হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক” যে বলেছেন, এ কি সামান্য কথা।” শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—“স্বর্ণের লেখা ত তুমি পড়েছ, তার লেখার শক্তি দেখে তোমার কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না?”

আমি বলিলাম, “তাতে সন্দেহ কি? তাঁর প্রতিভা দেখে আমিও চমৎকৃত!”

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

স্বেচ্ছাচারী

(উপন্যাস)

প্রথম অধ্যায়

১

পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হওয়া অনেক রকমেই অপ্রার্থনীয়। বাপ-মা এবং ছেলে—উভয়ের পক্ষ হইতেই এ কথা বলা চলে। কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্মের মাসছয়েক পরে অন্নপ্রাশনের সময় পিতা-মাতার মধ্যে তাহার নাম-করণ লইয়াই মস্ত একটা মতভেদ ঘটিয়া গেল। পিতা নাম রাখিলেন, হরিদাস; মাতা রাখিলেন, কার্ত্তিকচন্দ্র।

এবং কালক্রমে তাহার মাতার জোর-জবরদস্তি ও কান্নাকাটিতে পুত্রের কার্ত্তিকচন্দ্র নামই বাহাল রহিয়া গেল। পিতা যদিও আপনার পিতৃ-সত্ত্ব জাহির করিবার জন্য পুত্রকে মাঝে মাঝে হরিদাস বলিয়াই ডাকিতেন, তথাপি কোন দিক হইতে কোনরূপ সাড়া না পাইয়া তিনিও শেষে বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার মাতৃদত্ত নামেই ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

বিরোধের মধ্যেই যাহার জন্ম, তাহার পুষ্টিও সেই বিরোধের মধ্যেই হইতে লাগিল। কার্ত্তিকের মাতার উক্ত নাম রাখিবার. নানা প্রকার কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে কার্ত্তিকচন্দ্র দেখিতে ঠিক কার্ত্তিকেরই মত। অথচ এই পুত্রের নাম রাখা হইবে কি না, হরিদাস! হরে! ছি, ও যে চাকর-বাকরদের নাম! কার্ত্তিক কি বাবুদের বাড়ী তামাক সাজিবে, না, ভাত রাঁধিবে যে তাহাকে হরি নামে ডাকিতে হইবে? ছি, কার্ত্তিকের বাপের কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই! যে ছেলে পরে হাকিম-সদরালা হইবে, তাহার নাম হইবে কি না, হরিদাস! বামুন যেন কি!

কার্ত্তিকের পিতা শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন একজন সৎকুলীন অথচ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গ্রামের জমিদার মুখোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর পৈতৃক টোলের বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরের উপর নির্ভর করিয়া এবং দুই-এক ঘর শিষ্য-সেবকের বার্ষিকের আয়ে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পূজা-পাঠেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া থাকে। তথাপি তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য গ্রাম্য এণ্ট্রান্স্ স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া না দিয়া স্বয়ংই তাহার অধ্যয়নাদির ভার লইলেন। ইহাও কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতার সহিত তাঁহার মতদ্বৈধের আর একটি কারণ।

এইরূপ বিরোধের মধ্যে যাহার জন্ম ও বৃদ্ধি, বুদ্ধিও যে তাহার প্রথম হইতেই একটু 'বিরোধী' রকমের হইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেইজন্য কার্ত্তিকচন্দ্রের প্রকৃতিতে প্রথম হইতেই কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী গুণের বিকাশ দেখা দিল। সে তাহার পিতার টোলের ছাত্রদের সহিত সযত্নে ও তীক্ষ্ণ মেধার সহিত অধ্যয়নাদি করিত বটে, তথাপি সে তাহাদের দলে প্রথম হইতেই একটি মূর্ত্তিমান বিপ্লবের ন্যায় বিরাজিত ছিল। কিন্তু তাহার মুখের পরম গম্ভীর ভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শাসন করিতেও পারিত না। উপরন্তু অধ্যাপকের একমাত্র সন্তান বলিয়া সে অনেক গুরুতর অপরাধ করিয়াও মার্জ্জনা পাইত। বিশেষতঃ তাহার মাতাঠাকুরাণীর ভয়ে ছাত্রদিগকে কার্ত্তিকের বিষয়ে অনেকখানি সঙ্কুচিত থাকিতে হইত।

টোলের ছাত্র সর্ব্বানন্দের ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষার সময় অতি সন্নিকট। সে রাত্রি জাগিয়া ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছে এবং অনেক রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়া প্রত্যূষে উঠিয়াই তাহার ব্যাকরণখানির জন্য হাতড়াইতেছে,—ইচ্ছা, প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আসিয়াই পড়িতে বসিবে। কিন্তু দেখা গেল, তাহার মাথার শিয়রের পুস্তকরাশি বিপর্য্যস্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত;

সর্ব্বোপরি সেই অতি-যত্নের মুগ্ধবোধখানি যে কোথায় গিয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

কে করিল? কে করিল? আর কে?— কার্ত্তিকচন্দ্র। কিন্তু সে কোথায়, তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পিতা বিরক্ত হইয়া বিস্তর অনুসন্ধানে তাহাকে নিতাই ঘোষের দাওয়া হইতে ধরিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন, তুমি এ কাজ করলে?" কার্ত্তিকচন্দ্র পরম গম্ভীরভাবে বলিল, "সারা রাত্রি পড়ে সর্ব্ব দাদার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, পরীক্ষায় ফেল হবে, তাই ওর বইখানা সরিয়ে রেখেছি।" পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "শীঘ্র এনে দাও! আর যদি এ রকম কর, তা হলে তোমায় বিশেষ শাস্তি দেব।" কার্ত্তিকচন্দ্র নির্ব্বিকার চিত্তে সর্ব্বানন্দেরই একটা ভাঙ্গা বাক্স হইতে সেই প্রার্থিত পুস্তকখানি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "সর্ব্বদাদা, সারাদিন গ্যাজর-গ্যাজর করো না, বলছি, আমার শুদ্ধ মাথা খারাপ হয়ে যাবে।" সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তুমিও যখন পরীক্ষা দিতে যাবে, তখন এমনি করেই গ্যাজর গ্যাজর করবে।" কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞা-ভরে একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য যে শীতকালেই গরম জামা-কাপড় গায়ে দিতে হয়, কিন্তু আমাদের কার্ত্তিকের নিকট সে সত্য একেবারে বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায়ই মিথ্যা। বৈশাখের রৌদ্রে সকলে যখন ঘামিয়া অস্থির হইতেছে, তখনই তাহার প্রাতর্ভ্রমণের সময়। সে মধ্যাহ্নে আহারাদি সারিয়া মাতুলালয় হইতে প্রাপ্ত লাল মোজা ও গরম কোটে শোভিত হইয়া ছত্রহীন মস্তকে ঐ সময় সমস্ত গ্রামটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। কেহ আপত্তি করিলে সে বলে, "সবাই যা করবে, তাই যে করতে হবে, এর কি মানে? সব জিনিষেরই যখন দুটো দিক আছে, তখন সব কাজেরই বা দুটো দিক না থাকবে কেন?" সে যে একজন নৈয়ায়িকের পুত্র, এ কথা নানাপ্রকারে প্রমাণ করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র এই অল্পবয়সেই ন্যায়ের মূর্ত্তিমান ফক্কিকার-স্বরূপ ঘুরিয়া বেড়াইত। এবং তাহার অকালপক্ক মুখের নিকট কাহারও কোনরূপ আপত্তি টিঁকিত না বলিয়া তাহার মাতা মনোরমা ঠাকুরাণী প্রতিবেশিনীদিগকে মাঝে মাঝে গর্ব্বিত হাস্যে বলিতেন, "বামুন আমার এমন ছেলেকে টোলে ভর্ত্তি করতে চায়!" তাঁহার কথায় কেহ যদি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কিছু বলিত, অমনি তিনি বলিতেন, "ছেলে যদি আমার বাঁচে, তাহলে ও নিশ্চয় একটা হাকিম টাকিম হবেই। তবে যে ওর শরীর!" অবশ্য কার্ত্তিকচন্দ্রের ভগ্ন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীদিগের সহিত হয়ত তাহার মাতার আন্তরিক অমিল থাকিতে পারে,—কারণ, কার্ত্তিকচন্দ্রের দিব্য নধর গৌর কান্তি,—তথাপি মনোরমা দেবীর মুখের সম্মুখে সকলেই তাঁহার কথায় সায় দিয়া যাইত।

কার্ত্তিকচন্দ্রের এইরূপ বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা বিশেষ দোষ ছিল এই যে সে পড়াশুনায় অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। ইহারই মধ্যে সে ব্যাকরণ ও কাব্যে তাহার পিতার অনেক বর্ষীয়ান ছাত্রকেও

পরাস্ত করিতেছিল; এবং ন্যায় শাস্ত্রেরও দুই-একটা বুকনি তাহার অবিদিত ছিল না।

অপরাহ্ণে দেবায়তনের নাট মন্দিরে বসিয়া অধ্যাপক শিবচন্দ্র তাঁহার কতকগুলি ছাত্রের সহিত ন্যায়ের "অভাব" বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। একজন বুদ্ধিমান ছাত্র, নাম ব্রহ্মপদ, অধ্যাপকের সহিত ঐ বিষয়ে মৃদুভাবে তর্ক করিতেছিল। নিকটে বসিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র একটী পারাবতের পদদেশে ঘুঙ্‌র ও গলদেশে বিচিত্র বর্ণের ফিতা জড়াইতে ব্যস্ত ছিল। অধ্যাপক যখন ছাত্রের তর্কে কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় কার্ত্তিকচন্দ্র হঠাৎ পারাবতটীকে তুলিয়া লইয়া একেবারে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যস্থলে ফেলিয়া দিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে ফিরিবামাত্র সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনি অভাব বস্তু বোঝাতে পারছেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্রহ্মদাদা, তোমার বুদ্ধি নেই। এই অভাব বস্তুর দরুণই তুমি বুঝতে পারছ না। অতএব অভাব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর কি না? এই দেখ, এই রঙ্গু (পক্ষীটীর নাম) কেমন অভাব বস্তু বোঝে। ও বেশ বুঝেছিল যে ওর পায়ে ঘুঙ্‌রের অভাব আছে, তাই এতক্ষণ চুপ করে তাই পরছিল, তোমার মত তর্ক করেনি। কিন্তু তুমি এমনি বোকা, তোমার বুদ্ধি নেই, এই অভাব বস্তুটা পর্য্যন্তও তুমি জান না।"

ছাত্রেরা অনেকে মুখ ফিরাইয়া হাস্য সম্বরণের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রহ্মপদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ন্যায়রত্ন মশায়, চিরদিন কি আমাদের এইরকম অত্যাচার সইতে হবে?" অধ্যাপক স্বয়ংও বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের এই অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া তিনিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রহ্মপদ ক্রুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কার্ত্তিকচন্দ্র তখন তাহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এঃ, তোমায় অভাব বস্তুতেই পেয়ে বসেছে—বুদ্ধির অভাবের সঙ্গে হাসিরও অভাব হয়েছে—হাসতে পর্য্যন্ত ভুলে গেছ! ছি!"

কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিতে হাসিতে পারাবতটীকে লইয়া প্রস্থান করিল। অধ্যাপক তখন নানা কথায় ছাত্রকে শান্ত করিয়া পুনরায় অধ্যাপনায় মন দিলেন।

২

শিবরামপুরের কালিকামোহন মুখোপাধ্যায়ের বয়স যাহাই হউক, তাঁহার গুরু গম্ভীর চাল-চলনের জন্য কেহই তাঁহার বয়স অনুমান করিতে সাহস করিত না। বনিয়াদী জমিদারী চালের সমস্ত খুঁটিনাটিই সযত্নে তিনি পালন করিয়া চলিতেন। প্রাতঃকৃত্য-সমাপনের সময় সেই যেমন বহু বৎসর পূর্ব্বেও জলচৌকিতে বসিয়াই পাইকদের ডাকিয়া নিকটে আনিতেন, আজও তাঁহার সে চালের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সেই বেলা দেড়টার পর কাছারি হইতে উঠিয়া দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় আহারে উপবেশন আজিও অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। নিদ্রার সময়, উদ্যান পরিদর্শনের সময়, ...

সেই হল্‌দে রঙের মোটা লাঠিটি লইয়া ভ্রমণের সময়—এ সব কিছুরই একচুল নড়চড় হয় নাই। এমন কি কেহ কেহ বলে, বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর প্রথম পুণ্যাহের দিনে যে বস্ত্রখানি যে-ভাবে পরিধান করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ বস্ত্র সেই ভাবে সেই তাঁতিদের নিকট হইতেই ক্রয় করিয়া পরিধান করিয়া থাকেন। অধিক কি, এই চাল বজায় রাখিবার জন্য তিনি সহরাদিতে গমনাগমনও একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার ভয়ে ব্যাঘ্র ও ছাগশিশু একত্র জলপান করিত কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবে অনেক নরব্যাঘ্র অর্থাৎ ভোজপুরী পাহালবানকে তিনি পুষিতেন; এবং বহু দরিদ্র আত্মীয়-অনাত্মীয় শ্রেণীর লোক তাঁহার আশ্রয়ে পালিত হইত। তাঁহার প্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা বহু লোক-লস্কর ও জীব-জন্তুর কলরবে মুখরিত থাকিত। অশ্ব-শালায় অশ্ব, গোশালায় গাভী, অতিথিশালায় অতিথি, স্তম্ভের শিখরে পারাবত, কড়ি বরগার ফুকরে ফুকরে চড়ুই তালচঞ্চু,—পাকশালায় পাচকের কলরব, দাস-দাসী-গণের বচসা, অন্তঃপুরে বিধবার দল—তাঁহার সংসারে কিছুরই অভাব ছিল না। তথাপি কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেন যে কালিকাবাবু পুত্র-সন্তান-অভাবে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ছিলেন। অবশ্য এ কথা বাহিরের কেহ বুঝিতে পারিত না। কারণ কালিকাবাবুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী অন্ততঃ বাহ্যতঃ তাঁহার পুত্রের অভাব পূর্ণ করিয়া, বরং তাহার অধিক হইয়াই, বিরাজ করিতেছিলেন।

এই শৈলজাসুন্দরী যখন মাত্র দেড় বৎসরের, তখনি ইহাঁর নামে একটী বড় মৌজা ক্রয় করা হয় এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বহু পত্তনি, দরপত্তনি, সেপত্তনি মাহাল পিতা ইহার নামে ক্রয় করিয়াছেন। এমন কি ইহার সমস্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক সেরেস্তা গোমস্তা কারকুন পাইক নিযুক্ত করিয়া কালিকামোহন স্বয়ং "গার্জ্জেন" নাম স্বাক্ষর করতঃ ইহার বিষয়-কর্ম্ম চালাইতেছিলেন। কন্যার নামে পৃথক "বিষয়-আশয়" করা তাঁহার অপত্য স্নেহের যতখানি নিদর্শন, তদপেক্ষা শিশু কন্যাকে ইতিমধ্যেই জমিদারী করিয়া দেওয়ার একটা অহঙ্কারকেই বিশেষভাবে প্রকাশিত করিয়াছিল। শৈলজাসুন্দরী যদিও এখনও অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করেন নাই, তথাপি ইহারই মধ্যে তাঁহার নাম বড় বড় মকদ্দমায় বাদী অথবা প্রতিবাদীরূপে জগৎ সমক্ষে প্রচারিত হইতেছিল। এমন কি ইহাঁর নামীয় একটা মকদ্দমা প্রিভি কাউনসিল পর্য্যন্ত গিয়া একটী "লিডিং" কেসের মূর্ত্তিতে বর্জ্জয়েস অক্ষরে I. L. R. এর অঙ্ক শোভিত করিয়াছে। যদিও উক্ত শৈলজাসুন্দরী উক্ত মকদ্দমায় পরাজিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার পিতার পিতৃপিতামহগণের প্রসিদ্ধ নামকে সুদূর শ্বেতদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া কালিকা-বাবুর জমিদারীর প্রজাগণের হৃদয়ে জলাতঙ্কের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। এরূপ কন্যার

পিতা হইয়া কালিকাবাবু আপনাকে ধন্যই মনে করিতেছিলেন।

এহেন কন্যার বিবাহ দিতে হইলে অনেক চিন্তা, অনেকখানি সতর্কতার প্রয়োজন, শৈলজাসুন্দরীর পিতাও এ কথা বিশেষভাবে বুঝিতেন। অবশ্য এরূপ অবস্থায় সম্বন্ধ বা প্রস্তাবের অভাব কখনই হইতে পারে না, কারণ শৈলজা ধনী পিতার ধনী সন্তান। বহু দিক হইতে নানা প্রকার প্রার্থনীয়-অপ্রার্থনীয় সম্বন্ধ ইতিমধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। কিন্তু পিতা কালিকা-মোহনের এ পর্য্যন্ত কোনটিই মনঃপূত হয় নাই। কালিকামোহনের বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা আছেন; এবং তিনিই গৌরী-দানে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে এখনও ৺ কাশীধামে যাইয়া বাস করিতে পারেন নাই। তবে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে গৌরী ত দূরের কথা, কন্যকা-দানও সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছে।

শৈলজার বিবাহ-বিষয়ে ইনিও ইঁহার পুত্রের চিন্তার অংশ-ভাগিনী হইয়াছিলেন। কারণ বিবাহ দিয়া এই একমাত্র কন্যাকে একেবারে পর করিয়া দিতে কালিকামোহনও যেমন অনিচ্ছুক, তাঁহার মাতা জগদম্বা দেবীও তদ্রূপ। কিন্তু শৈলজাসুন্দরীর মাতা অর্থাৎ জমিদারী সেরেস্তায় যাঁহার নাম "বৌরাণী" লেখা হইয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ ছিল বলিয়াই প্রকাশ। শুনা যায়, তিনি না কি ঘরজামাই করার একান্ত বিরোধী। তিনি তাঁহার কোন কোন অন্তরঙ্গের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি বিবাহই দিতে হয়, তাহা হইলে একেবারে দান করিয়া ফেলাই উচিত। কন্যার পরিবর্ত্তে একটী পুত্র লাভ করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ তাহাতে কন্যাই স্বামীর স্থান অধিকার করিয়া দাম্পত্য জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়া ফেলে। স্ত্রীলোক যদি একেবারে স্বামীতে মিশিয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যই নিষ্ফল হইয়া যায়। অবশ্য তাঁহার মত যে গৃহের বধূর মত বলিয়াই যথাবিধি উপেক্ষিত হইয়াছিল, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

একমাত্র কন্যার উপর যে মাতার এতখানি স্নেহ-হীনতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই মাতা যে তাঁহার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী ও স্বামী মহাশয়ের নিকট ইহার জন্য কিঞ্চিৎ লাঞ্ছিত হইবেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; তথাপি ইঁহার দুর্বুদ্ধি যে ইনি স্বীয় মতের এক চুলও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। স্ত্রী-বুদ্ধি (অর্থাৎ পত্নীর বুদ্ধি) চিরদিনই প্রলয়ঙ্করী! শাস্ত্র কি মিথ্যা হয়!

জমিদার মহারাজ ও তাঁহার মাতা এইভাবে চিন্তাযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময় একদিন কালিকা-মোহনের দৃষ্টি অকস্মাৎ কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল।

কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার মধ্যাহ্ন-ভ্রমণের সময় কখনও কখনও জমিদারী কাছারী, এমন কি জমিদারী প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত শুভাগমন করিত। তাহার অদ্ভুত

চাল-চলন ও বেশভূষা সদর গোমস্তা হইতে পাইক দরোয়ান ঝাড়ুদার ফরাশ পর্য্যন্ত সকলের নিকটই পরিচিত ছিল; এমন কি অন্তঃপুরের দাস-দাসী, পাচিকা ও অন্যান্য "দীনাঃসমাশ্রিতা" বিধবাগণের নিকটও সে ন্যায়রত্ন মহাশয়ে পুত্র-রত্ন বলিয়া সমাদৃত, পরিচিত এবং সর্ব্বদোষে উপেক্ষিত হইত। তবে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সে বাবু মহারাজ অথবা তাঁহার মাতা "বুড়ী রাণীমার" মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু জমিদারী কাছারীর দালানের পারাবত-কুলের সহিত ইহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতম ছিল। এবং সেই সামান্য কারণ হইতে সহসা কার্ত্তিকচন্দ্র একদিন "বাবু মহারাজের" রাজকীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

স্থান জমিদারী কাছারীর সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড নাটমন্দির—অর্থাৎ যেখানে নানা উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ সার্দ্ধ দ্বাবিংশবার যাত্রা, নাচ, গান হইয়া থাকে। কাল মধ্যাহ্ন; এবং পাত্র আমাদের কার্ত্তিকচন্দ্র ও কতকগুলি বাগ্দী, চাঁড়াল প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোক। উপলক্ষ দ্বিবিধ,—কার্ত্তিকচন্দ্রের পক্ষে "মুক্ষি" নামক এক প্রকার পারাবত-বংশের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের বংশধরগণের দুই-একটীকে পিনাল কোডের এব্ডাক্সন ধারানুযায়ী কার্য্যের দ্বারা বে-আইনি স্থানান্তর-করণ, এবং বাগ্দীগণের পক্ষে জমিদার মহারাজের নিকট হইতে পথ-করের দায় হইতে মুক্তি লাভ করা।

কার্ত্তিকচন্দ্র একজন উক্ত শ্রেণীর লোককে আদেশ করিল, "রামু, এই মৈখানা চেপে ধর ত, আমি উঠব।"

রামু ওরফে রামা বাগ্দী ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, বাবু মহারাজের সামনে কেমন করে এ কাজ করব?"

কার্ত্তিকচন্দ্র একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে কাছারীর কক্ষের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেউ কিছু বলবে না, তুমি ধর।"

রামু তখন কাতর হইয়া বলিল, "দাদা-ঠাকুর, আমরা দরবার করতে এসেছি, এখন যদি দেওয়ানজী কোন কারণে বিরক্ত হন, তা হলেই সর্ব্বনাশ!"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "দরবার! সে আবার কি? দরবার ত' নবাব-বাদশারা করতেন, তোমরা তা কি করে করবে?"

রামু কহিল, "আজ্ঞে, মিছিমিছি আমাদের ওপর পথ-কর চাপানো হয়েছে, সেই কথা মহারাজের কাছে নিবেদন পেতে এসেছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা করলে কি হবে?"

এই প্রশ্নে সেই বিষণ্ণ জোড়-হস্ত ব্যক্তিগণের মুখেও একটা অস্ফুট হাসির রেখা দেখা দিল। রামু ভাবিল, এই কার্ত্তিকচন্দ্রকে দিয়াই হয়ত তাহাদের এ বিষয়ে কিছু উপকার হইতে পারে। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের ন্যায় রামচন্দ্র ইহাকেই অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, আপনি যদি আমাদের হয়ে দু'কথা বলে দাও, তাহলে আমি নিজেই কবিতোর ধরে দেব।"

কার্ত্তিক কহিল, "কাকে কি বল্‌তে হবে, বল, আমি এখনই বলছি।"

রামু কহিল, "দেওয়ানজীকে আর মহারাজকে বলতে হবে—"

কার্ত্তিক কহিল, "মহারাজ! সে আবার কে?"

রামু কহিল, "আজ্ঞে, বাবু মহারাজ—"

কার্ত্তিক কহিল, "ওঃ, বুঝেছি। আচ্ছা, কি বলতে হবে?"

রামু কহিল, "বলবেন যে এরা গরীব, এদের উপর আবার পথ-কর বসানো কেন? আমাদের যে চাকরান জমি আছে, তার জন্য ত আমরা তাঁবেদার হামেহাল হাজির আছি। রাত-বিরেত মানিনে, যখনই ডাক পড়ে, হুজুরে হাজির হয়ে কাজ করে দি। এর ওপরও যদি আবার খাজনা দিতে হয়, তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা? এই সব কথা একটু গুছিয়ে কাকুতি মিনতি করে যদি বলতে পার, তাহলে দাদাঠাকুর, আমরা আপনার কেনা হয়ে থাকব।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যেখানে শিবরামপুরের জমিদার কালিকা-মোহন ও তাঁহার প্রবল-প্রতাপ দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর বসিয়া কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন, একেবারে সেইখানে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "আপনার কাগজপত্র রাখুন, দেওয়ানজী, আপনি রামু বাগ্দীদের খাজনা মাপ করে দিন। ওরা গরীব, ওরা খাজনা দেবে কোথা থেকে?"

হঠাৎ জমিদারী কাছারির মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি থামিয়া গেল। যুগপৎ সকলেরই দৃষ্টি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল। দেওয়ান মহাশয়ের চক্ষু তাঁহার চশমার উপর দিয়া তেজ উদ্‌গীরণ করিয়া এই নির্ভীক বালকের উপর স্থাপিত হইল। দেওয়ানজী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি বলছ, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি বলছি, কেন আপনারা এই গরীব রামুদের ওপর অত্যাচার করছেন? আমি ওদের অবস্থা জানি, ওরা খাজনা দিতে পারবে না।"

গোমস্তা মুহুরী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কারণ এই দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ানকে ভয় করে না, এরূপ ব্যক্তি দশ-বারো ক্রোশের মধ্যে একটিও ছিল না। এমন কি স্বয়ং জমিদার মহাশয়ও ইঁহার মান্য রক্ষা না করিয়া কথা বলিতে সাহস করিতেন না। ইঁহার হাঁক-ডাকে বড় বড় ভোজপুরী দরোয়ানদেরও কলেবর কম্পিত হইত। আর সামান্য প্রজারা ত ইঁহাকে দেখিলে বাত্যা-তাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় সুদূরে পলায়ন করিত—কিম্বা যদি নিতান্তই দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহার রোষ-দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে বাত্যাহত কদলীর ন্যায় ভূমি ভিন্ন তাহাদের অপর আশ্রয়-স্থান আর কোথাও থাকিত না।

এ-হেন দেওয়ানের চশমা ও পিঙ্গল চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক যখন প্রভুর ন্যায় আজ্ঞা প্রদান করিল, তখন সকলেরই হৃদয়ে একটা আশু বিপদ-পাতের আশঙ্কা দেখা দিল। কার্ত্তিক চন্দ্র কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "দেওয়ানজী, আপনি গোমস্তাদের

বলে দিন, ওরা যেন আর এদের ওপর অত্যাচার না করে!"

দেওয়ান আপনার গাম্ভীর্য্যের শিখর হইতে না নামিয়া বলিলেন, "যাও কাৰ্ত্তিক, এখন বিরক্ত করো না। অন্য সময় তোমার আৰ্জী শোনা যাবে।"

কাৰ্ত্তিক কহিল, "অন্য সময় আবার কি? এই ত সময়! এখনই ত' কাছারি হচ্ছে। এখনই ওরা এসেছে, যা হয় এখনই হুকুম দিয়ে দিন। ওরা আবার কতবার হাঁটাহাঁটি করবে?"

দেওয়ান সিংহ-গর্জ্জনে বলিলেন, "কে আছিস্ রে, ঐ বাগ্দি হারামজাদাদের দূর করে দে ত! এত বড় আস্পর্দ্ধা! যা কাৰ্ত্তিক, এখন গোল করিস্‌নে, বলছি, নইলে—"

কাৰ্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "দেওয়ানজী, আপনি রাগই করুন আর যাই করুন, ওদের খাজনা মাপ না করলে আমি এখান থেকে উঠছিনে। বাবু, আপনি ত রয়েছেন, আপনিই একটা হুকুম দিন না!"

দেওয়ানজীর আর সহ্য হইল না; তিনি জমিদারি-চালে হুকুম দিলেন, "ঘনবরণ সিং, এই ছোঁড়াটার কান ধরে ওর বাপের কাছে রেখে আয়তো।"

ঘনবরণ সিং নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "চলিয়ে ঠাকুরজী।"

কাৰ্ত্তিকচন্দ্র সহসা কাছারির চৌকির উপর উঠিয়া তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় কসাইয়া বলিল, "ছাতুখোর, তুই আমার

কালিকামোহন এতক্ষণ সকৌতুকে বালকের অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার প্রসিদ্ধ পাইককে এই-ভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ঘনবরণ, বাইরে যা। কি বাবা কাৰ্ত্তিক, তুমি কি দরবার করছ—আমার কাছে কর।"

কাৰ্ত্তিক কহিল, "দরবার! কে দরবার করছে? দরবার নবাব-বাদশা এরাই করে, আর কে করতে পারে! আমি এই কথা বলতে এসেছি যে, যারা আপনারই কাজ করে, তারাই আপনার কাছ থেকে মাইনে দাবী করতে পারে। তা না হয়ে আপনি তাদের কাছ থেকে খাজনা নেবেন কি হিসেবে?"

কালিকামোহন বেগতিক দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওদের খাজনা মাপ করে দেব। যাতে কেউ ওদের খাজনা না নেয়, তা করে দেব। তুমি যাও, এই রোদ্দুরে ঐ গরম কোটটা খুলে ফেলো।"

কাৰ্ত্তিকচন্দ্র বিজয়-গর্ব্বে গম্ভীর মুখে ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "গরম জামা খোলা না খোলা, সে আমার ইচ্ছে।"

কাৰ্ত্তিকচন্দ্র নাট-মন্দিরে নামিয়া দেখে, তাহার বাগ্দি বন্ধুরা বেগতিক দেখিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। তখন সেই বিজয়-সংবাদ স্বয়ং সে তাহাদিগকে দিবার জন্য উন্নত মস্তকে দেউড়ীর মধ্য দিয়া দরোয়ানদের জ্বলন্ত দৃষ্টি উপেক্ষা করিতে

৩

মধ্যাহ্নে দেবায়তনের কূপে স্নান করিতে করিতে ব্রহ্মপদ ও আর একটি ছাত্র, নাম শ্যামাপ্রসন্ন, এই দুইজনের মধ্যে গভীরভাবে তর্ক চলিতেছিল। শ্যামা প্রসন্ন বলিল, "কাব্য পড়বার জন্য ব্যাকরণ বা অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন নেই। কবিতার ভাব বোঝা সহজ বুদ্ধিতেই হয়।"

ব্রহ্মপদ ন্যায়ের ছাত্র, তথাপি সে ব্যাকরণের উপাধিও লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কথনই নয়, ব্যাকরণ আর অলঙ্কার শাস্ত্রকে অবলম্বন করেই কাব্য, নইলে সে কাব্য কাব্য নামেরই যোগ্য হতে পারে না।"

"অর্থাৎ তোমার মতে আগে ব্যাকরণ তৈরি হয়েছিল, তার পর কাব্য-সৃষ্টি! আগে রাস্তা তৈরি, তারপর লোক-চলাচল! কি বুদ্ধি!"

"ব্যাকরণের সৃষ্টি যে আগে হয়েছিল, এ কথা জোর করে বলা যায় না, তবে—"

"আর তবেতে কাজ নেই। তোমার ন্যায়ের ফক্কিকার এখানে খাটবে না। যাঁরা কবি হন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, এ সব তাঁদের কাব্যকেই অনুসরণ করে। জীবের লাঙ্গুলের জন্ম দেহটার আগেই হয় না।"

"আগেই হয় না, কিন্তু একসঙ্গেই হয়। সাহিত্য-সৃষ্টির একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়ম-অনুসারেই সাহিত্য গড়া হতে থাকে। কবি আর লেখকেরা, জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, সেই নিয়ম-অনুসারেই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে থাকেন। পরে যখন কেউ সে সাধারণ নিয়মগুলি একত্র করে প্রকাশ করেন, তখন তিনিই হন বৈয়া-করণিক, আলঙ্কারিক ইত্যাদি।"

তাহাদের তর্ক চলিতেছে, ইতিমধ্যে টোলের আরও কয়েকটি ছাত্র গামছা ও কাপড় লইয়া স্নানার্থে সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইল। নিকটেই একটা দড়ি টাঙ্গানো ছিল, তাহাতে কাপড়গুলি ঝুলাইয়া তাহারাও ব্রহ্মপদ ও শ্যামাচরণের তর্কে যোগ দিল। যে লোকটি এই সকল ছাত্র-দের জল তুলিয়া দিতেছিল, সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরতি শেষ হয়ে ভোগ সরেছে, আপনারা শীগ্‌গির শীগ্‌গির চান করে নাও, মাঠাকুরণ রাগ করেছেন যে।" কিন্তু সে কথা কে শোনে! তাহারা তখন তর্কের মধ্যস্থলে উপস্থিত! এ সময় কেহ জল মাথায় ঢালিতে পায়ে ঢালিতেছে, কেহ পায়ে ঢালিতে ঘাসের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। এমন সময় হঠাৎ একজন ছাত্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটা "তার" আসিয়াছে এবং ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার অর্থোদ্ধারের জন্য হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গিয়াছেন। সকলেই তখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্নান সারিয়া লইল এবং পরে টোলের দিকে প্রস্থান করিল।

শিবচন্দ্র অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া ম্লান মুখে সংবাদ দিলেন, সর্ব্বানন্দ পরীক্ষা দিতে গিয়া বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়াছে এবং কলিকাতার এক "মেসে" সে পড়িয়া আছে,—অন্তই একজনের সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কে যাইবে! সকল ছাত্রই শঙ্কিতভাবে এ উহার পানে ও ইহার

পানে চাহিতে লাগিল। অধ্যাপক কাতর ভাবে বলিলেন, "সর্ব্বানন্দ বিদেশী, এখানে কেউ ওর আত্মীয় নেই বলে কি ওর চিকিৎসা বা সেবা হবে না?"

কেহই কোন উত্তর দিল না দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবা আমি যাব।"

পুত্রের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া পিতা বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি করবে? তা হলে আমাকেই যেতে হয়, দেখছি। সর্ব্বানন্দর ত শুনেছি, নিকট আত্মীয় কেউ নেই, এমন অবস্থায় কে-ই বা যাবে? যাক্, কার্ত্তিক, তোমার গর্ভ-ধারিণীকে বলে এস, আমার ব্যাগটা ঠিক করে রাখতে।"

ব্রহ্মপদ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "রোগটা ছোঁয়াচে, আর কাউকে—"

কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ভয়টাও ছোঁয়াচে, আমারও ভয় কচ্চে। ভাগ্যিস আমার ঐ রোগ হয়নি, তা হলে তোমাদের মত আগেই মরে বসে থাকতাম। আর সর্ব্ব দাদাই ত মরছে, তোমরা ত মরনি, খুসি হয়ে হরির লুট দাওগে।"

বিদ্রূপের তীরটা ঠিক স্থানে পৌছিল কি না, সে সংবাদ না লইয়াই কার্ত্তিকচন্দ্র চলিয়া গেল। শিবচন্দ্র তাড়াতাড়ি স্নানাহ্নিক সারিয়া লইয়া গো-যানযোগে চলিয়া গেলেন। কিন্তু গ্রাম হইতে ক্রোশখানেক অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন, কার্ত্তিকচন্দ্র গামছায় একখানা কাপড় বাঁধিয়া তাঁহারই অপেক্ষায় পথের ধারে এক বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতেছে। পুত্রের মুখের সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া পিতা আর কোন আপত্তি করিলেন না, উভয়ে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

মেসের দুই একজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে এবং শিবচন্দ্র ও তৎপুত্রের সেবায় সর্ব্বানন্দ সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। পরে সর্ব্বানন্দ কতকটা সুস্থ হইলে কার্ত্তিকচন্দ্র একদিন তাহার পিতাকে বলিল, "বাবা, আমি বাড়ী যাব।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "আর চার-পাঁচ দিন পরেই আমি সর্ব্বানন্দকে নিয়ে বাড়ী ফিরব, তখন যেও।"

কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "এই মেসের একজন আজই বাড়ি যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গেই আমি যাব। তিনি টিকিট করে দেবেন, তারপর ষ্টেশন থেকে আমি বাড়ী যেতে পারব। আমার মন কেমন কচ্ছে।" শিবচন্দ্র পুত্রকে চিনিতেন। তিনি আর প্রতিবাদ না করিয়া তাহার যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রভাতে কার্ত্তিকচন্দ্র যখন টোলে প্রবেশ করিতেছিল, তখন কয়েকজন ছাত্র তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খপর কি, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক বিষণ্ণ মুখে বলিল, "খপর আর কি! কাল সব শেষ হয়ে গেছে।"

সমবেত ছাত্রদের সকলের মুখ হইতে যুগপৎ একটা বিস্ময় ও ভয়সূচক শব্দ বাহির হইল। কার্ত্তিক তীব্র দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মপদ বলিল, "এই যে

পরশু পত্র পেয়েছি, সর্ব্বানন্দের অবস্থা অনেক ভাল।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর কোন উত্তর না দিয়া মাতৃসন্নিধানে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার ওষ্ঠে সে সময় যে তীব্র ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিল। ব্রহ্মপদ গম্ভীর মুখে বলিল, "কার্ত্তিককে আমার বিশ্বাস হয় না। ন্যায়রত্ন মশায় এলেন না কেন? নিশ্চয়ই এ-সব ওর দুষ্টামি।"

দুই একজন মাথা নাড়িয়া বলিল, "এত বড় মিথ্যা কথাটা কি ও বলবে! আর এতে ওর লাভই বা কি হবে?"

ব্রহ্মপদ কহিল, "লাভ-অলাভ নিয়ে ওর দুষ্টুমির পরিমাপ হয় না। এত অল্প বয়সে এতখানি দুষ্ট বুদ্ধি আমি ত আর দেখিনি।"

কার্ত্তিক তাহার মাতার নিকট কোন কথা গোপন করিল না, সেই জন্য কিছু-ক্ষণের মধ্যেই সত্য সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ ব্রহ্মপদ মনোরমা ঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের দুষ্টামির কথা নিবেদন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র ততক্ষণে একটা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া বলিল, "সারা রাত্তির ঘুমুই নি, এখন আমায় বকিয়ো না।" মাতা তখন হাসিয়া ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "কি করব বাবা, ওঁর আদরেই ও ক্রমশ এমন দুষ্টু হয়ে উঠছে। যাক্, উনি আসুন, এলে ওর যা-হয় একটা বিশেষ শাস্তি করব। এখন একটু ঘুমুক।"

তারপর কিছুদিন পরে সশরীরে সর্ব্বানন্দ ও শিবচন্দ্র গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশও শুনিলেন; কিন্তু ইহাতে মৃদু হাস্য ব্যতীত কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা হইল না দেখিয়া ব্রহ্মপদ হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল।

৪

সর্ব্বানন্দ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, তথাপি এখনও পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার অনুমতি পায় নাই। প্রত্যহ সকালে বৈকালে তাহাকে বেড়াইয়া আসিতে এবং যথাসময়ে আহারাদি করিয়া শয্যা গ্রহণ করিতে হয়। এই ভ্রমণের সময় কার্ত্তিক-চন্দ্রও কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে থাকে।

আজ সে তাহার চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইবামাত্র কার্ত্তিকচন্দ্র এক-খানা পিচের ডাল চাঁচিতে চাঁচিতে তাহার অনুসরণ করিল। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, তুমি আজ দুপুরে বেড়াতে যাও নি কেন?"

"তুমি ত' আজ-কাল পড়তে পাও না—তাই তোমার পড়া, আমার পড়া; দু'জনের কাজই আমি সেরে রাখছিলাম।"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "ঐ রে, তাহলে আমার মাথাটি খেয়েছ, বোধ হয়,—সমস্ত বই, পুঁথিপত্র ঘেঁটে ঘুঁটে—"

"বেশ খিচুড়ি তৈরি করে রেখেছি, চমৎকার হজম হবে'খন। এখন যে কাজে যাচ্ছ, চল। সব সময় বই, বই। কি যে হয় তার ঠিক নেই।"

উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন

সময় দূরে একটা পরিচিত টমটমের ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের ঝুনঝুন্ শব্দ শুনা গেল। জমিদার কালিকাবাবুর কন্যা শ্রীমতী শৈলজা-সুন্দরী তাঁহার খাস দাসী ও দরোয়ানের সহিত সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইহা তাহাদের প্রতিদিনের অভ্যাস, তাই কার্ত্তিক বা সর্ব্বানন্দ কাহারও তেমন লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল না। তাহারা পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাড়ীটাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু গাড়ীটা সবেগে অগ্রসর হইতে না হইতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।

অপর দিক হইতে একখানা গরুর গাড়ী কার্ত্তিকদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পল্লীগ্রামের গোজাতীয় জীবগণ যে কখন কি কারণে ভয় পায় তাহা বলা যায় না। সেই গাড়ীর বলদদ্বয় সহসা সেই গাড়ী-সমেত সশব্দে পার্শ্বস্থ নালার মধ্যে নামিয়া পড়িল। গাড়ীতে দুই একজন স্ত্রীলোক আরোহী থাকায় একটা ভয়ানক হৈ-চৈ ও আর্ত্ত শব্দ উত্থিত হইল। শুনিয়া সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকচন্দ্র ছুটিয়া ঘটনাস্থলে গেল।

দুর্ঘটনায় কাহারও তেমন আঘাত লাগে নাই বটে কিন্তু স্ত্রীলোকদের বাহিরে আনিতে ও গাড়োয়ানকে শকটের তলদেশ হইতে বাহির করিতে অনেকটা বেগ পাইতে হইল। ইতিমধ্যে মহামহিমান্বিতা শৈলজাসুন্দরী তাঁহার টমটম থামাইয়া গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে ছিলেন। গো-শকটের তলদেশ হইতে গাড়োয়ানকে যখন অদ্ভুতভাবে টানিয়া বাহিরে আনা হইল, তখন তিনি হাসিয়া তাঁহার টমটম হইতে প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গাড়ীটাকে টানিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়া উঠিয়া যখন দেখিল, টমটমের উপর উন্নত পাগড়ি দরোয়ান ও কোচম্যান চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তখন ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল; তদুপরি ঐ হাস্যো-চ্ছ্বসিতা বালিকার সহানুভূতিহীন হাস্যের শব্দে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক লম্ফে টমটমের উপর উঠিয়া বিরাশী শিক্কা ওজনের এক চড় উঁচাইয়া সে বলিল, "ফের যদি তুমি হাসবে, তাহলে বুঝতে পারবে। ওদের নালায় ফেলে দিয়ে বসে বসে হাসি! চড় খেয়ে হাসতে পার ত' বুঝি।" দাসী দরোয়ান ও কোচম্যান তিনজনেই অবাক এবং ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তিশালিনী শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী ভীত ত্রস্তভাবে বসিয়া পড়িয়া তাহার দাসীকে চাপিয়া ধরিলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি টমটমের নিকটে আসিয়া কার্ত্তিককে নামাইয়া আনিল। কার্ত্তিক গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে বলিল, "হারামজাদা, ফের যদি বসে বসে এই রকম করে মজা দেখিস, তাহলে তোদের ছড়ি পেটা করব।" কোচম্যান আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। কিন্তু শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরীর সে দিন আর সান্ধ্য ভ্রমণ হইল না; কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে সর্ব্বানন্দ মহাভীতভাবে কার্ত্তিককে বলিল, "এ তুমি কি করে বসলে! ছেলে মানুষের ওপর রাগ

দেখিয়েই বা তোমার কি লাভ হল? তা ছাড়া এই রকম করে একটা বিপদকে ডেকে এনেই বা কি লাভ হল? ওরা ত এখনি গিয়ে বাবুকে বলে দেবে, তারপর কি হবে, কে বলতে পারে?"

কার্ত্তিকচন্দ্রের রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল, তাই সে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "আমার ওপর কেউ রাগ করে না, তোমার ভয় নেই।"

সর্ব্বানন্দর ভয় কমিল না; তাই সে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু কার্ত্তিক সে প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী নয়। সে বলিল, "না, এখনও বেড়ানো হয় নি। আমি কিছুতেই তোমায় ফিরতে দেব না।" সর্ব্বানন্দ অগত্যা আরও খানিক বেড়াইতে বাধ্য হইল। কিন্তু বিপদ সেই খানেই শেষ হইল না। কিছুদূর যাইতে না যাইতে জমিদার মহাশয়ের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। কালিকাবাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কিরে কার্ত্তিক, তুই শৈলকে মেরেছিস কেন?"

কার্ত্তিক গম্ভীরভাবে বলিল, "ও তাহলে মিছে কথা বলেছে। আমি কেবল চড় উঁচিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি, মারাই উচিত ছিল।"

"কেন? মারা উচিত ছিল, কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "মানুষের এ রকম বিপদ ঘটলে দাঁড়িয়ে যে হাসতে পারে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা আর কি আছে! তার ওপর আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। আপনারই ওকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া উচিত।"

কালিকাবাবু সমস্তই শুনিয়াছিলেন এবং কি কারণে যে তিনি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার অনুসরণকারী দরোয়ান ঘনবরণ সিং কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধৃষ্ট বালকের নিকট যে চপেটাঘাত-লাভ তাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাহার অনুভূতি এখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাই অদ্যকার অপরাধের সংবাদ শুনিয়া প্রতিশোধের আশায় তাহার হস্তদ্বয় নিস্‌পিস্ করিতেছিল। কিন্তু ফলে যখন কিছুই হইল না, উপরন্তু বাবু মহারাজ যখন কার্ত্তিককে আদর করিয়া বলিলেন, "ছি বাবা, ছোট মেয়ের ওপর অত রাগ করতে নেই। ওর কতটুকু বুদ্ধি!" তখন সে তাহার গালপাট্টা চুমরাইতে চুমরাইতে ভাবিল, "মহারাজ বাওরা হো গয়ে হেঁ।"

কালিকাবাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন বিস্মিত সর্ব্বানন্দের দিকে চাহিয়া কার্ত্তিক বলিল, "দেখলে সর্ব্বদাদা, আমায় কেউ বকতেই পারে না।"

কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতা এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ওর মামাও একদিন এক সাহেব মেরেছিল। কেমন লোকের ভাগ্নে!" কিন্তু তাহার পিতা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ সব তোমার কি হচ্চে, কার্ত্তিক? পড়াশোনা করে কোথায় শান্ত প্রকৃতি হবে, তা না এ সব কি আবার? সেদিন ঘনবরণ সিংকে মেরেছ, আজ আবার একটি ছোট মেয়ের ওপর বীরত্ব ফলিয়েছ। এ সব ত

ভাল নয়। এমন করলে আমায় এখানকার বাস উঠোতে হবে, দেখছি।”

পরদিন হঠাৎ একজন পাইক আসিয়া যখন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সন্ধ্যার পর জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেল, তখন সকলেই বুঝিল, আজ একটা কিছু হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই ঘটিল না। কালিকাবাবু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পরম সমাদরে বসাইয়া নানাবিধ সদালাপ করিয়া সহসা একটা অদ্ভুত অনুরোধ করিলেন। বাবু বলিলেন, “আপনার ছেলেটীর বিষয় যা দেখছি-শুনছি, তাতে সংস্কৃতর সঙ্গে সঙ্গে ওকে ইংরিজি শিখুলে ও পরে একজন মহাপণ্ডিত লোক হতে পারে। সে জন্য আমার অনুরোধ, আপনি ওকে আমাদের এণ্ট্রেন্‌স্ ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিন। আমি হেডমাষ্টার মশায়কে বিশেষ করে বলে দেব, যাতে ওর ওপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা হয়।”

ন্যায়রত্ন মহাশয় আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন, “কার্ত্তিকের গর্ভধারিণীরও অনেক দিন থেকে তাই ইচ্ছে, কিন্তু ইংরিজি শিখলে ছেলে ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হয়ে যাবে, হয়ত পিতৃপিতামহের সুনাম নষ্ট করে ফেলবে! তা ছাড়া ভবিষ্যতে এই টোলের ভার ত ওকেই নিতে হবে, তা হলে আর ইংরিজি পড়ে ফল কি?”

কিন্তু কালিকাবাবু ছাড়িলেন না। তিনি নানাপ্রকারে বুঝাইলেন যে ইংরাজী পড়িলেই কেহ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয় না; এবং বিদ্যা বা জ্ঞান জিনিষটার কোনরূপ জাতি-গোত্র নাই। যে কোন স্থান হইতেই বিদ্যালাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

একে গ্রামের একচ্ছত্র সম্রাট, তাহাতে তাঁহার পুত্রের ভালর জন্যই যখন কালিকাবাবু এতখানি চেষ্টিত, তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় আর বেশী আপত্তি করিতে পারিলেন না। কেবল এইটুকু বলিলেন, যে ছেলেটী তাঁহার কিঞ্চিৎ একগুঁয়ে ধরণের, উহাকে এ বিষয়ে মত করাইতে কিঞ্চিৎ সময় লাগিতে পারে। এ কথার উত্তরে কালিকাবাবু বলিলেন যে সে বিষয়ে তিনি স্বয়ংই ভার লইতে প্রস্তুত; তিনি স্বয়ং কার্ত্তিকচন্দ্রকে বুঝাইয়া সম্মত করিবেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, সে ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছুক নয়। তাহার মাতা মনোরমা ঠাকুরাণী সগর্ব্বে বলিলেন, “তোকে সবাই এত ভালবাসে, আর তুই সে ভালবাসার এই রকম প্রতিদান দিবি? আমি ওঁকে যে কাজে এতদিন ধরে রাজী করাতে পারি নি, আজ সেই তিনিও রাজী হয়েছেন, তবু তুই আমার কথা শুনবি নে?”

কার্ত্তিক কহিল, “বাবা রাজী হয়েছেন, তুমি কেমন করে জানলে? তুমি ছিনে জোঁকের মত লেগে তাঁর মত করিয়েছ, তার ওপর তিনি জমিদার মশায়ের ভয়ে রাজী হয়েছেন। আমি যে কারও ভয়ে কোন কাজ করব, এ হতেই পারে না। বাবু যে ভয় দেখিয়ে, আমার বাবার অপমান করে আমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নেবেন, তা আমি কিছুতেই সইব না। তুমি বাবাকে এ কথা সাফ বলে দাও।”

মনোরমা দেবী চোখ কপালে তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুই ওঁর মান অপমান দেখছিস, আর আমি যে তাদের বলে পাঠিয়েছি, তুই নিশ্চয়ই পড়বি,—তার কি হবে? এখন আমার কথাটা কোথায় দাঁড়াবে? আমার মান-অপমান কি কিছুই নয়?"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি নিজে বড় লোকের মেয়ে, টাকাকড়ি ধনদৌলতের ওপর চিরদিনই তোমার লোভ। তোমার এ সব বিকারের রুগীর মত কাজ; তাই এ বিষয়ে তোমার কথা না রাখলেই তোমার মান বাড়ানো হবে।"

মনোরমা দেবী কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার ক্রোধের সমস্ত তেজটুকু নিরীহ শিবচন্দ্রের উপর ব্যয়িত করিয়া বলিলেন, "এমন ছেলেতে আমার কাজ নেই, তোমার ছেলের যা হয় কর, আমি ওর হাতের জলগণ্ডুষ যদি নি—"

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "থাম, থাম, মিছি মিছি একমাত্র বংশধরের ওপর এত বড় অভিশাপ দিয়ো না। আমিই ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে নিচ্ছি!"

কার্ত্তিকচন্দ্রকে অবশেষে বুঝিতে হইল বটে, কিন্তু সেও একটা সর্ত্তে। সর্ত্ত এই যে সর্ব্বানন্দকেও ইংরাজি পড়াইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বানন্দ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহার পড়াশুনার খরচের ভার কে লইবে? কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, জমিদার মহাশয় কি আর ইচ্ছা করিলে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলের এইটুকু উপকার করিতে পারেন না? শিবচন্দ্র বলিলেন, এ বিষয়ে কে তাঁহাকে অনুরোধ করিবে? তখন কার্ত্তিকচন্দ্র নিজেই সে ভার গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার বদলে না হয় সর্ব্বদাদা পড়বে, তা হলেই হবে।"

শিবচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "তোমার পড়াশুনার খরচ ত আর তিনি দিচ্ছেন না। তিনি কেবল ব্যবস্থা করে দেবেন মাত্র। খরচ-পত্র সবই আমার। সর্ব্বানন্দকে যদি পড়াতেই হয়, তাহলে সে খরচ আমাকেই বহন করতে হবে। তুমি সব বুঝছ, আর এটুকু বুঝছ না কেন? আর সর্ব্বানন্দই বা ইংরিজি পড়তে স্বীকার করবে কেন? তুমি ছেলেমানুষী করো না, আমি যা বলছি, তাই কর।"

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিল বটে কিন্তু মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ইহার দুই-একদিন পরে সকলেই সবিস্ময়ে শুনিল, বাবু সর্ব্বানন্দর পড়ার সমস্ত ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রমশঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিতত্ত্ব

বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমানে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কাজেই হিন্দুধর্ম্মের সহিত আদিতে ইহার যোগ ছিল না এরূপ ধারণাই বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছে। কিন্তু ইহার আদিতত্ত্বের আলোচনা করিলে হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার যোগেরই প্রমাণ যে কেবল পাওয়া যায় তাহা নহে, পরন্তু হিন্দুধর্ম্মই যে ইহাকে মূলগঠন প্রদান করিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম শাক্যসিংহ। কিন্তু "বৌদ্ধ" নামের মূলার্থের অনুধাবন দ্বারা "বুদ্ধ"কেই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই বুদ্ধ নামের মূলানুসন্ধান করিলে শাক্যসিংহ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার এই নাম হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। "বুদ্ধ" শব্দ বুধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বুধ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। সুতরাং "বুদ্ধ" শব্দ তত্ত্বজ্ঞানীর অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। "বুদ্ধ" শব্দের এই তত্ত্বজ্ঞানীর অর্থ যে শাক্যসিংহই ইহাকে প্রথম প্রদান করেন, তাহা নহে, পরন্তু বেদান্ত-দর্শনে আত্মার সম্বন্ধে প্রাগুক্ত অর্থে "বুদ্ধ" শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। বেদান্ত-দর্শনে "বুদ্ধ" শব্দ যেমন আত্মার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে—তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত শাক্যসিংহেরও ইহা প্রথম বিশেষণ-রূপেইপ্রযুক্ত হইত। শাক্যসিংহ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দেবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই "বুদ্ধ" বিশেষণ যুক্ত হইয়া তাঁহার নাম "বুদ্ধদেব" হইয়াছিল। এই প্রকারেই বিশেষণ হইতে "বুদ্ধ" শব্দ ক্রমে বিশেষ্যে পরিণত হইয়া, "বুদ্ধ" শাক্যসিংহের প্রধান নাম হইয়া পড়িয়াছে। "বুদ্ধ" শাক্যসিংহের ধর্ম্মসাধনার নাম বলিয়াই তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তাঁহার এই "বুদ্ধ" নাম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়াছে।

শুধু "বুদ্ধ" নামেই যে আমরা বেদান্তের সহিত শাক্যসিংহের ধর্ম্মের সংযোগের প্রমাণ দেখিতে পাই তাহা নহে, তাঁহার অপর একটী নামে তাহার আরও পরিষ্কার প্রমাণ দেখিতে পাই। সেই নামটী "অদ্বয়-বাদী"। এই নামটী অমরকোষ অভিধানে ধৃত হইয়াছে ; যথা,—

ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তুসঃ॥"

ইহা হইতে এইটী যে তাঁহার একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নাম তাহাই বুঝিতে পারা যায়। "অদ্বয়বাদী" এই নামের দ্বারা বুদ্ধদেব যে বেদান্তের অদ্বৈত মতাবলম্বী ছিলেন, তাহাই নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হয়।

বেদান্ত মতে মুক্তিতে পরমাত্মায় জীবাত্মার লয় হইয়া কেবলমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকায় এই মুক্তির নাম "কৈবল্য" হইয়াছে। সাঙ্খ্য মতেও এই মুক্তির অবস্থায় "কেবল জ্ঞানে"রই স্ফুরণ হইতে থাকে :—

"এবং তত্ত্বাভাসান্নাস্তি নমেনাহ
মিত্য পরিশেষ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥"

সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।

মুক্তির এই "কেবলজ্ঞানে"র অনুষ্ঠান হইতেই বৌদ্ধ সাধকের নাম "কেবলজ্ঞানী" ও "কেবলী" দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নির্ব্বাণেও এই "কেবলজ্ঞানে"র ভাবই অন্তর্নিহিত। তাহাতেই অভিধানে আমরা "কৈবল্য" ও "নির্ব্বাণ" একই পর্য্যায়ভুক্ত দেখিতে পাই ; যথা :—

"মুক্তিঃ কৈবল্যং নির্ব্বাণম্"—ইত্যমরঃ।

বুদ্ধের বহু নামের মধ্যে একনাম "বোধিসত্ত্ব" ও অপর নাম "মহাসত্ত্ব"। তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা সত্ত্বগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইতেই যে বুদ্ধের এই দুইটী নাম হইয়াছে, তাহাই এই উভয় নামের অর্থালোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কারণ "বোধি", বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানেরই বোধক এবং "সত্ত্ব" সত্ত্ব-গুণেরই দ্যোতক। সত্ত্ব ও সত্য উভয় শব্দ একই প্রকৃতিমূলক। উভয়ই একই সৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং মূলে উভয় শব্দ একই নিত্যার্থের প্রকাশক।

এই প্রকারে বুদ্ধের বিভিন্ন নামের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বেদান্তে আমরা মুক্তাত্মা বা পরমাত্মার যে সমস্ত গুণের বর্ণনা প্রাপ্ত হই, ঐ সমস্ত অর্থ দ্বারাও তৎ-সমস্ত গুণই উপপাদিত হয়।

এস্থলে তুলনা করিবার জন্য আমরা আত্মার লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"তত্ত্বজ্ঞানকং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাবং
প্রত্যক্‌চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বম ॥"

আত্মতত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ হইতে ইহার 'বুদ্ধ', 'শুদ্ধ', 'সত্য' প্রভৃতি এক-একটী লক্ষণই যে বুদ্ধের 'বুদ্ধ', 'বোধিসত্ত্ব', 'মহাসত্ত্ব' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে পরিণত হইয়াছে তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এই প্রকারে 'বুদ্ধভাব' আত্মতত্ত্বেরই লক্ষণান্বিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে "বুদ্ধত্ব" প্রাপ্তি যে পরমাত্মাতে সম্পূর্ণ লয়, প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মারই সারূপ্য পরিগ্রহ তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। গীতাতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় লয় যে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" * বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহাতেও বৌদ্ধ নির্ব্বাণের অর্থ যে পরমাত্মায় লয় তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বেদান্তের "সোঽহং" তত্ত্ব এই লয়তত্ত্ব হইতেই উদ্ভূত। পরমাত্মাতে যখন সমস্ত বিশ্বতত্ত্ব অন্তর্ভূত, তখন স্বতন্ত্র পরমেশ্বর তত্ত্ব স্বীকারের আর আবশ্যকতা থাকে না। ইহা হইতেই বুদ্ধদেব কেন যে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

কেবল যে বুদ্ধদেবের নামেই বেদান্তের নিদর্শন বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে—তাঁহার পিতামাতার নামেও সেই নিদর্শন বর্ত্তমান দেখা যায়। তাঁহার মাতার নাম "মায়াদেবী" ও পিতার নাম "শুদ্ধোদন"। "মায়া" বেদান্তের একটী প্রধান তত্ত্ব। সংসার-প্রবৃত্তি বা সৃষ্টি এই মায়ারই কার্য্য। সুতরাং "মায়া" যে মাতারূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। বেদান্তের "শুদ্ধআত্মতত্ত্বই" শুদ্ধোদন। আত্মতত্ত্বই বিশ্বের মূলতত্ত্ব। সুতরাং ইহা পিতারূপে বর্ণিত হওয়াই স্বাভাবিক। "বুদ্ধ" নাম যেমন বেদান্ত-দর্শন হইতে উপকল্পিত

* গীতা, ২য় অধ্যায়।

নাম—তাঁহার মাতা-পিতার নামও তেমনই বেদান্তানুযায়ী উপকল্পিত নাম বলিয়াই স্পষ্ট অনুমিত হয়। এই সমস্ত নাম যে ঐতিহাসিক নাম নহে, বুদ্ধ-পিতার যে পৌরাণিক "অঞ্জন" নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকারে বুদ্ধকে অঞ্জন-সুতরূপে বর্ণিত দেখা যায়ঃ—

"বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃকীকটেষু ভবিষ্যতি ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ঃ।

বুদ্ধদেব যে কেবল বেদান্তের সাধনাই করিয়াছিলেন তাহা নহে—বেদান্তের "ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ"ও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার এই "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" ভাব হইতেই অনুপ্রাণনা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছেঃ—

"জনসাধারণের জন্য ইনি কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আমি ব্রহ্মতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিব। এ ধর্ম্ম সকলেই গ্রহণ করিবে।" জীবনীকোষ।

তাঁহার ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনে আবার তাঁহাতে আমরা বিষ্ণুরই প্রতিরূপ দেখিতে পাই। তিনি যেমন "ধর্ম্মচক্রভৃৎ"—বিষ্ণুও তেমনই "চক্রধর"। বিষ্ণুর চক্র আবার সূর্য্যেরই রূপক।

বিষ্ণু "সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী" রূপে যে খ্যাত হইয়া থাকেন—তাহাতেই সূর্য্য বিষ্ণুর চক্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। বুদ্ধের সহিত বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যেরও সম্বন্ধ হইয়াছে—তাহাতেই তাঁহার আর এক প্রসিদ্ধ নাম "অর্কবন্ধু"বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়; যথাঃ—

গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ—ইত্যমরঃ

বুদ্ধদেবের "অমিতাভ" নাম এই সূর্য্য-সম্পর্ক হইতে হইয়াছে অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

অভিধানে বুদ্ধদেবের যে "শ্রীঘন" নাম আমরা পাইয়াছি, বিষ্ণুর "শ্রীগর্ভ" ও "শ্রীমূর্ত্তি" নামের সহিত উহাকে সম্পূর্ণ একার্থক বলিয়াই বোধ হয়। বুদ্ধদেবের সুপ্রচলিত "জিন" নাম বিষ্ণুর "জিষ্ণু" নামেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ।

বুদ্ধ নামে বিষ্ণু-সম্পর্কের নিদর্শন যেমন আবিষ্কৃত হয়, তেমনি শিব-সম্পর্কের নিদর্শন তদপেক্ষাও অধিকতর স্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত হয়। বুদ্ধদেবের সুপ্রসিদ্ধ আর এক নাম "মারজিৎ"; শিবেরও প্রসিদ্ধ নাম "স্মরহর"। বুদ্ধদেবের 'মার' জয়ের যেমন আখ্যান আছে—শিবের মদন-ভস্মেরও তেমনই আখ্যান আছে। বিশেষতঃ মার, কাম বা মদনেরই বাচক; যথা—"মদনো মন্মথোমারঃ।"

এইখানেই যে শিবের সহিত বুদ্ধের সাদৃশ্য শেষ হইল তাহা নহে, শিব যেমন শ্রেষ্ঠসংযমী ও যোগিপ্রবর, বুদ্ধকেও আমরা তেমনই যোগীশ্বররূপে স্তুত হইতে দেখি; যথাঃ—

"শান্তং সদা প্রাণিবধাতিভীতম্।
বৃহজ্জটাজুট ধরোত্তমাঙ্গম্
তনুল্লসদ্ গৈরিক গৌরবস্ত্রম্
যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্ ॥"

বুদ্ধদেবে এই সমস্ত নিদর্শন দর্শন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাবের মধ্যেই যে তাঁহার জন্ম এবং তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এই প্রভাবেরই দ্বারা যে সমনুপ্রাণিত, তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন *

রাজসাহী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম্ এ. এফ্, সি, এস্, মহাশয় গত ছয়-সাত বৎসর ধরিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ "ভারতী," "প্রবাসী," "ঢাকা রিভিউ," প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, সেইগুলি সম্প্রতি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন" নামক গ্রন্থে সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য— প্রথমতঃ, প্রত্যেক ধাতু ও তাহার যৌগিক সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে কিরূপ জ্ঞান ছিল, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা; দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ধাতুর জারণ মারণ প্রক্রিয়ায় কি রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা; এবং তৃতীয়তঃ আধুনিক কবিরাজ মহাশয়গণের দ্বারা ব্যবহৃত জারিত ধাতু দ্রব্য, মকরধ্বজ প্রভৃতির রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা তাহাদের স্বরূপ-নিরূপণ।

গ্রন্থখানির প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে জানা যায়, আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি বৈদিক কালে। অথর্ব্ব বেদই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিস্থল। আমরা অথর্ব্ব বেদে ঔষধ সমূহের বাহ্য ধারণে হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। যে সকল ভেষজের (যথা অশ্বত্থ, খদির, হরিদ্রা, অপামার্গ, মুঞ্জ, শমী, পৃশ্নিপর্ণী ইত্যাদি) বাহ্য ধারণ অথর্ব্ব বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে সেই সকল ভেষজই ঔষধরূপে সেবনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ধাতু সকলের মধ্যে সীসক ও স্বর্ণ দেহে ধারণ করিবার ব্যবস্থা অথর্ব্ববেদে আছে, পরবর্ত্তী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে ঐ দুই এবং অন্যান্য ধাতুর ভস্ম ঔষধ-রূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রথমে ঔষধ-সমূহের বাহ্য ব্যবহার (external application) এবং পরে অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত তাহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ (internal administration) হইয়া থাকে। প্রথমে হস্ত বা গলদেশে ধারণ, পরে মালিস বা প্রলেপরূপে ব্যবহার এবং শেষে ঔষধরূপে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় সেবন. এই রূপেই ঔষধ-সেবনের ক্রম বিকাশ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। অথর্ব্ববেদ হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎপত্তি-স্থল বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহা অমূল্য গ্রন্থ। কেহ কেহ অথর্ব্ববেদকে ভূত-প্রেত ঝাড়ান মন্ত্রের সমষ্টি মাত্র মনে করিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রাচীন মিশর দেশেও মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়াই চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদে এতগুলি রোগের মন্ত্রতন্ত্র আছে যে উহার "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যাণি" মন্ত্রগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিলে পৃথিবীর মধ্যে তাহা একখানি আদি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অথর্ব্ববেদের কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশের সহিত ভারতের রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার একটি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিষয়টি এই যে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ (এবং রসায়ন শাস্ত্র) গ্রীক, রোমীয় বা আরব জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত কি না; এবং তাহা না হইলে প্রাচীন গ্রীক, রোমীয় বা আরব চিকিৎসা শাস্ত্র ভারতের আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী কি না? এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ

---

* আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন, প্রথম ভাগ, শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম্, এ, এফ, সি, এস্, রসায়ন-অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ প্রণীত, মূল্য ১।০, বাঁধাই ১॥০ টাকা।

আছে। বহু গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে যে কয়টি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গ্রন্থকার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম। আয়ুর্ব্বেদ ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সৌসাদৃশ্য এবং তাহার জন্য গ্রীকগণই আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী। অধ্যাপক ওয়েবার (Weber) তাঁহার History of Indian Literature এ লিখিয়া গিয়াছেন যে সুশ্রুত গ্রীকগণের চিকিৎসার নিকট ঋণী হইতে পারে না, পরন্তু বিপরীত মতই সঠিক বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদে বিদেশীয় পারিভাষিক শব্দ নাই। ভারতীয় অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার হার্সবার্গ (Hirschberg) বলিয়া গিয়াছেন যে হিন্দুদের কঠিন কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা গ্রীকগণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল এবং ইউরোপীয়গণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সকল অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছেন। অধ্যাপক ডায়াজও (Dias) বিস্তর গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে গ্রীক চিকিৎসা-প্রণালী হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

দ্বিতীয়। মিশর দেশ (Egypt) পুরাকালে ভারতীয় আর্য্যগণের উপনিবেশ ছিল। গ্রীকগণ তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য মিশরবাসীগণের নিকট ঋণী।

তৃতীয়। গ্রীক ভেষজ নির্ঘণ্টতে নানাবিধ ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ ও গুণ বর্ণনা আছে।

চতুর্থ। অষ্টম শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় বৈদ্যগণ বোগদাদের বাদশাহের চিকিৎসক ছিলেন;এবং অনেক সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ এই সময় আরবীভাষায় অনূদিত হয়। এইরূপে চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ আরবী ভাষায় স্থান পায়। পুনরায় এই সকল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষা হইতে লাটিন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল এবং এই সকল অনুবাদ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ ছিল।

পঞ্চম। ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ সম্বন্ধে গ্রীকগণ হিন্দুদিগের নিকট ঋণী।

ষষ্ঠ। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরবীয়গণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত এবং দক্ষিণ ভারত হইতে তাহারা নানাবিধ ভেষজ আফ্রিকা ও ইউরোপে রপ্তানি করিত।

সপ্তম। অষ্টম শতাব্দীতে আধুনিক সিন্ধুপ্রদেশ বোগদাদের বাদশাহ খালিফ মনসুরের করায়ত্ত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বাদশাহের দরবারে ভারত হইতে অনেক পণ্ডিত আমন্ত্রিত হইতেন। এইরূপে আরবীয়গণ ভারতের উন্নত দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হন। আববাস বংশীয় মনসুর ও হারুণ প্রভৃতি বাদশাহগণ যাবতীয় বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, চরক, সুশ্রুত, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত মুলার আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে চরক সুশ্রুত ভিন্ন মাধবকারের নিদান ও বাগভটের অষ্টাঙ্গ এবং আরও কয়েকখানি সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। মুলার সাহেব আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়িগণ বোগদাদের রাজকীয় চিকিৎসকও ছিলেন।

অষ্টম। ভারতের সহিত আরবীয়গণের পরিচয় হইবার পর অনেক মুসলমান পণ্ডিত ভারতে শিক্ষালাভ করিতে আসিতেন। ভারতের আয়ুর্ব্বেদও অনেক আরবীয় পণ্ডিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহে 'সরক' (চরক), 'সুশ্রুদ' (সুশ্রুত), 'বদান' (নিদান), 'অসঙ্কর' (অষ্টাঙ্কর, অষ্টাঙ্গ) প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহের উল্লেখ বহুস্থানে আছে।

নবম। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগে যখন ধাতু-ঘটিত ঔষধ সকল বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহৃত হইত, তখন পর্য্যন্ত ইউনানি হাকিমেরা ধাতু-ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিতে ভীত হইতেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

আছে। আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কাল স্থূলতঃ তিনটী—(১) বৈদিক যুগ, (২) আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ ও (৩) তান্ত্রিক যুগ।

বৈদিক যুগের প্রধান গ্রন্থ অথর্ব্ববেদ ও কৌশিক সূত্র। এই যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, ত্রপু ও সীস এই ছয় ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীস ধাতু রোগ-বিনাশ-কল্পে "পরিহস্ত" রূপে ব্যবহৃত হইত।

অথর্ব্ববেদের পর "ব্রহ্মসংহিতা," "অশ্বিনীকুমার সংহিতা," ও "আত্রেয় সংহিতা" এবং অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত-কৃত সংহিতা সকল চরকের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। চরকসংহিতা ভিন্ন অপর সংহিতাগুলি এখন লুপ্ত হইয়াছে। এই আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ খ্রীষ্টপূর্ব্ব কয়েক শতব্দীর প্রাক্কালে আরব্ধ হইয়াছিল। "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়নের" তৃতীয় পরিচ্ছেদ-পাঠে এই আয়ুর্ব্বেদীয় যুগের কতক গুলি স্থূল কথা জানিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় যুগে দেখিতে পাই মদ্যবর্গের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। নানাপ্রকার আসব, শীধু, মদ্যের উল্লেখ চরক ও সুশ্রুতে পাওয়া যায়। সৌবীর-কাঞ্জিক, ধান্যাম্ল, তুষোদক (Vinegar) আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ছয় ধাতু ধাতুবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত ও স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। হীরক, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি রত্নবর্গও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। গন্ধকের ব্যবহারও চরক ও সুশ্রুতে আছে। পঞ্চলবণ ও দুই ক্ষার এবং সোহাগা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যবক্ষার (Carbonate of potash) এবং সর্জ্জিকাক্ষার (Carbonate of Soda) বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুশ্রুতে মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষারের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া বেশ বিশদভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুশ্রুত ও বাগভটে পারদেরও উল্লেখ আছে। চরকেও ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুশ্রুতে ধাতুর অয়স্কৃতি পরবর্ত্তী কালের ধাতু মারণের পূর্ব্বাভাষ দিতেছে।

তান্ত্রিক যুগে ভারতের প্রাচীন রসায়নের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। নাগার্জ্জুনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তির্য্যকপাতন, ঊর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন, ধাতুর শোধন, জারণ মারণ প্রভৃতি বিবিধাপ্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিবিধ ধাতুর অনেকগুলি নূতন নূতন যৌগিক (Compound) এই সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছিল। কালো সাল্‌ফাইড অব মার্কারি (কজ্জলী) লোহিত সাল্‌ফাইড অব মার্কারি (Red sulphide of mercury), রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দুর, কেলোমেল (রসকর্পূর), ফেরিক অক্‌সাইড (ferric oxide ; পুটিত লৌহ), সাল্‌ফাইড অব কপার (sulphide of copper ; মারিত তাম্র), অক্‌সাইড অব জিঙ্ক (oxide of zinc ; মারিত যশদ), অক্‌সাইড অব লেড (oxide of lead ; মারিত সীসক) আর্সেনাইট অব পটাশ (arsenite of potash ; হরিতাল ভস্ম), প্রভৃতি বিবিধ যৌগিক এই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নাইট্রো—হাইড্রো ক্লোরিক অম্ল (nitro hydrochloric acid সর্ব্বজারণ, বিড), সলফিউরিক এসিড (গন্ধক বা তেজাব) প্রভৃতি অজৈব অম্লও আবিষ্কৃত এবং ঔষধার্থ সেবিত হইত। জৈব অম্লের মধ্যে এক ধান্যাম্ল (vinegar) ভিন্ন অন্য অম্ল আবিষ্কৃত হয় নাই। ধাতু সকলের প্রস্তুত প্রক্রিয়া (metallurgy) বেশ বিশদভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রন্থকার চতুর্থ হইতে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রত্যেক ধাতুর প্রাচীন ইতিহাস, প্রস্তুত-প্রক্রিয়া, শোধন ও মারণ-প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ক্রিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে আমাদের রসায়ন জ্ঞানের অতীত গৌরব-কথা স্মরণ করিয়া, হৃদয়ে শ্লাঘা, আবেগ ও আনন্দের সঞ্চার হয়। আমাদের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তির কথা বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া পঞ্চানন বাবু আমাদের ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

সুচরিতা

(উপন্যাস)

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমরা কে ?

ঐখানে সে শুইয়া আছে,—আগেকার মত এখনও তেমনি রূপসী! মাঝে মাঝে আমি দুই পা আগাইয়া যাইতেছি আর মৌন যাতনায় তার মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছি। কাল তাহাকে আমার কাছ হইতে এ-জন্মের মত ছিনাইয়া লইয়া যাইবে, আর আমি একাকী পড়িয়া থাকিব, একাকী! আজ সে আছে ঘরের ভিতরে, মেজের উপরে; কিন্তু, কাল সে থাকিবে তুহিন-শীতল কবরের আঁধারে, শাদা কাপড়ে ঢাকা।

এমন অঘটন কেমন করিয়া ঘটিল, কে জানে! ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য এই কথাটা লইয়াই ক্রমাগত মনে মনে নাড়াচাড়া করিতেছি। বেলা ছয়টা হইতে ক্রমাগতই ভাবিতেছি আর ভাবিতেছি, কিন্তু এ-ভাবনার ত কোন কূল-কিনারা পাইলাম না! সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া আর-একবার ঠিক পরে-পরে সাজাইয়া গেলে বোধ হয় একটা কিনারা হয়!—কিন্তু এ কথা যতই ভাবি, ততই যে খেই হারাইয়া ফেলি! তবু একবার গোড়া হইতেই সুরু

প্রথম দিন সে আমার কাছে বেশ সহজভাবেই আসিয়াছিল।

জিনিষ বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা ধার লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আর-আর সকলকার সঙ্গে তাহার যে কোন তফাৎ আছে, প্রথমবারেই আমি তা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু, ক্রমেই তাহার স্বভাবের বিশেষত্ব অল্পে-অল্পে বুঝিয়াছিলাম।

সে সময় তার চুলগুলি রেশমের মত চিকণ ও সরু, গড়নটি বেশ পাতলা ছিপ্‌ছিপে ছিল। দেখিলেই বুঝা যাইত মেয়েটি বড় লাজুক। টাকা পাইলে সে আর পিছন-পানে চাহিত না—মাথাটি হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইত। বেশী কথা সে একটিও কহিত না; বন্ধকী জিনিষের দাম বাড়াইবার জন্য অন্য লোকে আমার সঙ্গে দর-দস্তুরি করিত বিলক্ষণ, সে কিন্তু অল্পেই তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইত।

যে জিনিষগুলি সে বাঁধা দিতে আনিত, সেগুলি এমনি খেলো ও কম-দামের যে আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম। আমার বিশ্বাস, জিনিষগুলি যে খেলো, এটা সেও জানিত; কিন্তু তার মুখের করুণ ভাব দেখিয়া মনে হইত, সেগুলি যেন তার বুকের নিধি। পরে শুনিয়াছিলাম, মৃত্যুর সময় তার বাপ-মা এগুলি তাকে শেষ-উপহার দিয়া গিয়া-

একদিন সে পুরাণো খরগোশের লোমের একখানি কম্বল লইয়া আসিল। জিনিষটার চেহারা দেখিয়া আমার মেজাজ চটিয়া গেল, দু-চারিটা কড়া কথা না শুনাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার কথায় তার সেই বড় বড় নীল চোখদুটি একবার জ্বলিয়া উঠিল! সে একটিও কথা কহিল না—কম্বলখানি লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেই প্রথম—তার চরিত্রের একটা দিক দেখিলাম।

কিন্তু সব-চেয়ে আমাকে বেশী মোহিত করিয়াছিল, এই অপরিচিতা সুন্দরীর তরুণ যৌবনশ্রীটুকু। তার বয়স তখন ষোলর কিছু বেশী—কিন্তু দেখিতে সে ছিল চৌদ্দ বৎসরের কিশোরীর মত।

এই ঘটনার পর দিনেই সে আবার আমার দোকানে ফিরিয়া আসিল। পরে জানিয়াছিলাম, আমার দোকান থেকে বাহির হইয়া আরও দু-জায়গায় তার পুরাণো কম্বলখানি সে বাঁধা দিতে গিয়াছিল; কিন্তু কোনই ফল হয় নাই; কারণ, যাদের কাছে গিয়াছিল তারা কেবল সোনা-রূপারই কারবারী।

আজ সে কাঠের একটি পাইপ আনিয়াছে। জিনিষটি দেখিতে দিব্য বটে, কিন্তু আমি সোনা-রূপার কারবারী,—কাঠের পাইপে আমার কাজ কি?

তবু, জিনিষটি আমি লইলাম। কিন্তু একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম, "আমি সুধু—তোমার জন্তেই—এটা নিলাম জেনো। যাদের সোনা-রূপার কারবার, তাদের আর-কেউ এটা নিত না।"

"তোমার জন্তেই"—এই কথাদুটির উপরে বিশেষ করিয়া জোর দিলাম।

আমার কথা শুনিয়া তাহার চোখদুটি আবার তেমনি জ্বল্‌জ্বলে হইয়া উঠিল! তবে, সেদিনকার মত আজ সে আমার টাকা ফিরাইয়া দিল না। রুদ্ধ আবেগে ফুলিতে ফুলিতে টাকাগুলি লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। কারণ?—কারণ আর কি, দারিদ্র্য! আমার কথায় সে যে বড়ই আহত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

সে চলিয়া গেলে আমি নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "খাম্‌কা দু-দুটো টাকা খরচ হয়ে গেল বটে—কিন্তু আজ যে বাহাদুরিটা করা গেল, তাতে এ খরচটা কি সার্থক হবে না?" আমি খুব একচোট হাসিয়া লইলাম।

এমনি করিয়াই আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত। ইহার পর, আবার সে কবে আসিবে, অত্যন্ত অধীরভাবে সেই আশায় রহিলাম।

তারপর যেদিন সে আসিল, এমন ঘনিষ্ঠতার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিলাম যে, নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

লেখাপড়া ও আদব কায়দায় আমি তৈরি ছিলাম। দেখিলাম, মেয়েটি বেশ ভদ্র। সেদিন সে আমার কাছে বিশেষ কিছু প্রকাশ করিয়া বলে নাই; কিন্তু পরে তার মুখে শুনিলাম, সে কোন ভদ্র পরিবারে গৃহ-শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে। তার সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়। সে মাহিনা চায় না, খাইখরচ ও বাসা

পাইলেই একরকম কষ্টেসৃষ্টে তার চলিয়া যাইবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া আজ পর্য্যন্তও সে কোন কাজের যোগাড় করিতে পারে নাই।

আমি আর-একবার তাহাকে বুঝিয়া লইবার জন্য তাচ্ছীল্যের সহিত বলিলাম, "তার চেয়ে তুমি কেন দাসীপনার চেষ্টা কর না! তাহলে ঠিক কাজ পাবে।"

আবার তাহার চোখে বিদ্যুৎ ঝকিল, —আবার সে আমার ঘর ছাড়িয়া নীরবে চলিয়া গেল।—যাক্‌গে, ভয়টা কিসের? আমি বৈ তার ত আর গতি নাই, ঘরের কড়ি বাহির করিয়া তাহার অকেজো, রদ্দী মালগুলো আর কেহই রাখিবে না। তাহাকে আমার কাছে আবার আসিতে হইবেই!

তাই! তিনদিনের মধ্যেই ফের সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেদিন তার চেহারা যেন কালি-মাড়া! বুঝিলাম একটা কিছু ঘটিয়াছে।

আজ সে একটি রূপার গিল্‌টি-করা দেবী-মূর্ত্তি বন্ধক রাখিবার জন্য আনিয়াছে। জিনিষটির আসল দাম বড়-জোর ছয় টাকা মাত্র।

মূর্ত্তিটি তাহার হাত হইতে লইয়া বলিলাম, —"এর জন্যে আমি তোমাকে দশ টাকা দিতে পারি।"

—"না, আমি দশ টাকা চাই না— আমাকে পাঁচটি টাকা দিন, মূর্ত্তিটি আমি আবার টাকা শোধ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব!"

কি বল! আর, ওর দাম ত দশ টাকার কম হবে না!"

আবার তাহার নয়নে বিদ্যুৎ! সে কোন উত্তর করিল না। আমি তাকে পাঁচটি টাকাই দিলাম।

বলিলাম, "গরিব বলে কারুকে আমি ঘৃণা করি না! আজ আমি এই ব্যবসা করছি বটে, কিন্তু একদিন আমিও গরিব ছিলাম— এমন-কি, তোমার চেয়েও।"

সে একটু তিক্ত হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ এই ব্যবসায়ে নেমে তাই বুঝি আপনি গরিবের উপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছেন?"

আমি মনে মনে বলিলাম, "হু, পথে এস,—তুমি যে কেমন মেয়ে, ক্রমেই তা বোঝা যাচ্ছে"—প্রকাশ্যে বলিলাম, "না; তা কেন? যারা ভাল হবে ভেবে লোকের মন্দ করতে যায়, আমি হচ্ছি সেই দলের মানুষ।"

সে কহিল, "আপনার কথা বোঝা ভার! কিন্তু আপনি যে কথাগুলি বল্লেন, আমি যেন এর আগে অমনি কথা আর কোথাও শুনেছি।"

"তুমি কি 'ফষ্ট' পড়েছ?"

—"পড়েছি, তবে খুব মন দিয়ে নয়।"

"কথাগুলি 'ফষ্টে' আছে। বইখানা ভাল করে পড়ো। হু,—তুমি যে হাসছ? ভাবছ বুঝি, নিজেকে আমি বিদ্বান বলে জাহির কর্‌ছি? এ তোমার ভুল।"

"আপনি ত বড় ফ্যাসাদে লোক দেখছি! আমি ওসব ভাবতে যাব কেন?"

পরের ভাল কর্ত্তে পারে। আমার নিজের কথা ধরছি না—আচ্ছা, মনেই কর, আমি খালি পরের মন্দই করি, তবু—"

আমাকে বাধা দিয়া, তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে একবার চাহিয়া সে বলিল, "তবু সবসময়ে সব জায়গায় লোকের ভাল কর্ত্তে পারা যায়।"

হায় রে, সেদিনের সব কথা ছবির মত আজ আমার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। সেদিনকার প্রতি মুহূর্ত্তটি আমার স্মৃতির উদ্যানে ফুলের মত ফুটিয়া আছে।

যখনি সে চলিয়া গেল, তখনি মন স্থির করিয়া ফেলিলাম। খোঁজখবর লইয়া তাহার জীবনের কোনো কথা জানিতে বাকি রাখিলাম না।

কি দুঃখের জীবন তাহার! এমন শোচনীয় দারিদ্র্য গোপন রাখিয়া কি-করিয়া যে হাসিমুখে সে আমার সঙ্গে আলাপ করিত, কিছুতেই তা ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। হাঁ, তাহার একটি আশা আছে—যৌবনের সামর্থ্য তাহার সহায়। অভাগীর আঁধার জীবনের সামনে যৌবনই আলোর প্রদীপ ধরিয়া আছে।

আমি তার কথা ভাবিতে লাগিলাম। সে আমার—একান্তই আমার! তাকে আমার মুঠার মধ্যে পাইয়াছি!

কিন্তু—এসব ছাইভস্ম কি বলিতেছি? আমি যদি এমনি আজে-বাজে কথা ভাবিতে থাকি, তাহা হইলে চিন্তার ত কোন অন্ত পাইব না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ-প্রস্তাব

তাহার জীবন-কাহিনী দু-কথায় শেষ করা যায়।

আজ তিনবছর হইল, তার বাপ-মা পরলোকে। সে এখন দুই গরিব খুড়ীর সংসারে আছে। খুড়ীদের একজন ছয়টি সন্তান লইয়া বিধবা; আর-একজন কুশ্রী, বৃদ্ধা, চিরকুমারী। তাহার পিতা ছিল কেরাণী।

দেখিতেছি, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার সহায়। আমি তাদের চেয়ে ভাল ঘরের ছেলে। ভদ্রবংশে আমার জন্ম, সংপ্রতি কাপ্তেনের পদ হইতে অবসর লইয়া স্বাধীন ব্যবসা করিতেছি।

গত তিন বৎসর এই অসহায়া বালিকা তাহার খুড়ীদের সংসারে দাসী-বাঁদীর মত কায়ক্লেশে আছে। অথচ এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ভিতরেও সে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। সংপ্রতি খুড়ীর মেয়ে-ছেলেদের লেখাপড়া শেখানো, কাপড় শেলাই করা, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করা—সংসারের যত কাজ সব তার ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে। চিম্‌টা দিয়া তাহার উপর মার-ধরও করা হয়। আবার খুড়ীরা তাহাকে বিক্রয় করিতেও চায়! তাহার নিজের মুখেই আমি এ-সব ব্যাপার জানিয়াছি, শুনিয়াছি।

তাদের পাশের বাড়ীতে একটা মোটা দোকানী থাকিত। পর পর দুই-দুইটা স্ত্রীকে কবরে পাঠাইয়া সে যখন তৃতীয় শিকার

খুজিতেছিল তখন এই অভাগীর উপর তাহার নজর পড়ে।

পঞ্চাশ বছরের সেই বুড়ো দোকানীটা বালিকার খুড়ীদের কাছে গিয়া বিবাহ-প্রস্তাব করিল। ভয়ে বালিকার প্রাণ উড়িয়া গেল। এই সময়েই সে অন্যত্র চাকরির আশায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। বিজ্ঞাপনের খরচের জন্যই সে তাহার সামান্য জিনিষগুলি আমার কাছে বন্ধক রাখিতে আসিত।

সন্ধ্যার সময় আমি তাদের বাড়ীতে গিয়া ঝী লুকেরিয়াকে ডাকিলাম। এই দাসীর কাছ হইতেই আমি বালিকার সব খবর পাইয়াছিলাম। লুকেরিয়ার মুখে শুনিলাম, সেই মোটা দোকানীটা বাড়ীর ভিতরে বালিকার পাশে বসিয়া আছে।

লুকেরিয়াকে বলিলাম, "মেয়েটির কাছে গিয়ে কাণে কাণে বলে এসগে, একটা দরকারি কথা জানাবার জন্যে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।"

লুকেরিয়ার সঙ্গে বালিকা বাহির হইয়া আসিল। আমি কোনরকম ইতস্তত না করিয়া স্পষ্টাস্পষ্টি বালিকাকে বলিয়া দিলাম যে, যাহাতে তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ হয় সর্ব্বদাই আমার সেই চেষ্টা। আমি খুব চালাক-চতুর লোক নই, হয়ত তেমন সৎও নই—আর লেখাপড়াতেও আমাকে মস্ত একটা দিগ্‌গজ বলিতে পারা যায় না। আমার সঙ্গে বিবাহ হইলে হয়ত সে তেমন খুসী হইতেও পারিবে না; কারণ, আমি তাকে ভাল কাপড়-চোপড়ও দিতে পারিব না, বা থিয়েটার ও বলনাচেও লইয়া যাইতে পারিব না—ইত্যাদি, ইত্যাদি!

আসল কথা, আমি যে নিজে একজন মস্ত ওস্তাদ লোক, বিবাহ-প্রস্তাবের ভিতরে এমন ভাব আমি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করি নাই।

সে যে আমাকে খুব-বেশী পছন্দ করিত না, তা আমি বেশ বুঝিতাম। কিন্তু সেই মোটা দোকানদারটাকে সে যে আমার চেয়েও ঢের-বেশী অপছন্দ করে, ইহাও আমার জানিতে বাকি নাই। সুতরাং আমাকে সে নিশ্চয়ই তাহার মুক্তিদাতা বলিয়া ভাবিবে!

কিন্তু আমাকে বিবাহ করিলে যে তাহার সুখের সীমা থাকিবে না, এ কথাটা আর কোন্ মুখে বলি? তাই সোজাসুজি বলিলাম, "এ বিবাহে আমারই বেশী লাভ—তোমার নয়।"

যাহা হউক, শেষ-বরাবর আমারই জিৎ হইল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে ভাবিতে লাগিল; তারপর আনমনে মৃদু, অস্ফুটস্বরে আপনা-আপনি বলিল, "হুঁ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বল?"

স্বপ্নোত্থিতের মত মাথা তুলিয়া দীর্ঘস্বরে সে বলিল, "অ্যাঁ?—কি?......হুঁ, দাঁড়ান, আমাকে ভাবতে দিন।"

তার ছোট মুখখানি গম্ভীর;—এত গম্ভীর যে, আমার সম্ভ্রম হইতেছিল! তবু মনে একটা আঘাত পাইলাম। সে কি তুলনা করিয়া দেখিতেছে আমি ভাল, কি ঐ দোকানদারটা ভাল?—হায়, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, ভুল বুঝিয়াছিলাম! আজও সে ভুল বুঝি ভাঙ্গে নাই!

যাক্;—আমি তার মত পাইলাম।

মনে পড়ে, আমি যখন চলিয়া আসি, লুকেরিয়া তখন রাস্তায় ছুটিয়া আসিয়া উল্লাসে আমাকে বলিয়াছিল, "আপনি আমাদের দিদিমণিকে বাঁচালেন, ভগবান আপনার ভাল কর্‌বেন মশাই! কিন্তু দিদিমণিকে কোনদিন যেন এমন কথা বল্‌বেন না—বড় অভিমানী তিনি!"

অভিমানী? বেশত, অভিমানী রমণীকেই আমি বেশী পছন্দ করি। রমণীকে বশে আনিতে না পারিলে রাগ হয়,—কিন্তু সময়ে সময়ে রমণীর অভিমান বড় মধুর!

হাঁ, আজও আমার ভুল ভাঙ্গে নাই। যখন সে শুষ্ক, চিন্তান্বিত হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে ভাবিতেছিল কি? "দেখছি, এ-দুজনের যার সঙ্গেই আমার বিবাহ হোক, আমি ত সুখী হতে পার্‌বই না। বরং ঐ দুষ্‌মন মোটা দোকানদারটাকে আমি যদি বিয়ে করি, তাহলে ও মাতাল হয়ে এসে হয়ত একদিন আমার গলা টিপে ধরে এই দুঃখের দুনিয়া থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই দিতে পারে!—দুদিকেই দুঃখ, তবে কোন্ দুঃখকে আমি বরণ কর্‌ব?"

আমাদের দুজনের ভিতরে ভাল কে,—এখনও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই!—তাই কি? না—না, প্রশ্নের জ্বলন্ত উত্তর এই যে আজ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া ঘরের ভিতরে মেজের উপরে পড়িয়া আছে! তবে আমি কোন্ মুখে বলিতেছি, 'এখনও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই'?

এখন আমার কি হবে?—কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না যে! বড়ই মাথার যাতনা—এখন ঘুমাইতে যাই, ঘুমাইতে যাই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবিশ্বাসের ম্লান হাসি

আমি ঘুমাই নাই। এই নীচতা, এই ঘটনার কথা যখনি আমি ভাবিতে গিয়াছি, তখনি মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! কি মলিনতার মধ্য হইতে তাহাকে আমি উদ্ধার করিয়াছি, অন্তত সেটা ভাবিয়াও আমার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল। যদিও, তখন আমার বয়স একচল্লিশ, তার ছিল ষোল।

বিবাহে কোন ঘটা হইল না। ঠিক করিলাম, বিবাহের পর আমার কর্ম্মস্থল মস্কোয় যাইব। কিন্তু আমার স্ত্রী তাতে বাধা দিল। সে বলিল, বিবাহের পর আমি তার খুড়ীদের—যে খুড়ীদের গ্রাস হইতে তাকে আমি উদ্ধার করিলাম—সেই খুড়ীদের কাছে গিয়া থাকিব। তাকে বিস্তর বুঝাইলাম, সে কিছুতেই বোঝ মানিল না। শেষটা আমি তার খুড়ীদের হাত করিবার ফিকিরে রহিলাম। কিন্তু যতক্ষণ-না সেই ধড়িবাজ বুড়ীদুটোর হাতে নগদ একশোখানি টাকা গুঁজিয়া দিলাম, ততক্ষণ অবধি তারা কোন-মতেই বাগ্ মানিতে চাহিল না। যাহা হউক, এ ব্যাপারটা আমার স্ত্রীর কাছে আর ভাঙ্গিলাম না; কারণ আমার নীচতার কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে আমাকে ঘৃণা করিত।

প্রথম হইতেই ফুলভারনত লতার মত প্রেমভারে সে আমার উপরে একেবারে নুইয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা আমি যখন দিনের কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতাম, তখন সে পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিত। তারপর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে তাহার শৈশবের, তাহার যৌবনের, তাহার পিতামাতার, তাহার ঘর-বাড়ীর কত কাহিনীই সে অনর্গল বলিয়া যাইত। হায়, সরল নিষ্পাপ প্রেমের সে অর্দ্ধস্ফুট ভাষা কি মধুর!

কিন্তু এ আনন্দের ভাষাকে আমি আমোল দিতাম না।—আমার স্বভাবটা এমনি আশ্চর্য্য ছিল!

আপন-মনে সে কথার পর কথা কহিয়া যাইত, আমি কিন্তু একেবারে চুপচাপ থাকিতাম। শীঘ্রই সে বুঝিল, আমরা দুজনে দুই ধরণের লোক—আমার ভিতর সহজ সরলতা নাই।

সকল বিষয়েই আমি কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু কেমন সহজেই সে আমার সমস্ত কঠোরতা ভাসাইয়া দিত! আমি কিন্তু কিছুতেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারিতাম না; আমি চাই, শৃঙ্খলা!

কিন্তু কি-করিয়া আরম্ভ করি? আমাদের সংসারের জীবন কেমন ছিল, তাহা বুঝানো বড় কঠিন।

আমার স্ত্রী বলিত, টাকাকে সে ঘৃণা করে। আর আমি বলিতাম, টাকাই সব। যতক্ষণ-না সে বাধ্য হইয়া চুপ করিত, ততক্ষণ আমি তাহার কথার প্রতিবাদ করিতাম। সে তার বড় বড় চোখদুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া আমার মুখে অর্থের গুণগান শুনিত। তার প্রাণটি ছিল উদার; কাজেই আমার মত সংসারসর্ব্বস্ব লোকের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা তাহার পক্ষে শক্ত।

এখন, এমন নারীকে কেমন করিয়া আমার লেন্‌-দেনের ব্যবসার কথা খুলিয়া বলি? কাজেই আমাকে সব চাপিয়া যাইতে হইত। পেটের কথা সহজে আমার জিভের আগায় আসে না—এটা আমার মস্ত গুণ। এই গুণটির জন্য জীবনের অনেক ঝড়-ঝাপটা আমি হাসিমুখে সহিতে পারিয়াছি।

এদিকে ষোল বৎসরের এই ছোট্ট বালিকাটি লোকের কানাঘুষা শুনিয়া আমার দুই-চারিটা গুপ্তকথা কিরূপে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল!—সে স্থির করিল, আমার জীবনের সকল রহস্যই বুঝি ধরিয়া ফেলিয়াছে! তবু আমি কিছুতেই মৌনব্রত ভাঙ্গি নাই—আজ অবধি নয়!

মানুষ কি দেমাকী জীব!

আমার চরিত্র যদি সে বুঝিতে চাহে—বুঝুক না! কিন্তু বদ্‌লোকের কানাকানিতে কেন?—নিজের বুদ্ধির জোরেই তাহাকে বুঝিতে হইবে! বুঝিয়া, আমাকে সে চিনুক!

তাকে একদিন বেশ সপ্রতিভ-ভাবে সোজাসুজি বুঝাইয়া দিলাম, "দেখ, যৌবনের গর্ব্বে মাধুর্য্য আছে বটে, কিন্তু তার দাম একটি কানাকড়িও নয়!"

যৌবন ত বিনাক্লেশে অর্জ্জন করা যায়! তাহাতে তো জীবন-মরণের লড়াই নাই। কিন্তু অর্থলাভের জন্য আমাকে সারাজীবন যুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে খুব তেজেই সে তর্কবিতর্ক করিত। তারপরে ক্রমেই কথাবার্ত্তা কমাইয়া আনিল—আমার মুখের পানে চোখ তুলিয়া সে শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে কথা শুনিয়া যাইত। কেবল, তাহার ওষ্ঠাধরে অবিশ্বাসের একটা ম্লান হাসি মাখানো থাকিত—সে-রকম হাসি আমি দু-চোক্ষে দেখিতে পারিতাম না। মুখে এমনি হাসি লইয়াই সে ঘরকন্না করিতে আসিয়াছিল। আমার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও তাহার দাঁড়াইবার ঠাঁইও ছিল না!

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চয়ন

ফেডর ডোস্টোয়েভ্স্কি

রুশ ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে বাস্তব উপন্যাস রচনায়, ফেডর ডোষ্টোয়েভ্স্কির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বাস্তবতা রুশ ঔপন্যাসিকগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও, ডোষ্টোয়েভ্স্কির মতন এত নিবিড়ভাবে আর কোন রুশ-লেখক বাস্তবতাকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

টলষ্টয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন, গুরুমশায়ের সাজে; কিন্তু ডোষ্টোয়েভ্স্কি সে ধার দিয়াই যান নাই। তাঁহার সহযোগী ঔপন্যাসিক শেখভ (গত আশ্বিনের ভারতীতে শেখভের একটি গল্পের তর্জ্জমা বাহির হইয়াছে), রঙ্গ-ব্যঙ্গে মস্ত ওস্তাদ ছিলেন; ডোষ্টোয়েভ্স্কির লেখায় এ-রকম হাস্যরসও নাই—অথচ তাঁহাকে দুঃখবাদীও বলা চলে না। কারণ, অন্ধকার যেখানে সূচীভেদ্য, সেখানেও তিনি আশার বাতী দেখিতে পান; তাঁহার সৃষ্ট অধঃপতিত মানব-আত্মার ভিতরেও পুনরুত্থানের একটা মধুর সম্ভাবনা পাওয়া যায়। তাঁহার মতে, জীবনের সকল জ্বালাযন্ত্রণা প্রেমের স্নিগ্ধ প্রলেপে জুড়াইয়া যায়; প্রেমগুণে মহাপাপীও উদ্ধার লাভ করে—ডোষ্টোয়েভ্স্কির রচনার পরতে পরতে স্বর্গীয় প্রেমের এমনি মহামহিমার অজস্র ধারা বহমান। তাঁহার Crime and Punishment ও Letters from the Underworld নামক উপন্যাস-দুখানিতে এই সকল গুণ সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিবে।

টলষ্টয় ছবি আঁকিয়া সকলের চোখে-আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেন যে, ছবির কোথায় কি নৈতিক উপদেশ আছে; কিন্তু ডোষ্টোয়েভ্স্কির কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তিনি কেবল চিত্রাঙ্কন করিয়াই ক্ষান্ত হন—চিত্র ও দর্শকের মধ্যে শিক্ষকের মত মধ্যস্থতা করিতে চান না, —যাঁহার ইচ্ছা তিনিই তাঁহার ছবি দেখিতে, নিজের খুসিমত যেমন বুঝিয়াছেন

তেমনি ভাবিতে পারেন। দর্শককে তিনি স্বাধীন চিন্তাশক্তি ব্যবহারের সুযোগপ্রদান করেন।

ডোষ্টোয়েভ্স্কির প্রেমবাদেও একটু আলাদা ধরণ আছে। সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা বিচরণ করে, যাহারা মাতাল, যাহারা রোগী, যাহারা কৃপণ, যাহারা বারবনিতা—ডোষ্টোয়েভ্স্কির প্রাণ সর্ব্বদাই তাহাদের জন্য ব্যথিত, তাহাদের জন্য কাঁদিয়া আকুল। পরন্তু, তাঁহার সৃজিত চরিত্রগুলি বাহিরে ছোট হইলেও ভিতরে বড়,—তাহাদের অনেকেরই চিত্তে অতৃপ্ত প্রেমের ফল্গু সকলের অসাক্ষাতে বহিয়া যাইতেছে—তাহাদের কেহ প্রেম-বিনা পাগল, কেহ প্রেমের আস্বাদ পাইয়া পাগল! তাহাদের কেহ বলে, "শৈশবে আমি যদি বাপ-মায়ের ভালবাসা পেতাম আজ তাহলে আমার এমন দুর্দ্দশা হোত না!"—তাহাদের কেহ পিতা,—"দেহে তিনি ছেঁড়াখোড়া ময়লা, পুরাণো কাপড় ছাড়া আর কিছু পরেন না, অথচ নিজের মেয়ের সুখের জন্য তিনি অম্লানমুখে রাণীর পোষাক কিনিয়া দিতে পারেন......মেয়ের মুখ চাহিয়া তিনি ভিখারী হইতেও প্রস্তুত......প্রতিদানে তিনি যদি কন্যার ওষ্ঠ হইতে একটুখানি প্রেমের হাসি পান!"—তাহাদের কেহ বলে, "যেখানে প্রেম নেই সেখানে জ্ঞানও নেই"—কেহ বলে, "ধীর হয়ে যে ভালবাস্‌তে পারে, জীবন তার কাছে আনন্দের মত",—কেহ বলে, "প্রেম হচ্ছে সকল রত্নের সেরা রত্ন, নিখিল বিশ্ব এই প্রেমের ভিতরেই কেন্দ্রীভূত......প্রেমের জন্যই মানুষ আত্মদান করবে—প্রেমের পায়েই সে হাসিমুখে জীবন বিকিয়ে দেবে!"—ডোষ্টোয়েভ্স্কির একখানি উপন্যাসে, এক নরদ্বেষী লম্পট আর-একজন সমাজত্যক্ত হতভাগ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "মনে একবার ভাব দেখি, তুমি যদি তোমার বুকের ভিতরে একটি নাছোড়বান্দা ছোট্ট খোকাকে পেতে, তাহলে কি তোমার আজ এমনিধারা হাল হোত?......স্বামী, স্ত্রী আর খোকা, এই তিনে যখন এক হয়ে—একেবারে এক-প্রাণ হয়ে যায়, তখন যেমন সুখ পাওয়া যায়, তেমন সুখ কি আর আছে?"

অনেক ঔপন্যাসিক, কেতাবী বাস্তবতার অনুরক্ত। পৃথিবীর নিত্য-নৈমিত্তিক ভীষণ ঘটনাগুলি তাঁহারা কল্পনায় দেখিয়া রচনা করেন; ডোষ্টোয়েভ্স্কি সে-শ্রেণীর লেখক নন। সংসারে নরক যাহাকে বলে,—ডোষ্টোয়েভ্স্কি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন;—সে দেখাও কেবল নির্লিপ্ত দর্শকের দেখা নয়—অমনি এক নরকে বন্দী বাসিন্দা হইয়া, শত শত সমাজত্যক্ত নষ্টাত্মার সঙ্গে তিনি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া, উচ্চাসনে উপবিষ্ট সমাজপতিগণের সম্মুখে তিনি নরকের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"এ ছবি দেখিয়া সমাজ কি বলিতে চায়?" সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণীর উপরে তিনি দোষারোপ করেন নাই;—তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন, দর্শককে ডাকিয়া আনিয়া তাহাই দেখান এবং দেখাইয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করেন। সভ্যতার যে কত অপরাধ, কত

ছিদ্র, কত ক্ষুদ্রতা, সমাজের যে কত অসম্পূর্ণতা, কত ক্রটি-বিচ্যুতি, কত অবহেলা, সংসারের পিচ্ছল পথে অভাবের তাড়নায়, ধনীর অত্যাচারে, মানুষের হীনতায় মানুষ যে কত নীচে ধাপে-ধাপে নামিয়া যায়, ডোষ্টোয়েভ্স্কির অঙ্কিত মানব-প্রকৃতির বাস্তব আলেখ্যে নিখুঁতরূপে তাহা চিত্রিত। তাঁহার ছবিগুলিকে বিদেশের ছবি, রুশিয়ার ছবি বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিলে চলিবে না—কারণ সেগুলি কেবল রুশিয়ার চিত্র নহে—সেগুলি সমস্ত পৃথিবীর আধুনিক সামাজিক জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি—তাহার ভিতরে একটা বিপুল সার্ব্বত্রিকতা আছে। তিনি যে মানুষগুলির হৃদয় ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন, সে মানুষগুলিকে আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সার্ব্বজনীনতা ডোষ্টোয়েভ্স্কির উপন্যাসের একটা প্রধান লক্ষণ।

'ভারতী'র বর্ত্তমান সংখ্যায় ডোষ্টোয়েভ্স্কির যে ক্ষুদ্র উপন্যাসখানির অনুবাদ ("সুচরিতা") আরম্ভ হইল, লেখক তাহাতে দেখাইতে চাহিয়াছেন, একজন সুদ্‌খোর, কর্কশ-স্বভাব মহাজন প্রেমের মহিমায় কিরূপে সদাশয় হইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রাণ দিয়া সে তাহার স্ত্রীকে ভালবাসিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনার একগুঁয়েমি ও কড়া মেজাজ কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। ফলে, না-জানিয়া না-বুঝিয়া আপনার প্রেমবতী পত্নীর বক্ষেই সে দুঃখ-যাতনার শূল বিদ্ধ করিয়াছিল।

পুস্তকের ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন:—"এই গল্পটিকে যদিও আমি "কাল্পনিক গল্প" বলিয়াছি, তথাপি ইহার মূলে সম্পূর্ণ বাস্তব উপাদান আছে।

মনে কর, একজন লোকের পাশে তাহার স্ত্রীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় লোকটির হৃদয় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; কি করিতে কি হইয়াছে সে তাহা ভাবিতে চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না বরং মাঝে মাঝে আপনার চিন্তাসূত্রের খেই হারাইয়া ফেলিতেছে। একবার মনে করিতেছে, তার স্ত্রীই সকল দোষে দোষী,—এ দুর্ঘটনায় তার কোন হাত নাই। কিন্তু এই আত্মপ্রবোধে তাহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিতেছে না—তাই পর-মুহূর্ত্তেই আবার সে বিপরীত চিন্তা-ধারায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। দুঃখে ও উত্তেজনায় সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অবশেষে, ক্রমে ক্রমে আত্মস্থ হইয়া সে যথার্থ সত্য বুঝিতে পারিল। এইজন্যই তাহার আত্মউক্তি আরম্ভে যেমন বিশৃঙ্খল ছিল, শেষকালটায় আর তেমনধারা রহিল না।

এইরূপ দীর্ঘ আত্মউক্তি ঠিক স্বাভাবিক না হইলেও, কলা-রাজ্যে ইহার ব্যবহার নূতন নহে। ভিক্টর হুগো তাঁহার "The Last Day of Condemned Criminal" নামক পুস্তকে (ইহার বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে "বন্দী" নামে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে) ঠিক এই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তির পক্ষে যদিও তাহার জীবনের শেষদিন, শেষঘণ্টা—এমন-কি শেষ মিনিট পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ ও মানসিক ভাবের বিশ্লেষণ

লিখিয়া রাখা সম্ভব নহে,—তথাপি, ভিক্টর হুগো যদি এই বিশেষ পদ্ধতিটি অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তব ও স্বাভাবিক এই উপন্যাসখানি লিখিবার কোনই সুযোগ পাইতেন না।"

আল্‌বার্ট বেস্‌নার্ডের ভারতীয় চিত্র

আলবার্ট বেস্‌নার্ড আধুনিক ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত চিত্রকর। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে—তাঁহার বয়স যখন পঁচিশ বছর, তখন তিনি prix de Rome নামক স্কলারশিপ লাভ করেন। সেইদিন হইতে অদ্যাবধি কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি কলারাজ্যে অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ ওস্তাদ-চিত্রকরগণ, রমণীর পট আঁকিতেই জীবনের বেশীভাগ কাটাইয়া দিতেন। বেসনার্ডও এই পথ ধরিয়াছেন। নিসর্গ চিত্রেও তিনি সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার অঙ্কিত বিবিধ আলেখ্যে কেবল প্রতীচ্যের বহিঃপ্রকৃতিই বিকাশলাভ করে নাই—তাঁহার তুলিকার মায়া-স্পর্শে সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রাচ্যের অনেক বিচিত্র দৃশ্যও প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকার বিরাট মরুভূমির জ্বলন্ত বর্ণ-কাব্য তাঁহার পরিকল্পনায় যেমন ফুটিয়াছে, তেমন আর কোথাও বড়-একটা দেখা যায় না।

গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বেস্‌নার্ড সস্ত্রীক ভারত-ভ্রমণে আসিয়া এখানে ছয়মাসকাল কাটাইয়া গিয়াছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষকে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন :—

"ভ্রমণকারীদের উজ্জ্বল বর্ণনা পড়িয়া ভারতভূমিকে কল্পনায় যে উচ্চাসন দিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া দেখিলাম, তার চেয়েও বিচিত্রসুন্দরী সে!"

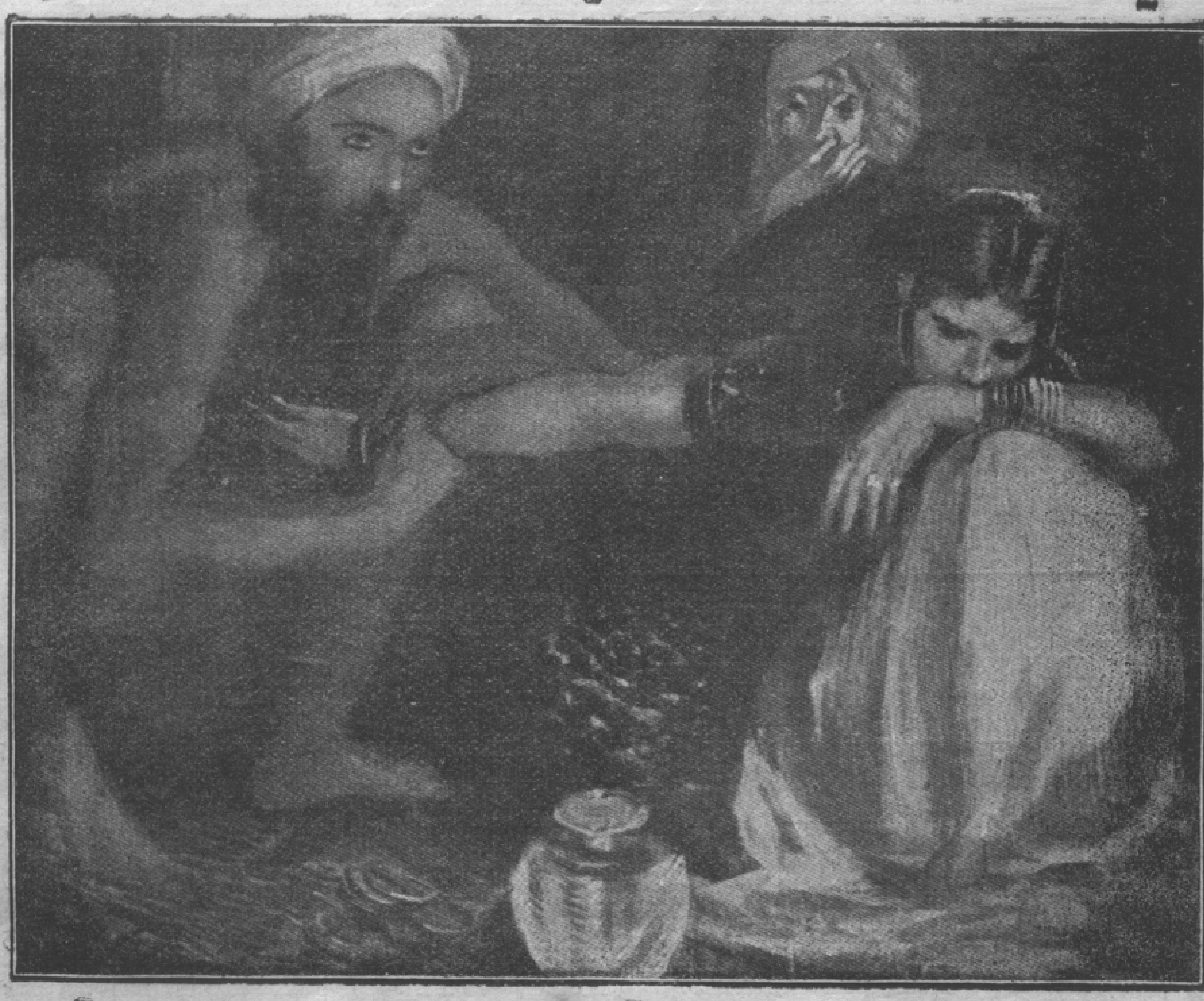
চিত্রকরেরা সাধারণত সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়া কলম ধরেন না; কিন্তু বেস্‌নার্ড একসঙ্গে চিত্রশিল্পী ও শব্দশিল্পী—তাঁহার রচনা-ভঙ্গী অতিশয় চিত্তহারী। ভারতবর্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে যে-সকল ভাবের ছাপ্ পড়িয়াছে, একই হাতে তুলি ও কলম ধরিয়া তিনি পটে ও খাতায় সেই সকল ভাবের রূপ চিরস্থায়ী করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শব্দ-চিত্রের দু-এক জায়গা তুলিলাম :—

"পাহাড়ের উপরে যে নদীটি শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছিল, এখানে সেই নদীটিই ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে বিদ্যুৎবেগে গিরিমালার চরণোদ্দেশে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। উপরে দাঁড়াইয়া নিচের দিকে চাহিলে মনে হয়, ওখানে যেন একটি বৃহৎ জলপাত্র রচিয়াছে;—রাশি রাশি ফেণার ভিতরে সেখানে আমি স্নানকারীগণকে দেখিতে পাইলাম। তাহাদের অঙ্গভঙ্গি দেখিলে সন্দেহ হয়, বুঝি তাহারা কোনরকম ধর্ম্মবিধি পালন করিতেছে! জলপ্রপাতের আশপাশের উচ্চ পর্ব্বত এবং পত্রবহুল বৃক্ষমালার রুক্ষ ছা-

সকলকেই যেন কি-একটা রহস্যের মত বোধ হইতেছে। পাহাড় যেখানেই একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, গাছের ডাল যেখানেই একটু সরিয়া গিয়াছে, সেইখানেই ফাঁক পাইয়া সূর্য্যকর প্রবেশলাভ করিয়া কোথাও কোন স্নানার্থীর মস্তক,কোথাও স্কন্ধ, আবার কোথাও-বা একটা কবন্ধ ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তিকে যতটুকু-পারে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।”

“ঐ দেখ, মন্দিরের দ্বারপথ! আমরা ক্রমেই নিকটস্থ হইতেছি; মরণোন্মুখ দিবা-লোক বাড়ীর ছাদে ছাদে ও গাছের মাথায় মাথায় যেন বেগুণিরঙ্গের কুঙ্কুম ছড়াইয়া দিতেছিল। বিপুল দ্বারের ভাঁজ-করা কপাটের খানিকটা খুলিয়া যাইবামাত্র এমন একটা আকস্মিক শব্দ উঠিল যে, হৃদয় আমার স্তম্ভিত হইয়া গেল। দান্তে যখন ক্রুদ্ধ আত্মাগণের পুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারও মনের ভাব বোধ করি, এমনিধারা হইয়াছিল!”

বেস্‌নার্ড সর্ব্বপ্রথমে সিংহলে উপস্থিত হইয়া সেখানকার বৌদ্ধ মঠ-মন্দির পরিদর্শন করেন। তারপর একে একে কাশী, আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর, আমেদাবাদ, বোম্বে দেখিয়া মাদুরায় গিয়া উপস্থিত হন। এখানে ষোলদিন থাকিয়া তিনি অনেক-গুলি ছবি আঁকেন। তারপর তিনি ত্রিচিনা-পল্লী, তাঞ্জোর, পণ্ডিচারী, মান্দ্রাজ, হায়দ্রা-বাদ ও কলিকাতা দর্শন করেন।



চুড়িওয়ালা

৬



নর্ত্তকী

এই ভ্রমণের ফলে বেস্‌নার্ড যে-সকল ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতর বেশীর ভাগই দক্ষিণ দেশের। ভারতের উত্তরাংশে অবরোধ-প্রথার কড়াক্কড়ি বড়ই অধিক। এমন-কি, বেস্‌নার্ডের সহধর্ম্মিনী পর্য্যন্ত সহজে উত্তর-ভারতের গোপন অন্তঃপুরে ঢুকিতে পারেন নাই।

বেস্‌নার্ডের আঁকা চিত্র-মালায় সেইজন্য আমরা যে-সকল নারীমূর্ত্তি দেখি, সাধারণত তাহারা নিম্নশ্রেণীর ভারতীয় রমণীর আদর্শে

অঙ্কিত; কিন্তু মূর্ত্তিগুলি যে শ্রেণীরই হোক —বেস্‌নার্ডের ছবিতে ভারতের সাধারণ নর-নারীর বাহিরের রূপ যে ঠিকমত ফুটিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক-একখানি ছবি আবার এতটা বাস্তব যে, দেখিলেই জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। যেমন "চুড়িওয়ালা"। এক রূপসী খরিদ্দারের পরিপুষ্ট সুডৌল হাত হইতে চুড়িওয়ালা খুব-কষা একগাছা চুড়ী জোর করিয়া খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সুন্দরীর মুখে সলজ্জ ব্যথার ভাব, ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুড়িওয়ালাকে বাধা দিবার ভঙ্গীটি ছবিতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর-একখানি ছবিতে 'নর্ত্তকী'র চেহারা নিপুণতার সহিত আঁকা হইয়াছে। এ-রকম নর্ত্তকী আমরা ভারতের সব জায়গাতেই পথে-ঘাটে যখন-তখন দেখিতে পাই।

রোশেনারার ভারতীয় নৃত্য

রোশেনারা যখন নাচেন, বিলাতী থিয়েটারে তখন আর তিলধারণের ঠাঁই থাকে না—তাঁহার নাচের তালে তালে দর্শকের মনও নাচিতে থাকে!

কলাবিদেরা বলেন, "কোন দেশের নাচে ও গানে সেই দেশের, সেই জাতির নিজস্ব ভাবটি ধরা পড়ে—যেমন, প্রজাপতি ধরা পড়ে জালের ভিতর!"

রোশেনারার নাচেও তাই ভারতবর্ষের আত্মা জাগিয়া উঠে;—একালের ট্রাম-রেল-লাইনে ভরা ও টেলিগ্রাফের তারে-ঘেরা ভারত নয়—সেকালের সেই বিস্মৃত দিবসের রূপ-কথার ভারতবর্ষ রোশেনারার নাচের তালে ও গানের তানে স্বপ্নের মত আত্মপ্রকাশ করে।

রঙ্গমঞ্চের কৃষ্ণ যবনিকায় আড়াল হইতে আগে একখানি ধবল হস্ত সাপের ফণার মত ভঙ্গীতে বাহির হইয়া উপরে-নীচে ডাইনে-বামে উঠিতে নামিতে হেলিতে দুলিতে থাকে; তারপর হঠাৎ যবনিকা সরিয়া যায় এবং সর্প-নৃত্যের অপূর্ব্ব পোষাক পরিয়া রোশেনারা দর্শকদের সামনে আসিয়া দাঁড়ান —তখন তাঁহার হাতদুখানি দেখিলে প্রাণে চমক লাগে, সে-যেন দুটি জীবন্ত সর্প!

এই সর্প-নৃত্য ভারতেরই নিজস্ব। দেবতার সম্মুখে এই নৃত্য-ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। সর্প-নৃত্য শিখিবার জন্য রোশেনারা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। নাচ যাহাতে স্বাভাবিক হয়, সেজন্য তিনি সাপুড়ে ডাকাইয়া জীবন্ত সর্পের নৃত্য-ভঙ্গি মনোযোগের সহিত অনেকদিন ধরিয়া পরখ করিয়াছিলেন।

রোশেনারা ভারত-মহিলা নন—একেবারে খাঁটি য়ুরোপীয় বংশে তাঁহার জন্ম। কিন্তু ভারতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব ও আদব-কায়দায় তিনি এমনি কেতাদুরস্ত যে,

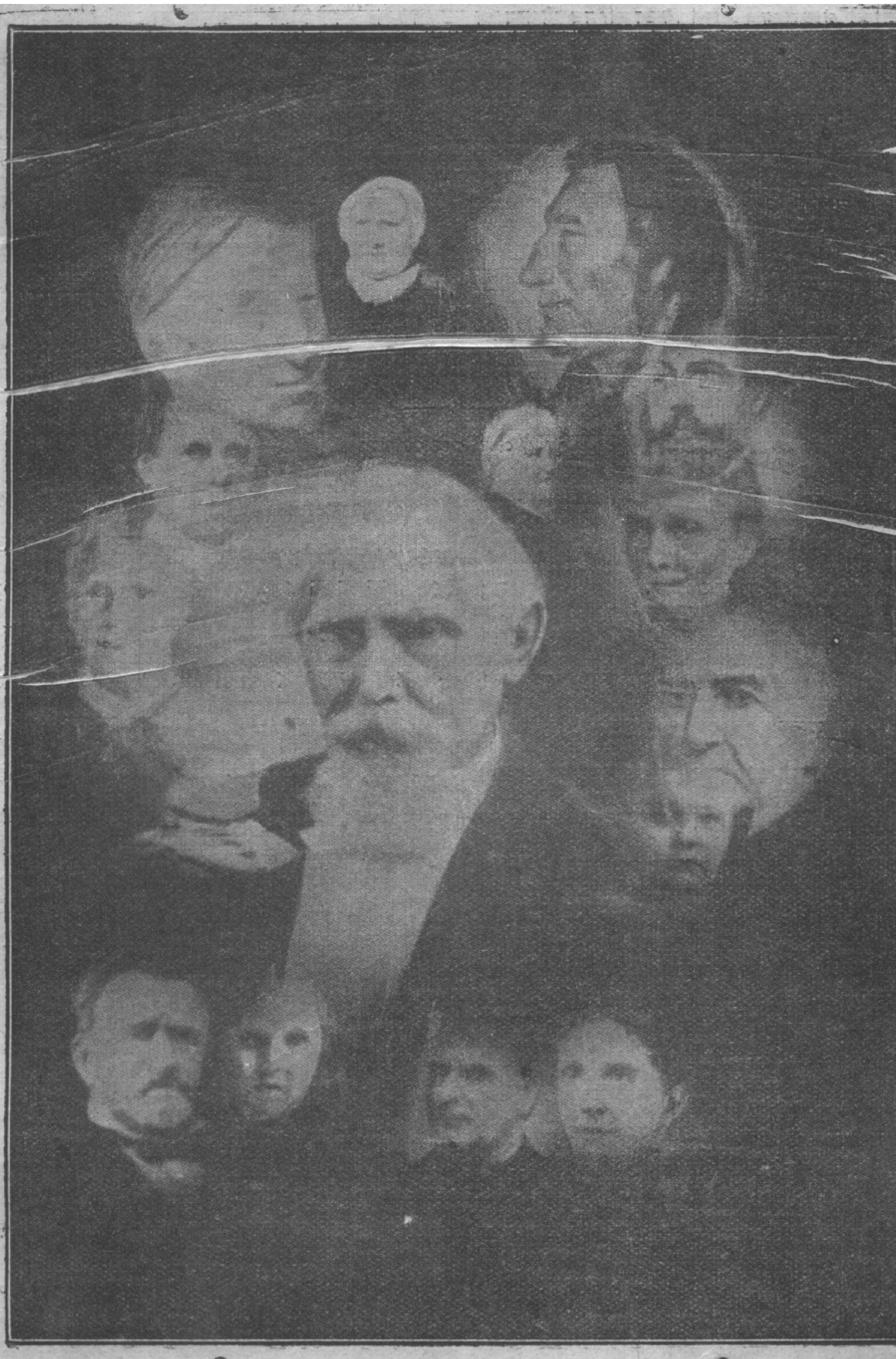
তাঁহাকে কিছুতেই কেহ ইংরাজ বলিয়া ঠাওর করিতে পারে না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, রবিবর্ম্মার চিত্রপট ছাড়িয়া কোন মূর্ত্তি যেন কার যাদু-মন্ত্রে হঠাৎ সজীব ও নৃত্যানন্দে উচ্ছ্সিত হইয়া নাট্যমঞ্চের উপরে আবির্ভূত হইয়াছে!

রোশেনারার আর-একটি বিখ্যাত নৃত্য আছে। দাক্ষিণাত্যে ফসলের সময়ে, কৃষক-বালারা কুলা লইয়া ময়দানে যায়। সেখানে কুলা নাড়িয়া কাল্পনিক শস্য ঝাড়িতে ঝাড়িতে বাতাসে যেন তুষ উড়াইয়া দিতেছে, এমনি ভান করিয়া সকলে একসঙ্গে একতালে নৃত্য করিতে থাকে। কৃষক-কন্যাদের ঐ সমবেত নৃত্যের অনুকরণেই রোশেনারার বিখ্যাত "স্বর্ণশস্য-নৃত্য"। এই নাচে রোশেনারাকে কি-রকম চিত্রার্পিতের মত সুন্দর দেখায়, "স্বর্ণশস্য-নৃত্যে"র ছবি দুই-খানি দেখিলেই সকলে তাহা কতকটা আন্দাজ করিতে পারিবেন।

রোশেনারা বলেন, "য়ুরোপের ঐক্য-তানের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতকে শ্রবণোপযোগী করিতে গিয়া আমাকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইংরাজ শ্রোতারা কিছুতেই ভারতীয় গান শুনিতে রাজি হন না—সে গানে যে কি মাধুর্য্য তাও তাঁরা বুঝিতে পারেন না। একবার আমি একজন ভারতীয় ঢুলিকে বিলাতে আনিয়াছিলাম। সে কিন্তু ইংরাজী ব্যাণ্ডের সঙ্গে কোনমতেই বাজনা বাজাইতে চাহিল না; আবার ব্যাণ্ডের লোকেরাও বলিল, 'এ বাজন্‌দারটা গানের কিছুই জানে না, বুঝে না!'—কাজেই আমি বাধ্য হইয়া মধ্যপথ ধরিলাম,



"স্বর্ণ-শস্য-নৃত্য"



প্রেতাত্মা-বেষ্টিত ডাঃ হস্‌ম্যান

বিলাতী গায়কদের দ্বারা ঐক্যতানের উপযোগী করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতেই আমি সুরসংযোগ করাইলাম।

ভারতীয় নৃত্যকলা আমি অত্যন্ত পছন্দ করি—বাস্তবিকই তাহা অপূর্ব্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের নানাপ্রকার নৃত্যের অধিকাংশই অযত্ন-অনাদরে হয় একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, নয় যায়-যায় হইয়া আছে।"

ভারতবাসী হইয়াও ভারতীয় নৃত্য বলিতে আমরা বাঈজীদের জঘন্য নাচ বা থিয়েটারের সখীদের না-ফিরিঙ্গি না-দেশীয় নগণ্য নৃত্য ছাড়া আর-কিছু বুঝি না। কিন্তু একজন ইংরাজ-মহিলা যে আমাদেরই অনাদৃত নৃত্য-কলাকে স্বদেশে পরিচিত ও সমাদৃত এবং তাহার অবনতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন, ইহা দেখিয়াও কি আমাদের মাথা লজ্জায় হেঁট হইয়া যাইবে না?

মরণের পরপারে

"মৃত্যুই চিরনিদ্রা" নহে—এ-যুগের পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা বিধি প্রকারে তাহা প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন। দেহ-নাশের সঙ্গে-সঙ্গেই যে সব শেষ হয় না, এ কথা অনেক দিনের পুরানো কথা। মৃত্যুর পর অস্তিত্বের বিশ্বাস চিরকালই সব দেশে আছে, অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই তাহা অন্ধবিশ্বাসের মত; কিন্তু আজকাল আধুনিক জ্ঞানের সীমাকে অস্বীকার করিয়া নহে, স্বীকার করিয়াই এই মতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। এই কাজে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় নামজাদা পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক প্রাণপণে লাগিয়াছেন। সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটির সভ্যগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরলোকের রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন—তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের প্রকাশিত বিবরণী পড়িলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। সহজে বিশ্বাস হয় না কিন্তু এমন সব নামজাদা লোক এই সব আশ্চর্য্য ঘটনার সাক্ষী যে তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসও করা যায় না। এমন সব ঘটনা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে মরণের পরপারে দেহমুক্ত আত্মার একটা সজীব অস্তিত্ব থাকে; এমন-কি অনেক সময়ে তাঁহারা পৃথিবীর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্তও করিতে আসেন। প্রফেসর সার উইলিয়ম ক্রুক্স্ Kt., O. M , F,R.S., D. Sc , সার অলিভার লজ Kt., F. R. S. D, Sc., এ, আর, ওয়ালেশ, সার জেমস পাগেট, সার ডব্লু, এফ, ব্যারেট, সি, এফ, ভারলে প্রভৃতি অনেক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মৃত্যুকে এখন নবজীবনের সোপান বলিয়া মনে করেন।

আমরা এখানে পণ্ডিতদের তর্কবিতর্ক না তুলিয়া একখানি ফটোর প্রতিলিপি দিলাম। এ-খানি ডাঃ থিয়োডোর হস্ম্যানের ছবি। এই আশ্চর্য্য ফটোখানি তুলিবার পরে দেখা গেল, হস্ম্যানের মূর্ত্তির উপরে ও চারিপাশে কবি দান্তে, রাজনৈতিক গ্ল্যাডষ্টোন, প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্ট, প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিন্‌লে প্রভৃতির সঙ্গে হস্ম্যানের তিনজন মৃত আত্মীয়ের ছায়ামূর্ত্তির মুখ রহিয়াছে!

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

বিনা নাবিকে জাহাজ-চালনা

বিনা তারে সংবাদ-প্রেরণের কথা এখন আর নূতন নহে। সম্প্রতি তার চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে—বিনা নাবিকে জাহাজ যে চালানো যায় তাহাও দেখিতেছি।

জাহাজে জনপ্রাণী নাই—অথচ অতি শৃঙ্খলার সহিত উহা পর্ব্বতসঙ্কুল সমুদ্র-মধ্য দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া নিরাপদে ছুটিয়া চলিয়াছে; তীরদেশে উপবিষ্ট প্রভুর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে জাহাজে হাজার তড়িতের বাতি জ্বলিয়া উঠিতেছে—শক্তিশালী ইঞ্জিন নড়িয়া উঠিতেছে; এমন-কি রাত্রির জমাট অন্ধকারের ভিতরেও এই অপূর্ব্ব পোতখানি ঠিক নিয়মিতভাবে তীরবেগে অগ্রসর হইতে পারে! জগতে বিজ্ঞানের নূতন শক্তির ইহাই ঘোষণা।

সমুদ্র-উপকূলে পর্ব্বতোপরি ৩৬০ ফিট উচ্চ দুইটি স্তম্ভ স্থাপিত। সেই স্তম্ভের উপরে একটি মঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া আবিষ্কারক জন্ হেমণ্ড Radio-Dynamics এর শক্তিতে বিনা তারে সমুদ্রে জাহাজ চালাইয়া থাকেন।

সেফিল্ডের বিদ্যালয়ে হেমণ্ড ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। একদিন তিনি গণিতের কোন অধ্যাপকের সহিত নানা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা উঠিলে হেমণ্ড সহসা বলিয়া উঠিলেন—"একদিন আমি কোনো চলন্ত জিনিষকে দূর হইতে আমার নিজের ইচ্ছায় চালিত করিব।"

হেমণ্ড যথার্থ অন্তর হইতেই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। কারণ আপন বাক্যের সত্যতা তিনি কতদূর প্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহা বুঝা যাইবে।

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে হেমণ্ড স্থির করিলেন, তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই জীবন কাল অতিবাহিত করিবেন।

তিনি অধ্যবসায়ের সহিত Gloucester-এ —Radio Dynamics লইয়া নানারূপ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত কতকগুলি বিচিত্র আবিষ্কারের তথ্য লোকমুখে শুনা যাইতে লাগিল। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের ময়দানে একটী স্তম্ভের উপর আলোক-রশ্মি ফেলিয়া অনেক আশ্চর্য্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইত। আলোকরশ্মি-পাতে কখনও স্তম্ভের উপরে আপনা-আপনি একটী বাঁশী বাজিয়া উঠিত, কখনও "ডিনামাইট" বিস্ফোরিত হইত, এবং কখনও-বা স্তম্ভের বাতিগুলির লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি বর্ণ-পরিবর্ত্তন ঘটিত।

স্তম্ভটীর সহিত হেমণ্ডের তার বা অন্য কোনপ্রকারের সংযোগ ছিল না। স্তম্ভে একটী ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক যন্ত্র সংযুক্ত থাকিত, আলোক-রশ্মিপাতে ত'হাই শক্তিসম্পন্ন হইয়া, —বিজ্ঞানের সহজ নিয়মেই এই সকল আশ্চর্য্য কার্য্যসাধন করিত।

প্রফেসার জেকব লোয়েবের একটী 'থিওরি' এই যে, পতঙ্গ-দেহে কোনো রাসায়নিক পদার্থ আছে বলিয়াই উহারা আকৃষ্ট হইয়া আলোয় উড়িয়া পড়ে। এই 'থিওরি'টি অবলম্বন করিয়া হেমণ্ড

আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রথম-প্রথম উপকূল হইতে সমুদ্র-বক্ষে জাহাজে আলোক ফেলিয়া উহাকে চালিত করিতেন। জাহাজে কতকগুলি Solenium cell থাকিত। আলোক-রশ্মিপাতে Solenim শক্তিসম্পন্ন হওয়াতে জাহাজের সমস্ত যন্ত্রগুলি আপনা-আপনি সচল হইত। কিন্তু কেবল এই উপায়ে দূর হইতে জাহাজ পরিচালনা-কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া হেমণ্ড এক নূতন প্রণালীতে, অর্থাৎ বিনা-তারে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তৎসাহায্যে ইচ্ছানুরূপ জাহাজ চালাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

আপনার নব আবিষ্কারের প্রথম ফল-পরীক্ষার দিনে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে তিনি স্বভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার বিজ্ঞানাগারের এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠের ছাদ হইতে একটি Wireless transmitter যন্ত্র লম্বিত ছিল; নিম্নে একটী টেবিলের উপর জাহাজ-চালন-যন্ত্রের মত একটী যন্ত্র রক্ষিত এবং দুইটী চুম্বক-যন্ত্রের মধ্যে জাহাজের হাইলটী ঝুলানো ছিল। হেমণ্ড একটী চাবি টিপিয়া উপরের যন্ত্র হইতে এই চুম্বক-যন্ত্রদ্বয়কে শক্তিসম্পন্ন করিলেন। তাহার ফলে হাইলটী তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণে ও বামে সরিয়া আসিতে লাগিল।

হেমণ্ড তাঁহার অভিনব আবিষ্কারের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন যে, আপনার ক্ষুদ্র বিজ্ঞানাগারের সহিত পৃথিবীর প্রশস্ততর [illegible] প্রভেদ। প্রতিদিন নূতন নূতন বাধা-বিপত্তির জন্য তাঁহার পরীক্ষা তাই বহুকাল ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকর হইতে পারে নাই।

অনেক বিফলতা, অনেক পরীক্ষার পর অবশেষে হেমণ্ডের একান্ত সাধনাগুণে "Rabio" নির্ম্মিত হইয়া সাগরজলে ভাসমান হইল। এই জাহাজ ৪০ ফিট দীর্ঘ ও ১৮০ অশ্বশক্তি-সমন্বিত এবং ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগবান।

"Rabio" এবং এই অত্যাশ্চর্য্য জলযান-সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এইরূপ:—

"কিছুদিন হইল, এক রাত্রিতে আমি পর্ব্বতের মঞ্চোপরি উপবিষ্ট "Rabio"র পরিচালক-মহাশয়ের পার্শ্বচর হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ইনি বহুদূরবর্ত্তী একখানি জাহাজকে এখানে বসিয়াই অন্ধকার রাত্রে আট মাইল ব্যাপী আঁকা-বাঁকা শৈল-সঙ্কুল দুর্গম সাগর-পথে চালাইয়া, তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আবার বন্দরে ফিরাইয়া আনেন।

"এই জাহাজ নিজের এঞ্জিনের জোরেই চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু বহুদূরের উপকূল হইতে পরিচালক ইহার গতি ও বেগ নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহার সাহায্য ভিন্ন জলযানটী একটুও নড়িতে চড়িতে পারে না।

"পরিচালকের কানে একটী দূরশ্রবণ-যন্ত্র (Telephone) লাগানো থাকে। ইহার সাহায্যে তিনি বিনা-তার-যন্ত্রের বায়ুতরঙ্গ শুনিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।

"পরিচালক-মহাশয় একটী চাবি টিপিয়া ধরিবামাত্র এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে লাগিল। একটী আলোক-স্ফুরণ ও ক্ষীণ

'হিস্-হিস' শব্দ ভিন্ন আমি আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলাম না; অথচ, ইহারই প্রভাবে নীচে, অনেক তফাতে বিদ্যুৎ-উৎপাদন-গৃহে এক তুমুল শক্তির বিকাশ হইয়াছে এবং সেই শক্তিতে জাহাজটী আপনি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"জাহাজটী এতক্ষণ নীচে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া চালকের আদেশ-প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। উপকূলের একটী বৃহৎ "সার্চ্চলাইট" হইতে আলোক-রশ্মি পড়িয়া বাষ্পাচ্ছাদিত জাহাজটীকে তুষার-ধবল দেখাইতে ছিল। কোনো যুদ্ধ জাহাজেও আজ পর্য্যন্ত এত বৃহৎ ও প্রখর আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। সমুদ্রের সাত মাইল দূর পর্য্যন্ত ইহা ১৮৬,০০০,০০০ মোমবাতির আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া থাকে।

"মঞ্চ হইতে পরিচালক অতি সহজেই এই "সার্চ্চলাইট"টীকে ইচ্ছামত উপরে-নীচে —দক্ষিণে-বামে ঘুরাইতে পারেন। কিছু দূরের একটী গৃহে বাতিটী রক্ষিত। এই প্রখরপ্রভ আলোক নিকটে থাকিলে পাছে পরিচালককে অন্ধ করিয়া দেয়, সেই ভয়ে বাতি-গৃহটী দূরে অবস্থিত; সুতরাং পরিচালক একরূপ অন্ধকারে বসিয়াই (একটী ক্ষীণ আলোকমাত্র মঞ্চের উপর জ্বলিয়া থাকে) আপনার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারই সতর্কতার উপর জাহাজটীর নির্ব্বিঘ্নতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। "সার্চ্চলাইটে" তিনি সাগর-বক্ষের অনেকদূর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পান—তাই অতি সামান্য বাধা-বিপত্তিও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না।

"বন্দর ছাড়িয়া জাহাজখানি এইবার খোলা সমুদ্রে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ "সার্চ্চলাইট"টী একপাশে খানিকটা ঘুরাইয়া পরিচালক বলিলেন, "এই দেখুন, আর একটু হলেই, জাহাজটি ঐ বোট্খানার উপর গিয়ে পড়েছিল! কি, দেখতে পাচ্ছেন না?—ওই—ওই যে একখানা প্রকাণ্ড বোট্! কোনো আলো নেই—কিছু নেই—ওরা এই রকমেই চলাফেরা করে থাকে, অনেক সময় তাই বড় উৎপাতেই—যাক্। আমি আমার জাহাজখানাকেই সরিয়ে নিচ্ছি।" বলিয়া তিনি একটী চাবি টিপিয়া ধরিলেন—দেখিতে দেখিতে জাহাজখানা বাঁ-দিকে ঘুরিয়া গেল।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমাদের জাহাজখানা এখন কতদূর গেছে?'

'প্রায় ৩ মাইল।—এই দেখুন, বোট-খানাকে ডান দিকে ২০০ গজ তফাৎ রেখে আমাদের জাহাজখানা পাশ কাটিয়ে চলে গেল।'

"মধ্যে মধ্যে পরিচালক-মহাশয় একটী নক্সায় (chart) উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি লিখিয়া লইতেছিলেন।

"সার্চ্চলাইটটী এবার তিনি বাঁ-দিকে ঘুরাইয়া বলিলেন—'মাল-জাহাজটার মৎলব কি?—আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে নাকি? ওর সঙ্গে আবার দু-পাশে দশ-বারো-খানা মাল-বোঝাই নৌকা বাঁধা আছে দেখছি! আমাদের জাহাজখানাকে ৩০০ গজ ডানদিকে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।—ব্যস্, ঠিক চলেছে।'

"এখন জাহাজখানা কতদূরে ?"

'পাঁচ মাইলের কম হবে না।—আপনি জাহাজখানা খানিক চালাতে চান ?'

'আমি ?'

'হাঁ—কেন ?—এই নিন্! ডানদিকে আরো সরাতে চান ?—তা বেশ!—এই ভাবে চাবিটা টিপে দিন্।—আস্তে।—হয়েছে! এখন বসে বসে দেখুন দেখি, ঠিক আপনার ইচ্ছামত যাচ্ছে কি না ?'

"চাহিয়া দেখিলাম—কি আশ্চর্য্য! কেবল আমার অঙ্গুলি-স্পর্শে, পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী ৬১৭ টন ওজনের একখানা জাহাজ, জানি না, কোন্ দৈবশক্তিতে সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছানুরূপ পথেই ভাসিয়া চলিয়াছে!"

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

"তালপাতার সেপাই"

(ফরাসী গল্প)

আমার বাড়িতে সেদিন ছোটোখাটো একটা সান্ধ্যসম্মিলন ছিল। অতিথিদের মধ্যে আমার বন্ধু শ্রীমতী ভবেয়ার ও তাঁর জাঠতুতো ভাই রেনি—এঁরা দুইজনেই উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ঘরের এককোণ হইতে শুনিলাম, রেনি বলিতেছে—"আমার বিশ্বাস, এ দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে বুক-ফুলিয়ে বলতে পারে যে জীবনে কখনো কারুর প্রতি অন্যায় বা নির্ম্মম ব্যবহার করিনি।"

আমি শ্রীমতী ভবেয়ারের কাছেই বসিয়াছিলাম। দেখিলাম, একটা চম্‌কানি তাঁর সমস্ত দেহের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল, কেমন-একটা বিবর্ণতা তাঁর সেই সুন্দর দেহশ্রীর উপর ছড়াইয়া পড়িল এবং সেই উজ্জ্বল চোখ দুটির উপর একটা দুঃখের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মনে হইল, মুছিয়া লইবার জন্যই তাঁর হাতখানি একবার কপালের উপর বুলাইয়া লইলেন,—এবং যে কয়েকটি অকালপক্ব চূর্ণ কুন্তল মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা তুলিয়া দিলেন। তারপর, হঠাৎ একটা অনুশোচনার উত্তেজনায় বলিয়া উঠিলেন—"সত্যি! কথাটা খুবই সত্যি! হয় ত বিশ্বাস করবেন না--আমাকে এখন যেমন দেখচেন এমন আমি চিরদিন ছিলুম না। একটা কঠোর অভিজ্ঞতায় আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে আগাগোড়া তলিয়ে না দেখে কারো সম্বন্ধে কোনো-একটা ধারণা করা ভয়ানক অন্যায়। উঃ, আমি কি নিষ্ঠুরতাই করেচি।"

বলিয়া তিনি করুণ কণ্ঠে এই গল্পটি আরম্ভ করিলেন—"আমরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়েছিলুম—ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান্ [illegible] তখন পাঁচ বছর হল শেষ হয়েছে।

আমি, মা ও রেনি—এই তিন জনে আমরা এক হোটেলে ছিলুম। তখন আমার বয়েস অল্প—রূপের গর্ব্ব প্রচণ্ড। আমি আশা করতুম—আশা কি, দাবীই করতুম—আমার আশ-পাশের সকলে দিবারাত্র আমার রূপের বন্দনা করুক—আমার পায়ে তাদের মুগ্ধ হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি ঢেলে দিক।

হোটেলের মধ্যে বড়-কাউকে আমি গ্রাহ্যে আনতুম না, কিন্তু একটি লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বয়স তার ত্রিশের কাছাকাছি—সুশ্রী, সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। মুখে-চোখে একটা উদ্দাম উৎসাহ, একটা তেজ,—কিন্তু কেমন-একটি দারুণ দুঃখে যেন সর্ব্বদাই অভিভূত। সৈনিকপুরুষের মতো তার ধরণটা। তার এক চাকর প্রতিদিন তার খাবার বয়ে নিয়ে যেত—খাবার-ঘরে সে কখনো আসত না। একলা আপন-মনে নির্জ্জনে সে ঘুরে বেড়াতো—কারুর সঙ্গে সে আলাপ করত না, তার দিকেও কেউ ঘেঁসত না। দেখতুম, সেনাধ্যক্ষেরা যেমন লম্বা কালো কোট পরে—তেমনি একটা জামা দিনরাত গায়ে ঝুলচে।

আমার ভারি অদ্ভুত লাগতো—একটা কৌতূহল ক্রমেই আমার মনে জমে উঠতে লাগলো। আমি একদিন ফন্দি করে তার সামনে গিয়ে পড়লুম; যা-হোক-একটা অছিলা করে কথা পাড়লুম—উত্তর পেলুম বটে কিন্তু তা তাচ্ছিল্যতায় পরিপূর্ণ—শুধু "হাঁ।" আর "না!" কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই দেখলুম তার সেই গম্ভীর বিষাদমাখা মুখখানি এক একবার আনন্দের স্ফূলিঙ্গে যেন জ্বলে-জ্বলে উঠতে লাগল।

আমি অন্যমনস্কতার অভিনয় করে হাতের দস্তানাটা মাটিতে ফেলে দিলুম। কী ছেলেমানুষি আমার! তার মুখে একটা ব্যস্ততা, একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু আমার দস্তানা না তুলে দিয়েই সে চলে গেল।

সেই দিন থেকে আমার সঙ্গে ভদ্রতা করে দূরে থাকুক—আমাকে দেখলেই সে যেন ভয়ে পালিয়ে যেত—আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। রেনি এই নিয়ে খুব একচোট হাসিঠাট্টা করে নিলে। সে তার নাম দিলে—"তালপাতার সেপাই"। তার এই হাসিতে আমিও যোগ দিলুম বটে কিন্তু সত্যি বলতে কি, সেপাইয়ের সেই রূঢ় অনাদরে আমার আত্মঅভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে কেঁদে উঠেছিল।

দুটি ঘটনায় আমার এই আহত অভিমান শেষে দারুণ ঘৃণায় পরিণত হয়ে পড়ল। একদিন সকালে আমি সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরচি পথে জনমানব নেই, কেবল এক রোগশীর্ণ বুড়ী মোট-মাথায় ধীরে ধীরে আসছিল। এমন সময় দেখি "সেপাই" একটা ঝোপে-ঢাকা বাঁকের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। জানিনা কি কারণে—সেপাইকে আচমকা দেখেই হোক, কিম্বা মোটের ভারেই হোক, বুড়ীটা মোট-সুদ্ধ ধপ করে পড়ে গেল। বেচারা মাটিতে পড়ে কাতর ভাবে এ-দিক ওদিক চাইতে লাগল। আমি তাকে তুলতে ছুটে গেলুম এবং তার মোটটাও উঠিয়ে দিলুম কিন্তু "সেপাই" একেবারে অচল—সে এতটুকু সাহায্যও করলে না।

আমি রাগ দেখিয়ে তার দিকে কটমট করে চাইলুম, বল্লুম—"এমন অভদ্র তো আমি কোথাও দেখিনি—মানুষের চামড়া যার গায়ে আছে সে যে এমন ব্যবহার করতে পারে জানতুম না। আমার কাছে পয়সা নেই—কী আপশোষ! মশায় কি দয়া করে এই বুড়ীকে কিছু দান করবেন?"

সে কেমন ইতস্তত করতে লাগল। একটা তীব্র বেদনার ছায়া তার চোখের উপর ঘনীভূত হয়ে এল। মনে হল সে যেন কি বলতে চাচ্ছে—বোধ হয় তার এই অভদ্র ব্যবহারের অর্থ কি তাই, কিম্বা ক্ষমা-প্রার্থনা। কিন্তু দেখলুম বলবার চেষ্টাটুকুই তার পক্ষে মর্ম্মান্তিক। তার ঠোঁট একবার কাঁপলো—কিন্তু কোনো বোধগম্য কথা বার হল না। তার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল, তার সেই একঘেয়ে অবিচ্ছিন্ন নীরবতা আবার ফিরে এল। সে আমার দিকে আর না চেয়ে, আমার কথা উপেক্ষা করে চলে গেল।

জীবনে এই প্রথম, আমি-হেন যে সুন্দরী সেও অনুরোধের অবহেলা পেলে—সে যে কী মর্ম্মান্তিক বলতে পারি না! রাগে ক্ষোভে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছিল। হোটেলে ফিরে এসে রেনিকে সব বল্লুম—সেও চটে আগুন। সে বল্লে, একবার দেখা হোক না সেপাইয়ের সঙ্গে, ভালো করে বোঝা-পড়া করে নেব। তার এই রাগের আগুনে, আমার সেই তখনকার ছেলেমানুষীর উৎসাহে, খুব কসে ইন্ধন দিতে লাগলুম।

সপ্তাহখানেক আর তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। আমি বল্লুম, "তাল-পাতার সেপাই" ভয় খেয়েছে, তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। রেনিও এই কথায় সায় দিলে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জেটির উপর বেড়াতে গেছি—তখন ঝড় উঠেছে—পায়ের তলায় সমুদ্র কেবলই দুলে-দুলে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে। হঠাৎ নীচে থেকে একটা আর্ত্তনাদ উঠল। আমরা কিনারার দিকে ছুটে গেলুম—দেখি সেপাই দাঁড়িয়ে—তার সমস্ত মুখখানা একটা দারুণ ভয় ও উৎকণ্ঠায় কম্পিত হয়ে উঠেছে—সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল—"দেখ দেখ একটা লোক জলে ডুবলো!"

আমি অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম। আমার ভাব বুঝে রেনি আর থাকতে পারলে না। সে ছুটে গিয়ে বল্লে—"মশাই কি মজা দেখছেন—একটা লোক ডুবছে!—মেয়ে মানুষের মতো চীৎকার করা ছাড়া কি আর কিছু করবার নেই!"

এই বলে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। দুজন নাবিক ছুটে এসে তার হাত ধরলে, তৃতীয় নাবিক জলে নেবে গেল।

"ঐ যে! ঐ যে জলে ভাসছে:—ঐ উঠিয়েছে।" বলে সেপাই সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটাকে উদ্ধার করে নাবিকেরা নিয়ে এল, আমাদের সামনে দিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে চলে গেল। আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

তার পর, লোকের ভিড় ক্রমে ক্রমে ভেঙে গেল—শেষে কেবল আমরা দুজনে ও সেপাই সেইখানে রইলুম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল তার সেই উন্নত সুদৃঢ় চেহারার সঙ্গে, তার সেই মুখের উপরকার তেজস্বিতার সঙ্গে তার এই শিশুর মতো অসহায়তার ভাবটা কী বেমানান!

রাগে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলুম। আমার কাছ থেকে ইসারা পেয়ে রেনি সেপাইয়ের মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে উঠল—"কাপুরুষ কোথাকার!"

তার একটি কোমল কাতর দৃষ্টি আমার মুখের উপর এসে পড়ল—হঠাৎ মনে হল, আমার প্রতি তার হৃদয়ের একটি প্রীতি যেন সঞ্চিত আছে, কিন্তু আমাকে সে সহ্য করতে পারচে না। রেনির এই অবজ্ঞার অপমানে তার চোখের পাতাগুলি কাঁপতে-কাঁপতে একেবারে নুয়ে পড়ল—এবং একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতা তার সমস্ত মুখখানিকে আঁধার করে ফেল্লে। তার ঠোঁট দুখানি একেবারে নীল হয়ে গেল। সে একটি কথাও কইলে না।

তার এই অসহ্য নীরবতায় আমার মেজাজ আরো রুখে উঠলো! রাগে, ঘৃণায়, কৌতূহলে—এবং তার পক্ষে অশোভন এই কাপুরুষতার প্রতি কেমন-একটু অবিশ্বাসে—আমি যেন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম। আমার শেষ-আঘাত আমি তাকে ছুঁড়ে মারলুম, বল্লুম—"রেনি, তুমি যদি ওকে একঘা চড় কসিয়ে দাও তাহলেও ওর এমন সাহস হবে না যে সেই অপমানের তাড়নায় তোমার উপর হাতটুকু পর্য্যন্ত তুলবে! এমন পৌরুষ ওর নেই!"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমি বুঝতে পারলুম, তার আঘাত কী সাজ্ঘাতিক, কী ভয়ঙ্কর! তার বিবর্ণ মুখের প্রত্যেক শিরাটি কুঞ্চিত হয়ে গেল—মনে হল, একটা ভয়ঙ্কর মানসিক বিপ্লব তাকে চেপে ধরেছে। রুদ্ধ-কণ্ঠে—তার এই কণ্ঠস্বর আমি ইহজীবনে কখনো ভুলতে পারবো না—হতাশায় রুদ্ধ, কাতরতায় ভগ্ন সেই কণ্ঠস্বরে—সে আমার দিকে চেয়ে—গুমরে বলে উঠল—"আমি কাপুরুষ নই কিন্তু দেবী, তুমি বড় নিষ্ঠুর! তোমার এই কঠিন নিষ্ঠুরতায় আমার হৃদয়ের একটি গোপন ব্যথাকে আজ খুলে ধরতে হল। সে কোনো সত্যিকার ঘৃণ্য লজ্জার কথা নয়, কিন্তু আমার দেহের শক্তি নিয়ে যে আমার চিরদিনের গর্ব্ব--তাই সে আমার লজ্জার কথা! তাই আমি সেই লজ্জা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। আমার দুঃখের কথা বলে আমি যে লোকের কৃপাপাত্র হব—বিশেষত তোমার—সে আমার পক্ষে নিদারুণ! তাই আমার এই গোপন কথাটি আমি মর্ম্মের মাঝখানে বহন করি। কিন্তু কী নিষ্ঠুর তুমি! আমার সেই প্রাণের বেদনা গোপন রাখতে দিলে না—আমার মর্ম্মস্থল ছিন্ন করে তাকে বার করে আনলে তবে ছাড়লে!"—বলে সে বলতে লাগলো—"তবে শোনো আমার গোপন কথা:—ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধে আমি গোলন্দাজ ছিলুম। একটা পুল তোপ দিয়ে ভেঙে

দেবার সময় শত্রুদের এক গোলায় আমার দুটো হাতই উড়ে যায়। আমি কাপুরুষ নই!—হাত তুলে সে কথা তোমার সামনে প্রমাণ করবার উপায়ও ভগবান রাখেন নি।"

অনুশোচনার একটা তীব্র শিহরণ আমার সমস্ত দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল। আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সামলে উঠে তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইবার আগেই দেখি সে চলে গেছে।"

শ্রীমতী ভবেয়ার কথা শেষ করিয়া একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন, মনে হইল যেন সেই অতীতের মধ্যেই তিনি তখনো ঘুরপাক খাইতেছেন।

আমি বলিয়া উঠিলাম—"বাস্তবিকই—অনুতাপের কথা। তার সঙ্গে কি আপনার আর দেখা হয় নি?"

—"না!" বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সমালোচনা

পূজা ও সমাজ। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ, হেডমাষ্টার, হাই স্কুল, ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম। শিলচর, এরিয়েন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা, কাপড়ে বাঁধা দেড় টাকা মাত্র। লেখক "নিবেদনে" বলিয়াছেন, "এই গ্রন্থে শারদীয় দুর্গাপূজার স্থূলতাৎপর্য্য সহকৃত আমাদের জাতীয় চরিত্র ও সমাজ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।" পূজার ব্যাখ্যায় কিন্তু তিনি যথেষ্ট মৌলিকতা ও উদার চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন—সে ব্যাখ্যায় গোঁড়ামির নাম-গন্ধ নাই। পূজার সহিত সমাজের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। বঙ্গের দুর্গাপূজা, লেখকের মতে, শক্তিপূজা; ইহা সার্ব্বজনীন উৎসব। হিন্দু আচার্য্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির মতের সহিত শাস্ত্রাদি মিলাইয়া তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন "ব্রহ্ম আর ভগবতী দুর্গা এক বস্তু।" তিনি আরও বলেন, "ভক্ত আরাধ্য দেবতাতে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার জন করিয়া লইতে ভালবাসেন। ঈশ্বরকে যিশু পিতা, রামকৃষ্ণ মা বলিয়া জানিতেন ও ডাকিতেন। ভগবতী দুর্গা বিশ্বজননী আমাদের সকলেরই জননী। দুর্গা পূজা মহাশক্তির পূজা, বিশ্বমাতার পূজা। * * * দুর্গোৎসবে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এই চারি দেবতার মূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে; বলদেবতা কার্ত্তিক, জ্ঞানদেবতা গণেশ, ধনদেবতা লক্ষ্মী এবং হৃদয়োৎকর্ষবিধায়িনী কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, এই শক্তিচতুষ্টয়ের উপাসনা বিহিত হইয়াছে।" কারণ সমাজ-শক্তির বৃদ্ধিতেই সুখসমৃদ্ধি এবং উন্নতি। সকল সভ্য সমাজেই দেখা যায়, এই চারিটি শক্তির বিকাশেই উন্নতি—দেহশক্তি, জ্ঞানশক্তি, হৃদয়শক্তি এবং ধনশক্তি। "সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এই চারিটি শক্তির সমবায়েই ঘটিয়া থাকে। সমাজ সম্বন্ধে এই মূলতত্ত্ব দুর্গোৎসবে দেখিতে পাওয়া যায়।" তাহার পর লেখক ঐ শক্তিচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া 'ভাষা', 'স্ত্রীশিক্ষা,' স্বাস্থ্যতত্ত্ব কলাবিদ্যা, চরিত্রবল প্রভৃতি সম্বন্ধে সুদক্ষ আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মত আগাগোড়া নিরপেক্ষ, উদার এবং তাহাতে চিন্তাশীলতাও যথেষ্ট। 'স্ত্রীশিক্ষা' নিবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, "বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার

বিদ্যায় বিদ্যাবতী, পত্রলিখনে কথঞ্চিৎ অভ্যস্তা যুবতী রমণীর সংসর্গে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন কি? * * * সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকই রমণী; ইঁহাদিগকে আঁধারে ফেলিয়া পুরুষগণের আলোক-ভোগের আশা বিড়ম্বনামাত্র। * * অশিক্ষিতা জননী শিশুকে কি শিক্ষা দিতেন পারেন?" "গুণের পূজা", "চাটুতা", "চাকরি", "ভীরুতা ও সাহস", "সংস্কার", "শিক্ষা", "বিবাহসংস্কার" প্রভৃতি সকল সন্দর্ভগুলিতেই লেখক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেমন, সুদৃঢ়, সুস্পষ্ট, তেমনই সতেজ ও নির্ভীক। এমন সুলিখিত সন্দর্ভ-পুস্তক বহুদিন আমাদের চোখে পড়ে নাই। এ গ্রন্থ প্রতি বিদ্যালয়ে পাঠ্যস্বরূপ নির্ব্বাচিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। এ গ্রন্থ ছাত্রগণের মনুষ্যত্ব-বিকাশে সহচর হইবে, আদর্শের পথ-নির্দ্ধারণে সহায়তা করিবে।

আদর্শ জননী। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি জীবন-চরিত নহে; শিশুসন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চরিত্র-গঠন-ব্যাপারে আদর্শ জননীর কর্ত্তব্য কি, তাহাই এ গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সন্তান-জনন এবং শরীর-পালন-বিষয়ক নিবন্ধগুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রমতের সহিত সে বৈজ্ঞানিক যুক্তির সমন্বয়ও লেখক সুনিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। চরিত্র-গঠন ও সন্তানের মানসিক শিক্ষার আলোচনাতেও উদার যুক্তি এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্তর শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, মাতার হস্তেই সন্তানের জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভাবী উন্নতি ও সেই সঙ্গে দেশেরও ভবিষ্যৎ ন্যস্ত। সকল প্রকার নীচতা ও হীনতা বর্জ্জন করিয়া সন্তানকে শিক্ষা দিতে হইবে, উদার সত্যের পথে সন্তানকে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ করাইতে হইবে, নহিলে

উচ্চ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রবীণ গ্রন্থকার এ গ্রন্থে মাতার কর্ত্তব্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বাঙলার গৃহে গৃহে পঠিত হোক্।

ক-কারের অহঙ্কার। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ কর্ত্তৃক প্রকটিত। কলিকাতা, বঙ্গবাসী কলেজ বুকষ্টল হইতে প্রকাশিত। কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। নিষ্ক্রয় এক শিকি ও এক আনা। মুখবন্ধে গ্রন্থকার একটু "কৈফিয়ত" কাটিয়াছেন, "ককারের অহঙ্কার প্রকৃতপক্ষে 'অনুপ্রাস' নামক পুস্তকের ক্রোড়পত্র বা জের। * * ভাষা-তত্ত্বের কোন প্রশ্নের আলোচনা ইহার বিষয়ীভূত নহে। * বিষয়টি নির্দ্দোষ আমোদ প্রদান করিবার জন্য কল্পিত।" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। বইখানি পড়িতে বেশ মজা লাগে—কথার ফাঁকে ফাঁকে একটা হাসির তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। লেখক গোড়া হইতেই এমনই তীব্র কৌতুহলের সঞ্চার করিয়াছেন যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ করিতে হইবে। কোথাও গবেষণার প্রয়াস নাই, বিষয়টি যেমন লঘু, তেমনই স্বচ্ছ, সরল ইহার বর্ণনাভঙ্গী। বিশ্রাম-ক্ষণটুকুকে আনন্দ-মুখর করিবার পক্ষে পুস্তিকাখানি উপাদেয় হইয়াছে।

ভালবাসা। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহিরণ্ময় বিশ্বাস, ৪৫ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। অবসর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বাধাই এক টাকা, আবাঁধা বারো আনা। এখানি উপন্যাস। লেখকের বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস লিখিবার শক্তি আছে—ভাষায় স্থানে স্থানে গ্রাম্যতাদোষ থাকিলেও তাহা স্বচ্ছ—তাহাতে প্রবাহ আছে—প্রাণ আছে। চরিত্র-সৃষ্টি করিবার শক্তিও লেখকের মন্দ নহে। তবে ইহার প্লটটিতে কয়েকটি বিষম দোষ রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ নায়ক দেবব্রতের চরিত্রে সহসা এমন তরলতা দেখা দিয়াছে, যাহার জন্য লেখক পূর্ব্বাহ্নে কোনরূপ আয়োজন করেন নাই, যাহা পাঠকের কাছে একেবারেই অদ্ভুত, বিসদৃশ; দ্বিতীয়তঃ উপনায়ক মোহিতের চরিত্রের প্রথম দিকটা থিয়েটারী ঢংয়ে

খুব সামলাইয়া লইয়াছেন। তৃতীয়তঃ কাঞ্চনের চরিত্রে লেখক শেষ রক্ষা করিলেও তাহার কতকগুলা ব্যবহার শিক্ষিতা মহিলার পক্ষে একেবারেই অমার্জ্জনীয় —বিলাসিনী রূপ-ব্যবসায়িনীর মতই হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ছোট-খাট অসঙ্গতি প্রচুর। আর একটি দোষ,—ভাষায় লেখক এতখানি কাবা ঢালিয়াছেন যে, স্থানে স্থানে তাহা নিতান্তই 'গা-জুরি' এবং 'বেখাপ্পা' হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য চরিত্রগুলিও মাঝে মাঝে কৃত্রিমতার মুখোস করিয়া ভাণ-অভিনয় করিতেছে বলিয়া মনে হয়। লেখকের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস আছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম। আজকাল অতি অল্প লেখকের উপন্যাসেই আমরা এরূপ রচনা-শক্তির আভাষ পাই। "ভালবাসা"-র লেখক ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া লিখিলে তাঁহার নিকট হইতে কালে যে আমরা সুন্দর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পাইব, এ আশা একান্ত দুরাশা বলিয়া মনে হয় না।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক, এম, এ, বি,এল প্রণীত। কলিকাতা, সেন রায় এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস বিলডিং হইতে প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। এখানি রস-রচনা—ইহাতে সর্ব্বসমেত সাতাশটি রচনা সংগৃহীত হইয়াছে—তন্মধ্যে তেরোটি পদ্যে ও অপরগুলি গদ্যে। রহস্যই রচনাগুলির প্রাণ। "আমার কর্ম্মভূমি",—৺দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসিদ্ধ 'আমার জন্মভূমি'র parody (লালিকা)—'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং অচিরেই এ লালিকাটি মূল গানের মতই সাধারণ্যে সমাদর লাভ করে। 'হাসি' গদ্য নিবন্ধ —সুন্দর। লেখক এই নিবন্ধে হাসির দর্শন লিখিয়াছেন—নিবন্ধটিতে লেখক রহস্যে ও চিন্তাশীলতায় বেশ মিশ্ খাওয়াইয়াছেন। "গরুর গাড়ী" "পঞ্জিকা," "ঢেঁকি", "নোলক", "আরসি", "টাকা". "শঙ্খ", ও "অলঙ্কার" আমাদের ভাল লাগিয়াছে—এগুলির রহস্য উজ্জল,—বিচিত্র—কোনখানে 'কাতুকুতু' দিয়া হাসাইবার অক্ষম নির্লজ্জ চেষ্টা নাই—অথচ সেই সঙ্গে প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতই চিন্তা-এইরূপ রহস্যই শিক্ষিত সমাজের প্রকৃত উপভোগ্য। লালিকাগুলির মধ্যে 'সোনার ঘড়ি', 'আমার প্রিয়ে' ও 'দুর্ব্বুদ্ধি' রহস্যে ম্লান। "মশকবধ কাব্য" চলনসই। এ শ্রেণীর রস-রচনার দিকে বাঙলার বহু লেখক ঝুঁকিয়াছেন—লালিকাও ছারপোকার ঝাড়ের মত মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় নিত্য কত-শত দেখা যাইতেছে—কিন্তু সেই সব অক্ষম লেখক রহস্য ও ভাঁড়ামির মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা জানেন না। সে সকল রচনার রহস্য (?) তাড়িখানার উপযুক্ত—ভদ্র বা শিক্ষিত সমাজ তাহাকে আমোল দিবে না। "রঙ্গ ও ব্যঙ্গের" রহস্য-রস সে শ্রেণীর নহে। এ রহস্যে ঔজ্জ্বল্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, রস আছে—কোন আবিলতা নাই। তবে এমন কয়েকটি রচনাও এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, যাহা বাদ দিলে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়িত বৈ কমিত না। গ্রন্থে দুইখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে। ছাপা কাগজ ভাল।

ধারা। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅনাথবন্ধু সেন "বিরাম", বরিশাল। কলিকাতা, সিদ্ধেশ্বর মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। সর্ব্বসমেত ৪৯টি খণ্ড কবিতা এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "কবিতাগুলির অধিকাংশই * * বিবিধ মাসিক-পত্রে গত পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।" কবিতাগুলি নানা ভাবের, নানা রসের। ছাপা কাগজ ভালো।

রামায়ণ। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল প্রণীত। প্রথম খণ্ড (আদি কাণ্ড হইতে সুন্দর কাণ্ড)। প্রকাশক, সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ৮ ও ৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এখানি 'মহর্ষি বাল্মীকির আদি কাব্যের পদ্যে মর্ম্মানুবাদ।' লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, অধ্যবসায়ও অসাধারণ, ভাষা সরল, সহজ,—কোনরূপ আড়ম্বর নাই—ছন্দও বিচিত্র। স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে। পড়িতেও একঘেয়ে লাগে না। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই

দেবী-পূজায় জীব বলি। শ্রীযুক্ত মহীন্দ্র নারায়ণ কবিরত্ন সঙ্কলিত। কাওয়াকোলা, 'গৌরগদাধর সমিতি' হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, নগেন্দ্র-ষ্টীম প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মুদ্রণ-সাহায্য চারি আনা। গ্রন্থকার বহুকাল ধরিয়া দেবীপূজায় জীববলির অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন। সে আন্দোলনের ফলে 'কতিপয় বারোয়ারি কালীপূজা হইতে ছাগ বলি উঠিয়া গিয়াছে।' এই রক্তস্রোত নিবারণ-কল্পেই তিনি শাস্ত্রাদির মত সঙ্কলন করিয়া প্রতিপক্ষের নিষ্ঠুর যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ দেশে শুধু Sentimentএর দ্বারা অন্যায় প্রথা নিবারণ করা অসম্ভব—প্রতিপক্ষ শাস্ত্রের দোহাই চাহে, সংস্কৃত শ্লোক খোঁজে। তাই লেখক শুধু হৃদয়-বৃত্তি দিয়া নহে, শাস্ত্রীয় শ্লোক দিয়াই প্রতিপক্ষের মত-খণ্ডনে চেষ্টা করিয়াছেন। "দেবীপুরাণ", "খণ্ডপুরাণ", "বৃহন্নারদীয় পুরাণ", প্রভৃতি ও "গীতা" সমস্তই এ বিষয়ে লেখকের স্বপক্ষে। গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া লেখক নিখিল জীব-জগতের উপকার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসার্হ।

জল-চল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সিরাজগঞ্জ, 'আয়ুর্ব্বেদ শান্তিকুটীর' হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, প্রতিভা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। অস্পৃশ্য পতিত জাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থে লেখক তাহাদিগকে সমাজভুক্ত করিবার পক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এ দেশের প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, উক্ত জাতিবর্গকে সমাজ হইতে ঠেলিয়া ফেলিবার মূলে অধিকাংশ স্থলেই ছিল শুধু নীচ স্বার্থ বা বিদ্বেষ। শাস্ত্রাদি হইতে লেখক আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন, চরিত্র এবং বিসদৃশ আচার-ব্যবহারেই লোকের সমাজচ্যুত হওয়া উচিত, জন্ম-পরিগ্রহের উপর দিয়া নহে। দৈবাৎ ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইয়াছে বলিয়া পাপাচারী ব্যক্তি পূজার্হ থাকিবে, আর চণ্ডালের বংশে জন্মিয়া কোন ব্যক্তি যদি হৃদয়-বৃত্তিতে বড় হয়, তথাপি তাহাকে পায়ের নীচে চাপিয়া রাখো, এ ব্যবস্থায় সমাজ দুর্ব্বল হয়, টিঁকিতে পারে না। লেখক নির্ভীকভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার যুক্তিও নিপুণ। এ দুর্দ্দিনে তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

গোলাকার

জন্ম-পরিগ্রহের পরে খেয়ে পরে' বেড়ে ওঠা,
ঠেলাঠেলি মারামারি করে' দুটি পয়সা লোটা,
মাঝে মাঝে রোগে ভোগা এবং শেষে শিঙ্গা ফোঁকা,
সবাকার-ই ভাগ্যে ঘটে, হোক্ সে জ্ঞানী কিম্বা বোকা।
জীবন-তত্ত্বের সহজ অর্থের চল্‌ছে তবু দীর্ঘ টীকা;
গজিয়ে ওঠে কাঁটার বনে সরু মোটা প্রহেলিকা।
ঘুরে ফিরে তত্ত্ব-জাহাজ লাগে আবার ঘাটের তটে!
প্রমাণিত হচ্ছে কেবল—ধরা গোলাকার-ই বটে!

আমাদের প্রশ্ন

ভারতীর সম্পাদনভার হাতে লইয়া অবধি এই কথাটা আমাদের কেবলই মনে উঠিতেছে যে যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভারতীর গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত এবং ভারতীর উপকার করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছি কি না। দুঃখের বিষয়, কোন গ্রাহকই ভালো-মন্দ, হাঁ-না—কোন কথাই বলেন না। কাজেই তাঁহাদের মনোভাব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যাই। আমাদের মনের মতো করিয়া আমরা ভারতীকে সাজাইবার চেষ্টা করি কিন্তু তাহা গ্রাহকবর্গের মনস্তুষ্টি করে কি না জানিতে পারিলে আশ্বস্ত হই। তাঁহাদের চোখে যে ত্রুটি পড়ে এবং যাহা তাঁহাদের মনের-মত হয় না তাহা জানিতে পারিলে আমরা সংস্কারে চেষ্টিত হইতে পারি। এই উদ্দেশ্যে আমরা গ্রাহকবর্গের নিকটে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা এগুলির প্রতি অবহেলা না করিয়া, তাঁহাদের উত্তর পাঠাইয়া ভারতী পরিচালনে এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আমাদের সাহায্য করিবেন।

প্রশ্ন

১। ভারতীতে এখন মাসিক যত পাতা দেওয়া হয়, তার চেয়ে বেশী চান কি না? প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভালো আজ কাল বাংলা মাসিকপত্রের সংখ্যা এবং পত্রাঙ্ক যত বাড়িয়াছে, ভালো লেখকের সংখ্যা তদুপযোগী বাড়ে নাই। কাজেই আকার বৃদ্ধি করিলে বাজে মাল না চালাইয়া উপায় নাই।

২। প্রবন্ধের ভাগ বেশী চান, না গল্প, উপন্যাস, নক্সা ইত্যাদি?

৩। কোন্ শ্রেণীর প্রবন্ধ বিশেষ মুখ-রোচক—ঐতিহাসিক? প্রত্নতাত্ত্বিক? বৈজ্ঞানিক? সামাজিক? না সাহিত্য, শিল্প-কলা সম্বন্ধীয়?

৪। ছোট গল্প এবং ধারাবাহিক উপন্যাসের মধ্যে কোন্‌টার পক্ষপাতী?

৫। বিদেশী ছোট গল্প এবং উপন্যাসের অনুবাদ ভালো লাগে কি না?

৬। কোন্ লেখকের ছোট গল্প এবং উপন্যাস পড়িতে বেশী উৎসুক?

৭। কোন্ কোন্ কবির কবিতা ভালো লাগে?

৮। বিদেশী ছবির প্রতিলিপি, না, ভারতীর চিত্রের প্রতিলিপি চান?

সমস্ত জিজ্ঞাস্য কথা প্রশ্নের মধ্যে বাঁধা যায় নাই, অনেক কথা নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছে, সেজন্য আমাদের প্রশ্নের বাহিরের কথাও ইচ্ছা করিলে গ্রাহকবর্গ আমাদিগকে জানাইতে পারেন। আমরা তাহাতে খুসীই হইব।

সম্পাদক।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



দশাশ্বমেধ ঘাট—কাশী।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]　　ফাল্গুন, ১৩২২　　[১১শ সংখ্যা

স্বেচ্ছাচারী

(উপন্যাস)

শিবরামপুরের দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স যদিও পঞ্চাশের উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তথাপি তাঁহার মতি-গতি এ পর্য্যন্ত বন-গমনের দিকে ঢলিয়া পড়িবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। ইহার মুখ্য গৌণ সমবায় প্রভৃতি নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে তাঁহার পুত্র মণিশঙ্কর এখনও অবধি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ নামক বৃহৎ বিচরণ-স্থানে কিছুতেই প্রবেশাধিকার পাইল না। জমিদার মহাশয়ের দেওয়ানের পুত্র বলিয়া অবশ্য কোনবারই সে নির্ব্বাচন-পরীক্ষায় "বারিত" হয় নাই, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মূর্খ পরীক্ষকগণ কেহই তাহার জ্ঞানের গভীরতা ও বিদ্যার বিস্তৃতি বা অভিব্যাপ্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না।

এই সমস্ত সমবায় কারণে মণিশঙ্কর এক বার সংস্কৃত বিদ্যার গহন বনে প্রবেশের কল্পনাও করিয়াছিল। কিন্তু "সহর্দ্ধেঃ" প্রভৃতির রেফাদি-কণ্টকে প্রথমেই তাহার মনের রেশমী চাদরখানি আটকাইয়া যাওয়ায় বিরক্ত হইয়া সে-কল্পনা সে ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পিতার দুর্দ্ধর্ষ পাইক গণের অতন্দ্রিত চেষ্টাতেও যখন বিদ্যা-পথের কণ্টক দূর হইল না, তখন সে অগত্যা একটা কন্‌সার্ট ও থিয়েটার পার্টি খুলিবার সঙ্কল্প করিল।

দেওয়ান মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার পুত্র বিদ্যালয়ের সব-কয়টা ডিগ্রি আদায় করিয়া শেষে আইনের মুকুট মাথায় চড়াইয়া কালিকাবাবুর বিস্তীর্ণ এষ্টেটের পরামর্শ-দাতা বা অন্য কোন প্রকার

উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে। কিন্তু মণিশঙ্কর কোন প্রকারেই প্রবেশিকার সিংহ-দ্বার পার হইতে পারিল না; উপরন্তু দেওয়ানজী দেখিলেন, দুইটী অখ্যাত অজ্ঞাতনামা মনুষ্য-শিশু তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে দিব্য অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশে যুগপৎ এই যুগল ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া দুর্গাশঙ্কর পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পরগণে কমবখ্‌ৎপুর ও তরফ পয়জার-ডেঙ্গার নিকাশ সারিয়া হিসাবানা ও নজরানার কয়েক শত টাকা সঙ্গে করিয়া দুর্গাশঙ্কর রাত্রি আটটার সময় গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী ইতিমধ্যে মহা উৎকণ্ঠায় কাল-যাপন করিতেছিলেন; কারণ, পুত্র মণিশঙ্কর বৈকালে মাতার নিকট তাহার কনসার্ট-পার্টীর জন্য দুইটা বাঁশীর আব্দার লইয়া বিস্তর কান্নাকাটি করিয়া গিয়াছে;—এমন কি, দুই একবার তাহার মূর্চ্ছার উপক্রমও দেখা গিয়াছিল। মণিশঙ্কর না কি বাল্যকাল হইতে বুদ্ধিশক্তির প্রাচুর্য্যের জন্য ঐ রোগে ভুগিতেছিল; তাই তাহার মাতা যখন-তখন দেওয়ান মহাশয়কে উক্ত বিষয়ে সতর্ক করিয়া মণিশঙ্কর যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহাই করিতে উপদেশ দিতেন;—অবশ্য উপদেশের সঙ্গে তাঁহার অন্যান্য শক্তি প্রয়োগ করিতেন কি না, সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ কেহ বলিতে পারে না। তবে দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান দুর্গাশঙ্করকে কেহ সেই উপদেশ

থাকিতে দেখে নাই। এমন কি, দুষ্ট লোকে এ কথাও বলে যে দেওয়ানজীর "স্ব-কৃত" তালুকগুলির মুনাফার টাকাও কিস্তি কিস্তি ইঁহারই সিন্দুকজাত হইয়া থাকে। নিস্তারিণী দেবী অনেক সময়েই স্বামী মহাশয়কে কৃপা করিয়া "স্বকৃত" বিষয়-চিন্তার ভার হইতে নিস্তার দিয়া থাকেন,—অন্ততঃ ইহাই বাজার-গুজব। কিন্তু বাজারে যাহা রটে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক নয়।

দুর্গাশঙ্কর অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ওগো, কোথায় আছ?" নিস্তারিণী দেবী অবশ্য অতি নিকটেই ছিলেন, কিন্তু অন্তরের উৎকণ্ঠা পাছে মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই কক্ষ হইতেই একজন দাসীর উপর হুকুম-জারী হইল, "ওরে রাজু, জল-চৌকি আর গাড়ুটা এগিয়ে দে—বাবু এসেছেন।"

দুর্গাশঙ্কর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া টাকার তোড়াটা ধপাস করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "উঃ, বেটারা কম হায়রাণ করেছে। কোন বেটার যদি বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে! শোন, ওগুলো লোহার সিন্দুকে তুলো না, আলমারিতেই রেখে দাও। কাল আমার টাকার বিশেষ দরকার।"

নিস্তারিণী দেবী আলমারি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "আমারও একশ' টাকার বিশেষ দরকার। কত টাকা আছে এ তোড়ায়?"

"সাত শ' বাইশ।"

"তুমি কাল কত নেবে?"

"দরকার ত প্রায় এগার শ' টাকা। ঐ

আমায় সলিমপুরের খাজনা শোধ করে দিতে হবে, তারা তাগাদা লাগিয়েছে।"

"এক শ' টাকা আমায় কাল দিতেই হবে। বাদ-বাকি তুমি নিও।"

"হঠাৎ এত টাকা কি হবে?"

"মণির জন্যে তুটো বাঁশি কিনে দিতে হবে।"

"বাঁশি! বাঁশি কি হবে?"

"কি হবে, তা জানি নে। না পেলে আবার হয় ত সে মূর্চ্ছো যাবে। আজ অনেক কষ্টে তাকে সামলেছি।"

পুত্রের বিষয় কোন কথা বলিতে গেলে এখনই একটা বিপদ ঘটিতে পারে, সেই ভয়ে দুর্গাশঙ্কর তাড়াতাড়ি মুখাদি প্রক্ষালন করিতে বাহিরে গেলেন। এবং পরে জলযোগ সারিয়া গড়গড়ার নল মুখে দিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। বাহিরে গ্রামস্থ দুই একজন উমেদার তলপিদার মোসাহেব তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

দেওয়ানজী আসন গ্রহণ করিতেই বৃদ্ধ পার্ব্বতীনাথ সরকার বলিলেন, "দেওয়ানজী, আপনি মণিশঙ্করের হারমোনিয়া বাজানো শুনেছেন? কি সুন্দরই সে বাজাচ্ছে! আমি আসতে আসতে পথে পোড়া বাঙ্‌লায় ওর বাজনা শুনে এলাম।"

রাজীব জোয়াদ্দার বাঁধানো হুঁকাটা আর একজনের হাতে চালান করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "এই ত' মোটে মাসখানেক হল হারমোনিয়াটা ও কিনেছে, এরই মধ্যে এত শিখলে কবে?"

পার্ব্বতীনাথ কহিলেন, "পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, ভায়া। পূর্ব্বজন্মের সাধনা।"

পার্ব্বতীনাথের উপর সরকারি তুইটা ডিক্রি এখনও ঝুলিতেছিল। এবারে সেটার পরিশোধের কোন আশা ছিল না, তাই তিনি স্বীয় নাতিটীকে মণিশঙ্করের থিয়েটারে জুটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলের থার্ড মাষ্টারটী এ বিষয়ে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া দেওয়ানজীকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। দেওয়ানজী তাই গম্ভীর মুখে বলিলেন, "সরকার মশায়, আপনার নাতিটীকে এরই মধ্যে পড়াশুনা ছাড়িয়ে দিলেন? থার্ড মাষ্টার ত খুব তুঃখ করছিল। সে বলছিল, আপনার গিরিজা-নাথের বেশ ধার আছে, সে এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পাশ করবেই। এরই মধ্যে ওকে পড়াশুনা ছাড়ানো ভাল হল না।"

পার্ব্বতীনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আজ্ঞে দেওয়ানজী, মণিই যখন পাশ করতে পারলে না, তখন গিরিজার আর কতটুকু ধার! তাই মনে করছি, আমার যা কিছু আছে, তাই দেখবে-শুনবে আর মণির সঙ্গে থেকে যদি—"

রাজীব জোয়াদ্দারের উচ্চ হাস্যে সরকার মহাশয়ের বাকি কথাটুকু শুনিতে পাওয়া গেল না। দেওয়ান মহাশয়ও সেই হাস্যে যোগ দিয়া বলিলেন, "না, না, সরকার মশায়, এরই মধ্যে তা করবেন না। মণির সঙ্গে জুটলে ওর ইহকালও যাবে, পরকালও যাবে। মণিটাকে নিয়ে যে কি করব, তা আমিই ঠিক করতে পারছি না। তার ওপর আপনারা পাঁচজনে লাগলে ওকে আর সামলানো যাবে না। দেখুন দেখি,

ন্যায়রত্ন মশায়ের ছেলেটীকে আর সর্ব্বানন্দকে। এরই মধ্যে ওরা কেমন এগিয়ে যাচ্ছে। আহা, ছেলে দুটীকে বুকে ধরতে ইচ্ছা করে!"

উপস্থিত বন্ধুগণের মধ্যে, রাজীব জোয়াদ্দার ব্যতীত, সকলেই দেওয়ানজীর এই দেবোপম করুণায় গলিয়া গিয়া "আহা তা বটে!" "তাতে আর সন্দেহ কি?" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার কথার পোষকতা করিল। কিন্তু জোয়াদ্দার মহাশয়ের কোটর-গত ভ্রু-সমাচ্ছন্ন দুই চক্ষু হইতে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি বাহির হইয়া দেওয়ানের অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষুর সহিত সঙ্গত হইল। এবং মুহূর্ত্তেই এই দুই বন্ধুর চোখে-চোখে একটা নীরব কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। তাহার পর, দুই এক 'দান' দাবা খেলা ও তাম্রকূট ধ্বংসের পর সকলেই যখন উঠিয়া বাড়ী গেল, তখন জোয়াদ্দার মহাশয়কে একা পাইয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "কি করি বল ত, রাজীব? মণির যে কি করব, কিছু বুঝতে পারছি না।"

রাজীবলোচন তাঁহার শ্বেত-কৃষ্ণ মস্তকটী আন্দোলিত করিতে করিতে বলিলেন, "আমি তখনই বলেছিলাম তোমায় যে, এ ভাল হচ্ছে না, তুমি ন্যায়রত্নটাকে টোল-শুদ্ধ গঙ্গাপার করে দিয়ে এস,—তুমি ত তা শুনলে না। যেদিন কার্ত্তিক ছোঁড়াটা কাছারিতে বাবুর নাকের ওপর তোমায় অপমান করলে, সেই দিনই বুঝেছিলাম, তোমার মণির ভাগ্যে কাঁচকলা!"

দেওয়ানজী কহিলেন, "এখন আর তা হয় না। বাবু ঐ দুটো চ্যাঙড়াকে কি নজরে যে দেখেছেন, তা বলতে পারিনে! স্বয়ং হেডমাষ্টার ওদের মাষ্টার হয়ে শেখাচ্ছে। ন্যায়রত্ন এখন পরামর্শ-দাতা, হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধেতা। কি করি!"

দেওয়ানজী মুখের নলটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "হরে, তামাক দিয়ে যা না! বেটা এরই মধ্যে ঘুমুচ্ছে!"

ভৃত্য হরিদাস কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিয়া বলিল, "খাবার হয়েছে। মা ঠাকরুণ—"

"যা, যা, এখন গোল করিস্ নে।"

হরিদাস গড়গড়ায় কলিকা বসাইয়া দিয়া বলিল, "ঠাকরুণ, বল্লে খেতে এস।"

"যাচ্ছি, তুই যা না, কথাটা সেরে যাচ্ছি, বল্‌গে।"

হরিদাস নাছোড়বান্দা; আপন-মনে বকিতে লাগিল, "রামে মারলেও মারে, রাবণে মারলেও মারে। এখন যাই কোথা? রাজীব বাবু, বাড়ী যান না, রাত হয়েছে। মা রেগেছে,—বাবু ওঠো—আমার যেমন কপাল—খাটতে খাটতে প্রাণটা গেল—ওঠো বাবু—"

দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "রাজীব, কাল দুপুর বেলা এস।"

রাজীবলোচন অগ্রেই উঠিয়া পড়িয়া-ছিলেন। কারণ মা-ঠাকুরাণীর রাগের অর্থ তিনি ভাল রকমই বুঝিতেন। তাই পরদিন আসিতে স্বীকৃত হইয়া তিনি প্রস্থান করিলে দেওয়ানজীও হরিদাসকে বকিতে বকিতে অন্তঃপুরে চলিলেন।

৬

মণিশঙ্কর লোকটী চিরদিনই কবি।

সতেরো বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি বন্ধু ও গ্রামস্থ বহু বৃদ্ধের মহলে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন; এবং ঊনবিংশ বর্ষ গত হইতে না হইতেই তিনি "মকরাক্ষের মোক্ষ" নামক নাটক ও "গঙ্গার গোস্পদ লাভ" নামক মহাকাব্যের তিন সর্গ লিখিয়া যশ-গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছিলেন।

আজ কোন এক অপূর্ব্ব খণ্ড-কাব্যের 'উদ্দীপনা' তাঁহার মস্তিষ্কে জাগিয়া উঠায় তিনি দ্বিপ্রহরে তাঁহাদের বাগানের একটা আমগাছের তলায় বসিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়াছিলেন! পার্শ্বে হেরল্ডের বাড়ীর ফ্লুটটি অনাদরে পড়িয়া-ছিল! কবিবর মণিশঙ্কর এক-মনে এক রাখালের গোচারণ-কালীন গীতি শুনিতে-ছিলেন এবং তাঁহার মস্তিষ্কে সেই সঙ্গে কাহার কমল চরণের রিণিকি ঝিনির মধুর রাগিণী ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, কে জানে!

রাখালের গানটীও অতি চমৎকার, অতি করুণ। বিশেষতঃ তাহার গলায় অশিক্ষিত পটুত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিয়া আমাদের কবিবর তাহাকে তাঁহার থিয়েটারে কোনও একটা পার্ট দিতে পারেন কি না, ঐ সঙ্গে তাহাও ভাবিতেছিলেন। রাখালের গানটিতে বেশ মধুর ও করুণ রসের সমাবেশ ছিল। রাখাল গাহিতেছিল,—

"ছোট মামু গো। ভেব্যা মলু গো!
দুনিয়া পোড়ালে আল্লা!
ম্যাঘ কইরে সদা পানী নাহি হয়,
মাটী 'ফাইটা' হল চ্যাল্লা চ্যাল্লা।
হ্যাদুর বামুন যত হয়্যা হ্যাতজ্ঞ্যান
'শিবির' মাথায় তাঁরা পানি ঢেইল্যা দ্যান,
কাঁইদা ভ্যাকুল হইল য্যাত মোছলমান,
কোরাণ পইড়্যা মল চ্যারানে মোল্লা।"

কবি মণিশঙ্কর রাখাল-বালকটীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে গানটী লিখিয়া লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটী নবতর সুরের গুঞ্জন-ধ্বনি তাঁহার মগজে জাগিয়া উঠায় তিনি রাখাল-বালকের সঙ্গে বাঁশীতে তান ধরিয়া দিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সুরটি তাঁহার বন্ধুর মহলে "শঙ্কর-সাহি" নাম ধারণপূর্ব্বক প্রচারিত হইয়া গেল।

কিন্তু এইরূপে আমাদের মণিশঙ্কর নব সুর, নবতর গান এবং নবতম কাব্যের জন্ম দিয়াও মনে স্বস্তি পাইতেছিলেন না। কারণ তাঁহার মানস-প্রতিমার মূর্ত্তি তাঁহাকে শয়নে স্বপনে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই মানস-প্রতিমাটী হঠাৎ এক শীতের সন্ধ্যায় দশম বর্ষীয়া এক বালিকার রূপ ধরিয়া বহু জামা-জোড়া শ্রী-অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক সবুট পদক্ষেপে কবিবরের মানস-আম-দরবারে প্রবেশ করিয়া একেবারে রাণীর মহিমায় চিত্ত-সিংহাসনে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। ইনি আর কেহই নন, আমাদের পরিচিতা শ্রীযুক্তা শৈলজাসুন্দরী। যদিও কবিবর ইঁহাকে বহুবার দেখিয়াছিলেন, তবুও কে জানে কেন, কোন্-এক অপূর্ব্ব সন্ধ্যালোকে অপরূপ লগ্নে টম্‌টমোপরি উপবিষ্টা ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি-শালিনী এই মহিম-ময়ী কুমারী এক-লম্ফে

তাঁহার সান্ধ্য-ভ্রমণের টমটম হইতে একেবারে কবির চিত্ত-শতদলের উপর চড়িয়া বসিয়াছিলেন, তাই কবি মণিশঙ্কর উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত, উৎক্ষিপ্ত-হস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার মাতা নিস্তারিণী দেবী বলেন যে তাহার পরিপাকের গোল-মাল হইতেছে; বন্ধুরা বলেন, কবিতা দেবী ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শত্রুরা বলে—না, সে কথায় আর কাজ নাই! শত্রুর কথায় কান দিতে গেলে জগতের কোন শক্তিমান পুরুষের সম্বন্ধেই কোন কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে—গঞ্জিকা-সেবনে বা ধান্যেশ্বরীর সেবায় কবিতার উৎস খুলিয়াই যায়, হজমের গোল করে না, শত্রুরা যাহাই বলুক, মণিশঙ্করের "শঙ্কর-সাহি" সঙ্গীত গঞ্জিকার ধূমে অথবা সময়ান্তরে ধান্যেশ্বরীর চক্রে অধিকতর জমিয়া উঠে। শত্রুর কথায় কর্ণপাত নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু প্রকৃত কবির মনোভাব কখনই গোপন থাকিতে পারে না, তা সে কথা যত গোপনীয়ই হোক। যে কথা শুনিলে লোকে কর্ণে অঙ্গুলি দান করিবে, তাহাও যদি প্রকৃত কবির জীবনে ঘটিয়া থাকে, তবে কবিতা দেবীর কৃপায় তাহাও জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত হইবেই; এবং নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ মন্ত্রানুসারে তাহা প্রকৃত কবিত্ব-শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া লোকে হজম করিবেই। চিরদিনের এই নিয়মানুসারে কবি মণি শঙ্করের গোপন কথাটি স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে প্রচারিত হইয়া পড়িল; এবং ক্রমশঃ সেই কথা কবির "শঙ্কর-সাহি" যোগে কোন্ এক বিশেষ মুহূর্ত্তে মাতা নিস্তারিণী দেবীরও শ্রুতিগোচর হইল; পরে সে স্থান হইতে যথারীতি পিতা দুর্গাশঙ্করের কর্ণেও সে কথা উঠিতে বাকী রহিল না। দুর্গাশঙ্কর তখন চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "এঁ্যা! হারামজাদা কোন্ দিন আমারও সর্ব্বনাশ করবে, দেখছি! আরে চুপ, চুপ, কি বল, তার ঠিক নেই! আমার ছেলে শৈলর জন্য পাগল! মা দুর্গে, এ আমায় কি বিপদে ফেল্লে! তোমাদের জ্বালায় কি দেশ ছেড়ে পালাব না কি!"

নিস্তারিণী কহিল, "তা তুমি রাগই কর, আর যাই কর, এর একটা বিহিত করতে হবে। মণি আমার খায় দায় না—শৈলর নামে কি একটা গান বেঁধেছে, তাই গেয়ে বেড়ায়।"

দুর্গাশঙ্কর কহিলেন, "আরে, থাম, থাম, চাকর-বাকরে শুনতে পেলে সর্ব্বনাশ ঘটবে। হতভাগাটার মাথা তুমি এমনি করে খাচ্চ? আপন ছেলের ইষ্ট বুঝছ না? এ সব কি হচ্চে তোমার?"

নিস্তারিণী দেবী চটিয়া লাল হইয়া উঠি-লেন, বলিলেন, "হবে আবার কি! তোমারই মাথা খারাপ হয়েছে, তাই নিজের ছেলের ভাল দেখতে পাচ্ছ না। বাবু ত ঘর-জামাই নেবার চেষ্টায় আছেন। আমার মণি কি তাঁর ঐ রূপের ধোচন মেয়ের অযুগ্যি? কেন, তুমি চেষ্টা কর না! চেষ্টা করে দেখলে এত দিন কোন্ কালে দেখতে, আমার মণি তোমার মনিব হয়ে তোমার ওপর হুকুম চালাচ্ছে।"

পত্নীর পতিভক্তির এই সুমধুর পরিচয় পাইয়াও দুর্গাশঙ্করের ক্রোধ কমিল না।

তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "বাবু ঘরজামাই নেবেন বলে কি হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেবেন! কে তোমার ঐ মাতাল গেঁজেল ছেলেকে মেয়ে দেবে?"

নিস্তারিণী দেবীর আর সহ্য হইল না, তিনি মাটীতে পড়িয়া "ওগো, এমন স্বামীর হাতেও পড়েছিলুম গো, ওগো—"ইত্যাদি নানাবিধ সকরুণ উক্তির সহিত বহুবিধ রাগ-রাগিণী-সংযোগে আপনার মর্ম্মবেদনা জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। দুর্গাশঙ্কর তখন বে-গতিক দেখিয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে এবং নিস্তারিণী দেবীর কথা-মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সে যাত্রা নিস্তার লাভ করিলেন।

৭

দুই-তিন বৎসর ধরিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের গৃহে যাতায়াত করিয়া সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকচন্দ্র যখন এনট্রান্স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশের অনুমতি পাইল, তখন শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র দাস একেবারে অপমানে প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ প্রধান শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দুই এক বৎসরের মধ্যে কেহই তৃতীয় শ্রেণীর যোগ্য ইংরাজী ও অঙ্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না; ছাত্র দুইটীকে আরও নিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হউক। প্রধান শিক্ষক রামরতন হাজরা হাসিয়া বলিলেন, "আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, যদি অনুপযুক্ত বোধ করেন, নামিয়ে দেবেন।"

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের স্পষ্ট-বক্তৃত্ব নামক একটী সর্ব্বজন-বিদিত গুণ ছিল। তিনি যখন-তখন সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিয়া যশ অর্জ্জন করিতে ছাড়িতেন না। সেই কারণেই এমন উপযুক্ত অবসরকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন না,—তাঁহার টেরা চক্ষুর একটী অন্য একজন শিক্ষকের উপর এবং অপরটী গবাক্ষের গরাদের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি নিজে পড়িয়েছেন বলেই যে ওরা উপযুক্ত হবে, তার কোন অর্থ নেই। আমি নিজে পরীক্ষা করে নেব, আর অখিলবাবুও (অঙ্ক-শিক্ষক) পরীক্ষা করবেন।" অখিলবাবু সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে, আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আপনিই পরীক্ষা করুন।"

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাহার দিকে তাঁহার টেরা চক্ষুর এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহার অর্থ বিচক্ষণ চক্ষুতত্ত্ববিদ ডাক্তার সাহেব তিন হাজার বৎসরের সুগভীর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারাও উদ্ধার করিতে পারিতেন না। তবে উক্ত শিক্ষক মহাশয় সেই দৃষ্টি যে অতি ঘৃণার দৃষ্টি অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত; কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর হ্রস্ব ও ঋজু পদের উপর ভর দিয়া স্বাভাবিক পদটা কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উক্ত মহানুভব শিক্ষক তাঁহার রাজাসনে আসীন হইয়া যখন সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "ওহে ছোকরা, কি নাম তোমার? এ দিকে এস" তখন ঐ শ্রেণীর সমস্ত তরুণ হৃদয়গুলি আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কারণ, শিক্ষক মহাশয়ের স্বরের বহুবিধ ভঙ্গীর

অর্থ তাহারা অস্থি-মজ্জায় অনুভব করিতে শিখিয়াছিল। সর্ব্বানন্দ যখন সলজ্জভাবে তাঁহার সিংহাসনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ওহে, এত ধেড়ে বয়সে এতটুকু-টুকু ছেলের সঙ্গে পড়তে তোমার লজ্জা করবে না?" সর্ব্বানন্দ অধিকতর লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে চটী জুতা দিয়া প্লাটফর্ম্মের পায়ায় আঘাত করিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় উক্ত কার্য্যকে "ধেড়ে ছেলের" ধৃষ্টতা মনে করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন? বল না!" সর্ব্বানন্দ তখন অতি মৃদু স্বরে বলিল, লজ্জা করিবে।

শিক্ষক বলিলেন, "কিন্তু সাবধান, যা জিজ্ঞাসা করি, যদি তার ঠিক জবাব দিতে না পার, তা'হলে তোমায় এদের চাইতেও ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়তে হবে।"

সর্ব্বানন্দর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শিক্ষক তাহাকে রয়েল রিডার নম্বর ফাইভ নামক অতি অপূর্ব্ব ও গুরুগম্ভীর পুস্তক হইতে একটী গুরুতম স্থান বাহির করিয়া বলিলেন, "পড়।" সর্ব্বানন্দ কম্পিত হৃদয়ে উহা পাঠ করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাহার উচ্চারণ তেমন সুবিধাজনক হইল না, তবে কোন স্থানে আটকাইল না। পূর্ণবাবু তাঁহার চক্ষু দুইটিতে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, ফুটিল কি না সে সংবাদ কেহ রাখে না, তবে তাঁহার দন্তপংক্তি সহসা বিকশিত কুন্দবৎ সমস্ত মৌন ও ভীত হৃদয়গুলির ভয়ের অন্ধকার কথঞ্চিৎ দূরীভূত করিল। তিনি তাঁহার দংষ্ট্রময়ুখ প্রীতির পাত্র কোন এক বালকের উপর পুঞ্জীভূত করিয়া বলিলেন, "কেমন রে নিধে, পড়া ঠিক হয়েছে?" নিধে ওরফে নিধিরাম এক-লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ও কিছু হয় নি।" শিক্ষক তাহাকে আদেশ করিলেন, "একবার শুনিয়ে দে ত, হেড মাষ্টারের ছাত্র হলেই রিডিং পড়া শেখা যায় না।" নিধিরাম পরম পুলকিত চিত্তে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় উক্ত শিক্ষক মহাশয় যে ভাবে যে স্থানে মাথা নাড়িতেন, থামিতেন, বা সুর টানিয়া ছোট-বড় করিতেন, অবিকল তাহার অনুকরণ করিয়া ঠিক সেই ভাবে পাঠ করিল।

তাহার পাঠ-ক্রিয়া শেষ হইলে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "That's all right. শুনলে হে ছোকরা, দু'বছরে এ রকম রিডিং পড়া শেখা যায় না।"

পরে তিনি সর্ব্বানন্দকে ঐ স্থানের অর্থ করিতে আদেশ দিলেন। সর্ব্বানন্দ ভয়ে ও লজ্জায় দুই-এক স্থানের অর্থ বলিতে ভুল করায় আবার তাহার উপর শ্রেণীস্থ সমস্ত বালকবৃন্দের বিদ্রূপাত্মক কলরব ও সর্ব্বোপরি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের বিরাট হাস্যের তীব্র বিষ বর্ষিত হইল।

এদিকে কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বানন্দর অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে গুমরাইতেছিল। হঠাৎ শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবামাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি হে, অমন করে তাকাচ্ছ কেন? এদিকে এস ত দেখি, তোমারই বা কতদূর দৌড়!"

কার্ত্তিকচন্দ্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সমবেত বালকমণ্ডলীকে দেখিয়া লইয়া এক-লম্ফে সম্মুখস্থ একটা ডেস্ক ডিঙাইয়া একেবারে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। শিক্ষক মহাশয় তাহার প্রচণ্ড মুখভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ থতমত খাইয়া বলিলেন, "ও কি! অমনভাবে লাফিয়ে এলে যে? কেবল লাফালাফি শিখেছ, বুঝি?"

কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "যেখানে যেমন রীতি, সেখানে তেমনি করতে হয়।"

শিক্ষক মহাশয় অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে কি বাঁদর-লাফ শিখতে আসে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "এখানে ত তাই শেখানো হয় দেখছি। যাক, কি জিজ্ঞাসা করবেন, করুন।"

শিক্ষক কহিলেন, "কি! হুকুম চালাচ্ছ যে! আমি ভোজপুরী ছাতুখোর দরোয়ান নই যে আমায় ভয় দেখিয়ে সারবে! যা জিজ্ঞাসা করব, তা বলতে না পারলে বিতিয়ে লাল করে দেব।"

কার্ত্তিক কৃত্রিম বিনয়ে হাত জোড় করিয়া বলিল, "যে আজ্ঞে! এখন জিজ্ঞাসা করুন।"

শিক্ষক মহাশয় বজ্র-নিনাদে বলিলেন, "Rascal! bloody fool!"

কার্ত্তিকচন্দ্র টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "এদের অর্থ চান? এদের অর্থ,—a squint-eyed lame man. বাঙলা মানে, টেরা-চোখো, দেড়-ঠেঙ্গো মানুষ।"

নামক আগ্নেয়-গিরির বিকট গর্জ্জন না কি বহুশত ক্রোশ দূরস্থিত মালয় উপদ্বীপেও শুনা গিয়াছিল এবং তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশি সুদূর ইংলণ্ডের সান্ধ্য আকাশকেও রঞ্জিত করিয়াছিল। কার্ত্তিকচন্দ্রের ভীষণ বিদ্রূপে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় যে প্রচণ্ড শব্দে আপনাকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা সুদূর লাইব্রেরী ও দরোয়ানের টীনের ছাদেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ শব্দের নানা কারণের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ নামক দুর্বিনীত শক্তির যোগ থাকায় ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া অন্যান্য শিক্ষক-গণের অনুমান। প্রত্যক্ষ যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারাও বলে যে, তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া তাঁহার চেয়ারখানি চৌকি হইতে তাঁহাকে লইয়াই পতিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতর বেদনার কারণ হইয়াছিল, কার্ত্তিকচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক হাস্যপরিপূর্ণ বাক্য!—উক্ত শিক্ষক মহাশয় যখন ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুনিলেন, কার্ত্তিকচন্দ্র পরিষ্কার কণ্ঠে উক্ত বচনটি উদ্ধৃত করিতেছে, তখন তিনি ক্রোধে দুঃখে অপমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন; এবং ব্ল্যাক বোর্ডের বেঞ্চের উপর আহত পাখানি তুলিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অন্যান্য শিক্ষকগণ সেই কক্ষে সমবেত হইলেন এবং প্রধান শিক্ষক সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "কার্ত্তিক, তুমি এঁর

কার্ত্তিকচন্দ্রের ক্রোধ অনুশোচনায় পরিণত হইয়াছিল। সে বিনীত স্বরে বলিল, "উনি মিছামিছি সর্ব্ব-দাদাকে সকলের সামনে অপদস্থ করেছিলেন, তাই আমি সে অপমানের শোধ নিয়েছি। তবে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।" কার্ত্তিকচন্দ্র জোড়-করে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের আঘাতের জ্বালা তখনও কমে নাই; তাই তিনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "আগে ও কান মলুক, নাক-খৎ দিক, তবে ক্ষমা করব।" কার্ত্তিকচন্দ্র বিনাবাক্য-ব্যয়ে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিল। তথাপি উক্ত শিক্ষক মহাশয় মুখ বক্র করিয়া রহিলেন দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "ওর আর কি শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, করুন। ও প্রস্তুত আছে।" পূর্ণবাবু আজ্ঞা দিলেন, উহাকে সাতদিন বেঞ্চের উপর দাঁড়াইতে হইবে। হেডমাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইতেছে; তথাপি তিনি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর সেই আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কার্ত্তিকও বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাহার নিজস্থানে গিয়া বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু কোন বালকই সাহস করিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না।

হেডমাষ্টার মহাশয় তখন তৃতীয় মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি কার্ত্তিকের পিছনে বেশী লাগবেন না। কারণ এর মধ্যেই ও আমার ফার্ষ্ট ক্লাশের সেরা ছাত্রের চাইতেও ছাত্র আমার হাতে কখনও পড়ে নি ওকে ফার্ষ্ট ক্লাশেই একেবারে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই সর্ব্বানন্দর সঙ্গ ছাড়তে রাজী নয়, তাই ওকেও আপনার ক্লাশে দিয়েছি। আর মনে থাকে যেন, কালিকাবাবুর দৃষ্টি ঐ ছেলেটীর উপর সর্ব্বদা পড়ে আছে। ওকে বেশী ঘাঁটালে কারও রক্ষা থাকবে না। আর এই বয়সে এত মাইনের এমন চাকরী যে আপনার অন্য কোথাও জুটবে, তারও বড় ভরসা দেখি না। সাবধান!"

৮

একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া শৈলজা যখন দেখিল, তাহার বয়োকনিষ্ঠা বা সমবয়স্কা সরলা, কমলা প্রভৃতি বহু আত্মীয়া অনাত্মীয়া বালিকার বিবাহ হইয়া গেল, তাহার হইল না, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার ঠাকুরমার উপর আবদার আরম্ভ করিয়া দিল। ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "তুই কি রকম বর নিবি?" শৈলজা সগর্ব্বে বলিল, "কেন, মণিদার মত!" মণিশঙ্কর ইতিমধ্যে মাতৃ-উপদেশে জমিদার-গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহার "মানস-প্রতিমাকে" ভুলাইবার জন্য বহুবিধ জাল বিস্তার করিতেও সে কোন ত্রুটি রাখে নাই।

ঠাকুরমা চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কিরে, ঐ হতভাগাটার মত?"

শৈলজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "গাল দিচ্ছ? আমি ওকে বলে দেব।"

"তা দিস, কিন্তু ওকে তোর পছন্দ

"ও কেমন থিয়েটারে রাজা সাজে, গান করে, আবার আমায় সেদিন কেমন খরগোস দিয়েছে, তুমি দেখনি ?"

"দেখেছি, কিন্তু রাজা সাজলে, খরগোস দিলেই কি বিয়ে হয় !"

"ও আমায় কত আদর করে ! বাঃ, আমার জন্যে সেদিন কেমন মস্ত একটা ফুলের তোড়া এনেছিল, আমি মণিদাকেই বিয়ে করব, ঠাকুমা, তুমি বিয়ে দাও।"

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দাঁড়া, তোর বাবাকে বলে বিয়ের বন্দোবস্ত করছি। কিন্তু মণির সঙ্গে নয়।"

"তবে কার সঙ্গে ?"

"কার্ত্তিকের সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, আমি ওকে বিয়ে করলে ত। ও যে দুষ্টু !"

"দুষ্টু ! সে কি রে, কি দুষ্টুমি করলে ?"

"ও সব্বাইকে মারে। আমায় ত একবার মারতে গিয়েছিল, মনে নেই ?"

"সে কিরে ! সে কথা এখনও তোর মনে আছে ?"

"মনে নেই আবার ! তা ছাড়া মণিদা তার কত নিন্দে করে, বলে, ইস্কুলে ছেলেদের সঙ্গে ও ভারী মারামারি করে, মাষ্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করে। না ঠাকুমা, তার চেয়ে সর্ব্ব-দা ভাল, না হয়, ওরই সঙ্গে বিয়ে দাও। কার্ত্তিকদাকে বিয়ে করব না,—ও তাহলে কোন্ দিন আমায় মেরে ফেলবে।"

ঠাকুরমা উচ্চ হাস্য করিয়া তাঁহার বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও বৌমা, তোমার মেয়ের কথা শোনো।"

শৈলজার মাতা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি বলছিস, শৈল ?"

শৈল কহিল, "ঠাকুমা আমায় কার্ত্তিক-দাকে বিয়ে করতে বলছে। আমি বলছি, অত দুষ্টুকে আমি বিয়ে করব না।"

মাতা হাসিয়া বলিলেন, "তা না করিস, না করবি ! এখন যা, তোকে সরলা ডাকছে, তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কত খেলনা এসেছে, দেখ্ গিয়ে।" শৈলজা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শৈলজার মাতা তখন শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বলিলেন, "মা, ও সব কথা শৈলকে না বলাই ভাল। উনি ওতে রাগ করেন, বারণ করেন।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি, মা। কিন্তু তোমার মেয়েই যে এদিকে পাকা বুড়ী হয়ে উঠেছে, তার খবর ত' রাখ না। ওই বল্লে, সরলার বিয়ে হল, কমলার বিয়ে হল, আর আমার বিয়ে হবে কবে ? আমি তাই জিজ্ঞেস করছিলুম, কেমন বর নিবি ? তাতে কি বল্লে, জান ? বল্লে, মণিদাকে বিয়ে করব। এমনি তোমার মেয়ের পছন্দ !"

শৈলজার মাতাও চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কি মা, মণিশঙ্কর ! দেওয়ানজীর ছেলে !"

"হ্যাঁ, ওই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটা। ছোঁড়াটা না কি ওকে কি-কি দিয়েছে।"

"আর ওকে এখানে আসতে দেওয়া নয়। ও ভারী বদ ছেলে।"

"তা কি আর আমি জানিনে ?"

শৈলজার মাতা চিন্তিত মনে প্রস্থান

করিলেন; এবং সময়-মত সমস্ত কথা কালিকাবাবুর নিকট খুলিয়া বলিলেন। কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এতেই এত ভাবনা! আমি বলি, মেয়ের বুঝি সর্দ্দি লেগেছে! তা নয়, সে মণিটাকে বিয়ে করতে চেয়েছে! তাই বল। ডাক ত' শৈলকে।" শৈলজাকে ডাকিতে আদেশ দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। ও বয়সে মেয়েমানুষের যখন বিয়ে হয়ে যায়, তখন শৈলর কথা হেসে ওড়ানো চলে না।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "যাদের চলে না, তারা অমন করে বলতে পারে না যে, 'আমার বিয়ে দাও'। তা আবার কার সঙ্গে, না, যে দুটো খরগোস দিয়েছে, কি দুখানা ছবি দিয়েছে, তারই সঙ্গে! আমার শৈল চিরদিন খুকীই থাকবে, তোমার ভয় নেই, ইন্দিরা। তবে তোমাদের একটা অনুরোধ, ডেঁপো মেয়েদের সঙ্গে ওকে মিশতে দিয়ো না, এইটুকু করো, তা হলেই দেখবে, সব ঠিক থাকবে।"

গৃহিণী কহিলেন, "কিন্তু মা যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, আর কতদিন অপেক্ষা করবে? কার্ত্তিককেই যদি তোমার এত পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আর দেরী করছ কেন? ওর বাপকে বলে সব ঠিক করে ফেল না। কিন্তু আমার মত যদি নাও, তা হলে সমান ঘরে বিয়ে দাও, অমন গরীবের ছেলে এনে শেষে ও বেচারার এ কূল ও কূল দুই মজাবে!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তুমি কার্ত্তিককে এখনও চিনতে পার নি, তাই ঐ ভয় করছ। ঘর-জামাই হলেই যা হবার সম্ভাবনা, আমি তাই দূর করবার জন্য কার্ত্তিককে যথাসাধ্য শিক্ষিত করে নিতে চাই। ও যাতে মনে করতে পারে যে, ইচ্ছা করলেই ও স্বাধীন, এই রকম বিদ্যা-সাধ্য ওর করিয়ে দিয়ে তবে ওকে মেয়ে দেব। তাই এত যত্ন করে পড়াচ্ছি!"

গৃহিণী ইন্দিরা দেবী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মেয়ের যদি ওকে পছন্দ না হয়?"

"তা হলে আজীবন কষ্ট পাবে। আমি কিন্তু আর কারও হাতে আমার মেয়ে তুলে দিতে পারব না। কার্ত্তিককে দেব, তারপর মেয়ে যদি নিজের বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট করে, বুঝব, মেয়ের কপালে সুখ নেই। নইলে কার্ত্তিককে যে জানে, সে ওকে ভাল না বেসে থাকতে পারে, তা ত আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না।"

"তুমি যে কার্ত্তিককে কি চোখে দেখেছ, তা তুমিই জান। কিন্তু আমি ত ওর খুব বুদ্ধি-শুদ্ধি ছাড়া আর কোন গুণ দেখতে পাইনে।"

"পাও না! আশ্চর্য্য। ওর ঐ গম্ভীর মুখখানায় কি একটা প্রচণ্ড শক্তি! আপনাকে বিপদে ফেলেও পরকে ভাল-বাসবার ক্ষমতা ও রাখে! তা ছাড়া আরও যা আছে, তা তোমায় কি বোঝাব?' তার সুমুখে দাঁড়ালে হয় ত রাজা-মহারাজের মাথা নীচু হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে, নির্ভিক তেজস্বিতা! দেখেছ কোন দিন, ওর তেজ? ওকে দেখলেই আমার মনে পড়ে, সেই পূর্ব্বকালের তপোবনের ঋষি-

বালকদের কথা। ইন্দিরা, আমি যে কেন ওকে ভালবাসি, একদিন ওকে তোমার কাছে বসিয়ে কথা কয়ে দেখো, তাহলেই সব বুঝতে পারবে।"

তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় শৈলজা সেখানে আসিয়া বলিল, "কি বাবা, ডাকছ কেন?"

পিতা তাহাকে খাটের নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "কি করছিলি?"

"কিছু না। একটা মজা দেখছিলুম।"

"মজা দেখছিলি? কোথায়, কি মজা?"

"কার্ত্তিকদা এসে তোমার আলমারি খুলে বই ঘাঁটছিল। যে বইখানা ও রোজ কেবলই-কেবলই ঘাঁটে, আমি সেখানা লুকিয়ে রেখেছি, ও তাই খুঁজছে আর রামচরণকে বকছে। আমি লুকিয়ে তাই দেখছিলুম, আর সরলাকে দেখাচ্ছিলুম।"

"তুই ত ভারি দুষ্টু। যা, গিয়ে বের করে দিয়ে আয়।"

"না, দেব না। কেন দেব? ও কেন রোজ রোজ আমাদের বই ঘাঁটবে! ওর নিজের বই ঘাঁটুক না গিয়ে।"

"পাগলি, ও যে আমার বই নিয়ে পড়ে। ও বই না পেলে ওর পড়া হবে না, শেষে স্কুলে মার খাবে।"

"ও যেমন দুষ্টু, ওর মার খাওয়াই উচিত। বাবা, তুমি ইস্কুলের মাষ্টারদের বলে দিয়ো যে, ওর নিজের বই নেই, পরের বই নিয়ে পড়ে, তাই ও পড়া বলতে পারে।"

ইন্দিরা কহিলেন, "তুই যেমন ওকে দেখতে পারিস নে, আমরা যে তেমনি ওকে খুব ভালবাসি।"

শৈল কহিল, "তাইতেই ত ওর আস্কারা আরও বেড়ে গিয়েছে, নইলে যখন-তখন সবাইকে ও বকে কেন? আমি কিছু করলে ধমকায় কেন?"

ইন্দিরা কহিলেন, "তুই ওর পেছনে লাগতে যাস কেন?"

শৈল কহিল, "বেশ করব, লাগব। যে আমায় মারতে আসে, বকে, তাকে আদর করবে! বাবা, তুমি ওকে কেন এখানে আসতে দাও? রোজ রোজ কেন ও তোমার লাইব্রেরী ঘাঁটবে?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, কাল থেকে ওকে এখানে আসতে মানা করে দেব। তা হলেই ত হবে? ও বেচারার তাহলে কিন্তু খুব কষ্ট হবে।"

শৈলজা কিছুক্ষণ বিছানার উপর মাথা রাখিয়া চিন্তা করিয়া বলিল, "খুব কষ্ট হয় ত এক-একদিন আসতে দিয়ো, কিন্তু রোজ নয়। তার চাইতে মণিদাকে বলে দেব, ও এসে রোজ রোজ তোমার বই পড়ে যাবে।"

ইন্দিরা দেবী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "খবদ্দার শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলিসনে। ও ভারী পাজী। ফের যদি কোন দিন ওর কাছ থেকে কিছু তুমি নাও— "

গৃহিণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কালিকাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "কি মিছি-মিছি যা-তা বকছ! না রে শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলিস্। তবে তাকে সবাই মন্দ বলে, সেজন্য সে কিছু দিলে নিয়ো না।

নিলে সবাই আমায় বকবে, তোমাকেও বকবে।”

শৈলজাসুন্দরী এইবার চটিয়া গেলেন। তিনি মহারাণী-অধিরাণীর মত তার ক্ষুদ্র মস্তকটী উন্নত করিয়া বলিলেন, “আমি তোমাদের কারও কথা শুনব না। কেন, তোমরা মণিদাকে বকবে? কি করেছে সে?”

কালিকাবাবু কন্যার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, “ওরে না, না, সে আমাদের কিছু করে নি। কিন্তু তুই যদি তার কাছ থেকে কিছু নিস্, তাহলে সবাই আমাদের বকবে।” শৈলজার সে কথা বিশ্বাস হইল না, কারণ তাহার পিতাকে তিরস্কার করিতে পারে, এমন লোক সে চোখে দেখেই নাই, কল্পনাও করিতে পারে না! সেই কারণে সে মাথা নাড়িয়া বলিল, “তোমাকে কেউ বকবে না। তোমরা তাকে দেখতে পার না বলে এই কথা বলছ।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “যে জন্যই বলি, তুমি তার কাছ থেকে কিছু নিয়ো না। নিলে আমার খুব দুঃখ হবে, তোমার মার কষ্ট হবে।”

শৈলজা এইবার নরম হইয়া বলিল, “আচ্ছা, তোমরা কষ্ট পাও ত' নেব না। কিন্তু মিছিমিছি তোমরা মণিদার উপর রাগতে পাবে না। আমি কিন্তু মণিদার খরগোস ফিরিয়ে দেব না।”

কালিকাবাবু অগত্যা সেই সর্ত্তে সম্মত হইয়া কন্যাকে বলিলেন, “যাও, এখন খেলা করগে।” কন্যা অমনি বলিয়া উঠিল, “খেলা করব কি? কার্ত্তিকদা কি করছে, দেখে আসি। বই না পেয়ে নিশ্চয়ই সে এতক্ষণ লাইব্রেরী মাথায় করেছে।”

কার্ত্তিকচন্দ্র ওদিকে তাহার ওয়েবষ্টার ডিক্সন্‌রীখানা খুঁজিয়া না পাইয়া যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছিল এবং শেষে অগত্যা আর একখানা পুরাতন অভিধান খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া কাজ চালাইয়া লইতেছিল। তাহার সম্মুখে বসিয়া সর্ব্বানন্দ একখানা খাতায় কতকগুলা ইংরাজী idiom-এর বাংলা তর্জ্জমার চেষ্টায় বারবার মাথা চুলকাইয়া পেনসিল কামড়াইয়া ক্ষণে ক্ষণে কার্ত্তিকচন্দ্রের দিকে চাহিতেছিল—ইচ্ছা, সে একটু সাহায্য করে। কিন্তু কার্ত্তিক চন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আপন মনে কাজ করিতেছিল, অন্যদিকে চাহিবার তাহার অবসরমাত্র ছিল না!

এমন সময় দ্বারের নিকট একটা সুমধুর হাস্যধ্বনি শুনিয়া সর্ব্বানন্দ চমকিয়া ফিরিয়া দেখে, শৈলজা দুই হাতে সেই অভিধানের দুই অংশ লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, “কার্ত্তিক, ঐ দেখ তোমার ওয়েবষ্টার।”

কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া শৈলজার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র, শৈলজা হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, “দেব না, কখখ্‌নো দেব না ত।” তখন কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, “দিয়ে যাও বলছি, শৈল, নইলে—”

শৈলজা কিন্তু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মাথা নাড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিল, “দেব না—কখ্‌খনো দেব না।” তখন

কার্ত্তিকচন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া তাহার দিকে সবেগে ছুটিতে গিয়া আর-একখানা চেয়ারে কাপড় আটকাইয়া পড়িয়া গেল ; এবং একটা আলমারির কোণে লাগিয়া তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তবুও কার্ত্তিকের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় শৈলজাকে ধরিতে গেল। শৈলজা কিন্তু কিছু দূরে ছুটিয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা, কার্ত্তিক যদি বাহিরে না আসে, তাহা হইলে আবার গিয়া তাহাকে ঐ বই দুইখানা দেখাইবে। কার্ত্তিকচন্দ্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শৈলজার সমস্ত দুষ্টামি মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বই দুইখানা ফেলিয়া দিল এবং কার্ত্তিকের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ও কার্ত্তিক-দা, রক্ত যে! তোমার কপাল কেটে গেছে। ও রামচরণ, জল আন্। ও সর্ব্ব-দা, শীগ্‌গির এস।"

কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথমটা ঝোঁকের মাথায় বাহিরে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বাহিরে আসিয়াই আঘাতের গুরুত্ব অনুভব করিল। কারণ কপাল কাটিয়া রক্তের ধারায় তাহার মুখ ও বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, শৈলজা কাঁদিতে কাঁদিতে লাইব্রেরীর বাহিরে যে এক-কলসী জল ছিল, তাহাই একটা প্রকাণ্ড মগে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছে, আর কার্ত্তিক এক হাতে ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিয়া রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

লাইব্রেরীর খানসামা রামচরণ দ্বিপ্রাহ্নিক নিদ্রা দিতেছিল। শৈলজার চীৎকারে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ জল ঢালিয়া কার্ত্তিকের কপালে জলপটী বাঁধিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিতে গেল। কার্ত্তিক ধীরে ধীরে উঠিয়া যখন লাইব্রেরীর একখানা চেয়ারে বসিল, তখন শৈল চোখ মুছিয়া ম্লান মুখে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "কার্ত্তিক-দা, বাবাকে বলো না, আর আমি দুষ্টুমি করব না।"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "তোমার দোষ কি! আমি ত আপনি পড়ে গিয়েছি।"

"না কার্ত্তিকদা, আমারই দোষ। আমি মাপ চাচ্ছি। সর্ব্ব-দা, ঐ দেখ, আরও রক্ত পড়ছে! কি হবে?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "ভয় কি! ডাক্তারবাবু আসছেন। এখনই সেরে যাবে।"

"যদি রক্ত বন্ধ না হয়, আমার বড় ভয় করছে, আমি বাবাকে ডেকে আনি।"

শৈলজা চলিয়া গেল। তারপর ডাক্তার বাবু আসিয়া বাঁধা-ছাঁদা করিয়া বলিলেন, "এখন নড়ো না, বিকেলে বাড়ী যেয়ো, এখন খবরদার নড়ো-চড়ো না।"

(ক্রমশ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

মফস্বলের হাকিম ও মোক্তার

বেলা তিনটার সময় রামদীনের রান্না করা আলুর তরকারি এবং ভঁয়সা ঘিয়ে ভাজা মোটা আটার লুচি যথাসাধ্য গলাধঃকরণ করিয়া নৌকায় আসিয়া শুইয়াছি, এমন সময় থানা হইতে শ্যামলালবাবু ডাক হাঁক্ করিতে লাগিলেন, "আরে ভায়া, আর কত খাবে ?—একবার এপারে এসনা,—আমার যে একটু জরুরী কাজ আছে।" লোকটার বেহায়াপণা দেখিয়া একবার মনে হইল কোন উত্তর দিব না,—কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া আবার থানার ঘাটে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্যামলালবাবুর "একাদশী" করা বোধ হয় তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল, কারণ তাঁহার মুখখানি তাম্বুলরাগে রঞ্জিত দেখা গেল। বামহাতে একটী খোলো হুঁকা লইয়া তিনি ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া এক-একটী টান দিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক-একটি ঢেকুর তুলিয়া "একাদশী"টা যে একটু অতিরিক্ত মাত্রাতেই করা হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ভায়া, মনে বড় কষ্ট দিয়ে গেলে, আমার বাসায় একটু জল পর্য্যন্ত খে'য়ে গেলে না,—আমি কতবার তোমার ওখানে গিয়ে জামাই-আদরে খেয়ে আসি,—কত ত্যক্ত করি,—আর আমার এমনি কপাল যে, তোমাকে একটু মিষ্টিমুখও করাতে পারলুম না! তা' এবার যা' হবার তা' হয়ে গেল, আবার যদি কখনও এদিকে আগমন হয়, তবে পাঁজি দেখে এস,—সেবারও যেন এমনি একাদশীতে এসে আমাদের ক্ষুণ্ণ করে যেও না,—আমার স্ত্রী তোমাকে দু'টী খে'তে দিতে না পে'রে ভারি আপশোষ করছিল,—তা আমি তাকে অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এসেছি,—তুমি ত আমাদের ঘরের লোক—"!

আমি বহুকষ্টে বিদ্রূপের হাসি সম্বরণ করিয়া বলিলাম, "তা'ত বটেই, তা'ত বটেই,—আমি কি আর আপনার পর ? এখানে খেলেও আপনারই খেতেম, ওপারে গিয়েও আপনারই খে'য়ে এলেম,—এ'তে আর আপনাদের ক্ষুণ্ণ হবার কি আছে ? আত্মীয়তার ত লক্ষণই এই—"!

শ্যামলাল বাবু এই কথাতে যেন বড়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া বলিলেন, "তা ভাই, বেশ,—তোমাদের মত ইংরেজীনবিশের সঙ্গে আমাদের মত মুখ্যোসুখ্যো লোকের ত আর কথায় এঁটে উঠবার যো নেই,—তা বেশ,—এখন ভাই, যদি আমার একটু কাজ ক'রে দিয়ে যাও, তাহলে বড় উপকার হয়।"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত নৌকা হইতে ডাঙ্গায় নামিলাম। শ্যামলালবাবু আমাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া নিজে অদূরে আর একখানা চেয়ারে গিয়া বসিলেন। তার পর হাতের হুঁকাটী দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া বলিলেন, "দুঃখের কথা আর কি বলব ভায়া,—তেত্রিশ বৎসর চাকরী হল, পয়সা-

কড়ি কিছুই কর্‌তে পারলাম না,—খরচ-পত্র আমার বেজায়! ভাগ্যে ভগবান্ আমাকে কোন পুত্র কন্যা দেন নাই,—সংসারে শুধু আমি আর গৃহিণী,—তাতেই ব্যয়বাহুল্যে আমার প্রাণান্ত! Retire কর্‌তে আর বড়জোর তিনমাস কি সাড়ে তিনমাস বাকী,—একটা extension-এর জন্য সাহেবকে অনেক পীড়াপীড়ি করে-ছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই নরম হলেন না,—আজকাল ত আর সেকালের মত দয়ালু মনিব পাওয়া যায় না,—থাকৃত যদি Boswell সাহেব, তবে, দেখ্‌তে পেতে আমার কত খাতির,—Boswell সাহেবের মত "মা-বাপ" মনিব আর হবে না! এই ত সাম্‌নে পূজা আসছে,—জীবনে কখনও পূজা করা হয় নাই,—কোথায় পাব টাকা-পয়সা? এবার গৃহিণী বড়ই পীড়াপীড়ি করে ধরেছেন, চাকরী ছেড়ে বাড়ী গিয়ে এবার দুর্গোৎসবটা করতে হবেই হবে। মেয়েমানুষে ত বুঝে না, কি কষ্টে একটা পয়সা রোজগার হয়! আমি ভাই, এলাকার চৌকিদার, দফাদার, পঞ্চাইত, প্রধান প্রভৃতি সকলের কাছে চেয়ে-চিন্তে কষ্টেসৃষ্টে কুড়ি ডুই পাঁঠা আর হাজারখানিক নারিকেল যোগাড় করে রেখেছিলাম,—তা আমার ছোট ভাই চুনিলাল এসে সে-সব ফিরিয়ে দিয়ে গেছে! হতভাগা আমার মুখের উপরই বলে কিনা,—'দাদা, কোনদিন ত কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম করলে না,—এবার যদি বৌদিদির তাড়নায় একটা শুভকাজ করবার সঙ্কল্প করেছ, তবে সেটা আর এইভাবে অঙ্গহীন করো না। তোমার যদি সাধ্যে না কুলোয়, তবে পূজা না কর ক্ষতি নেই,—তবু ভিক্ষা করে পূজার পাঁঠা সংগ্রহ কর্‌তে পারবে না! তুমি কর্‌বে পূজা, আর তার ফলভাগী হবে এই সব চৌকিদার দফাদার,—আমি বেঁচে থাক্‌তে তা কোনমতেই হতে পারবে না দাদা!—তোমার পয়সা কার জন্যে আর জমাচ্ছ বল দেখি? বয়স ত আর কম হলো না,—আর কতকাল বাঁচবে? সারা জীবন ত কেবল রোজগারই কর্‌লে,—এখন কিছু-কিছু দেবধর্ম্মের কাজে ব্যয় কর। না-হ'লে পরলোকে গিয়ে কি জবাবদিহি করবে বল দেখি—?' দেখ্‌লে ভায়া, আক্কেলটা দেখলে একবার!—ছোট ভাই হ'য়ে আসে কিনা আমাকে উপদেশ দিতে! আমার বলে কিনা 'কত কাল বাঁচবে?' কেন, আমার আর এমন-কি জেয়াদা বয়স হয়েছে,—আমার বয়সে অনেকে তৃতীয়পক্ষে বিবাহ করেও ত ছেলে মেয়ের বাপ হয়! ভাইটীও আমার তোমাদেরই মত ইংরেজীনবীশ কিনা,—তা বোধ হয় কথার ধরণেই বুঝতে পেরেছ,—আমরা হচ্ছি সেকেলে বাঙ্গলানবীশ, 'মহিমার্ণবেষু'র দল,—কাজেই আমাদের Old fool ব'লে অশ্রদ্ধা করবে বৈ'ক! ও'রা মনে করে, আমার হাতে না-জানি কত টাকাই আছে,—তা পরের ধন আর নিজের পরমায়ু, এ কি আর কেউ কম দেখে! Extension যখন পেলেম না, তখন পেন্সন নিয়ে যাওয়াই স্থির,—কোন মতে চোক-কাণ বুজে এই কয়টা মাস কাটাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু বিধাতা

বোধ হয় আমার সে সাধেও বাদ সাধলেন,—কপাল আমার এম্‌নি পাথর-চাপাই বটে! আমার ছোট দারোগা ছিলেন নরেশবাবু,—তিনি পরাণগঞ্জে বদলী হয়ে গেছেন,—তাঁকে ত তুমি চেনই,—তোমরা দুজনে ত এক বৎসরেই ভাগলপুর থেকে পাশ ক'রে এসেছ,—তিনি ভারী লায়েক,—ইংরেজীতে বি, এ, ফেল, সর্ব্বদাই মুখে লেড্ মেড্ বুলি,—আমাদের ত তৃণ বলেও গণ্য করেন না। তিনি এর মধ্যে একদিন যেন কার কাছে খবর পেয়েছিলেন, নাথের আবাদের শ্যামভদ্র নাকি চোরাই মাল রাখে। শুনেই আর যাবি কোথায়!—আমার কাণে সে কথা এলে পাছে বাহাদুরীটা আমিই নিই,—এই ভেবে তিনি আমার কাছে সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করেই অন্য কাজের উপলক্ষ্য করে থানা থেকে দুজন কনেষ্টবল নিয়ে নাথের আবাদে চলে গেলেন। পথে জন দুই তিন দফাদার চৌকীদারকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন, শুন্‌লাম। ভোরবেলায় শ্যামভদ্রের বাড়ী ঘেরাও করে তিনি খানাতল্লাসী করতে উদ্যত হলে শ্যামের নিদ্রাভঙ্গ হয়,—সে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করেও নরেশবাবুর মন ভিজাতে না পেরে অবশেষে রেগে একবারে "মরিয়া" হয়ে উঠে! তারপর নরেশবাবু যখন আবার শ্যামের অন্দরমহলে ঢুকতে গেলেন, শ্যাম তখন তার ছেলে, জামাই আর চাকরবাকরের সাহায্যে তাঁকে বেশ করে চেপে ধ'রে একবারে আষ্টেপৃষ্টে এঁটে বেঁধে ফেল্‌লে! তারপর যা আর দফাদার চৌকীদারেরা সেনাপতির বিপরীত দশা দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে একবারে উর্দ্ধশ্বাসে থানায় এসে উপস্থিত! আমি এই খবর পেয়ে বিনোদকে নরেশবাবুর উদ্ধারের জন্য পাঠাব বলে মনে মনে ভাবছি,—(আমার নিজের শরীরটা সেদিন বড়ই অসুস্থ ছিল কিনা!—) এমন সময় দেখ্‌লাম, নরেশবাবু হাড়গোড়ভাঙ্গা "দ,"-এর মত খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার দিকেই আসচেন! তিনি এসেই আমার উপর ত নানাপ্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করলেন, যেন তাঁর ধনঞ্জয়-প্রাপ্তির জন্য আমিই অপরাধী,—আমিই নাকি এতকাল শ্যামভদ্রকে আইনের মুখ থেকে বাঁচিয়ে আসছি,—আমি নাকি মাসে মাসে শ্যামের কাছে মাসহরা খাই,—এবার পুলিশ-সাহেবের কাছে তিনি সবই প্রকাশ করে দেবেন,—এইরূপ অনর্গল কত কথাই যে তিনি বলতে লাগলেন, তার আর ইয়ত্তা নাই। বুঝ্‌লাম, অতিরিক্ত গাত্র-জ্বালাতেই নরেশ বাবু ঐ সব আবোল-তাবোল বক্‌ছেন, তখন উত্তর দিতে গেলে হয়ত একটা লজ্জাকাণ্ড কাণ্ড হ'য়ে যাবে, কাজেই আমি আর কোন উচ্চবাচ্য করলাম না। কিছুক্ষণ পরে তিনি একটু সুস্থির হলে, আমি তাঁকে এই ব্যাপার নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করলাম, কারণ শ্যামের বাড়ী খানাতল্লাসী করবার জন্য তিনি কোন ওয়ারেণ্টও পান নাই, গুরুতর সন্দেহের কোন কারণও তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না। তার চেয়ে শ্যামকে তলব

পায়ে ধরে ক্ষমা চায়, আর কিছু নজর-সেলামীও দেয়, সেই ব্যবস্থা করতে চাইলাম। কিন্তু নরেশবাবু আমার কথা একেবারেই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি সোজাসুজি পুলিশ-সাহেবের কাছে এক রিপোর্ট দিয়ে শ্যামের বিরুদ্ধে ৩৫৩ ধারা-মত (সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে মারপিট করা) মোকদ্দমা রুজু কর্‌বার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ওদিকে শ্যামও নরেশবাবুর নামে বেআইনী জনতা, অনধিকার প্রবেশ, মানহানি প্রভৃতি নানাবিধ চার্জ্জ দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত দাখিল কর্‌ল। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব পুলিশের কাগজপত্র তলব করলে পুলিশ-সাহেব নরেশবাবুর রিপোর্টটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব কোন পক্ষেরই মোকদ্দমা গ্রহণ না করে প্রথমে আমার উপর তদন্তের ভার দিয়েছেন। আমার ভাই, এখন উভয় সমস্যা,—"না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ!" সত্যকথা বল্‌তে গেলে নরেশবাবু মারা যান, অথচ বুড়া-বয়সে (?) মিথ্যা রিপোর্টই বা কেমন করে দি? অনেক ভেবে চিন্তে আমি "সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে" গোছের একটা রিপোর্ট বাঙ্গলায় লিখে রেখেচি। তুমি যদি দয়া করে সেইটা ইংরাজী করে দেও, তবে বড় ভাল হয়। ব্রেক্‌ সাহেব বাঙ্গলা ভাল জানেন না, আমারও ত ইংরাজী বিদ্যা "Who is you" পর্য্যন্ত! শুন্‌লে বরং কোনরকমে দুই এক কথা বুঝতে পারি, কিন্তু লিখ্‌তে গেলে ইংরেজী বিদ্যায় আদোপেই কুলিয়ে উঠে না। তুমি যদি দয়া ক'রে রিপোর্টটারে ইংরেজী তর্জমা করে, তারপর সেটা পরিষ্কার ক'রে নকল ক'রে দেও, তবে আমি নিচে নিজের নামটা কোনমতে ইংরেজীতে সই ক'রে সাহেবের কাছে পাঠাতে পারি। ছেলেমানুষ তোমরা, এই ত খাটবার বয়স,—তোমাকে আমি চিরদিনই ছোট ভাইএর মত দেখি, তাই এইটুকু কষ্ট করতে অনুরোধ কর্‌লাম, আর কেউ হ'লে এ ভরসা হ'ত না।"

শ্যামলালবাবুর উপরোধ রক্ষা করতে আমার অন্তরে ইচ্ছার লেশমাত্রও ছিল না, সেজন্য বলিলাম, "ইংরেজীতে আমার দখল খুব কম,—আর আমার হাতের লেখাও অতি জঘন্য,—আমার মতে ইংরেজী না করে রিপোর্টটী বাঙ্গলাতেই দেওয়া ভাল"।—কিন্তু এই "রোজা-মরা ভূতকে" ভোগা দিয়ে ভুলান সহজ নহে,—তাঁহাকে নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে সম্মত হইতে হইল।

অনেকদিনের কথা,—সেই অদ্ভুত রিপোর্টের সব কথা এখন আর আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না,—কিন্তু মুখবন্ধটুকু তার এমন মধুর ছিল যে, একবার পাঠ করিয়াই তাহা আমার হৃদয়ে একেবারে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। মুখবন্ধটুকু এইঃ—

"মহিমার্ণবেষু:—

দারোগাবাবু ইংলিশমেণ্ট, নূতন ধনী শ্যামভদ্র, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল, অধীন তাবেদার সজেমীনে গিয়া

আদেশ অনুযায়ী দারোগাবাবুর অঙ্গসেবার বিবরণ নিম্নে নিবেদন পাইতেছিঃ—”

সৌভাগ্যবশতঃ আমাকে এই মধুর ভাব এবং ভাষাসংবলিত রিপোর্টটীর অনুবাদের কষ্টস্বীকার করিতে হইল না। রিপোর্টখানা আগাগোড়া পাঠ শেষ হইতে না হইতেই কেদারবাবু আসিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন।

তিনি বলিলেন, “আর বিলম্ব করবেন না, এইবার চলুন তারাপুর যাত্রা করি,—সাহেব যে কখন আসবেন, তার কোন স্থিরতা নাই। আমাদের একটু আগে যাওয়াই ভাল।”

আমি বিপদ্-সমুদ্রে কূল পাইয়া দ্বিরুক্তি-মাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলাম। শ্যামলালবাবু তখনও তাঁহার রিপোর্টের তরজমার জন্য অনুরোধ করিতে থাকায় আমি বলিলাম, “দেখুন, অমন পাকা রিপোর্টের ইংরেজী করা আমার সাধ্যের অতীত,—ইংরেজী অনুবাদ করতে গেলে অমন সুন্দর রিপোর্টটী একেবারে মাটি হয়ে যাবে,—তার চেয়ে কাল আপনি তারাপুরে রিপোর্টটী সঙ্গে নিয়ে যাবেন, সেইখানে ওটি সাহেবের নিকট পেশ করলেই হবে’খন।”

শ্যামলালবাবু তাঁহার রিপোর্টের প্রশংসা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—সেজন্য আমার প্রস্তাবে আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। আমাদিগকে বিদায় দিবার সময় শ্যামলালবাবু বলিয়া দিলেন, “তোমরা যাও, বিনুকে আমি আজই তারাপুরে পাঠাচ্ছি,—আমিও কাল “পারণ” করে যত শীঘ্র পারি, ওখানে গিয়ে হাজির হব। যদি সাহেব-বাহাদুর আগেই এসে পড়েন, তবে দয়া করে বলো, যে আমার অসুখ হয়েছে।”

ডেকলতলা হইতে তারাপুর অনুমান দশ মাইল ব্যবধান। উহা মুসলমান-প্রধান গ্রাম; দুই তিন ঘর হিন্দু আছে বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা অতি হীন। এই গ্রামে ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের একটী ক্ষুদ্র বিশ্রামাগার আছে, সেইখানেই সকালে কাছারী হইবে। গ্রামে এই বাড়ীটি “ডাক-বাঙ্গলা” নামে খ্যাত, আমরাও সেই নামেই ইহার উল্লেখ করিব। গ্রামে হাটবাজার দূরে থাকুক, একটা মুদীর দোকান পর্য্যন্ত নাই। তারাপুর আসিতে আমাদের রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। মধ্যাহ্নে সেই যে মোটা আটার কয়েকখানা লুচি খাওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তৃপ্তি না হইলেও উদরে অস্থিরতাটা চলিতেছিল যথেষ্ট, সেইজন্য নৈশ ভোজনে আর তেমন রুচি হইতে ছিলনা,—আর রুচি হইলেও এখানে সে সাধ পূর্ণ হইবার কোন উপায় বা সম্ভাবনা ছিল না। পূর্ব্ব-রাত্রিতে স্থানাভাববশতঃ নৌকায় নিদ্রার বড় ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল, আজ সেজন্য কেদারবাবুকে নৌকায় রাখিয়া আমি নিজের বিছানাপত্র ও মোটমাট সঙ্গে লইয়া “ডাকবাঙ্গলায়” আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভালকরিয়া একবার পাঠ করিবার জন্য মোকদ্দমার নথিটীও কেদার বাবুর নিকট হইতে চাহিয়া লইলাম। আমি যখন নৌকা হইতে নামিয়া আসি, তখন ভাটার প্রায় শেষ অবস্থা, নৌকাখানা তাই একেবারে খালের তলায় গিয়া পড়িয়া ছিল।

আমি একটা আমগাছের গুঁড়ির নিকট নৌকার গলুইটী লাগাইয়া কোনমতে জুতা বাঁচাইয়া ডাঙ্গায় নামিলাম। মাল্লারা সেই গাছের শিকড়ের সঙ্গেই নৌকা বাঁধিয়া নৈশভোজনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। রামদীন কনেষ্টবলও আমার সঙ্গে ডাঙ্গায় আসিয়া "ডাকবাঙ্গলার" মেজেতে "কম্‌লী" পাতিয়া শয়ন করিল।

তখন অনেক রাত্রি, আমি গভীর নিদ্রায় অচেতন,—এমন সময় মনে হইল, কে-যেন বাহির হইতে ডাকিতেছে, "দারোগাবাবু, ও দারোগাবাবু, শীঘ্র উঠুন, আমরা প্রাণে মারা গেলুম।"

ঘুম আমার ভাঙ্গিয়াও যেন ভাঙ্গিতে ছিলনা। বাহিরের ডাকাডাকি আমার কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে রামদীনের ঠেলাঠেলিতে ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল,—আমি ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম। বালিশের নীচে ভাগ্যে একটা দিয়াশলাই ও একটী মোমবাতি রাখিয়া ছিলাম, তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দেখি, কেদারবাবু ভিজা গায় ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন। 'ব্যাপার কি' জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি এখনও বুঝতে পারছেন না?—নৌকা ডুবে গেছে!"

কি করিয়া নৌকা ডুবিল জানিতে চাহিলে পিছনদিক হইতে করিমবক্স মাঝি উত্তর করিল, "বাবু, আপনি যখন নেমে আসেন, নৌকাখানা তখন আমরা আম গাছের শিকড়ের সঙ্গেই বেঁধে রেখেছিলাম। আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে আমি পীরমামুদকে বল্‌লাম, 'পীরমামুদ, একটা পাড়া পুঁতে নৌকাখানা তার সঙ্গে বেঁধে রাখ, কারণ গাছের যে শিকড়টায় নৌকা বাঁধা আছে, সেটা প্রায় খালের তলায়, জোয়ারের সময় ওখানে নৌকা বাঁধা থাক্‌লে নৌকার গলুই ভাস্‌তে পারবে না।' পীর মামুদ আমার কথামত একটা পাড়া পুঁতে নৌকাখানা সেই পাড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখলে—কিন্তু বুদ্ধি করে নৌকার গলুইটাও সেই সঙ্গে শিকড়ের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে নি। জোয়ারের সময় জলের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা যখন উঁচু হচ্ছিল, তখন গলুইটা কোনরকমে আমগাছের শিকড়ের নীচে আটকে গিয়েছিল। আমরা সারাদিন খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়াতে এ-সব কাণ্ড কিছুই টের পাই নি। হঠাৎ গায়ে জলের ঝাপটা লাগাতে হুড়মুড় করে যেমন উঠ্‌তে যাব, অমনি নৌকাখানা জলের মধ্যে তলিয়ে গেল! গলুইটা তখনও গাছের শিকড়ে আট্‌কে থাকাতে ব্যাপার বুঝতে বিলম্ব হল না। তাড়াতাড়িতে আমরা নৌকার কোন জিনিসই বাহির করতে পারি নি, কেবল পেস্কার-বাবুকে কোনমতে ছাপ্পড়ের নীচে থেকে টেনে হিচ্‌ড়ে বাইরে আন্‌তে পেরেছি। তাঁর বিছানা-বালিশ, আমাদের কাঁথা কাপড় হাঁড়ী-কুঁড়ি সব ডুবে গেছে হুজুর, সব ডুবে গেছে!"

আমার গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগে শুক্‌নো কাপড় ছিল, কেদারবাবুকে তাহারই এক-খানা বাহির করিয়া দিলাম, তিনি সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আমার শয্যাসহচর হইলেন। এত দুঃখের মধ্যেও 'নথিটী রক্ষা

পাইয়াছে' বলিয়া কেদারবাবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মাঝিদের সাহায্যের জন্য রামদীনের সঙ্গে গ্রামের চৌকীদার এবং ডাক-বাঙ্গলার পাহারাওয়ালাকে পাঠাইয়া দিলাম। ভাটার সময় জল সেঁচিয়া উহারা নৌকাখানা উদ্ধার করিলে দেখা গেল, জিনিসপত্র বেশী কিছু ভাসিয়া যায় নাই,—কেবল ভিজিয়া গিয়াছে মাত্র। আমার বড় সাধের দাবাবোড়েগুলি ছাপ্পড়ের মধ্যেই পাওয়া গেল, তবে পেষ্টবোর্ডখানা একেবারে গলিয়া যাওয়াতে উহাকে খালের জলে বিসর্জ্জন দিতে হইল। কেদারবাবুর তোষক ও বিছানার চাদরখানা নিকটেই একটা ঝোপের মাথায় পাওয়া গেল,—কিন্তু তাঁহার মাথার সামলা এবং শিয়রের বালিশটির কোনই সন্ধান হইল না। মাঝিরা পরের দিন সকালে "পান্তা" খাইবে বলিয়া "সুঁটকি" মাছের ঝোল রাঁধিয়া রাখিয়াছিল, নোনা জলে সে ঝোলের আর চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই,—হাঁড়ীর তলায় কেবল মাছকয়খানা কাদামাখা অবস্থায় পাওয়া গেল। সোনাউল্লা কাতর দৃষ্টিতে মাছ কয়খানা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল, তারপর "নসীবে না থাক্‌লে ভোগে আস্‌বে কেন!" —বলিয়া মাছকয়খানা খালের জলে ফেলিয়া দিয়া হাঁড়িটি ধুইয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখিল।

তাড়াতাড়ি সকল জিনিস ডাঙ্গায় তুলিয়া শুকাইতে দেওয়া হইল,—কারণ, আর কিছু না হোক্, চোগা চাপকান না শুকাইলে ত কেদারবাবুর এজলাসে যাওয়াই হইয়া উঠিবে না।

বেলা সাড়ে-নয়টার মধ্যে সকল সাক্ষীকে ডাকাইয়া ডাকবাঙ্গলায় জমা করা হইল, এবং যাহাতে তাহাদের কেহ উঠিয়া না যায় সেজন্য রামদীন কনেষ্টবল, এবং দুইজন চৌকিদারকে সেখানে মোতায়েন রাখা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিনোদ জমাদার বা শ্যামলালবাবু দারোগার তখনও কোন খোঁজ-খবর নাই! থানা হইতে একটী কনেষ্টবল পর্য্যন্ত তারাপুরে পদার্পণ করে নাই! একেই বলে "যার বিয়ে তার মনে নেই"।

গতকল্য আমাদের একপ্রকার অনাহারেই কাটিয়া গিয়াছে, আজও কাহাকেও খাওয়া-দাওয়ার কোন যোগাড়-যন্ত্র করিতে দেখিলাম না! এখানে কোন দোকান-পাট না থাকাতে কিছু কেনাও গেল না। নৌকায় মাঝিমাল্লারা একে একে গ্রামের মধ্যে স্বজাতির বাড়ীতে গিয়া যাচিয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়া আসিল,—রামদীনও চৌকিদার পাঠাইয়া গোটা-দুই ডাব-নারিকেল আনাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিল,—আমি আর কেদারবাবুই কেবল খালি পেটে বোকা বনিয়া মুখ চুণ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বেলা এগারটার পর শ্যামলালবাবু সশরীরে দর্শন দিলেন, এবং "পারণ" করিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হঠাৎ একটা অপঘাত-মৃত্যুর সংবাদ পাওয়াতে তিনি নাকি বিনোদ-জমাদারকে কালই অন্যত্র পাঠাইয়াছেন। স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত শ্যামলালবাবু আমাদের খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়াছে কিনা

জানিতে চাহিলে আমি কোন কথা বলিলাম না, কিন্তু কেদারবাবু গাত্রজ্বালা নিবারণ করিতে না পারিয়া শ্যামলালবাবুকে কড়া-মিঠা বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন। অন্যলোক হইলে বোধহয় লজ্জায় অধোমুখ হইত—কিন্তু শ্যামলালবাবুর সে সব বালাই নাই, তাঁহার কোনই ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি গ্রামের চৌকিদার দফাদার পঞ্চাইত প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া তাহারা আমাদের আহারের কোন বন্দোবস্ত করে নাই কেন বলিয়া, খুব একচোট গালাগালি করিয়া লইলেন, এবং তখনই যেখান থেকে পারে, চাল ডাল, মাছ দুধ, তেল নুন, মশলা তরকারী সব যোগাড় করিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। হুকুমপ্রাপ্তিমাত্র শ্যামলালবাবুর সঙ্গী থানার দুইজন কনেষ্টবল, চৌকিদার দফাদারকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের মধ্যে ছুটিয়া গেল, এবং একঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র আনিয়া শ্যামলালবাবুর নৌকায় তুলিয়া দিল।

শ্যামলালবাবু রন্ধনের ব্যবস্থা করাইবেন,—এমন সময় একদিক দিয়া ব্রেক্ সাহেব ঘোড়ায়, আর একদিক দিয়া আসামীদের মোক্তার নাজিরালী মিঞা পাল্কীতে চড়িয়া "ডাকবাঙ্গলায়" শুভাগমন করিলেন। ধড়া-চুড়া আমার আগেই পরা ছিল,—কাজেই সাহেব আসিবামাত্র সসম্ভ্রমে একটা সেলাম দিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম,—কেদারবাবু ও শ্যামলালবাবু হাঁশফাঁশ করিতে করিতে দৌড়িয়া পোষাক পরিতে গেলেন। সাহেব ঘোড়া হইতে নামিয়াই, "বিলাসপুর সাঁকোমে বিচালি কাঁহে নেহি দিয়া,—হামারা ঘোড়াকা গোড় মাট্টিমে বৈঠ্ গিয়া থা"—বলিয়া শ্যামলালবাবুকে বড়ই জোরতলব করিলেন। শ্যামলালবাবু তখন ধুতি খুলিয়া সবে পেণ্টুলানটি পরিয়াছেন, তখনও বোতাম আঁটা হয় নাই,—সাহেবের ডাকাডাকিতে তিনি কোনমতে কোটটী গায় এবং টুপিটি মাথায় দিয়া পেণ্টুলানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে দৌড়াইয়া আসিলেন। সাহেবের মূর্ত্তি দেখিয়া শ্যামলাল বাবুর যেন মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না,—বার দুই তিন কেবল "Yes sir," "No sir," "হুজুর মা-বাপ" বলিয়া বলিদানের পাঁটার মত থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ব্রেক্ সাহেব ছোকরা সিভিলিয়ান হইলেও লোক নেহাৎ খারাপ ছিলেন না,—তিনি সাধারণের সম্মুখে শ্যামলালবাবুকে আর কিছু না বলিয়া, আমার দিকে চাহিয়া তখনই সেই সাঁকোর দুইধারে বিচালি পাতিবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন,—যেন ফিরিবার সময় ঘোড়ার আর কোন কষ্ট না হয়। শ্যামলালবাবুর নিকট শুনিলাম, বর্ষার জলে বিলাসপুরের কাঠের পুলের দুইপার্শ্বের কাঁচা-মাটী সব ধুইয়া যাওয়াতে সাহেব-বাহাদুর আগেই সেখানে মাটী ও বিচালি বিছাইয়া দিতে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন,—শ্যামলালবাবু স্বয়ং সেখানে না গিয়া একজন কনেষ্টবলকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সেই কনেষ্টবল যে কি দিয়া কি করিয়াছে,

সে বিষয়ে আর তিনি কোন সন্ধান করেন নাই। যাহা হউক, আমি তখনই একজন দফাদার, চারিজন চৌকিদার এবং থানার একজন কনেষ্টবলকে বিলাসপুর সাঁকোয় পাঠাইয়া দিলাম, এবং অবিলম্বে সমুদায় মেরামত করিয়া, সাহেব ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলাম। উহারা গ্রাম হইতে দুই-তিনখানা কোদাল এবং প্রত্যেকে এক এক বোঝা বিচালি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল। সাহেবের সহিস তখনও আসিয়া উপস্থিত না হওয়াতে একজন চৌকিদার সাহেবের ঘোড়াটী এদিক ও'দিক টহলাইতে লাগিল।

আমি কেদারবাবুর বিপদের কথা সাহেবকে বলিবামাত্র তিনি হোহো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বটে, তাই নাকি? আমি বড় দুঃখিত হলাম বাবু! আচ্ছা, পেস্কার-বাবুকে সামলা না পরেই আস্‌তে বলুন,—সামলার সঙ্গে বাবু যে তাঁর মাথাটিও খোয়াননি,—এইটুকুই সৌভাগ্যের বিষয়!"

সাহেব ডাকবাঙ্গলার হলঘরে সবে গিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় তিনটী নব্য ছোকরাবাবু কোথা হইতে আসিয়া দুয়ারে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে সুরু করিলেন। চাপরাশী তখনও আসিয়া পৌছায় নাই, কাজেই সাহেবের স্বচ্ছন্দতার জন্য কেদারবাবু এবং আমিই দায়ী। আমরা বাবু-কয়টীকে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেও তাঁহারা সে কথা আমোলেই আনিলেন না। শুনিলাম, ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একজন তালুক-দারের ভাগিনেয়, শ্যালক ও পোষ্যপুত্র। অল্পসময়ের মধ্যেই ব্রেক্‌ সাহেবের দৃষ্টি এই বাবু-তিনটীর উপর পড়িল। একে সাহেব পিপুলবাড়ী ষ্টেশন হইতে ঘোড়ায় প্রায় ১২।১৩ মাইল কাঁচা রাস্তা কাদামাটী ভাঙ্গিয়া আসিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন,—তাহাতে আবার সাঁকোর নিকট ঘোড়ার পা আট্‌কাইয়া যাওয়াতে তাঁহার মেজাজটাও তত প্রসন্ন ছিল না,—কাজেই ছোকরা-বাবু কয়টীর এইরূপ উঁকিঝুঁকি মারা তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবু, এই ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করুন, এঁরা এখানে কি চান?"

আমি বাবু-কয়টীকে তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা সাহেবকে দেখিতে আসিয়াছি।"

ব্রেক্‌-সাহেব বাঙ্গলা ভাল না জানিলেও মোটামোটি একরকম বুঝিতে পারিতেন,—অন্ততঃ "দেখিতে আসিয়াছি" এই কথাটা বোধহয় ভালই বুঝিয়াছিলেন,—কারণ বাবুদের মুখের কথা শেষ না হইতেই তিনি চাবুক হাতে লাফাইয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! ওরা আমাকে দেখ্‌তে এসেছে? আমি কি সং? এখনি ওদের দূর করে দাও!"

সাহেবের মূর্ত্তিদর্শনেই বোধহয় বাবু-কয়টীর দর্শন-পিপাসা শীতল হইয়া গিয়াছিল,—কারণ তাঁহারা সেখানে আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব না করিয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ পদক্ষেপে দৃষ্টি-পথের অগোচর হইয়া পড়িলেন!

বেলা একটার সময় সাহেব মোকদ্দমা

আরম্ভ করিলেন। তখন চাপরাশীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই "হানিফগাজী আসামী হাজির হ্যায়,—হানিফগাজী আ—সা—ম! নেছারদ্দি মোল্লা আসামী হাজির হ্যায়,—নেছারদ্দি মোল্লা আ—সা—ম!"—ইত্যাদি ডাকে-হাঁকে ডাক-বাঙ্গলা একবারে সরগরম হইয়া উঠিল। একটা গাছতলায় কয়েকটা নেংটিপরা বালক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, চাপরাশীর শ্মশ্রুবহুল মুখমণ্ডল এবং মেঘমন্দ্রবৎ কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহারা আর তথায় অপেক্ষা করিতে সাহস না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রামের ভিতরে অদৃশ্য হইল।

নাজিরালী মোক্তার আ-ভূমি নত হইয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া আসামীগণের পক্ষ-সমর্থনে দণ্ডায়মান হইলেন। মোক্তার সাহেবের মূর্ত্তিটী তেমন মনোরম ছিল না। মোক্তারীতে তাঁহার পশার প্রতিপত্তিও তেমন বেশী নয়। তবে সে-সময়ে সদরে আর কোন মুসলমান মোক্তার না থাকায় স্বজাতি-মহলে তাঁহার কিছু কিছু মক্কেল জুটিয়া যাইত, এবং তাহাতেই কোনমতে তাঁহার দিন-গুজরাণ হইত। মোক্তার-সাহেবের বাড়ী এই তারাপুরেরই সন্নিকটে; শুনিলাম, একজন আসামী নাকি তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়,—এবং সেইজন্যই এই মোকদ্দমায় তাঁহার শুভাগমন হইয়াছে। ১৮৯১ সালের সেন্সাসের সময় নাজিরালী মিঞা বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য সহরে গিয়াছিলেন। পরীক্ষার পর সেন্সাসের ডেপুটী কামিনীবাবুর পেস্কার আতাউল রহমান মিঞাকে ধরিয়া সেন্সাস-আপিসে তিনি একটী চাকুরী লাভ করেন। মাসিক বেতন ছিল বারো টাকা, আহারের ভারটা আতাউল রহমান সাহেবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চাকুরী উপলক্ষে কাছারীতে ঘুরিবার সময় নাজিরালী মিঞার মনে মোক্তারী পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প উদিত হয়। সে সময় বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিলেই মোক্তারী পরীক্ষা দেওয়া যাইত। আতাউল রহমান সাহেব দয়া করিয়া এর-তার কাছে চাহিয়া-চিন্তিয়া মোক্তারীর পাঠ্য বহি-কয়খানা সংগ্রহ করিয়া দেন। নাজিরালি মিঞা তাহা বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে থাকেন। দুই মাসের পর ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল নাজিরালী মিঞা তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছেন। খোদার দয়ায় মোক্তারী পরীক্ষাতেও তিনি একবারেই উত্তীর্ণ হইলেন, এবং সনন্দ পাইবামাত্র সদরে আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ইংরেজীতে তাঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল না,—তবে শুনিয়া শুনিয়া "yes sir," "no sir," "very good sir," "poor man sir," প্রভৃতি গোটাকতক বাঁধা গৎ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যেখানে-সেখানে সেই কয়টা কথার তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন। সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় নাজিরালী-সাহেব সর্ব্বদাই অতি বিশুদ্ধ ভাষায় কথা কহিতেন। একবার ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারাপদবাবুর এজলাসে একটী হাঙ্গামা মোকদ্দমায় ইয়ারমামুদ নামক জনৈক আসামীর পক্ষসমর্থনের জন্য নাজিরালী মিঞা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী ভজহরি গোয়ালাকে জেরা করিবার সময় নাজিরালী

মিঞা বলিলেন, "দেখ ভজহরি, এই বিচারপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মাধিকরণ, এখানে প্রবঞ্চনা করিলে নিরয়গামী হইতে হইবে,—তুমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া সত্য কথা বলিতে শপথ গ্রহণ করিয়াছ,—সে কথা যেন বিস্মৃত হইও না,—একবার বিচারপতির দিকে চাহিয়া বল দেখি, এই আসামী ইয়ারমামুদ একজন "প্রতিভাশালী" লোক কি না? অধিক কথা বলিয়া আদালতের মহামূল্য সময় নষ্ট করিও না,—এককথায় বল, "হাঁ," কি "না"—।" ভজহরি ত অবাক্,—মোক্তারবাবুর এই সাধু ভাষার বিন্দুবিসর্গও তাহার মাথায় ঢুকিয়াছিল কি না সন্দেহ,—কাজেই সে হতভম্ব হইয়া চারিদিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে চাহিয়া দেখিতে এবং ঘন ঘন মাথা চুলকাইতে সুরু করিল। নাজিরালী মিঞা সোৎসাহে সাক্ষীর এইরূপ বিব্রতভাব হাকিমকে নথিতে নোট করিয়া লইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। মোক্তার-সাহেবের বিদ্যা-বুদ্ধি তারাপদবাবুর অবিদিত ছিল না,—কাজেই তিনি বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"আপনার প্রশ্নটা কি মোক্তার-সাহেব?"

নাজিরালী মিঞা বলিলেন, "হুজুর, আমার প্রশ্নটা অতি সহজ, আমি সাক্ষীর নিকট জানিতে ইচ্ছা করি, আমার এই মক্কেল ইয়ারমামুদ একজন "প্রতিভাশালী" লোক কি না?"

মজা দেখিবার সময় তারাপদবাবুর একটু চিবাইয়া চিবাইয়া কথাবলা অভ্যাস ছিল,

ছিল,—সম্মুখে চাহিয়া কথা বলিলে তাঁহার কণ্ঠ হইতে সহজ সুরেই কথা বাহির হইত,—কিন্তু বাম বা দক্ষিণ দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া কোন কথা বলিতে গেলেই তাঁহার গলার সুর বেহালার মত অত্যন্ত সরু হইয়া যাইত!—তিনি ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া সরু গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্র—তি—ভা—শা—লী—কা—কে—বলে—মো—ক্তা—র—সা—হে—ব?"

নাজিরালী মিঞা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "প্রতিভাশালী" মানে এই হচ্ছে হুজুর, যে, ইয়ারমামুদের জমী, জমা, টাকা, পয়সা যথেষ্ট আছে কিনা—?"

হাকিম আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—সঙ্গেসঙ্গে এজলাসে উপস্থিত উকীল মোক্তার, আমলা মক্কেল, এমনকি সাক্ষী ভজহরি পর্য্যন্ত সকলেই হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। সেই দিন হইতে নাজিরালী-সাহেব সকলের নিকট ঘোরতর "প্রতিভাশালী" মোক্তার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল,—সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিয়া একবাক্যে আসামীগণকে চোর, বদমায়েস ও দাগী বলিয়া প্রমাণিত করিয়া গেল। "প্রতিভাশালী" মোক্তারের সমুজ্জ্বল প্রতিভাপূর্ণ কূটপ্রশ্নেও কোন সাক্ষী টলিল না,—হেলিল না,—কাহারও মুখ হইতে আসামীগণের সাপক্ষে একটিও কথা বাহির হইল না। গতিক ভাল নহে দেখিয়া মোক্তার সাহেব জেরার পরিমাণ

করিলেন,—কারণ, মহীলতার অন্বেষণ করিতে করিতে প্রায়ই অহি নিক্রান্ত হইয়া পড়িতে-ছিল,—অনেক কথা, যাহা আমাদ্বারা বাহির হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, মোক্তার সাহেবের জেরার মুখে সাক্ষীরা সে-সব কথাও বলিয়া ফেলিতেছিল। জেরা দীর্ঘ না হওয়াতে জবানবন্দীর পরিমাণ অত্যন্ত হ্রস্ব হইয়া গেল, কাজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিশ-পক্ষের সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী সমাপ্ত হইল।

এইবার "সাফাই" সাক্ষীর পালা। প্রেক্ সাহেবের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আরও দুই-একবার মফস্বলে আসিয়া আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, Leading question জিজ্ঞাসা করিলে সাহেবের বড় ক্রোধ জন্মে। কোনমতে বিপক্ষের দুই-একটা প্রশ্ন leading বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলেই সেদিনের মত নিশ্চিন্ত!

নাজিরালী মিঞা তাঁহার সাক্ষী-দিগকে, "কেমন হে বাপু, হানিফের তিন লাঙ্গলের জমী আছে কি না?—নেছারদ্দি বৎসরে ২৫।৩০ মণ গুড় বিক্রয় করে কি না?"—এমনি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র আমি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলাম, "হুজুর, আমি মোক্তার-সাহেবের এই সব Leading question-এর দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"

আর যায় কোথা!—সাহেব তো চটিয়া অস্থির! সিংহের ন্যায় বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া প্রেক্ সাহেব মোক্তারকে ডাকিয়া বলিলেন, "চুপ—চুপ! এরকম করে তুমি প্রশ্ন করতে পাবে না! তুমি যদি আইনমত জেরা করতে না পার, তাহলে চুপচাপ বসে পড়!"

মোক্তার-সাহেব অমনি "হুজুর, হুজুর, poor man, poor man—" বলিয়া হাত কচ্‌লাইতে আরম্ভ করিলেন!

কিন্তু কে কার কথা শুনে,—সাহেব আর মোক্তারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না দিয়া, নিজেই সাফাই সাক্ষীগণকে তাঁহার অদ্ভুত হিন্দী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী মিশ্রিত ভাষায় দুইচারি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া একে একে বিদায় দিতে লাগিলেন। আমার আর জেরা করিবারও আবশ্যক হইল না। মোক্তার-সাহেবের জড়সড় ভাব দেখিয়া আসামী এবং সাফাই সাক্ষীদের কেহই কোন উচ্চবাচ্য করিতে সাহস পাইল না। উহারা মনে করিল মোক্তার-সাহেব না জানি কি একটা বেফাঁশ কথা বলিয়া সাহেবকে চটাইয়া দিয়াছেন।

মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া মোক্তার-সাহেব বেশী সাফাই সাক্ষী উপস্থিত করিতে সাহসী না হইয়া বলিলেন,—"হুজুর, আমরা আর সাক্ষী ডেকে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না,—আমার মক্কেলগণ যে নির্দ্দোষ, তা বোধ হয় হুজুর ভালরূপেই বুঝ্‌তে পেরেছেন,—এখন আমার প্রার্থনা এই যে, ধর্ম্মাবতার দয়া করে একবার আসামীদের ঘর-বাড়ীর অবস্থা দেখ্‌তে আজ্ঞা হয়। ওদের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, আর বাগান-ভরা গাছপালা দেখ্‌লেই হুজুর বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, কোন্ দুঃখে,—কোন্ অভাবে ওরা চুরি কর্‌তে যাবে?"

Bad livelihood মোকদ্দমার আসামী

যদি হাকিমকে নিজ বাড়ী-ঘর দেখিতে অনুরোধ করে, তবে সে প্রার্থনা নামঞ্জুর করিবার নিয়ম নাই,—কাজেই প্রেক সাহেবকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মোক্তারের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল।

সাহেব কাছারী ভাঙ্গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে টিফিন্ খাইতে প্রবেশ করিলেন, এবং আর্দ্দালীকে অবিলম্বে ঘোড়া প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। ইংরেজ জাতি জলে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, রণক্ষেত্রে যেখানেই থাকুনা কেন, শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও পেটটা কখনও খালি রাখে না। তাই জল-কাদা ভাঙ্গিয়াও একজন খানসামা সাহেবের জন্য প্রচুর ফল, মূল, রুটী, মাখন, ডিম্ব, মাংস, সোডা, হুইস্কি প্রভৃতি লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সাহেব তৃপ্তির সহিত সেই সব দ্রব্যের সৎকার আরম্ভ করিলেন, আর বাহিরে আমি ও কেদার বাবু—হীন, অধম বাঙ্গালী,—দুইদিনের উপবাসী,—পেটের জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছিলাম!

প্রায় কুড়ি মিনিট পর সাহেব জলযোগ শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন,—কিন্তু তখনও আর্দ্দালির দেখা নাই। সাহেবের ঘোড়া প্রস্তুত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য আমি ডাকবাঙ্গলার পিছনদিকে একজন চৌকিদারকে পাঠাইয়া দিলাম, সে ব্যক্তিও আর ফিরিয়া আসে না দেখিয়া শেষকালে একপা-দুইপা করিয়া আমি নিজেই সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, ইহজীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। দেখিলাম, সাহেবের আর্দ্দালি ঘোড়াটীর গলার দড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর একপার্শ্ব হইতে একজন লোক, (তাহাকে "শালপ্রাংশু" বলিলেও "মহাভুজ" বলা যায় না,—কারণ তাহার গায়ে চামড়া ও হাড় ভিন্ন মাংস নামক পদার্থটার বড়ই অসদ্ভাব ছিল)—মাছ ধরিবার জন্য "খেপ্‌লা" জাল যে-ভাবে ছুঁড়িয়া মারে, সেই ভাবে রেকাবসমেত জিনটী ঘোড়ার পিঠে ছুঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে! ঘোড়াটী খুব তেজীয়ান্, যেমন উচু, তেমনই লম্বা। অশ্ব-জীবনে এইভাবে জিন পরার আরাম সে বোধ হয় আর কখনও ভোগ করে নাই,—কাজেই এই নবীনত্বের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া চারি পা তুলিয়া অশ্বিনীকুমারটি কেবল লম্ফ ঝম্প করিয়া বিশেষরূপে নিজের আপত্তি জানাইতেছিল। ঘোড়ার লাফানির সঙ্গেসঙ্গেই ঐ ক্ষীণকায় লোকটীও "এ দাদা, জান্ গিয়া,—জান্ গিয়া—" বলিয়া "শত হস্তেন বাজিনা" এই নীতি-বাক্যের অনুসরণ করিয়া তফাতে সরিয়া পড়িতেছিল।

ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই দেখিলাম, প্রেক্ সাহেব চাবুক হাতে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! ঘোড়া এবং জিনের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাহেবের আপাদ-মস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, এবং "কোন্ হ্যায় তোম্,—হামারা সহিস্ কাঁহা গিয়া"—বলিয়া তিনি সেই ক্ষীণকায় লোকটির প্রতি চাবুক আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন! সে বেচারা ত ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—তাহার সুদীর্ঘ জঙ্ঘা-দুইটি ঐ ক্ষীণদেহের ভার

বহনেও অশক্ত হইয়া মুইয়া পড়িতে লাগিল! জবাব দিতে বিলম্ব করাতে সাহেবের ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল,—তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "কোন্ হ্যায় তোম্ উল্লু? হামারা সহিস কাঁহা গিয়া, জল্‌দি বলো!"

সে বেচারা যোড়হাতে বলিল,—"হুজুর, ধর্ম্মাবতার,—মাই-বাপ—হামারা কুচ্ কসুর নেহি,—আপ্‌কা সহিস বোখার হোকে পিপুলবাড়ী টিশনমে গিরা হ্যায়,—হাম্‌কো জোর কর্‌কে ভেজ্ দিয়া,—বোলা কি, তোম্ নেহি যাওগে, তব্ সাহেব তোম্‌কো ফাঁশী চড়াওয়ে গা,—ক্যা করে হুজুর, সরকারকা হুকুম,—হাম জান্‌কা ডরসে হিঁয়া চলা আয়া,—হামারা তবিয়ৎ আচ্ছা নেই,—হাম্ জাত ধুনকর,—লেপ তোষক গদ্দি তৈয়ারী কর্‌না হামারা কাম হ্যায়,—ঘোঁড়া হাত্তীকা কাম হাম্ কভি নেহি কিয়া জনাব—"!

এত ক্রোধের মধ্যেও সাহেব আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না, কাজেই বেচারা ধুনকর এ যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিল। ধুনকারের হাতে পড়িয়া জিনটীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। রেকাবের সঙ্গে লাগাম,—রাশের সঙ্গে পেটি,—নামদারের সঙ্গে জিনের ঢাক্‌নি সব জড়াইয়া আট্‌কাইয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল! সাহেব নিজ হস্তে সেই সব খুলিতে খুলিতে, উদ্দেশে সেই অনুপস্থিত সহিসের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। বহুকষ্টে যখন জিন লাগাম পরাইয়া ঘোড়াকে প্রস্তুত করা হইল, তখন সাহেবের সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিয়া গিয়াছে।

লাফ দিয়া ঘোড়ায় উঠিয়াই সাহেব মোক্তারকে বলিলেন, "চল বাবু, কাঁহা তোমারা মক্কেল লোগ্‌কা ডেরা হ্যায়—।" মোক্তারসাহেব আসামীগণকে লইয়া সাহেবের ঘোড়ার পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন, আমরাও একটু পিছনে-পিছনে চলিলাম। খালিপেটে কাদাজল ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে পথ-ভ্রমণ ব্যাপারটা যে আমাদের পক্ষে তেমন সুখজনক হয় নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। খানিক দূর গিয়াই মোক্তার সাহেব ডাহিনে বাঁয়ে হাত তুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন, "হুজুর, এই সব জমী হানিফ গাজীর,"—"ঐ বাগান নেছারদ্দির,"—"ঐ যে গরু চরিতেছে ওগুলো সব ইব্রাহিমের।"—সাহেব এই সব কথা শুনিতে-শুনিতে ক্রমেই যে চটিয়া উঠিতেছিলেন, সেকথা আমরা পিছন হইতে বুঝিতে পারিলেও, "প্রতিভাশালী" মোক্তার সাহেব উৎসাহাতিশয্যে উহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আরও একটু পথ অগ্রসর হইয়া সাহেবকে শুনাইয়া শুনাইয়া মোক্তার-সাহেব তাঁহার অন্যতম মক্কেল জনাবালী ফকিরকে যেমন বলিয়াছেন যে, "কই হে জনাবালি, তোমার সেই বাঁধাঘাটওয়ালা পুকুরটা কোন্‌দিকে, দেখাও না সাহেবকে!"—অম্‌নি সাহেব ঘোড়ার রাশ ধরিয়া ডানদিকে হঠাৎ এমন-এক হেঁচ্‌কা টান দিলেন যে, ঘোড়াটা মুহূর্ত্তমধ্যে তড়াক্ করিয়া ঘুরিয়া পড়িল। মোক্তার-সাহেব তাড়াতাড়িতে তাল সামালাইতে না পারিয়া পিছনের একটা ছোট খানার ভিতরে একেবারে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন,—তাঁহার চোগা চাপকান

সমস্তই জল-কাদায় একেবারে বিচিত্র হইয়া গেল! সাম্‌লাটা মাথা হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল; ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিতে গিয়া মোক্তার-সাহেবের একপাটি জুতা কাদাতেই প্রোথিত হইয়া গেল, এবং মুখকমলও পঙ্কলিপ্ত হইল। মোক্তার-সাহেবের এই আকস্মিক দুরবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই বড় ব্যথিত হইলাম বটে, কিন্তু সাহেবের মনে ততটা সমবেদনার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

"তোম্ পহিলা বোলা ইয়া সব্ জমীন্, বাগান, গরু ভৈঁষ্ সব তোমারা মক্কেলকা হ্যায়,—আভি বোলতা কি উস্ লোগ্‌কা ঘাটবান্ধা তালাও (পুকুর) হ্যায়,—থোড়া বাদ তোম্ বোলগে কি দুনিয়া ভর্ ওহি লোগ্‌কা এলাকা হ্যায়,—তোমারা সব বাৎ ঝুঁটা হ্যায়,—নেহি যাগা হাম্ তোমারা সাথ,—যাও, হাম্ সব্ সম্‌ঝ্ গিয়া,—সদর যায়কে মাম্‌লাকা হুকুম দেগা,—" এই কথা বলিতে বলিতে সাহেব পিপুলবাড়ী ষ্টেশনের দিকে সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। সুতরাং আমরাও অগত্যা ডাকবাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এতগুলি লোকের সম্মুখে এইভাবে অপ্রস্তুত হওয়াতে মোক্তার-সাহেবের মেজাজটা বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল। "আচ্ছা, থাক্ বেটা সাহেব, আমি সদরে গিয়েই হাইকোর্টে মোশন কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ব,—প্রেক্ সাহেবের কাছে এই মোকদ্দমার বিচার কোন মতেই হতে দেব না।"—বলিয়া তিনি মক্কেলদিগকে অবিলম্বে টাকার যোগাড় করিতে বলিলেন। মক্কেলেরা কিন্তু সুবোধ বালকের মত সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল না।

তাহারা সমস্বরে বলিল, "যান, যান, সাহেব, আপনার জন্যই আমাদের এই সর্ব্বনাশ হয়ে গেল,—আপনিই সাহেবকে যা' তা' সাত সতের বলে চটিয়ে দিলেন। আপনার মত জল-জ্যান্ত মিথ্যাকথা আমরাও বলতে পারি না,—কার জমী, কার বাগান, কার গরু বাছুর সব আমাদের বলে দেখাতে গেলেন, তাতেই ত সাহেব অত রেগে উঠ্‌লো। জনাবালীর কোন্ পুরুষে কবে বান্ধা ঘাটওয়ালা পুকুর ছিল যে, আপনি সে কথা বল্‌তে গেলেন? অত বড় মিথ্যা কথাটা যে বল্‌লেন, যদি সাহেব সত্য-সত্যই পুকুর দেখতে চাইত, তবে কি উপায় হোত? চারিদিকে তিন ক্রোশের মধ্যেও যে কোন পুকুর নাই! ধোঁকা দিয়েই যদি সাহেবকে ভুলান যেত, তবে কি আর সাহেব হাকিমী করতে পারত? আপনাকে আনাই আমাদের ঝকমারী হয়েছে,—সদরে গিয়ে আমরা অন্য মোক্তার দেব।"

মোক্তার-সাহেব গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা যা, তাই দিগে যা।—তোদের মত চোর মক্কেল আমার অনেক জুটবে,—যা, অন্য মোক্তার দিয়ে জেলে পচে মরগে যা! 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর'—তোদের বাঁচাবার জন্যেই আমি সাহেবকে এত করে বোঝাতে গিয়ে শেষকালে আছাড় পর্য্যন্ত খেলুম,—আর তোরা বেটারাই বলিস্ কিনা, আমি মিথ্যুক!—বেইমান নিমকহারাম বেটারা—জানিস্, এ-সব কথা

বল্‌লে মানহানির Case করা যায়? একেই ত ঘাড়ে চেপেছে এই বদমায়েসী মোকদ্দমা, তার উপর আবার মানহানির দাবি চড়া'লে যে দ্বীপান্তরে যেতে হবে, সে খোঁজ রাখিস্ ত? থাক্, তোদের সঙ্গে বকে বকে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না,—দে আমার চুক্তির টাকা,—দে আমার পাল্কী-ভাড়া,—আমি চলে যাই,—তোরা তোদের পথ দেখ,—আমি দরখাস্ত করে এখনি তোদের জামীন এব্‌রা করে দিচ্ছি, যা এখন হাজতে!"

কিন্তু মোক্তার-সাহেবের তর্জ্জন-গর্জ্জন কেহ গ্রাহ্য ত করিলই না—বরং—উল্টাইয়া মুখ-ভ্যাংচাইয়া তাহারা বলিল,—"যাও যাও সাহেব,—টাকা যা পেয়েছ তাই ঢের,—আর এক-পয়সাও আমরা তোমাকে দেব না। পাল্কী-ভাড়া কিসের? এলে কেন পাল্কী ভাড়া করে? তোমার কোন্ পুরুষে কে কবে পাল্কী চড়েছিল? এখনও দেখ গিয়ে তোমার ভায়েরা সব রোদে বৃষ্টিতে লাঙ্গল ঠেল্‌ছে,—অন্যখানে যা কর তা কর, এখানে পাল্কী চড়ে আস্‌তে তোমার একটু লজ্জাও কর্‌ল না? দেব না পাল্কী-ভাড়া,—যা পার তাই কর গিয়ে—!"

এই সময় শ্যামলালবাবু একটু অগ্রসর হওয়াতে আসামীদের বাক্যস্রোতঃ বন্ধ হইয়া গেল। মোক্তার-সাহেবের এই অপমানে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কনেষ্টবল-গণকে বলিলাম, "লাগাও হাতকড়ী সব বেটাকে,—মোক্তার-সাহেব যখন জামিন এব্‌রা করছেন, তখন সব বেটাকেই হাজতে যেতে হবে।"

হাজতের কথা উঠিবামাত্র বাছাদের মুখ আবার ছোট হইয়া গেল। একটু আগেই যে মোক্তারকে তাহারা যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া অপমানিত করিতেছিল, হাজতের নাম শুনিয়া আবার সেই মোক্তার-সাহেবেরই পা জড়াইয়া ধরিয়া সকলে অনুরোধ করিতে লাগিল, তিনি যেন তাহাদের জামিন এব্‌রা না করেন!

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

বিদেশে "আর্য্য সমাজ"

গুজরাতের স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত "আর্য্য সমাজ" ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই "সমাজের" আদর্শ অনুসারে ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কার পঞ্চনদেই বিশেষ রূপে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের প্রভাব যুক্ত-প্রদেশেও বিস্তৃত হইতেছে। বাঙ্গালী মারাঠা ও মান্দ্রাজী শিক্ষিত জনগণ ইহাদের কার্য্য প্রণালী অবগত আছেন। আর্য্য সমাজের "গুরুকুল", য়্যাংগ্লোবৈদিক কলেজ, বালিকা-বিদ্যালয়, "শুদ্ধি" বিধান, হিন্দী প্রচার ইত্যাদি সম্বন্ধে ভারতবাসীর নিকট নূতন পরিচয় দিতে হয় না। ইহাদের কার্য্য

বিবরণ বাঙ্গালা, মারাঠি ইত্যাদি সকল প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। Modern Review, Indian Review Vedic Magazine ইত্যাদি ইংরাজী মাসিক পত্রেও আর্য্য সমাজের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহ বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুই এক জন ইংরাজ এবং ইয়াঙ্কি পর্য্যটক আর্য্য সমাজের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকালকার দিনে বিদেশীয় মুখে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতে থাকিলে দেশীয় সমাজে শীঘ্রই প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। আর্য্য-সমাজও সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ কয়েকজন বিদেশী বন্ধু পাইয়াছেন।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা কেন্দ্রে বিবেকানন্দ-পন্থী "স্বামী"রা বেদান্তভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দয়ানন্দপন্থীরা এখনও ভারতবর্ষের বাহিরে কোন কেন্দ্র স্থাপন করিতে অগ্রসর হন নাই বোধ হইল। যুক্ত-প্রদেশের স্বামী রামতীর্থের ভক্তসংখ্যা এক্ষণে অতি অল্প মাত্র। ভারতবর্ষেই এখনও তাঁহার কীর্ত্তি সুপ্রচারিত হয় নাই। অল্প দিন হইল ৺লালা বৈজনাথ রায় বাহাদুরের উদ্যোগে হরিদ্বারে "রামাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই রামতীর্থ পন্থী-দিগের একমাত্র কেন্দ্র। বিদেশে ইঁহাদের অভিযান সুরু হইতে দেরী আছে।

লণ্ডনে থাকিতে দেখিয়াছিলাম আর্য্য সমাজপন্থীরা একটা ধর্ম্ম মন্দিরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে ইঁহাদের নিয়মিত রূপে যাওয়া-আসা আছে। অন্যান্য মতা-বলম্বী ভারতীয় ছাত্রেরা, পর্য্যটক এবং ব্যব-সায়ীগণও এই মন্দিরের উপাসনা কার্য্যে যোগদান করিতেন। ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী আর্য্য-সমাজ-পন্থীদিগের উদ্যোগে অন্যান্য ভারতীয় উৎসবও বিলাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দয়ানন্দের জন্মতিথি, গুরুকুল-প্রতিষ্ঠা, য়্যাংগ্লোবৈদিক কলেজ স্থাপন ইত্যাদি উপলক্ষে সভাসমিতি আহ্বান করা অথবা ভোজপানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল উৎসবে বিলাতের অধ্যাপক, পার্লামেণ্টসভ্য সম্পাদক প্রভৃতিও যোগদান করেন। এই উপায়ে বিলাতী শিক্ষিত সমাজের মহলে মহলে আর্য্য সমাজের নাম প্রবেশ করিতেছে।

আমেরিকায় আসিয়া দেখি কাশীর "নবজীবন"-সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশব-দেব শাস্ত্রী মহাশয় বৎসরকালাবধি ইয়াঙ্কি-স্থানে নানাপ্রকার বক্তৃতা করিতেছেন। কেশবদেব আর্য্যসমাজের একজন করিৎকর্ম্মা প্রচারক। ইনি পঞ্চনদের শেষ প্রান্ত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সকল প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং পাঞ্জাবী—ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাস করেন কাশীতে—এবং বহু বাঙ্গালী কেজোলোকের সঙ্গে ইহার বন্ধুত্ব আছে। কাজেই মার্কিনদেশে ইনি ভারতবর্ষের অনেক কথা প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। খৃষ্টান পাদ্রীরা সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের এবং বিশেষভাবে আর্য্যসমাজের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এইজন্য আর্য্য সমাজের সঙ্গে পাদ্রী মহাশয়গণের ঝগড়া লাগিয়াই আছে। আমেরিকায়ও কেশব-দেবকে পাদ্রীগণের সঙ্গে যথেষ্ট বাক্‌যুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

বিলাতে এবং ইয়াঙ্কিস্থানে

ভারতবর্ষসম্বন্ধে মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রধানত এইরূপ:—"ভারতবর্ষের নরনারীগণ অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য; ইহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই—পারিবারিক জীবন অতিশয় নীতিহীন; জীবনের সকল কার্য্যে কুসংস্কারের আবরণ আছে। একমাত্র খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের ফলে ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে ভারতবাসীরা মানুষ হইবে না। আমরা অশেষ স্বার্থত্যাগ করিয়া এই অধর্ম্ম ও কুধর্ম্মের দেশে বিদ্যা, নীতি ও ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছি। আপনারা যদি প্রকৃত খৃষ্টান হন, তাহা হইলে আমাদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।" এইরূপ বক্তৃতার সঙ্গেসঙ্গে পাদ্রী-মহাশয়গণ ভারতবর্ষের নানা-প্রকার কুৎসিত চিত্র দেখাইয়া থাকেন। ইহাদের কোন-কোনটা হয়ত সত্য, কোন-কোনটা হয়ত কাল্পনিক। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া শ্রোতারা দয়ার্দ্র হইয়া পড়ে—যাহার নিকট টাকা-পয়সা আছে সে তাহা দিয়া পাদ্রীসমাজের সাহায্য করে। এই কারণে ভারতবর্ষের নীতিহীনতা, ধর্ম্মহীনতা, অসভ্যতা ইত্যাদির কাহিনী প্রচার করা পাদ্রীদিগের একটা ব্যবসায়বিশেষ! ভারতবর্ষের লোকেরা উচ্চশিক্ষিত, সচ্চরিত্র কিম্বা ধার্ম্মিক, এ-কথা সপ্রমাণ হইলে ইয়াঙ্কিরা অথবা য়ুরোপীয়েরা পাদ্রী-প্রচারকগণকে সাহায্য করিবে কেন?

এইজন্যই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের কোন লোক বিদেশে কোন তত্ত্ব প্রচার করিতে আসিলেই, পাদ্রীরা প্রথম হইতেই তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। এইরূপ বাধা না দিলে যে তাঁহাদের "ভাত মারা" যাইবে! বিবেকানন্দ-পন্থীরা এ-কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন। পাদ্রীরা যে কেবলমাত্র ধর্ম্মপ্রচারক-গণের প্রতিকূল, তাহা নয়। সেদিন আই-ওয়া নগরে ঐতিহাসিক শ্যামবগের কথা-বার্ত্তায় বুঝিয়াছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুধীন্দ্র নাথ বসুকে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে পাদ্রী মহাত্মারাই অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা রাষ্ট্রের নায়কগণকে লিখিয়া পাঠান, "যদি একজন হিন্দু আমাদের খৃষ্টান-সমাজের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পুত্রগণকে শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে আমাদের খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে। ভারতীয় হিন্দুরা আমাদিগকে আর ভয় ও সম্মান করিবে না। দেশীয় ইয়াঙ্কিরাও বুঝিবে, যে ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত লোক ইয়াঙ্কিস্থানে অধ্যাপক হইতে পারে, সেই ভারতবর্ষে আমাদের প্রচার-কার্য্য অনাবশ্যক। সুতরাং আমরা স্বদেশে অর্থসাহায্য পাইব না।"

কেশবদেব ইয়াঙ্কিস্থানের কতিপয় নগরে বক্তৃতা দিয়াছেন। দু-একখানা পুস্তকও ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে ক্যালি-ফর্ণিয়া প্রদেশের কোন কলেজে উচ্চঅঙ্গের চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহা ব্যতীত আমেরিকার হিন্দুস্থান পরিষদের কার্য্যে ভারতীয় ছাত্রগণকে ইনি সাহায্য করিতেছেন—বর্ত্তমানে ইঁহাকে পরিষদের সভাপতির পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এবারকার বিশ্বমেলায় যাহাতে ভারতীয় দ্রব্য-নিচয় প্রদর্শিত হয় তাহার জন্য কেশবদের

কয়েক মাস যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। নানা কারণে শ্রম বিফল হইয়াছে। প্রদর্শনীতে ভারতের কথা প্রচারিত হইতে পারিল না। কিন্তু আগামী আগষ্ট মাসে "বিশ্ব-হিন্দুস্থানী-পরিষদে"র সম্মিলন (International Hindusthanee Student's Convention) আহুত হইবে। সেই সময়ে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো-নগরে নানা সভা-সমিতি-সম্মিলন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইবার কথা। তখন যাহাতে ভারতের কথা সুপ্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। কেশবদেবের উৎসাহ এবং ভারতীয় ছাত্রগণের উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

কয়েকদিন হইল, "আর্য্যসমাজ" সম্বন্ধে একখানি সুলিখিত ইংরাজী গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহা বিলাতের লংম্যান্‌স্ গ্রীণ কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত। লেখক শ্রীযুক্ত লাজপত রায়। ইনি বিলাতে এবং আমেরিকায় পর্য্যটন ও বক্তৃতা করিতে আসিয়াছেন। লাজপত রায়ের নাম বিলাতের অনেক মহলেই পরিচিত ছিল—ইয়াঙ্কিস্থানেও এইবার ইনি পরিচিত হইলেন। কোথাও বৈদিকধর্ম্ম, কোথাও হিন্দুর নীতিজ্ঞান, কোথাও আর্য্যসমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিবার সুযোগও ইহার জুটিয়াছিল। কতিপয় অধ্যাপক ইহার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া বুঝা গেল। ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রতি বিদেশীয় শিক্ষিত জনগণের শ্রদ্ধা-অনুরাগ যত বৃদ্ধি পায় ততই আমাদের মঙ্গল। এই সকল দেশের কাগজপত্রে কোন ব্যক্তির চিত্র প্রকাশিত হওয়া অতিশয় মামুলি কথা। সুতরাং কেশবদেব ও লাজপত রায় প্রভৃতির ফটোগ্রাফও বিভিন্ন দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণও মাঝে মাঝে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপায়েই বর্ত্তমান যুগে কার্য্য-প্রচার ও মতপ্রচার ইত্যাদি হইয়া থাকে। বিবেকানন্দ,



লাজপত রায়

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের এবং দুনিয়ার সকল ব্যক্তিই এইরূপে প্রচারিত হইয়াছেন। দুঃখের কথা—অধিকসংখ্যক ভারতীয় নরনারী দুনিয়ার বাজারে প্রচারিত হইতেছেন না। জগতে ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক লাগিয়া যাউন। সহস্র সহস্র ভারতবাসীর চিত্র বিলাতী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, ইয়াঙ্কি, মেক্সিকান, ব্রেজিলিয়ান, চীন ও জাপানী পত্রসমূহে প্রকাশিত হউক। দুনিয়ার রিপোর্টারগণ সহস্র সহস্র ভারতবাসীর মত ও কার্য্যের আলোচনা নানাপত্রে প্রকাশিত করিবার সুযোগ লাভ করুন।

লাজপত রায়ের গ্রন্থ সচিত্র। এই গ্রন্থে বর্ণিত সকল তথ্য এবং চিত্রগুলি ভারতবাসীর সুপরিচিত। গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক সিড্নি ওয়েব।

সিডনি ওয়েব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি এই ভূমিকায় তাঁহার নিজচোখে দেখা নানা বিষয়ের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'নবীন ভারতে'র উত্থান হয়। তাহার পর হইতে নানাদেশীয় বিলাতী পর্য্যটকগণ ভারতীয় নবযুগের চাক্ষুষ পরিচয় পাইবার জন্য ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নেভিন্সন তাঁহার The New Spirit in India গ্রন্থে, র‍্যাম্সে ম্যাক্ডোন্যাল্ড্ তাঁহার The Awakening of India গ্রন্থে এবং পাদ্রী য়্যাণ্ড্রুস্ তাঁহার The Indian Renaissance গ্রন্থে আর্য্যসমাজের প্রশংসা করিয়াছেন। একমাত্র চিরল, তাঁহার The Unrest in India গ্রন্থে আর্য্যসমাজের সঙ্গেসঙ্গে 'নবীন ভারতে'র সকল প্রতিষ্ঠানকেই তিরস্কার করিয়াছেন।

লাজপত রায়ের ন্যায় বিচক্ষণ অন্যান্য লেখকগণের দ্বারা বর্ত্তমান ভারতের অনেক তথ্য ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও জাপানী ভাষায় প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। অবিলম্বে তাহা আরব্ধ হইবে বলিয়াও বিশ্বাস হইতেছে। বিদেশে অতীত ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, চিত্র, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদির প্রচার কিছুকাল হইতে চলিতেছে। কিন্তু 'নবীন ভারতে'র কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর এবং অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনসমূহ এখনও জগতে প্রচারিত হয় নাই। লাজপত রায়ের গ্রন্থ 'নবীন ভারতে'র প্রচারকল্পে পথপ্রদর্শক।

লাজপত রায়ের গ্রন্থ দেখিয়া আর এক কথা মনে হইল। রাণাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্তের পর আর কোন প্রবীন নেতৃস্থানীয় ভারত-সন্তান ভারতসম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ-রচনায় বিশেষভাবে অগ্রসর হন নাই। লাজপত রায় তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া অনেকের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট করিলেন।

য়ুরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রবন্ধুগণ সকলেই সুলেখক। এমন-কি, সেনাপতি এবং অর্ণবযানাধ্যক্ষগণও তাঁহাদের বক্তৃতা মাসিকপত্র ও গ্রন্থাদিতে প্রচার করিয়া থাকেন। উড্রো উইলসন, মর্লে, বার্ণাড়ি ইত্যাদির নাম লেখক-মহলে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের জননায়কগণ প্রধানত বক্তৃতা

দান করিয়া থাকেন। বক্তৃতাগুলি দৈবক্রমে দোকানদারগণের খেয়ালমত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এমন-কি গোখ্‌লেও বীজগণিত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন নাই। এই অবস্থায় লাজপত রায়ের দৃষ্টান্তে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। শুনিতেছি সুবক্তা শ্রীযুক্ত অম্বিকা-চরণ মজুমদার ভারতীয় মহাসমিতি কংগ্রেসের ইতিহাস-প্রণয়নে নিযুক্ত আছেন। অতএব, বলিতে হইবে যে দেশে অল্প-অল্প সুবাতাস বহিয়াছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ভারতের মুদ্রা

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আধুনিক ভারতের মুদ্রা-সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের মুদ্রা বলিলে,প্রধানত আমরা সিক্কা-টাকা এবং আকবরী মোহর বুঝিতাম। কিন্তু ভারতে তথনও মুদ্রার প্রচলন যথেষ্ট হয় নাই; অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ছিল। তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সিক্কা-টাকা বা আকবরী মোহরের বড় একটা প্রয়োজন হইত না। কড়ি এবং তামার গোলাকার পয়সাই একটী ক্ষুদ্র পল্লীর সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য সম্পাদন করিত। সিক্কা-টাকা বা আকবরী মোহর বড়লোকদের ব্যবহারে লাগিত। তদ্দ্বারা তাঁহারা ঢাকাই মসলিন এবং মুর্শিদাবাদের সিল্কের ন্যায় বহুমূল্য বিলাসের দ্রব্যসকল ক্রয় করিতেন। বণিকগণও বহি-বাণিজ্য চালাইবার জন্য সিক্কা-টাকা বা আকবরী মোহর ব্যবহার করিত।

এখন আমরা মুদ্রাস্বরূপ নানাপ্রকার জিনিষ ব্যবহার করি; যথা, গভমেণ্ট প্রমিশরী নোট, টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী, আনী, ডবল পয়সা, আধ পয়সা এবং পাই। ইংরাজী সভরিন্‌ আমাদের ব্যবহারে আসিলেও ইহা এখনও সুপ্রচলিত হয় নাই।

রৌপ্যমুদ্রা।—প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের সময় টাকা বিদ্যমান ছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে বর্ত্তমান টাকা বা পশ্চিমওয়ালারা যাহাকে তঙ্কা বলে, ঐতিহাসিক যুগ হইতেই তাহার প্রচলন হইয়াছে। দিল্লীর সম্রাট শেরসাহ নানা কারণে ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। বঙ্গোপসাগর হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ম্মিত বিস্তৃত রাজপথ এখনও তাঁহার অতুল কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই মোগল-সম্রাট শেরসাহই তঙ্কা নামক রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলন করেন। এই রৌপ্য-মুদ্রার আর-একটী নাম রূপিয়া। তঙ্কা নামটীর অপভ্রংশ টাকা।

মুসলমানদের নিকট হইতে ইংরাজগণ রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর, প্রথম-প্রথম মুসলমানী মুদ্রাই তাঁহারা প্রচলিত রাখেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। সিক্কা-টাকা এবং আক্‌বরী মোহর দুইই যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ভারতের বাহিরে রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল না। সোনা বা রূপার বাজার-দর অনুসারে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। ভারতেও রৌপ্য মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট কোন মূল্য ছিল না। লণ্ডনের রৌপ্যের বাজার-দর অনুসারে উহা নির্দ্ধারিত হইত। লণ্ডনের রৌপ্যের দর যাহা হইত, তাহার উপর লণ্ডন হইতে ভারতে পাঠাইবার খরচ, mint charge এবং অন্যান্য ব্যয় যোগ করিয়া, ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার দাম ঠিক করা হইত। তখন প্রতি রৌপ্য মুদ্রায় একআনা মাত্র খাদ মিশান হইত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, সোনার বাজার-দর নামিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। তখন ভারত-গভর্মেণ্ট, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যাপারে ভারতকে লাভবান করিবার জন্য সোনার মোহর আর প্রচলিত মুদ্রা (legal tender) রূপে গৃহিত হইবে না, এইরূপ ঘোষণা করেন।

সোনার মোহরের চলন তখন হইতে কমিয়া যাইতে থাকিলেও, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, দেশে সোনার মোহরের চলন একেবারে বন্ধ হয় নাই। কিন্তু, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে, একমাত্র রৌপ্য মুদ্রার চল হইয়া যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণের খনি আবিষ্কৃত হয়। তখন হইতে রূপার দাম পড়িয়া যাইতে থাকে। পূর্ব্বে ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার মূল্য সাধারণত দুই শিলিং ছিল। দশটি টাকা দিলে ইংরাজী একটী সভরিন্ পাওয়া যাইত। কিন্তু রূপার দাম পড়িয়া যাওয়াতে রূপার কদরও কমিয়া যায়। কাজেই অনুপাত-হিসাবে দাম কষিতে গেলে, রূপার দাম সোনার দামের অনুপাতে অনেক কমিতে থাকে। শেষে, এক টাকার দাম ১৪ পেন্স পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়।

মুদ্রা-জগতে এইরূপ বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায়, অন্তর্বাণিজ্য বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। রূপার মূল্য তুলনায় পড়িয়া যাওয়ায়, এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যও কমিয়া যায়; কিন্তু যে সমস্ত দেশ তখন সুবর্ণ মুদ্রা ব্যবহার করিত, সেই সেই দেশে দেশোৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও চড়িয়া যায়। কাজেই, ভারতের ব্যবসায়ীগণ রপ্তানী-ব্যবসায়ে খুব লাভবান হইতে লাগিলেন; কিন্তু য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতে দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লাভবান হইতে না পারায়, ভারতের আমদানী-ব্যবসায় একবারে বন্ধ হইয়া যায়। ভারত-গভর্মেণ্ট এই মুদ্রা-বিপ্লবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। ভারত-গভর্মেণ্টকে প্রত্যেক বৎসর ছাব্বিশ কোটী টাকা Home charge রূপে বিলাতে প্রেরণ করিতে হয়। এই Home charge বিলাতে সভরিন-রূপে দিবার নিয়ম। পূর্ব্বে যখন ১০ টাকায় একটী সভরিন্ কিনিতে পারা যাইত, তখন যে পরিমাণে টাকা খরচ হইত, এখন একটী সভরিন্ ক্রয় করিতে ১৫।১৬ টাকা দিতে হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা দেড়া খরচ হইতে

লাগিল। এই সমস্ত গোলমাল মিটাইবার জন্য, ভারত-গভর্মেণ্ট, রৌপ্য এবং স্বর্ণের মূল্যের অনুপাত নির্দ্দেশ ক'রয়া দেন। আমেরিকা, ফ্রান্স ও জর্ম্মনি তখন রৌপ্য এবং স্বর্ণ উভয়বিধ মুদ্রাই প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিত; ভারত-গভমেণ্টের অনুরোধে উক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ একটী কংগ্রেসে, এই মুদ্রা-বিপ্লবের সমস্যা করিতে বসেন। এই কংগ্রেস হইতে ইংলণ্ডকেও রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রাকে প্রচলিত মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ইংলণ্ড সম্মত না হওয়ায়, আমেরিকা, জর্ম্মনি, ফ্রান্সও অসম্মত হন। তাহার পর আমেরিকা, জর্ম্মনি এবং ফ্রান্স প্রভৃতি সকলেই একমাত্র সুবর্ণ মুদ্রাকেই প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করেন। উক্ত দেশসমূহে যে-সমস্ত রৌপ্য-মুদ্রা ছিল, তাহা গলাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা হয়। রূপার বাজার তখন একবারে পড়িয়া যায়।

ফলে ভারত-গভমেণ্ট নিরূপায় হইয়া পড়েন। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য জুয়াখেলার মত হইয়া উঠে। Home chargeএর মাত্রাও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ এবং প্রাদেশিক গোলোযোগে সরকারের খরচ নানাদিকে আরও বাড়িয়া উঠে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুন, ভারত-গবমেণ্ট ভারতে অবাধ মুদ্রা-করণ বন্ধ করিয়া দেন (The mint was closed to the public)। ভারত-গভমেণ্ট এখন হইতে প্রত্যেক টাকায় খাদের ভাগ বাড়াইয়া দেন। এখন প্রত্যেক টাকায় বা আধুলি-সিকি-দুয়ানীতে কত পরিমাণ খাদ মিশানো হয়, নিচে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

	প্রকৃত অংশ	খাদ	প্রকৃত ওজন
টাকা	১৬৫	১৫	১৮০
আধুলি	৮২½	৭½	৯০
সিকি	৪১¼	৩¾	৪৫
দুয়ানী	২০⅝	১⅞	২২½

পূর্ব্বোক্ত তালিকাটীতে দেখা যাইবে, প্রত্যেক টাকা হইতে ১৫ গ্রেণ, প্রত্যেক আধুলি হইতে ৭½ গ্রেণ, প্রত্যেক সিকি হইতে ৩¾ গ্রেণ এবং প্রত্যেক দুয়ানী হইতে ১⅞ গ্রেণ, বিশুদ্ধ রৌপ্য বাহির করিয়া লওয়া হয়। এখন একটী টাকায় ১৬৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকে। একটী ইংরাজী সিলিংয়ে ৮০$\frac{৮}{১১}$ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকে। সুতরাং একটী টাকা ২·৪৩৯ সিলিং বা দুই সিলিং চারি পেন্সের সমান। এই অনুপাতে হিসাব করিলে একটী ইংলিশ সভরিনের দাম ১৫ টাকায় দাঁড়ায়। সাধারণত রূপার বাজার-দর সোনার অনুপাতে ১৫·১। এইজন্য ভারত-গভমেণ্ট নিয়ম করিয়া দিলেন যে, গভমেণ্ট ১৫টী রৌপ্য মুদ্রা লইয়া প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে একটী ইংলিশ সভরিন দিবেন। রূপার বাজার-দর যাহাই হউক, ভারত-গভমেণ্ট ১৫·১ অনুপাতে সোনা-রূপার দর বাঁধিয়া দিলেন। এই নিয়ম অনুসারে কোন বৈদেশিক ব্যবসাদার, কতকগুলি টাকা লইয়া ভারত-সরকারের কাছে যাইলে, ভারত-সরকার তাহাকে

১৫টী টাকার পরিবর্ত্তে একটী ইংরাজী সভরিন্ দিতে বাধ্য হইলেন।

এই নিয়ম প্রচলিত হইবার পর হইতে, বহিঃবাণিজ্যের অবস্থা সুবিধাজনক হইয়া আসিল এবং কত টাকা Home charge দিতে হইবে, তাহাও ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু ভারত-গভর্মেণ্ট নিজে একটী গুরুতর দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। আইন করিয়া, সোনারূপার একটী কৃত্রিম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু জগতের বাজারত ঐ আইন মানিতে বাধ্য নয়। জগতের বাজারে রূপার দাম যদি প্রচলিত দর হইতে কম হয়, তাহা হইলে, ভারত-গভর্মেণ্টকে তাহা পূরাইয়া দিতে হইবে। এইজন্য ভারত-গভর্মেণ্ট টাকার integral value উহার face value অপেক্ষা কম রাখিয়া, প্রত্যেক টাকা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা রহিল, যখন রৌপ্যের বাজার দর, কৃত্রিম অনুপাত অপেক্ষা কম হইবে, তখন এই সঞ্চিত অর্থ হইতে, তাহা পূরাইয়া দিবেন।

তাহার পর গভর্মেণ্ট প্রচলিত বিশুদ্ধ মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ২৫ গ্রেণ খাদ মিশাইয়া নূতন টাকা তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৭ এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ, এই প্রকারে অতিবাহিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আর কোনপ্রকার টাকা মুদ্রিত হয় নাই।

ভারতের দেশীয় নৃপতিবর্গ দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলিরও আপন আপন রৌপ্যমুদ্রা ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে রূপার বাজার যখন নামিতে আরম্ভ হয়, তখন ঐ-সব দেশীয় টাঁকশালগুলিতে প্রয়োজনীয় টাকার সংখ্যা অপেক্ষা, অধিক টাকা মুদ্রিত হইত। কাজেই টাকার প্রচলন অধিক হওয়ায়, দ্রব্যাদির মূল্য চড়িয়া যায়; এবং এইরূপে দেশীয় রাজ্যগুলিতেও ইংরাজ-শাসিত ভারতের ন্যায়, মুদ্রা-বিপ্লব উপস্থিত হয়। ভারত-গভর্মেণ্ট টাকা এবং সভরিণের মধ্যে একটী কৃত্রিম অনুপাত বাঁধিয়া দিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গকে ভারত-গভর্মেণ্টের মুদ্রাশাল হইতে মুদ্রিত মুদ্রা লইতে অনুরোধ করেন। কাশ্মির এবং ভূপাল এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, মুদ্রাঙ্কণ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠায়, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য আরম্ভ হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে, ভারত-গভর্মেণ্টের মুদ্রাশালাগুলি হইতে, বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্বোক্ত দেশীয় রাজ্য-গুলির ব্যবহারের জন্য ১৭ কোটি টাকা মুদ্রিত হয়। এই টাকাগুলিতে, প্রত্যেক টাকায় ১৫ গ্রেণ করিয়া খাদ থাকায়, ভারত-গভর্মেণ্টের আয় যথেষ্ট বাড়িয়া যাইতে থাকে। ঐ অতিরিক্ত আয়ের নাম Gold Reserve Standard রাখা হয়; রূপার মূল্য পড়িয়া স্বর্ণ-রৌপ্যের কৃত্রিম দর বজায় রাখিবার জন্য, যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে, এই সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে তাহা দেওয়া যাইবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। পরে রূপার বাজার-দর একভাবেই রহিয়া যায়, কাজেই এই খাদমিশ্রিত টাকা মুদ্রিত করিয়া, ভারত-গভর্মেণ্ট প্রত্যেক বৎসরেই যথেষ্ট লাভবান হইতে লাগিলেন।

আয় ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ অল্প সুদে টাকা পড়িয়া থাকে দেখিয়া গোপালকৃষ্ট গোখ্‌লে, লর্ড কার্জ্জনের ব্যবস্থাপক সভায় এই উদ্বৃত্ত টাকাগুলি দেশের শিক্ষাপ্রচার বা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভারত-গভর্মেণ্ট দেখিলেন, শিক্ষাদান এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারও বেশ চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু দেশের উন্নতি করিতে গেলে, রেলওয়ের একান্ত প্রয়োজন। তখন পর্য্যন্ত, পর্য্যাপ্ত অর্থাভাবে ভারতে যথেষ্ট রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত-গভর্মেণ্ট, 'সেক্রেটরী অফ্‌ ষ্টেটে'র সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এখন হইতে উদ্ধৃত্ত অংশের অর্দ্ধেক, সঞ্চিত অর্থ-ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হইবে এবং অপর অর্দ্ধেক রেলপথ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে।

এক আকস্মিক দুর্ঘটনা ভারত-গভর্মেণ্টের এই ইচ্ছা ফলবতী হইতে দেয় নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে, আমেরিকার নিকট হইতে ভারতবর্ষ যত টাকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকার দ্রব্য আমেরিকায় রপ্তানী করে। কাজেই ভারতের হুণ্ডিগুলির সংখ্যা আমেরিকার হুণ্ডির সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হওয়ায়, ভারতীয় হুণ্ডির দাম বাড়িয়া যায়। এই বিপ্লবের সময় ভারত গভর্মেণ্টকে সঞ্চিত অর্থভাণ্ডারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ভারত-গভর্মেণ্ট দেখিলেন যে, আন্তর্জাতিক-বাণিজ্য ব্যাপারে মাঝে মাঝে এইরূপ আকস্মিক বিপদ ঘটিতে পারে; সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে গেলে, Gold Reserve Fundএর একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য, স্থিরীকৃত হইল যে, যতদিন পর্য্যন্ত না স্বর্ণ-ভাণ্ডারে ২৬,০০০,০০০ পাউণ্ড জমিবে, ততদিন পর্য্যন্ত উহা হইতে আর এক কপর্দ্দকও খরচ করা হইবে না। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, এই অর্থ-ভাণ্ডারে ১৯,৭৫৬,০৯৭ পাউণ্ড সঞ্চিত হয়।

ভারত-গভর্মেণ্ট খাদমিশ্রিত রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হইয়া যাইবার পর, একে একে নিম্নলিখিত দেশীয় রাজ্যগুলি বৃটিশশাসিত ভারতের মুদ্রাকে নিজেদের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বরোদা, কোটা, যোধপুর, রাধনপুর, ঝলওয়ার, ইন্দোর, কাম্বে, সিরোহী, ডুনগাপুর, বানস্‌ওয়ারা, প্রতাপগড়, কারুলি এবং টঙ্ক। বৃটিশ ভারতের ন্যায় উক্ত দেশগুলিতে পূর্ব্বপ্রচলিত মুদ্রাগুলিকে গলাইয়া পুনর্মুদ্রিত করা হয় নাই। সেই-সমস্ত মুদ্রারই সহিত বর্ত্তমান মুদ্রার একটী অনুপাত ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আন্দামান এবং Strait Settlement-এ প্রচলিত রৌপ্য ডলার ভারতের মুদ্রাশালা হইতেই মুদ্রিত হইত। কিন্তু, Colonial Government মুদ্রাসম্বন্ধে নূতন আইন জারি করায়, Colonial dollar এখন একমাত্র বোম্বায়ে মুদ্রিত হয়।

তামা ও ব্রোনজ্‌ মুদ্রা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেনা-বেচা এবং দৈনন্দিন আদান-প্রদান ব্যাপারে, অল্পদামী মুদ্রা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় এবং

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ভারত-গভমে´ণ্ট তাম্র-মুদ্রার প্রচলন করেন। ভারতে প্রচলিত তাম্র-মুদ্রাকে চারিভাগে ভাগ করা যায়,—ডবল-পয়সা, পয়সা, আধ-পয়সা এবং পাই। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কেবল অলওয়ার এবং বিকানীরই ভারত-গভমে´ণ্টের প্রচলিত তাম্র-মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র তাম্র-মুদ্রা আছে। কোন্‌প্রকার তাম্র-মুদ্রায় কত অংশ তামা আছে, নিম্নে তাহার একটী ফর্দ্দ দেওয়া গেল।

	গ্রেণ, ট্রয় ওজন।
ডবল-পয়সা	২০০
পয়সা	১০০
আধ-পয়সা	৫০
পাই	৩৩⅓

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি আইনে তাম্র মুদ্রার ব্যবহার উঠিয়া গিয়া ব্রোনজ্ মুদ্রা প্রচলিত হয়। এই বৎসর হইতেই ডবল-পয়সায় মুদ্রাকরণও তুলিয়া দেওয়া হয়। কোন্‌প্রকার ব্রোনজ্ মুদ্রার ওজন কত এবং তাহাদের আকারই-বা কত, নিচে তাহার একটী ফর্দ্দ দেওয়া গেল।

পয়সা—	ওজন, ট্রয় গ্রেণ—	আয়তন মিলিমিটারে
পয়সা	৭৫	২৫.৪
আধপয়সা	৩৭½	২১.১৫
পাই	২৫	১৭,৪৫

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি আইন দ্বারা ভারতে নিকেল মুদ্রা প্রচলনেরও ব্যবস্থা হয়। ডবলপয়সার মুদ্রাকরণ বন্ধ হওয়ায় সরকার নিকেল আনী চালান। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, নিকেল ডবলপয়সা চালাইবারও কথা উঠে। কিন্তু প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা ভারত-গভমে´ণ্টকে বলেন যে, আগে প্রজাপুঞ্জ নিকেল আনী ব্যবহারে অভ্যস্ত হউক, তাহার পর নিকেল ডবল-পয়সা চালান হইবে।

গভমে´ণ্ট প্রমিশরী নোট। নোট সমস্ত দেশেই প্রচলিত। য়ুরোপে, সাধারণত ব্যাঙ্কারগণই নোট ছাপাইয়া থাকেন, গভমে´ণ্ট কোনপ্রকার নোট ছাপান না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আমাদের ভারতবর্ষেও বাঙ্গালা, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক হইতেই নোট বাহির হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, ভারত-গভমে´ণ্ট এক আইন জারি করিয়া ব্যাঙ্কগুলির হস্ত হইতে নোট ছাপিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লন। তারপর হইতে ভারতে একমাত্র গভমে´ণ্টেরই নোট ছাপিবার ক্ষমতা আছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Currency Act অনুসারে বৃটিশ-শাসিত ভারতের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও নোট চলিবে, এইরূপ হুকুমজারি হয়।

ভারত-গভমে´ণ্ট যে-সমস্ত নোট তৈয়ারি করেন, তাহার জন্য সম মূল্যের স্বর্ণ ট্রেজারীতে জমা রাখিতে হয়। পূর্ব্বে এই অমুদ্রিত স্বর্ণ-পিণ্ড সমস্তই ট্রেজারীতে পড়িয়া অনর্থক পচিত। তাহারপর গভমে´ণ্ট নিয়ম করেন যে, এই সঞ্চিত অর্থ হইতে ৬ কোটী মুদ্রা খাটানো হইবে। এই খাটানো টাকা ক্রমশ বাড়িয়া এখন ৪০ কোটী টাকাতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গভমে´ণ্ট প্রমিশরী নোট, সোনা-রূপা টাকার ন্যায় আইনত প্রচলিত। গভমে´ণ্টও যত-ইচ্ছা প্রমিশরী নোট বাহির করিতে

পারেন। টাকার বদলে এরূপ নোট চালাইবার একটু হেতু আছে। ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা, হাতে হাতে ঘুরিয়া ক্ষইয়া যায়, কাজেই তাহাতে প্রত্যেক বৎসর অনেক টাকা অনর্থক নষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা, সংখ্যায় অধিক হইলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। একখানি দশহাজার টাকার নোট যেমন সহজে লইয়া যাওয়া যায়, দশহাজার টাকার বা সভরিণের তোড়া তেমন অনায়াসে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায় না। এইজন্যই ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা অপেক্ষা নোট অধিকতর সুবিধাকর। কেহ কেহ বলেন ইংলিশ সভরিণের প্রচলন হওয়ায়, নোটের কদর কমিয়া আসিতেছে। এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেননা অন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ৫০০, ১০০০ এবং ১০০০ টাকার নোটেরই অধিক প্রয়োজন; কিন্তু দেশের মধ্যে, ৫০ টাকার নিচের নোটগুলিরই অধিক দরকার। ৫০০, ১০০০ বা ১০০০০ টাকার নোটেরও ব্যবহার গত বারো বৎসরের মধ্যে শতকরা ১১ হইতে ৩৭ অংশ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে, কিন্তু ৫০০ টাকার নিচের নোটের ব্যবহার শতকরা ১০০ ভাগেরও অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; নিম্নের অঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বৎসর		দশলক্ষ মুদ্রা হিঃ
১৯০০—০১	...	২৫৬·৩৯
১৯০৫—০৬	...	৩৬১·৪০
১৯১০—১১	...	৪৮১·৯৭
১৯১১—১২	...	৫৭১·৬৫

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কোন্‌প্রকারের কত টাকার নোট ছিল, এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা কত হয়, নিম্নের অঙ্কগুলি দেখিলে তাহা বুঝা যায়।

	১৮৯৩	১৯১২
৫ টাকার নোট	২,৪১৭২৮০	১২৯৯৯৩৮৫
১০ „	৩৯,১৭৩৩৬০	১৫০৯০৭৪০০
২০ „	৬,৬০১৬৬০	১৩১২৬৬০
৫০ „	১১৬২৪১০০	১৮৯৬২৭৫০
১০০ „	৫৬৮০৬৮০০	১৬৫২২০৯০০
৫০০ „	২৫১২৪০০০	২৮৭৫১০০০
১,০০০ „	৬৭৯৮১০০০	৯২৯৭১০০০
১০,০০০ „	৫৪০৩০১০০	১৪৩২০০০০০

১৯০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, পাঁচ টাকার নোট ছিল না। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কারেন্সি-আইনে পাঁচ টাকার নোটকে ব্রহ্মদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত করা হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি-আইনে, পাঁচটাকার নোটকে ইংরাজ-শাসিত সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন ব্যতীত, কানপুর, লাহোর ও করাচীতেও নোট বাহির করা হইত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি আইনে, করাচী, লাহোর এবং কানপুরের নোট তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা বন্ধ হয়। পূর্ব্বে যে-সমস্ত নোট যে-প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইত, কেবল সেই প্রদেশেই তাহা ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন নিয়ম করা হইল, ৫,১০,৫০ ও ১০০ টাকার নোট ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই চলিবে। ১০০ টাকার বেশী যে-সমস্ত নোট—অর্থাৎ ৫০০, ১০০০, এবং

১০০০০ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে হইলে, যে প্রদেশ হইতে বাহির হইয়াছে, সেই প্রদেশের যে-কোন ট্রেজারীতে সেগুলি ভাঙ্গান যাইতে পারে। কোন ছোট ট্রেজারী অত দামী নোটের টাকা না দিতে পারিলে, প্রধান ট্রেজারীতে গেলে নোটের ভাঙ্গানি টাকা মিলিবে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি-আইন দ্বারা ২০ টাকার নোট তুলিয়া দেওয়া হয়, তবে যে-সমস্ত নোট পূর্ব্বে মুদ্রিত করা হইয়াছিল, সেগুলিকে আর নষ্ট করা হয় নাই। এখন কেবল নিম্নলিখিত সংখ্যার নোটগুলি মুদ্রিত হয়ঃ—পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ, একশ, পাঁচশ, হাজার, এবং দশহাজার টাকার। হাজার এবং দশহাজার টাকার নোট ধনীগণ ব্যবহার করেন। নগদ টাকা বাড়ীতে রাখা শ্রেয়স্কর নয়, এইজন্য তাঁহারা সরকারের ঘরে নিরাপদে টাকা জমা রাখেন। নিম্নে যে-যে স্থান হইতে নোট বাহির হয়, সেই সমস্ত স্থানের, নোট বাহির করিবার ভার যে-সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর উপর অর্পিত, তাঁহাদের উপাধির এবং যে-সমস্ত নোট সর্ব্বত্র প্রচলিত নয়, সেই সমস্ত নোট যেখানে-যেখানে চলিতে পারে, সেই সেই জায়গার একটী ফর্দ্দ দেওয়া গেল।*

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক নোটের জন্য সমান মূল্যের স্বর্ণ গভর্মেণ্টের ট্রেজারীতে জমা থাকে। এই-সমস্ত স্বর্ণ ট্রেজারী না পচাইয়া তাহার মধ্য হইতে ১৪০ কোটী মিলিয়ন, গভর্মেণ্ট সুদে খাটান। তাহা হইতে গভর্মেণ্ট প্রতি বৎসর ৪৪৯০৪৫০ টাকা সুদ পান। এই বিভাগটি চালাইবার জন্য গভর্মেণ্টের বাৎসরিক খরচ হয় ১৮৫৭১৯০ টাকা। সুতরাং খরচ বাদে, প্রতি বৎসর ২৬৩৩২৬০ টাকা সরকারের লাভ হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

---

* নোট বাহির হইবার স্থান	যে-সমস্ত রাজকর্ম্মচারী নোট বাহির করেন তাঁহাদের নাম	যে যে প্রদেশে ৫০০, ১০০০ এবং ১০০০০ টাকার নোট চলিবে সেই সেই প্রদেশের নাম।
কলিকাতা	কনট্রোলার জেনারল	বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, পোর্টব্লেয়ার ও আন্দামান।
কানপুর	উত্তর-পশ্চিম অযোধ্যা প্রদেশের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল,	আগ্রা এবং অযোধ্যা
লাহোর	পঞ্জাব একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল	পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ
মান্দ্রাজ	ঐ	মান্দ্রাজ এবং কুর্গ
বোম্বে	ঐ	বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বেরার এবং হায়দ্রাবাদ
করাচী	Agent to the Indian Government	সিন্ধুপ্রদেশ
রেঙ্গুন	একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল, বর্ম্মা	বর্ম্মা

সমসাময়িক ভারতের সভ্যতা

আমরা ইতিপূর্ব্বে, সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে, মধ্য-এসিয়ার লোকদিগের প্রভাবে, মুসলমান-সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় সভ্যতার কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল আলোচনা করিয়াছি। এইরূপে রূপান্তরিত ভারতের উপর ইংরাজেরা কিরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতা স্থাপন করিলেন তাহাও পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাদের চেষ্টার ফলাফল আলোচনা করা আবশ্যক; কি পরিমাণে ভারতবাসীরা ইংলণ্ড ও য়ুরোপের প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াছে এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান করা যাক্।

এই সম্বন্ধে প্রথমেই দুইটি কথার উল্লেখ করিব:—

প্রথম কথা। মোটামুটি ধরিতে গেলে, এসিয়ার সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতা পৃথক নহে। অসমান পরিমাণে, উহাদের ক্রমবিকাশের মিল আছে; আরও এই কথা বলা যাইতে পারে, এসিয়ার উন্নতি স্থগিত হইয়া যাওয়ায় এসিয়ার আংশিক অবনতি ঘটিয়াছে। সুতরাং, কতকগুলি সামাজিক ব্যাপার আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহাদের উভয়ের মূল-উৎপত্তির প্রভেদ নির্ণয় করা দুষ্কর। কখন কখন, যাহার বাহ্য আকার য়ুরোপীয়, আসলে তাহা এসিয়ার প্রাচীন প্রতিষ্ঠানাদির অনুবৃত্তি মাত্র। কখন কখন দেখা যায় য়ুরোপীয়েরা কোন এসিয়িক আইন বা প্রথার ভিতরকার ভাবটি একটু পরিবর্ত্তন করায় উহা একেবারে য়ুরোপীয় হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় কথা। য়ুরোপীয় সভ্যতা হইতে, ভারত উহার একটা বিশিষ্ট রূপ অবগত হইয়াছে—সেটি অ্যাঙ্‌গ্লো-স্যাকশন সভ্যতা; ভারতে, এসিয়িক সভ্যতা খুবই একটা বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করিয়াছে—সেটি ভারতীয় সভ্যতা। যেমন এসিয়া ও য়ুরোপের সভ্যতা—এই দুই একত্র মিলিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে একই ক্রমবিকাশের পরিচয় দেয়, সেইরূপ আচার, জাতি, আব্-হাওয়া, ইতিহাস, এই সমস্ত—ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় সভ্যতাকে এমন-সকল গুণে অনুরঞ্জিত করিয়াছে যাহাকে "স্বজাতীয়" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অন্য অবস্থায় পড়িলে হয়ত, ভারত ভারতীয় হইতে বিরত না হইয়াও, উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হইতে পারে। ইংলণ্ড কর্ত্তৃক বিজিত, ইংলণ্ডকর্ত্তৃক হঠাৎ রূপান্তরিত ভারতের কিয়ৎপরিমাণে ইংরাজি ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবারই কথা; যেমন গল্ (gaule) রোমীয় ভাবাপন্ন হইয়াছিল, যেমন ইংলণ্ড এখনো নিজ বক্ষের উপর নর্ম্মান আধিপত্যের ছাপ্ ধারণ করিয়া আছে। পক্ষান্তরে ভারতের জলবায়ু, জাতিবৈশিষ্ট্য প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদি ইঙ্গ-ভারতীয়দিগের মর্ম্মভাবটি অল্প-স্বল্প বদ্‌লাইয়া দিবে। বর্ত্তমানে, ভারতের সভ্যতা ও ইংলণ্ডের সভ্যতা স্বতন্ত্রভাবে পাশাপাশি রহিয়াছে, এখনো মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই। কিন্তু উহাদের সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে।

এখন অনুসন্ধান করা আবশ্যক, কোন্ কোন্ স্থলে এই দুই সভ্যতার মর্ম্মভাব পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার পর দেখিতে হইবে, কিরূপে ইহাদের মধ্যে অভেদ ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে, এবং উহা সংঘটিত হইতে কতটা সময় লাগিবে এবং উহা হইতে কিরূপ সভ্যতা প্রসূত হইবে।

প্রথমে, সমসাময়িক ভারত-সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১৯০১ অব্দের আদম-শুমারের পর, লোকসংখ্যা ২৯৪,৩৬০,৩৫৬তে উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতের জনসংখ্যা ২৩১,৮৯৮,৮০৭ এবং সামন্তরাষ্ট্র-সমূহের জনসংখ্যা ৬২,৪৬১,৫৪৯।

ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যার এইরূপ বিভাগ করা যাইতে পারে :—

মাদ্রাজ	...	৩৮,২০৯,৪৩৬
বোম্বাই ও সিন্ধুদেশ (এডেন ইহার অন্তর্ভুক্ত)	...	১৮,৫৫৯,৫৬১
বাঙ্গলা	...	৭৪,৭৪৪,৮৬৬
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা		৪৭,৬৯১,৭৮২
পঞ্জাব	...	২০,৩৩০,৩৩৯
ব্রহ্মদেশ	...	১০,৪৮৯,৯২৪
মধ্যপ্রদেশ	...	৯,৮৭৬,৬৪৬
আসাম	...	৬,১২৬,৩৪৩
বেরার	...	২,৭৫৪,০১৬
আজ্‌মীর মেরওয়ার	...	৪৭৬,৯২১
কুর্গ	...	১৮০,৬০৭
ব্রিটীশ বেলুচিস্থান	...	৩০৮,২৪৬
এডেন	...	৪৩,৯৭৪
অ্যাণ্ডামান ও নিকোবর		২৪,৬৪৯
উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত দেশ	...	২,১২৫,৪৮০

এই সংখ্যায় মধ্যে কেবল ১৬৯,৬৭৭ যুরোপীয়; উহার অন্তর্ভুক্ত—সৈন্য ও রাজ-কর্ম্মচারী।

১৮৯১ অব্দে, সহস্রাধিক লোক ৪১ ভাষায় কথা কহিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ভাষাগুলির অধিকতর প্রসার :—

হিন্দীভাষী লোক	..	৮৫,৬৭৫,৩৭৩
বাঙ্গলা ,,	...	৪১,৩৪৩,৭৬২
তেলুগু ,,	...	১৯,৮৮৫,১৩৭
মারাঠি ,,	...	১৮,৮৯২,৮৭৫
পঞ্জাবী ,,	...	১৭,৭২৪,৬১০
তামিল ,,	...	১৫,২২৯,৭৫৯
গুজ্‌রাটি ,,	...	৯,৭৫১,৮৮৫
উড়িয়া ,,	...	৯,০১০,৯৫৭
বর্ম্মী ,,	...	৫,৯২৬,৮৬৪

ধর্ম্মমত-অনুসারে ভারতবাসীদিগের এইরূপ বিভাগ, যথা :—

আদিম ধর্ম্ম	...	৯,২৮০,৪৬৭
হিন্দুধর্ম্ম	...	২০৭,৭৩১,৭২৭
মুসলমান-ধর্ম্ম	...	৫৭,৩২১,৩৬১
শিখ্	...	১,৪১৬,৬৩৮
পার্শী	...	৮৯,৯০৪
ইহুদী	...	১৭,১৯৪
খৃষ্টান	...	২,২৮৪,৩৮০
অন্যান্য ধর্ম্ম	...	৪২,৭৬৩

ব্যবসায়-অনুসারে মোটামুটি জনসংখ্যার বিভাগ যথা :—

নাগরিক লোকসংখ্যা	...	২৭,২৫১,১৭৬
গ্রাম্য লোকসংখ্যা	...	২৫৯,৯৭২,২৫৫

এই সময়ে ৩,৬৪৫,৮৪৯ পশুপালক এবং

১৭১,৭৩৫,৩৯০ কৃষক ছিল। ভৃত্যের সংখ্যা ছিল ১১,২২০,০৭২; রাজকর্ম্মচারী ও ম্যুনিসিপ্যাল-কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল—৫,৬০০, ১৫৩। স্থল-বিভাগের ও নৌ-বিভাগের সৈন্য ছিল—৬৬৪,৪২২ (ইংরাজ সৈন্য উহার অন্তর্ভূত); যাহারা উদার-শিক্ষাশ্রিত (liberal) ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা —৫,৬৭২,১৯১। ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারে বর্ণবিভাগের সংখ্যা ছিল ২,৮৮৯; উহাদের মধ্যে আবার উপবিভাগ ছিল। একই বর্ণের বিভিন্ন বিভাগ অনেক প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল না। ১৮৯১ অব্দে কোম্পানী-কাগজ ও "শেয়ার" প্রভৃতির অধিকারীর সংখ্যা—১৯৩,২৯১। ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে ৪৮২,৪৮২ লোকের আয় ছিল ৫০০ টাকা। যাহার উপর আয়-কর আদায় হইত এরূপ আয়ের পরিমাণ ৫০,৬৩০,০০০ পৌণ্ড অতিক্রম করে নাই

নিম্নলিখিত সংখ্যাঙ্কের হিসাবও ঔৎসুক্য জনক;—পুরুষ-সংখ্যা (১৮৯১ অব্দে):—১৪৬,৭২৭,২৯৬; তন্মধ্যে ৬২,১২০,৩০০ বিবাহিত পুরুষ। (১৯০১:—১৪৯,৯৫১, ২৪০)।

স্ত্রীলোকের সংখ্যা:—১৪০,৪৯৩,১৩৫; তন্মধ্যে ৬২,৪৫৮,৯৪৬ বিবাহিত স্ত্রী। (১৯০১:—১৪৪,৪০৯,১১৬)।

পাঁচ বৎসর বয়সের নীচে:—২০,৬৩১, ৩৮০ পুরুষ; ২১,৪১০,১১৯ স্ত্রীলোক।

পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত:—পুরুষ ৩৭,৫৮৮,৯০৫; রমণী ৩২,৮৪৪,০৪৫।

২৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত:—৪৩, ৪৬৭, ৬৫০; ৪১, ১০২, ৪৩৬ রমণী।

৪৪ হইতে ৫৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত:—১৩, ৯৮৯, ৬৯১ পুরুষ; ১২, ৮৭৬, ৩৪১ রমণী।

৬০ বৎসরের অধিক বয়স:—৬, ৭৬৯, ৪৩৩৫ পুরুষ; ৪,০৩২, ৪৪৮ রমণী।

এই সকল গোড়ার তথ্য হইতে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, যথা:—

বহুসংখ্যক ভাষা, ধর্ম্মমত, ও বর্ণভেদ হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক একতাসাধন করা অতীব কঠিন কার্য্য। দশ ভাগের নয় ভাগ লোক কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত; বহুসংখ্যক শিশুসন্তান এবং লোকের পরমায়ু স্বল্পস্থায়ী। কতক-গুলি লোক ধনশালী, তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রভূত ধনশালী; মধ্যশ্রেণীর লোক সংখ্যায় খুবই কম; কেবল রাজ-কর্ম্মচারী এবং যাঁহারা "উদার" শিক্ষাশ্রিত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন—তাঁহারাই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবের বশবর্ত্তী। কিন্তু জনসাধারণের উপর রাজকর্ম্মচারী ও শিক্ষিত লোকদিগের এখনো তেমন প্রভাব দেখা যায় না। এইরূপে গত আদম-সুমারীর মোটামুটি পরীক্ষা হইতেই আমরা জানিতে পারি,—য়ুরোপীয় সভ্যতা ভারতে কতটা বাধা পাইয়াছে এবং এই বাধা অতিক্রম করিতে আরো কতকাল লাগিবে।

*
* *

এক্ষণে অনুসন্ধান করা যাক্,—কিরূপে

ভারতের মুখ্য জাতিগণ ইংরাজপ্রবর্ত্তিত অভিনব প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে, এবং ঐ-সকল জাতি য়ুরোপের আচার-ব্যবহার ও শিল্প আত্মসাৎ করিতে কতটা পটুতা দেখাইয়াছে।

বাঙ্গালী।—দৌর্ব্বল্যজনক আব্-হাওয়ার মধ্যে, এবং অতীব সমৃদ্ধিশালী ভূমির উপর ৭০ লক্ষ মনুষ্যের বাস (১)। বাঙ্গালী মিশ্রজাতি, শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ, অর্দ্ধ আর্য্য ছাঁচের, অর্দ্ধ মোগলীয় ছাঁচের। নম্র-প্রকৃতি, বুদ্ধিমান, প্রবল স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট, নূতন জিনিস আত্মসাৎ করিবার প্রভূত শক্তি-সমন্বিত, সৌম্য-প্রকৃতি ও তোষামোদের বশীভূত; বাঙ্গালীর সরলতার অভাব, সাহসের অভাব ও নছোড়বন্দা-দৃঢ়তার অভাব। উহাদের মধ্যে হাজার হাজার জাত। জঙ্গলের শিকারী ও নৌকার মাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারক ও কলিকাতার খবরের কাগজ-ওয়ালা পর্য্যন্ত সকল ব্যবসায়ই উহাদের মধ্যে আছে।

ধনীদিগের মধ্যে, দরিদ্রদিগের মধ্যে, কতকগুলি লোক য়ুরোপীয় সভ্যতার ধরণে গঠিত; ইংরাজেরা এই সভ্যতা দেড় শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালীর উপর চাপাইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সরকারী রাজকর্ম্ম পাইবার জন্য ও "উদার" ব্যবসায়গুলি অবলম্বনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে দোকানদার আছে, মহাজনী কুঠীওয়ালা আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি লোক খুব ধনী। জমিদারদিগের বহুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি; ঐ ভূমি কৃষিপ্রজা কর্ত্তৃক কর্ষিত হইয়া থাকে। মুদ্রাযন্ত্র ও সাহিত্য বেশ পরিপুষ্ট। সকল রকমের পোষাক:—বাবুর পোষাক য়ুরোপীয় ধরণের; শিক্ষিত লোকের ও শিক্ষার্থীর চাপকান ও হল্‌দে চোগা; দোকানদারের সাদা পরিচ্ছদ, ইতর-সাধারণ প্রায় নগ্ন বলিলেই হয়। উচ্চবর্ণের রমণীরা ঘোম্‌টা না দিয়া বাহির হয় না। ইতর-সাধারণ রমণীরা শুধু একখানি শাড়ী পরিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে এক তৃতীয়াংশ ও নীচ জাতের সকলেই মুসলমান। প্রধান ভাষা—বাঙ্গলা।

অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। এখানকার আবহাওয়া বঙ্গদেশ অপেক্ষা স্বাস্থ্যজনক, ভূমি ততটা সমৃদ্ধ নহে, ততটা আর্দ্র নহে। গাঙ্গেয় উপত্যকার নগরগুলি:—আগ্রা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলাহাবাদ, বেনারস। জাতি প্রায় অমিশ্র:—হিন্দুস্থানী শ্যামবর্ণ, ক্ষুদ্র ডিম্বাকার মুখ; লম্বা, পাতলা, প্রায়ই শীর্ণ, খুব গর্ব্বিত (বিশেষতঃ উচ্চবর্ণদিগের মধ্যে)। ইহারাই পূর্ব্বকার যোদ্ধৃ-জাতি; ইহারাই ইংলণ্ডের হইয়া ভারত জয় করিয়াছে; খুব গোঁড়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, (বিশেষতঃ বেনারস অঞ্চলের লোক), কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায়, উহাদের মধ্যে সেরূপ জঘন্য কুসংস্কার নাই। উহারা অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকে; কেন না, গাঙ্গেয় উপত্যকাই সেই প্রকৃত ভারতভূমি, যেখানে প্রাচীন সভ্যতা ও মধ্যযুগের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল:—তাই, হিন্দুস্থানীরা আক্ষেপ-

(১) আসলে, যাহারা বাঙ্গলা বলে তাহাদের সংখ্যা ৪১ লক্ষ মাত্র। অন্য ত্রিশলক্ষ লোক বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভূত।

সহকারে য়ুরোপীয় সংস্কার ও রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া থাকে। উহারা সরকারী কাজের জন্য বা "উদার" ব্যবসায়াদির জন্য বড় একটা চেষ্টা করে না। উহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ধীরে ধীরে হইতেছে। উহাদের মধ্যে দোকানদার ও বড় জমিদার তেমন বেশী নাই। ৯০ অধিবাসী কৃষিজীবী; নগরের মধ্যে, ছোট ছোট বেনিয়া ও কতকগুলি নিপুণ কারিগর আছে। পোষাক বিচিত্র ধরণের। শতকরা ১০জন মুসলমান। উহাদের মধ্যে হিন্দীর বিভিন্ন "ভাখা" বা উপভাষা প্রচলিত।

পঞ্জাবে ভারতের সকল জাতি ও মধ্য এসিয়ার লোক দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—পাঠান বা ভারতপ্রবাসী আফগান, হিন্দুস্থানী, জাট্ (শক্‌জাতীয়), রাজপুত, গুজ্‌রাটি, পারস্তদেশীয়, তুর্ক, মোগল। কোথাও, অর্দ্ধনগ্ন ও মুণ্ডিতমস্তক হিন্দু, কোথাও পশমী চোগা ও দীর্ঘ পরিচ্ছদপরিহিত শ্মশ্রুধারী মুসলমান; সীমান্ত-প্রদেশের লোকেরা স্বকীয় অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষা করিয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি সুন্দর ছাঁচের লোক দেখিতে পাওয়া যায় (বিশেষতঃ শিখদের মধ্যে);—উহারাই পূর্ব্বকালের যোদ্ধৃজাতি; এখনো উহারা সৈন্যমণ্ডলীতে অনেক সৈনিক যোগাইয়া থাকে; মেজাজ্‌টা কড়া, আভিজাত্যমূলক কুসংস্কারে পরিপূর্ণঃ—রাজপুত ও বেনিয়াদিগের মধ্যে একটা বিধবাবিবাহ হইলেই সেই পরিবারের জাত যায়। অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী; তথাপি অনেকে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়। দরিদ্র কৃষকেরা কুসাদজীবীর কবলে পতিত। ইতরসাধারণ—অনক্ষর। অধিকাংশ লোকই মুসলমান। পশ্চিম ভাগে হিন্দু কম। ভাষা পাঞ্জাবী;—হিন্দীর একটা উপভাষা।

সিন্ধুদেশ।—বেলুচী-প্রধানদিগের অধীনে কতকগুলি কৃষক ও পশুপালকের বাস। এই বেলুচীরা গোঁড়া মুসলমান—সামন্ত-তন্ত্রের রীতিনীতি-সমন্বিত যোদ্ধৃপুরুষ; কৃষকেরা শান্তপ্রকৃতি, সকল বিষয়ে উদাসীন ও অনক্ষর। কিন্তু যে-অবধি অনুর্ব্বর মরুভূমি ও জলাভূমিসকল জলসেচন-প্রণালীর দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে, সেই অবধি উহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

রাজপুতনা।—কতকগুলি সামন্ত-তান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাজারা রাম ও কৃষ্ণের বংশধর এইরূপ তাহাদিগের অভিমান। রাজপুতেরা দীর্ঘকায়, ছিপছিপে, মুখাকৃতি চওড়া, রং কতকটা ফর্সা, নাসা শুকচঞ্চুবৎ, চোখ শ্যামবর্ণ; উহাদের মধ্যে অনেকে গালপাট্টা রাখে, কাহারও-বা উহা মাথার চুলের সহিত বাঁধা থাকে; একপ্রকার পরিচ্ছদ, যাহা কতকটা হিন্দুধরণের, কতকটা মুসলমানি ধরণের এবং কতকটা য়ুরোপীয় ধরণের। উহারা উত্তম সৈনিক, উত্তম ঘোড়-সোয়ার, সুন্দর অস্ত্রশস্ত্রের অনুরাগী, দাসত্বে পরিণত জনসমূহকে উহারা অবজ্ঞা করে। যাহারা বেশী বুদ্ধিমান তাহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়। গোঁড়া হিন্দু। মুসলমান খুবই কম। উহাদের ভাষা গুজরাটী অথবা হিন্দীর কোন উপভাষা।

যেখানে ভাল ভাল বন্দর আছে, সেই

গুজ্‌রাটে, সকল জাতিরই বংশধরেরা বিশেষতঃ গুজ্‌রাটীরা বাস করে। গুজরাটীরা সুনম্য-প্রকৃতি, কার্য্যদক্ষ, বাণিজ্য-ব্যাপারে তাহাদের স্বাভাবিক পটুতা আছে। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত রাজধানী—বোম্বাই। গুজরাটের উর্ব্বর ক্ষেত্র বহু-সংখ্যক কৃষককে পোষণ করে। পরিচ্ছদে বহুল বৈচিত্র্য। চাষারা শুধু সাদা ধুতি পরে, এবং বেনিয়ারা দীর্ঘ পরিচ্ছদ ও ভাঁজবিশিষ্ট পাগ্‌ড়ি ব্যবহার করে। অধিকাংশ লোকই হিন্দু। ১২ ভাগের এক ভাগ মুসলমান। কতকগুলি বিশেষ-ছাঁচের লোক আছে যথা, মারোয়াড়ী—মারোয়ারের মৌলিক কুসীদজীবী। (মারওয়ার রাজ-পুতানার অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্র)। তার পর ওয়াকীল,—মাম্‌লা-মোকদ্দমা চালাইবার লোক—ইহারা চাষা ও বেনিয়াদিগের অর্থ শোষণ করে।

৮০ হাজার পার্শী। ইহারা জোরোয়াষ্টার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বংশধর। মুসলমান কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া উহারা প্রথমে অর্মজ্‌দ্‌ দ্বীপে পরে সুরাটে বাস স্থাপন করে। উহাদের অধিকাংশই এক্ষণে (৯০ হাজারের মধ্যে ৬০ হাজার) বোম্বায়ে। ধনীদিগের য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রভূত ধন সম্পত্তি যথা, মৃত সর্ জাম্‌শেদজি জিঝিভাই—যিনি সার্ব্বজনিক কাজে কত লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। কি শ্রমশিল্প, কি বেঙ্ক, কি তুলার কল্, কি বাণিজ্যের কুঠী, কি জাহাজসংক্রান্ত কোম্পানী—এই সমস্ত কাজের শীর্ষস্থানে উহারা। সাধারণ লোকেরা পরিশ্রমী, সূক্ষ্মরুচি, ছোট ছোট ব্যবসায়ে নিযুক্ত, অন্তরে সাম্যনীতির ভাব, ধর্ম্মসংক্রান্ত কুসংস্কারাদিতে উহাদের দৃঢ় আসক্তি। পুরুষদিগের এক প্রকার ধুচ্‌নী টুপি ও কালো ঢিলা কোর্ত্তা। স্বতঃ-নির্ব্বাসিত হইয়া উহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বেলুচিস্থানে, ব্রহ্মে, চীনে বাণিজ্যব্যবসায় ও কুসীদবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এডেন-উপনিবেশে এমন-কি লণ্ডনেও উহাদের বাণিজ্য-কুঠী আছে। পার্শী-সমাজ একটি পঞ্চায়েতের দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। উহার ২০ জন সদস্য। উহার মধ্যে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ও গৃহস্থ লোকের প্রতিনিধি আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সভার নিষ্পত্তি মঞ্জুর করেন না। কাজেই উহার প্রভুত্ব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী সকলেই গুজরাটি ভাষা ব্যবহার করে।

যে পার্ব্বত্য প্রদেশ অনুর্ব্বর সেই দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিজীবী মারাঠ্ঠাদের বাস। ভারতের উত্তরাংশের লোকেরা এই মারাঠাদের উচ্চবর্ণকেও বড় একটা শ্রদ্ধা করে না। উহাদের দৈহিক উচ্চতা মাঝামাঝি, খুব শ্যামবর্ণ, আসলে দ্রাবিড়ীয়দিগের ন্যায় চওড়া-মাথা ছাঁচের হইলেও হিন্দুদের সহিত যৌন-মিলনের ফলে উহা কতকটা সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। উহারা দাড়ী রাখে। যদিও এখনও গর্ব্বিত ও লড়াক্কা-মেজাজ, তথাপি য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে উহারা এখন বাণিজ্য-ব্যবসায় ও কুসীদ কর্ম্মে নিযুক্ত। কেবল মধ্যভারতের মারাঠা-রাজ্যে যে রাজবংশ

আছে ও রাজকর্ম্মচারীদের যে পরিবারবর্গ আছে তাহারা আদৎ মারাঠা। লোক-সাধারণ—হিন্দু, দ্রাবিড়ীয় ও অপেক্ষাকৃত অসভ্য পাহাড়ী। কিন্তু তাহাদের ভাষা ও রীতিনীতি বিজেতাদিগেরই ভাষা ও রীতি নীতি।

মধ্যভারতে অল্প মুসলমান; নিজামের রাজধানী হৈদ্রাবাদে বিস্তর মুসলমান। হৈদ্রাবাদে, বহির্দ্দেশ হইতে আগত আরব, পারসিক, এমন-কি কাফ্রি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত মধ্যদেশে মারাঠা ভাষা প্রচলিত।

দক্ষিণে, জাতিসমূহের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। আদিমনিবাসী, উত্তর হইতে সমাগত বিদেশীগণ, সমুদ্রপথে আগত প্রবাসার্থী-গণ। তথাপি দ্রাবিড়ীয় ছাঁচেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। উপকূলগুলি, বিশেষত মালা-বারের উপকূল-ভূমি উর্ব্বরা। আভ্যন্তরিক দেশটি মরুবৎ অনুর্ব্বর। অধিবাসীগণ নগ্ন-প্রায়, শীর্ণকায় ও কদাকার।

বিশেষরূপে কেবল দুই জাতির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়;—টেলুগু ও তামিল। ভারত-উপদ্বীপে বা দাক্ষিণাত্যে তামিল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল জাতি:—ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, চওড়া-মাথা, মোটা-ঠোঁট, জ্বল-জ্বলে চোখ। নছোড়বন্দা ও একগুঁয়ে। অসভ্য চাষা। ইহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মনির্ব্বাসিত হয়। সিংহলে উহাদের সংখ্যা ছয় লক্ষ; উহারা নিম্ন ব্রহ্মদেশে, শ্যাম ও মারিচ দ্বীপে এবং আণ্ডিল দ্বীপপুঞ্জেও প্রবাস-স্থাপন করে। অষ্ট্রেলীয়রা ভারতবাসীর অষ্ট্রেলীয়ায় উপনিবেশ-যাত্রা রহিত করিয়াছে। কুলীরা যেখানেই বাস স্থাপন করে, সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বর লইয়া আসে।

একটু প্রাক্কালে ইংরাজগণ হইতে সভ্যতা প্রাপ্ত হওয়ায়, বঙ্গদেশের ন্যায় মাদ্রাজেও শিক্ষার উন্নতি হইয়াছে। সহরের রাস্তায়, মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা সায়াহ্নে একত্র সমবেত হইয়া তর্কবিতর্ক করে। এইরূপ দৃশ্য তাঞ্জোরের শুভ্রবর্ণ মঠেও দৃষ্ট হয়! যুবকের দল, নগ্নবক্ষ, সাদা-জামা, সাদা চাদর-কাঁধে-ফেলা। সূর্য্যের শেষ-রশ্মি, উচ্চ "বিমান"কে (মন্দিরের চূড়া) কনকরঞ্জিত করিয়া খোদাই-করা ময়ূরের পাখার উপর খেলা করে; স্তম্ভ, কুট্টিম, ও মঠের প্রাচীর এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরীয়, ছায়া আলোকে অঙ্কিত হইয়া উঠে। স্তম্ভবদ্ধ বহিঃপ্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শিক্ষার্থীরা উচ্চকণ্ঠে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে, দর্শন সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করে। যদি কোন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী মঠ দেখিতে যায় অমনি ছাত্রেরা তাকে আক্রমণ করে! বিশ্বব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে, আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে, শিব ও বিষ্ণুর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহে। বিশেষত মানবজাতির উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার কি মত উহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে। স্বকীয় পৌরাণিক ধর্ম্মমতের শিক্ষায় বর্দ্ধিত হওয়ায়, বিশ্বমানবের অধঃপতন হইয়াছে—এই সংস্কারটী এই প্রাচ্য দেশীয় ছাত্রদিগের মন হইতে কিছুতেই অপনীত হয় না। সূর্য্য অস্ত হইল, একটা গরম দম্‌কা বাতাস আসিয়া নিবিড় ধূলা উড়াইয়া দিল; আকাশে কাকেরা, বৃক্ষশাখায় টিয়া-পাখীরা খুব চীৎকার আরম্ভ

ছাত্রেরা তখনও তর্ক করিতেছে; কিন্তু য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ঃ—ভবিষ্যতে এই জাতির কি-দশা হইবে? যে জাতির লোকেরা এরূপ কঠিন প্রশ্ন সকল এত আবেগ ভরে সমাধানের চেষ্টা করিতেছে—এই সাদাসিধা সুবক্তার জাতি, এই প্রকৃত মানুষের জাতি যাহারা য়ুরোপীয় মধ্যযুগের মত' এই সব দুরূহ প্রশ্নের আলোচনায় এত আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইতেছে, না-জানি তাহারা অনুকূল দিন আসিলে এই আগ্রহ ও উৎসাহ, জীবন-সংগ্রামে ও জীবনের কাজে কিরূপ প্রয়োগ করিবে।

উর্ব্বর ব্রহ্মদেশে সুবিশাল অরণ্য; এই অরণ্যভূমি ইরাবতী ও তাহার শাখা-নদী গুলির দ্বারা পরিসিক্ত। বর্ম্মাজাতির সুনম্য প্রকৃতি ও অবাধ বুদ্ধি, উহারা স্বেচ্ছাক্রমে য়ুরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। পুরুষেরা ভবিষ্যৎ-চিন্তাবিরহিত, অলস। রমণীরা খুব উদারপ্রকৃতি, মনোমোহিনী, নিপুণা, প্রভাবান্বিতা, কাজকর্ম্মে সুদক্ষা। সকলেই বৌদ্ধ, কেবল প্রবাসী ভারতবাসীরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী (২৮৪,৮৮০) ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী (৩৩৯,৪৩০)। বর্ম্মীরা তাহাদের সকল আমোদ প্রমোদের মধ্যেই একটু সৌন্দর্য্যরস ঢালিয়া দেয়। ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ার উপর স্বর্ণাচ্ছাদিত মন্দির; বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে খোদাই কাজ-করা মঠগৃহ, তাহার চারিধার তক্তা দিয়া বদ্ধ; মণ্ডপের তিনটি পিরামিড-আকারের চূড়া, —ক্রমে সূচাগ্র হইয়া উঠিয়াছে; মণ্ডপের ছাদ মণ্ডপের গা হইতে ঝুঁকিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রতিমা, প্রাচীর-গাত্রে অল্প-উত্তোলিত ভাস্করকার্য্য দেবদেবীর মূর্ত্তি, নাগ-মূর্ত্তি, জড়াও কাজের গহনা, রংকরা অথবা সোনালী বা রূপালী পাত মোড়া। একটা দীর্ঘ সোপান দিয়া মন্দিরে উপনীত হওয়া যায়; সোপানের ধারে ধারে কাঠের দোকান ও খুব উজ্জ্বল রঙ্গের বিকট মূর্ত্তিসমূহ। দিবসের সকল সময়েই, বিশেষতঃ সায়াহ্নে বর্ম্মীরা মন্দিরে গমন করে; ইহাই—সাধারণ মিলনের স্থান।

দেবালয়—ছত্রতলে, পুষ্পরাশির মধ্যে, অগণ্য বুদ্ধপ্রতিমা;—কোনটা শোয়া, কোনটা দাঁড়ান, কোনটা উবু-হইয়া-বসা। হাজার হাজার মোম্‌বাতী—বাতীর আলো ধূপের ধোঁয়ায় মিশিয়া গিয়াছে। দ্বারদেশে মাথা কামানো, হল্‌দে ধুতি-চাদর-পরা বৌদ্ধভিক্ষুগণ। চারিদিকেই আনন্দোৎফুল্ল জনতা। পুরুষদের চওড়া ধুতি, খাঁদা নাক; উহারা পীতবর্ণ, উহাদের রঙ্গিন পাগড়ী, সাদা ঢিলা-আস্তিন্ জামা, কোমরে জড়ান পাঁচরঙ্গা ধুতি, জঙ্ঘা ও পা অনাবৃত। শিশুরা নগ্নপ্রায়, উহাদের উরু ও পাছায় উল্কি। রমণীদের দেহের উচ্চতা মাঝামাঝি; উহারা পাতলা, ছিপছিপে, মনোমোহিনী। চিরুণী-দেওয়া উঁচু-বাঁধা চুল পুষ্পভূষিত; উহাদের খোলা কপাল, ডিম্বাকার মুখ, পাতলা নাক; ছাড়া-ছাড়া ভ্রূ, টানা ও বাঁকা চোখ, মধুর ও চতুর দৃষ্টি; ওষ্ঠদ্বয় ভোগ-বিলাসী, জেদালো থুতি। পরিচ্ছদ ঃ—"থামেইন্"—এক রকম পাঁচরঙ্গা রেশমী শাড়ী; তাহার সঙ্গে সেলাই-করা একটা

মার্জ্জনী এবং একটা সাদা ঢিলা-চওড়া-আস্তিন্ জামা। একটা ওর্‌না। পুরুষ ও রমণী উভয়ই রেশমী কাপড় পরে। বয়স অনুসারে কাপড়ের রং:—যুবকদের জন্য লাল, প্রৌঢ়দের জন্য বেগনী, বৃদ্ধদের জন্য সবুজ। ওরনার রং উজ্জ্বল কিন্তু অকৃত্রিম নহে:—নারাঙ্গি, গোলাপী, নীল-সবুজ। এবং সূর্য্য ঐ সকল বিচিত্র বর্ণের প্রতিবিম্ব উহাদের পীতবর্ণের উপর নিঃক্ষেপ করায় উহাদিগকে যেন আরো সজীব করিয়া তুলে, উহাদের চোখ যেন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এইরূপে বিবিধ জাতি-সমন্বিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে, বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন লোক, য়ুরোপ হইতে প্রাপ্ত শিল্প ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ ভাবের অনুরূপ ও প্রয়োজনের অনুরূপ রূপান্তরিত করিয়াছে। এই প্রকারেই উহারা পূর্ব্বে মধ্য-এসিয়ার, পারস্যের ও আরবের শিল্প ও প্রতিষ্ঠানাদিকে রূপান্তরিত করিয়াছিল। অতএব, সমসাময়িক ভারতের অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে, প্রথমে নিরূপণ করা আবশ্যক—কোন্ কোন্ জিনিস সমস্ত ভারতের নিজস্ব এবং কোন্ কোন্ জিনিস বিশেষ বিশেষ প্রদেশের নিজস্ব; সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে, কোন্ কোন্ জাতি এই নব সভ্যতার উপর নিজ নিজ ছাপ অঙ্কিত করিয়াছে। একটা সাধারণ ভাব হইতেও এই সমস্তের আলোচনা করা যাইতে পারে। মোটামুটি বলিতে গেলে—সমস্ত ভারত সমাজে, একটা গোল-যোগ, অনিশ্চিততা, চেষ্টাপ্রযত্ন, এবং য়ুরোপীয় প্রবণতা ও এসিয়িক প্রবণতার মধ্যে যুঝাযুঝি; সেই সঙ্গে, বিরুদ্ধ প্রবণতাসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর আপোস ও মিলন সংস্থাপন—ইহাই সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞান-সম্মিলন

গত বৎসর জানুয়ারী মাসে 'সায়েন্স কংগ্রেস' বা বিজ্ঞান-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছিলাম। এতদুপলক্ষে গভর্মেণ্ট শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার পি, সি, রায় ও ডাক্তার ডি, এন্, মল্লিক মহাশয়কেও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

'সায়েন্স কংগ্রেস' বা বিজ্ঞান-সম্মিলন ব্যাপারটা যে কি, তাহা জানিবার জন্য হয় ত অনেকের আগ্রহ হইবে। বিলাতে British Association for the Advancement of Science নামক একটি বিজ্ঞান-পরিষৎ আছে। এই পরিষৎ বিলাতের সকল প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। বৎসর বৎসর গ্রেট ব্রিটেন

ও আয়র্লণ্ড এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই পরিষদের অধিবেশন হয়। পরিষদের নানা শাখা আছে—যথা, রসায়ন-শাখা, ভূবিদ্যা-শাখা, প্রাণিবিদ্যা-শাখা ইত্যাদি। প্রত্যেক শাখায় একজন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন। এখনকার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন এই 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে'র আদর্শেই গঠিত হইয়াছে। এই সকল শাখার অধিবেশনে কেবল মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধই পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। ফলে এই পরিষৎ বৎসর বৎসর বৈজ্ঞানিকগণের পরস্পর মিলনের ও ভাববিনিময়ের সুযোগ করিয়া দেন। সঙ্গেসঙ্গে, যে-স্থানে পরিষদের অধিবেশন হয়, সেখানকার নবীন বৈজ্ঞানিক-গণ সম্মিলিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পান এবং তাঁহাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির আলোচনায় যোগদান করিয়া বিশেষরূপে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে'র অধিবেশন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হইয়া থাকে। গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় অধিবেশন হয়। সেই সময় ইউরোপে মহাসমর উপস্থিত হইয়াছিল এবং 'এম্‌ডেন' নামক জার্ম্মান রণতরি ভারত-মহাসাগরে ব্রিটিশ বাণিজ্যতরীসকল ডুবাইয়া চারিদিকে মহাভয়ের সঞ্চার করিতেছিল। অধিবেশন শেষ হইলে যখন বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী স্বদেশে ফিরিতেছিলেন তখন তাঁহাদের জাহাজের খালাসীরা ভারত-উপকূলে আসিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া পলায়ন করে। তাহার ফলে স্যর অলিভার লজ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকগণ স্বহস্তে ঝাঁটা ও ব্রুশ দিয়া জাহাজের ডেক ও ক্যাবিন প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়াছিলেন। সকলে দেশে ফিরিলেন—যুদ্ধ না বাধিলে অনেকেই ভারতে আসিতেন এবং আমরা তাঁহাদের সাহচর্য্যে ধন্য হইতাম। কেবল সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক Armstrong সাহেব কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারত-বর্ষে 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশানে'র অধিবেশনের প্রস্তাব দুই-একবার হইয়াছিল বটে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অধিবেশনের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গবেষণা বা শিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের পরস্পরে মিলন ও ভাববিনিময়ের কোনও সুবিধা নাই দেখিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার সাইমন্‌সেন ও লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক মিষ্টার ম্যাক্‌মোহন ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহে একখানি চিঠি ছাপিয়া Indian Science Congress-এর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। কলিকাতার 'বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি' এই প্রস্তাব সাগ্রহে অনুমোদন করাতে গতবৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং বঙ্গের মাননীয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল পেট্রনরূপে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া-ছিলেন। সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল তিনদিন এবং সভাক্ষেত্রে অনেকগুলি

পঠিত হইয়াছিল। সম্মিলনের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, যাহাতে সম্মিলিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ভালরূপে মেলামেশা হইতে পারে সেইজন্য প্রতিদিন সান্ধ্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সকল সান্ধ্যসম্মিলনে লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরও যোগদান করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজে গত জানুয়ারী মাসে বিজ্ঞান সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। এই বিলাতী-ধরণের সম্মিলন ও আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মধ্যে তফাৎ এই যে, যাঁহারা বিজ্ঞান সম্মিলন আহ্বান করেন তাঁহাদিগকে প্রতিনিধিগণের "ভরণ-পোষণে"র জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হয় না; প্রতিনিধিগণকে কংগ্রেসের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হয়, তাহা হইতেই কংগ্রেসের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তাহার উপর প্রতিনিধিগণ যাতায়াতের ব্যয় নিজেরাই বহন করেন, এবং থাকিবার ও আহারাদির বন্দোবস্তও নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়। কংগ্রেসের জন্য বিচিত্র পটমণ্ডপেরও প্রয়োজন হয় না।

"দীয়তাং ভুজ্যতাং"এর কোনও ব্যবস্থা না থাকাতে এখানে বাজে লোকের ভিড় ও গোলমাল হয় না। সেইজন্য যে-কোনও সাধারণ গৃহই কংগ্রেসের অধিবেশনের পক্ষে যথেষ্ট। প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল—'বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সভাগৃহে। মাদ্রাজে অধিবেশন হইয়াছিল মাদ্রাজ 'প্রেসিডেন্সি কলেজে'র বিভিন্ন ক্লাসের ঘরে। এক-একটি ঘরে এক-একটি শাখার অধিবেশন হইয়াছিল। ক্লাসে যেখানে অধ্যাপক-মহাশয় বসেন, সভাপতি মহাশয় সেই আসন গ্রহণ করিলেন; এবং প্রতি-নিধিগণ ছাত্রদের বেঞ্চের উপর সুখাসীন হইলেন। প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদাতেই কংগ্রেসের সমস্ত খরচ মায় সান্ধ্য-সম্মিলনের ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহিত হইয়াও কিছু উপরি থাকে। আর আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রাতেও ব্যয়-সঙ্কুলান হয় না। শুনিলাম বর্দ্ধমানের সম্মিলনের জন্য অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এই ব্যয়ের অনুপাতে যতটুকু সাহিত্যের আলোচনা হইয়াছিল, সেটুকু পর্য্যাপ্ত কি না জোর করিয়া বলা বড়ই শক্ত। শুনিলাম বর্দ্ধমানে প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র হইয়াছিল অথচ দ্বিতীয় দিনের শাখাসমূহের অধিবেশনকালে প্রত্যেক শাখায় পাঁচ-সাত-দশজনের বেশী লোক দেখা যায় নাই। এ-ক্ষেত্রে বলিতে হয় আসল কাজের জন্য নয়, কেবল আমোদ-প্রমোদ ও তামাসা দেখিবার জন্য অথবা রসনাতৃপ্তির জন্যই এই দুই সহস্র প্রতিনিধি বর্দ্ধমানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন! সাহিত্য-সম্মিলন এখন যে-ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপরে সেখানে প্রকৃত রসের আস্বাদ পাইবেন না। এক্ষেত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কিছু কমাইয়া যাহাতে বিনা আড়ম্বরে প্রকৃত কার্য্যের ব্যবস্থা হয় সম্মিলন কি তাহাই করিবেন না?

আর একটা কথা বলা দরকার। এই বিজ্ঞান-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের মধ্যে

অধিকাংশই সাহেব। মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্থানীয় দর্শক ও প্রতিনিধি এবং আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী ভিন্ন অধিকাংশ প্রতিনিধিই সাহেব ছিলেন। তাহার দুইটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমত, পদার্থবিদ্যা (Physics) ও রসায়ন শাস্ত্রে (Chemistry), বিশেষত দ্বিতীয়টিতে, গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালা দেশে যত বহুল পরিমাণে জাগিয়াছে, ভারতের অন্যত্র এখনও সেরূপ জাগে নাই। সেইজন্য বিজ্ঞান-সম্মিলনে অন্য প্রদেশবাসীর অপেক্ষা বাঙ্গালীর সমাগমই বেশী হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র ভিন্ন বিজ্ঞানের অন্য-অন্য বিভাগে যে-সকল বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই সাহেব। আমাদের কলেজসমূহে প্রধানত পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রই পড়ান হয়, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভারত-সরকারের অধীনে চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা (Geology), প্রাণিবিদ্যা (Zoology), উদ্ভিদবিদ্যা (Botany) প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বহু বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাদেরও মধ্যে অধিকাংশই সাহেব। সেইজন্য এই সকল বিভাগে যাঁহারা গবেষণা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতবাসীর সংখ্যা কম হইবারই কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের 'মেডিক্যাল কলেজ' সমূহের অধ্যাপকেরা প্রায় সকলেই সাহেব, এবং বাঙ্গালী ডাক্তারদের মধ্যে যাঁহারা মেডিকেল কলেজে কাজ করেন, তাঁহারা অনেকেই Demonstrator প্রভৃতি নিম্নতন পদে অধিষ্ঠিত। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী অনেক বড় বড় ডাক্তার আছেন ("বড় ডাক্তার" মানে যাঁহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন) বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে গবেষণায় ডাক্তার রায়, ডাক্তার স্যার লিওনার্ড রোজার্স প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত ডাক্তারদের মত একজন লোকও নাই। মেডিকেল কলেজে কাজ করিবার কতকটা সুবিধা পাইয়াছেন বলিয়াই বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় Bactriology সম্বন্ধে কিছু-কিছু গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেইরূপ, ভারতের উদ্ভিদ-সমূহের তথ্যসংগ্রহ করিবার জন্য কলিকাতা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'বোটানিকেল গার্ডেন' আছে। সেই-সকল স্থানের ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয় অনেক বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ-বিদ্যাবিষয়ক গবেষণায় যশস্বী হইয়াছেন। তাহা ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন স্থানে মিউজিয়ম আছে। এই-সকল মিউজিয়মে ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের অনেক শাখা দেখা যায়। এই-সকল মিউজিয়মে কর্ম্ম ক'রয়া ডাক্তার এনান্‌ডেল প্রাণিবিদ্যায় ও সার টমাস্ হলাণ্ড, ভূবিদ্যায় গবেষণার দ্বারা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ত বাটীতে বসিয়া গবেষণা করিতে পারেন না। তাঁহার জন্য 'লেবরেটারী' চাই, মিউজিয়ম চাই, যন্ত্র চাই, সরঞ্জাম চাই। কলিকাতার মিউজিয়মে প্রাণিবিভাগে চাকরি পাইয়াছিলেন বলিয়াই বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বি, এল, চৌধুরী

মহাশয় প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের কলেজসমূহে বহুদিন হইতে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হইতেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ভিন্ন অন্য কোন কলেজে কোনও 'ল্যাবরেটরী' ছিল না—সেইজন্য এই দুই শাস্ত্র লইয়া অন্য কোনও কলেজে গবেষণাও হইত না। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-আইন পাশ হইবার পর ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষায় এক নবীন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এখন প্রত্যেক কলেজে 'ল্যাবরেটারী' আছে এবং যে কলেজে বি, এস্, সি অনারস (B. Sc. Honours) পর্য্যন্ত পড়ান হয়, সে কলেজের 'ল্যাবরেটারী' এত উন্নত হইয়া থাকে যে, তাহাতে অধ্যাপকেরা ইচ্ছা করিলে গবেষণায় ব্যাপৃত হইতে পারেন। সেইজন্য এখন আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেবল কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আবদ্ধ নাই; 'সায়েন্স এসোসিয়েসন' ঢাকা কলেজ, রাজসাহী কলেজ প্রভৃতি অনেক কলেজে উহার বীজ উপ্ত হইয়াছে। আশা করা যায়, কালে প্রত্যেক কলেজে উহার বীজ ছড়াইয়া পড়িবে এবং ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার ক্রমশ বর্দ্ধিত হইলে অদূর-ভবিষ্যতে এই বিজ্ঞান-সম্মিলনে ভারতবাসীর সংখ্যাই ক্রমে অধিক হইয়া উঠিবে।

আগামী বারে মান্দ্রাজের বিজ্ঞান-সম্মিলনীর অন্যান্য কথার আলোচনা করিব।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

কথা ও কাজ

আমরা মুখে যা' বলি কাজে তা' করি না। এ অনুযোগটা এত বেশী শুনিতে পাই যে আমার মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম। যেখানেই যে কথা সেই কাজ, সেইখানেই কোন অস্বাভাবিক কারণ ভিতরে ভিতরে চলিতেছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, মানুষ একটা বিরাট ইঞ্জিন নয় যে Whistleএর সঙ্গেসঙ্গেই চলিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং যদিই আমাদের কথার সঙ্গে কাজের সকল-সময়ে মিল না হয় তাহা হইলে সেই কারণেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল এমন মনে করিবার বিশেষ কারণ দেখি না।

আমাদের জীবন-সমস্যা এতই জটিল যে তাহার মধ্যে প্রত্যেক কথা কাজে পরিণত করিতে বিস্তর ব্যাঘাত ঘটে। সে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা সকল সময় সহজও নহে। আবার অনেক সময়ে তাহা অসম্ভবও বটে। কিন্তু কাজটা যখন মন্দ তখন শুধু কথা বা চেষ্টার জন্য—আইনের ভাষায় বলিতে গেলে শুধু attemptএর জন্য—শাস্তি দিবার ব্যবস্থা অনেক পণ্ডিতেরও

মুখে শুনিতে পাই, অথচ ভাল কাজের বেলায় আমরা শুধু কথা বা চেষ্টার কেবল যে কোনও মূল্য দিতে সম্মত হইনা তাহা নহে, অধিকন্তু তাহাকে ব্যঙ্গের দ্বারা পরিহাস করিয়া নির্যাতিত করি।

সকলপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কথাকে কার্য্যে পরিণত করাই যে সকল সময়ে মনুষ্যত্ব, এমন কথাও বলা যায় না। যিনি দানের নামে পুত্রকে বলি দিয়াছিলেন, অথবা যিনি পিতৃ-ভক্তি দেখাইতে মাতৃহত্যা বা বারবার নিরীহ বহুজনের প্রাণনাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাদের স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি মনের কোমল বৃত্তি-নিচয়ের স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করার জন্য বাহাদুরি দিতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে এ কাজের জন্য তাঁহাদের কৌলীন্যের দাবী যে খুব-বেশী, এমন কথা ত মনে হয় না। আবার যদি কেহ পিতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তিসত্বেও তাঁহার আদেশে মাতাকে মারিতে না পারেন, যাহা সাধারণের অর্থাৎ কাহারো নহে, তাহার জন্য যদি কেহ তাঁহারই উপর যাহা বিশেষ করিয়া নির্ভর করে তাহাতে সকলসময়ে জলাঞ্জলি দিতে না পারেন, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে কেন যে তাঁহাকে ছোট করিয়া গণ্য করা হইবে এ-কথাটাও ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

দেখা যাইতেছে, কাজের সঙ্গে মিল হয় না বলিয়াই যে, কথা নিন্দনীয়, তাহা নহে। কথা নিন্দনীয় তখনই—যখন তাহা মনের কথা নয়—প্রাণের কথা নয়, যখন তাহা মুখের শব্দমাত্র—শুকের মুখস্থ বুলির মত ভাবশূন্য, অর্থশূন্য—কেবল পরকে প্রতারিত করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। কিন্তু যে কথার পশ্চাতে কল্পনা ও সঙ্কল্প আছে তাহা কার্য্যে পরিণত না হইলেও প্রশংসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য। সকলসময়ে তাহা ফলবান্ না হইলেও potential energyর মত বজ্রগর্ভ মেঘের ন্যায় সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ বলিয়াই নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। তবে, বজ্রপাতের দ্বারাই যেমন মেঘের মধ্যে বজ্রাগ্নির অস্তিত্ব জানা যায়, কার্য্যের দ্বারা, ত্যাগস্বীকারের দ্বারা তেমনি সঙ্কল্পের অস্তিত্বও জানা যাইতে পারে। কাজে কথার যাচাই হয়, কাজ কথার কষ্টিপাথর। তাই যে-কথার পশ্চাতে কাজ নাই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণও সম্ভবপর নহে। এইজন্যই আমরা প্রত্যেক প্রাণের কথাকেই কাজে সার্থক দেখিতে চাই। পশ্চাতে কাজ না থাকিলেও কাজটা যে প্রাণের হইতে পারে, এটা আমরা অনেক সময়ে স্বীকার করিতে চাই না। বীজ নিষ্ফল হইলে তাহা বীজেরই দোষ, ইহাই আমরা ধরিয়া লই। কিন্তু তাহার সফলতা যে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি আরো বহু পারিপার্শ্বিক কারণের উপর নির্ভর করে, এই সোজা সত্যটা অনেক সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই। অনেক সময়ে আবার বীজের প্রাচুর্য্যকেই আমরা নিষ্ফলতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বাক্পটুত্বের জন্য বাঙ্গালী আত্ম-পর সকলের নিকটেই গঞ্জনাভাজন হইয়া আসিতেছে। সেখানে কথার জন্য উচিত-মূল্য আদায়ের প্রয়াস করিয়া হয় ত ভাল কাজ করিতেছি না।

কিন্তু আমরা কার্য্যবীর বলিয়া যাঁহাদিগকে তারিফ করিয়া থাকি, বাক্যবীর তাঁহারাও যে খুব কম, এমন কথা বলা যায় না। আমাদের রসদ-সচিব Lloyd George-এর কথা মনে করুন। কাজে তিনি 'পোষাক-পরা ঘুর্ণি বাতাস' (a perfect Tornado in Trousers) বলিয়া উল্লিখিত হন দেখিতে পাই। কথায়ও তিনি ঘুর্ণি বাতাসের মতই ধূলি উড়াইয়া মাথা ঘুরাইয়া অনেক সময়েই আঁধি লাগাইয়া দেন। তাঁহার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া সাধারণ লোকে কূল-কিনারা দেখিতে পায় না। ইহার কারণ, কথা ও কাজের মধ্যে একটা ভেদ চিরকালই থাকিবে। এই ভেদ থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কথা, কাজের চেয়ে আগে চলিবেই। কাজ কথাটাকে সার্থক করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইরূপে, ব্যক্তি—গৃহ—সমাজ—রাষ্ট্র অগ্রসর হইতে থাকে। কথা যেখানে ছোট হইয়া গেছে, চিন্তাও সেখানে খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে হইবে। যদিচ কাজ সেখানে কথামত হইয়া কথাটাকে আপাতত সার্থক করিয়া লইতেছে, তথাপি তাহার নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া সে ক্রমশ কলের কাজের মত নির্জীবতা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাণের অভাবে উৎসাহ মরিয়া যাইতেছে। সুতরাং আপনা হইতে কাজও যে সেখানে পিছাইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

কেবল কথার জন্য একটি অভ্রভেদী সিংহাসন তৈরি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহাও হয় ত অনেক পরিমাণে সত্য, আমরা কথা এত-বেশী বলিয়াছি যে, তাহাতে বিকারের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। আমার কথা—এই আদর্শকে আমাদের কাজের চেয়েও কতকটা উচ্চ করিয়া রাখিতেই হইবে। আদর্শকে নামাইয়া ধরিলে কাজও সেই পরিমাণে নামিয়া পড়িবে। এবং কাজেও আমরা যে-পরিমাণ অগ্রসর হইতে থাকিব আদর্শকেও ঠিক সেই পরিমাণেই আগাইয়া ধরিতে হইবে। এ আদর্শ প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক গৃহ—প্রত্যেক সমাজের পক্ষে হয়ত বিভিন্ন হইবে, এবং বিভিন্ন হওয়াও হয়ত কতকটা বাঞ্ছনীয়। আদর্শের বিষয়ে absolute standard—একটা চরম মাপ্‌কাঠি—আমার মনে হয়, সোনার স্বপ্নের মত সম্ভাবনার রাজ্যের পরপারে অবস্থিত। অনেক সময়ে এই absolute standard নির্দ্ধারণ করিতে আমরা মারামারি করিয়া অনেকটা কাজের শক্তির অপব্যয় করি।

দর্শনের রাজ্যে দেখা যায়, পরমাণুবাদী যখন অসংখ্য পরমাণুকে নিত্যতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন উহাই জগৎ-সৃষ্টির চরম কারণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ক্রমে দেখা গেল, এতগুলি পরমাণু ও জাতি-সমবায় প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার জঞ্জাল জগৎসৃষ্টি বিষয়ে নিতান্তই অনাবশ্যক। ভাষায় তাহাদের ব্যবহারে কিছু সুবিধা হইলেও বস্তুত তাহাদের স্বীকারে সত্যানুসন্ধিৎসুর অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তখন এগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন দর্শনের সৃষ্টি হইল। প্রকৃতি-পুরুষবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি কত মতেরই প্রচার হইয়া গেল।

কিন্তু এ-বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। যাহা শেষ কথা, তাহা আপেক্ষিক শেষ কথা, ইহা সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি ও অবস্থাঅনুসারে এই শেষ কথা অনবরতই পরিবর্ত্তিত, কোথাও শোধিত আবার কোথাও-বা বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হুইতেছে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে-দিন প্রচারিত হয় সে-দিন যজ্ঞিয় পশুর আর্ত্তনাদে যে করুণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল, সে হৃদয়ে একদিনও বোধকরি এ-কথা স্থান পায় নাই যে, তাহার এই মহামন্ত্র মৃত-জীবভক্ষণের প্ররোচনায় নিয়োজিত হইবে। কিন্তু চীন ও ব্রহ্মদেশে এইরূপই ঘটিয়া গেল। শঙ্করের কর্ম্মসংন্যাসেও ভারতবাসী এইরূপে একদিন বসিয়া গেল। যে সাঁতার দিতে পটু সে যখন জলের উপর নিশ্চেষ্ট হয়, তখন তত উদ্বেগের কারণ না থাকিলেও, যে এ-বিষয়ে অপটু তাহার নিশ্চেষ্টতা যে ডুবিবার লক্ষণ ইহা ভাবিয়া দেখিবার অবসরও তাহার ঘটিয়া উঠিল না, বুদ্ধিমান্ বলিবেন এইসকল মতের মধ্যে যে ত্রুটি ছিল তাহারই জন্য এমনটা ঘটিতে পারিয়াছে। ত্রুটি অবশ্যই ছিল। আধুনিক কান্ত্, হিগেল, সোপেনহাওর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের লীলাক্ষেত্রে যে বীভৎস অভিনয় চলিতেছে তাহার মধ্যেও কোথাও-না-কোথাও ত্রুটি অবশ্যই আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ত্রুটি ইহাই আমি মনে করি যে এইসকল কথা বা আদর্শকে চূড়ান্ত বলিয়া স্থির করা—ইহাদের চূড়ান্তত্ব যে আপেক্ষিক এই কথা ভুলিয়া যাওয়া। বুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে—অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা কখনই চূড়ান্ত থাকিতে পারে না। তাই বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের দেশে চূড়ান্ত কথা শুনাইতে পারে নাই, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াও রাজার সহায়তা, ভারতবাসীর স্বাভাবিক নিরীহতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি অনুকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও তাহা মরিয়া গেল। এইখানটাতে হয়ত পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয়ের মতের সহিত আমার মতের কিছু বিরোধ বাধিয়া যাইতেছে। আমি কিন্তু বিষয়টাকে প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখি নাই। দর্শনের দিক্ দিয়া দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, দর্শনহিসাবে ব্রাহ্মণের মেধার নিকট বৌদ্ধ দর্শন পরাজিত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া আমার ত মনে হয়ই না বরং উহাকে আমি বৌদ্ধ দর্শনের মৃত্যুর পরওয়ানা বলিয়াই দেখিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের মেধার উপর হয়ত আপনাদের ততটা শ্রদ্ধা নাই—শ্রদ্ধা থাকিতেও পারে না—কারণ, আপনারা এক পাচক ব্রাহ্মণ অথবা বড়-জোর আমার মত ব্রাহ্মণের সম্পর্কে আসিয়াছেন—কিন্তু আজ যে মেধার কথা বলিতেছি তাহা নিতান্ত অবজ্ঞেয় নহে, তাহা শঙ্করাচার্য্য, রামানুযাচার্য্যের মেধা—তাহার নিকট বৌদ্ধ দর্শনকে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। তাই বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা কাজ যে বড় কম হইয়াছে, তাহাও নহে। দর্শনের শেষ কথা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সেও আজ সহস্রাধিক বৎসর হইয়া গেল। তাহা

লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিয়াছি, কথাটাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টারও ত্রুটি করি নাই। কিন্তু নূতন কথা আর বড় বেশী বলি নাই। এ-দেশীয় দর্শন-রাজ্যে ইহা কখনই শুভ লক্ষণ নহে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'এ পৌঁছিবার যে-সকল দার্শনিক গোঁজামিল আছে—মায়া, লীলা প্রভৃতি যে-সকল কথা সদুত্তর না যোগাইলে ব্যবহৃত হয়, সেগুলার মীমাংসার জন্য অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক আমরা ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর মস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া কল্পনা ও যুক্তির নির্ব্বাসন-দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি, আমরা কথাকে বাদ দিয়া কাজে লাগিয়াছি। অনেকের মতে এইটাই শুভলক্ষণ; কিন্তু আমি বলি যখন কাজের চেয়ে কল্পনা কমিয়া আসিয়াছে তখন তাহা মৃত্যুর লক্ষণ—জীবনের লক্ষণ নহে। সুতরাং কাজ যদি-বা সকল সময়ে না হয় সেজন্য কল্পনাকে বা আদর্শকে খাটো করা আমার পরামর্শ নহে। কথাকে যদি প্রাণের সংকল্পে বরণ করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে কাজ একদিন আপনা-হইতেই তাহার অনুগামী হইবে। সেজন্য বসিয়া থাকিব না। কথাকে, কল্পনাকে, আদর্শকে উত্তরোত্তর অগ্রগামী করিবারই চেষ্টা করিব। সেজন্য যদি পরিহাস সহ্য করিতে হয়, তবে তাহাতেও সম্মত আছি। তাহাতে যদি আমার কপালে কেবল দুঃখই থাকে, তবে সে দুঃখ যেন আমার মাথার মণি হইয়া উঠে।*

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমাদের শিক্ষা

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের সকল শিক্ষা মায় উচ্চ, বাঙ্গলাভাষাতেই হওয়া উচিত। কথাটা অদ্ভুত নয়, কেননা এক ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অপর সকল দেশে, দেশভাষাতেই দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটা নূতনও নয়, কেননা আর কেউ না হোক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ কথা পূর্ব্বেও বলেছেন;—একবার নয়, বহুবার। মাতৃভাষার স্বপক্ষে এক কথা যে একশোবার করে বল্‌তে হয় সে দোষ বক্তাদের নয়, এর জন্যে দোষী হচ্ছেন সেই শ্রোতার দল যাঁরা এক কানে বিলেতি আর-এক কানে সংস্কৃত তুলো দিয়ে বসে আছেন। বাঙ্গলার কথা বাঙ্গলায় বল্‌লে সে কথা শিক্ষিতসম্প্রদায় কানে তোলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য কথা যদি ইংরাজি ভাষায় বল্‌তেন তাহলে বাঙ্গালীর তা মনে বস্‌ত। আমাদের কাছে যে খাঁটি বাঙ্গলার চাইতে মেকি সংস্কৃত ও ভাঙ্গা-ইংরাজির মূল্য ঢের বেশি তার

* শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে ৭ই মাঘের উৎসবে পঠিত।

পরিচয় ত আমাদের সাহিত্যে সংবাদপত্রে সভাসমিতিতে দু'বেলা পাওয়া যায়। সে যাই হোক, শিক্ষিতসম্প্রদায় যে রবীন্দ্রনাথের কথায় মনোযোগ দেন্‌নি তার প্রমাণ—তাঁরা অনেকেই বল্‌ছেন—ও-সব কবিত্বের কথা, কাজের কথা নয়। অনেকের বিশ্বাস যাঁর কবি-প্রতিভা আছে তাঁর বিষয়বুদ্ধি নেই। এ কথা যদি সত্যও হয় ত একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে যাঁর কবি-প্রতিভা নেই তাঁরই বিষয়-বুদ্ধি আছে। কোনও একটি মানসিক-শক্তির অভাব থেকে অপর একটি মানসিক-শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ হয় না। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মতে কবির মন আকাশে ওড়ে, মাটির খবর রাখে না। একথা সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এ দেশের ইউনিভার্সিটি-ফেরৎ লোকের মনের গতি আকাশের দিকেও নয়, মাটির দিকেও নয়,—বাটীর দিকে। আমাদের সকল ভাবনা সকল চিন্তা পরিবারের গণ্ডীর ভিতরই আবদ্ধ। আমরা আকাশের খবর দূরে থাক্, দেশের খবরও রাখিনে; কেননা আমাদের মনের পক্ষে ঘর হতে আঙিনা বিদেশ। দেশের দিকে, দশের দিকে একটু ফিরে চাইলে আমরা প্রকাশ্যে এ কথা বলতে লজ্জিত হতুম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-বিদ্যা আমরা লাভ করি তা অর্থকরী বিদ্যা। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পবিত্ত এ ত প্রত্যক্ষ সত্য অথচ একমাত্র এই সম্প্রদায়ই উচ্চ শিক্ষিত। এবং এই উচ্চ শিক্ষা যত প্রসার লাভ করছে উচ্চশিক্ষিত দলের পশার তত কমে আস্‌ছে; এক বিয়ের বাজার ছাড়া আর সকল বাজারেই বি-এর দর পড়ে যাচ্ছে। এরূপ হবার প্রধান কারণ এই যে,—যে-বিদ্যা আমরা শিখি তা অর্থকরী অর্থাৎ তা wealth producing বিদ্যা নয়। আমাদের সকল শিক্ষিত লোকের সমবেত বিদ্যার ফলে এই ভূভারতে ধানের একটি শিষও বাড়েনি। আমাদের স্বার্থকরী বিদ্যা হচ্ছে আসলে অর্থ-হস্তান্তরকরী বিদ্যা। এ বিদ্যার গুণে এর পকেটের টাকা ওর পকেটে যায়। আসল ঘটনা এই যে, আমরা দেশে বিদেশে কোরে খাইনে; আপিসে আদালতে চোরে খাই। যাঁরা শিক্ষার সংস্কার কর্‌বার প্রস্তাব করেন তাঁরা এ কথাটিও মনে রাখেন যে যে-দেশে যথার্থ শিক্ষা আছে সে দেশে জাতীয়-শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধনেরও বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে—জাতীয় শিক্ষার গুণে তদ্দেশবাসীরা এক দাসদাসী ব্যতীত অপর সকল ধনে অপূর্ব্ব ধনী হয়ে উঠেছে। দেশের বিষয় কবি হয় ত দিবাস্বপ্ন দেখেন আমরা কিন্তু নিশাস্বপ্নও দেখিনে—কেননা আমাদের নব শিক্ষার প্রভাবে আমরা স্বার্থের নেশায় দিবারাত্র বেহোঁস হয়ে থাকি।

(২)

কাজের লোকেরা বলেন যে, অন্তত পেটের দায়ে আমাদের ইংরাজি শেখা দরকার, অতএব বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। ভাবুক লোকেরা এর উত্তরে বল্‌বেন, শুধু পেটের দায়ে নয়, মনের দায়েও আমাদের পক্ষে শুধু ইংরেজী

নয়, জর্ম্মান ফ্রেঞ্চও শেখা আবশ্যক ; অতএব বাঙ্গলা ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। কেননা যার কোন একটি ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার নেই তার পক্ষে অপর কোনও ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমরা তাই অর্দ্ধেক জীবন ইংরাজির সঙ্গে কুস্তাকুস্তী করেও সে ভাষাকে কায়দা করতে পারিনে—ফলে অধিকাংশ সময় বি-এ এবং এম-এর মুখ এবং হাত থেকে যা বেরোয় তা ইংরাজি নয়, তার অপভ্রংশ—ইংরাজেরা যাকে বলেন Babu English. আমরা যদি পৃথিবীর যত জ্ঞান বিজ্ঞান বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা করি তাহলে দুটি তিনটি ইউরোপীয় ভাষা কেবল মাত্র ভাষা-হিসেবে শিক্ষা কর্‌বার সময় আমাদের হাতে যথেষ্ট থাকবে। বাঙ্গলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা হলে আমরা অবশ্য বক্তৃতায় Burke Bright-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারব না কিন্তু ইংরাজিতে কেরাণীগিরি এবং ওকালতী কর্‌তে পার্‌ব। সাংসারিক হিসেবেও তাতে আমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না, কেননা ইতিমধ্যে এদেশে এত Burke Bright জন্মগ্রহণ করছেন যে তাঁদের আর বংশবৃদ্ধির দরকার নেই। দেশ উদ্ধার যদি কথায় না হয় ত সে ইংরাজি কথাতেও হবে না। মুখস্থ বাক্য মাত্রেরই অন্তরে যে মন্ত্রশক্তি আছে—এ ভুল আমাদের এতদিনে ভাঙ্গা উচিত ছিল।

(৩)

আমাদের নবশিক্ষার ফলে আমরা যে জাতীয় অভ্যুদয় সাধন কর্‌তে পারিনি তার প্রমাণ আমাদের দেশহিতৈষীরা নিজের ছেলেকে কথার জাল বুন্‌তে শিখিয়ে আর-সকলের ছেলেকে তাঁতের কাপড় বুন্‌তে শিখতে বলেন। আমরা যদি স্বজাতির বাইরের না হোক মনের দৈন্যও দূর করতে পারতুম তাহলেও নয় আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে কতকটা অহঙ্কার করতে পারতুম। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমরা কিছু কর্‌তে অক্ষম বলেই এই ধুয়ো ধরেছি যে আমাদের জাতীয় মনের কোনরূপ দৈন্য নেই। যদি চিকিৎসা কর্‌তে না জানি তাহলে কারও রোগ নেই এই কথাটা বলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। এবং বিদ্যার অভাবে বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই আমরা দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আত্মার ঐশ্বর্য্যে আমাদের সমতুল্য জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই,—অতএব উপোস করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ কেননা খালি পেটের ভিতরই আত্মা বাড়বার স্থান পায়।

এ সব কথা বলায় আমরা এই সত্যেরই পরিচয় দেই যে, আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনকে আমাদের নবশিক্ষার ভাগ দিতে পারিনে, আমরা বিদ্যা-ধনে নিজেরা ধনী হইনি বলে, অপরকে তা দান কর্‌তে পারি নে। দেশের শিক্ষিত লোকেরা যে দশের শিক্ষক হননি তার কারণ আমরা এ শিক্ষা আনন্দসহকারে লাভ করিনি। বি-এ পাস করা আমাদের পক্ষে একটা দায় এবং কায়ক্লেশে সেই দায় হতে উদ্ধার লাভ কর্‌তে পারলেই আমাদের

মাথার উপর থেকে একটা ভার নেমে যায় এবং আমরা তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এই পাস-করার ফাঁড়া কেটে গেলে আমরা আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুমাত্র বিদ্যার চর্চ্চা করি—তার বাদবাকী অংশের সঙ্গে জন্মের মত বোকশোধ হই।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লেখাপড়া শিখতে যে কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়েছে তার হাত থেকে একবার অব্যাহতি পেলে আমরা লেখাপড়ার দিক্ দিয়েও আর ঘেঁস্‌তে চাইনে। পঠদ্দশায় আমরা যে, সরস্বতীকে নিত্য বলি—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—তার কারণ তিনি বিদেশিনী। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ কর্‌তে হয় বলেই আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিটে এত নিরানন্দ। যার ভিতর আনন্দ নেই তা আমরা নিজের মন থেকেই দূর করতেই যখন ব্যস্ত তখন অপরের মনে তা প্রবেশ করিয়ে দেবার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। এবং যাঁদের এরূপ সাধুসংকল্প আছে তাঁরাও সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত কর্‌তে অক্ষম। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ইংরাজির সাহায্যে আরোহণ করি বলে বাঙ্গলায় অবরোহণ কর্‌তে পারিনে। ইংরাজি সরস্বতী আমাদের জ্ঞানবৃক্ষের আগ্‌ডালে চড়িয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেন্। ফলে আমরা কেউ বা আইনের কেউ বা ডাক্তারির শাখায় বসে ফল পাতা যা পাই তাই খেয়ে জীবন ধারণ করি, অথচ দেশের মাটি নীচে পড়ে রয়েছে, যার আবাদ কর্‌লে ফলত সোনা। নবশিক্ষিত মনের যে কৃষিকাজ আসে না তার একমাত্র কারণ এই যে সে-মনকে মাতৃভূমির কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, মনের মাতৃভূমি হচ্ছে মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের প্রতিই দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে চেয়েছেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সুচরিতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার উদ্দেশ্য

প্রেমের নেশায় আমি বিভোর হই নাই; তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, আমার সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য,—এটুকু ভাল করিয়া আমার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলাম। সে তাহাতে কোন উচ্চবাচ্য করিল না।—এম্‌নি চুপচাপ থাকাই তাহার স্বভাব। তবে, বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সে ঘর-সংসারের কাযকর্ম্মে লাগিয়া গেল।

বিবাহ করিয়া আমি বাড়ী বদ্‌লাইলাম না। আমার বাড়ীতে ঘর ছিল দুখানি। বড় ঘরটির একধারে আপিশ-ঘর। মাঝখানে

বেড়া। ছোট ঘরটিতে আমরা শুইতাম; বন্ধুবান্ধব আসিলে এই ঘরেই অভ্যর্থনা হইত। আমার আসবাব-পত্র সামান্য—এমন-কি, সুচরিতার সেই পিসীদের চেয়েও খেলো।

স্ত্রীর সঙ্গে লুকেরিয়াও আমার সংসারে আসিয়াছিল।

দিন দু-টাকার বেশী সংসারের খরচ দেওয়া আমার পক্ষে যে অসাধ্য, এ কথাটা আগে থাকিতেই জানাইয়া রাখিলাম।—"আর, তিন বছরের ভিতরে আমি ষাট হাজার টাকা জমাতে চাই, এই আমার সংকল্প—বুঝেছ ?"

সে কোন আপত্তি তুলিল না।

কিন্তু আমি আর-যা-হই অবিবেচক নই। প্রতিদিন হাতখরচের জন্য আরও আনা-কতক পয়সা তাকে দিতাম; যাতে তার টানাটানি না হয়, সেদিকে আমার নজর ছিল না এমন নয়।

সে থিয়েটার দেখিতে ভালবাসিত। আমি বলিলাম, "দেখ, ফি-মাসে একবার করে আমি তোমাকে থিয়েটারে নিয়ে যাব। তার বেশী আর তুমি যেতে পাবে না।"

মনে হচ্ছে, সবসুদ্ধ বার-তিনেক থিয়েটারে গিয়াছিলাম। আমরা 'পিটে' বসিতাম। আমরা দুজনে একসঙ্গে থিয়েটারে যাইতাম, অভিনয় দেখিতাম, বাড়ী ফিরিতাম,—কিন্তু সে সবই নীরবে। হায়, কেন এ নীরবতা ?—তখনও আমাদের দুজনের ভিতরে ঝগড়া-ঝাঁটি কিছুই হয় নাই—তবুও এই নীরবতা!

মনে পড়ে, মাঝে মাঝে আমার দিকে সে আড়্‌চোখে চাহিয়া দেখিত;—সেই চুরি-করা চাহনি দেখিলে আমি বেশী করিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিতাম। আমারই ভয়ে সে মুখ খুলিত না—এ-জন্যে দায়ী আমিই! আবেগভরে আমাকে যখন-সে দুহাতে জড়াইয়া ধরিত, তখন দু-একটা সোহাগের কথা তার মুখ দিয়া উপ্‌চিয়া উঠিত। কিন্তু পাছে আমার স্বভাবের গাম্ভীর্য্য তরল হইয়া পড়ে এই ভয়ে আমি তার সেই চটুলতার প্রশ্রয় দিতাম না। প্রেমের প্রলাপ শুনিয়া তন্ময় হইবার বয়স আমার গেছে; তার সঙ্গে ছেলেখেলায় যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—আমি ও-সব ভালবাসি না; আমি তার গুরুজন, আমি চাই তার শ্রদ্ধা, তার সম্ভ্রম!

আমাদের ভিতরে ক্রমে মন-কষাকষি আর ঝগড়াঝাঁটির সূত্রপাত হইল। তবে বিবাদ-বিসংবাদ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না—কারণ ঝগড়ার আরম্ভেই আমরা কথাবন্ধ করিতাম। লক্ষ্য করিলাম, তার সেই কোমল মুখখানির উপরে দিন-দিন কেমন একটা ঔদ্ধত্যের, কঠোরতা ঘনাইয়া আসিতেছে। আমিও ক্রমে অভদ্র হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

সে গরীবের মেয়ে হইলে কি হয়! তার মনটা ছিল বেগমের মত। তাই, আমার সংসারের টানাটানিতে সে যখন-তখন নাক বাঁকাইত। না প্রিয়ে, আমি গরীব নই—সংসারী মানুষ মাত্র! বাজে খরচ আমার অসহ্য। এই সোজা কথাটা বুঝিলে না?

এতটা কড়াকড়ি সে পছন্দ করিত না। শেষটা আমার সঙ্গে থিয়েটারে যাইতেও আপত্তি করিত। কিন্তু তাহার বিমুখতা আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতাম না। ফলে, সেও যত বাঁকিয়া বসে, আমিও তত চুপ হইয়া যাই!

সবই কি আমার দোষ?—ভেবে দেখা যাক্! হ্যাঁ, ষোড়শী বালিকার সঙ্গে প্রৌঢ় পুরুষের মনের মিল হওয়া শক্ত বটে! রমণীর নিজের মধ্যে নিজস্ব বলিয়া কোন-কিছু নাই, তাইতো আমাদের এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। তবে, রমণী প্রেমরূপিণী বটে। সে যাকে ভালবাসে, তার নিষ্ঠুরতাকেও পূজা করে। এতে তার প্রেমের ও মহত্ত্বের লক্ষণ পাওয়া যায় স্বীকার করি, কিন্তু—নিজত্ব কোথায়? সেই কারণেই ত তারা কেবল দুঃখই পায়। তা যদি না হইবে তবে কি আমার স্ত্রীর মৃতদেহ আজ এখানে পড়িয়া থাকে!

তার প্রেমের উপর আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। সেই আন্তরিক, নিবিড় আলিঙ্গন কি ভুলিবার? হ্যাঁ, আমাকে সে ভাল বাসিত বটে, কিন্তু সে চাহিত প্রতিদানে আমিও তাকে তেমনি ভালবাসি—যেমন করিয়া আমায় সে ভালবাসে। আর এ কথাও বলি, মৌখিক ভালবাসা জানাইতে না পারিলেও আমি তাকে এমন-কিছু দুঃখ দিই নাই—যার জন্যে—যার জন্যে—না, থাক্—সে কথা আর তুলিয়া কাজ কি?

সমাজের লাঞ্ছনায় আমার মন জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। সমাজে আমি একঘরে। ষাট হাজার টাকা জমাইয়া এ-দেশ ছাড়িয়া যাইব। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের ছায়ায় আঙ্গুরের ক্ষেতে ঘর বাঁধিয়া শেষ ক'টা দিন নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া দিব। সেখানে সমাজের চোখ-রাঙ্গানি নাই। আমার অন্তরটিকে যে ভালবাসিবে, আমার সন্তানকে (ভগবান যদি দয়া করেন) যে ভাল-বাসিবে—এমন কোন প্রেমবতী, স্নেহময়ী গৃহিণী সেখানে সেই নির্জ্জনে আমার সঙ্গের সঙ্গিনী থাকিবে।

এ-সব মনের কথা মনে-মনেই ভাঙ্গা-গড়া ভাল।—কিন্তু বোকামি করিয়া তাকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম।

ষোড়শী রমণী সে,—তরুণ প্রাণটি তাহার নবীন যৌবন-শ্রী-তে পরিপূর্ণ ছিল; আমার জীবন-সংগ্রাম, আমার দুঃখযন্ত্রণা, আমার আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া সে বুঝিবে বল? জীবনের অভিজ্ঞতা তার কতটুকু?

আমার সেই অবিবেচনার ফল?—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই অসহ মৌনব্রত!

সব-চেয়ে সে বেশী গোলমাল করিত, আমার পোদ্দারী ব্যবসায় লইয়া। আমি কি এতই অর্থ-পিশাচ? যা প্রাপ্য তার বেশী একটা কাণাকড়িও যে আমি লইতাম না, এটা কি তার চোখে পড়িত না? হায়, এ পৃথিবীর অবিচার!

অনেক গুণে গুণী হইলেও সে কি নির্দ্দয়া, আমার প্রাণে সে কি ব্যথাই না দিয়াছে! কে বলিতে পারে, তাকে ভালবাসি নাই?—কে বলিতে পারে এ

আমাদের জীবন অভিশপ্ত, আত্মা অভিশপ্ত। এই অভিশপ্ত পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশী অভিশপ্ত কে? আমি—আমি! দেখ, আমার জীবন লইয়া প্রকৃতি ও নিয়তি কি নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়াছে!

এখন বুঝিতেছি, আমি কোথাও একটা গলদ করিয়া বসিয়াছি। এখন বুঝিতেছি —তখন বুঝি নাই।

আপনমনে বড়াই করিয়া বলিতাম, "আমি হচ্ছি দর্পী, কড়া মেজাজের লোক। আমার কোন নৈতিক পরিবর্ত্তনের দরকার নেই; যদি যাতনাই পেতে হয়, তবে সকলের অগোচরে, নিজেই মুখ বুঁজে সব সহ্য কর্ব্ব।"—সেই একগুঁয়েমির ফল, এই। এতে আর কোন ভুল নাই।

ভাবিতাম, "এখন বুঝছে না বটে, কিন্তু সময়ে সে আমার কদর বুঝবে। তখন আমার চরিত্র তার কাছে আর হেঁয়ালি বলে ঠেক্‌বে না, তখন সে নিচু হয়ে আমার দু পা জড়িয়ে ধর্‌বে।"—এই ছিল আমার মতলোব। তবু, এর মাঝে বোধ করি কিছু ভুল-চুক্ করিয়া ফেলাতে, আমার সব মতলোব ফাঁসিয়া গিয়াছে!

—থাক্, আর না—আর না! বিধাতার বিধান কে বদ্‌লাইবে? হা মানব! এ সংসার-পাথারে তুমি ক্ষুদ্র তৃণমাত্র—ভাসিয়া যাইতেই তোমার জন্ম!—কিন্তু সাহসী হও, দর্পী হও!

এস, এইবারে সব বলি শুন। সত্য প্রকাশ করিতে আর আমার ভয় নাই। এ তার দোষ—এবং, সব দোষ তার

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুচরিতার বিদ্রোহ

ঝগড়াটা কি-করিয়া বাধিল জান?

একদিন একটা বুড়ী আমার কাছে একটি সোনার পদক আনিল,—সেটি তার পরলোকগত স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন। আমি পদকটি একেবারে কিনিয়া নিতে চাহিলাম। বুড়ী কিন্তু হাপুস নয়নে ভাঙ্গা গলায় কান্না ধরিল; তার ইচ্ছা পদকটি আপাতত আমার কাছে বাঁধা থাকে—তাহা হইলে পরে সে জিনিষটি আবার উৎরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে। তাহাই হইল।

দিন-পাঁচেক পরে, একগাছা বালা লইয়া বুড়ী আবার আসিল। পদকটির বদলে সে আমাকে বালাগাছা রাখিতে বলিল। কিন্তু সেই কমদামের বালাগাছা পদকের বদলে রাখিতে আমার মন সরিল না।

আমাকে লুকাইয়া বুড়ী আমার স্ত্রীর কাছে গেল। তাহার স্বভাবটা বোধ করি, বুড়ী বুঝিতে পারিয়াছিল। স্ত্রীকে বলিয়া-কহিয়া বালা রাখিয়া সে পদকটি লইয়া গেল।

সেইদিনই ব্যাপারটা জানিতে পারিলাম।

আমার স্ত্রী একলাটি মেঝের দিকে চাহিয়া বিছানায় বসিয়া আপনমনে পা দুলাইতেছিল। তাহার মুখ অপ্রসন্ন—ওষ্ঠে, একটা তিক্ত হাসির রেখা।

খুব আস্তে-আস্তে শান্তস্বরে বলিলাম, "দেখ, টাকা আমার। আমি নিজের খুসিমত সংসার চালাব। বিয়ের আগে এ-সব কথা তোমাকে ত খুলেই বলেছিলাম

হঠাৎ সে সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তারপর,—স্বপ্নেও যা ভাবি নাই, তাই হইল!—বাঘিনীর মত আমার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমাকে সে দুই-হাতে এলপাতাড়ি মারিতে লাগিল!! বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম।

একটু পরেই আপনাকে সামলাইয়া লইলাম। তেমনি শান্তভাবেই বলিলাম, "আজ থেকে সংসারের কোন কথায় তুমি থাকতে পারবে না।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

সারাদিনের ভিতরে সে বাড়ীতে আসিল না। বিবাহের সর্ত্ত ছিল, আমার হুকুম ছাড়া সে বাড়ীর বাহিরে পা বাড়াইতে পারিবে না।—যাক্; সন্ধ্যা-নাগাৎ আমার স্ত্রী বাড়ীতে ফিরিল।

পরদিনও সেই ব্যাপার। সকালে সে চলিয়া গেল, বৈকালে ফিরিল।

দোকানপাট বন্ধ করিয়া আমি তার পিসীদের কাছে গেলাম। আমার স্ত্রী সেখানে নাই। তাহাদের কাছে সব খুলিয়া বলিলাম। তারা দুজনে ভঙ্গিভরে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি তাহলে দেখছি রীতিমত জব্দ হয়েছ।"—আমিও এমনি উত্তরের আশা করিয়াছিলাম।

যাহা হউক, পিসীদের একজনকে ঘুষ দিয়া হাত করিলাম। দুদিন পরে তার মুখে জানা গেল, এই ব্যাপারের সঙ্গে কর্ণেল এফিমোভিচের সংশ্রব আছে

কর্ণেল এফিমোভিচের সঙ্গে আমি এক সেনাদলে কাজ করিয়াছিলাম। আমাদের দুজনে একটুও বনিবনাও ছিল না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে কিসের সম্পর্ক তার? রাগে আমি কাঁপিতে লাগিলাম।

মাসখানেক আগে একটা কাজের অছিলায় কর্ণেল আমার দোকানে আসিয়াছিল। কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-মস্করা করাতে সেইদিনই তাকে বারণ করিয়া দিয়াছিলাম, সে-যেন ফের আমার দোকানে না আসে।

পিসী বলিল, "ও-পাড়ার জুলিয়াকে চেন ত? তোমার স্ত্রী তার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। কর্ণেল, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যে জুলিয়াকে হাত করেছে।"

আচ্ছা,—আমার চোখে ধুলা দেওয়া বড় সোজা কথা নয়! জুলিয়া যে ঘরে থাকে, গোপনে তার পাশের ঘরখানি ভাড়া লইলাম। ইতিমধ্যে আর-একটা ঘটনা ঘটিল।

রাত্রির আগেই আমার স্ত্রী ফিরিয়া আসিল।

বিছানায় বসিয়া পা দুলাইতে-দুলাইতে আমার দিকে সে গর্ব্বিতভাবে চাহিয়া রহিল!

আজ মাসখানেক হইতে সে-যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে! যেন সে সর্ব্বদাই ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত!

হঠাৎ তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে আমাকে বলিল, "তুমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাওনি বলে তোমাকে নাকি ফৌজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?"

—"হ্যাঁ, আমাকে অন্য এক সেনাদলে কাজ করতে বলা হয়েছিল। তাই আমি কাজে জবাব দি।"

—"তাহলে ভীরু বলে তুমি কর্ম্মচ্যুত হয়েছ ?"

—"লোকে তাই বলে থাকে বটে। কিন্তু আমি যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিনি—কাপুরুষতা তার আসল কারণ নয়।"—আমি তখন সবিস্তারে সমস্ত কথা বর্ণন করিলাম।

ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "শুন্‌লাম, ফৌজ ছেড়ে তুমি নাকি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে মেগে বেড়াতে ?"

—"হ্যাঁ, আমার মাথার উপর দিয়ে অনেক দুঃখের ঝড় বয়ে গেছে! সে ঝড়ে আমি একটু টলেছিলুম বটে,—কিন্তু একেবারে নরকে গিয়ে পড়ি নি! আজ আবার সে পুরোণো কথা কেন ?—সেদিন ত আমার চলে গেছে!"

—"হুঁ, এখন যে তুমি টাকার মানুষ,—মস্ত পোদ্দার!"

আমার ব্যবসার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সে আমাকে ছোট করিতে চায়!—তার যা-খুসি করুক্-গে,—স্ত্রীলোকের কথায় অধীর হওয়া উচিত নয়!

ঘণ্টাখানেক পরে সে সাজ গোছ করিয়া আসিল। আমার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "বিয়ের আগে এ-সব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও তুমি ত আমাকে বল নি!"

আমি তার কথায় কাণ দিলাম না,—সেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা লুকাইয়া-লুকাইয়া জুলিয়ার বাড়ীতে গেলাম। যে ঘরখানা ভাড়া লইয়াছিলাম, তার পাশেই জুলিয়াদের বৈঠকখানা; মাঝে দেওয়াল,—তাহাতে একটি দরজা। আমি সেই দরজায় কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার পকেটে একটা গুলি-ভরা পিস্তল ছিল।

দরজার আড়ালে দুইঘণ্টাকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিলাম।

সেই লম্পট কর্ণেলকে যে কথাগুলি সে বলিল, তাহা কি সহজ, কি সরস, কি সতেজ! কর্ণেলের প্রেম-জানানো ভাব-ভঙ্গি হা-হুতাশ, মিনতি, সে দু-কথায় হাসি-টিটকারির চোটে উড়াইয়া দিল। শেষকালে মরিয়া হইয়া কর্ণেল আমার স্ত্রীর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িল।

আমার মনের ধোঁকা তখনও যায় নাই; ভাবিলাম—এ-সব হচ্ছে মেয়েলি ঢং! সে তার কদর বাড়াইতে চায়, কর্ণেলের কাছে, তাই সে সহজে আত্মসমর্পণ করিতে রাজি নয়!

কিন্তু, একটু পরেই আমার ভ্রম বুঝিলাম; না, তাহার চরিত্র দিনের আলোর মত পরিষ্কার, তাহাকে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই,—সে সতী, ফুলের মত নির্ম্মল!

সংসারে অনভিজ্ঞা, এই সরলা বালিকা, মনে-মনে আমাকে ঘৃণা করে; তাই এ হাঙ্গামার সঙ্গে না-জানিয়া আপনাকে সে জড়াইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু ব্যাপারটা সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইবামাত্র তাহার চোখ খুলিয়া গিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল, আমাকে কোন রকমে অপদস্থ করিবে।—কিন্তু যখনি সে বুঝিয়াছে, আমাকে আহত করিতে আসিলে তাহার অমল স্বভাবও অনাহত থাকিবে না, তখনি সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কর্ণেলের কাকুতি-মিনতিতে তার মন একটুও ভিজিল না। বরং চোখা-চোখা বাক্যবাণে, কর্ণেলকে সে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

তখন সবদিকে হতাশ হইয়া, এই অসভ্যটা এমনি রাগিয়া উঠিল যে, আমার ভয় হইতে লাগিল, এইবারে বুঝি-বা সে আমার স্ত্রীকে মারধর করিয়াই বসে!

বন্ধুর মত সহজভাবে, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম। আমার মনের সব ময়লা ধুইয়া গিয়াছে; আমাকে ঘৃণা করিলেও সে যখন অসতী নয়—তখন করুক্ আমাকে ঘৃণা—কি তাতে আসে যায়?

হঠাৎ তাদের ঘরের দরজা খুলিয়া দিলাম। কর্ণেল তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। আমি সোজা গিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলাম, "এস, বাড়ী এস।"

কর্ণেল ততক্ষণে বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সাম্‌লাইয়াছে। সে চেঁচাইয়া বলিল, "নিয়ে যাও বাবা, নিয়ে যাও! যদিও কোন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে চাইবে না—তবু—"

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই আমরা ঘর থেকে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার স্ত্রী কোন আপত্তি করিল না,—সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া সে-যেন একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছে! কিন্তু তার এ ভাবটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না।

বাড়ীতে আসিয়া সে একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িল। তারপর স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। তার মুখ খড়ির মত শাদা। কিন্তু, তখনও তাহার চক্ষে সেই দর্পিত দৃষ্টি এবং ওষ্ঠে সেই নিষ্ঠুর হাস্যের আভাস! সে-যেন ঠিক করিয়াছে, আমি তাকে গুলি করিয়া মারিব!

পিস্তলটা পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিলাম। সেইদিকে সে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। আমার কাছ থেকে সেও পিস্তল ছুঁড়িতে শিখিয়াছিল।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। রাত তখন এগারোটা। আমার শরীরটাও কেমন এলাইয়া পড়িয়াছিল।

আরও ঘণ্টাখানেক সে যেখানে ছিল, সেইখানেই মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। তারপর পোষাক পরিয়াই সোফার উপরে শুইয়া পড়িল। এই প্রথম সে আমাকে ছাড়িয়া একলা ঘুমাইল।—এ-টুকু মনে রাখিবার কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুঃস্বপ্নের স্মৃতি

তারপর সেই ভীষণ ঘটনা!

আমার ঘুম যখন ভাঙ্গিয়া গেল, ঘরের ভিতরে তখন ভোরের আলো ঢুকিয়াছে।

একেবারে সজ্ঞানে জাগিয়া উঠিলাম। চোখ চাহিয়াই দেখি, আমার স্ত্রী টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া—তাহার হাতে পিস্তল। আমি যে জাগিয়াছি, সে তা দেখে নাই। হঠাৎ সে আমার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। আমিও অমনি চোখ মুদিলাম।

বিছানার পাশে আসিয়া আমার উপরে

সে ঝুঁকিয়া পড়িল। আমি সব শুনিতে পাইতেছি। নীরবতা যেন থম্‌থম্ করিতেছে —সে নীরবতাও যেন কাণ পাতিয়া শোনা যায়!

সে একটু নড়িল; ভয়ে-বিস্ময়ে আচম্‌কা আমার চোখের পাতা খুলিয়া গেল! সে-ও আমার চোখের দিকে চাহিল,— পিস্তলের নলী তখন ঠিক আমার রগের উপর! চকিতে দুজনের চাহনি মিলিল! প্রাণপণে আবার আমি চোখ মুদিলাম। যা-থাকুক কপালে,—আর চোখ চাহিব না, আর নড়িব না,—না, কিছুতেই না!

প্রথম ঘুম ভাঙ্গিলেই লোকে প্রায়ই একবার মাথা তুলিয়া চোখ চাহিয়া দেখে, —আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আমাকে চোখ মুদিতে দেখিয়া আমার স্ত্রীও ভাবিল, আমি নিশ্চয়ই ঘুমাইতেছি। নহিলে, এমন ব্যাপার দেখিয়াও কেউ কি কখনো চোখের পাতা মুদিতে পারে?

কথায় আছে, গভীর খাদের ধারে, খুব উঁচু পাহাড়ের টঙ্গে গিয়া দাঁড়াইলে, নিচে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য লোকের মনে একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে।

আমার নিজেরও বিশ্বাস, সঙ্গিন মুহূর্ত্তে কেবলমাত্র অস্ত্র হাতে লওয়ার দরুণই, পৃথিবীতে নিত্য এত হত্যা ও আত্মহত্যা ঘটে।—ঠিক সময়টিতে যদি লোকের মতি অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তবে অনেক দুর্ঘটনা নিবারণ করা যায়। আমি যে সব দেখিয়াছি এবং দেখিয়াও তাহার হাতে যে মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি, আমার স্ত্রী যদি এমন অনুমানও করে, তবে সে গুলি না চালাইতেও পারে।

সেই নিষ্ঠুর স্তব্ধতা!—হঠাৎ আমার চুলের তলায় ইস্পাতের শীতল স্পর্শ অনুভব করিলাম। আর কি আমি বাঁচিব? সে আশা খুব কম। আর, যে নারীকে প্রাণের মতই ভালবাসি, সেই নারীই যদি আমার প্রাণ নিতে চায়, তবে কি কাজ সে ছার প্রাণে?

সে যদি বুঝিয়া থাকে যে আমি ঘুমাইয়া নাই, তবে বুঝুক, কাপুরুষতার অপবাদে ফৌজে আমার কাজ গেলেও, আমি কাপুরুষ নই।

আচ্ছা, আমি তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করি নাই কেন? কি-জানি! তারপরেও যতবার কথাটা ভাবিয়াছি, ততবারই আমার বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে! আমার আর কি আছে, যা বাঁচাইতে চাহিব?—আমার আত্মা তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।—কি বাঁচাইব, কিসের জন্য? আমার সে ভগ্নহৃদয়ের ব্যথা বুঝিবে, এমন মরমী কে আছে?

—পলকের পর পলক যাইতেছে, কিন্তু ঘরের সে নীরবতা মৃত্যুর মত স্থির হইয়া আছে! আমার প্রাণের তলে তলে চেতনা যেন উথলিয়া উঠিতেছিল! কপালের উপরে পিস্তলটা তখনও মরণাগ্নি উদ্গারের জন্য প্রস্তুত!

চকিতে প্রাণে আশার চমক লাগিল। হঠাৎ চোখ মেলিয়া দেখি,—আমার স্ত্রী

আর ঘরে নাই! একলাফে শয্যা ছাড়িয়া উঠিলাম। আমারই জিৎ! তাকে আমি চিরকালের তরে হারাইয়া দিয়াছি!

পাশের ঘরে গিয়া নীরবে টেবিলের সামনে বসিয়া পড়িলাম। এবং চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলাম।

খানিকপরে তাহার দিকে চাহিলাম। তার মুখ যেন মড়ার মুখ! খরচোখে তাহার দিকে তাকাইয়া আছি দেখিয়া আপনার পাণ্ডুর ওষ্ঠে সে একটু মৃদু হাস্ত আনিবার চেষ্টা করিল। তার ভাব দেখিলে বোধ হয়, সে-যেন মনে-মনে নাড়াচাড়া করিতেছে যে, সেই ভয়াবহ দৃশ্য আমি দেখিতে পাইয়াছি কিনা?

খাওয়া-দাওয়ার পর বাজার হইতে একখানা লোহার খাট ও একটা পর্দ্দা কিনিয়া আনিলাম। শয়ন-কক্ষের পাশের ঘরে সেই লোহার খাটখানা পাতিয়া উপরে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দিলাম। আজ থেকে আমার স্ত্রী এইখানে শয়ন করিবে,—যদিও কথাটা তাকে মুখ ফুটিয়া আর বলিলাম না।

এই নূতন বন্দোবস্ত দেখিয়া সে বুঝিল যে, আমি সব দেখিয়াছি, সব জানিয়াছি। সে রাতেও টেবিলের উপরেই পিস্তলটা তেমনি ফেলিয়া রাখিলাম।

সে তার নূতন বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। আমাদের বিবাহের বাঁধন আজ থেকে টুটিয়া গেল। তাকে জয় করিলাম বটে, কিন্তু ক্ষমা করিলাম না। রাত যত ঘনাইয়া আসে, সে-ও তত ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। সকালে তাহার খুব জ্বর আসিল। এইভাবে সাতটি সপ্তাহ জ্বরের ঘোরে সে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

(ক্রমশ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

দাঁড়িপাল্লা

তুলাদণ্ড—সাদাকথায় যার নাম দাঁড়ি-পাল্লা, সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এই তুলাদণ্ড যে কত-রকমের আছে এবং দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে ইহার যে কত বৈচিত্র্য তাহা আমাদের সকলের জানা না থাকিতে পারে। সেইজন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

হাটে বাজারে দোকানী পসারীর কাছে সাধারণত যে দাঁড়িপাল্লা থাকে তার কথা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার গঠন, তাহার ওজনপ্রণালী মোটা-মুটি আমাদের সকলেরই জানা আছে। এবং যাঁহার জানা নাই তাঁহার যে এ ভবের হাটের ষোলো-কড়াই কাণা তাহাতে সন্দেহ নাস্তি।

যেখানে সাহিত্য, শিল্পকলা লইয়া আলোচনা চলিতেছে সেখানে হঠাৎ দাঁড়ি-পাল্লার কথা তোলাতে অনেকে আশ্চর্য্য

হইতে পারেন এবং আমাকে বেরসিক ঠাওরাইতে পারেন। কিন্তু ওজন জিনিষটা সাহিত্য-ব্যাপারীদের কাছে কি নিতান্তই তুচ্ছ? আজকাল তো সাহিত্যসমালোচকদের মুখে শোনা যাইতেছে যে সাহিত্যে আমাদের ওজন-জ্ঞানের ভারি অভাব।

কোন্ ওজনে সাহিত্যের মাপ হয় সেই গূঢ় সন্ধানটি দিতে পারিলে খুসী হইতাম। কিন্তু আপাতত যখন তাহা পারিতেছিনা তখন এই স্থূল জিনিষের ওজন লইয়াই আলোচনা করা যাক।

দুপাশে দুই পাল্লা দিয়া দাঁড়ির দুইধারে তাহা ঝুলাইয়া এবং দাঁড়ির ঠিক মাঝখানে একটা মাপকাঠি রাখিয়া সাধারণত জিনিষ ওজন করা হয়। ছোট জিনিষ ওজন করিবার জন্য হাতে-ধরা দাঁড়িপাল্লা এবং বড় ভারি জিনিষের জন্য কোন শক্ত জিনিষ হইতে ঝোলানো দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হয়। একপাল্লায় ওজন, আর-একপাল্লায় জিনিষ রাখিয়া, দুই পাল্লা সমান হইলে ঠিক ওজন হইল ধরা হয়। অবশ্য এই সহজ ব্যাপারটার মধ্যেও ছল-চাতুরী চলিতে পারে। একটা আঙুলের টিপনি কিম্বা পাল্লাকে দোল খাওয়াইয়া ওজন চুরি চলে। সে সব কথায় আমাদের কাজ নাই, যাঁহারা এই ছল-চাতুরীতে ঠকিতেছেন এবং যাঁহারা এই দুনিয়া হইতে ছলচাতুরী দূর করিতে চান তাঁহারা ঐ কথা লইয়া আলোচনা করুন; আমি কেবল দাঁড়িপাল্লার গঠন লইয়াই ব্যাপৃত থাকিব।

মোটা জিনিষের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ মোটারকমের দাঁড়িপাল্লায় চলে কিন্তু সূক্ষ্ম জিনিষের জন্য সূক্ষ্ম-গড়নের দাঁড়িপাল্লা অর্থাৎ নিক্তির দরকার। এই নিক্তির ওজনে তিল পরিমাণ, এমন কি তার চেয়েও কম, এদিক-ওদিক না হয় তার জন্য অনেক কৌশল করা হইয়াছে। আশপাশের বাধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তবে এই সব নিক্তি তৈরি হইয়াছে। দাঁড়িপাল্লার দাঁড়িতে যে তিনটি (দুই পাল্লার দুই এবং মাঝের মাপকাঠির এক) বন্ধন আছে তাহাতে ঐ তিন স্থানে আটক খাইয়া দাঁড়ির নড়াচড়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া ওজনের দোষ হইতে পারে, সেইজন্য দাঁড়ির একমুখে ধারাল ইস্পাত (wedge) 'ওএজে'র আকারে এবং আর-এক মুখে মসৃন অথচ শক্ত কোনরকম পাথর দিয়া উহার গতি সহজ করিয়া দেওয়া হয়; আর হাওয়াতে নড়া বন্ধ করিবার জন্য কাচের বাক্সের মধ্যে ওজন করা হয়; এমন কি ভ্যাকুঅমের মধ্যে, অর্থাৎ হাওয়া সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া কোন-কিছুর মধ্যেও ওজনের ব্যবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য এইরূপ সূক্ষ্ম ওজনের দরকার। এইরূপ তুলাদণ্ডের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়। নয়ত তাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পাল্লা দুইটি শূন্যে ঝুলিতে থাকিলে ক্রমাগত উঠিতে-নামিতে থাকে, কাজেই ওজন ঠিক করা শক্ত হয়, সেইজন্য পাল্লাদুটিকে সমতল স্থানে রাখিয়া তাহার উপর একসঙ্গে ওজন ও জিনিষ চাপাইয়া তারপর পাল্লাদুটিকে শূন্যে তুলিবার ব্যবস্থা করিলে ওজনের সুবিধা হয়।

সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ওজন নির্ণয় করিবার জন্য এইরূপ অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে।

টাকশালে একপ্রকার অদ্ভুত রকমের তুলাদণ্ড আছে। তাহাকে আটোমেটিক স্কেল অর্থাৎ স্বাধীন বা স্বতশ্চল তুলাদণ্ড বলা যাইতে পারে। রূপার পাত প্রস্তুত করিয়া একটা কলে চালিয়া দেওয়া হয়; সেখানে ছাপ্ খাইয়া গোল গোল টাকা প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে থাকে; যদি কোনকারণে কোন টাকার কিছু দোষ থাকিয়া যায়, কিম্বা ওজন যদি কম-বেশি হয় তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক টাকার পরীক্ষা হইয়া থাকে। ওজনের জন্য একটা চোঙের মধ্যে অনেক টাকা একটির উপর একটি —এইভাবে সাজান হয়। কলের মধ্যে একটি একটি করিয়া টাকা আপনা-হইতে পাল্লার উপর গিয়া পড়ে। যদি ওজন ঠিক হয় তবে টাকাটি ঠিক নিচে একটি পাত্রের উপর পড়ে; যদি বেশি ওজন হয় তাহা হইলে দক্ষিণ দিক দিয়া গড়াইয়া একটি চোঙের মধ্য দিয়া অপর এক পাত্রে পড়ে। সেইরূপ হাল্কা টাকাগুলি বাম ধারে পড়িয়া আর এক পাত্রে জড় হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা এই কলে একটি-একটি করিয়া টাকা তুলাদণ্ডের পাল্লার উপর আসিয়া পড়ে, অল্পক্ষণ তাহার উপর থাকে এবং ওজন হইয়া যে-ধারে পড়া উচিত, সেই ধারে গিয়া পড়ে। কলে ওজন ঠিকমত হইতেছে কিনা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, কলের কোন প্রকার দোষ হইলেই ওজন ভুল হইবে না। প্রত্যেক কল একঘণ্টা বা দুইঘণ্টা অন্তর পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার পদ্ধতি এই :— অন্য দাঁড়ি-পাল্লায় কয়েকটি টাকা আগে ওজন করিয়া দেখা হয়; তারপর সেই টাকাগুলি কলের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হয় যে ভারি টাকা ভারির দিকে, আর সমান টাকা সমানের দিকে আর হাল্কা টাকা হাল্কার দিকে যাইতেছে কিনা। কলের দোষ হইলে তাহা শুধরাইবার উপায় আছে। এই কার্য্যের জন্য শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার মিস্ত্রি আছে।

তুলাদণ্ডের অনেক প্রকার আকার আছে। স্প্রিংএর সাহায্যে একপ্রকার তুলাদণ্ড নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কোন প্রকার ধাতুনির্ম্মিত সরু বা মোটা তারকে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া এক বা কয়েক ফের করিলে স্প্রিং তৈয়ারি হয়। কোন-একটি স্প্রিংকে চাপিয়া ছোট করিতে বা টানিয়া বাড়াইতে ভার লাগে। নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ওজনের ভার চাপাইয়া বা টানিয়া স্প্রিং কতটা চাপিয়া বা কতটা বাড়িয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া স্প্রিং-সংযুক্ত একটি প্লেট বা পাতে তাহার চিহ্ন করা হয়। সেই চিহ্নের পাশে সেই ওজন লেখা থাকে। এইরূপ তুলাদণ্ডের সাহায্যে চিঠিপত্র বা ডাকের পার্শেল ওজন হইয়া থাকে। অনেক সময় ডাক্তারেরাও এইরূপ তুলাদণ্ডের সাহায্যে রোগীর বা যে-কোন মানুষের দেহের ওজন নির্ণয় করিয়া থাকেন। এইরূপ তুলাদণ্ডের দোষ এই যে, স্প্রিং আল্‌গা হইয়া গেলে আর ঠিক ওজন পাওয়া যায় না।

দুইপাশে দুইটা নয়, কেবল একপাশে

একটা পাল্লা দেওয়া একরকম তুলাদণ্ড আছে। এইরূপ তুলাদণ্ডের ব্যবহার উড়িষ্যা-প্রদেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ডক্টর বি, এল, চৌধুরি মহাশয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গঞ্জাম জিলায় রম্ভা নামক স্থানে এবং পুরীর এলাকাধীন চিল্কাহ্রদের নিকটবর্ত্তী বকুল নামক স্থানে এইরূপ তুলাদণ্ডের ব্যবহার দেখিয়া আসিয়া তাহার বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণল নামক মাসিকপত্রের ১১।১ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি রম্ভার এইরূপ দুইটি তুলাদণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। সে-দেশে ইহার নাম বিশাডাঙ্গা। ইহা ভারি ও শক্ত শালকাঠের তৈয়ারি। কাট অর্থাৎ দণ্ডটি গোল; একদিকে মোটা হইতে ক্রমশ অপর দিকে সরু হইয়া আসিয়াছে। সরু দিকের প্রায় শেষভাগে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে একটি পাল্লা ঝুলান থাকে। বেত বা কঞ্চি বা বাঁখারি দিয়া পাল্লাটি তৈয়ারি হয়। দড়িটির উপরে ১৭টি গোল দাগ কাঠকে বেষ্টন করিয়া কোঁদা আছে। ৬, ১১, ১৩, এবং ১৬ নং দাগে একটি করিয়া × এইরূপ চিকা দাগ আছে। কোন জিনিষ ওজন করিতে হইলে পাল্লাতে তাহা রাখিয়া কাঠিটি অর্থাৎ দণ্ডটি একটি দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া ধরিতে হয়। দড়িটি সরাইয়া সরাইয়া দেখিতে হয় কোন্ দাগের উপর রাখিলে দণ্ড ঠিক সোজা থাকে। প্রত্যেক দাগের একটা ওজন নির্দ্দিষ্ট আছে। নং১ প্রথম দাগ—কোন ওজন হয় না। ইহা পাল্লার পাষাণস্বরূপ।

২ দ্বিতীয় দাগ		১ পল	অর্থাৎ	৬ তোলা	
৩ তৃতীয়	”	২ ”	বা	১২	”
৪ চতুর্থ	”	৩ ”		১৮	”
৫ পঞ্চম	”	৪ ”		২৪	”
৬ ষষ্ঠ	” ×	৫ ”		৩০	”
৭ সপ্তম	”	৬ ”		৩৬	”
৮ অষ্টম	”	৭ ”		৪২	”
৯ নবম	”	৮ ”		৪৮	”
১০ দশম	”	৯ ”		৫৪	”
১১ একাদশ	” ×	১০ ”		৬০	”
১২ দ্বাদশ	”	১১ ”		৭২	”
১৩ ত্রয়োদশ	” ×	১৫ ”		৯০ অর্থাৎ আধ বিশা	
১৪ চতুর্দ্দশ	”	১৮ ”		১০৮	”
১৫ পঞ্চদশ	”	২০ ”		১২০	”
১৬ ষোড়শ	”	২৫ ”		১৫০	”
১৭ সপ্তদশ	”	৩০ ”		১৮০ বা ১ বিশা	

দণ্ডে দাগ করিবার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ওজনের জিনিষ পাল্লায় রাখিয়া পরীক্ষা করা হয় এবং দণ্ডের যে স্থানে দড়ি ধরিলে সেই ওজনের জিনিষ লইয়া দণ্ড ঠিক সোজা থাকে সেই স্থানে দাগ করা হয়। উপরে যে ওজনের পরিমাণ দেওয়া হইল তাহার। দাগ দণ্ডের মোটা দিক হইতে আরম্ভ। কোন কোন বিশা ডাঙ্গায় ২০ পল (অর্থাৎ ১২০ তোলা) বা ১৮ পল (অর্থাৎ ১০৮ তোলা) অবধি মাপ থাকে। চৌধুরী-মহাশয় অনুমান করেন যে, যে-সব দেশে উড়িয়া ভাষার অধিকার সেই-সব দেশে বিশা ডাঙ্গার ওজন প্রচলিত আছে।

এই ধরণের তুলাদণ্ড ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়। ইহার কয়েকটি নমুনা কলিকাতার যাদুঘরে আছে। ছোটনাগপুরের একটি তুলাদণ্ড সেখানে আছে। উহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা এক ফুটের চেয়ে কিছু-বেশি লম্বা। ভারি শাল-কাঠের তৈয়ারি। দণ্ডটি দুইভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ গোল ও মোটা, অপর ভাগটিও গোল কিন্তু সরু, এবং সেই ভাগ শেষের দিকে আরও সরু হইয়া গিয়াছে। এই সরু ভাগটিকে বেষ্টন করিয়া ছয়টি গোল দাগ আছে। সরু ভাগের শেষদিকে এক ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের মধ্যে দড়ি ঢকাইয়া তাহাতে পাল্লা ঝুলান হয়। পাল্লাটি পাতলা চেপটা কাঠের তৈয়ারি, তাহার চারি কোণে চারিটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলির মধ্যে সুতা প্রবেশ করাইয়া সেই সুতাগুলি একত্র করিয়া দণ্ডের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া আটকানো আছে। ছয়টি যে দাগ আছে তাহার প্রথম দাগে দড়ি দিয়া দণ্ডটি ঝুলাইলে পাল্লার ওজনে দণ্ড সোজা থাকে। দ্বিতীয় দাগে ধরিলে দুই তোলা ওজন খাওয়াইলে দণ্ড সোজা থাকে। এইরূপ তৃতীয় দাগে চারি তোলা, চতুর্থ দাগে ছয় তোলা, পঞ্চম দাগে আট তোলা, ষষ্ঠ দাগে বার তোলা ওজন হয়। এই দণ্ডের গড়ন বড় মোটা, অপরিষ্কার।

ঢাকা হইতে এইরূপ এক তুলাদণ্ড পাওয়া যায়; তাহা কলিকাতায় যাদুঘরে আছে। তাহার মাপের চিহ্ন ঠিক ছোট-নাগপুরের দণ্ডের মত। কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলে উঁচুদরের কারিগরি দেখা যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উড়িষ্যা দেশে প্রচলিত বিশাডাঙ্গা নামক তুলাদণ্ডের অনুরূপ তুলাদণ্ড অর্ক্নি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ফেরো দ্বীপের অসভ্য জাতিদের ভিতর প্রচলিত আছে। নিকটবর্ত্তী স্কাণ্ডিনেভিয়ার অপর অপর প্রদেশেও এইরূপ তুলা-দণ্ডের ব্যবহার চলে। সেখানে ইহার নাম বিশ্‌মের বা বিশ্‌মার। উড়িষ্যার বিশাডাঙ্গা নাম এই নামের অনুরূপ। পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ আছে কি না জানিবার উপায় নাই। বিশাডাঙ্গা এই শব্দের উৎপত্তি সন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, ২০ পলে এক বিশা হয়, এই পল উড়িষ্যার মধ্যে সর্ব্বত্রই ছয় তোলা; সংস্কৃত ভাষায় বিংশ শব্দের অপভ্রংশ বিশা শব্দ হইতে পারে কিন্তু উড়িষ্যার সর্ব্বত্রই সংস্কৃত বিংশের পরিবর্ত্তে বিশ না বলিয়া কুড়ি বলা হইয়া থাকে। কাজেই বিশাডাঙ্গার 'বিশা' বিংশের অপভ্রংশ না হইতেও পারে।

উড়িষ্যা-প্রদেশের যে বিশাডাঙ্গার কথা বলা হইল, সামান্য দোকানদার ও গ্রামের লোকেরাই তাহার সাহায্যে ওজন করিয়া থাকে। মহাজন ও বড় ব্যবসাদারেরা এখানকার প্রচলিত দাঁড়িপাল্লার মত তরাজুতে করিয়া সকল জিনিষ ওজন করিয়া থাকে। গ্রামবাসীদের মধ্যে আর-একপ্রকার ওজন প্রচলিত আছে। ইহাতে দাড়িপাল্লার প্রয়োজন হয় না। কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট মাপের পাত্র থাকে ও সেই পাত্রে সেই

মাপের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মাপ দাগ দিয়া চিহ্নিত করা থাকে। এইরূপে মাপ করিয়া চাল, দাল, ধান, গুড়, ঘি, দুধ, আটা ইত্যাদি খুচরা বিক্রয় হইয়া থাকে। এই মাপের নাম অদ্ধা বা ওদ্ধা। সচরাচর ফাঁপা বাঁশের এক টুকরা লইয়া এই অদ্ধা তৈরি করা হয়। গাঁটের কাছে একমুখ বন্ধ থাকে, আর-এক মুখ খালি থাকে। ইহা আমাদের দেশের কুন্‌কের অনুরূপ। উড়িষ্যা দেশে মহাজনেরাও অদ্ধা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের অদ্ধা লোহার তৈরি। এক অদ্ধার মাপ ৮৮ তোলা। সরকারি কারখানায় ইহার মাপ পরীক্ষা করিয়া মাপের সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ ছাপ মারিয়া দেওয়া হয়। এইগুলি ১/০ (সতের আনা) দামে কারখানায় বিক্রয় হয়। গ্রামবাসীরা যে অদ্ধা ব্যবহার করে তাহার মাপ আলাদা। ঘি, দুধ, চাল, ইত্যাদি মাপিবার জন্য যে অদ্ধা ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম সিকা-অদ্ধা ও তাহার ওজন ৭৩ তোলা। কিন্তু ধান, তেল, গুড় ইত্যাদি দ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য যে অদ্ধা ব্যবহার হয়, তাহার নাম বিক্কা-অদ্ধা অথবা পুলুসা-অদ্ধা; তাহার ওজন ৬৪ তোলা। অদ্ধার কম ও বেশি ওজনের মাপও আছে। রম্ভা ও বালুগাঁতে নিম্নলিখিত মাপ চলিত ঃ—

৪ অদ্ধা (বাঁশের)—১ তুম্বার সমান। এই তুম্বা কাঠের তৈয়ারি।

৪ তুম্বা—১ লউটির সমান। এই পাত্র মাটি বা তামার হয়।

২০ লউটি—১ ভরন

৩ ভরন—১ গাড়ি

২ পে—১ প

২ প—১ অদ্ধা সোলা

২ সোলা—১ বুদ বা বোরা

২ বোরা—১ অদ্ধা ৬৪ বা ৬৮ তোলা

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দাঁড়িপাল্লা বাঙ্গলার কোন কোন গ্রামেও ব্যবহৃত হয়।

রেলওয়ে-ষ্টেসনে বা বড় বড় কারখানায় মাল ওজন করিবার জন্য যে 'প্লাটফর্ম স্কেল' নামক তুলাদণ্ডের ব্যবহার হয় তাহার নির্ম্মাণ-প্রণালী কতকটা জটিল। কিন্তু ইহার ওজনের বন্দোবস্ত কতকটা পূর্ব্বোক্ত গ্রাম্য দাঁড়িপাল্লারই অনুরূপ। 'প্লাটফর্ম স্কেলে'র একটা 'ফ্রেম' আছে। ফ্রেমটা এইরূপ ঃ—চৌকা একটা লোহার তলায় চার কোণে চারটা চাকা। সেই চাকার সাহায্যে 'স্কেল'কে সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। যেখানে নাড়ানাড়ি করিবার আবশ্যক না থাকে সেখানে চাকা থাকে না। সেই চৌকা লোহাটার সঙ্গে একটা নলের মত লোহা খাড়া করা থাকে। পূর্ব্বোক্ত চৌকা লোহাটার ঠিক নিচে তাহার সঙ্গে ঠেকান আর একটা লোহা থাকে সেইটা পাল্লার কাজ করে। সেই নিচের লোহাটার একপাশে একটা শিকলি বা দড়ির মত কিছু দিয়া, সেটা খাড়া লোহাটার মাথায় একটা আঙটায় ঝুলান থাকে; দড়ি বা শিকলিটা আঙটা হইতে খাড়া নলটির মধ্য দিয়া গিয়া নিচের লোহার সঙ্গে লাগান থাকে। নলের মত খাড়া লোহাটার মাথা থেকে বাঁকাইয়া সেটাকে পাশের

দিকে রাখা হয়। এই অংশটুকু নলের মত নয়,—যেন একটা পুরু লোহার পাত নলের সহিত যুক্ত। ইহা 'ফ্রেমে'র অঙ্গ। যে আঙটার কথা বলা হইয়াছে সেই আঙটার সঙ্গে লাগান দুটা 'রড' আছে। প্রথম 'রড'টি রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা চাপিয়া ফ্রেমের শেষভাগে একটা আঙটায় আটকাইয়া দিলে নিচের পাল্লাটা উঁচু হইয়া শূন্যে ঝুলিতে থাকে, তখন তাহাতে ওজন করা যায়। চাপিয়া ও আটকাইয়া না দিলে সে 'রডে' যুক্ত শিকল বা দড়ি ঝুলিয়া পড়ে ও পাল্লাটি মাটিতে বা মাটিসংলগ্ন লোহায় ঠেকিয়া পড়ে, তখন ওজন করা যায় না। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন ওজন করিতে না হইবে তখন পাল্লাকে ঝুলাইয়া রাখিলে পাল্লা জখম হইয়া যাইতে পারে; সেইজন্য পাল্লাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। অপর 'রড' বা দাঁড়িটিতে কি কাজ হয় এইবার বলা যাক। যে পাল্লার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক উপরের লোহার পাতের সঙ্গে ঠেকিয়া থাকিলে তাহার উপর মাল রাখিলে পাল্লাতে ভার পড়ে। সেই ভাবে এই দ্বিতীয় 'রড'টি উঁচু হইয়া পড়ে; কারণ পাল্লার সহিত ইহা দড়ি বা শিকলি দিয়া আটকান থাকে। এই দ্বিতীয় 'রড'টীর শেষদিকে ওজন চাপাইলে উহা ফের নামিয়া পড়ে। পাল্লার ওজন ও এই ওজন দুই সমান হইলে 'রড'টি সোজাভাবে থাকে, উঁচু বা নিচু হয় না। 'রডে'র শেষ ভাগে ওজন ঝুলাইয়া দিলে ওজন জানা যায়। তাহা ছাড়া 'রডে'র উপরে একটা ছোট ওজন থাকে, সেটাকে 'রডে'র উপর সরাইয়া সরাইয়া দিলে ওজনের কম-বেশি বুঝা যায়। 'রডে'র উপর চিহ্ন করা থাকে, সেই চিহ্ন হইতে ওজন বুঝা যায়। পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া এই ওজনের দাগ করা হয়। মাত্র এই দাগগুলিই পূর্ব্বোক্ত গ্রাম্য দাঁড়িপাল্লার দাগের অনুরূপ। অন্য কোন বিষয়ে এই দুই দাঁড়িপাল্লার মিল নাই।

সাধারণ ও গ্রাম্য দাঁড়িপাল্লার সহিত তুলনা করিলে এই 'প্লাটফর্ম স্কেলে'র প্রধান প্রভেদ দেখা যায় যে, সাধারণ দাঁড়ি-পাল্লা দাঁড়ির ঠিক মাঝখানে ঝুলান থাকে এবং দুই পাশে দুই পাল্লা ঝুলে, আর 'প্লাটফর্ম স্কেলে' দাঁড়ির এক প্রান্তে একটি পাল্লা ঝুলান থাকে, অপর প্রান্ত-ভাগটি বাটখারা রাখিবার পাল্লার কার্য্য করে। এবং দাঁড়ির উপরে একটি বাটখারা বসাইয়া সরাইয়া সরাইয়া ওজনের তারতম্য জানা যায়। যে গ্রাম্য দাঁড়িপাল্লার বিষয় লেখা হইয়াছে, তাহাতে দাঁড়ির এক প্রান্ত ভারি থাকার দরুন এবং দাঁড়ির নিজের ভারেও অপর প্রান্তে ঝুলান পাল্লায় জিনিষের ওজন প্রকাশ করে। ঝুলাইবার দড়িটি সরাইয়া সরাইয়া বাটখারার কার্য্য পাওয়া যায়। সুতরাং পৃথক বাটখারার প্রয়োজন হয় না।

দরদী

(আন্তন শেখভের গল্প হইতে)

সন্ধ্যা হয়-হয়। দেওয়ালী পোকার মত তুষারকণাগুলি সদ্যজ্বালা আলোক-স্তম্ভের চারিদিকে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং শাদা তুলার মত চারিদিকের ঘর-বাড়ী, ঘোড়ার পিঠ, মানুষের কাঁধ ও টুপির উপর পুরু হইয়া জমিতেছিল।

গাড়োয়ান আইওনার মুখ-চোখ আজ যেন পাণ্ডাসপানা হইয়া গিয়াছে; কুঁজো হইয়া অচল পাথরের মূর্ত্তির মত সে গাড়ীর উপর বসিয়া আছে—তাহার ভাব দেখিলে বোধ হয়, যেন সে চিন্তা-সাগরে একেবারে তলাইয়া গিয়াছে। ঘোড়াটার অবস্থাও তথৈবচ, সেও যেন ভাবনায় বিভোর! আহা, বেচারীরই-বা দোষ কি? এই দিনকতক আগেও সে মনের খুসিতে মাঠে লাঙ্গল টানিত। নীল আকাশ—ধু-ধূ মাঠ—দূর বন,—প্রকৃতির শ্যামল শোভা তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া থাকিত—কিন্তু এখন? চারিদিকে পৃথিবীর চঞ্চলতা, নরনারীর গণ্ডগোল ও হুড়াহুড়ি—উজ্জ্বল আলোর অজস্র সমাবেশ—তারই মধ্যে তাকে দিবারাত্র ছুটাছুটি করিতে হইতেছে!

দুপুর হইতে আইওনা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে—এ-পর্য্যন্ত তাহার একটীও ভাড়াটিয়া জোটে নাই। ক্রমে সন্ধ্যা তাহার ধুসর পক্ষপুটে সারা সহরটিকে ঢাকিয়া ফেলিল। এই কর্ম্মহীন শান্ত সন্ধ্যায়

আইওনা মনে-মনে যে কি চিন্তা-জাল বুনিতেছিল, তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

"কিরে গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি?"

আইওনা চমকিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি চোখের পাতা হইতে তুষারের টুক্‌রাগুলো ঝাড়িয়া দেখিল,—একজন সৈনিকপুরুষ গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

"বেটা, কথা শুনতে পাচ্চিস না—শীগগীর চল্—এক সেকেণ্ড দেরি নয়—চল্, চল্"—বলিতে বলিতে লোকটি একেবারে গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

গাড়োয়ান কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া ঘোড়ার পিঠে এক চাবুক বসাইয়া দিল; চাবুকের আঘাতে ঘোড়ার পিঠ হইতে শুভ্র তুষার-কণাগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঘোড়াটা একটা অনিচ্ছা ও বিরক্তির সহিত, গলাটা সামনের দিকে বাড়াইয়া দিয়া পা টানিয়া-টানিয়া কোন গতিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ী যে কোথা দিয়া চলিয়াছে আইওনার সেদিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ নাই, হাতে সে কেবল লাগামটী ধরিয়া আছে মাত্র! এমন সময় রাস্তার পাশ হইতে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"কোথাকার হতভাগা গাড়োয়ান রে! আর-একটু হ'লেই চাপা দিয়েছিল আর কি—আরে মোলো! ডানদিক ঘেঁষে

সৈনিকপুরুষটিও চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ডানদিক ঘেঁসে যাও"—

আইওনা একবার সৈনিকপুরুষের মুখের দিকে তাকাইল, সে যেন তাঁহাকে কিছু বলিতে চায়, কিন্তু তাহার গলা হইতে একটা অস্ফুট কর্কশ স্বর বাহির হইল মাত্র।

সৈনিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌চিস্‌?"

জোর করিয়া মুখে একটু হাসির ছায়া টানিয়া আনিয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় আইওনা বলিল—"মশায়, গেল হপ্তায় আমার ছেলেটী মারা গেছে—তাই—"

"হুঁ; কি করে?"

"কি করে ঠিক বলতে পারবো না—বোধ হয় জ্বরে,—তিনদিন সে হাঁসপাতালে পড়েছিল......তারপর সব শেষ...ভগবানের ইচ্ছে..."

আবার রাস্তার অন্ধকার হইতে শব্দ আসিল, "কোথাকার সৃষ্টিছাড়া গাড়োয়ান গো; একেবারে চোখের মাথা খেয়েছে—মর্‌ মুখপোড়া! কোন্‌ চুলোয় যাচ্ছ দেখতে পাও না—"

সৈনিকপুরুষটী বলিয়া উঠিলেন, "জোরে খুব জোরে—এমন ঢিমে চালে চল্‌লে সময়মত পৌঁছুতে পারবো না! লাগাও কষে চাবুক!"

ঘোড়াকে বার-দুই চাবুক কষাইয়া দিয়া সৈনিকের দিকে সে আবার ফিরিয়া চাহিল। তার ইচ্ছা, তার মন হইতে যাহা উথলিয়া উঠিতেছে সেই দুঃখের কাহিনীটা সমস্ত একবার খুলিয়া বলে!

সৈনিক ততক্ষণে চোখ বুঁজিয়া পরম আরামে গাড়ীর দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়াছেন—গল্প শুনিতে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।

কিছুক্ষণ পরে সে আরোহীটিকে যথা-স্থানে নামাইয়া দিয়া একটী গাড়ীর আড্ডার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহার উপরে আবার তুষারের শ্বেতপ্রলেপ জমিতে লাগিল।

রাস্তার পাথরে ও জুতায় খটাখট্‌ শব্দ তুলিয়া তিনটি যুবক গাড়ীর সামনে আসিয়া থামিল। একজন যেমন লম্বা, আর এক জন তেমনি বেঁটে।

একজন বলিল, "পলিস্কি-পুলের সামনে যেতে হবে—সোয়ারী আমরা তিনজন, ২০ কোপেক ভাড়া, রাজি থাকত' চল।"

নীরব ইঙ্গিতে তাহাদিগকে গাড়ীর ভিতরে গিয়া ব'সিতে বলিয়া সে আবার গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পলিস্কি-পুলে যাইতে হইবে—মোটে ২০ কোপেক ভাড়া,—হায়রে! আজ যদি তাহার ছেলেটী বাঁচিয়া থাকিত!

গাড়ীতে উঠিয়া তিনজনে ঝগড়া শুরু করিয়া দিল—কে বসিবে আর কে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এই লইয়া শেষটা মারামারি হইবার উপক্রম! শেষে ঠিক হইল বেঁটে লোকটাই দাঁড়াইয়া থাকিবে—কেননা সে মাথায় খাটো। বেঁটে মানুষটি তখন অপ্রসন্ন মনে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গাড়োয়ানের ঘাড়ে হাত দিয়া—"জল্‌দি চল্‌, জল্‌দি"—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

এমনসময়ে একজন বলিল, "কাল আমি আর এক বন্ধুর সঙ্গে চার-চারটে বোতল মদ একদমে সাবাড় করেছি!"

লম্বা লোকটা হাতের উপর হাত ঠুকিয়া বলিল, "নিছক্ মিথ্যাকথা—গাঁজাখুরি—চুপ!"

সে লোকটি আবার বুক ঠুকিয়া বলিল—"আলবৎ সত্যি—একশোবার সত্যি!"

এই-সব শুনিয়া আইওনা একটু হাসিয়া মনে মনে ভাবিল, "আ কপাল, এরাই হচ্ছে ভদ্রলোক!"

এদিকে কিন্তু বেঁটে লোকটা গালাগালির চোটে তাহাকে একেবারে নাস্তানাবুদ্ করিয়া তুলিল! তাহার ভারগ্রস্ত দেহ থর্থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চোখের সাম্নে চারিদিক অস্পষ্ট—চারিদিকে নিরাশা!

ইতিমধ্যে আরোহীরা তাহাদের পরিচিত এক সুন্দরীর রূপের তারিফ্ করিতে করিতে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। আইওনা তাহাদের দিকে একবার তাকাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "আমার ছেলেটি গেল হপ্তায় মারা গেছে।"

বেঁটে লোকটী বলিয়া উঠিল, "সেজন্যে দুঃখ কি,—আমাদেরও একদিন যেতে হবে হে! আরে জল্দি চালাও, জল্দি! আচ্ছা বেতো ঘোড়া ত! দাওনা ঘাকতক চাবুক!"

আর-একজন মদের নেশায় ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বিয়ে হয়েছে ত?"

আইওনা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "বিয়ে না হলে কি ছেলে হয় হুজুর!"—একটু থামিয়া, নিশ্বাস টানিয়া সে আবার বলিল, "বিয়ে ত হয়েছে, এখন মরণ হবে কবে, তাই ভাবছি! যম যে আমাকে একেবারে ভুলে বসে আছে—নইলে আমি থাক্তে কি আমার বুকের বাছাকে বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়!"

আইওনা খুব আগ্রহের সঙ্গে সবে তাহার ছেলের মৃত্যু-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনসময়ে বেঁটে লোকটি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচা গেল! ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি—থামাও গাড়ী!"

আবার সে একাকী—আবার সেই নিস্তব্ধতা—সেই নিরাশা!

সে একজন দরদী খুঁজিতেছিল। সেই লোক-তিনটার কাছে নিজের ব্যথার কথা বলিয়া অশ্রুভরা বুকখানা সে একটু হাল্কা করিয়া লইবে ভাবিয়াছিল,—কিন্তু, তাহার কথায় কেউ ত কান পাতিল না!

বাধা পাইয়া দুঃখের বেদনায় সে একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল! রাস্তায় নর-নারীর স্রোত চলিয়াছে। তাহার চোখদুটী তন্ন তন্ন করিয়া সেই জনতার মধ্যে এমন একটী লোককে খুঁজিতে লাগিল, তাহার দুঃখের কথা শুনিতে যাহার আপত্তি নাই! কিন্তু হায়রে কপাল, সেই নিষ্ঠুর জন-স্রোত ক্রমাগতই আসিতে আর যাইতে লাগিল—তাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিল না। তাহার হৃদয়-তটের বন্ধনে আবদ্ধ এই যে সাগর-সমান অগাধ বেদনা জমা হইয়া আছে, এ যদি একবার উপছাইয়া পড়ে, তবে সারা পৃথিবীটাই বুঝি ভাসিয়া যায়!

মাথায় খড়ের বোঝা লইয়া একটা লোক যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া আইওনা বলিল, "ভায়া, কটা বেজেছে বল্তে পার?"

"রাত দশটা হবে—এত রাতে এখানে!—এগিয়ে পড়—" বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

আইওনা ঘোড়া হাঁকাইয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়া পড়িল। তখনও তাহার আশা আছে একটা লোক পায় তো তাহাকে মনের দুঃখটা বলিয়া একবার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে! কিন্তু হায়, এ জগতে দুঃখের কথায় কান দেয় এমন লোক কই! তাহার মাথাটা একবার ঘুরিয়া উঠিল, —গাড়ীর উপর থেকে পড়িয়া যায় আর-কি! কিন্তু কোনরকমে আপনাকে সামলাইয়া সে বাসার দিকে গাড়ী ফিরাইল।

ঘোড়াটাও যেন তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল; দেড়ঘণ্টার মধ্যে সে আস্তাবলে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া ঘরের এককোণে গিয়া সে বসিয়া পড়িল এবং একটা পুরানো উনুনের উপর দুইখানা হীমশীতল বাহু বাড়াইয়া দিল। ঘরটি খুব ছোট। কত বৎসরের ময়লা ও আবর্জ্জনা যে ঘরের চারিদিকে জড় হইয়া আছে, তাহা বলা দায়। ঘরের উপর অনেক লোক পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছে—তাহাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঘরটী যেন একেবারে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

এমন সময় একটী লোক ঘরের এক কোন্ হইতে উঠিয়া জলপূর্ণ বালতির কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

আইওনা অতি করুণস্বরে বলিল, "ভায়া, খুব জল-তেষ্টা পেয়েছে বুঝি—আচ্ছা, খাও ভাই খাও—তেষ্টা মেটাও! ভগবান তোমায় রক্ষা করুন—বন্ধু, আমার ছেলেটি গেল হপ্তায় মারা গেছে, জানত?—ভাই, শুনছ কি? গেল হপ্তায় হাঁসপাতালে—আহা, সে কি খেদের কথা—"

একবার ঢোক্ গিলিয়া সে তাহার দিকে চাহিল; মনে করিয়াছিল তাহার ছেলের মৃত্যুর কথা শুনিয়া লোকটীর মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লাইয়া যাইবে। সে কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না; জলপান করিয়া, আবার সে সোজা নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আইওনা চুপ করিল। লোকটা যেমন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপান করিতে আসিয়াছিল, ছেলের মৃত্যুর কাহিনী বলিবার জন্য সে-ও তেমনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনে করিয়াছিল, একে একে সব কথাই সে বলিয়া যাইবে। কি করিয়া তাহার ব্যারাম হইল, মরিবার পূর্ব্বে সে কি বলিয়াছিল, ছেলের পরিত্যক্ত কাপড়গুলি কি করিয়া সে হাসপাতাল হইতে আনিয়াছিল—এই সব!

ভাবিতে ভাবিতে সে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এবং ছেঁড়া কোটটা খুলিয়া ফেলিয়া আস্তে-আস্তে আপনার ঘোড়ার কাছে আগাইয়া গেল।

ঘোড়াটি তখন নিশ্চিন্তমনে ঘাস চিবাইতেছিল। ঘোড়াকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "ঘাস খাওয়া হচ্চে, বেশ, সেই ভাল; কি করবো বল; দানা কিনে আনবার সময় পাইনি—ছেলেটি থাকলে সেই ত সব কোরত!"—তারপর ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "হায় বন্ধু, আমার ছেলেটি ত আর নেই! তোমার যদি আজ একটি ছোট্ট বাচ্চা থাকত—আর, তুমি যদি তার মা হতে—আর, সে যদি বেশী দিন না বাঁচতো, বল দেখি বন্ধু, তাহলে

তোমার মনে দুঃখ হোত কিনা?” এই বলিয়া সে দুইহাতে স্নেহভরে ঘোড়ার গলা জড়াইয়া ধরিল।

ঘোড়াটি তাহার হাতের উপরে মুখ রাখিয়া বড় বড় চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে ঘাস চিবাইতে লাগিল। আইওনার মনে হইল, ঘোড়াটি যেন তাহার কথা সব বুঝিয়াছে।.........সারা প্রাণ ঢালিয়া এই মূক শ্রোতাটিকে সে আপন পুত্রের মৃত্যুকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল...... ।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

চয়ন

ভাবাত্মক নাটক

বৈশাখমাসের চয়নে আমরা রুশলেখক লিওনিড আণ্ড্রীভের একটুখানি পরিচয় দিয়াছিলাম। সেবারে আণ্ড্রীভের গল্প লিখিবার ক্ষমতার কথা বলা হইয়াছিল।

কিন্তু আণ্ড্রীভ সুধু গল্পলেখক নন;—রুশিয়ার নাট্যসাহিত্যেও তিনি একজন প্রতিভাধর সুপরিচিত লেখক। নাট্যকার অস্ট্রোভস্কি, রুশদেশে আধুনিক নাটকের জন্ম দেন। টলষ্টয় ও শেখভ প্রভৃতি লেখকেরা সেই আধুনিকতার ভিতরে আপন-আপন নিজস্বের পরিচয় দিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রুশলেখকেরা সাধারণত ব্যক্তিগত মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধ,—তাঁহারা গতানুগতিকতার একান্ত বিরোধী। আণ্ড্রীভের রচনাতেও এই স্বাধীন ভাব ও ভঙ্গির স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। তাঁহার রচিত নাটকগুলি অস্ট্রোভস্কি প্রভৃতির লিখিত আধুনিক নাটকাবলী হইতেও অধিকতর আধুনিক।

আণ্ড্রীভ স্বদেশী নাট্যসাহিত্যে এক নূতনতর রসসৃষ্টি করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের Maski নামক রঙ্গালয়সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রে “Letter on the Theatre” নামে তাঁহার-রচিত একটি লেখা বাহির হয়। ঐ রচনায় তিনি রঙ্গালয়ের অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া একটি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ভবিষ্যতের রঙ্গালয় বলিতে আণ্ড্রীভ কি বুঝেন, আমরা এখানে তাহাই বলিব।

নাট্যসমালোচনায় দেখা যায়, সমালোচকেরা সর্ব্বদাই Dramatic action বা ‘নাটকীয় ক্রিয়া’ বলিয়া একটা কথা তুলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনায় এই যে ‘action’,—ইহার অভাবে নাটকের মর্য্যাদা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কথাটা অতি পুরাতন,—এবং ছোট-বড় সকল সমালোচকই এই পুরাতন কথাটাকে নিশ্চিন্ত-ভাবে মানিয়া আসিতেছেন। ইহার বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠিতে পারে, এ-কথা এতদিন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

কিন্তু, আপত্তি উঠিয়াছে। বেলজিয়ামে মেটারলিঙ্ক, রুশিয়ায় আণ্ড্রীভ এবং বাঙ্গলা-দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নানাদেশীয় প্রতিভাশালী লেখকেরা উক্ত আপত্তিকারিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য।

আণ্ড্রীভ অসমসাহসে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "নাটকীয় ক্রিয়া কি রঙ্গালয়ের পক্ষে একান্তই আবশ্যক?" তারপর তিনি নিজেই এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন,—"না।"

"কেন?"

একালের মানুষ যত-বেশী আঘাত পায়, বাহিরে তত-কম চাঞ্চল্য প্রকাশ করে এবং সকল যন্ত্রণা তাহার অন্তরের গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে সঞ্চারিত হইয়া যায়। তাহার নিভৃত অন্তরের অশান্তি বাহিরেও তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিতে পারে না।

দুঃখ পাইলে শিশু যত চপল হয়, বয়স্ক লোকেরা ততটা হয় না। সভ্যতার শৈশবে মানুষও এম্‌নি ছিল। অনেক দেখিয়া, অনেক শিখিয়া বহুযুগব্যাপী অভিজ্ঞতায় মানুষও এখন বাহ্য চঞ্চলতা-পরিহারে অভ্যস্ত হইয়াছে; বালুগুপ্ত ফল্গুর মত দুঃখ এখন হৃদয়-কুহরে আশ্রয় লইয়াছে। এই কারণে অতীতের সেই বীরত্বপ্রধান আদি বা মধ্যযুগের খুব-কম লক্ষণই একালের ভাব-প্রধান নর-সমাজে দেখা যায়।

এইখানেই আণ্ড্রীভের সঙ্গে সেক্‌স্‌পিয়ার, সর্দ্দো, ডুমা, শিলার ও হুগো প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকারের প্রভেদ। আণ্ড্রীভ, মানুষের বাহিরের স্থিরতার উপরে অস্থির, গোপন হৃদয়ের কাহিনী লিখিয়া যান, এই পরস্পর-বৈপরীত্যে দরদী আত্মা স্পষ্ট-রূপে ফুটিয়া উঠে।

স্বমতপোষণের জন্য আণ্ড্রীভ, বেন্‌ভেনুটো শেলিনি ও ফ্রেডারিক নিট্‌শে নামে দুই ভিন্নযুগের ও সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী পণ্ডিতের জীবন লইয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

শেলিনি মধ্যযুগের লোক। তাঁহার একটিমাত্র জীবনে কত বিপদ, কত উদ্ধার, কত হত্যা, কত বিস্ময়, অজ্ঞাত আবিষ্কার, প্রেম, ও শত্রুতা দেখা যায়! এক-একদিন কেবল সহরতলী হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে শেলিনির জীবনে যত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সাধারণত আধুনিক কোন লোকের সারাজীবনেও তত-বেশী ঘটনা ঘটে না। সে-যুগের মানব-জীবনই ছিল ঘটনাবহুল। তাই, তখনকার নাট্যকার-গণের সৃষ্ট চরিত্রেও চিত্তোত্তেজক ঘটনার সমাবেশ না হইয়া উপায় ছিল না। তাই শেলিনির জীবনে গতযুগের রঙ্গালয় যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে।

—আর, ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখি নীট্‌শের জীবনে। নীট্‌শে কোন আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে পড়েন নাই। যৌবনে যখন তিনি সৈনিক ছিলেন,—যখন তাঁহার পক্ষে ঘটনাবহুল জীবন যাপন করাই স্বাভাবিক—তখনও তিনি একান্ত সাধারণভাবেই কাল কাটাইয়া দিয়াছেন। তারপর, যখন তিনি পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া নিষ্কর্ম্মার মত ভাব-সাধনায় বসিলেন, তখন হইতেই তাঁহার জীবনে প্রকৃত নাটকত্বের সূত্রপাত হইল। তাঁহার হৃদয়ের আড়ালে সৃষ্টির যে রহস্য এতদিন গোপন ছিল,

সেইদিন হইতে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। নীট্‌শে যেন আধুনিক রঙ্গালয়ের মূর্ত্তি!

একালের গতানুগতিক নাট্যকারগণ নীট্‌শের জীবন-নাট্য ফুটাইবার শক্তি রাখেন না। কারণ, যে-পদ্ধতিতে তাঁহারা নাটক লিখেন, তাহা শেলিনির মত ঘটনাবহুল জীবনের পক্ষেই উপযোগী; তাই নীট্‌শের মত ঘটনাহীন ও ভাবপ্রধান চরিত্র বিকাশ করিতে গেলে তাঁহারা অক্ষম হইবেন। অথচ, সেই মান্ধাতার আমোলের শেলিনিকে লইয়া ত একালের সাহিত্য, শিল্প ও জীবনযাত্রা চলিতে পারে না!—আমাদের মধ্যে চাহি এখন নীট্‌শের মত মহামানব—যাঁহার জীবন আমাদের এত কাছে-কাছে, এত আবশ্যকীয়, এবং আমাদের পক্ষে এত উপযোগী! এইজন্যই এ-যুগের নাট্যবিভাগকে যথার্থ কাজে খাটাইতে হইলে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন প্রয়োজন।

সমালোচকেরা পাছে আপত্তি তুলেন, তাই আণ্ড্রীভ্‌ বলিতেছেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, পৃথিবীতে আর ঘটনা ঘটে না বা মানুষের জীবনে এখন ক্রিয়ার অভাব। সংবাদপত্র পড়িলেই জানা যায়, চারিদিকে নিত্য কত আত্মহত্যা, রক্তপাত ও বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিতেছে। কিন্তু নাট্যকলার হিসাবে এ-সব ঘটনার মূল্য এখন কমিয়া গিয়াছে; জীবনের উপরে মনোবিজ্ঞানের দাবি এখন অত্যন্ত অধিক। আগে যেখানে নাটকের তরবারিধারী বীরেরা প্রেমের আবেগে মাতিয়া উঠিত, এখন সেখানে এক নূতন অভিনেতার আবির্ভাব হইয়াছে,—তাহার নাম বিচার-শক্তি। প্রেম নহে, বলবতী স্পৃহা নহে, গৌরব-লালসা নহে—কিন্তু সুখ, দুঃখ, ও জীবনযুদ্ধের ভাবনাই আধুনিক জীবন-নাট্যে প্রধান অভিনেতার স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং নাটকেও ইহাদের জন্য প্রথম স্থান নির্দ্দেশ না করিয়া উপায় নাই। আণ্ড্রীভ, এই শ্রেণীর নাটক রচনায় এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, তাঁহার শেষ নাটকখানির নাম দিয়াছেন, "চিন্তা।" নাট্যজীবনের আরম্ভে "মানব-জীবন"ও "কৃষ্ণ-ছদ্মবেশীগণ" নামে তিনি যে দুখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহাদের ভিতরেও এই ভাবের ধারাই বহমান।

আণ্ড্রীভের ভাবাত্মক নাটকগুলিতে প্রায়ই রূপকের সাহায্যে মানব-জীবনকে বুঝান হইয়াছে। ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচকেরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। "কৃষ্ণ-ছদ্মবেশীগণ" যখন প্রথম অভিনীত হয়, তখন খুব অল্পলোকেই তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিল।) আণ্ড্রীভ বলেন, "সমালোচকেরা হচ্ছে অদ্ভুত জীব। কতকগুলি বিষয়কে আমি যে কেন বিশেষভাবে প্রকাশ করেছি, এটা বুঝতে না পেরে মিছেই তারা মাথা ঘামিয়ে মরে। এর খুব একটা সোজা জবাব আছে। প্রত্যেক বিষয় তার উপযোগী ভঙ্গিতেই লেখা উচিত। অমন-যে বুদ্ধিমান লোক শেখভ, কথাবার্ত্তায় যিনি অত সাবধানী, তিনিও একদিন ইব্‌সেনের নাম শুনে বন্ধুবান্ধবদের মাঝখানে বলে ফেলেছিলেন, 'ইব্‌সেন হচ্ছেন মস্ত এক নির্ব্বোধ।'—ইব্‌সেনের

সৃষ্ট রূপক যখন শেখভের মত লোকও বুঝে উঠতে পারেন-নি, তখন আমার লেখা বোঝেন-নি বলে, সমালোচকেরা যদি আমাকে গালাগালি দেন, তবে সে-সব সুবুদ্ধির মত উড়িয়ে দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। গেল দশবছর আমি যেমন বুঝেছি, তেমনি লিখেছি। কি রূপক, কি বাস্তব—আমি কারুর অধীন নই; তারাই আমার গোলাম; যখন যেমন বিষয়, তখন তেমন ভাবেই রূপক বা বাস্তবকে আমি কাজে খাটিয়েছি। ভবিষ্যতেও আমি ঠিক এই নিয়মমতই চল্‌ব।”

পাঠকেরা বিচার করিয়া দেখিবেন, বাঙ্গলাদেশেও রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ভাবাত্মক ও রূপকপ্রধান নাটকগুলির গূঢ় অর্থ ধরিতে না পারিয়া, নির্ব্বোধ সমালোচকেরা “দুর্ব্বোধ! দুর্ব্বোধ!” বলিয়া কিরূপ চীৎকার করিতেছেন! রুশিয়া ও বাঙ্গলা-দেশের সমালোচকদের মধ্যে ভেদ এইটুকু যে, সেখানকার ‘ক্রিটিকে’রা আজকাল আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, আর এখানকার ‘ক্রিটিকে’রা এখনও ‘যে তিমিরে সেই তিমিরে’ই পড়িয়া আছেন!

ভারতীয় চিত্রকলা

সংপ্রতি কলিকাতায় ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় চিত্রকলার এই নূতন পদ্ধতি-টির দিকে আজকাল সকলের দৃষ্টি আক-র্ষিত হইয়াছে। জগতের সকল দেশের কলাবিদেরাই বলিতেছেন, এই নব ভারতীয় পদ্ধতিটি চিত্রকলায় এক অভিনব প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করিয়াছে।

কিছুদিন আগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেই প্রদর্শনীর চিত্রমালা দেখিয়া উক্ত দুই দেশের শিল্পরসিকগণ মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেখানকার প্রধান-প্রধান পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় চিত্র-কলার বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। স্থানাভাবের জন্য আমরা সেই বিবিধ আলোচনার কিছু-কিছু উদ্ধার করিয়া দিলাম মাত্র।

বিলাতের The Daily News and Leader বলিতেছেন:—

“প্রসিদ্ধ ভারতীয় কবির ভ্রাতুষ্পুত্র ও আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রধান পুরো-হিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত ষাটখানি চিত্র এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রাজ্ঞী মেরী ও শ্রীযুক্ত হ্যাভেল কর্ত্তৃক দত্ত “অশোকের রাণী” ও ওমর খইয়ামের ছবিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণরঞ্জক। প্রদর্শনীতে অন্যান্য যে-সকল শিল্পীর চিত্র আছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, ঈশ্বরীপ্রসাদ ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়ের নামই উল্লেখযোগ্য;—ইঁহারা অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। য়ুরোপীয় চিত্রকলায়

"একটি রমণী আলুর খোসা ছাড়াইতেছে" বা "একটি যুবতী বাসন মাজিতেছে"—প্রভৃতি নামের যে-রকম-সব বাজে রাবিশ ছবি দেখা যায়, ভারতীয় চিত্রকলায় সে-রকম কোন-কিছু একেবারেই নাই—অধিকাংশ চিত্রই ভারতীয় ইতিহাস, পুরাণ এবং কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্য প্রভৃতি অতি-মানবগণের জীবনী অবলম্বনে অঙ্কিত হইয়াছে। যাঁহারা, ভারতবাসীর গোপন হৃদয় সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুভূতি লাভ করিতে চান, তাঁহারা এই প্রদর্শনীতে আসিলে আনন্দের সহিত অনেক শিক্ষা পাইবেন।

শ্রীযুক্ত হ্যাভেল যখন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ে"র প্রধান অধ্যক্ষের পদলাভ করেন, ছাত্রেরা তখন ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি অত্যন্ত বিমুখ হইয়া ছিল। বিদ্যালয়-সংলগ্ন চিত্রশালাটি প্রতীচ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পট দেখিয়া নকল-করা ছবিতে পরিপূর্ণ থাকিত—ছাত্রদের আদর্শ ছিল সেই-সব রাবিশ। শ্রীযুক্ত হ্যাভেল অসম-সাহসে সেই রদ্দী মালগুলো চিত্রশালা হইতে বিদায় করিয়া দেন এবং তাহাদের স্থানে ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য্যের ভাল ভাল নমুনা আনিয়া রাখিবার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করেন। ফলে, কলিকাতায় তাঁহার বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ছাত্রেরা একসঙ্গে বিদ্যালয় ছাড়িয়া যায়। কিন্তু সে-সকল নিন্দা-গালাগালিতে তিনি একটুও টলিলেন না। ছাত্রেরা আবার একে-একে ফিরিয়া আসিল এবং প্রতিভাবান নবীন কলাবিদ অবনীন্দ্রনাথ সহযোগীরূপে হ্যাভেল-সাহেবের সঙ্গে যোগদান করিলেন। হ্যাভেল-সাহেবের কার্যকাল সমাপ্ত হইলে অবনীন্দ্রনাথই শিল্প-বিদ্যালয়ে উপদেষ্টার পদগ্রহণ করেন।

হ্যাভেল-সাহেব বলেন, "আমরা যখন ভারতবর্ষের শাসনভার পাই, ইংরাজদের ভিতরে রুচিবোধ তখন একরকম ছিল না বলিলেই চলে—ভারতের পক্ষে এটি গভীর দুর্ভাগ্যের কথা। যাহা য়ুরোপ হইতে আমদানি নহে, তাহার কোন আদর ছিল না। অনাদর-অপযশে ভারতীয় কলার দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। ভারতের রাজামহারাজ ও ধনীরা দেশীয় রাজমিস্ত্রীর বদলে 'পাবলিক ওয়ার্কসে'র কর্ম্মচারীদের ডাকাইয়া আধা-ফেরঙ্গ আধা-দেশীয় আদর্শে প্রাসাদাদি তৈয়ারি করিতে লাগিলেন। ভারতের নিজস্ব ও অপূর্ব্ব ভিত্তি-চিত্রের বদলে কুৎসিত বিলাতি 'ওয়াল-পেপার' ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কোন-জাতীয় ললিতকলা স্থাপত্যের মধ্য দিয়াই প্রধানত আত্মপ্রকাশ করে; সুতরাং কোন দেশের স্থাপত্যকলার অবনতি দেখিলে বুঝিতে হইবে, সে দেশের রুচিও অবনত হইয়াছে।

এদিকে ভারতে যাহারা বংশানুক্রমে শিল্প-ব্যবসায়ী, দেশব্যাপী অবহেলায় তাহাদের দুর্গতির আর অবধি রহিল না। জীবিকাসংগ্রহের জন্য বাধ্য হইয়া, তাহারা ছোটখাট সখের জিনিষ তৈয়ারিতে লাগিয়া গেল;—এ-সব কাজগুলি অত্যন্ত কৃত্রিম হইত, কারণ এ কাজের সঙ্গে শিল্পীদের প্রাণের মিল থাকিত না। আমি একজন ছাত্র পাইয়াছিলাম, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা

রাজশিল্পী ছিলেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার আগে কলিকাতার কোন সাহেব-ব্যবসায়ীর কাছে ইনি ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের পাড় আঁকিতেন। চিত্রশালায় কতগুলি দামী মোগল-চিত্র আছে, সেগুলি আমি এক দোকানীর ঘরে পোকা-খাওয়া ও ধূলামাখা অবস্থায় পাইয়াছিলাম। ছবিগুলির প্রতি দোকানদারের একটুও দরদ ছিল না। পাশ্চাত্য ছবির আদর হওয়াতে প্রাচীন পটগুলি ছেলেদের খেলনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত হ্যাভেলকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, ভারতের শিল্পীরা যে 'অ্যানাটমি' ও 'পারস্পেকৃটিভ' জানে না বলিয়া নিন্দা আছে, সেটা কি ঠিক?"

—"হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা মস্ত ভুল করা হয়। 'অ্যানাটমি' ও 'পারস্পেকৃটিভ'-এ ভারতীয় শিল্পীর জ্ঞান একটু আলাদা-রকমের! তিনি দৈহিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সুন্দরতর ও সূক্ষ্মতর একটা-কিছু প্রকাশ করিতে চান; তাঁহার কল্পনা ও ধ্যান-ধারণায় দৃশ্য ও অদৃশ্যের মোহন মিলন সাধন হয়—আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন এমন অপূর্ব্ব মিলন অসম্ভব। য়ুরোপীয় কলায় অপার্থিবতা যেখানে চরমে উঠিয়াছে, সেখানেও তাহা পার্থিব পদার্থের সহিত একেবারে সংস্পর্শ-বর্জ্জিত নহে। ভারত-শিল্পী সর্ব্বদা স্বর্গ-সৌন্দর্য্যকে মর্ত্তে নামাইয়া আনিতে চান। যখন তিনি পার্থিব দেহ আঁকিতে বসেন, তখন তিনি 'অ্যানাটমি'র খুঁটিনাটি এড়াইয়া আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন; এইজন্যই যাহারা কেবল চামড়ার চোখ লইয়া দেখে, কেবল তাহারাই ভারতীয় পটে 'অ্যানাটমি'র খুৎ ধরিতে বসে। একজন প্রাচীন সংস্কৃত লেখক বলিয়াছেন, পরম রূপবান মানুষের মূর্ত্তি আঁকার চেয়ে অ-রূপ দেবতার মূর্ত্তি আঁকাও শ্রেয়স্কর।—ইহাই হইল ভারত-শিল্পীর আদর্শ।

"ভারতীয় পটে যে-সকল বর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহাদেরও এক-একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। ললিতকলা, ভারতের জাতীয় জীবনেরই অংশবিশেষ; এবং ইহার সঙ্গে দার্শনিকতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। ভারতবাসী মাতৃক্রোড় হইতেই দার্শনিক।"

"আধুনিক য়ুরোপীয় কলায় Post Impressionism-এর যে আন্দোলন চলিতেছে, ভারত-শিল্পের সঙ্গে তাহার কোন সাদৃশ্য আছে বলিয়া কি আপনার মনে হয়?"

শ্রীযুক্ত হ্যাভেল হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এদেশে যাঁহারা ভাবাত্মক কলার পক্ষপাতী, তাঁহাদের উপরে যে প্রাচ্য শিল্পের ছাপ্ পড়িয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস, য়ুরোপীয় শিল্পের উপরে ভারত-শিল্পের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। য়ুরোপকে শিখাইবার জন্য ভারতের অনেক নূতন জিনিষ আছে। কিন্তু য়ুরোপের ভাবাত্মক চিত্রশিল্পীরা ভারত-শিল্পীর মত ছবির প্রতি খুঁটিনাটির উপর প্রাণমন সমর্পন করিতে পারেন না,—দুজনের মাঝে এইখানেই তফাৎ।

"তবে, এখানকার প্রদর্শনী দর্শনকালে এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, "কলিকাতা শিল্প-বিদ্যালয়" এখনও শৈশবদশা পার হয়

নাই। ভারতের প্রাচীন আদর্শ ইহার প্রধান অবলম্বন হইলেও এই নব-পদ্ধতি প্রতীচ্যের ভাল-দিকটা গ্রহণ করিতেও আপত্তি করে না। ভারতবাসীরা যে রক্ষণশীল, এ ধারণা ভুল। নূতন ভাবের ধারাকে অনুসরণ করিতে তাহারা সর্ব্বদাই আগ্রহবান। "ভারতীয়-চিত্রকলা'র পুরোহিত-গণ, ইংলণ্ড ও ভারতকে একত্রে মিলিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও কার্য্য করিতেছেন।"

আগামীবারে ফ্রান্সে "ভারতীয় চিত্র-কলা"র সমাদর-সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

কৈসর-প্রাসাদের কাহিনী

জার্ম্মাণ-সম্রাটের "ওল্ডপ্যালেস্" নামক প্রাসাদ প্রাচীনতা ও বিপুলতার জন্য জগদ্বিখ্যাত। ছয়শত কক্ষ বিশিষ্ট এই বৃহৎ প্রাসাদ 'উটারডেন্ লিন্‌ডেন্' নদীর তীরদেশে অবস্থিত। বার্লিনে এরূপ প্রকাণ্ড প্রাসাদ আর একটীও নাই। সৌন্দর্য্যেও ইহা অতুলনীয়। এসিয়ার আদি রাজা ফ্রেডারিক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার প্রস্তরময় দেহের বিপুল-শ্রীর তুলনায় ফ্রান্সের তৎকালীন সৌন্দর্য্যশালিনী 'ভার্সেলিস্' নগরীকে হীনপ্রভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য তাঁহার সফল হইয়াছিল কিনা বলা কঠিন নয়। এই প্রাসাদসম্বন্ধে 'ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে' এক অদ্ভুত কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

এই অতিকায় প্রাসাদের মধ্যভাগে সবুজ রঙ্গের একটী 'টাউয়ার' আছে। প্রবাদ এই যে, এখানে স্ত্রীলোকের এক প্রেতাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রেতাত্মার আবির্ভাব জার্ম্মাণ-রাজবংশীয়গণের পক্ষে অতিশয় অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, ইহার আবির্ভাব হইলে অচিরেই রাজবংশধরগণের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস, এই মূর্ত্তি নিশাকালে আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রাবৃত হইয়া ধীরপদবিক্ষেপে প্রাসাদের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। রাজবাটীর ছয়শত কক্ষের কোনটীই তাহার অগম্য নহে। কেবল যে-অংশে রাজা বা রাজবংশীয়গণ অবস্থান করেন, সেই অংশে সচরাচর সে পদার্পণ করে না; কিন্তু রাজবংশধরগণের কাহারও মৃত্যু-কাল ঘনাইয়া আসিলে সে মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই সকলের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া দেয়।

এই প্রেত-রমণীটী কে, সে-সম্বন্ধে কয়েকটী কিম্বদন্তী আছে। দ্বিতীয় 'ইলেক্টার জো'কিম্' নামক কৈসারের এক পূর্ব্বপুরুষ 'অ্যানা সিডো' নাম্নী এক রমণীর প্রেমে আসক্ত হন। এই রমণীর বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। তিনি

হইয়া এক রাসায়নিকের শরণাপন্ন হন এবং পরশপাথরের সাহায্যে প্রভূত অর্থলাভের প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিষ্ফল হয়। অবশেষে তিনি প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন করিয়া অর্থ-শোষণ করিতে থাকেন। এই দুর্ভাগ্য নরপতি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার হতভাগিনী প্রণয়িণী নব-ভূপতি কর্তৃক লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ হন, এবং অবশেষে অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। লোকের ধারণা যে, এই বিলাসিনী রমণীর অতৃপ্ত আত্মা তাহার প্রণয়াস্পদের গৃহে আবদ্ধ আছে, এবং রাজবংশধর কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিল বলিয়া সে রাজাদের মৃত্যুকালে আত্ম-প্রকাশ করিয়া মুমূর্ষুর মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই :—অতি প্রাচীন-কালে এই বংশের এক রাজা কোন এক বিধবা কাউণ্টেসের প্রেমে মুগ্ধ হন। এই রমণীর দুইটী সন্তান ছিল। রূপবান রাজার রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়া কাউণ্টেস্ তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে রাজা বলিয়াছিলেন, "এই সুন্দরী বিধবাকে পত্নীরূপে পাওয়া অতিশয় লোভনীয়। কিন্তু আমার অভিষ্টসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় চারিটীমাত্র চক্ষু। নহিলে সানন্দে এই রূপসীকে বিবাহ করিতে আমার কোনই আপত্তি ছিল না।"

উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী কাউণ্টেস্ রাজার এই উক্তির অন্যরূপ অর্থ করিলেন। তিনি তখন রাজার প্রেমে অন্ধ, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দুটী সন্তানের প্রতিই রাজা ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই হতভাগ্যেরাই তবে তাঁহাদের সুখের পথের কণ্টক—অতএব তাহারা অপসারিত হউক। এই ভাবিয়া কাউণ্টেস্ তাঁহার সন্তানদুটীর মথায় আল্‌পিন বিঁধাইয়া স্বহস্তে তাহা-দিগকে মারিয়া ফেলিলেন। বস্তুত, রাজার সেরূপ কোনও অভিপ্রায় ছিল না। তিনি নিজের পিতামাতাকেই উদ্দেশ করিয়া ঐকথা-গুলি বলিয়াছিলেন। হতভাগিনী কাউণ্টেসের যখন ভ্রম ঘুচিল, তখন তিনি আর এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার পাপগ্রস্ত আত্মা সেইদিন হইতে রাজপ্রাসাদে দারুণ অশান্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

তৃতীয় কিম্বদন্তী আরও ভয়াবহ এবং তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত "টাওয়ার"-টীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ফ্রেডারিক প্রুশিয়ার আদি রাজা ছিলেন এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি "Iron tooth" অর্থাৎ লৌহদন্ত নামে অভিহিত হইতেন। এক অতি নৃশংস উপায়ে তিনি অপরাধীগণকে শাস্তি দিতেন। তাঁহার প্রাসাদে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি স্ত্রীমূর্ত্তি থাকিত। এই মূর্ত্তির ভিতরটা ফাঁপা এবং তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রবেশ-দ্বার ছিল। ইহার ভিতরে অনেকগুলি তীক্ষ্ণ বর্শা সাজানো থাকিত। যে-সকল লোক সামরিক অপরাধে দণ্ডিত হইত, তাহাদিগকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া এক গুপ্ত কল ঘুরাইয়া সুতীক্ষ্ণ বর্শায় হত্যা করা হইত। এই কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তিটী উক্ত 'টাওয়ারে'ই প্রথমে স্থাপিত হয়। ইহার

নাম ছিল 'মেডেন্' অর্থাৎ কুমারী। এই কুমারী-মূর্ত্তিটী এখন 'নূরনবার্গে'র প্রাসাদে দেখা যায়। কথিত আছে, এই তীক্ষ্ণশূল-গর্ভা কুমারীর নির্ম্মাণ-পরিকল্পনায় একটী জীবন্ত কুমারীকে আত্মপ্রাণ বলি দিতে হইয়াছিল। সেই কুমারীর প্রেতাত্মাই না কি এই 'টাওয়ারে' স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছে, এবং নিষ্ঠুর রাজার বংশধরগণের প্রতি দণ্ডবিধানার্থ পুরুষানুক্রমে তাহাদিগের অমঙ্গলস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রেত-রমণী নিশব্দে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যখন ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন কোন অসীমসাহসী ব্যক্তিও তাহার সম্মুখীন হইতে বা তাহাকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সাহস করে না। কারণ, সেরূপ চেষ্টা করিলেই বিষম অনর্থ ঘটিবে।

একরাত্রে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়াছিল। রাজবাটীর এক বালক ভৃত্য কৌতূহলবশে ইহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে এরূপভাবে কোথায় চ'লেছেন"? প্রেতিনী কোনও উত্তর করিল না। তাহার আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং হস্তে একটী চাবি থাকিত। এই চাবির সাহায্যে সে না কি রাজবাটীর যে-কোন কক্ষে যাতায়াত করিতে পারিত। ভৃত্যের কথায় সে যে অসন্তুষ্ট হইয়াছে, এমনও বোধ হইল না; কেবল তাহার হস্তস্থিত চাবি দ্বারা সে ভৃত্যের মস্তকে এক আঘাত করিল। আঘাত পাইবামাত্র ভৃত্যের মৃতদেহ কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল; পরদিবসই 'ইলেক্টার জন্ সিগিস্মণ্ড' হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইউরোপের জনসাধারণের দৃঢ় ধারণা যে, এই প্রেতরমণী অদ্যাপি জর্ম্মাণ-সম্রাটের গৃহে বাস করিতেছে। বার্লিনবাসীগণও অদ্যাবধি এই ভৌতিক ব্যাপারে অবিশ্বাস করে না। রাত্রিকালে রাজপ্রাসাদসংলগ্ন সেতু অতিক্রম করিবার সময় প্রেতমূর্ত্তি দর্শনাকাঙ্খায় নগরবাসীগণ এখনও সবুজ 'টাওয়ারে'র প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

শহরে "ফাল্গুনী"

"এ সেই পালা যা' জ্যোৎস্নায় হ'লে জমে ভালো,—বুল্‌বুল্-বোস্তঁা যার প্রধান গায়ক,—ঝিঁঝি যার তানপুরা,—জোনাকী যার রঙ্গ-প্রদীপ;—যা' কেবল মুক্তাশুক্তির আরাম-কেদারায় বসে কল্পনা-কুশলী কবিরা শুনবেন,—আর যার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করতে না পেরে পাণ্ডিত্যাভিমানী হস্তীমূর্খেরা গোড়াগুড়ি শুঁড় আস্ফালন সুরু করে দেবে।"

—ফরাসী কবি গতিয়ে।

বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষাকল্পে সেদিন স্যার রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর অলোকসামান্য কবি-প্রতিভা ও সঙ্গীত-প্রতিভার যুক্তবেণী "ফাল্গুনী" নামক একটি দৃশ্যকাব্য অভিনয় হ'য়ে গেল। এই নাট্যকাব্যের অভিনয়ে নেমেছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ; সঙ্গে ছিলেন

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথপ্রমুখ সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-নিপুণ সুরসিক বুধ-মণ্ডলী এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আনন্দ-মুকুল শিশু ও বালকবৃন্দ। এই অভিনয়ের টিকিট-বিক্রীর টাকায় যে শুধু বাঁকুড়া-বাসীর অন্ন-দুর্ভিক্ষের কতকটা উপশম হবে তা' নয়, এর শিল্প-সৌন্দর্য্যে অনেক রসপিপাসু বঙ্গবাসীর অনেক-দিনের রসের তৃষ্ণা এবং অন্তরের দুর্ভিক্ষেরও মোচন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই, করলে মিছে কথা বলা হয়। কারণ, এ সম্বন্ধে আমরা অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি,—তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন "যিনিই সৌভাগ্যক্রমে সেদিনকার এই অভিনয়ে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন তিনিই এই রস-মাধুর্য্য-সম্ভোগের শুভ দিনটিকে জীবনের একটি স্মরণীয় দিন ব'লে মনে করেন। তা কি প্রবীণ উকীল ব্যারিষ্টার আর কি নবীন বি-এ, বি-এস-সি, এম্-এ, এম্-এস-সির ছাত্র, কি কারবারী পয়সা-ওয়ালা কয়লা-খনির মালিক আর কি দরিদ্র স্বল্প-বেতন স্কুলের মাষ্টার—সকলেই খুসী,—সকলেই বল্ছেন, যে, সেদিন যা পেয়েছেন তা তাঁদের আশাতিরিক্ত।" অবশ্য দু'একজন খবরের কাগজের কাগুজী সাহিত্যিক ভোঁতা পাণ্ডিত্য প্রকাশ ক'রে দশের মুখে হাত চাপা দিয়ে সত্য-গোপনের ব্যর্থ চেষ্টাও করেচেন। দশের মুখে হাত চাপা দিতে হ'লে অন্ততঃ রাবণের মত দশমুণ্ড কুড়ি হাত থাকা দরকার, তা' যখন তাঁদের নেই তখন তাঁদের দুশ্চেষ্টা নিস্ফল হতে বাধ্য। ওদিকে এক-আধজন মেকী দার্শনিক নাকি গভীর দার্শনিকতার ভাণ ক'রে বল্ছেন, কবির যথার্থ কাজ হ'চ্চে কাব্য-কমলের কমলে-কামিনীকে দিয়ে হাতী গেলানো, তা' যখন হয়নি তখন ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যাই হোক্, তাঁরা যাই বলুন আর খবরের কাগজে যতই কালি ছড়ান্, দু'-একটা মলিন কাগজের বাদুড়ের ডানায় সূর্য্য ঢাকা পড়বে না। বেশীর ভাগ লোকের মতে "ফাল্গুনী" আনন্দের মহাসমুদ্র, উৎসবের চিরন্তন উৎস।

ধোঁয়া আর কুয়াসায় আচ্ছন্ন আমাদের এই কল্কাতার শহরে দক্ষিণা হাওয়ার মতন এই ফাল্গুনী! হঠাৎ এসে মধ্য-শীতের সন্ধ্যাবেলার সমস্ত ধোঁয়া আর হিম যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই; আকাশের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আবার মুখভরা হাসি, বুকভরা আলো নিয়ে ঝক্ঝকে হ'য়ে উঠ্‌ল! অনেক অসাড় মনে সাড়া জাগ্‌ল! বেণু-বনের মত অনেকেরই প্রাণ এর প্রভাবে আনন্দে স্পন্দমান। এ যে "কানে কানে একটি কথায় সকল কথাই" ভুলিয়ে দিয়ে গেল। এ যে যাদুকর! এ যে আশ্চর্য্য!

প্রথমে ভাবা গিয়েছিল, শহরে ফাল্গুনী অভিনয় বুঝি ফাল্গুনের হাওয়ায় কড়ি-বরগায় ফুল-ফোটানোর মতন অসম্ভব। কিন্তু অভিনয়ের রাতে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়েই মনের সে ভাবটা কেটে গেল। দেখ্‌লুম কল্পনাদেবীর কল্প-কুঞ্জ-চারী শিল্পী-দের তপস্যার প্রভাবে শহরের ধূলোতেই ফুলের ধুলোট সুরু হয়েছে। কল্পলতার

ডাল নুইয়ে ধরে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য চয়ন ক'রে রঙ্গমঞ্চটি সাজানো হয়েছে। রঙ্গ-তোরণের একদিকের স্তম্ভে আঁকা রয়েছে জলাভাবে শুষ্কপ্রায় "পাপ্‌ড়ি-ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী।" অন্তদিকের স্তম্ভে লীলা-হিল্লোলিত দিঘির নীল জলে সদ্য-ফোটা শতদল পদ্ম। তোরণের মাথায় মরালের শ্রেণী, শুষ্কতার দিক পরিহার ক'রে পরিপূর্ণতার দিকে সোৎসাহে ছুটে চলেছে। সারদার কৃপায় ঐ সারগ্রাহী মরালের দল আসল জিনিসটুকুই চয়ন ক'রে ফিরবে;—

"সুধী ওরা ত্যজি নীর
গ্রহণ করিবে ক্ষীর।"

আর, যে-পুকুরের তলাকার পাঁক পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে সেদিকে দৃষ্টি রইল বস্তুতন্ত্র বকের,—সে মাছ না নিয়ে নড়বে না। সে যে আমিষের গন্ধ পেয়েছে।

যবনিকা উঠ্‌ল।

প্রথমেই ফাল্গুনীর প্রস্তাবনা স্বরূপ রবীন্দ্র নাথের নূতন লেখা "বৈরাগ্য-সাধন" অভিনয় সুরু হ'ল। বৈরাগ্য-সাধনের গল্পটি হচ্ছে এই—

এক রাজার মাথায় পাকা চুল দেখা দেওয়ায় তাঁর মন অত্যন্ত খারাপ হয়েছে; তিনি মৃত্যু আসন্ন ঠাউরে রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম্ম, আমোদ আহ্লাদ, গান-বাজনা এমন কি জরুরি কাজে দেখাশুনা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। মন্ত্রী বেচারা ক্রমাগত চেষ্টা করেও রাজাকে ঠিক বাগ মানাতে পারচেন না; প্রত্যন্তদেশে ভয়ানক যুদ্ধ বেধেছে, সেনাপতি রাজার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে চান, কিন্তু মহারাজের মনে এম্‌নি গেরুয়া রঙের ছোপ ধরেছে, যে তিনি কিছুতেই এই সব বৈষয়িক ব্যাপারে কর্ণপাত করতে পারচেন না। ওদিকে চীন-সম্রাটের দূত এসেচেন তাঁকেও অম্‌নি-অম্‌নি ফিরতে হবে, কারণ মহারাজের মন খারাপ হয়েছে। কবিশেখর কাব্য-মঞ্জরী শোনাতে চান, কিন্তু মহারাজ ঐহিক প্রেমের গান শুন্‌তে একান্ত নারাজ। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজারা রাজার দেউড়িতে ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করছে, কিন্তু চেঁচালে কি হবে? চেঁচিয়ে ফল নেই, কারণ মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।

তিনি এখন চান্‌ একমাত্র শ্রুতিভূষণকে আর তাঁর সেই বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি। শ্রুতিভূষণ যাজক ব্রাহ্মণের নিখুঁৎ ছবি। তিনি অমূল্য উপদেশের পরিবর্ত্তে মহারাজের কাছ থেকে মূল্যবান একখানি তালুক আদায় ক'রে নির্ঝঞ্ঝাটে নিজের বৈরাগ্য-সাধনের জন্যে একখানি মর্ম্মর প্রস্তরের বাড়ীর আবদার জানিয়ে, মহারাজকে রুদ্রাক্ষের মালা ধরিয়ে বৈরাগ্য-সাধনা করতে উপদেশ দিয়ে গেলেন। এমন সময় রাজার সভাকবি কবিশেখর এসে উপস্থিত। ফাল্গুনের হাওয়ার মত হঠাৎ এসে ইনি সমস্ত ওলোট-পালট ক'রে দিলেন। তিনি বল্‌লেন "চুল শাদা হ'য়েছে? তাতে ভাবনা কি? শাদা আলোর ভিতরে রামধনুকের সকল রঙ লুকিয়ে থাকে, শাদাই তো সকল রঙের বাসা। যারা ভোগবতী পার হ'য়ে এসেছে তারাই তো আনন্দ-লোকের

ডাঙ্গা দেখ্‌তে পেয়েছে, এই তো আনন্দের বয়েস।"

রাজা খুসী হ'য়ে উঠ্‌লেন, কবির সঙ্গ তাঁকে "অকূল প্রাণের সাগর তীরে" পৌঁছে দিলে, তাঁর আর "ক্ষয় ক্ষতির ভয়" রইল না। তখন আবার নহবতের বাঁশী বাজ্‌ল, সেনাপতিকে যুদ্ধের পরামর্শের জন্যে ডেকে পাঠানো হ'ল, নিরন্নদের অন্নের ব্যবস্থা হ'ল। ফাল্গুনের হাওয়ার মত কিছু-একটা করবার জন্যে তাঁর মন প্রাণশক্তির উল্লাসে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। স্ফূর্ত্তির আতিশয্যে রাজা কবিশেখরকে বল্‌লেন "তোমার নূতন লেখা কোনো নাটক, কি ত্রোটক, কি প্রহসন, কি হল্লীশ, কি আর-কিছু তৈরী আছে? যদি থাকে তো অভিনয় লাগিয়ে দাও।" তাতে কবিশেখর তাঁর লক্ষ্মীছাড়ার দলটিকে রাজোদ্যানে হাজির ক'রে যে নাটক রাজাকে দেখালেন সেটি হ'চ্ছে এই ফাল্গুনী।

ফাল্গুনী আবার দুটি নাটকের সমষ্টি,—একটি বহিঃপ্রকৃতির, অপরটি অন্তঃপ্রকৃতির। একদিকে বৃদ্ধ শীত চলে যেতে চাইছে, নব বসন্তের নূতন প্রাণের চরেরা তাকে বল্‌ছে "যাবে কি? তোমাকে যে আমাদের খেলার সাথী হ'তে হবে!" তাদের উৎসাহের আতিশয্যে এবং টানা-টানির হুড়াহুড়িতে শেষে কম্বলবস্ত শীতের কম্বল এবং পাকা দাড়ি খসে পড়ল, দেখা গেল, সে প্রকৃত বুড়ো নয়, সে তরুণ—সে স্বয়ং পুষ্পাকীর্টী ঋতুরাজ বসন্ত। ছেলেরা গেয়ে উঠল—

"সাম্‌নে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি!"

তখন, হিমের বাহুর বাঁধন টুটে পাগ্‌লা ঝোরা ছুটি পেয়ে গেল, উত্তুরে হাওয়া উজান বইল। প্রমাণ হ'য়ে গেল চির-পুরাতনের বুকের ভিতর থেকেই চির-নূতনের স্ফূর্ত্তি। বিশ্বকর্ম্মার কারখানায় কুৎসিত গুটিপোকার ভিতরেই সুন্দর প্রজাপতি তৈরী হ'য়ে ওঠে। "Evil is good in the making" শীত হচ্ছে বসন্ত-সম্ভব কাব্যের খস্‌ড়া-খাতা। মৃত্যু নেই, আছে পরিবর্ত্তন; জীবন চঞ্চল হ'লেও, নশ্বর নয়, তার নিত্যনূতন মূর্ত্তি, নিত্য নূতন বেশ। শীত-বসন্তের এই ব্যাপারটি গীতি-ভূমিকা নামে ফাল্গুনীর চারটি অঙ্কের বিরাম স্থানে কন্‌সার্ট বা অর্কেষ্ট্রার বদলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, পর্দ্দা না ফেলে এই গান-গুঞ্জন-মগ্ন ভোম্‌রার ডানার যবনিকা কল্পনা করা হয়েছে। এটি "ফাল্গুনী"র একটি বিশেষত্ব এবং ফাল্গুনীকারের নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভার একটি নূতন পরিচয়।

এদিকে বহিঃপ্রকৃতিতে যখন এই সব অঘটন ঘটছে তখন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, চুপ ক'রে নেই। নব-যৌবনের দল, বনে বনে ফাগুন লেগেছে দেখে একেবারে দক্ষিণের হাওয়ার মতন উল্লসিত হ'য়ে উঠেছে। তারাও আজ অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না। তারা তাদের প্রবীণ দাদার উপদেশপূর্ণ চৌপদী-গুলির প্রতি কর্ণপাত না ক'রে ছুটির দিনের ছেলের দলের মত প্রাণের প্রাচুর্য্যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। বিশ্ব-সংসারে তারা

জীবনকেই শুধু সর্দ্দার বলে মানে, সেই সর্দ্দারই তাদের "মিত্র, মন্ত্রী, মনীষী এবং মশালধারী পথপ্রদর্শক"। তাকেই নেতা করে নব-যৌবনের দল মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা ঠিক করেছে যে, যে-বুড়োটা যৌবনের হাসি ম্লান করে দেয়, দুনিয়ার পাঁজরের মধ্যে যার বাসা, যে ধূলো উড়িয়ে রথ হাঁকিয়ে চ'লে যায়, জীবনে কেউ কখনো যার মুখ দেখেনি অথচ যাকে সবাই ভয় করে সেই আদ্যি-কালের বুড়োটাকে ধরে এনে এবার বসন্ত-উৎসবের খেলা খেল্‌তে হবে, ভয়-ভাঙা আনন্দে উৎসবকে সম্পূর্ণতা দান করতে হবে। যেমন সঙ্কল্প অম্‌নি সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। যে ক্ষ্যাপামির তালে সাগরের পাগল ঢেউ নাচে সেই ক্ষ্যাপামির তালে পা ফেলে এরা চল্‌ল,—রাস্তা ঘাট ঠিক না করেই চল্‌ল—কারণ নব-যৌবনের দলের ধ্রুববিশ্বাস চলার বেগেই পায়ের তলায় রাস্তা জেগে উঠবে।

পথে তারা মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে কোটালকে জিজ্ঞাসা করে, কেউ বুড়োর ঠিকানা বল্‌তে পারে না; কারণ মাঝির দৌড় ঘাট পর্য্যন্ত, ঘর পর্য্যন্ত নয়; কোটালের এলাকা রাস্তা, তার বেশী নয়।

বেলান্ত ঘুরে ঘুরে নব-যৌবনের দল উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্বন্ধে একটু যেন সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ল। হয় তো বুড়োকে ধরতে পারবে না, প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। এমন সময়ে এই দলের সদানন্দমূর্ত্তি চন্দ্রহাস কোথা থেকে একজন অন্ধ বাউলকে নিয়ে হাজির হ'ল। বাউল চোখে দেখতে পায় না, সে গান গেয়ে বিজনের মধ্যে পথ আবিষ্কার করে। কিন্তু সে তো নিজে অন্ধ, কি সাহসে সে অপরকে পথ দেখাতে উদ্যত হ'ল? অন্ধতার অন্ধকারে সে যে পরম বন্ধুকে লাভ করেছে তাঁরই চরণ-শব্দ সে আপনার হৃৎ-স্পন্দনে শুন্‌তে পায়, সেই চরণ শব্দ বরণ করে সে চলে—এই তার সাহসের কারণ—এই তার ভরসার মূল। সে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে। দুঃখের সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পথে ঢোকবার সময় তাকে রিক্ত হাতেই ঢুক্‌তে হয়েছে, সেই জন্যে তার মনের-পাওয়াই এখন তার সর্ব্বস্ব। সেই মনের রত্ন-প্রদীপের আলো সম্বল ক'রে সে চির-জ্যোতির রাজ্যে চলেছে। জীবনে প্রথম যারা সংশয়ের ধাক্কা পেয়েছে এই আত্মপ্রত্যয়বান্ অন্ধই তাদের একমাত্র পথের সাথী। কারণ এই অন্ধ দুঃসহ দুঃখের আঘাত সহ্য ক'রে অটল নিষ্ঠা লাভ করেছে, চিত্ত-সাগর মথন করে চিন্তা-মণির আলোয় ওর অন্ধ-করা অন্ধকার জন্মের মত তিরোহিত হয়েছে। এই অন্ধের নির্দ্দেশমত যৌবন-নিঃশঙ্ক চন্দ্রহাস চির-রহস্যময় গুহার মধ্যে দুঃসাহসের ভরে ঢুকে পড়ল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দলের লোক তার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়ল, তারা বাউলের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু বাউলের কোনো ভয় নেই, সে গাইতে লাগল—

"হবে জয়! হবে জয়! হবে জয় রে
ওহে বীর! হে নির্ভয়!

জয়ী প্রাণ চির প্রাণ
জয়ী রে আনন্দ গান
জয়ী প্রেম জয়ী ক্ষেম জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়! হবে ক্ষয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
ত্যজ ঘুম মেল চোখ
অবসাদ দূর হোক্
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে।"

সত্যিই অবসাদ দূর হোল, চন্দ্রহাস ফিরে এসে বল্‌লে সে বুড়োর দেখা পেয়েছে, অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে সে ঐ আস্‌ছে।—সে আর কেউ নয়—সে আমাদের জীবন—আমাদের সর্দ্দার, বারে বারেই সে নূতন। এইবার পূরোদমে উৎসব আরম্ভ হ'ল। অন্তঃপ্রকৃতিও বুঝলে যে, যাকে চিরকালের বুড়ো বলে মনে করে আসা হয়েছে সে চির-তরুণ—সে জীবন;—জরা তার ছদ্মবেশ, মৃত্যু তার মুখোস্‌। সংশয়ের ভিতর দিয়ে সন্ধানী নব-যৌবনের দল এই সত্যকেই আবিষ্কার করলে, চির-যৌবনের দলীল পাকা হ'ল, তাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হল, বুড়োকে চির-তরুণ ক'রে নিয়ে বসন্ত-মহোৎসবে তারা ছেলে-বুড়োসকলকেই আহ্বান ক'রে গেয়ে উঠল—

তোরা আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর তীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে
যা' আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

কবিশেখর নব-যৌবনের দলকে দিয়ে যে বুড়োকে বন্দী করে এনে জগতের সাম্‌নে তার আসল চেহারা বার ক'রে দিলেন একদিন শাক্যসিংহ সেই বুড়োর সম্বন্ধে লোকের ভয় ভেঙে দেবার জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। বুড়ো বড় সোজা মানুষ নয়। নব-যৌবনের দল আজ যে সিদ্ধি লাভ করলে তা সিদ্ধার্থের সিদ্ধি নয়, আনন্দের সিদ্ধি। এ আনন্দ আরামের নামান্তর নয়, আরামকে যাবার পালা শুনিয়ে এর আরম্ভ। এ আনন্দের খেলা হচ্চে বাঁচামরা, লড়াই করা, ভাঙাগড়া। এর খেলাই কাজ, আবার কাজই খেলা এ বলে—

মোদের যেমন খেলা তেম্‌নি যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।

এ আনন্দ ভয়ডর জানে না, ক্ষয়ক্ষতি মানে না। এই আনন্দ থেকেই "খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" এই আনন্দ সম্বল করেই "জাতানি জীবন্তি" আর যারা শেষ চলা চলেছে তারাও এই আনন্দে "অভিসংবিসন্তি।"

ফাল্গুনীর আনন্দ-অভিব্যক্তির চারটি স্তর। প্রথম স্ফূর্ত্তি বা সঙ্কল্প; দ্বিতীয় সন্ধান; তৃতীয় সংশয়; চতুর্থ আবিষ্কার বা পরম সিদ্ধি।

স্ফূর্ত্তি অঙ্কে কবি যে নূতন নূতন সুরের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, যে আনন্দের উৎস উৎসারিত ক'রেছেন তাতে মন এবং চোখ পলকহারা হ'য়ে যায়। সন্ধানের অঙ্কে উদ্দাম নির্ভীক যুব-হৃদয়ের "শূন্য ব্যোম অপরিমান মদ্যসম পান" করবার

ইচ্ছাটা সংক্রামক হ'য়ে ওঠে, পঙ্গুদের মনেও গিরিলঙ্ঘনের আশা জাগতে থাকে। সংশয়ের অঙ্ক অবসাদের অতলে ডুবিয়ে ধরে, কাউকে মাথা তুলতে দেয় না। কিন্তু সংশয়ের অন্ধকার তেমন জমাট নয়; মেটারলিঙ্কের "দৃষ্টিহারা" নাটকের অন্ধদের সংশয়ের মত এ সংশয় একেবারে কূলহারা নয়; এ নাটকে দৃষ্টিহারা বাউল মনের মধ্যে আশার মণি-প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে, তাই সংশয় এখানে হৃদয়কে একেবারে হতাশ ক'রে ফেলবার অবকাশ পায়নি। আরো বোধ হয় যে, যে-কবি আনন্দলোকের সংবাদ পেয়েছেন তাঁর কাছে সংশয় জিনিসটা আর তেমন মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে না। সংশয় তাঁর কাছে মানুষের অধ্যাত্ম ইতিহাসের একটা কৌতুক-কর পরিচ্ছেদ মাত্র—বড় জোর একটা দুঃস্বপ্নের মত। ফাল্গুনীর সংশয়ের অঙ্ক বোধ হয় কতকটা সেইজন্যে তেমন ঘনিয়ে উঠতে পারে নি। তা' ছাড়া—এ যে নবযৌবনের সংশয়, এ যে মেঘের ছায়া, বড় জোর সূর্য্য-গ্রহণের ফিকা অন্ধকার—এতো জমবার কথা নয়—এতো স্থায়ী হবার কথা নয়—এর পিছনে তীব্র হাস্যের প্রচণ্ড রশ্মিচ্ছটা যে সংহত হ'য়ে রয়েছে—আশ-পাশ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে।

এর পর হচ্ছে আবিষ্কারের অঙ্ক, এই অঙ্কে যার হাসি চন্দ্রের মত উজ্জ্বল সেই মূর্ত্ত যৌবনানন্দ নির্ভীক চন্দ্রহাসকে অন্ধ বাউলের ধ্রুববিশ্বাস পাথেয় স্বরূপ দিয়ে, কবি দুর্গম পথে প্রেরণ করেছেন। সে চিরনূতন—তাকে আবিষ্কার ক'রে এনেছে; নব-যৌবন-দলের প্রতিজ্ঞা রেখেছে, মৃত্যু-রহিত আনন্দরূপের জয় গান করেছে।

ফাল্গুনীর কবি সুরের আলোয় রাশি রাশি সৌন্দর্য্য কলাপের মত বিকাশ ক'রে অন্তরের আনন্দে চিরসত্যকে চিরসুন্দর ক'রে তুলেছেন। "ফাল্গুনী" বিশ্ব-সাহিত্যের একটি মহামূল্য রত্ন। এর আদর জগতের সর্ব্বত্র হচ্ছে, হবে এবং হ'তে বাধ্য। কবির মানস-সরোবরের কমলে-কামিনী হাতী হয়তো গিলতে পারবেন না, কারণ তা হ'লে জগৎ থেকে দিগ্‌গজ পণ্ডিত দিঙনাগের বংশ লোপ হয়ে যাবে; হস্তী-মূর্খদের শুঁড় আস্ফালন এবং "খড়্গিণঃ লাঙ্গুলতাম্" দুর্লভ দর্শন হ'য়ে পড়বে। কিন্তু যা' ক'রেছেন তা' অতুলনীয়, পুলকাঞ্চিত পদ্মের মধ্যে বজ্রমণি দেখিয়ে দিয়েছেন।

এইবার অভিনয়ের এবং রঙ্গ-সজ্জার কথা। সাজ-সজ্জায় বিশেষ কোনো যুগের বা বিশেষ কোনো জাতের হুবহু অনুকরণ করা হয় নি, আর দৃশ্যপট যা' দেখানো হ'য়েছে তা ভূগোল-পরিচয়ের কোনো পর্য্যায়ের সঙ্গেই মেলে না। তা' হ'লেও বেশ সুন্দর এবং ভাবদ্যোতক। নীল রঙের পর্দ্দায় সবুজের আভা—আকাশে এবং অরণ্যে মিলে-মিশে যেন নিবিড় হ'য়ে উঠেচে। গোটা কত তারা দেখা যাচ্ছে। হর-শিরস্থিত চন্দ্রকলার মত একটুখানি চাঁদও দেখা দিয়েচে। দু-একটা গাছের ডাল মাথার উপর ঝুঁকে রয়েছে, তার একটাতে একটি ঝুলনো বাঁধা।



"ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে"—অন্ধ বাউল



"সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি"
দাদা ও নবযৌবনের দল
[শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটোগ্রাফ হইতে]



"সবাই যারে সব দিতেছে"

অন্ধ বাউল

[শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটো হইতে]



ফাল্গুনীর রঙ্গ-সজ্জা

[শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটোগ্রাফ হইতে]

জায়গার ফাঁকে-ফাঁকে তৃণমঞ্জরী বসন্তের হাওয়ায় রঙীন্ হ'য়ে উঠেচে। এর বেশী আর কিছু নয়। এই তো রঙ্গ-সজ্জা;—এরি আবেষ্টনের মধ্যে তিন চার ঘণ্টা-ব্যাপী আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। পাঁচ ছ' বছরের ছেলেমেয়েগুলি পাখীর মত সহজ আনন্দে গান গেয়ে উল্লাসে নৃত্য করে হেসে-খেলে চলে গেল। কেউ হয়েছে পারুল, কেউ বকুল, কেউ আমের মুকুল, কেউ নীড়ের পাখী, কেউ শালের কিশলয়। ঝরনার গতির মত সহজ ওদের নৃত্য, দোয়েল শ্যামার মত সহজ এদের গান! যখন এরা গাইছিল—

"আমরা ডাকি পাখীর গলায়"

"আমরা নাচি বকুলতলায়"

তখন সত্যিই মনে হচ্ছিল সেই জন্যেই পাখীর গান এত মধুর, সেই জন্যেই বকুলের গন্ধ এত চমৎকার।

এই পাঁচ-ছয়ের দলের উপরে একটি দশ-বারোর দল আছে। এই দলেরও সমস্ত অনিন্দ্য; এদের মধ্যে অনেকেই এমন চমৎকার স্বাভাবিক অভিনয় করে যে তা দেখ্‌লে শহরের অনেক নামজাদা অভিনেতার অভিনয়-কাণ্ডে অরুচি জন্মে যায়। এই ছেলেগুলি ঠিক আশ্রম-মৃগ, এদের ছোটগুলি আশ্রমের বুলবুল্। আনন্দ-চাঞ্চল্যে এদের দুটি দলই ওতঃপ্রোত।

এদের উপরকার দল বিশ-ত্রিশের দল, দু-একজন চল্লিশ-ঘেঁষাও আছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই দলের চাঁই—কবি ও সঙ্গীতবিশারদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-



"যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস"

রাজা ও শ্রুতিভূষণ

[শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটোগ্রাফ হইতে]



"কে গো তুমি ?—কামিনী ফুল"

বসন্তের জাগরণ

শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটোগ্রাফ হইতে]

প্রতিভার ইনি ভাণ্ডারী, এ বিষয়ে এঁর দ্বিতীয় নেই। এঁর পরেই অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিজ্ঞান-বিদ্ জগদানন্দ রায়, শিল্পী অসিতকুমার হালদার, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন এবং বোলপুরের বিদেশী ছাত্র নরভূপ রাও। শীত ও বসন্তের ভূমিকায় প্রিয়দর্শন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বেশ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া বোলপুরের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী যে গানটি গেয়েছিলেন সেটিও এবার বেশ উৎরেছিল। সর্দ্দার চলনসই, মাঝি মাঝামাঝি, অনাথ কলুর অংশ বেশ ভালো। কোটাল আরও ভালো।

এইবার সব চেয়ে বড়র দলের কথা। এই দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্র নাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং অধ্যাপক উইলিয়ম্ পিয়ার্সন।

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েছিলেন; তাতে তিনি ধীর গম্ভীর রাজমন্ত্রীর যে ছবিটি দেখিয়েছেন তা মনে রাখবার মতন। এঁর পোষাক ছিল ভারতবর্ষের মন্ত্রীবর্গের শীর্ষস্থানীয় মারাঠি পেশোয়াদের ধরণের।

রাজার ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁর চাল, চলন, হাসি, এমন কি প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী পর্যন্ত রাজোচিত হয়েছিল। এঁর রঘুবংশের রাজাদের মত লীলাকমল ঘোরানো, এঁর ধাতুদর্পণে বারবার পাকাচুল দেখা, লক্ষ্মী-ছাড়ার দলের অভিনয়-কালে আনন্দে অধীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে 'সাধু' 'সাধু' জীবনে কখনো সত্যিকারের রাজা না দেখ্লেও তার সেদিন রাজা দেখা হয়েছে। রাজার পোষাকও চমৎকার হ'য়েছিল, অজন্তার প্রাচীন চিত্রপট যেন জীবন্ত হ'য়ে দেখা দিয়ে গেল।

ভারত-শিল্পের নবীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজ-গুরু শ্রুতিভূষণের অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হাস্যরসের ভূমিকায় এঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। এঁর অভিনয়-কালে অনেক জমাট গোঁফের চির-কুজ্ঝটিকা হাসির আলোয় পুলকিত হয়ে উঠেছিল।

এইবার স্যার রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের কথা। তরুণ কবিশেখর এবং বৃদ্ধ বাউল এই দুটি বিচিত্র ভূমিকায় ইনি স্বয়ং অবতীর্ণ হন। এঁর অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বল্তে যাওয়া বাচালতা মাত্র। এ শুধু চোখে দেখবার নয়, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে উপভোগ করবার এবং চিরজীবন স্মরণ করবার জিনিস। এই মাত্র কবিশেখরের মূর্ত্তিতে লীলা-চপল অভিনয়ে যিনি চঞ্চল জীবনের এবং চঞ্চলতর যৌবনের জয় গান ক'রে রাজার নিরেট বৈরাগ্যকে আবীরের গুঁড়োর মতন দুই হাতে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে গেলেন, পর-মুহূর্ত্তেই তিনি অন্ধ বাউলের বেশে অশ্রু-সরস অটল নিষ্ঠার মূর্ত্তিতে সংশয়ের বিজন দেশে অন্ধকারের তীরে তীরে দুর্গমচারী যাত্রীদের দৃষ্টিহীন পথপ্রদর্শক হ'য়ে দেখা দিলেন। নব-যৌবনের দলের সুপ্তবিশ্বাসকে নিজের বিশ্বাসের দ্বারা আবার জাগিয়ে দিতে এলেন। দুঃখের মূল্যে অমৃত ক্রয় ক'রে সেই অমৃত হাটে মাঠে ছড়িয়ে দেবার

গ্রহণ করা যার-তার কর্ম্ম নয়। জীবনে যে অন্ততঃ একদিনের জন্যও অমৃতের আস্বাদ পেয়েছে কেবল সে-ই এ ছবি আঁকতে পারে; শুধু সে-ই এ বাউল সাজ্‌তে পারে। যে ধ্যানরসিক ধ্যানের এই মূর্ত্তি জগৎকে আজ দেখিয়েছেন তিনি জগতের নমস্য। চিরবসন্তের বীণা তাঁর হাতেই শোভা পায়, কারণ চির-উৎসবের উৎস তিনি উৎসারিত ক'রে দিয়েছেন।

চির-বসন্তের বীণ
বাজাও যামিনী দিন
চির-যৌবনের ওগো চির-পুরোহিত!
শীতে ম্লান দুনিয়ায়
লাগালে ফাল্গুনী বায়
সবুজ পাতায় তুমি জাগালে সঙ্গীত।
চির-প্রাণে প্রাণ-বান
অফুরাণ তব দান
অমৃত তোমার গান নবীয়ান্ নিতি;
তোমারে কী পারি দিতে—
পারিজাত অবনীতে—
নাই কবি, দিনু তাই অন্তরের প্রীতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সরস্বতী

তুষারে যে সব পড়েছে মানস-সরের ফটিক জলে
কে ফোটালে শ্বেত শতদল সহসা সেই তুষার-তলে।
কে জেগেছ আদিম ঊষা
কে জেগেছ জ্যোতির্ভূষা
শুভ্র আলোর মৃণাল-সূতায় বিশ্ব-হিয়ার কৌতূহলে
কে রেখেছ অমল চরণ গোপন প্রাণের পদ্মদলে।

মুকুট তোমার উজল রাজে শিশু-আঁখির শশী-কলায়,
মুক্ত মনের লাবণ্যেরি মুক্তামালা তোমার গলায়;
সত্য স্বপন দ্বন্দ্বহারা
জড়ায় পায়ে নূপুর পারা
ঘুরে ফিরে ছন্দ-মরাল ভিড়ায় ডানা পায়ের তলায়

চাঁদের আভা নিছিয়ে নেওয়া তোমার বীণার চাঁদির তারে
চকোর-লোভন উথ্‌লেছে সুর তিতিয়ে ভুবন সুধার ধারে ;
ধবল-গিরির পৈঠা পরে
মর্ম্মরে আর স্ফটিক স্তরে
বরফ-চূরের বিম্বে শাদা ঝর্ণা ঝরে হীরার হারে
শুভ্র সুরের গান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে সে ঝঙ্কারে।

চতুর্ম্মুখের হাস্য-রুচি যশঃ-শুচি জ্যোতির্ম্ময়ী।
দেবি ! তোমার দিব্য আঁখির দীপ্তি-পাতে উজ্জ্বলত্রয়ী !
জ্যোৎস্না-জরির সুতায় বোনা
ছন্দ-কলির চন্দ্র-কোণা—
গগন তোমার ভাব-তনুটি বেড় দিয়ে ওই স্পর্শে মহী
সত্য-সূর্য্য নেত্র তোমার তুমি স্বয়ম্প্রভা অয়ি !

তুমি সকল প্রকাশ-করা সকল-শুভ্র মূর্ত্তি তব,
নিখিল-চিত্ত-নবীন-করা প্রখর তুমি—জীবন নব ;
সত্য তুমি নিত্য তুমি
লক্ষ্মীছাড়ার বিত্ত তুমি
যে বর হাতে নাই বরদার দাও যে তুমি সে দুর্লভও
মর্ত্ত্য-লোকের অমরতা—তোমার কৃপা-সমুদ্ভব।

পুণ্য-শুভ্র অধর তোমার স্মিত-হাসির পুলক তা'তে,
প্রজ্ঞা তোমার চোখের কাজল সৃজন-প্রাতে প্রলয়-রাতে ;
নীহারিকার নিতল বুকে
শীতল চরণ রাখলে সুখে
ভায় ছায়াপথ শূন্যে—তোমার শুভ্র পায়ের আল্‌পনাতে,
চন্দনে শ্বেত পরশ তোমার হরষ চন্দ্র-মল্লিকাতে।

মন্‌-গহনের শ্বেত হরিণী। মহাশ্বেতা সরস্বতী !
মন্‌-মানসের ফুল-কমল অমল তোমার ওই মুরতি।
অমল তোমার অভ্র-পুঁথি
ধবল শঙ্খ তোমার স্তুতি
অমল তপের লও আহুতি চিত্তলোকের উষা-জ্যোতি
কর্পূরেরি শুভ্র প্রদীপ তারায় তোমার সন্ধ্যারতি।

আশিস তোমার মৃত্যুঞ্জয়ী, হাসি সে শুকতারার ভায়ে ;
মন্দারেরি অমল মালা বিলাও দেবী ! ডাহিন বাঁয়ে।
মরাল রথে মনোজবে
ফিরছ তুমি ভাবের ভবে
গন্ধরাজ আর পারিজাতের অঞ্জলি ওই শুভ্র পায়ে,
পায়ের আভায় ঘাম দিয়েছে চন্দ্রকান্ত-মণির গায়ে।

সদ্য-গলা বরফে ফুল ফুটিয়ে হঠাৎ লাখে লাখে
চেতন-লোকের মগ্ন-তটে জাগে তোমার প্রসাদ জাগে,
দ্বাদশ রাশির আলোয় ঝামর
চাঁচর মেঘে ঢুলায় চামর
লুটায় কবি, সিদ্ধ অমর তোমার পদ্মাসনের আগে
উজল তোমার কিরীট-হীরা ধ্রুব-তারার কিরণ- রাগে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা নব্য ভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং তাহাতে শূদ্রের কতটা শাস্ত্র-সম্মত অধিকার আছে, তাহাই শাস্ত্রাদির সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র চিরদিনই উদার মত প্রচার করিয়া আসিয়াছে, শুধু স্বার্থের জন্য পরে শাস্ত্রের মধ্যে বিস্তর নীচ মত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—সেটুকু লেখক সুদক্ষভাবে ধরাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্য ক্রমে শিক্ষার ফলে সকলেরই এখন এদিকে দৃষ্টি পড়িতেছে—সমাজের কতকগুলা অশিক্ষিত ব্যক্তি যথেচ্ছাচার করিয়া সব ভাঙ্গিবে গড়িবে, শিক্ষিত সম্প্রদায় আর তাহা সহ্য করিতেছেন না। ফল দাঁড়াইতেছে, অতিরিক্ত গোঁড়ামির আশ্রয় লইয়া সব-ঠেলিয়া-ফেলার দল ক্রমশই হীন-বল হইতেছে। উন্নততর উদারতর হিন্দুর অভ্যুত্থান ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষং—সমাজ ক্রমে এ পৌরুষের মূল্য বুঝিতেছে এবং তাহার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, সে সম্বন্ধে আশাও আমাদের বিলক্ষণ আছে। বর্জ্জন-নীতি অধঃপতনের পূর্ব্বলক্ষণ, এ কথা দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকে এখনও বুঝিতেছেন না—তাঁহারা এখনও গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসান্ দিয়া চলিয়াছেন—বুঝিতেছেন না, ক্রমশঃ কোন্ অন্ধকারের দুর্গম গহনে গিয়া পৌঁছিবেন। এ ব্যাপারে চৈতন্যলাভ করিতে হইলে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। শিক্ষা (culture) ব্যতিরেকে সমাজের শক্তি সঞ্চার অসম্ভব। দেশবাসী সকলেরই এদিকে সবিশেষ উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। লেখকের এ গ্রন্থ সেদিকে মৃদু ইঙ্গিত করিয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে



বসন্ত

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত চিত্র হইতে।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]　　　　চৈত্র, ১৩২২　　　　[১২শ সংখ্যা

দেনা-পাওনা

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তারো বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে' ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন,
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি;
সুখস্বপ্নরসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছাসি।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে থুয়ে
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে

তুমি ত গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে—
সিংহাসন হতে নেমে
হাসি-মুখে তাই তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

২৪ মাঘ, ১৩২১
পদ্মাতীর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেকেলে কথা

শ্রীযুক্ত মণিলাল গাঙ্গুলির সহিত ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকার সম্বন্ধটুকু অম্ল-মধুর। ইনি সম্পর্কে আমার নাতিনীজামাই। যখন অন্নব্যঞ্জন মুখে রোচেনা তখন অম্ল-ব্যঞ্জনে অরুচি দূর করে। ইনি আমাকে ধরিয়া পড়িয়াছেন—"আপনি সেকালের কথা লিখুন।" নব সম্পাদকের এই মিষ্ট অনুরোধে লিখিবার তিক্ত পরিশ্রমও আজি সহজসেব্য হইয়া উঠিয়াছে, লেখনীর ভারও আজ লঘু বোধ করিতেছি।

লিখিতে হইবে আমাকে সেকালের কথা? তাই ত! ইহার মধ্যেই সেকেলে হইয়া পড়িলাম! পুনঃপুনঃ আবৃত্তি না করিলে কিন্তু কথাটা ভুলিয়া যাইতে হয়। এই ত সে সেদিন—যেদিন দিদিমা বেচারীরা আমাদের একেলে-পনার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতেন, আর নব্য নারী আমরা তাঁহাদের সেকেলে-পনার গঞ্জনা অকাতরে সহ্য করিয়া নায়িকা-দর্প অনুভব করিতাম।

ধিকারসূত্রে আজি আমাদিগেরই হস্তগত তথাপি বিনা প্রয়োগে তাহা পেটিকাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছি।

ইন্ডলিউসনের হাওয়া যেরূপ প্রবলভাবে বহিয়াছে—তাহাতে কেবল ইংলণ্ডে সফরিজিষ্টদল নহেন বিশ্বের মেয়ে-মহল স্বাধিকারলাভ বাসনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালীর মেয়েও যে আর অবলা নহেন, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এক্ষেত্রে আমার হাতের অস্ত্র কাড়িয়া সহজেই যে তিনি আমাকে নিরস্ত করিবেন এ ভয়টুকু বিলক্ষণ আছে। বেশ জানি তাঁহাকে দোষী করিলেই তিনি বলিবেন—"একেলে"কে ত গঠন করিয়াছে "সেকেলে"ই, অতএব তাহার কাজের জন্য দায়ী ত তোমরাই।"

কথাটা সত্য বটে, কিন্তু তবুও উঃ কি আস্পর্দ্ধা! আমাদের কালে কি আমরা এরূপ উত্তর দিতে পারিতাম! বুক ফাটিলেও তখন মুখ ফুটিত না! তবেই দেখ একালের মেয়েদের যে পরিমাণে বলিবার বুঝিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে সেই পরিমাণে সহিবার বহিবার শক্তিও কমিয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইহাই এযুগের স্থূল এবং মূল লক্ষণ। সুস্থশরীর, শারীরিক পরিশ্রম, সুপ্রসব এসকল যেন এখন সেকেলে-ফ্যাসানের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া বলিবার মত নূতন কথা কিছু ত খুঁজিয়া পাই না। আমাদের কালে যাহা ছিলনা, এখন তাহা হয় নাই। তখনকার অঙ্কুর এবং চারা গাছই এখন পত্রপুষ্পে সুশোভিত। বরঞ্চ যে গাছ শুকাইয়াছে, যে ফুল ঝরিয়াছে তাহার [illegible]

স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে, এখনকার দিনের মত বি এ, এম-এ তখন না থাকিলেও বিদুষীর আদর তখনও যথেষ্ট ছিল। অন্ততঃ আমাদের বাড়ীর দৃষ্টান্ত ত এইরূপই দেখি। আর আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতিরও মূল-পত্তন হইয়াছে আমাদের কালেই।

বহু বৎসর পূর্ব্বে অন্তঃপুর-শিক্ষাসম্বন্ধে আমি "প্রদীপ" নামক মাসিক পত্রিকায় যে কথা লিখিয়াছিলাম—সম্ভবতঃ তাহা অনেকের পক্ষেই এখন নূতন হইবে। এই আশা বিশ্বাসে সেই কথাই এখানে পুনরাবৃত্তি করিয়া আজি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন সে প্রায় শতাব্দিকালেরই কথা। তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ সকলেই তখন সপরিবারে এক বাড়ীতেই বাস করিতেন। শুনিয়াছি এই বহু পরিবারের মধ্যে কোন নারীই তখন মূর্খ ছিলেন না, বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তখনো তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন।

এই ত গেল আমার পক্ষেও যাহা সেকাল সেই কালের কথা। আর আমাদের কালেও তাহারি জের চলিয়া আসিয়াছে। আমি দেখিয়াছি আমাদের দূর-সম্পর্কে এক আত্মীয়া ভগিনী, মাতার বয়স্যা,—চমৎকার বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতেন। সংস্কৃতও তিনি কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন।

সেই জন্য মেয়েমহলে শুধু নয়, পুরুষ-মহলেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইঁহাদিগের পৌত্রী দৌহিত্রীদিগের মধ্যে বরঞ্চ লেখাপড়ার এরূপ আদর দেখি নাই, কাহাকে কাহাকেও মূর্খ দেখিয়াছি। বৃদ্ধাগণ প্রৌঢ়াগণ আমাদের বাড়ীতে যেরূপ বিদ্যানুশীলনের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবংশীয়া নবীনাগণ অন্যত্র গিয়া শিক্ষালাভের সম্ভবতঃ সেরূপ সুবিধা পান নাই।

আহার, বিরাম, পূজা-অর্চ্চনার ন্যায় সে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতি দিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞঠাকুর পাঁজি-পুথি-হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবীঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল, অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনা-শক্তি ছিল, কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবীঠাকুরাণীর দেবদেবী-বর্ণনা, প্রভাত-বর্ণনা শুনিতে কুতুহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবীঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার বর্ণনাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইঁহার প্রভাত-বর্ণনার অনুকরণ যাহা শুনিয়াছি, নব্যবংশের প্রীতির জন্য তাহা সযত্নে স্মৃতিরক্ষিত করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

"যামিনী চতুর্যামে লগ্না হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করতে পার্‌ছেন না; প্রভাত পূর্ব্বদিগন্তের নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু প্রকাশ হ'তে পার্‌ছেন না। কেননা শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেমবন্ধনে নিদ্রাচেতন্ হ'য়ে রয়েছেন। আহা, সারানিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন। মরি, মরি! আহা প্রাণ-স্বরূপ শ্রীহরি, প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বিহঙ্গবিহঙ্গীর কল-রব নাই; নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারা পূর্ব্বাকাশ হ'তে এখনো অস্ত যেতে পারছেন না, সূর্য্যদেব অরুণ-রথে সমাসীন হয়ে উদয় হ'তে ভয় পাচ্ছেন। সৃষ্টিতে প্রলয় আসে-আসে। সূর্য্যদেব চিন্তাকুল হৃদয়ে রথ ফিরিয়ে ভগবান ব্রহ্মার সদনে উপনীত হলেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে এই সমূহ বিপদের কথা অবগত করালেন। ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণনা ক'রে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গে অন্যোপায় না দেখে কৃষ্ণপক্ষীর (রামপক্ষী) স্মরণ কর্‌লেন, পক্ষী আগত হলে বল্লেন, "হে কৃষ্ণভক্ত বিহঙ্গম, তুমি না রক্ষা কর্‌লে এ বিপদে পরিত্রাণ নাই। হে অগতির গতি, ভক্তচূড়ামণি, তুমি ভিন্ন ভগবান বিষ্ণুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করে এমন সাধ্য আর

লের প্রতি কৃপাবান্ হয়ে তুমি গিয়ে তাঁকে জাগরিত কর;—নচেৎ সৃষ্টি এখনি লোপ পায়! পক্ষীবর ব্রহ্মার বচনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্ভয় প্রদান ক'রে, বৃন্দাবনের নিকুঞ্জদ্বারে এসে ডাক্‌লেন—কুক্‌কুহুকু অর্থাৎ উঠ হে উঠ,—কুক্‌কুহুকু! কুক্‌কুহুকু! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেব কমললোচন উন্মীলন করে দেখলেন প্রভাত হয়েছে।"

যতদূর স্মরণ হচ্ছে তাতে লজ্জিত বোধ না করে এই সুখের মিলনভঙ্গ-জনিত অপরাধে তিনি পক্ষীবরকে যে অভিশাপ প্রদান কর্‌লেন সেই শাপেই তখনকার পূজ্য পবিত্র কুক্কুট-পক্ষী এখন হিন্দুর অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছের খাদ্য।

আমি যে গল্পটি হুবহু আমার খুল্লতাত-পত্নীর ভাষায় আবৃত্তি করিলাম এমন নহে; ভাষার রূপান্তর হইয়াছে সন্দেহ নাই। সে এত ছেলেবেলার কথা যখন কাকিমার মুখ হইতে পীড়াপীড়ি করিয়া এই বর্ণনা শুনিতাম। সমস্ত কৌতূহল সমস্ত প্রাণ তখন কুক্‌কুহু কথাটির উপর পড়িয়া থাকিত। কখন্ পাখী ডাকিয়া উঠিবে সেই আগ্রহে প্রথমাংশের প্রতি তেমন মনোযোগই হইত না। তবে এতবার এই গল্পটি শুনিয়াছি, তাই এখন মনে করিয়া ভাষা রচনা করিতে পারিলাম।

বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃসীমাবদ্ধা মহিলাগণের জন্য; বালিকা নববধূ ও বিবাহিতা বালিকা কন্যাগণ ইঁহার কাছেই শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর অবিবাহিতা কন্যাগণ বালকদিগের সহিত একত্রে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর কিছু না হউক, বালকবালিকার শিক্ষার ভিত্তি সমভাবেই গঠিত হইত।

তখন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় হয় নাই। বৈষ্ণবীঠাকুরাণী যে পুস্তক হইতে বর্ণবোধ করাইতেন, তাহার নাম শিশুবোধক। পুস্তকখানি আমি বড় হইয়া দেখিয়াছি। অক্ষরমালা, বানান, দেবদেবী-বন্দনা, যাম-বর্ণনা, লিপিলিখন-প্রণালী—এ সমস্তই এই একখানি পুস্তকের মধ্যে স্তূপীকৃত। বন্দনা ও বর্ণনার ভাষা এত কঠিন দুর্ব্বোধ্য যে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলেই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা এক রকম শেষ হইয়া যায়। তাঁহারা লেখা অভ্যাস করিতেন প্রথমে তালপাতে, তাহার পর কলাপাতে। বালির কাগজে কঞ্চী কলমের মক্‌স সর্ব্বশেষে।

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা—মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধান খানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের "তত্ত্ববিদ্যা'র

সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলানা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্ধুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত। বড় হইয়া সে-কালের বইগুলি যথেষ্ট নাড়াচাড়া করিয়াছি;—মানভঞ্জন, প্রভাসমিলন, দূতীসংবাদ, কোকিলদূত, রুক্মিণীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদচরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, চাহারদরবেশ, হাতেমতাই, গোলেবকায়লী, লয়লামজনু, বাসবদত্তা, কামিনী-কুমার ইত্যাদি। পাঠক দেখিতেছেন এতগুলির মধ্যে একখানি কেবল নামকরণে সামাজিক; কামিনী-কুমার কাব্যে লিখিত উপন্যাস। তখন পর্য্যন্ত গদ্যে উপন্যাস লিখিত হয় নাই। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের শৈশবে রামনারায়ণ তর্করত্ন গদ্যে সংস্কৃত নাটকাদি অনুবাদের পর, 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' 'বহুবিবাহ নাটক" প্রভৃতি সামাজিক নাটক রচনা করেন। কালী সিংহের হুতোমপেঁচার নক্সা, প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাসাবলী ইহারও পরে রচিত। অথচ সাহিত্যনামাবলীতে কামিনীকুমারের নাম কেন দেখিতে পাই না? 'কামিনীকুমার' পদ্যে লিখিত উপন্যাস, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, বিদ্যাসুন্দরের ঠিক অনুকরণ নহে। পূর্ব্বে কাব্য লিখিতে হইলেই ভারতচন্দ্র রায় তাহার আদর্শ হইত। শুনিয়াছি মদনমোহন তর্কালঙ্কার "বাসবদত্তা" লিখিবার সময় পণ করিয়া লিখিতে বসেন, যে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুকরণে কাব্য লিখিয়া ভারতচন্দ্রকেও হারাইবেন। কিন্তু পুস্তক বাহির হইলে, তখনকার সমজদারদের বিচারে তাঁহাকে ভগ্নচেতা হইতে হয়, ক্ষোভে সাধের বাসবদত্তা তিনি অগ্নিসমর্পণ করেন। দুই-চারিখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই যাহা বাহিরে প্রচার হইয়াছিল, তাহাতেই মাত্র মদনমোহনের মহিমা আবদ্ধ থাকে।

কবিত্বে বা ঔপন্যাসিক রহস্যে কামিনীকুমারের মূল্য অধিক, এরূপ বলিতে পারি না—তথাপি সাহিত্যসমাজে ইহার নাম রক্ষা হওয়া উচিত। চলিত বঙ্গসমাজের স্ত্রীপুরুষ লইয়া নায়কনায়িকা রচনার ইহা সর্ব্বাদি পুস্তক। যতদুর মনে পড়িতেছে, কামিনীকুমারের গল্পটি এইরূপ—প্রথমে নায়কনায়িকার জন্মবিবরণ, রূপবর্ণনা, পরে বয়ঃপ্রাপ্তে উভয়ের দর্শন, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, মিলন-আশায় উভয়ের দেশভ্রমণে নির্গমন; স্থান বর্ণনা, কোন কোন স্থানে উভয়ের সন্দর্শনলাভ; কামিনী ছদ্মবেশী পুরুষ, অতএব কুমারের নিকট অপরিচিত, কিন্তু কুমারকে কামিনী চিনিয়া তাহার

সহিত রহস্যালাপে রত, অবশেষে উভয়ের গৃহে প্রত্যাগমন, মিলন ও বিবাহ। ইহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার মধ্যম খুল্লতাত।

পিতৃদেবকে ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন। এবং যেহেতু আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার পৃথক বস্তু নহে, পরস্পরসংলিপ্ত, সেই হেতু ধর্ম্মসংস্কারের সহিত যে-পরিমাণ সমাজ সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সেই-পরিমাণে গৌণ-ভাবে তিনি সমাজসংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু গৌণভাবে নহে, ধর্ম্ম-সংস্কারের ন্যায় সমাজসংস্কারেও যে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইহার দ্বারাই যে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্য-বিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের সুসভ্য পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তন সংকল্পেও যে কতদূর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে পারি। ধর্ম্মসংস্কারে রামমোহন রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে, কিন্তু সমাজসংস্কারে যে পিতৃদেব বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

বেথুনস্কুল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া যে দুই-একটী মহোদয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শিশু কন্যাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাঁহাদের মধ্যে একজন।

পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষাসংস্কার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার উন্নতি আরম্ভ। তখন হইতে ধর্ম্মসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জ্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ, এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মবৃত্তি সমভাবে সম্মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, সমস্ত ভারতব্যাপী বহুকাল প্রচলিত হীন স্ত্রী-আচার দুই একটি করিয়া নিজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন; আজিকালিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিলেন ও বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ পর্য্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার শিশুকন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গলার সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশববাবু পিতামহাশয়ের শিষ্য হইলেন।

লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন। অনেকে এই ঘটনাটিতে অসমসাহসিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হন। কিন্তু মহর্ষি পিতৃদেব, যিনি ধর্ম্মের জন্য আত্মীয় বান্ধব, সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য অবাধে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি যে সত্যধর্ম্ম গ্রহণাপরাধে গৃহতাড়িত, শিষ্যরূপে সমাগত, শরণাগত সস্ত্রীক কেশববাবুকে দেশাচার তুচ্ছ করিয়া পুত্রস্নেহে গৃহে গ্রহণ করিবেন, ইহা কি বড়ই আশ্চর্য্যের কথা?

যদি আশ্চর্য্য হইতে হয়—তবে ইহার পরবর্ত্তী আর একটি কার্য্যে। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এ সকলই মেজদাদামহাশয় বিলাত যাইবার পূর্ব্বেকার কথা। তাঁহার বিলাত গমনের দুই-তিন বৎসর পরে একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিলেন। মেয়ের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া পিতৃদেবের মনে হইল না। আদি-ব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস ভুগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।

বঙ্গমহিলার সাধারণ-প্রচলিত একখানি মাত্র সাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল। দিদি আমাদের মাতুলানী এবং বৌঠাকুরাণী-গণ একরূপ সুশোভন পেসোয়াজ এবং উড়ানী পরিয়া পাঠাগারে আসিতেন। বাঙ্গালী মেয়ের বেশের প্রতি আজীবন পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা, এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল। মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু অবিশ্রান্ত তাঁহার শিশুকন্যাদের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও তিনি ত্রুটি করেন নাই। আমাদের বাড়ীতে সেকালে খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান বালক-বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্ত্তে নিত্য নূতন পোষাকে সাজিয়াছি। পিতামহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের কাপড় ফরমাস করিয়াছেন; দরজি প্রতিদিনই তাঁহার কাছে হাজির, আর আমরাও। কিন্তু এত পরীক্ষাতেও তিনি আমাদের জন্য বেশ একটি পছন্দসই বেশ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেজ-বধূঠাকুরাণী বোম্বাই হইতে গুর্জ্জর মহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন তখনই তাঁহার ক্ষোভ মিটিল। দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলনে, এ পরিচ্ছদ তিনি যেমনটি চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম মনের মতনটি হইয়া, বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাবমোচনে তাঁহার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ করিল।

বিলাত হইতে ফিরিবার পর হইতে

স্ত্রীজাতির উন্নতি-সংকল্পে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন আমার পূজনীয় মেজদাদা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এতদিন যে তিনি এ সম্বন্ধে নীরব, নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়াছিলেন এমন নহে, তবে এতদিন পিতার নেতৃত্বে পুত্র তাঁহার সহায়তা করিতেছিলেন, এখন স্বাধীন ও উপযুক্ত হইয়া পিতার বিশ্রামাবসরে নিজে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। আশৈশব ইনি মহিলা-বন্ধু; স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই উক্ত বিষয়ের ঔচিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ সতেজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। পিতৃদেব অন্তঃপুরের মঙ্গলের জন্য যে-সকল আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, অধিকাংশই ইঁহার পরামর্শে, ইঁহার প্ররোচনায় সম্পাদিত। ইনি এ সকল কার্য্যে পিতার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। অন্তঃপুরের অবস্থা সংশোধনের জন্য মাতাকেও ইনি ক্রমাগত ভজাইতেন। আজন্ম যে উদ্দেশ্য ব্রতরূপে হৃদয়ে ধারণ পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, নিজে সকর্ম্মা স্বাধীন হইয়া অদম্য অটল উৎসাহে তাহার উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন হইতে আমাদের বাড়ীতে—কেবল তাহাই নহে, সমগ্র বঙ্গসমাজে তাঁহার যুগ আরম্ভ। পিতা মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন করিয়াছিলেন, পুত্র তদুপরি প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করিলেন; পিতা তাঁহার অন্তঃপুরে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, পুত্র তাহা সযত্নে ফলবন্ত করিয়া সে ফল সমাজে বিতরণ করিলেন; পিতা ঘরের সংস্কারে বঙ্গের নেতা, পুত্র ঘরের দৃষ্টান্ত পরকে সমর্পণে ধন্য। একজন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জনয়িতা, একজন স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক।

মেজদাদামহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষে এবং তাঁহার সার্ভিস আরম্ভ হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। তখন অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখন মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এবাড়ী হইতে ওবাড়ী যাইতে হইলে ঘেটাটোপ-মোড়া পাল্‌কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখন নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্‌কী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে। স্ত্রীকে মেজদাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই—সমুদ্রপথে, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই নূতন এতই লজ্জাজনক যে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্‌কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল। একজন ফ্রেঞ্চ মহিলা তাঁহার বহির্গমনের উপযোগী নূতন বেশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু অদম্য ইচ্ছার স্রোতে দৈব পর্য্যন্ত গা ঢালিয়া দেয়—মানুষের কি কথা! দুই বৎসর পরে মেজদাদা যখন সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিলেন, তখন আর কেহ বধূকে পাল্‌কী করিয়া গৃহে আসিতে বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত।

বাড়ীতেও এই সময় ইঁহারা একরূপ

একঘ'রে হইয়া রহিলেন। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সহিত অসঙ্কোচে খাওয়া-দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে দ্বিতীয়-বার যখন মেজদাদা বোম্বাই হইতে বাড়ী আসিলেন তখন বাঁধাবাধি অনেকটা শিথিল হইল। তখন সবে মাত্র আমার বিবাহ হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীশিক্ষানুরাগী, উন্নতিপ্রবর্ত্তক। বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহাকেও জীবনে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, তিনি মেজদাদার সঙ্গে পূর্ণপ্রাণে মিশিয়া তাঁহার দলপুষ্ট করিলেন, এবং বাড়ীর আর-সকলেরও মতামত অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানিনা বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম। বৎসরান্তে সকলে একত্রে ফিরিলাম।

ভাঙ্গনধরা তীর অনেক দূর পর্য্যন্ত খসিল। কলিকাতায় ফিরিয়া মেজদাদা আর নিজের ঘরে একঘরে নহেন, দলে পুষ্ট। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে বাড়ীর আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল।

এইখানে বলা আবশ্যক, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচারক না হইলেও, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে সেজদাদা পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও চিরকাল উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে অনেক সময় আমাদের নিজে শিক্ষাদান করিতেন। বিবাহের পরে তাঁহার শিক্ষদানের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন তাঁহার পত্নী। সেজদাদাই প্রথমে দেশাচার কুলাচার ভাঙ্গিয়া তাঁহার পত্নীকে আমাদের বাড়ীর গায়ক বিষ্ণুর নিকট গান শিখাইতে আরম্ভ করেন। মহর্ষিদেব ইহাতেও আপত্তি করেন নাই। শ্রীমতী প্রতিভা দেবী যিনি সঙ্গীত বিদ্যায় বঙ্গমহিলাগণের অধুনা নেত্রীস্বরূপ তিনি হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই কন্যা।

বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর সহিত স্বতন্ত্র আবাসে বাসকালীন তিনিও আমার সেতার শিক্ষার জন্য ওস্তাদ নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ আমাদের বাড়ীতে শিক্ষার স্রোত বেগে বহিতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গান বাজনা, লেখাপড়া সর্ব্ব রকমে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল। দিদিরা পর্য্যন্ত ঘরে কাঁচিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী করিয়া যাতায়াত ত আর লজ্জার বিষয়ই নহে, পাল্‌কীর চলন একরকম উঠিয়াই গেল। আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দি কাল মেজদাদামহাশয় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাঁহার দৃষ্টান্তে, তাঁহার যত্নে আমাদের অন্তঃপুরে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কেবল আমাদের গৃহে কেন? তাঁহার দৃষ্টান্ত সমস্ত বঙ্গে আজ পরিব্যাপ্ত। এ দেশের কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার পক্ষেই এখন বাহিরে যাওয়া সেরূপ নূতন নহে, সেরূপ লজ্জাজনক নহে। বাহিরে যাইতে হইলে সুসভ্য পরিচ্ছদেরও আর ভাবনা নাই। এখন স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা

বহুবিস্তৃত। যে কণ্টকাকীর্ণ পথ বহুযত্নে বহু পরিশ্রমে তিনি মুক্ত প্রসারিত করিয়াছেন, বঙ্গবালা-মাত্রেরই নিকট তাহা এখন সহজ, সুগম। উন্নতিশীলা মহিলাদিগের কথা ছাড়িয়া,—অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যেও উন্নতির এই স্রোত প্রবাহিত। এখন কন্যাকে দেখিতে আসিয়া বরপক্ষীয়গণ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন কন্যার লেখাপড়া কিরূপ। রীতিমত বিদ্যাচর্চ্চা, শ্বশুর শাশুড়ীর নিকটও কন্যাভাব, গাড়ী চড়িয়া যাতায়াত, বোম্বাই ফ্যাসানে পরিচ্ছদ পরিধান—এ সকল এখন হিন্দু-সমাজনীতির অঙ্গীভূত। আর এ সকলের যিনি প্রবর্ত্তক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে শত বাধা একাকী এক হস্তে উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রগামী হইতে হইয়াছে। নিজের বাড়ীর লোকে পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত যোগ দিতে ভয় পাইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতিতে ইনি এমনই অটলসংকল্প ছিলেন, মহিলাদিগের মঙ্গল-কল্পনায় ইনি এমনি আনন্দলাভ করিতেন যে, এ সাধনার জন্য তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই; কোন অপমানেই তাঁহাকে নত করিতে পারে নাই। আজকাল যাঁহারা সমাজে স্ত্রীকে লইয়া বহির্গত হন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই বহু পুরুষের মাঝে দু-একটি মহিলাকে লইয়া গিয়া অন্যের অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট হইতে লজ্জা-বোধ করিবেন, কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা ইঁহাদের দলভুক্ত নহেন, অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে যান না, তাঁহাদের সঙ্গে স্ত্রীকে পরিচিত করিতেও সেন্টিমেন্ট, মেজদাদার যুক্তি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহার নিকট এ কথা পাড়িলে তিনি রাগিয়া বলিবেন, একরাশ পুরুষের সভায় কেন দু-একটি মেয়ে লইয়া যাইব না? যাঁহারা স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে যান না, তাঁহাদের নিকট স্ত্রীকে বাহির না করিলে তাঁহাদের শিক্ষা হইবে কিসে? অভ্যাস পরিবর্ত্তন হইবে কেমন করিয়া? কেবল কথায় নহে, কার্য্যতঃ চিরদিন তিনি এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন। বিদেশে সভা-সমিতিতে বা 'পান সুপারী'তে তাঁহাকে একা নিমন্ত্রণ করিবার যো ছিল না। বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত না হইলে তিনি কোথাও যাইবেন না, সকলেই জানিয়াছিল। মেজদাদার স্বভাবে স্ত্রী-সম্মান এতই ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান যে, কোন ভদ্র পুরুষে স্ত্রীজাতির প্রতি অসম্মান দৃষ্টিতে চাহিতে পারে, ইহা তিনি অন্তরে ধারণা করিতেও অক্ষম।

মেজদাদার কাছে যদি বল,—বুদ্ধিতে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদি বল—পুরুষের ন্যায় তাহাদের উচ্চশিক্ষা অনাবশ্যক, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা পুরুষের অসমকক্ষ, অমনি তিনি গরম হইয়া উঠিবেন, মেয়েদের পক্ষ হইয়া তর্কপরায়ণ হইবেন। বাড়ীর মেয়েরা মিউজিয়াম বা পশুশালা বা কোন বক্তৃতা শুনিতে যাইতে চাহে—সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার পুরুষ মিলিতেছে না; মেজদাদা জানিতে পারিলেই অমনি শত অনিচ্ছা শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাকে সঙ্গে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইবেন।

থাকিত ত, মেজদাদাই তাহাদের মুরুব্বি; বাড়ীর মেয়েরা সকলেই জানিত মেজদাদার মত সহায়, বন্ধু তাহাদের আর কেহ নাই, তাঁহার উপর সকলেরি বিশ্বাস ছিল অসীম। বাস্তবিক পক্ষে মহিলাদিগের সর্ব্বতোভাবে এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও নেতার উপযুক্ত, এমন উদার মহদন্তঃকরণব্যক্তি সংসারে কম দেখিতে পাওয়া যায়। আমার ভ্রাতা মনে করিলে এ কথা আমি সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন আমি তাঁহার কার্য্য সমালোচনায় বিচারাসীন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিরূপে সম্মুখে রাখিয়া অপক্ষপাতীরূপে তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে দান করিতেছি মাত্র।

সুখের বিষয়, তাঁহার প্রাণপণ উদ্যম এখন সার্থক, আশৈশব জীবনের উদ্দেশ্য সফল, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মহিলোন্নতিতে বঙ্গদেশ আজ সর্ব্বপ্রধান।

এইখানে একটি কথা না বলিলে সত্যের অবমাননা ঘটে। যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র স্ত্রীজাতির এতদূর উন্নতি হইত কি না সন্দেহ। অন্ততঃ তিনি যে অনেক পরিমাণে এ উন্নতি অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

নিষ্ক্রমণ

মায়ের পরশ! আলোয় ধূলোয় লোকে-লোকাকীর্ণ সহরের কিনারা দিয়েই এই নির্ম্মল পরশখানি একটুখানি নদীর বাতাস হয়ে বহে চলেছে। এপার থেকে ওপারে যাবার, পার থেকে ঘরে আসার সেতু-পথে চকিতের মত এই পরশ,—গঙ্গাজলে ধোয়া এই পরশ!

এই শান্ত সুস্নিগ্ধ পরশখানির একপারে দেখছি পরিচিত পুরাতন দেশ, আরপারে দেখা যাচ্ছে প্রবাস-বাসের সিংহদ্বার—হিম-রাত্রির অন্ধকার মাখা!

বিপুল জনস্রোতের সঙ্গে একত্রে ছুটে চলেছি, ঠেলে চলেছি—নিঃশব্দে নীরবে; আর নদীর উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত বহে আস্ছে কাজল আকাশ—কালো-জলের সমস্ত স্নেহমাখা মায়ের পরশ!

অন্ধকারের মাঝখান থেকে একটা তীব্র বাঁশি দিক্‌দিগন্তের সুনীল পরিসর হঠাৎ ছিন্ন করে দিয়ে চীৎকার করে উঠল! আবার আলো, আবার ধুলো, আবার জনকোলাহল! এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে যখন পৃথিবী-জোড়া প্রকাণ্ড রাত্রি ভেদ করে চলেছি, তখন কেবল শুনছি পায়ের তলা দিয়ে একটা ঝন্‌ঝনা, লৌহ নির্ঝরের মত ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে।

গাড়ির দুই সারি জানলার ভিতর

দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র দুই ফালি আস্‌মানি পর্দা, তার মাঝে মাঝে ঝক্‌ঝকে এক একটি তারা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলের এই দুই যবনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে বামে কিছুই দেখছিনা; কেবল সম্মুখ থেকে একটার পর একটা ঝন্‌ঝনার ধাক্কা আস্‌ছে আর মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা গাছের ঝাপ্‌সা মূর্ত্তি চোখের উপরে এসে আঘাত করেই সরে যাচ্ছে।

বিরাট রাত্রির এই প্রকাণ্ড বৈচিত্র্য-হীনতার ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছি বল্লে ভুল হয়। নিশাচর পাখীরা রাত্রির নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলিয়ে নিঃশব্দে যেমন ভেসে যায় এ তেমন করে যাওয়া নয়, এ যেন একটা উন্মত্ত দৈত্য চাকা-দেওয়া লোহার খাঁচায় আমাকে বন্ধ করে পৃথিবীর উপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে; তার চলার প্রচণ্ড বেগে লোহার খাঁচাটা পৃথিবীর বুক আঁচ্‌ড়ে চারিদিকে অগ্নিকণা ছিটিয়ে অন্ধকুহরের ভিতর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে।

সুদীর্ঘ অনিদ্রা, অফুরন্ত অস্থিরতা, তার পরে বিরাট অবসাদ! নির্জ্জীব প্রাণ নিরুপায় অবোলা একটা জন্তুর মত চুপ করে পড়ে আছে—অপার অন্ধকারের মুখে দুই চোখ মেলে।

একটুখানি আলোর আঘাত,—নিশীথ বীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন! ঊষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি—নূতন দিনের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর পূর্ব্বপার-পর্য্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্ম্মের মত একটি কোমল অন্ধকার, তারি উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে! সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে;—যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।

পথিক যেমন পথ চল্‌তে ক্ষণিকের মত পথপ্রান্তে দেবতার দেউলটিতে একটি নমস্কার দিয়ে পুনরায় চলতে আরম্ভ করে, আমরা তেমনি এই প্রাতঃসন্ধ্যাটিকে প্রণাম করেই যেন আবার অগ্রসর হচ্ছি।

একটা কূলকিনারা-হারা বালুচরের ঠিক আরম্ভে রাত্রি প্রভাত হয়েছে। আকাশের বর্ণ দূরে দূরে নদীর ক্ষীণ ধারাগুলিকে সুতীক্ষ্ণ ছুরির মত উজ্জ্বল করে তুলেছে। পৃথিবীর শেষপ্রান্ত-পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে—পরিষ্কার ফিরোজার একটি মাত্র প্রলেপ; তার উপরে একঝাড় কুশ আর কাশ। নূতন সূর্য্যালোক কাশফুলের শ্বেত-চামরের উপরে আবীর ছড়িয়ে সমস্ত ছবিটিকে রাঙিয়ে তুলেছে। নির্জ্জন এই নদীর পার, নিঃশব্দ নিশ্চল এই নদীপারের বালুচর,—এর ভিতর দিয়ে জলের ক্ষীণধারা আমাদেরই মত মন্দগতিতে চলেছে।

নদী থেকে শত শত হাত ঊর্দ্ধ দিয়ে সেতুপথ বেয়ে চলেছি। একটি মৃদুমন্দ দোলা, গতির একটা শিহরণ মাত্র,—এছাড়া আর কিছু অনুভব হচ্ছেনা। চলেছি, চলেছি—দিনের মনভোলানো সবুজের মাঝ দিয়ে রাতের ঘুমপাড়ানো নীলের দিকে।

অশেষ পথ—সুদীর্ঘ প্রহর-পলের ভিতর

দিয়ে ক্রমাগত চলেছে; দিন ও রাত্রি এই পথের দুইধারে নিরাবরণ ও আবরণের দুইখানি মায়াজাল রচনা করতে-করতে আমাদেরই সঙ্গে চলেছে।

বারানসী—মন্দির-মঠের একটা প্রকাণ্ড অরণ্য; দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোকে তার সমস্তটা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,—জনশূন্য স্নানের ঘাটে সোপানের কোলে-কোলে—নদীজলে বিজলী রেখাটি থেকে, তপ্ত পথে নিঃশব্দে যে যাত্রীরা চলেছে তাদের গাঢ় ছায়াটি পর্য্যন্ত। এ যেন একটা মায়াপুরীর দিকে চেয়ে রয়েছি! পাষাণ প্রাচারগুলো থেকে একটা উত্তাপ মুখে এসে লাগছে, নাগরিকদের সমস্ত গতিবিধি কার্য্যকলাপ আমাদের চোখে পড়ছে স্পষ্ট, কিন্তু তাদের কোনো সাড়াশব্দ আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছেনা। এ যেন একটা মূকের রাজত্ব পেরিয়ে চলেছি। আর শব্দের সীমার বাহিরে তাদের এই প্রকাণ্ড নগরী উৰ্দ্ধ আকাশে পাংশু দুইটা পাষাণ-বাহু তুলে একটা ভাষাহীন নিবারণের মত দূর-দূরান্তরের দিকে চেয়ে রয়েছে—দুই প্রহর বেলার শব্দহীন আলোকের গায়ে চিত্রার্পিত।

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের উপরে বেলা-শেষের তাম্র আভা। আম্রবনের ছায়ায়-ছায়ায় রাত্রি আপনার আশংসা নিয়ে এখনি দেখা দিয়েছে। বনরেখার উপরে অযোধ্যার শেষ-নবাবের বহুকালের পরিত্যক্ত প্রাসাদের একটা অংশ আকাশের পরিষ্কার নীলের গায়ে শুষ্করক্তের গাঢ় একটা বিমলিন ছাপ ফেলেছে। বাঁধভাঙা গোমতীর জল প্রকাণ্ড একটা ছিন্ন কন্থার মত পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে—অনেক দূর পর্য্যন্ত সমস্ত সবুজকে আচ্ছাদন করে।

পশ্চিম-দিগন্তব্যাপী শোণিমার নীরব একটি নির্ঝর আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর পর্য্যন্ত নেমে এসেছে; রাতের পাখী এরি উপর দিয়ে কালো ডানা মেলে উড়ে আসছে।

রাত্রি তৃতীয়-প্রহরে বৃষ্টি নেমেছে, পাহাড়ের হাওয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মুখে এসে লাগছে,—বরফের মত! দূর-দূরান্তরে একটিমাত্র ঝিল্লি অন্ধকারে শব্দের একটা উৎস খুলে দিয়ে ক্রমান্বয়ে গেয়ে চলেছে। একটা পান্থশালার প্রদীপ জলে-ধোয়া পৃথিবীর মসৃণতার উপরে আপনার আলোটি অনেক-দূর-পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়ে অনিমেষে রাত্রির দিকে চেয়ে রয়েছে।

নিরন্ধ্র অন্ধকারকে ধাক্কা দিতে-দিতে গাড়ি চলেছে—হিমালয়ের যেদিক বেয়ে গঙ্গা নামছেন সেই দিক হয়ে।

এখানে মেঘ কেটে চাঁদ দেখা দিয়েছেন —অন্ধকার গিরিশ্রেণীর চূড়ায়। অদূরে স্নানের ঘাট, নহবৎখানা, মন্দির-চূড় জ্যোৎস্নায় ঘুমিয়ে আছে; গঙ্গার বাতাস সমস্তটির উপরে স্নিগ্ধতা ঢেলে দিয়েছে। আমাদের যাত্রা-পথের শেষে, সুদীর্ঘ রাত্রির অন্তিম-প্রহরে এই গঙ্গাদ্বার! এরি ওপারে সূর্য্য-দেবের হরিতাশ্বসকল অপেক্ষা করচে —নূতনকে অদৃষ্টপূর্ব্বকে জগতে বহন করে আনবার জন্য।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের আয়-ব্যয়

ভারতের আয়-ব্যয় বলিতে আমরা ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষেরই আয়-ব্যয় বুঝিব। ভারতবর্ষের আয় গত কয়েক-বৎসরের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে; নিম্নের তালিকাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বৎসর	কোটী মুদ্রা হিঃ
১৮৪০	২১
১৮৬০-৬১	৪৩
১৮৮০-৮১	৭০
১৯০০-১	১১৩

বাঙ্গলা অধিকারের পর ইংরাজগণ ক্রমশ ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়েন। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভারত-সরকারের আয়-ব্যয় উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় ছিল না। অধিকৃত রাজ্যরক্ষা এবং ভারতে বৃটিশ-সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, তৎকালীন শাসন-কর্ত্তাগণকে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য রাখিতে হইত। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজ-কোষ হইতে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় হইত। ১৮১৪ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, ২৮ বৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হয়,—ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হইয়াছিল কেবলমাত্র ১৫ বৎসর। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায়, সরকারকে অনবরত কর্জ্জ করিতে হইত, কাজেই ঋণের মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের

৬০ কোটী টাকাতে গিয়া দাঁড়ায়। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া, সরকারকে আবার ৫০ কোটী টাকা ধার করিতে হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে।

এই সময় অর্থ-সচিবের পদ সৃষ্ট হয়। জেমস উইলসন নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অর্থ-সচিবের পদ দিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়। উইলসন সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া, সৈন্য-বিভাগে ব্যয়ের আতিশয্য দেখিয়া উক্ত বিভাগের প্রায় ৬½ কোটী টাকার খরচ কমাইয়া দেন। ভারত-সরকারের অন্যান্য বিভাগেও তিনি আবশ্যকীয় ব্যয়গুলি মাত্র রাখিয়া অপরাপর ব্যয় কমাইয়া দেন। তাহাতেও আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও আয়-কর (income-tax) বসাইতে হয়।

পাঁচবৎসরের মধ্যে ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আয়-ব্যয় সমান হওয়ায়, আয়-কর তুলিয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা বহুদিন উন্নত অবস্থায় থাকে নাই। এই সময়ে উড়িষ্যায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। রেলেওয়ে-গুলির উন্নতির জন্যও যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইয়া উঠে; তাহার উপরে সীমান্ত-প্রদেশে

খরচও বৃদ্ধি পায়। কাজেই ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আবার খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। তাই গবর্মেণ্টকে বাধ্য হইয়া Provincial rates বৃদ্ধি করিতে হয়। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে আয়-ব্যয় আবার সমান হয়। আমরা "ভারতী"তে পূর্ব্বপ্রকাশিত "ভারতের মুদ্রা" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, মেক্সিকোয় রূপার খনির আবিষ্কার হওয়ার দরুণ, ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে মুদ্রা-বিপ্লব আরম্ভ হয়। এই মুদ্রা-বিপ্লব আরম্ভ হওয়ায় ভারত-সরকারের Home-Chargeও অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়; তাহার জন্যও ভারত-সরকারকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে আয়-কর স্থাপিত হয়। লবণের শুল্কও মণ-করা ২ টাকা হইতে বাড়াইয়া ২॥০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, সরকারের ব্যয়-বাহুল্য কমাইবার জন্য একটী পরামর্শ-সভারও প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের 'Currency reform' হইয়া যাইবার পর, ভারত-গভর্মেণ্টের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ আশাপ্রদ হইয়া আসে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক বৎসর ৭।৮ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হইতে থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত-সরকারের অবস্থা এইরূপ সচ্ছলই ছিল। তাই ভারত-সরকারের ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেক বৎসর কয়েক কোটী মুদ্রা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত হইবে, স্থিরীকৃত হয়। ইহাই ভারত-সরকারের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এই প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতসরকারের আয় আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার কারণ কি? ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রফল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারকে দেশীয় রাজন্য-বর্গের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হয়। কাজেই দেশের প্রজাগণের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে সরকার দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না। এখন আ-সমুদ্র ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করায়, ভারতবাসীগণের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। এখনকার শাসন-প্রণালীও অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। এই সমস্ত কারণে, যদিও ভারত-সরকার জমির কর এবং আয়-কর পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে ধার্য্য করিয়াছেন, তথাপি মোট রাজস্বের মাত্রা এখন বাড়িয়াই গিয়াছে।

প্রত্যেক বৎসর মার্চ্চমাসে ভারত-সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাহির হয়। এই আয়-ব্যয়ের তালিকা তিন বৎসরের গড়-পড়তা-হিসাব মাত্র। ১৯১৬-১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিতে গেলে, পূর্ব্ব বৎসরের ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে কত খরচ হইল, তাহা দেখাইতে হইবে; ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দের খরচ হইতে কত উদ্বৃত্ত ছিল বা ঋণ ছিল তাহাও দেখাইতে হইবে। এই সমস্ত অঙ্ককে ভিত্তি করিয়া একটা আন্দাজ হইতে ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বজেটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে

করিবার অধিকারী কেবল তিন শ্রেণীর পদস্থ ব্যক্তি। সেক্রেটারী অফ ষ্টেট, গভর্ণর-জেনারল ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ।

হোমচার্জ্জ:—ভারতবর্ষ দরিদ্র লোকের দেশ। কিন্তু বিধাতা এই দরিদ্রের দেশকে নানাপ্রকার খনি দ্বারা রত্নগর্ভ করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজ ধনীগণ, নিজেদের অর্থবলে ভারতবর্ষের এই খনিগুলিতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। রেলওয়ের উন্নতির জন্য ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। এই টাকার সুদ ভারতকেই দিতে হয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষে আসিয়া, ভারতের রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাদের বেতনের উদ্বৃত্ত অংশ স্বদেশে প্রেরিত হয়। বৃদ্ধবয়সে কার্য্য হইতে অবসর লইয়া দেশে ফিরিলে,ভারতবর্ষই তাঁহাদিগকে পেন্সনের টাকা যোগায়। বিদেশীয় বণিকগণ, ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর তাঁহাদের অর্জ্জিত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ স্বদেশে প্রেরিত হয়। ইহা ব্যতীত, সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের অফিসের সমস্ত খরচই ভারতবর্ষকে দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত হিসাব অনুযায়ী, ভারতবর্ষকে প্রত্যেক বৎসর কয়েক কোটী মুদ্রা, ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়। তাহারই নাম Home charge। ভারতের সেক্রেটরী অফ ষ্টেট এই টাকা বণ্টন করেন।

সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটকে একজন Banker বা 'শ্রেষ্ঠী' বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইংরাজ বণিকগণ, ইংলণ্ডে স্বর্ণ-মুদ্রাই ব্যবহার করেন; কিন্তু ভারতবর্ষে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত। ভারতবর্ষ হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গেলে, তাঁহাদের রৌপ্য-মুদ্রার প্রয়োজন হয়। সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট, হোম-চার্জ্জে স্বর্ণ-মুদ্রাই দিয়া থাকেন; ভারতের মুদ্রা কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা। এইজন্য সেক্রেটারী অফ ষ্টেট হুণ্ডির ন্যায় কতকগুলি নোট প্রত্যেক বৎসর বাহির করেন, তাহাদিগকে council bills বলে। ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার হোম-চার্জ্জ তিনি আশা করেন, সেই টাকাকে সভরিণে (এক সভরিণে পনেরো টাকা) পরিণত করেন। বিলাতী বণিকগণ, সভরিণ দিয়া এই council bill ক্রয় করেন। সেক্রেটারী অফ ষ্টেট বণিকগণের প্রদত্ত অর্থে, ভারতের নিকট হইতে ইংলণ্ডের প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করেন। বিলাতী বণিকগণ, তাঁহাদের প্রয়োজনানুসারে council bill খরিদ করিয়া তাঁহাদের ভারতবর্ষস্থিত এজেন্টগণকে পাঠাইয়া দেন। ভারতবর্ষস্থিত এজেন্টগণ এই council bill, ভারত-সরকারের নিকট লইয়া গিয়া, আপনাদের প্রাপ্য মুদ্রা রৌপ্য-মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করে। এই সুন্দর প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, ভারতবর্ষ হইতে হোম চার্জ্জ পাঠাইবার খরচ এবং বিলাতী বণিকগণের ভারতবর্ষস্থিত এজেন্টগণকে টাকা পাঠাইবার খরচ বাঁচিয়া যায়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বিলাতী বণিকগণ যদি হোম-চার্জ্জের প্রাপ্য টাকার অপেক্ষা অধিক টাকা ভারতে পাঠাইতে চায়, তাহা হইলে কি তাহারা বাকী টাকাটা ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে পাঠায়?

বিলাতী বণিকগণের হোম-চার্জ্জ অপেক্ষা অধিক টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে, তাহারা council bill-ই ক্রয় করে। সেক্রেটারী অফ ষ্টেটও সে বৎসর, হোম-চার্জ্জ অপেক্ষা, অধিক মুদ্রার council bill বাহির করেন। বিলাতী বণিকগণ সেই council bill ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলে, ভারতগভমেণ্ট নিজের দেয় অংশ অপেক্ষা যত টাকা অধিক দিতে হইবে, তত টাকা সঞ্চিত ভাণ্ডার (Gold-reserve fund) হইতে বাহির করিয়া দেন। সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটও হোম-চার্জ্জের চেয়ে যত অধিক টাকা পান, তাহা হয় বিলাতের সঞ্চিত ভাণ্ডারে জমা দেন, না-হয় আবার ভারতে পাঠাইয়া ভারত-সরকারের ব্যয়িত অংশ পূরণ করেন।

Council bill-এর পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং যে বৎসর বিলাতী বণিকগণ হোম-চার্জ্জ অপেক্ষা অল্প মুদ্রা ভারতে প্রেরণ করে, সে বৎসর council bill বিক্রয় করিয়া, হোম-চার্জ্জের সমস্ত দেয় অংশ পূরণ না হওয়ায়, সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটকে বিলাতের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে বাকী টাকাটা ধার করিতে হয়। পরে, ভারত-সরকার, ভারতবর্ষ হইতে উক্ত বাকী টাকা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলে, সেই টাকায় ভাণ্ডারের ধার শোধ করা হয়।

১৯০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে সেক্রেটারী অফ ষ্টেট ৩৩,৪৩২,১৯৬ পাউণ্ডের council bill বিক্রয় করেন। এত-বেশী বিক্রয় আর কখনও হয় নাই। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে, ভারতের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য-বিপর্য্যয় হওয়ায় Exchange-এর মূল্য কমিয়া যায়; তাহাতে council bill-এর পরিমাণ মাত্র ১৫৩০৭০৬১ পাউণ্ডে গিয়া দাঁড়ায়। বাজার একইভাবে থাকায়, ১৯০৮ ০৯ খৃষ্টাব্দে council bill-এর পরিমাণ আরও কমিয়া মাত্র ১৩৯১৫৪২৫ পাউণ্ড হয়। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের অবস্থা আবার আগেকার মত হয়। সুতরাং council bill-এর পরিমাণও ২৭৪১৬৫৮৬ পাউণ্ডে গিয়া দাঁড়ায়। ১৯১১ ১২ খৃষ্টাব্দে council bill-এর পরিমাণ, ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ন্যায়ই ছিল।

বিলাতী বণিকগণ সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের নিকট হইতে council bill ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঠান। এই council bill, কলিকাতা, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজেই বিক্রয় হয়। কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুদ্রার council bill বিক্রীত হয়। ১৮৯৮-৯৯ এবং ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বায়েই অধিক মুদ্রার council bill বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে সমুদায় council bill-এর শতকরা ৫১ ভাগ কলিকাতায় এবং ৪৪ ভাগ বোম্বায়ে; ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শতকরা ৪৫ ভাগ, বোম্বায়ে ৩৯ ভাগ, এবং ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শতকরা ৫৫ ভাগ এবং বোম্বায়ে ৩৮ ভাগ বিক্রীত হয়।

হোম-চার্জ্জের পরিমাণ গড়পড়তা বার্ষিক ৬২ কোটী টাকা মাত্র।

[illegible]

সরকারই ভারতের রাজস্ব খরচ করিবার অধিকারী ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা-গণকে সামান্য খরচের জন্যও ভারত-সরকারের কাছে হাত পাতিতে হইত।

Sir Strachey, তাঁহার India নামক পুস্তকে একটী হাস্যকর বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সামান্য একটী চাপরাসী বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে, সেই চাপরাসীর বেতনের জন্য ভারত-সরকারের কাছে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে আবেদন করিতে হইত। একটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সামান্য আট টাকা বেতনের একজন চাপরাসী পর্য্যন্ত স্বয়ং নিযুক্ত করিতে পারিতেন না। ইহা যে হাস্যকর, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই নিয়মের ফল কিন্তু ভাল হইত না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণকে আয়-ব্যয়ের কোন অংশ ছাড়িয়া না দেওয়ায় ভারত-সরকারের ব্যয়ের উপর তাঁহাদের কোন দরদ ছিলনা। তাঁহারা বে-পরোয়া খরচ করিতেন। স্বনামধন্য গোখ্‌লে, আর-একটী অসুবিধা দেখান। ভারতের প্রাদেশিক আইন ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে, বেসরকারী সভ্যগণের কাজ করিবার কিছু ছিলনা। ভারত-সরকার প্রত্যেক বৎসর ব্যবস্থাপক সভায়, আয়-ব্যয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করায়, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া, ভালমন্দ দেখাইতে পারেন; কিন্তু ভারত-সরকারের বজেটের ন্যায়, প্রাদেশিক কোন বজেটের বন্দোবস্ত না থাকায়, সভ্যগণ কেবলমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিবৃত্ত হইতেন। গোখলে বলেন যে, প্রাদেশিক বজেট হইলে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সদস্যগণেরও কতকটা দায়িত্বের সৃষ্টি হইবে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, লর্ড মেয়ো Strachey সাহেবের সাহায্য লইয়া প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব এবং ভারত-সরকারের রাজস্ব পৃথক করিয়া দেন। ইহাই ইতিহাসে, Provincial decentralisation নামে কথিত হয়।

এখন হইতে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা-গণের হস্তে রাজস্বের কতক অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই রাজস্ব হইতে তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু ভারত-সরকার তাঁহাদের আয়-ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে উপদেশ দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থাও হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, উদ্বৃত্ত অংশ, সেই প্রদেশের স্বাস্থ্য এবং বিদ্যার উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন; কিন্তু প্রয়োজন হইলে, ভারত-সরকার আপনার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঐ উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন, এইরূপ নিয়মও করা হইয়াছে। Provincial decentralisationএর পর হইতে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ, আয়-ব্যয়ের অধিকারী হওয়ায় সংযমী হইয়াছেন এবং রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত অংশ প্রত্যেক বৎসর স্বাস্থ্য ও বিদ্যা-দানকল্পে ব্যয়িত হওয়ায়, ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ও বিদ্যারও উন্নতি হইতেছে।

যে-সমস্ত রাজস্ব ভারত-সরকারই আদায়

করিতে পারেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ যাহা আদায় করিতে গেলে গোলমাল হইতে পারে, সেই সমস্ত রাজস্ব আদায়ের ভার এখনও একমাত্র ভারত-সরকারের হাতেই আছে; যেমন, লবণ-শুল্ক, বাণিজ্য-শুল্ক (Custom), আফিম বিক্রয় ও দেশীয় রাজন্য-বর্গের নিকট হইতে প্রাপ্য নজর। কতক রাজস্ব ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ একযোগে আদায় করেন; যেমন, জমির খাজনা, ষ্টাম্প, আব্‌কারী, আয়-কর, বন-কর ও রেজিষ্ট্রেশন। আর-কতক রাজস্ব প্রাদেশিক-শাসনকর্ত্তার দ্বারা আদায় করাই সুবিধাজনক বলিয়া, তাহার আদায়-ভার একমাত্র প্রাদেশিক-শাসনকর্ত্তা-গণের হস্তেই রাখা হইয়াছে; যেমন, 'Provincial rates' নামে স্থানীয় টাক্স-গুলি (Local taxes)।

ভারতের ঋণ ঃ—পূর্ব্বোক্ত রাজস্বের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, ভারতের ঋণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন।

সমস্ত দেশেই, সমস্ত গভর্মেণ্টকেই, রাজ্য-শাসনের জন্য মধ্যে মধ্যে ঋণগ্রহণ করিতে হয়। এই ঋণের সুদ যতদিন সেই গভর্মেণ্ট দিতে পারেন, ততদিন সেই গভর্মেণ্টকে সচ্ছল-অবস্থাপন্ন বলিয়া ধরা হয়, না দিতে পারিলে দেউলিয়া বলা হয়। ভারতবর্ষ একটী বিশাল প্রদেশ। শাসনের জন্য মধ্যে মধ্যে অর্থের প্রয়োজন হয়, বার্ষিক রাজস্ব দিয়া, সেই অভাব না মিটাইতে পারিলে, সরকারকে কর্জ্জ করিতে হয়। আমাদের ভারত-সরকারের গৃহীত ঋণের কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। সত্য বটে, এমন অনেক সময় আসিয়াছে, যখন বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট রাজস্বে ব্যয়-সংকুলান না হওয়ায়, ভারত-সরকারকে বাধ্য হইয়া ঋণ করিতে হইয়াছে। এই প্রকার ঋণকে ইংরাজীতে Unproductive debt বলে। এই ঋণ জোঁকের মত দেশ-বাসীর গায়ে লাগিয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ভারত-সরকারের এই প্রকার Unproductive ঋণ অধিক নয়। কারণ ভারত-সরকার রেলওয়ে-নির্ম্মাণে এবং খাল খননের জন্য যত অর্থ-ব্যয় করিয়াছেন, তাহা মোটের উপর লাভজনক; উক্ত অর্থে নির্ম্মিত রেলওয়ে এবং খাল হইতে যাহা বার্ষিক আয় হয় তাহাদ্বারা উক্ত ঋণের সমস্ত সুদ চুকাইয়া দিলেও কিছু লাভ থাকে। ভারত-সরকারের এই-রূপ ঋণই অধিক।

ভারতের ঋণকে দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়; উহার কতক অংশ ভারতবর্ষ হইতেই (Rupee loan in India), এবং আর কতক অংশ বিলাত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে (Sterling loan in England)। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, 'রুপি-লোনে'র পরিমাণ ১৩৯৭৯২৫৭০০ এবং ষ্টার্লিং লোনের পরিমাণ ১৭৮৪৭০০১৩ পাউণ্ড ছিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ অবধি, ভারত-শাসক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী, ব্যবসাদার রাজা ছিলেন। তাহার পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে বণিক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন, ভারতের ঋণ মাত্র ৩৩২·৯৫ মিলিয়ন টাকা ছিল।

এই ঋণ, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, ৪৫৩·৩৬ মিলিয়ন টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া, ভারত-সরকারকে আবার বাধ্য হইয়া ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। কাজেই ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে, ভারতের ঋণের মাত্রা ৬৩৫·৫৫ মিলিয়ন টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। এই সময় ভারতের প্রথম অর্থ-সচিব উইলসন্ আসিয়া ভারতের আর্থিক-অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে, রৌপ্যের দাম কমিয়া যাইতে আরম্ভ হওয়ায় ও ভারতের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, এবং শাসনকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য, বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হয়। উইলসন্ সাহেব আয়-কর তুলিয়া দিয়া যাইলেও উহা 'লাইসেন্স-টাক্স'রূপে প্রবর্ত্তিত হয়। লবণের শুল্ক বাড়িয়া যায়। তথাপি প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান না হওয়ায়, গভমে'ণ্টকে বাধ্য হইয়া আবার ঋণ করিতে হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ঋণের পরিমাণ ৯১১·২৫ মিলিয়ন টাকায় গিয়া দাঁড়ায়।

'Currency reform'-এর পর, ভারত-গভমে'ণ্টের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিলে, গভমে'ণ্ট রেলওয়ে-নির্ম্মাণ এবং খাল-খননের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই সমস্ত কার্য্যে, বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। ভারত-সরকার রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া এই অর্থ প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিতে করিয়াই সরকার রেলওয়ে-নির্ম্মাণ এবং খাল-খনন কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

এই খাল বা রেলওয়ে এখন বেশ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যে টাকা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, নামে তাহা ঋণ হইলেও, ব্যবসায় তাহা খাটানো হইয়াছে সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উহা ঋণ নহে। যাহা হউক, ভারতের ঋণের পরিমাণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

বৎসর	১০ লক্ষ টাকা হিঃ
১৮৮৭-৮৮	৯৮০·৪
১৮৯৩-৯৪	১০৫২·৪
১৮৯৬	১০৮২·১২
১৯০৩-০৪	১২৫৮.৭৫
১৯১১-১২	১৩৯৭·৯৩

পাঠকগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, উপরে যে তালিকা দেওয়া গেল, উহা ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত 'রুপীলোন' মাত্র; উহা ভিন্ন বিলাত হইতে সংগৃহীত 'ষ্টার্লিং-লোনে'র পরিমাণ ১৭৮৪৭০০১৩ পাউণ্ড। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৪ P.c. ৪½ P.c. ৫ P.c সুদের ঋণগুলিকে যথাক্রমে ২ P.c., ৩ P.c., এবং ৩½ P.c. করা হইয়াছে। কতহারের সুদের কত 'Sterling loan আছে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

২½ P.c.—	১১৮৯২২০৭ পাউণ্ড
৩ P.c.—	৬৬৭২৪৫৩০ „
৩½ P.c.—	১৮২৭৬২১০ „

ঋণ করিয়া ভারতের রেলওয়ের উন্নতি

শতকরা ৩½ টাকা হার সুদে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৭৫০০,০০০ পাউণ্ড, ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ৭৫০০,০০০ পাউণ্ড এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৪০০০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রা গ্রহণ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের ঋণের একটু পার্থক্য আছে। ভারতের অধিকাংশ ঋণই রেলওয়ে-নির্ম্মাণ বা জলাশয়-খনন ইত্যাদি কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। এই প্রকার ঋণের অর্থে নির্ম্মিত রেলওয়ে বা জলাশয়গুলি এখন বেশ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ঋণের মাত্রা সমস্ত ঋণের তুলনায় শতকরা ৮৮ ভাগ। সুতরাং ভারত-সরকারের ঋণের মাত্রা দেখিয়া আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

বজেটে ভারত-সরকারের রাজস্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে:—টাক্স ও টাক্স ছাড়া অন্যান্য আদায়। ভারতবর্ষ হইতে খুব অল্প পরিমাণেই টাক্স আদায় হইয়া থাকে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ অবধি,ভারত-সরকারের সমুদয় রাজস্বের শতকরা ৩৮ অংশ মাত্র টাক্স হইতে সংগৃহীত হইত। ঐ খৃষ্টাব্দের পর, টাক্সহইতে গৃহীত রাজস্বের অংশ বৃদ্ধি পাইয়া, এখন শতকরা ৫০ ভাগে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শতকরা ৫০ ভাগও ঠিক নহে। কেননা টাক্সের মধ্যে রেলওয়ে, খাল ইত্যাদি হইতে আয়ও ধরা হইয়া থাকে। ঐ আয় বাদ দিলে, সমস্ত রাজস্বের শতকরা ২৬ ভাগ মাত্র ঠিক টাক্স হইতে সংগৃহীত।

জমির খাজনা:—ভারত-সরকারের সমস্ত রাজস্বের এক চতুর্থাংশ একমাত্র জমির খাজনা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। য়ুরোপে, জমির উপর রাজার কোন দাবী-দাওয়া নাই। জমিদারেই জমির অধিকারী হওয়ায়, জমির খাজনার একমাত্র ভোগ-দখলকারী—জমিদার। এইজন্য, য়ুরোপের দেশসমূহে জমিকে রাষ্ট্রগত করিয়া লইবার কথা হইতেছে। এখন যাহা য়ুরোপের নিকট স্বপ্নমাত্র, আমাদের নিকট তাহা জ্বলন্ত সত্য। এইজন্যই আমাদের টাক্সের মাত্রা এত কম। সমুদয় জমির কর যদি জমিদারদেরই প্রাপ্য হইত, তাহা হইলে রাজ্যের ব্যয়-বহন করিতে, সরকার প্রত্যেক বৎসর জমির করস্বরূপ যে টাকা পান তাহা পূরণ করিবার জন্য, টাক্সের মাত্রা বাড়াইতে হইত। সে-ক্ষেত্রে, সাধারণের ক্লেশের সীমা থাকিত না।

সরকারী কাগজপত্রে জমির কর বলিয়া যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ প্রকৃত জমির কর, ৩ ভাগ বাকী-খাজনা, ৩ ভাগ ব্যক্তিগত কর ৩ ভাগ মৎস্য-ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত এবং আর ১ ভাগ জমির স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ও বন্দোবস্তী-খরচা আদায় করিয়া সংগৃহীত হয়। প্রকৃত জমির কর (ordinary land-revenue) মাত্র ২৯ কোটী টাকা। মাদ্রাজ হইতে ৬½ কোটী মুদ্রা, বাঙ্গলা হইতে ৩ কোটী মুদ্রা, আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশ হইতে ৬½ কোটী মুদ্রা, পাঞ্জাব হইতে ২½ কোটী মুদ্রা, বোম্বাই হইতে ৪ কোটী মুদ্রা, পূর্ব্ববাঙ্গলা ও আসাম হইতে ২ কোটী মুদ্রা, ব্রহ্মদেশ হইতে

হইতে ১৪ কোটী মুদ্রা, প্রত্যেক বৎসর প্রকৃত জমির করস্বরূপ সংগৃহীত হয়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত হয়; তাহার সুফল একমাত্র বঙ্গদেশের জমিদারগণই ভোগ করিয়া আসিতেছেন। মাদ্রাজের এক-তৃতীয়াংশে এবং আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশের কতকগুলি জেলাতেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। পূর্ব্বে যে বাকী-খাজনার কথা বলা হইয়াছে, উহার শতকরা ৯২ ভাগ, বাঙ্গলা, বোম্বাই এবং পাঞ্জাব হইতে সংগৃহীত হয়। প্রায় সমস্ত ব্যক্তিগত করই, (Capitation tax) পূর্ব্ব-বাঙ্গলা, আসাম এবং ব্রহ্মদেশ হইতে সংগৃহীত হয়। মৎস্য-চাষ হইতে প্রাপ্যের অর্দ্ধেক অংশ একমাত্র ব্রহ্মদেশেই সংগৃহীত হয়।

অন্যান্য প্রদেশগুলির মৎস্য-চাষ হইতেও কিছু কিছু টাকা আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মুদ্রার পরিমাণ কোন বৎসরই সমান হয় না। বৃষ্টিপাতের মাত্রাহিসাবে ও নদী-সমূহের অবস্থানুসারে মৎস্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, কাজেই সংগৃহীত করও ঐ হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে বৎসর-বৎসর ওঠে-নামে। পাঞ্জাব এবং আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্ত প্রদেশ প্রত্যেকটি হইতেই, প্রত্যেক বৎসর ৫ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া থাকে। সেইরূপ পূর্ব্ব-বাঙ্গলা, পশ্চিম বাঙ্গলা, আসাম, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশ হইতেও প্রতি প্রদেশে ১½ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ পর্য্যন্ত মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া থাকে।

জমির কর বলিয়া যে অর্থ সংগৃহীত

যে বৎসর বর্ষার অভাবে ফসল ভাল হয় না, এবং দুর্ভিক্ষ মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দেয়, সে বৎসর ভারত-সরকারকেও রাজস্ব-সংগ্রহকালে দয়া দেখাইতে হয়। কাজেই জমির করের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট নাই। প্রজাগণের ভাল-মন্দ অবস্থানুসারে ইহারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায়, ১'৮২ কোটী মুদ্রা কম জমির কর আদায় হয়। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে, ভারতের সর্ব্বত্রই ফসল ভাল হয়, তাই উক্ত বৎসর ২'০৬ কোটী মুদ্রা বেশী জমির কর আদায় হয়।

১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে, ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশে সামান্যভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায়, ২৯'২ লক্ষ মুদ্রা কম জমির কর আদায় করা হইয়াছিল।

জমির কর আদায় করিতে ভারত-সরকারের কিছু খরচও হইয়া থাকে। জমির কর হইতে যাহা সংগৃহীত হয়, উহার শতকরা ১৭ ভাগ জমির কর-সংগ্রহেই ব্যয়িত হয়। জমির করসংগ্রহে যত অর্থ খরচ হয়, উহার কত অংশ কোন্ কার্য্যে ব্যয়িত হয়, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

জেলার শাসন-খরচ	শতকরা	৪৪	ভাগ
জেলার অন্যান্য খরচ	,,	২৪	,,
জেলার এবং গ্রামের কর্ম্মচারীদের রাহা-খরচ প্রভৃতি		১২	,,
জমির জরিপ খরচ	,,	১২	,,
জমির কর-সংগ্রহের কমিশন খরচ		৫	,,

জেলা-শাসনের ব্যয় মাদ্রাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জেলা-শাসনে যে অর্থ ব্যয় হয়, উহার শতকরা ২০ ভাগ মাদ্রাজে, ১৮ ভাগ আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশে, ১৫ ভাগ বোম্বায়ে, ১২ ভাগ বাঙ্গলায়, ১০ ভাগ ব্রহ্মদেশে, ৯ ভাগ পাঞ্জাবে, ৮ ভাগ পূর্ব্ব-বাঙ্গলা ও আসামে এবং ৫ ভাগ মধ্য-প্রদেশ ও বেরারে ব্যয়িত হয়।

বনবিভাগঃ—ভারতের উত্তর ও দক্ষিণে ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বকাল হইতেই বিশাল অরণ্য আছে। কথিত আছে যে, সুন্দরবন পূর্ব্বে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন অনেক স্থলে বন কাটাইয়া সহর বসান' হইয়াছে। কিন্তু ভারত-সরকার অরণ্যের উপকারিতা বিস্মৃত হন নাই। অরণ্য দ্বারা ভূমি স্নিগ্ধ হইয়া থাকায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। আবার শুনা যায়, বৃক্ষদের মেঘ আকর্ষণ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। ভারতের উত্তরে, হিমালয়ের পাদদেশে যে বিরাট বনানী আছে, বর্ষাকালে বারিপাত হইলে এই বিরাট বনস্থল জলরাশি গ্রাস করিয়া, ভারতের নদীসমূহের জল বারোমাস যোগাইয়া থাকে। এইজন্য ভারত-সরকার উত্তর-ভারতের এবং ব্রহ্মদেশের অরণ্যগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। বন-আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে অরণ্যনিবাসী বন্যলোকেরা কৃষিকার্য্য করিবার জন্য, আগুন লাগাইয়া এক-একটী বন জ্বালাইয়া দিত; তাহার পর বৃক্ষগুলি যখন ভস্মে পরিণত হইয়া যাইত, তখন উহার উপর শস্যের বীচি বন-আইন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং এই সমস্ত আইনের উপর লক্ষ্য রাখিবার ও অরণ্যের গাছগুলির পরিচর্য্যার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ভারতে যত অরণ্য আছে, ভারত-সরকার সুবিধার জন্য সেগুলিকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারত-সরকার হইতে নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ, যে বনগুলির উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছেন সেই বনগুলিকে Reserved forest বলে। এই সমস্ত বন হইতে কোনপ্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিলে কিম্বা বনের ক্ষতিকর কোন কার্য্য করিলে, আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। আর কতকগুলি বন আছে, যেগুলিকে সরকার Reserved forest করিবেন, কিন্তু এখনও সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই বনগুলিতে জরিপ ইত্যাদি কার্য্য হইতেছে। এই সমস্ত বনকে Protected forest বলে। এখানেও বনের ক্ষতিকর কোনপ্রকার কার্য্য করা নিষিদ্ধ। আর পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার অরণ্য ব্যতীত, অন্যান্য যে-সমস্ত অরণ্যের উপর এখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই, যে-সমস্ত অরণ্য এখন অসভ্যদের হস্তেই আছে, সেগুলিকে Unclaimed forest বলে। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ২৪৩৪৭৮ বর্গ-মাইল বন ভারত-সরকারের অধীনে আছে। উহার মধ্যে ৯৬৩৮৭ বর্গ-মাইল জমা-নেওয়া বা Reserved, ৮৫০৭ বর্গ-মাইল সুরক্ষিত বা Protected এবং অবশিষ্ট অংশ বেওয়ারিশ বা Unclaimed। সরকার কর্ত্তৃক জমা-নেওয়া ও রক্ষিত বনের

বাঙ্গলায় ও আসামে, এবং অবশিষ্টাংশ আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত।

অরণ্যগুলিকে রক্ষা করিতে যেমন সরকারকে প্রত্যেক বৎসর কিছু-কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হয়; তেমনি উক্ত অরণ্য-সমূহ হইতে ভারত-সরকারের কিছু-কিছু আয়ও হইয়া থাকে। বন-বিভাগে ভারত-সরকারের ব্যয় অপেক্ষা আয়ই অধিক, এইজন্য এই বিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকার কিছু টাকা রাজস্ব-হিসাবে পাইয়া থাকেন। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে, ভারতের বন-বিভাগ হইতে ভারত-সরকার ২'৭ কোটী মুদ্রা পান। উক্ত বিভাগ পরিচালনা করিতে সরকারকে ১'৫২ কোটী মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। বন-বিভাগ হইতে ১'২২ কোটী মুদ্রা ভারত-সরকার রাজস্ব-হিসাবে প্রাপ্ত হন। বনবিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকার যত টাকা পান, তাহার শতকরা ৩৭ ভাগ একমাত্র ব্রহ্মদেশ হইতেই পাওয়া যায়। বন-বিভাগ হইতে উৎপন্ন কোন্-কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, ভারত-সরকার কত টাকা প্রাপ্ত হন, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল:—

বাহাদুরী কাঠ ও
জ্বালানী কাঠ —২'১৪ কোটী মুদ্রা।
মহুয়া ও বনজাত ফলমূল—২৫'৯৫ লক্ষ মুদ্রা।
গোচারণ জমির কর —২৪'৭৪ লক্ষ মুদ্রা।

বন-বিভাগ হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে, বন-বিভাগ হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১২২ লক্ষ মুদ্রায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বনবিভাগের রাজস্ব-সংগ্রহকালে, ভারত-সরকার যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়া থাকেন। যে-সমস্ত বন জমা-নেওয়া বা রক্ষিত, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীগণকে উক্ত বন হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিনামূল্যে দেওয়া হয়। বন-বিভাগের রাজস্ব-বৃদ্ধির কারণ, বন-বিভাগের শৃঙ্খলতা। পূর্ব্বে উহা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, এখন উহার শাসন-প্রণালী সংস্কৃত হওয়ায়, রাজস্বের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আফিম:—আমাদের ভারত-সরকার যে-সমস্ত দ্রব্যের এক-চেটিয়া কারবার এখনও নিজের হাতেই রাখিয়াছেন, আফিম তাহার মধ্যে অন্যতম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারত-সরকার আফিমের কারবার হইতে প্রত্যেক বৎসর ৮ কোটী মুদ্রা পাইতেন। এখন চীনে আফিম উৎপন্ন হওয়ায় এবং আফিমের প্রতি চীনের লোকের অনুরাগ কমিয়া যাওয়ায়, চীনদেশ হইতে প্রাপ্ত উক্ত রাজস্বের পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে যে আফিম উৎপন্ন হয়, উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উহার এক অংশ ভারত-সরকার কর্ত্তৃক আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। অপরাংশের নাম, মালোয়া আফিম। মালোয়া আফিম, দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক মধ্যভারতে, রাজপুতনায় এবং বরোদায়

ভারত-সরকার কর্ত্তৃক উৎপন্ন আফিম। ভারত-সরকার স্বয়ং যে আফিমের কারবার করেন, উহার অধিকাংশই আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশের ২৯টী জেলায় উৎপন্ন হয়। ঐ-সকল জেলার কৃষকগণকে, ভারত-সরকারের প্রতিনিধিগণ টাকা দাদন দেন। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে আফিম কাটা হইয়া গেলে, প্রত্যেক কৃষক স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য টাকায় ৬ সের হিসাবে, সরকারের প্রতিনিধিগণকে বিক্রয় করে। সরকারের প্রতিনিধিরা ঐ আফিম গাজিপুরের Central fundএ লইয়া গিয়া জমা করে। সেখানে এই আফিমকে দুই-ভাগে ভাগ করা হয়। যে আফিম চীন এবং ষ্ট্রেট-সেটলমেণ্টে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়, তাহার নাম Provision opium; এগুলিকে বলের আকারে তৈয়ারি করা হয়। প্রত্যেক বলের ওজন ৩·৫ পাউণ্ড। এইরূপ ৭০টি বল একটী সিন্ধুকে থাকে।

ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে ব্যবহার করিবার জন্য যে আফিম তৈয়ারি করা হয়, তাহাকে Excise opium বলে। ইহার সঙ্গে Provision opium-এর রীতিমত পার্থক্য আছে।

Excise opium এর বলগুলিকে ত্রিভুজাকারে তৈয়ারি করা হয়। এই অফিমের এক-একটী বলের ওজন এক সের। এক-একটী সিন্ধুকে ৭০টী করিয়া বল থাকে। প্রত্যেক বৎসর জুন মাসে Provision opium কলিকাতায় বিক্রয় হয়। Excise opium হয় কলিকাতায়, না-হয় গাজীপুর ফারম হইতে লাইসেন্স-প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে বিক্রয় করা হয়, নয়ত গভর্মেণ্টের ট্রেজারীগুলিতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

বৃটীশ-গভর্মেণ্ট প্রত্যেক বৎসর ফরাসী-গভর্মেণ্টকে ৮০০০ টাকা প্রদান করেন এবং ৩০০ সিন্ধুক আফিম একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করেন। ফরাসী-গভর্মেণ্ট সেইজন্য যাহাতে তাঁহাদের শাসিত স্থানে বৃটিশ-ভারতে উৎপন্ন আফিমের অন্যায় ব্যবসা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মালোয়া আফিম ঃ—মালোয়া-আফিমের অধিকাংশই মালোয়া এবং আজমীরেই উৎপন্ন হয়। উক্ত রাজ্যদ্বয় ভারত-সরকারের ন্যায় আফিমের কারবার এক-চেটিয়া করিয়া রাখেন নাই। ভারত-সরকার এই আফিমের বাক্স ৫০০ হইতে ৬০০ মুদ্রায় ক্রয় করিয়া বোম্বাই বন্দর দিয়া চীনে রপ্তানী করিয়া থাকেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে, বোম্বাই হইতে আফিম রপ্তানীর নূতন আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইন-অনুসারে, বোম্বায়ের Collector of Revenue আফিমের রপ্তানী করিবার পাস বিলি করেন। যাহারা আফিম রপ্তানী করিতে চাহে, তাহাদিগকে একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া এই পাস ক্রয় করিতে হয়। তাহার পর আফিমের প্রত্যেক বাক্সের দাম করা হইয়াছে ১২০০ টাকা। তাহারা যতগুলি আফিমের বাক্স পাঠাইতে চাহিবে, সেই বাক্সগুলি উক্ত মূল্যে খরিদ করিতে হইবে। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে, আফিম হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের মাত্রা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাজস্বের কতক অংশ ভারত-সরকার এবং আর-কতক অংশ দেশীয় রাজন্য-বর্গ পাইয়া থাকেন।

যাহা হউক, মোটের উপর আফিম হইতে গৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। ১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে আফিম হইতে গৃহীত রাজস্বের পরিমাণ সমস্ত রাজস্বের শতকরা ১৬ ভাগ ছিল, কিন্তু, ১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া ৭ ভাগ মাত্র হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, চীনে আফিমের বাজার নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, ভারত-সরকার পেনাঙ, সিঙ্গাপুর ইত্যাদির সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিয়া, আফিম হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ আয় আর কতদিন থাকিবে তাহা বলা যায়না।

লবণ। য়ুরোপের আধুনিক অর্থশাস্ত্র-বিদ্‌গণ বলেন যে, রাজ্য-শাসনের জন্য যে টাকা প্রয়োজন, তাহার সমুদয় অংশই যে কেবল ধনীগণের দ্বারাই প্রদত্ত হইবে, দরিদ্রেরা কিছুই প্রদান করিবে না, ইহা ঠিক নহে। এইজন্য দরিদ্র-দিগের নিকট হইতেও কিছু টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহারা মানবের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির উপর শুল্ক বসাইতে বলেন। লবণ মানবের প্রয়োজনীয় নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তু। এইজন্য সমস্ত সভ্য-জগৎ লবণের উপর শুল্ক বসান' ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। লবণের উপর শুল্ক আমাদের ভারতবর্ষে বহুদিন হইতেই প্রচলিত ছিল। ইংরাজগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পর, এই শুল্ক-আদায়ের মালিক হন। পূর্ব্বে লবণের উপর মন-করা

বসান' হইত। এইজন্য একমণ লবণের দাম হইত ৬. টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত। গরীবদের তাহাতে বিশেষ কষ্ট-ভোগ করিতে হইত। লর্ড কার্জ্জনের সময় যখন ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়া উঠে, তখন উক্ত শুল্ক কমাইয়া প্রথমে মণ-করা ২ টাকা তাহার পর ১॥০ টাকা মাত্র করা হয়। ইহাতে একমণ লবণের মূল্য ২॥০ টাকা হইতে ৩৲ টাকায় নামিয়া আসে।

আমরা ভারতবর্ষে যে লবণ ব্যবহার করি, উহার অধিকাংশই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, ৩১০ লক্ষ মণ লবণ আমরা দেশে উৎপন্ন করি এবং ১৬০ লক্ষ মণ লবণ, আমাদের ব্যবহারের জন্য বিদেশ হইতে আমদানি করি। সুতরাং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, আমরা যত লবণ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার পরিমাণ ৪৭০ লক্ষ মণ। আমরা প্রত্যেক বৎসর যে-পরিমাণ লবণ ব্যবহার করি, উহার ২/৩ ভাগ হইতে ৩/৪ ভাগ পর্য্যন্ত আমাদের দেশেই উৎপন্ন করিয়া থাকি। বিদেশ হইতে আনা লবণ প্রধানত বাঙ্গলা এবং ব্রহ্মদেশে অধিক ব্যবহৃত হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, সেই-সেই প্রদেশের উৎপন্ন লবণই ব্যবহৃত হয়। ভারতের আমদানি লবণ সাধারণত ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, এডেন্, মস্কট, জেড্ডা ও মিশরের লোহিতসাগর-স্থিত কতকগুলি বন্দর হইতে আসিয়া থাকে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে, ভারতের যে-যে স্থানে

নিম্নে, তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।(১)

লবণ তৈয়ারি করিবার জন্য সরকারের এবং সাধারণ লোকের কারখানা আছে। সরকারের অপেক্ষা সাধারণ লোকের কারখানার সংখ্যাই অধিক। ব্রহ্মদেশে সমুদ্র-জল আগুনে গরম করিয়া, উহা হইতে লবণ বাহির করা হয়। কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং সিন্ধুপ্রদেশে, সূর্য্যের কিরণেই সমুদ্র-জল শুকাইয়া লবণ বাহির করা হয়। রাজপুতনায় হ্রদের লবণাক্ত জলকে সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া লবণ বাহির করা হয়। পঞ্জাবে এবং কোটায় অনেক লবণের পাহাড় আছে, সেখানে ঐ-সকল পাহাড় হইতে লবণ সংগ্রহ করা হয়। ভারতের উৎপন্ন লবণের শতকরা ৫০ ভাগ বোম্বাই এবং মাদ্রাজ উপকূলে, সূর্য্যের কিরণে জল শুকাইয়া তৈয়ারি করা হইয়া থাকে।

আমরা কোন্ বৎসর কত পরিমাণ লবণ ব্যবহার করিয়াছি এবং উহা হইতে ভারত-সরকার কত টাকা রাজস্ব আদায় করিয়াছেন নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল। (২)

ষ্টাম্প (Stamps)। ষ্টাম্প দুই প্রকার। মোকদ্দমা ইত্যাদির জন্য যে ষ্টাম্প বিক্রয় হয় তাহাকে Judicial Stamp বলে; তদ্ব্যতীত অন্যান্য কারণে যে ষ্টাম্প বিক্রয় হয়, তাহাকে Revenue Stamp বলে। ষ্টাম্প ইংলণ্ডে প্রস্তুত হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষে বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুণ এবং করাচী এই চারিটী স্থানে Central stamp

---

		মণ
(১) বর্ম্মা (সমুদ্রের জল বা কূপ হইত উৎপন্ন লবণ)	...	৭১৪১৮৬
সম্বর হ্রদ	...	৩৫৪৪৪১১
পাঞ্জাব এবং কোহাটের লবণ খনি	...	৩৮৭০৬৮৮
সম্বর ব্যতীত রাজপুতনার অন্যান্য স্থান হইতে	...	৯৯২৪১১
মানদি, সুলতানপুর, গোয়ালিয়র, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের সলপিটার রিফাইনারী হইতে		২০৫৪৯৭
সিন্ধু প্রদেশ	...	৪৪৬২০৬
বোম্বায়ের রন অফ্ কচের উপকূল হইতে	...	১২৩০২৬৩৮
মাদ্রাজের পূর্ব্ব-উপকূল হইতে	...	৩৩৩৬০৯১০

(২) বৎসর	ওজন, মণ হিঃ		রাজস্ব, টাকা হিঃ
১৮৮৮-৮৯,১৮৯২-৯৩	৩৩৪৩১৮৯৬	...	৮০২৬৯৭০৪
১৮৯৩-৯৪,১৮৯৭-৯৮	৩৪২১১৬৭৫	...	৮২৫৮০৯৮২
১৮৯৮-৯৯,১৯০২-১৯০৩	৩৫৬৭৮৬০২	...	৮৬৭৫৯৬৭৯
১৯০৩-০৪,১৯০৭-০৮	৩৯৫৯৭৩৪১	...	৬১৫৮৯৯৫৭
১৯০৮-০৯	৪৩০১৭০২৪	...	৪৩২৬৪১৬২
১৯১০-১১	৪০৫৬৫৯৮৮	...	৪০৮১৭০১০

depot আছে। কলিকাতার ডিপো হইতে ষ্টাম্প সমস্ত বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, আগ্রা, অযোধ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-ভারতবর্ষ, মধ্য-প্রদেশ এবং বেরারে (Stamp for copies only) বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। বোম্বায়ের ডিপো হইতে সমস্ত বোম্বাই প্রদেশে, বেরারে এবং (Copy-র ষ্টাম্প ছাড়া অন্যান্য ষ্টাম্প) মধ্য-প্রদেশে ও মধ্য-ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে সমস্ত মাদ্রাজ প্রদেশে, কুর্গে, বাঙ্গালোরে এবং ত্রিবাঙ্কুরে ষ্টাম্প প্রেরিত হয়। রেঙ্গুণ হইতে সমস্ত ব্রহ্মদেশে এবং আন্দামানে যায়। করাচী হইতে, সমস্ত পাঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশ বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, রাজপুতনা, কাশ্মীর, খোরাস্থান, পারশ্যউপ-সাগরের উপকূলস্থিত প্রদেশ-সমূহে ষ্টাম্প প্রেরিত হয়।

ষ্টাম্প হইতে কোন্ বৎসর কত টাকার রাজস্ব আদায় হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

		টাকা হিঃ
১৮৭৮-৭৯,১৮৮২-৮৩	...	৩২৬১৬৮৯৪
১৮৯৩-৯৪,১৮৯৭-৯৮	...	৪৬৮৯৪৬৮০
১৯০৩-০৪,১৯০৭-০৮	...	৫৯০২২২৭৩
১৯০৮-১৯০৯	...	৬৮৪৭৭৫৪১
১৯০৯-১৯১০	...	৭১৩৩৫২১৩
১৯১০-১৯১১	...	৭৫৬৪৭৭৬৯
১৯১১-১৯১২	...	৬৫৮৬২৫৩৭

আয়কর (Income tax)। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আয়-কর বলিয়া কোন ব্যাপার ছিল না। সিপাহি-বিদ্রোহের পর, ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে একজন অর্থ-সচিব প্রেরিত হন। তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম ইন্‌কম-টাক্স বা আয়-কর-প্রথা স্থাপন করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিলে, আয়-কর তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষাদি বিবিধ কারণে, ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা আবার মন্দ হওয়াতে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে Licence-tax প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই লাইসেন্স-টাক্স চিরস্থায়ী আয়-করে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জমি হইতে খাজনা গ্রহণ করা হয় বলিয়া, জমি হইতে যে আয় হয়, তাহার উপর কোন কর নাই। আয়-কর যখন প্রথম প্রচলিত হয়, তখন বাৎসরিক ৫০০ টাকা হইতে উর্দ্ধতন আয়ের উপর উহা স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড কর্জ্জনের সময় ভারত-সরকারের অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল হইয়া উঠায় বাৎসরিক ১০০০ টাকার আয়ের উপর আয়-কর বসান' হইয়াছে। ভারত-বাসীদের আয় দিন-দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় করের পরিমাণ দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রাদেশিক কর (Provincial rates) :—জমির খাজনা ব্যতীত, পথকর প্রভৃতি প্রজাদের নিকট হইতে যে কর গৃহীত হয়, তাহাকে Provincial rates বলে। ইহা হইতে উদ্বৃত্ত সমুদয় অংশ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ ব্যবহার করিতে পারেন। কৃষকদিগের নিকট হইতে এই কর সংগৃহীত হয় বলিয়া দুর্ভিক্ষ

হইলে বা বারিপাত না হইলে, জমির খাজনা যেমন কম হয়, ইহারও সেইরূপ হ্রাস হয়। ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৫৪ লক্ষ রাজস্ব আদায় হয় কিন্তু ১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দে, উহা ৪০৫ লক্ষ মুদ্রায় গিয়া দাঁড়ায়।

ভারত-সরকারের ব্যয়ও যথেষ্ট। একমাত্র Civil Department-এ-ই ১৫২ কোটী মুদ্রা ব্যয়িত হয়। কোন্ বিভাগে কত মুদ্রা ব্যয় হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বিভাগ	লক্ষ মুদ্রা হিঃ
সাধারণ শাসন-বিভাগ ...	২২৭
বিচারালয় ...	২৯৫
জেল ...	৭৪
পুলিশ ..	৪০৭
সমুদ্র-বিভাগ (Marine) ...	৫১
যাজকীয় (Ecclesiastical) ...	১৭
অন্যান্য বিভাগসমূহ ...	৬১

ইহা ভিন্ন, পেনসন্, কাগজপত্র, ছাপাই খরচ ইত্যাদিতেও কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ বিভাগে সরকারের যাহা খরচ হয়, তাহার অপেক্ষা আয়ই অধিক; সুতরাং ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে ভারত-সরকারের প্রত্যেক বৎসর কিছু-কিছু লাভই হইয়া থাকে।

টাঁকশাল হইতে খাদ-মিশ্রিত টাকা মুদ্রিত করায়, ভারত-সরকারের প্রত্যেক বৎসর যথেষ্ট লাভ হয়। কিন্তু উক্ত মুদ্রা Gold Standard Reserve Fundএ জমা দেওয়ায়, উহা রাজস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ... গুলিকে গলাইয়া নূতন মুদ্রা তৈয়ারি করাইতে, প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকারকে কিছু কিছু খরচ করিতে হয়।

রেলওয়ে।— ভারতবর্ষের সমস্ত রেলওয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, ভারত-সরকারের সাহায্যেই নির্ম্মিত হইয়াছে। রেলওয়েগুলিতে পূর্ব্বে ভারত-সরকারের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইত। কয়েক বৎসর হইল, রেলওয়েগুলি বেশ আশাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৎসর	মোটক্ষতি লক্ষ মুদ্রা হিঃ
১৮৭৬-৭৭—১৮৮০-৮১ ...	১২০
১৮৮১-৮২—১৮৮৫-৮৬ ...	৭৪
১৮৮৬-৮৭—১৮৯০-৯১ ...	১৬২
১৮৯১-৯২—১৮৯৫-৯৬ ...	১৫৩
১৮৯৬-৯৭—১৮৯৮-৯৯ ...	১৬৮
১৮৯৯-১৯০০—১৯০৪-১৯০৫	
মোট লাভ ...	১১১

কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য, ভারত-সরকার খাল কাটাইয়াছেন ও কূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। কিন্তু, এই বিভাগে সরকারের খরচ অপেক্ষা আয়ই অধিক। এই বিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকার এক কোটীরও অধিক মুদ্রা প্রাপ্ত হন। জেলার ও প্রাদেশিক সরকারী বাটী এবং সরকারী রাস্তা ইত্যাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কার-কার্য্যে সরকারকে প্রত্যেক বৎসর ৪ কোটীরও অধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। যে বৎসর সরকারের আর্থিক অবস্থা মন্দ হয়, সেই বৎসর এই বিভাগের

ঋণের জন্য কত টাকা সুদ দিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে।

সৈন্য-বিভাগ। ১৯১১-১৯১২ খৃষ্টাব্দের report-এ প্রকাশিত যে, ভারত-সরকার সৈন্যবিভাগে ২০০½ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন। ঐ মুদ্রার ২৩'২১ কোটী ভারতবর্ষে এবং ৫০'০৬ লক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডে খরচ করা হয়।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বিভাগ (effective), পরোক্ষ ফলপ্রদ বিভাগ (non-effective), সমুদ্র-বিভাগ (marine) এবং স্বতন্ত্র রক্ষা-বিভাগ (special defence works);—সৈন্য-বিভাগে, এই চারিটি শাখা আছে। কোন্ শাখায় কত খরচ নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল। (৩)

এখানে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহা শান্তির সময়ে সৈন্য-বিভাগে যে টাকা খরচ হয়, তাহারই তালিকা। হঠাৎ যুদ্ধ বাধিলে যে টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা extra-ordinary charges বলিয়া ধরা হয়। সে টাকার কতক্ অংশ অতিরিক্ত সাময়িক কর ইত্যাদি হইতে এবং আর কতক্ অংশ ঋণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

পরিচয়

কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচয়?
গেছি ভুলে, এখন খালি চিরদিনের মনে হয়।
মেঘের তড়িৎ বনের হরিৎ
সিন্ধু সরিৎ মাঝে কি?
উজল নিশায় বিমল উষায়
দিবায় কিম্বা সাঁঝে কি?
শুদ্ধ তারা কল্পনা কথা; তবে সেথায় নয়রে নয়।
সে কি ধ্যানে? সে কি জ্ঞানে?
সে কি গভীর সাধনায়?
সে কি সুখের ফুল্ল বুকে?
সে কি দুঃখে যাতনায়?
কহে তারা নিজের কথাই; তবে সেথা নয়রে নয়।
কবে কোথায় পরের ব্যথায়
আকুল হয়ে কেঁদেছি?
মন ভুলায়ে, হাত বুলায়ে,
কোথায় কাকে সেধেছি?
সেথায় বুঝি আমার খোঁজে এসেছিলে প্রেমময়!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

(৩) প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বিভাগ		কোটী মুদ্রা হিঃ
সৈন্যদিগের বেতন ও ভাতা এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের খরচ তাহাও এই শাখার অন্তর্ভুক্ত		১৪
Supply, transport including firms, ইহাও এই শাখার অন্তর্ভুক্ত		৩'১৮
Ordinance establishment, supplies and services		১
পরোক্ষ ফলপ্রদ বিভাগ		
পেনসন্ গ্রাচুইটী ইত্যাদি এই শাখার অন্তর্গত	...	৪'৭৮
Military works ঐ	...	১'৪৪
সমুদ্র-বিভাগ	...	৫০ লক্ষ
স্বতন্ত্র-রক্ষা-বিভাগ	...	৫ লক্ষ

চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্তচন্দ্র মেঘান্তর হ'তে সমুজ্জ্বল,
যজ্ঞ-ভস্মরাশি হতে দীপ্ত তব দৃপ্ত তেজোবল।
মানববিধান রাজ্যে হে বিদ্রোহী বিধাতৃ-প্রেরিত,
পঙ্ক হ'তে জনমিল পদ্মসম তব ছত্র সিত।
প্রকৃতি তোমার মাঝে, ক্রুদ্ধা হয়ে—মানবের পরে
নিল তার প্রতিহিংসা আভিজাত্য পদে চূর্ণ করে'।
রাষ্ট্র নহে লীলাক্ষেত্র, প্রজা নহে খেলার পুতুল,
রাজনীতি নহে শুধু প্রমোদের কল-কোলাহল,—
এ সত্য জানালে তুমি ধ্বংস করি অগ্নিবর্ণ কুল,
ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব যত ব্যসনীরে করিয়া নির্ম্মূল।
আর্য্যত্ব-গৌরবী যত শূদ্রাধমে করিয়া সংহার,
অযোগ্য, অসত্য, তমে ওগো চন্দ্র, করি অপসার—
জাগো তুমি দাসী-পুত্র ক্ষত্রোত্তম, বীরেন্দ্র-কেশরী;
অক্ষত্রিয় ক্ষত্রে ত্যজি আর্য্যাবর্ত্তে তোমারেই বরি।
বসুমতী বীরভোগ্যা; ন্যায় সত্যে দিবে বরমালা,
বিচার করেনা সে যে অট্টালিকা আর পর্ণশালা।
তুমি পূর্ব্ব পশ্চিমের ঘটাইলে প্রথম মিলন,
শর্ম্মিষ্ঠারে এনে তুমি অঙ্কলক্ষ্মী করিলে রাজন্,
যবনীরে চুম্ব দিলে যবনেরে বক্ষে নিলে তুমি,
হে আদর্শ মহারাজ, তুমি মহা মিলনের ভূমি।
ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম— ভগবান্ নহে পক্ষপাতী
সবাই সন্তান তাঁর—ভেদ নাই—সবি এক জাতি—
তোমার জীবনে যাহা একদিন হলো অঙ্কুরিত
চৈতন্য-নানক-বুদ্ধ-মন্ত্রে তাহা পূর্ণ বিকশিত।

শ্রীকালিদাস রায়।

স্বেচ্ছাচারী

৯

কবিবর মণিশঙ্করের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার 'মানস-প্রতিমা' হঠাৎ সান্ধ্যভ্রমণ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সেদিন তিনি স্পষ্ট তাঁহাকে বলিয়াছেন যে আর তিনি তাঁহার সম্মুখে বাহির হইবেন না। মণিশঙ্করের কাতর দৃষ্টি, অভিমান-ভরা মধুর বচন, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "বাবা বলেন, তুমি মদ খাও, খারাপ লোকের সঙ্গে থাক, তোমার সঙ্গে কথা বলতে নেই।" হায় নিষ্ঠুরে! তুমি ত' জান না, কেন সে মদ খায়! তোমার নিষ্ঠুরতা, তোমার উপেক্ষাই যে তাহার কারণ। তুমি যদি দয়া করিয়া তাহার পানে একবার চাহিয়া দেখ, তাহা হইলে যে সে রাজার রাজা হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক হইতে পারে, ভীষ্মের মত শরশয্যায় শয়ন করিতেও তাহার বাধে না! তুমি যদি বল, তাহা হইলে সে পিতা ত্যাগ করিতে পারে, এমন কি এমন যে হিতৈষিণী মাতা, তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া তোমার চরণে সে আপনাকে বলি দিতে পারে। হায়, তুমি তোমার ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তির উপর উন্নত হইয়া বসিয়া রহিলে, আর সে রহিল কোথায়?

কবিবরের দুঃখ-সাগর মথিত হইয়া আজ-কাল যে সমস্ত উচ্ছ্বাস বাহির হইতেছিল, তাহাদের অমানুষিক বা আনুনাসিক রসাত্মকতায় অনেক নিশাচর সাহসী ব্যক্তিও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল। এমন কি তাঁহার "শঙ্করসাহি" কবিতাগুলি "পল্লী-সাহিত্যানুসন্ধান-সমিতির" সভ্যগণের কৃপায়, মণিশঙ্কর নামটিকে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দী হইতে একেবারে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উপনীত করাইয়া পল্লী-সাহিত্যের গতাসু মহাপুরুষগণের সঙ্গে তাঁহাকে একাসনে বসাইয়া দিতেছিল।

গৃহে তাঁহার সঘন মূর্চ্ছা, বন্ধু-মহলে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণোন্মাদকর শঙ্করসাহি গীত এবং পথে ঘাটে তাঁহার চপল মন্থর গতি গ্রামের চিত্তটিকে একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মাতা ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার আসিয়া ব্যবস্থা করিলেন, দুই বেলা ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল আর ভাত এবং দিবারাত্রি গৃহে আবদ্ধ থাকা। বন্ধুরা ব্যবস্থা করিলেন, "পোড়া বাঙ্গলা" ছাড়িয়া তাঁহারই বৈঠকখানায় আসিয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখা। মণিশঙ্কর স্বয়ং ব্যবস্থা করিলেন, প্রতিদিন চারি বোতল করিয়া ধান্যেশ্বরীর সেবা। কিন্তু মূর্খ পিতা দুর্গাশঙ্কর ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার নিজ সলিমপুর মহালের নায়েবী—না হয়, জমিদার-মহাশয়কে বলিয়া-কহিয়া নিকটস্থ কোন এক তালুকের ম্যানেজারী।

পিতার এই ব্যবস্থা শুনিয়া পুত্রের উদ্ভাবনশীল মস্তিষ্কে এক অপূর্ব্ব ভাব গজাইয়

উঠিল। তিনি তাঁহার পিতাকে ধরিয়া বসিলেন যে শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরীর নামে যে সুবর্ণ-গোলা নামক তালুক আছে, তাহার ম্যানেজারিটা তাঁহাকে দেওয়া হউক। উহার ম্যানেজার না কি এই সময় হিসাব দিবার জন্য সদর কাছারিতে আসিয়াছে; উহাকে এই সময় বরখাস্ত করিয়া পিতা তাঁহাকে ঐ পদটী প্রদান করুন, তাহা হইলেই কবিবরের সমস্ত রোগ সারিয়া যাইবে। পিতা সেই কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকেও ঐ সময়ে তড়িৎগতিতে একটা অভিসন্ধি জাগিয়া উঠিল; এবং দৈবের কোন্ অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "ম্যানেজার বেটাকে হিসেব নিকেশে ফেলতে হবে।"

দুর্গাশঙ্কর চলিয়া গেলে মণিশঙ্কর বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া এক অদ্ভুত প্রস্তাব করিলেন। শুনিয়া বন্ধুগণ একেবারে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু কবিবরের তখন বাক্যের উৎস খুলিয়া গিয়াছে; তিনি জ্বলন্ত গদ্য-পদ্য বর্ষণ পূর্ব্বক বন্ধুগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; দুই ঘণ্টার উদ্যোগে স্থির হইল, যেমন করিয়াই হউক সুবর্ণ গোলার ম্যানেজারের কাগজ-পত্র সরাইয়া ফেলিতে হইবে। ম্যানেজার রাত্রে ঠাকুরবাড়ী-সংলগ্ন একটা কুঠরীতে নিদ্রা যায়। রাত্রি বারোটা-একটার সময় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। মহাশক্তির প্রভাবে সকলেই উৎসাহিত হইয়া উক্ত কার্য্যে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইল।

কিন্তু কার্য্যকালে সমুৎপন্নে দেখা গেল, তিন-চারিজন ছাড়া আর কেহই মণিশঙ্করের সঙ্গে নাই। তথাপি কি ভয়, কি ভয়! তাহারা এক-একজনেই এক একশত। Forward! March! No fear!

সেনাপতি মণিশঙ্কর বলিলেন, "সাবধান! কোন শব্দ করো না। চুপি চুপি ওখানে ঢুকে যদি দেখি দরজা বন্ধ, তাহলে কাঠের জানলাটা এক টানে খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে তার পর দেশলাই জ্বালা যাবে। পাপিষ্ঠ ম্যানেজার যদি বাধা দেয়, তাহলে—"মণিশঙ্কর কলোসিয়ম্-স্থিত রোমান সম্রাটের ন্যায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, কি করিতে হইবে।

মণিশঙ্কর নিঃশব্দতার আদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একজন প্রিয়তম শিষ্য যিনি শঙ্করসাহি সঙ্গীতে এবং ধান্যেশ্বরীর সেবায় গুরুকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই তাঁহার হৃদয়স্থ শঙ্কর সাহির সুরকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাই অন্যান্য সকলে যখন ম্যানেজারের কক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া জানালা-দরজা বন্ধ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিল, তখন তাঁহার শঙ্করসাহি হঠাৎ সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইল, "একবার বেরোও হে নরেশ!"

"আরে, চুপ চুপ।"

"আমরা তোমায় দেখে নেবো;
বেরোও হে নরেশ! একবার বেরোও হে—এ।—',

"সর্ব্বনাশ করলে। আরে চুপ।"

কিন্তু কে শোনে? পুনরায় দ্বিগুণ জোরে বাহির হইল, "বেরোও হে—এ—এ—একবার।"

এমন সময় দ্বার খুলিয়া ম্যানেজার নরেশচন্দ্র মহালনবীশ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কে হে তোমরা?"

আর পিছানো চলে না! মণিশঙ্করের সেই গায়ক শিষ্য গিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া গাহিল, "আমরা তোমায় দেখে নেবো—হে!" নরেশবাবু ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ডাকাত—ডাকাত—"এবং কোনরূপে আপনাকে মুক্ত করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার চীৎকারে কিছুক্ষণের মধ্যেই টোলের কয়েকটী ছাত্রসমেত সর্ব্বানন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মুখে কাপড়-বাঁধা কয়জন লোক দরজা ঠেলিয়া নরেশবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তিনি কক্ষমধ্য হইতে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন। তাহারা আসিয়া মণিশঙ্করকে সদলে ঘিরিয়া ফেলিল। মণিশঙ্কর বেগতিক দেখিয়া হুকুম দিলেন, "চালাও লাঠি।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "আর লাঠি চালিয়ে দরকার নেই। পালাও বলছি, নইলে সব-কটী মাতালকে ঐ কুয়োয় চোবাব।"

মণিশঙ্কর হুকুম দিলেন, "মারো শালা সর্ব্বাকে।" কিন্তু সর্ব্বানন্দ ও অন্যান্য ছাত্রগণ কিল, চড় ও দুই-চারি লাথিতে সকলকে ভূতলশায়ী করিল। পরে ঠাকুরবাড়ির দরোয়ানগণ পৌছিলে বলিয়া দিল, "বাঁধো এদের।" দরোয়ানেরা সঙ্গে আলো আনিয়াছিল। তাহারা আলোর সাহায্যে যখন চিনিল, কাহাকে বাঁধিতে হইবে, তথনই সকলে পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আরে ইনি মণিবাবু! ই কেয়া হুয়া? আপ্ কাহে ডাকু বন্ গিয়া?" মণিশঙ্কর তখন সাহস পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঁধো ঐ শালাকো।" কে কাহাকে বাঁধে?

ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিল, "বটে! আরে সর্ব্ব-দা, করেছ কি! মণিবাবু এসেছেন, ওঁর অভ্যর্থনা করনি? ছি ছি, কি করছ, শীগ্‌গির কুয়ো থেকে একঘড়া জল তুলে এনে ওঁর মাথায় দাও।" সর্ব্বানন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এই সারলে! ওহে মণি, পালাও, কার্ত্তিক ক্ষেপেছে। আমার হাতে তবু রক্ষা আছে, ওর হাতে নেই।"

মণিশঙ্কর কার্ত্তিকচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়াই সসম্মানে পলায়নের পথ খোলসা কি না তাহাই দেখিতেছিল। ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র কূপ হইতে একঘড়া জল তুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মণিশঙ্করের অন্যান্য বন্ধুগণ পূর্ব্বেই পলাইয়াছিল, কিন্তু সে তখনও সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্ত্তিক আসিয়া যেমন তাহার গলায় হাত দিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে মাটিতে ফেলিল, অমনি সে সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্ব, ভাই, রক্ষে কর।" সর্ব্বানন্দ তখন কার্ত্তিককে টানিয়া বলিল, "আঃ, কি কর, কার্ত্তিক? দেখছ না, বেচারা মদের ঝোঁকে এ কাজ করে ফেলেছে। যাও মণি, পালাও।"

মণিশঙ্কর তখন একেবারে তাঁহার "আড্ডা" পোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহার যে কয়টী সঙ্গী যুদ্ধাভিযানে যাইতে সাহস করে নাই, তাহারা উপস্থিত ছিল। মণিশঙ্কর ফরাশের উপর গিয়া আছাড় খাইয়া বলিলেন, "ভাই দেবেন, ভাইরে, আমার বড় অপমান হয়েছে!"

"কি, কি, কি হল?"

"উঃ, বড় অপমান! জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল!"

একজন বন্ধু তাড়াতাড়ি এক গ্লাস ষ্টিমুলাণ্ট্ আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিতেই, তৎক্ষণাৎ সে তাহা উদরসাৎ করিয়া বলিল, "উঃ, ভাইরে কি অপমান! আমার মূর্চ্ছা যাবার ইচ্ছে হচ্চে।" তাহার অবস্থা দেখিয়া একজন তাড়াতাড়ি তাঁহার মাতার নিকট সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেল, এবং অন্যান্য সঙ্গীগণ পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

দেবেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি!"

মণিশঙ্কর কহিল, "প্রিয়নাথ, বাপ! আর এক গ্লাস দাও, ভাই!"

প্রিয়নাথ তাহার আজ্ঞা পালন করিলে মণিশঙ্কর উঠিয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কি হয়েছে? বরং বল, কি হয়নি? সেই পাপিষ্ঠ পরান্নভোজী কুকুরগুলোর ভয়ে আমায় পালিয়ে আসতে হল! সেই পাতচাটা হারামজাদা সর্ব্বা আর কার্ত্তিকে! সেই দুটো চ্যাংড়া আমায় লাথি মারলে!

দেবেন কহিল, "থাম, থাম, ও কি করছ? গলা টিপছ কেন?"

মণি কহিল, "আমি মরব। সত্যি আমি মরব।"

দেবেন কহিল, "প্রিয়নাথ, তুই আরও মাটি করলি। এ সময়ে আবার মদ দিতে গেলি কেন? এখন একটু তেঁতুল-গোলার জোগাড় দেখ্।"

দেবেন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল লইয়া মণির মাথায় দিতে লাগিল। মণিশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি ঠাণ্ডা করছিস, দেবেন? এ প্রাণ আর ঠাণ্ডা হবে না। যেদিন সর্ব্বার মুণ্ডু এই হাতে, আর কার্ত্তিকের মুণ্ডু এই হাতে ঝোলাতে পারব, সেদিন ঠাণ্ডা হব। নইলে বন্ধু, তোমরা বন্ধু-হারা হবে।"

প্রিয়নাথ তেঁতুল-গোলা আনিবামাত্র দেবেন বলিল, "এই তেঁতুল-গোলাটুকু খাও।"

মণি কহিল, "কি এনেছ? তেঁতুল-গোলা! যদি এই বাটিতে করে ঐ পাপিষ্ঠদের গরম রক্ত আনতে পারতে, তাহলে তাই খেয়ে আমি ঠাণ্ডা হতুম! কি মিছে তেঁতুল-গোলা খাওয়াচ্ছ? রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত—রক্ত!"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি তাদের রক্ত এনে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ এইটে খাও—"

"তাদের মুণ্ডু—দু-দুটো মুণ্ডু—"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি কেটে এনে দিচ্ছি। তুমি এটুকু খেয়ে ফেল

তাহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় নিস্তারিণী দেবী "ওরে মণিরে, বাপ্‌রে" বলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন মাতৃভক্ত সন্তান টলিতে টলিতে উঠিয়া মাতাকে ধরিয়া বলিল, "মা—গর্ভধারিণী—জগৎজননী—"

বাকীটুকু আর শুনা গেল না। কারণ পুত্রের নিবিড় আলিঙ্গনে মাতা সপুত্র ভূমিসাৎ হইলেন।

১০

দেওয়ান দুর্গাশঙ্করের গর্ব্বোচ্চ শির নত হইয়া যাওয়ায় তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। এমন কি যাহারা তাঁহার কৃপাদৃষ্টির জন্য সতত সতৃষ্ণ নয়নে জোড়-করে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত, তাহারাও আজকাল তাঁহাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাছারির আমলা-ফয়লা হইতে আরম্ভ করিয়া উমেদার পাইক এমন কি ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইয়া হাসে। দেখিয়া শুনিয়া তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে একদিন জমিদার মহাশয়কে বলিলেন, "আমার বয়স হয়েছে, এখন আর আমি পারি না, আমার কাছ থেকে সব বুঝে সুঝে নিয়ে আমায় ছুটী দাও।"

কালিকাবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছেলের দোষে নিজেকে দোষী করা নিজের উপর অন্যায় অত্যাচার! আপনি কেন ব্যস্ত হচ্চেন? মণিশঙ্করের জন্য আপনি কেন শাস্তি ভোগ করতে যাবেন? আপনি আমার পৈতৃক দেওয়ান, আপনাকে

দুর্গাশঙ্কর কহিলেন, "না বাপু, এ আমারই পাপের শাস্তি। যেখানে আমি মাথা উঁচু করে সবার ওপর হুকুম চালিয়েছি, সেখানে মাথা নীচু করে কাজ করতে পারব না। তোমার এষ্টেট হতে আমি যা কিছু করেছি, তাতেই আমার বাকি কটা দিন বেশ চলে যাবে। আর কেন আমায় ধরে রাখছ?"

কালিকাবাবু বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া কিছুতেই দেওয়ানজীকে রাখিতে পারিলেন না; তবে দুর্গাশঙ্কর আরও কয়েক মাস থাকিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

দেওয়ান মহাশয়ের কর্ম্মত্যাগের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কেহ দুঃখিত হইল, কেহ মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি দুঃখবোধ করিলেন। পুত্রের পাপে পিতার শাস্তি-ভোগ তাঁহার নিকট বড়ই দুঃসহ বোধ হইল, তাই তিনি কার্ত্তিককে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের জন্যই দেওয়ানজী এ রকম ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তোমরা যদি মণিশঙ্করের সেদিনকার ব্যাপার চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করে না দিতে, তাহলে কখনই এ ব্যাপার ঘটত না। সেদিন থেকে মণি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে, দেওয়ান মশায়ের স্ত্রীও শুনলাম, সেদিন থেকে শরীরে আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়েছেন, তার ওপর উনি আবার কাজ ছেড়ে দিচ্চেন। তোমাদের উচিত, ওঁর পায়ে ধরে যাতে উনি আবার কাজ নেন, তাই

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সময়-মত দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করিল। দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন তোমরা বাপু আবার আমার পিছনে লাগলে? কাজ করা না করা আমার ইচ্ছে। এতে পরের এত মাথা-ব্যথা কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমাদের জন্য যদি আপনার ক্ষতি হয়ে থাকে, বলুন, যেমন করে হোক, সে ক্ষতি পূরণ করবার চেষ্টা করব। রামকে তীর মারলে সে তীর যদি শ্যামকে লাগে, তাহলে যে তীর ছুড়েছিল, সকলে তাকেই দোষ দেবে। কি হলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, বলুন, আমার সাধ্যাতীত না হলে আমি তাই করব।"

দুর্গাশঙ্কর গড়গড়ায় ভীষণভাবে দুইটা টান দিয়া বলিলেন, "বিপদে কোথায় সহানুভূতি পাব, না, এই রকম একটা চ্যাংড়ার কাছে অপমান হতে হচ্চে! যারা আমার সামনে মুখ তুলে কথা বলতে সাহস করত না, তারা এখন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে, সাহায্য করব। ওঃ, এর চাইতে মরণ ছিল ভাল!"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমার কোনরকম অসদভিপ্রায় নেই। যে শপথ করতে বলেন, তাই করে বলছি, যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়, আমি তা করতে রাজী আছি।"

দুর্গাশঙ্কর কহিল, "কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! আচ্ছা, দেখি, টোলের ভাত খেয়ে তোমার মনটা কতখানি বড় হয়েছে! বাবুকে বলে-কয়ে মণিশঙ্করের সঙ্গে শৈলজার বিয়ে

কার্ত্তিকচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি! তা আমি কেমন করে পারব? শৈলজার বিয়ের ওপর আমার কি হাত? বাবু আমার কথা শুনবেন কেন? তবে আমায় যদি এ প্রস্তাব করতে বলেন, আমি আজই করব।"

"না, না, অতখানি দয়া তোমায় করতে হবে না। তবে তুমি যদি ইচ্ছে কর, তা হলে তা হতে পারে।"

"কি করে, বলুন। আমি তাই করব।"

"তোমাদের এখানকার বাস তুলতে হবে।"

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমরাই তা হলে আপনার শত্রু! বেশ, তাহলে বাবাকে এ কথা বলছি যে, আমরাই আপনার পথের কাঁটা। কিন্তু বাবা এখান থেকে যাবেন কি না, সে কথা বলতে পারিনে। যদি একা আমি গেলে হয়, বলুন, আমি এখনই সরে পড়ছি। আর যখন ইংরিজিই পড়ছি, তখন এ বিদ্যার শেষ না দেখে আমি ছাড়ছি না। চার মাস পরেই আমাদের এণ্ট্রেন্স্ একজামিন, তারপর হয় কলকাতায়, নয় অন্য কোন জায়গায় আমায় যেতেই হবে। তখন অনায়াসেই আমি আপনার পথ থেকে দূর হব। এই চার মাস অপেক্ষা করতে পারবেন না? এখন যেতে হলে, হয়ত বাবু আমায় যে-রকম ভালবাসেন, তাতে আপনার সুবিধে না হয়ে অসুবিধেই হতে পারে।"

দুর্গাশঙ্করের ক্রোধ ক্রমশ বিস্ময়ে

বালকের এতখানি বুদ্ধি! দুর্গাশঙ্করের মনে আবার আশা দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, ইহার বুদ্ধি যথেষ্ট বটে, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি কম, নহিলে নিজের ভবিষ্যৎকে কি কেহ এতখানি উপেক্ষা করিতে পারে?

তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আপনার ভয় হচ্ছে যে, এত বড় লোভ আমি কি করে সম্বরণ করব? হয়ত পারব না? কিন্তু ঠিক জানবেন যে আপনার কাছে যেটা খুব বড়, আমার কাছে হয়ত সেটা খুবই ছোট! আপনি টাকা-কড়ি, ধন-দৌলতকে বড় করে দেখতে শিখেছেন, আর আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, নিজের মানটাকেই বড় করে দেখতে শিখেছি। বাবু হয়ত আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে শৈলজাকে আমার হাতেই সঁপে দেবেন, মনস্থ করেছেন। কিন্তু আমি জানি, ভিখিরীর ছেলে রাজপদ পেলেও সেই ভিখিরীই থাকে। আপনার মণি এই এত বড় লাখ-দেড় লাখের সম্পত্তি পেলেও সেই মণিই থাকবে। আমি দূর থেকে তাই দেখে হাসব। কিন্তু বাবু আমায় ভালবাসেন, ঠিক জানবেন, সে ভাল-বাসার অপমান আমি কখনও করব না। আমি বড়ই হব, ছোট হব না। বাবা যদি এতদিন পর্য্যন্ত আমার ভার বহন করতে পেরে থাকেন, আরও কিছুদিন তিনি তা পারবেন, বোধ হয়।"

দুর্গাশঙ্কর তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন তুমি ব্রাহ্মণের ছেলেই থেকো। তোমায় কিছু করতে হবে না। কপালে থাকে, মণি বড় হবে, ভাল হবে, কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাহায্য নেব না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করগে। আমি অধম, তাই তোমায় সন্দেহ করেছিলাম।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু আমি যখন বলেছি যে আপনার পথে দাঁড়াব না, তখন নিশ্চয়ই সরে যাব, কেউ আমায় নিবারণ করতে পারবে না। তবু এও বলে রাখছি, আপনার মণিকে বাবু যদি মেয়ে না দেন তাহলে আমি আবার আসব। তখন যদি তিনি আমাকেই সমস্ত দেন, ত আমায় নিতেই হবে, কারণ তিনি আমায় ভাল বাসেন। তবে ভয় নেই, এখন যদি তিনি প্রস্তাব করেন যে তোমায় শৈলজাকে বিয়ে করতে হবে, তাহলে আমি কিছুতেই তা করব না। আপনি আপনার মণির জন্য যথেচ্ছা চেষ্টা করুন।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দাঁড়াইল না, দেওয়ানজীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গাশঙ্কর নীরবে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি যে বাপ, কি করি!"

১১

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার কিছুদিন পরে দেখা গেল, কার্ত্তিকচন্দ্র কুড়ি টাকার বৃত্তি পাইয়াছে। সর্ব্বানন্দ পাশ হইয়াছে মাত্র। এই দুই সংবাদে সকলেই সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহার পিতা

প্রস্তাব করিলেন, সে ঐ স্কলারশিপের টাকায় কলিকাতা বা অন্য কোন স্থলে পড়িতে যাইতে পারে, তখন সে বলিল, "সর্ব্ব-দার কি হবে?"

পিতা বলিলেন, "যিনি এতকাল ওর খরচ বহন করে আসছেন, তিনি যদি এখন অস্বীকৃত হন, তাহলে নিরুপায়!"

"তাঁর কাছে এখন এ প্রস্তাব করে কে?"

"ইতিপূর্ব্বে যে করেছিল, সেই করবে।"

"কোন কারণবশতঃ আমি আর সে প্রস্তাব করতে পারব না।"

"কি কারণ?"

কার্ত্তিকচন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনার কাছে গোপন করা উচিত নয়। দেওয়ানজীর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তা থেকে এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, কেন বাবু আমায় এত স্নেহের চক্ষে দেখেন। বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার ইচ্ছা করেছেন। এখন সেকথা জেনে শুনে তাঁর উপর জোর-জুলুম আর আমি করতে পারিনে। যদিও আপনিই এতদিন আমাদের খরচ-পত্র চালিয়েছেন, কিন্তু অন্য জায়গায় পড়বার খরচ চালানো আপনার পক্ষে অসম্ভব। অতএব এ অবস্থায় আমি ত কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। এখন জেনে শুনেও যদি অজ্ঞের ভাব দেখিয়ে আমি তাঁকে গিয়ে বলি যে সর্ব্ব-দার খরচ আপনাকে দিতে হবে, তাহলে সেটা মিথ্যে কথা বলার মতই হবে। এক উপায়, যদি সর্ব্ব-দা গিয়ে বলে। কিন্তু—"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কালিকাবাবু কত লোকের ছেলে-পিলের খরচ-পত্র দিচ্ছেন, সর্ব্বানন্দর মত গরীব ব্রাহ্মণের ছেলের খরচ দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন, এ সংবাদ ত আমিও জানতাম না। আমি মনে করতাম, তিনি যেমন সকলকেই দয়া করেন, তোমাকেও তেমনি। তবে তোমায় যে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এটা আমি খুবই জানি! কিন্তু এর মধ্যে যে ঐ-রকম ভাব লুকানো ছিল, তা ত কৈ ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। ছি ছি, কি লজ্জা! এখন ত সকলেই মনে করবে যে, আমি টাকার লোভে ছেলে বিক্রী করেছি। কার্ত্তিক, আর তোমার ইংরিজি লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই।"

"আমার লেখা-পড়ায় ত এতদিন কোনরকম আর্থিক সাহায্য বাবু করেন নি, আজও করতে হবে না, কারণ আমি যা স্কলারশিপ পেয়েছি, তাতেই আমার চলবে।"

"আর্থিক সাহায্য পাওনি, তাই-বা কেমন করে বলব! হেড মাষ্টার মশায় নিজে তোমায় পড়াতেন। তোমাদের যখন যে বইয়ের দরকার, বাবুর লাইব্রেরী থেকে তখনই তা পেয়েছ। স্কুল-পাঠ্য পুস্তক কিছু লাইব্রেরীতে থাকে না, তবু তোমরা দুজনেই তা পেয়েছ। এখন ত সবাই বুঝতে পারবে যে, কেন ওখানে তোমার এত প্রতিপত্তি! না, না, কার্ত্তিক, তুমি ইংরিজি পড়ার আশা ছেড়ে দাও।"

"আমি না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু

সর্ব্ব দাদাকে তাহলে গাছে চড়িয়ে মৈ কেড়ে নেওয়া হবে!"

"তার উপায় আমি কি করব? সর্ব্বানন্দকে বল, সে নিজে গিয়ে বাবুকে বলে-কয়ে যা হয় করুক। আমরা আর তার কোন সাহায্য করতে পারব না।"

"বাবা, আপনি ব্যস্ত হচ্চেন, কেন? আমাদের কার্য্যোদ্ধার নিয়ে কথা! আমি নিজে বিবাহ না করলে ত আর তাঁরা জোর করে আমার বিয়ে দিতে পারবেন না।"

"কি! তুমি আমায় এত নীচ মনে কর যে এতদিন এত উপকার নিয়ে আজ ঐ রকম মিথ্যাচারের দ্বারা তাঁর প্রত্যুপকার করব? এতদিন অজ্ঞানে যা করেছি, করেছি, আর তা কিছুতেই পারব না। তুমি আর পড়তে পাবে না, আমার পৈতৃক যা আছে, তাই নিয়ে তোমায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

"বাবা, আপনি এ রকম ব্যস্ত হলে আপনার পৈতৃক সম্পত্তিই বা রাখবেন কি করে?"

"না পারি, ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করলে কেউ দোষ দিতে পারবে না। তবু এ কথা ত কেউ বলতে পারবে না যে, হরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের সন্তান পুত্র বিক্রয় করেছে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাবা, আপনার যাতে কোনরকম অসম্মান হয়, তা করতে দেব না। কিন্তু বিপদকে আগে থেকে ডেকে আনা কোনরকমেই উচিত হবে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্ব-দাদার যদি কোন উপকার করতে পারি, করব কি?"

"আমাদের উঁচু মাথা নীচু না করে যদি পার, তাহলে কর। কিন্তু সাবধান, কালিকাবাবুর মত উদার-হৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে কোনরকম চালাকি করতে পাবে না। সব কথা স্পষ্ট বলার পরও তিনি যদি তোমার আর সর্ব্বানন্দর উপকার করতে রাজি হন, তাহলে তা তুমি করতে পার।"

"বেশ, সেই কথাই স্থির।"

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া সর্ব্বানন্দকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। সর্ব্বানন্দ ম্লান মুখে বলিল, "কাজ কি ভাই, আমার ইংরিজি পড়ায়? ইংরিজি পড়ে বড় জোর কেরাণী হব। গরিব ব্রাহ্মণের ছেলের ভাগ্যে সেই দাস্য বৃত্তি ছাড়া যখন আর কিছুই জুটবে না, তখন যা দু'দশ বিঘে জমি শিষ্যসেবক আছে, তাই নিয়ে দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটানো মন্দ কি!"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি যদি এম্, এ পাশ করতে পার, তাহলে প্রোফেসর হতে পারবে, অন্য কোনরকম বড় কাজও মিলতে পারে। সেই জন্যেই বলছি, তুমি এ সুবিধা ছেড়ো না। চল, গিয়ে বাবুকে সব কথা বলি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এতদিন তোমার স্কন্ধে ভর করে চালিয়েছি, আর আমার তা ইচ্ছে নয়।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমায় সে কথা আর বলতে পারব না, কার্ত্তিক। আমায় ক্ষমা কর ভাই, আমায় ছেড়ে দাও। আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হোক।"

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ সর্ব্বানন্দর মুখের

পানে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বানন্দ সহসা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, মানুষকে বেশী ভালবাসতে নেই, বেশী বিশ্বাসও করতে নেই। আমি তোমার কাছে একটা কথা এতদিন গোপন করেছি বলে লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি তোমার অকৃতজ্ঞ বন্ধুকে ত্যাগ কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমায় সব কথা খুলে বল্‌তেই হবে। কি হয়েছে বল,—হয়তো আমা হতে তোমার উপকার হতে পারে।"

"তা জানি, তুমি তা পার বলেই তোমায় তা বলব না। তোমার দ্বারা এ উপকার আমি নেব না।"

"নিতেই হবে, বল, নইলে জান আমাকে?"

সর্ব্বানন্দ কাতর হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই আমায় এত ভাল বাসিস নে, আমি তোর এতখানি ভালবাসার মোটেই উপযুক্ত নই।"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি ভালবাসার উপযুক্ত কি না, সে বিচার আমি করব। এখন তুমি যে আমায় ভালবাস, তার পরিচয় দাও। বল, কি হয়েছে?"

সর্ব্বানন্দ ছল ছল নেত্রে বলিল, "আমায় যদি মেরে ফেলতে পারিস, তা হলে বলতে পারি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তাহলে বলবে না?"

"কিছুতেই না।"

কার্ত্তিক কহিল, "সর্ব্ব-দা, তাহলে বলে রাখছি, আর তুমি আমায় দেখতে পাবে

কার্ত্তিকচন্দ্র চলিয়া যায় দেখিয়া সর্ব্বানন্দ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, আমায় দয়া কর। তুমি মুখ ফিরিয়ো না। তুমি যদি মুখ ফেরাও, তা হলে ভগবান মুখ ফিরুবেন। দয়া কর ভাই!"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি কৈ আমায় দয়া করলে? তুমি যে দয়া আমায় করতে পার না, আমিও তোমায় সে দয়া করতে পারি না।"

সর্ব্বানন্দ সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, শোন, যদি তোমায় এ কথা বলি, তা হলে এই মুহূর্ত্তে তুমি সে কাজ করতে যাবে। অথচ তাতে ফল হবে এই যে তোমাদেরও ক্ষতি হবে—আর আমার? ন্যাংটার আবার গাঁটকাটার ভয়? আমি যে সর্ব্ব সেই সর্ব্বই থাকব।"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে। হয় সব কথা খুলে আমায় বল, নয় আমার আশা ত্যাগ কর।"

সর্ব্বানন্দ তখন নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কার্ত্তিককে বলিল, "ঐ দরজাটা তাহলে বন্ধ করে দাও।" দরজা বন্ধ করিয়া দুই বন্ধুতে যে কথা হইল, তাহাতে কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে বলিল, "যাই হোক, আমিও যা তুমিও তাই। আমি গরীবের ছেলে, তুমিও গরীবের ছেলে। কালিকাবাবু আমাকে যদি মেয়ে দিতে উদ্যত হয়ে থাকেন, তোমাকেই বা তিনি না দিতে পারবেন কেন?"

বাসেন, তা তুমি জান না, তাই এ কথা বলছ। তার উপর শৈল?"

"শৈল ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও। যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকেই ওর ভালবাসতে হবে। ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়।"

"কি ভয়ঙ্কর! যার বিয়ে হবে, তার কথাই ধর্ত্তব্য নয়! শৈল আর ছেলে মানুষটি নেই। এখন ওর মুখ-চোখ দিয়ে ওর মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তুমি অন্ধ, তাই কিছু দেখতে পাওনি। আমি আজ কতদিন লক্ষ্য করে আসছি, তোমাকে দেখলে ওর সমস্ত মুখখানির ওপর দিয়ে—"

কার্ত্তিক বাধা দিয়া কহিল, "থাম, থাম, তুমিও কি মণিশঙ্কর হয়ে উঠলে না কি? কি বল তার ঠিক নেই! আমার মত হোঁৎকারামকে যদি, তুমি সামনে থাকতেও, শৈল পছন্দ করে থাকে, তাহলে ওর ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি আছে। যাক, তোমার আমার মধ্যে মেঘ কেটে গেল! এই সামান্য কথা তুমি যখন আমায় বলছিলে না, তখন বুঝছি তোমার যথেষ্ট পাপ সঞ্চয় হয়েছে। সেই পাপের শাস্তির জন্য তোমাকে আমার সঙ্গে কলকাতায়, কিম্বা যেখানেই যাই পড়তে যেতে হবে। আর তোমার সঙ্গে যেমন করে পারি, শৈলজার বিয়ে আমি দেওয়াব। এতে যত চালাকি খাটাতে হয়, খাটাব।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কি! তুমি নিজের নাম করে টাকা নিয়ে আমার পড়ার সাহায্য করবে? আর মনে করেছ, সেই টাকা আমি নেব?"

কার্ত্তিক কহিল, "আরে থাম না, তুমি বাবুকে একটুও চেন নি। আমি না চাইলেও তিনি তোমায় সাহায্য করবেন। এখনও ত কোন কথা হয়নি। সবই যখন উড়ো-ভাসার ওপর চলছে, তখন তাই চলুক না!"

"না, আর তা হতে পারে না। তুমি না চাইলেও তোমারই জন্য তিনি আমায় সাহায্য করবেন।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেখ সর্ব্ব-দা, বাবুর এত-খানি অপমান করো না, বলছি, তাহলে তোমার পাপ হবে। বাবু এতদিন আমার জন্য তোমায় সাহায্য করেন নি, এ তোমায় বলে রাখছি। তার প্রমাণ চাও, আজ আমার সঙ্গে যেয়ো, দেখতে পাবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা যদি প্রমাণ করতে পার, তা হলে তোমার সঙ্গে যেখানে যেতে বল, রাজি আছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "যেতে রাজি না হলেই ব তোমায় ছাড়ত কে? আমি যা মতলব করেছি, তার জন্য তোমায় সরিয়ে দিতুমই। আমি আজ পাঁচ মাস আগে দেওয়ানজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তাঁর মণির জন্য পথ খোলসা করে দেব, সে কথা ত তোমার মনে আছে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ছি ছি কার্ত্তিক, শৈলর সঙ্গে ঐ জানোয়ারটার নাম এক সঙ্গে করতে তোমার বাধে না?"

কার্ত্তিক কহিল, "আচ্ছা সর্ব্ব-দা, জিজ্ঞাসা করি, মানুষ ত মানুষই! আত্মায় ত সবাই এক! তাহলে একজনের নাম করলেই বা তোমাদের মুখে জল আসে কেন, আর একজনের নামেই বা খড়্গহস্ত হয়ে ওঠ কেন? মানুষ মানুষই, অবস্থা

শিক্ষা ইত্যাদির গুণে নানা রকম হয়। কে জানে? কে জোর করে বলতে পারে যে আমরাই খুব উঁচু জীব, আর মণিশঙ্কর খুব নীচু! শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী তাঁর নিজের ত্রিশ হাজার আর তাঁর বাপের দেড় লাখ টাকার সম্পত্তির দরুণই বা এত প্রার্থনীয় বস্তু হয়ে উঠলেন কেন? আর সর্ব্বানন্দ শর্ম্মার চল্লিশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর মাত্র সম্বল হওয়াতে তিনিই বা এত হেয় হলেন কেন? সমস্ত জগতের উপর যদি কারও আধিপত্য থাকে ত সেই রাজরাজেশ্বরের অফুরন্ত ধন-দৌলতের কাছে তোমার মাসিক পাঁচ টাকাই বা কি, আর মহারাজাধিরাজের লাখ লাখ টাকাই বা কি! One divided by infinityও যা, আর one million divided by infinityও তাই।"

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের যুক্তি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে হাসিতে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল, "ঐ হাসিটেই হচ্ছে একমাত্র দামী জিনিষ। সংসারের দু'এক টুকরো মাটি, কাঠ, জল-বাতাসের জন্য কামড়া-কামড়ি দেখে যে হাসতে পারে, সেই ঠিক বস্তু লাভ করেছে। অন্য সবাই গড্ডলিকা-প্রবাহের দলে পড়ে ভেসে যাক, আর আমরা দুজনে কেবল হাসি এস।"

১২

সন্ধ্যার সময় লাইব্রেরীর সম্মুখস্থ উদ্যানে একটা বেদীর উপর বসিয়া কালিকাবাবু তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি আগেই সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু দুপুর বেলায় তোমরা আসনি কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবার সঙ্গে একটা পরামর্শে আমরা ব্যস্ত ছিলুম, তাই আসতে পারি নি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমারও যে একটা কথা আছে—তিনি এখনও আসছেন না কেন? ওরে রামচরণ, বিষণকে ডাক্ ত।"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবা আসবার আগে আমাদের দুটো কথা আছে—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাই না কি? বসো, বসো, ঐ বেঞ্চে বসো।"

কার্ত্তিক আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার কথা এই যে আমার কলেজে পড়তে যাওয়ায় একটু গোলমাল উপস্থিত হয়েছে। কি গোলমাল, বাবা তা নিজে বলবেন। সেই গোলমালের দরুণ হয়তো আমার ইংরিজি পড়া আর নাও হতে পারে। কিন্তু—সর্ব্ব-দা তাহ'লে কি করবে?"

কালিকাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছ, তবু তোমার পড়ার গোলমাল হবে? আশ্চর্য্য! তোমার বাবাকে আবার নতুন করে সেই সব পুরোনো কথা বোঝাতে হবে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "কোন একটা নতুন কারণ ঘটায় তিনি আমাকে আর ইংরিজি পড়াতে অনিচ্ছুক। কি কারণ, তিনিই তা বলবেন। এখন সর্ব্ব-দার কি হবে, তাই জানতে চাচ্ছি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "ওর যদি সে

রকম কোন কারণ না ঘটে থাকে, তাহলে ওর পড়াশোনায় কোন রকম বাধা ত দেখতে পাচ্ছি না। এতদিন ওর খরচ দিতে যদি এ এষ্টেটের না আটকে থাকে, তাহলে এখনও আটকাবে না। তোমার বাপ যদি তোমার মঙ্গল না চান, তা বলে সর্ব্বানন্দ কেন নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে? সর্ব্বানন্দ, তুমি কি বলতে চাও?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আজ্ঞে, আমার আর কিছুই বক্তব্য নেই, তবে কার্ত্তিক জোর করে আমায় ইংরিজি পড়া ধরিয়েছে। এখন ওই যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে আমারই বা এত প্রয়োজন কি! আমি যে বরাবর সমস্ত একজামিনই পাশ করতে পারব, তারও কিছু ঠিক নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাই বলে কেউ চুপ করে থাকতে পারে না। যখন তোমার এতখানি সুবিধে করে দিতে আমরা সম্মত হচ্ছি, তখন তুমিই বা সে সুবিধে ছেড়ে দেবে কেন? হয়ত যদি ভাল করে বরাবর পাশ করে যেতে পার, তাহলে পরে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে কোন ভাল পোষ্ট পাওয়াও তোমার পক্ষে কঠিন না হতে পারে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু কার্ত্তিক যদি যেতে না চায়—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাপু, অতখানি সেন্টিমেণ্টাল হলে সংসার চলে না। আমি মানলাম, তোমাদের দুটিতে খুব ভাব। তাই বলে একজন যদি নিজের ভাল-মন্দ না বোঝে, তাই বলে যে অপরকেও বিবেচনা-শক্তি ত্যাগ করতে হবে, এর কোন অর্থ নেই। তোমার যদি আর কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে প্রস্তুত হওগে। তোমার যা কিছু খরচ-পত্র হবে, আমি তা বহন করব। কার্ত্তিক, তোমার আর কিছু বলবার আছে?"

কার্ত্তিক কহিল, "আর যা আছে, তা বাবাই বলবেন। তবে আমার কিন্তু সর্ব্ব-দার সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। আপনি বাবাকে বুঝিয়ে যদি রাজি করাতে পারেন, তাহলে আমিও যাব।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাবা কার্ত্তিক, তোমার কিসে ভাল হবে, সে কি আমি বুঝিনে? তুমি জান না—"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। আপনার দয়া যদি আমি এ জীবনে ভুলি, তাহলে আমার সমস্ত জীবনই একটা অভিশাপ বলে জ্ঞান করব। যেন চিরদিন আপনার আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত থাকতে পারি, আমায় এই আশীর্ব্বাদ করবেন।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আমার ভাল-বাসাটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়, পরে জানতে পারবে। এখন যাও, তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাওগে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমরা গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিলেন। কালিকাবাবু জ্যোৎস্না-বিধৌত একটী কামিনী বৃক্ষের দিকে চাহিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া ন্যায়-

রত্ন মহাশয় বলিলেন, "আপনি আমায় ডেকেছিলেন ?"

কালিকাবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, "এই যে আপনি এসেছেন। আজ এত দেরী হল যে ?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কাৰ্ত্তিক আমাকে বলেছিল, আজ একটু পরে যাবেন, আমার একটা কথা আছে, বাবুর সঙ্গে ; তাই সে চলে গেলে, আসছি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আপনি না কি কাৰ্ত্তিককে আর পড়াশুনা করতে দেবেন না ?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "পড়াশুনা করতে দেব না, এ কথা বলিনি ; তবে অন্য কোথাও গিয়ে ওর পড়াশুনার আর প্রয়োজন নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কেন, এ-রকম ইচ্ছা হল ?"

শিবচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন ; তারপর পদতলস্থ চটী জুতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আজ এমন একটা কথা শুনেছি, যাতে আপনার দয়ার ওপর নির্ভর করে তাকে বিদেশে বিদ্যার্জ্জনের জন্য পাঠাতে আমার ইচ্ছা চলে গিয়েছে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কি কথা আর কার কাছেই বা তা শুনলেন, শুনি।"

শিবচন্দ্র কহিলেন. "কথাটা শুনেছি, কাৰ্ত্তিকের কাছে, তবে সে কার কাছে শুনেছে, সে কথা বলতে পারব না। কারণ তাতে সে ব্যক্তির হয়ত অনিষ্ট হতে পারে। তবে কি কথা, তা যদি শুনতে চান ত বলতে পারি। কিন্তু পরের মুখে শোনা কথা, আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "সঙ্কোচ বোধ হয় ত' বলে কাজ নেই, কিন্তু আমার বক্তব্য যা আছে, তা বলে নি। কাৰ্ত্তিকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি যতখানি চিন্তিত, আমাকেও ততখানি জানবেন।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে, সে কথা অবিশ্বাস করবার তাহলে আর কিছুমাত্র কারণ নেই। আপনি যে কাৰ্ত্তিককে নিজের সন্তানের মত দেখেন এ কথা আপনার অতি-বড় শত্রুতেও বলবে। কিন্তু যদি বুঝতে পারি যে একমাত্র স্নেহ হতেই আমি যে কথা শুনেছি, সেই কথা উঠেছে, তাহলে সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে কালই আমি কাৰ্ত্তিককে কলেজে পড়তে পাঠিয়ে দেব।"

কালিকাবাবু ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "আর যদি এই অতিস্নেহের অন্য কোন গূঢ় কারণ থাকে, তাহলে আপনি ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন ? আপনার ছেলেকে যদি কেউ একটু বেশী ভালবাসে, —তা সে ভালবাসা যে কারণেই হোক —সেটা আপনার কাছে মস্ত অপরাধ বলে গণ্য হবে ?"

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি যদি এতখানি ক্ষুণ্ণ হন, তাহলে এবিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করতে বাধ্য হব, কারণ আপনার দয়ার উপর, স্নেহের উপর, নির্ভর করেই আমাদের এখানে বাস করা। আপনি দুঃখিত হলে আমাদের—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। ক্ষুণ্ণই হই, আর রাগই করি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লোপ করে

আপনার মত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করব, এতখানি নীচ আমি নই। তবে কার্ত্তিককে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, ন্যায়রত্ন মশায়। বহুদিনের একটা আশা তিলে তিলে সঞ্চিত হয়ে এখন পর্ব্বতাকার ধারণ করেছে। এখন যদি আপনি নিষ্ঠুরের মত সে আশাকে ধূলিসাৎ করেন তাহলে সে দুঃখ রাখবার আমার আর স্থান থাকবে না। ন্যায়রত্ন মশায়, এত দিন এ কথা প্রকাশ করে বলিনি, তার কারণ, কি জানি, যদি এ সংবাদ শুনে কার্ত্তিকের কোন অনিষ্ট হয় বা আপনি প্রথমেই তাতে বাধা দেন, আপনার মধ্যে যে একটা ব্রাহ্মণোচিত গর্ব্বিত ভাব আছে, তার প্রমাণ আমি বহুদিন পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম, সেইজন্যই সাহস করে এ বিষয়ে কোন কথা বলতে পারি নি। আমার চিরকালের ইচ্ছা যে যদি কার্ত্তিককে নাও পাই, তবুও তাকে বড় হতে মহৎ হতে আমি সাহায্য করব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার যে আশা ছিল, সেটাও তত বড় হয়ে উঠে এখন আমার সমস্ত কায়মনোবাক্যের একমাত্র চেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি আমার সে বাসনা পূর্ণ না করেন, তাহলে—"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কি বাসনা, স্পষ্ট খুলে বলুন! কার্ত্তিককে আপনার কি প্রয়োজন!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "এ জীবনের শেষ বাসনা পূর্ণ করব, আমার শৈলজাকে তার হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্তহব। ন্যায়রত্ন মশায়, আমায় আপনি দয়া করুন, এ ইচ্ছায়

করে বলছি যে কার্ত্তিককে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন করে দিয়ে, শৈলজা আর তার মধ্যে যেন কোনরকম অসাম্য না থাকে, তাই করে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ হবে।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "বুঝতে পারলাম না, শৈলজার যাই করুন, তবু সে আপনার কন্যাই থাকবে, আর কার্ত্তিকের যাই করুন, তবু সে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলেই থাকবে। তাকে যদি আপনার সমস্ত সম্পত্তির উপর বসিয়ে দেন, তবু সে জানবে যে সে সমস্তই তার পাওয়া জিনিষ, এবং সে পরের গচ্ছিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক মাত্র। যেমনই করুন, আপনার শৈলজার সঙ্গে আমার পুত্রের যে আন্তরিক প্রভেদ, চিরদিন তা থেকেই যাবে। এমন স্থলে বিবাহ দিলে বিবাহের যা ফল তা মিলবে কি না সন্দেহ। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি সাহসে এক ভিখারীর সন্তানের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে সাহস করছেন? আমার কি সাধ্য যে আপনার মত ধনী ব্যক্তির সঙ্গে সমানভাবে কুটুম্বিতা রক্ষা করে চলি!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "একমাত্র টাকাতেই যে মানুষ বড় হয়, এ কথা আপনার মুখে শুনে আশ্চর্য্য হচ্চি। আপনাকে যদি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ না মনে করব, তাহলে আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের জন্য এত ব্যস্ত হব কেন? আমার শৈলজার ত' সম্বন্ধের অভাব ছিল না, বড় বড় লোকের বাড়ী থেকেও সম্বন্ধ এসেছে, আর আমি

সন্তানকে এনে ঘরজামাই করে রাখতে পারি। ও দুটোর একটা ইচ্ছেও আমার নেই। আমি চাই ব্রাহ্মণের সন্তান, আমি চাই যার আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে, সেইরকম মানুষ, পুরোপুরি মানুষ। কলের পুতুল বা খেঁকী কুকুরের যদি দরকার হত তাহলে তা এত দুর্লভ হত না। আপনার পুত্র বলেই কার্ত্তিক দুর্লভ, আপনার পুত্র বলেই কার্ত্তিকের মানুষ হবার আশা আছে, তাই ওকে এমন করে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হচ্চে।”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “কিন্তু সকলেই ত’ বলবে যে আমি পুত্র বিক্রয় করেছি। যতই কেন আপনি করুন না, লোক-নিন্দার মুখ থেকে আমার নিস্তার নেই। এমন অবস্থায় কি করে আমি এ বিষয়ে সম্মতি দেব?”

কালিকাবাবু কহিলেন, “সামান্য একটু লোক-নিন্দার ভয়ে আপনি এক নিরীহ ব্রাহ্মণ-কন্যার সৎপাত্রলাভে বাধা দেবেন? ভুলে যান যে সে ধনীর সন্তান; মনে করুন, সে কেবল এক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ-কন্যা। মনে করুন, তার বাপ আপনার হাত চেপে ধরে বলছে, “মশায়, আমার কুল রক্ষা করুন, আমার কন্যার বিনিময়ে আপনার পুত্রটীকে দান করুন।” তারপর বলুন, আপনি কি করবেন? এর পরও যদি আপনি চান যে আমি সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলি, আপনার কাছ থেকে জোড়-হাতে এই কার্ত্তিককে আমি ভিক্ষা করে নিয়েছি, তাতেও আমি প্রস্তুত!”

শিবচন্দ্র স্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এতখানি বিনয়ের সম্মুখে তাঁহার সমস্ত গর্ব্ব ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তিনি অন্য কিছু করিতে না পারিয়া নত নেত্রে হস্তের তলদেশ খুঁটিতে লাগিলেন। কালিকাবাবু সহসা নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “বন্ধু, আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, বলুন, আমায় কি করতে হবে, কি করলে আপনার মন পাব?”

শিবচন্দ্রের মস্তক হইতে তর্ক-যুক্তি, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তাদি সমস্তই এক নিমেষে উড়িয়া গেল। তাঁহার যত গর্ব্ব যত অহঙ্কার যত ব্রাহ্মণত্ব ছিল, সমস্তই বাসাংসি জীর্ণানির ন্যায় খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি দেখিলেন, কালিকাবাবুও মানুষ, তিনিও মানুষ—উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “কালিকাবাবু, আপনারই জয়! আমি আর তর্ক করব না। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। কিন্তু এ সংবাদ উভয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাক্। এখন কর্ণান্তর করার প্রয়োজন নেই।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “বৈবাহিক, আপনাকে নমস্কার! এই সন্ধ্যার আকাশের নীচে বসে ঐ চন্দ্র আর তারাদের সাক্ষ্য রেখে আমাদের কথাবার্ত্তা স্থির করে নিলাম। আপনার কার্ত্তিককে যখন উপযুক্ত বিবেচনা করবেন, তখনই অনুমতি দেবেন, আমি বিবাহের উদ্যোগ করব। কিন্তু মনে থাকে যেন, আমার কন্যা বাগ্‌দত্তা হয়ে রৈল, এর এখন অন্য পাত্রে সম্প্রদান অসম্ভব।”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

শিবচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার কলেজে পড়তে যাওয়াই সাব্যস্ত হল।"

কার্ত্তিকচন্দ্র মনে মনে হাসিল; প্রকাশ্যে বলিল, "তাহলে একটা ভাল দিন দেখে দিন, আমি গিয়ে মাকে খবর দি।"

যাত্রার দিন সর্ব্বানন্দকে কিন্তু অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে লুকাইয়া বেড়াইতে দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সে হচ্ছে না, সর্ব্ব দা, সিন্নি খেতে এগিয়ে এখন কোঁৎকা দেখে পেছুলে চলবে না। আমি যা মনে করেছি, তা করবই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "নিজের বুদ্ধিকে বা ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দেখা তোমার ক্রমশঃ একটা রোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাবধান, হয়ত এই কারণেই তোমার সমস্ত মহত্ত্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "সে ভয় নেই, কারণ শেষ পর্য্যন্ত তুমি আছ। নিতান্তই যদি পড়ি, তুমি আমায় টেনে তুলবে। কিন্তু তুমি যে মনে করেছ, আমার plan of operationএ বাধা দেবে, তা হচ্ছে না। আমি সমস্ত কাজের ভার নিজের উপর নিয়েছি, কারও মুখাপেক্ষী হয়ে কাজ করব, তেমন লোক আমি নই। এ বিয়ে আমি দেওয়াবই, তাতে যা হয় হবে। তুমি আমার ওপর নির্ভর কর।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার কাছেও যেমন "সর্ব্বমাত্মবশং সুখং", আর কারও কাছে যে তা নয়, তা তুমি কেন মনে করছ? আমিও প্রতিজ্ঞা করছি যে যদি বুঝি, শৈলজা আমায় চায় না, তাহলে স্বয়ং ভগবান এলেও এ বিয়েতে কেউ আমায় সম্মত করাতে পারবে না।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি পারব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কেন?"

"কারণ! কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিথ্যে কথা! এর কারণ আমি বলব,—শুনবে? এর কারণ, তুমি নিজেকে সব-চাইতে ভালবাস। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথার বিরুদ্ধে কিছু হবে, এ তোমার সহ্য হয় না! আমার সঙ্গে শৈলর বিয়ে দিতে যখন তোমার ইচ্ছে হয়েছে, তখন সে ইচ্ছার সুমুখে তুমি আর কারও ইচ্ছেকে দাঁড়াতে দিতে চাও না! তোমার সূক্ষ্ম অথচ প্রচণ্ড গর্ব্বই তোমার সব। সাবধান কার্ত্তিক, পতনের এই হল প্রথম সোপান।"

কার্ত্তিক কহিল, "এঃ, সমস্ত সৎকার্য্যই দেখছি বিরোধের মধ্য দিয়েই ঘটে থাকে। আমার জীবনের প্রথম সৎকাজের দেখছি প্রথম থেকে তুমিই বিরোধী হয়ে দাঁড়ালে। তা হওগে, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত যখন আমায় কোন কাজেই হারাতে পারনি, তখন এ কাজেও পারবে না—এ'ও বলে রাখলুম, দেখে নিয়ো।"

বৈকালে দুইখানি গো-শকট সজ্জিত হইয়া আসিল এবং সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক টোলের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জমিদার-গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সেখানে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুইজনে যেমন বাহিরে আসিবে,

অমনি দেখিল, লাইব্রেরীর দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষে শৈলজা দাঁড়াইয়া আছে। যুগপৎ উভয় বন্ধুর দৃষ্টিই শৈলজার উপর পতিত হওয়াতেই হউক বা যে কারণেই হউক শৈলজা গবাক্ষ হইতে সরিয়া গেল। কার্ত্তিকচন্দ্র তাড়াতাড়ি সর্ব্বানন্দর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "সকলেরই সঙ্গে দেখা করলুম, শৈল কেন বাকি থাকে! ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি, চল।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তুমি অতি পাষণ্ড!"

কার্ত্তিক বলিল, "যে আজ্ঞে, আপনি না যান, আমার ত যেতে বাধা নেই! আমি চল্‌লুম।"

সর্ব্বানন্দ কোন কথা না বলিয়া গো-শকটে গিয়া উঠিল। কার্ত্তিকচন্দ্র লম্ফে লম্ফে সোপান অতিক্রম করিয়া এক নিমেষে শৈলজার নিকটে গিয়া বলিল, "শৈল, আমরা যাচ্ছি। বোধ হয় দু'এক বছর আসতে পারব না। সবাই কত উপদেশ দিলে, তুমি কিছু বলবে না?"

শৈল ধীরে ধীরে তাহার পায়ের গোড়ায় একটা প্রণাম করিয়া একটু যেন ম্লান মুখে বলিল, "আমি আর কি বলব?"

কার্ত্তিক কহিল, "কিছু না? একটা কথাও বলবার নেই? সর্ব্ব-দাও আসতে পারবে কি না, ঠিক নেই, ওকেও কিছু বলবার নেই?"

শৈলজা লজ্জিত হইয়া বলিল, "ওঁকে আমার প্রণাম দিয়ো!"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি এই ক'বছরের মধ্যে বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছ, দেখছি। এত-দিনের জন্য আমরা যাচ্ছি, আর একটা কথাও আমাদের জন্য জুগিয়ে রাখনি? ছিঃ! যদি তোমার আপন ভাই এমনি করে দূরদেশে চলে যেত, তাহলে কি তুমি তাকে একটা কথাও বলতে না, শৈল?"

শৈল সহসা কাঁদিয়া ফেলিল এবং একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের পানে চাহিয়া ছুটিয়া সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল। কার্ত্তিক-চন্দ্র সে দৃষ্টির কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া অগত্যা হাসিতে হাসিতে আসিয়া সর্ব্বানন্দর অনুসরণ করিল।

(ক্রমশ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

"ফাল্গুনী"

ফাল্গুনে যখন প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য-পটের পরিবর্ত্তন হয়, তখন জীবনের অনেকখানি রহস্য চোখের সম্মুখে ধরা পড়ে। সুষুপ্তির মধ্যে জাগরণের, ভ্রান্তির মধ্যে সত্যের, বিলয়ের মধ্যে প্রাণের লীলার আভাস পাওয়া যায়। যা একটা বিভীষিকার মত কুয়াসা ও অন্ধকারের পক্ষ বিস্তার করে' জগৎকে ঢেকে ফেলে, সে যে কেবল প্রাণের শক্তিকেই নূতন করে' জাগিয়ে তুলতে

আসে,—এই সত্যই ফাল্গুনের নবপল্লবদলে আর রঙিন আকাশে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রাণকে জাগাতে হলে' আগে ঘুম পাড়াতে হয়, তাই শীত আসে তার লেপ আর কাঁথা নিয়ে, তার ঠাণ্ডা নিশ্বাস নিয়ে, আর সাতসাগরের কথা নিয়ে।

আমরা যে বার-বার ঘুমিয়ে পড়ি, সে ঘুমিয়ে-পড়ার মধ্যে জাগরণের সুরটিই কেবল বাজে। জাগরণকে নতুন করে' আন্‌বার জন্য, সত্য করে' জানবার জন্যই ঘুমের আয়োজন। ঘুমের যে নিশ্চেষ্ট ভাব, সে কেবল জাগরণকে উন্মত করবার জন্য, প্রাণের চেষ্টাকে প্রবুদ্ধ রাখবার জন্য।

আর এই আনন্দই সব-চেয়ে বড় আনন্দ—এ ঘুমিয়ে-থাকার আনন্দ নয়, এ কেবল জেগে-থাকার আনন্দও নয়। এ আনন্দ জেগে উঠ্‌ব বলে'ই ঘুমিয়ে পড়ার আনন্দ, ঘুমের মধ্যে জাগরণের আনন্দ, ঘুম থেকে নতুন করে' জেগে ওঠার আনন্দ। এ খেলার আনন্দ, কারণ এ প্রাচীন হয়ে নবীনতার মধ্যে ফেরবার আনন্দ। ফুলের কুঁড়িটা যদি চিরকাল ফুলের কুঁড়িই থাকত, তাহলে তার ভরা যৌবন জগতের মধ্যে সব-চেয়ে প্রাচীন জিনিষ হ'ত। সে জগতের কৃপার পাত্র হ'ত, কারণ সে এক বিপুল আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকত।

সে হাওয়ার আনন্দ। পথ-চলার আনন্দ। নিজেকে হারিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে পাওয়ার আনন্দ, নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে লওয়ার আনন্দ, নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে চলার আনন্দ। এ খেলার আনন্দ, কারণ এ নতুন হওয়ার আনন্দ। এ নবযৌবনের আনন্দ।

পরমেশ্বর মানুষকে বড় আনন্দের অধিকারী করেছেন। তিনি তাকে চির জীবন দিয়ে অভিশাপগ্রস্ত করেননি, তিনি তাকে চির যৌবন দিয়ে প্রাচীন করে রাখেননি। চিরযৌবনের ঐশ্বর্য্য অসীম অতল ক্ষীর সমুদ্রের মতন হ'ত,—যাতে হাবুডুবু খাওয়া যায়, কিন্তু দাঁড়ানো যায় না। যে সুরটি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অধিক বাজে, যেটি না থাকলে ঐশ্বর্য্যের মূল্য থাকত না, সেটি অভাবের সুর। আমরা অভাবের উপর দাঁড়িয়েই ঐশ্বর্য্যকে উপভোগ করি, দুঃখ থেকেই সুখকে পাই, বিরহের মধ্যে ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখি।

আসা-যাওয়ার মধ্যেই জীবনের প্রধান আনন্দ,—এই যে আসি বলে' চলে যাওয়া, এই যে নতুন করে' আসা, এরই মধ্যে জীবনের গৌরব রয়েছে, যৌবনের আনন্দ রয়েছে। প্রাণের ধর্ম্ম—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়া। যে নদী নিঃশেষে আপনাকে ঢেলে দিয়ে চলেছে, পাতায় পাতায় সে সবুজ হয়ে উঠ্‌ছে, ফুলে ফুলে সে সৌরভ হয়ে খেল্‌ছে, মেঘে মেঘে তার সুরটা জমাট হয়ে ভাসছে। এমন করে' সে আপনাকে নিঃশেষ করে' দিয়ে গিয়েছে কিন্তু তার চলা ত ফুরায়নি। সে কেবল তার গভীর চলা গোপনে রেখে চলেছে, সে জগতের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে চলেছে, সে তার পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলে দিয়ে চলেছে, কিন্তু তবু তার গতি হারায়নি।

নদী ত রয়েছে। সেই নদীই ত রয়েছে, যে তার পাষাণকারা ভেদ করে' বেরিয়ে এসেছিল হাজার হাজার বৎসর আগে, প্রাণের সাড়া পেয়ে ছুটে চলেছিল দুকূল প্লাবিত করে' দুধারের দেশ জাগিয়ে, নিজের আনন্দের মধ্যে সমস্ত বিশ্বকে বরণ করে'।

প্রাণ আমাদের মধ্যে রয়েছে, তবু তাকে বার বার খুঁজে নিতে হবে। এই ত প্রাণের সর্দ্দারি করা। তাকে কাজের মধ্যে খুঁজতে হবে, বিপদের মধ্যে খুঁজতে হবে, মৃত্যুর মধ্যে খুঁজতে হবে। প্রাণ চায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জেগে উঠতে। সে-ই বার-বার প্রথম। এই আরম্ভের সুরই তার সুর। সে-ই বার বার বিদায় নিয়ে যায় মিলনের আনন্দে জাগবার জন্য। যে বুড়ো মানুষকে চিরদিন ক্ষেপিয়ে বেড়ায় সে এই চিরনবীন প্রাণ। সে আমাদেরই আড়াল করে' লুকিয়ে থাকে, চলার মাঝে ধরা দেয়। আমরা তাকে পাব কি,—সে-ই আমাদের পেয়ে বসেছে।

সেইজন্যই প্রাচীন হবার যো নেই। ভিতরের দৃষ্টি যখন একবার জাগে, তখন আর পথ-হারাবার ভয় থাকে না। দিনের আলোকে পথ দেখাবার জন্য প্রদীপের আলোর দরকার করে না। আমরা যদি একবার সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারি জীবনই আমাদের সর্দ্দার, যদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখের বাণী শুনতে পারি, তবে তার সমস্ত শক্তি,—যার অনবরত লীলা চল্‌ছে সবুজ পাতার মেলায়, তারার আলোর খেলায়, সাগরের জলের উচ্ছ্বাসে, সেই সমস্ত বিশ্বশক্তি আমার মধ্যে জেগে উঠবে। এ বড় আশ্চর্য্য যে এত-বড় জগৎ সে কেবল আমারই চাওয়ার অপেক্ষা করছে। সেই জন্যই ভয় নেই। ভয় কেবল নিজের মধ্যে। পাতাটি যদি মনে করে সে একা, সে-ই কেবল শুকিয়ে আসছে, তারই জীবন ফুরিয়ে আসছে, তার বোঁটাটি খসে আসছে, তাহলে সে মরে। সে-ই মরে, কেননা মরণের ভয় তারই। তার চারিধারে যে শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে আসে, সে তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের শক্তিকে বড় মনে করেছে। কিন্তু তার ভাণ্ডার অল্প, পুঁজি ছোট—সেইজন্য সে ভয়েই মরে।

কিন্তু এ জগতে হারিয়ে যাবার ভয় নেই—প্রাচীন হবার অবসর নেই। প্রত্যেক পাতাটি বিশ্বরাজের ছাপ নিয়ে আসে, সে হারায় না। জগতের আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ দিন এসেছে, তাদের প্রত্যেকটিতে পরমেশ্বরের শিলমোহর অঙ্কিত ছিল,—কেউ হারায়নি। কিন্তু সেই একই ফিরছে। সেই একই পাতা বারে বারে সবুজ হয়ে উঠছে, সেই একই দিন বারে বারে প্রভাত হয়ে ফিরছে, সেই একই ফুল বারে বারে রঙিন হয়ে ফুটছে। প্রাচীন জ্ঞান, প্রাচীন সত্য এমনি করে' নবীন হয়ে উঠেছে।

এইজন্যই জীবনকে একটা রহস্য, একটা খেলা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কারণ জীবনের পাত্র ক্রমাগত শূন্য হয়ে আসছে নতুন করে' অমৃতে ভরে উঠ্‌বার জন্যে। শেষই বার-বার প্রথম হয়ে

আসছে। মরণের আয়োজনেই জীবনের চেষ্টা। প্রাচীন হবার সব আয়োজনই হয়েছে। শ্বেত শ্মশ্রুরাজি শেষ-বয়সের পরিচয়-পত্র হয়েছে, শরীরটা ভগ্নশাখার মত মাটির দিকে ঝুলে পড়েছে, মহাপারাবারের মহাগানের মধ্যে পৃথিবীর কোলাহল ডুবে গেছে। কিন্তু এমনি সময়েই কে পিছু ডাকে, তখন হিসাব ভুলের বিষম ফেরে পড়ে যেতে হয়। এই যে দুরন্ত প্রাণ, আমারই উৎসাহে টলমল করছে। এই যে নবযৌবন—আমারই চেষ্টা, আমারই উত্তম, আমারই অধ্যবসায় নিয়ে জ্বলে উঠেছে। আমার প্রাণ যে এদের মধ্যেই সাড়া দিচ্ছে। এ কি?—আমিই কি যাব বলে' ফিরে এলুম না কি?

দৃষ্টি গভীর হলে এইটেই চোখে পড়ে। আকাশের একটা তারা যখন উঠে বলে—আমি আছি, তখন সে কথা হাজার হাজার তারার মুখে হাজারবার জ্বলে ওঠে। তখন তুমি আকাশেই তলিয়ে যাও, আর আঁধারেই মিলিয়ে যাও, আর অনন্তের পথেই ছুটে বেরিয়ে যাও, তোমার কথাটাই থাকবে, চিরকাল তারার মুখে জ্বলবে।

জীবনের মধ্যে সব-চেয়ে প্রাচীন বয়স যৌবনের অনতিপূর্ব্ব-কাল। এই সময়ে যা হারায় তা আর ফিরে আসে না। তখন দৃষ্টি থাকে যেটার উপর সেটা কেবল বড় হচ্ছে, নিজেকে হারাচ্ছে। সে চলছে কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায়, দেহের উত্তেজনায়। ভয় বেশি, ভরসা কম, কারণ জ্ঞান দুর্ব্বল। সেইজন্য নবযৌবন মৃত্যুকে যত ভয় করে এত আর কিছুতে নয়। সে তখনও নিজেকে কেবলি হারাচ্ছে। কালচক্রের যে দিকটা আঁধারের দিকে মাথা নীচু করেছে, সেই দিকটাই সে দেখতে পেয়েছে। যেদিক সোণার আলোর কিরীট পরে' জাগরণের শিখরে উঠে দাঁড়িয়েছে, সেদিকে তার দৃষ্টি জাগেনি। এই নবযৌবনকে মৃত্যুর ভয় থেকে বাঁচাতে গেলে তাকে সামনে অন্ধকারের দিকে, মৃত্যুর গহ্বরের দিকেই চালাতে হবে।

এইটেই হল প্রাণের সর্দ্দারিগিরি। যৌবনকে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। যে কাজে সব-চেয়ে ভয়, সব-চেয়ে বাধা, সেই কাজে তাকে নিযুক্ত করতে হবে। তার পায়ের তলায় পথ জেগে উঠবে, তার 'চরণ ঘায়ে পলে পলে মরণ মরবে।' কিন্তু মৃত্যুকে উপেক্ষা করলেই প্রাণ পাওয়া যায় না। প্রাণকে মৃত্যুর কোলে শিশুর মত জেগে উঠতে দেখবে যখন তখনই মৃত্যুর ভয় দূরে যাবে। যতক্ষণ বাহিরের দৃষ্টিই কেবল সজাগ থাকবে ততক্ষণ প্রাণকে সর্ব্বক্ষণ দেখা যাবে না। যখনই অবসাদ আসবে, ক্লান্তি আসবে, দিক যখন আঁধার করে' আসবে, পথ যখন খেয়াঘাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হবে, তখন সত্যসত্যই মনে হবে প্রাণ ফাঁকি দিল।

সেই আঁধারে মনের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। এই অনন্ত জগতের বিকাশ, যার মধ্যে ভয় নাই, বিচ্ছেদ নাই, মৃত্যু নাই, এই মনের প্রদীপকে তুলে ধরবে, আর এই নিখিল জীবনের অবিচ্ছিন্ন সুরটি তার মধ্যে আগুন হয়ে জ্বলবে।

তখন দেখা যাবে, যা-কিছু অন্ধকার

বলে মনে হ'ত, সে কেবল আলোর পথ হয়ে পড়েছিল। আজ সে পথ আলো-কে বুকে করে ধন্য হ'ল। যা প্রাণের ভয় হয়ে এসেছিল, তা আজ প্রাণের জয় গেয়ে চলে গেল। যাকে পিছনের দিক থেকে মৃত্যু বলে' মনে হয়েছিল, সে-ই সুন্দর হয়ে নিখিলের প্রাণ হয়ে আমাদের সর্দ্দার হয়ে ফিরে এল। যা ফুরিয়ে যায় তা একটা বড় পাওয়ার মধ্যে ফুরিয়ে যায়;—কাজ ফুরিয়ে যায় শান্তির মধ্যে, আশা ফুরিয়ে যায় বিশ্বাসের মধ্যে, দিনের আলো ফুরিয়ে যায় সন্ধ্যার সুষমার মধ্যে, নিশীথের গভীরতার মধ্যে, রজনীর সৃষ্টির মধ্যে।

এইজন্য শীতের বিদায়ের আয়োজন দেখলে হাসি পায়। সে তার জীর্ণ পাতার পুঁজি নিয়ে অতিপ্রাচীন গলিতনখদন্ত বৃদ্ধের মত চলেছে, তার ভাব দেখে যে হাসি পায়। সে যে নিতান্তই দুরন্ত প্রাণের খেলার সাথী। তার কি প্রাচীন হবার সময় আছে? তার ভিতরে ভিতরে যে নব-জীবনের চাঞ্চল্য হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে!

বিশ্ববিধাতা এ কথাটা অতি সহজ করে' বুঝিয়ে দিয়েছেন পিতামাতার জীবনের মধ্যে দিয়ে।

মৃত্যুর দিকটা সত্য হ'ত যদি আমি একা আমার মধ্যে বেঁচে থাকতুম। কিন্তু আমি যে সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে বেঁচে আছি। যদি আমার প্রাণটুকু আমারই হ'ত তবে বিশ্বের কোন্ আনন্দ আমার প্রাণে আস্‌ত? পাখীর গলার যে আনন্দ রোজ রোজ জেগে ওঠে, ফুলের যে আনন্দ সৌরভের মধ্যে ভরপুর হয়ে ওঠে, তাকে একবার আমার জীবনে আন্‌তে গেলে অনেক সাধনার দরকার হ'ত। যা পরের আনন্দ তাকে কি সহজে আমার মধ্যে পাওয়া যেত?

আমরা সুন্দর জিনিষ দেখে আনন্দ পাই। এ দেখা যদি কেবল চোখের দেখা হ'ত তা হলে সে শুধু দর্পণের ছায়ার মত মিলিয়ে যেত, প্রাণে দাগ পড়ত না। কিন্তু সে শুধু দেখা নয়, সে পাওয়া। যখন সুন্দরকে দেখি তখন নিজেকে সুন্দর করে ফিরে পাই,—সুন্দর শরীরের মধ্যে, সুন্দর জীবনের মধ্যে, সুন্দর পৃথিবীর মধ্যে। দেখার আনন্দ—সে কেবল বার-বার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেকে বড় করে', স্নেহের মধ্যে নিজেকে সুন্দর করে' সুখের মধ্যে নিজেকে অমর করে' ফিরিয়ে পাওয়া। তা না হলে আনন্দ এত সহজ হ'ত না।

এইজন্যই কবি জোর করে' বল্‌তে পারেন, যে আমরা মরব না। আমরা কি দেখছি না যে এই প্রাচীনতম কাল সেও নিজেকে অহরহ নবীন করে তুলছে প্রত্যেক প্রভাতের মধ্যে? আমরা কি দেখছি না যে এই প্রাচীন পৃথিবী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন হচ্ছে নবকিশলয়ের মধ্যে, ফুলের বিকাশের মধ্যে, পাখীর কলকণ্ঠের মধ্যে। আমরা কি বুঝছি না যে আমাদের প্রাচীন জ্ঞান প্রাচীন প্রাণ প্রাচীন শরীর প্রত্যেক মুহূর্ত্তে জেগে উঠ্‌ছে কচি মুখের হাল্‌কা হাসির মধ্যে, তরল চোখের সরল চাহনির মধ্যে, তরুণ জ্ঞানের নূতন বিকাশের মধ্যে।

চাঁদের হাসিটি যখন অমাবস্যার অন্ধকারে

লুকিয়ে পড়ে তখন আমরা তার অন্তর্দ্ধান থেকেই তার আবির্ভাবের আভাস পাই—সে যাওয়ার সুর আর আসার সুর এক করে' দিয়ে চলে যায়। প্রাচীনতা যখন মৃত্যুর অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ে, তখন সেও যে একদিন শিশু চন্দ্রের মত কচি ঠোঁটখানি আকাশের গায়ে হেলিয়ে দেবে না, তা কে বল্‌বে?

সেইজন্য প্রাণের ভয় নেই, সে মরণকে মানে না। সে মেঘের থেকে বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে ফুলের থেকে সৌরভ হয়ে দখিণ হাওয়ায় বেরিয়ে পড়ে, সে আঁধার থেকে বেরিয়ে পড়ে' আলোর মত ছড়িয়ে যায়। সে হারায় না। সে যেন নিত্য বলছে,—

আমরা মরব না,
আমরা অন্ধকারের বুকের আগুন
ঝড়ের কাছে হারব না।
দেখচো না কি তারায় তারায়,
আঁধার কেবল পথই হারায়,
আলোর রেখায় চল্‌ব মোরা
পথের হিসাব করব না।
দেখচো না কি ঝরা ফুলে,
ঘুমের বাতাস উঠছে দুলে,
গভীর ঘুমে জাগছে তারা,
আমরা কেন পারব না?
ফুরিয়ে গেলে হারিয়ে যাওয়া,
জাগবে কেবল ফিরিয়ে পাওয়া,
ফুরিয়ে গেলেও পথ যে বলে,
পা ছেড়ে তোর সরব না।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

বৈষয়িক সভ্যতা হইতে নৈতিক সভ্যতাকে পৃথক করা আবশ্যক। নৈতিক সভ্যতার বিভাগে, আমরা বিশেষ করিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উক্ত প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে, আমাদের দেখিতে হইবে কোন্‌টা পুরাতন ভারত-সমাজের নিজস্ব এবং কোন্‌টাই বা ইঙ্গ-ভারতীয় নূতন সমাজের নিজস্ব।

ধর্ম্ম

সকল দেশের ন্যায় ভারতেও, মুখ্যরূপে ধর্ম্মের দ্বারাই অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানাদি অপেক্ষা, নূতন রীতিনীতিই ধর্ম্মকে বিশেষরূপে আক্রমণ করে; সমাজের ক্রমবিকাশ ও বৈদেশিক প্রভাবের দ্বারা এই নূতন রীতি-নীতির সৃষ্টি হয়। তাই ভারতের সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা, রূপান্তরীকরণ ও যুঝাযুঝি পরিলক্ষিত হয়।

*
* *

প্রথমে শাসন-বিভাগের কার্য্যপ্রণালী।

তত্ত্বতঃ ইংরাজ-শাসিত রাষ্ট্র, সকল-ধর্ম্মের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ

দুই প্রকারে উহাদের অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এক পক্ষে,—নর-বলি, সতীদাহ, ইন্দ্রিয়-লালসামূলক বীভৎস পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি কতকগুলি নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিজনক অনুষ্ঠান রহিত করিতে হইয়াছে; পক্ষান্তরে কোম্পানী, প্রাচীন রাজবংশাবলীর অধিকার ও অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের ভার নিজ হস্তে লইয়া কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; মঠের, হিন্দুদেবালয়ের, মুসলমান মস্‌জিদের ধনসম্পত্তিসংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহ ও রক্ষণভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেশীয় লোকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, ১৮৬৩ অব্দের আইন, গভর্ণমেণ্টকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। যে কাজ গভর্ণমেণ্ট করিতে ছিলেন, সেই কাজের ভার—নির্ব্বাচিত, মনোনীত, বা বংশক্রমাগত ট্রষ্টীদিগের উপর অর্পিত হয়। তাছাড়া ঐ আইনের বলে ভক্তেরা বা উপাসকেরা ট্রষ্টিদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। এই বিষয়ে ভারতীয় আইন, ইংরাজি আইন হইতে খুবই কম তফাৎ। রাষ্ট্র ও ধর্ম্মসমাজের মধ্যে এই পার্থক্যটা অধুনা ভারতে যত কঠোরভাবে রক্ষিত হয় এমন আর কোথাও নহে।

১

প্রথমে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক, কেননা সমস্ত লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা তিনভাগের দুই ভাগ।

আমাদের আলোচনার নির্দ্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিবার জন্য আমরা প্রথমে যে সকল মত ও অনুষ্ঠান নিছক্ হিন্দু তাহারই প্রাধান্য দিব; তাহার পর আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের উপর য়ুরোপ কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; এবং বর্ণভেদ ও গোষ্ঠী সম্বন্ধীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের আদিষ্ট সামাজিক কর্ত্তব্য সকলের ব্যাখ্যা করিবারও সুবিধা হইবে। হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত মতবিশ্বাস, সমস্ত জীবনীশক্তি, সমস্ত সৌন্দর্য্য, হিন্দু সম্প্রদায়গুলির ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যায়; অতএব এই ইতিহাস আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ইতিহাসের অন্তর্ভূত সামাজিক অংশটাই একটা সভ্যতাবিধায়িনী শক্তি। লোক-ধর্ম্মের হিসাবে দেখিতে গেলে, আমাদের মনে হয়, হিন্দুধর্ম্ম শোচনীয় অবনতির অবস্থায় আসিয়াছে। অবশ্য উহার মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন মতামতের স্মৃতি ও ইস্‌লাম ও খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু উহা উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই অবনতির প্রধান কারণ—অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ-দিগের অবজ্ঞা। অন্যান্য ধর্ম্মে, আচার্য্য ও ভক্তের মধ্যে একটা ধারাবাহী সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে ধর্ম্ম মতগুলি কলুষিত না হয়, যাহাতে অনু-ষ্ঠানগুলি পৌত্তলিকতায় পরিণত না হয় তৎপ্রতি আচার্য্যদিগের দৃষ্টি থাকে; লোক-দিগের শ্রদ্ধাভক্তি, জ্বলন্ত উৎসাহ,—স্বকীয় জীবনে ধর্ম্মের বিশ্বাসগুলি ও পূজা অনুষ্ঠানাদি

বজায় রাখে। ভক্তিবিরহিত পুরোহিতেরা পূজা-অনুষ্ঠানকে বাঁধা নিয়মে পরিণত করে, ধর্ম্মমতগুলিকে পাণ্ডিত্যসুলভ কতকগুলি সূত্রে পরিণত করে। কিন্তু নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণেরা, অর্থ-শোষণের অভিপ্রায়ে ইতর-সাধারণের স্থূল পৌত্তলিকতাকে উৎসাহ দেয়; আবার কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণেরা ইতর-সাধারণকেও অবজ্ঞা করে, নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ-দিগকেও অবজ্ঞা করে। তাই, উহারা কেবল সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার করিতেই ভালবাসে। উহাদের লিখিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষ্যে, উহারা কেবল অক্ষর ধরিয়াই তর্ক-বিতর্ক করে, আসল মর্ম্মভাবটি উহারা ধরিতে পারে না। যাহারা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা ধর্ম্মালোচনা হইতে পরাঙ্মুখ; রাজকর্ম্মচারী, বণিক, উদার-ব্যবসায়াবলম্বী, সমস্ত ব্রাহ্মণেতর শিক্ষিত লোক—ইহারা, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-শিক্ষার যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে ফল লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে উহারা এই বলিয়া অভিযোগ করিত যে, ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ভাষাকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে; অধুনা ইংরাজি শিক্ষা উহাদের বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। প্রতি বৎসরেই সংস্কৃত কালেজের ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।

একজন স্বদেশী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—য়ুরোপীয় ও মার্কিনেরা, আমাদের ধর্ম্মের আলোচনায় এতটা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, আর আমরা কিনা উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করি,—যেন আমাদের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্কই নাই। স্বধর্ম্মের উন্নত ভাবসমূহের প্রতি এই যে উদাসীনতা, ইহাই হিন্দুজাতির অধঃপাতের মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই। যদি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত বৈদেশিকেরা বিচার করিয়া বলেন যে, হিন্দু-ধর্ম্মের এই সমস্ত মতগুলি শ্রদ্ধার যোগ্য, গ্রহণের যোগ্য, তাহা হইলে স্বয়ং হিন্দুদিগের কি চোখ্ খুলিবে না, তাহারা কি সংস্কৃত শিখিবে না?—কেননা, যে রত্ন-ভাণ্ডারে হিন্দুধর্ম্মরূপ মহারত্ন বদ্ধ আছে, সংস্কৃতরূপ চাবি ভিন্ন সে রত্ন-ভাণ্ডারের দ্বার কখনই উদ্‌ঘাটিত হইবে না।

তাপস ও মঠবাসী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ। ১৮৯১ অব্দের আদম-শুমারীতে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ৫২৫০০০০ ধরা হইয়াছে; যোগীদের মধ্যে কতকগুলি লোক একটা মহৎ লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলে, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, যে-সকল তপশ্চর্য্যা শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, মনকে পশুত্বে পরিণত করে, তাহাতেই তাহাদের সমস্ত শক্তিক্ষয় হয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হয় ভণ্ড, নয় অলস; তাহারা ভক্তদিগের অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মঠধারী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কেহবা ধার্ম্মিক ও কৃতবিদ্য, কেহবা অলস ও কুসংস্কারাপন্ন। কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতকগুলি সন্ন্যাসী, দানধর্ম্মের উপদেশ পালন করিয়া থাকে। সমষ্টিভাবে ধরিলে, হিন্দুধর্ম্ম ভয়ের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম নহে।

জনসাধারণের অনেকগুলি প্রথা ও বিশ্বাস কবিত্বময় ও হৃদয়স্পর্শী; উহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ভগবৎ-ভক্তি, এবং একমাত্র চিত্তশুদ্ধিকর যে ভগবৎ-প্রসাদ সেই

ভগবৎ-প্রসাদে বিশ্বাস; সাধারণ লোকের ধর্ম্ম কোন সভ্য দেশের ধর্ম্ম অপেক্ষা কম স্থূল নহে। গাছ-পাথর-পূজার সহিত হিন্দুধর্ম্ম, সকল প্রকার কুসংস্কারকে, অবনতিগ্রস্ত সমাজের সমস্ত রুগ্ন বিকৃত অনুষ্ঠানকে সংযোজিত করিয়া দিয়াছে।

তত্ত্বতঃ তাহাই হিন্দুধর্ম্মের মতবিশ্বাস যাহা রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদি শিক্ষা দেয়; কিন্তু সর্ব্বত্রই উহা স্থানীয় কাল্পনিক কথার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামের, নগরের, প্রত্যেক অঞ্চলের, প্রত্যেক বর্ণের নিজস্ব পৃথক দেবতা আছে। এবং সে-সব দেবতা কিরূপ দেবতা! পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরের দেবতা-গুলা কাষ্ঠনির্ম্মিত অতীব স্থূল ধরণের কদাকার পুত্তলিকা।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত অবস্থা বুঝিতে হইলে, স্মরণ করা আবশ্যক—কুৎসিৎ প্রমোদ-উৎসবময় পূজা-পদ্ধতির এখনো কত সহস্র গুপ্ত ভক্তবৃন্দ, এখনো দেবালয় সকল কত অশ্লীল চিত্রে সমাচ্ছন্ন। এখনো যাদু-বিদ্যার খুব সম্মান; মন্ত্রশক্তিতে লোকের খুব বিশ্বাস। ব্রাহ্মণেরা যে সকল প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছে তাহা মলদূষিত ও মূঢ়। পাপীরা গোমূত্র পান করে, সকল হিন্দুরাই গোবরের ছাই গায়ে মাখে। (১) কোন রাজা বা ধনশালী লোক যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে তবে তাঁহাকে সোনা বা রূপা গলাইয়া একটা গরুর মূর্ত্তি গড়াইতে হয়। সেই মূর্ত্তির মধ্যে তাহাকে বদ্ধ করা হয় এবং এমন-করিয়া তাহার মধ্য হইতে বাহির হইতে হয় যে লোকে বলিতে পারে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল। ১২ বৎসর যাবৎ একটি প্রভাবশালী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—যাহার কাজ গোমাংস-আহার রহিত করা। এই সম্বন্ধে মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করায়, মধ্যে মধ্যে গুরুতর গোলযোগ উপস্থিত হয়। আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও, নর-বলি অজ্ঞাত নহে। ১৯০১ অব্দে, মাদ্রাজ প্রদেশের এক ব্যক্তি শিবলিঙ্গের সম্মুখে নিজ পুত্রের শিরশ্ছেদন করে। তখনই গেরেফ্‌তার হওয়ায়, সে বলিল,—শিব তাহার নিকট স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, তাহার পুত্রের মুণ্ড-বিনিময়ে তাহাকে প্রভূত ধন-ঐশ্বর্য্য দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং বলিয়াছিলেন ঐ মুণ্ড আর এক শিশুর স্কন্ধে বসাইয়া দিবেন। লোকটার বিশ্বাস, পুলিশ ইহাতে অসময়ে হস্তক্ষেপ না করিলে, দেবতা তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিতেন। বেনারসই ভারতের ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানী। যে সময়ে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় সেই শীতকালে বেনারসে গমন করিতে হয়।

মেঘশূন্য ঘোর নীল আকাশ। জ্বলন্ত কিরণ-বর্ষী সূর্য্য। বাতাস লঘু। অনুর্ব্বর ভূমি হইতে যে ধূলি-জাল সমুত্থিত হয় তাহা সূর্য্যকিরণে কনকরঞ্জিত হইয়া উঠে। বিশাল গঙ্গা, জলের রং হল্‌দে, ভাটা পড়িয়াছে, বালুতট দেখা যাইতেছে, তথায় শব-দেহ-গুলা শিকারী পাখীতে সমাচ্ছন্ন। কেবল

(১) অজ্ঞ বৈদেশিকদিগের অতিরঞ্জিত বর্ণনা আমাদের হাস্যোদ্রেক করে মাত্র।—অনুবাদক

পূত-স্পর্শ জীবদিগকেই গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয় :—যথা, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, যোগী, গরু ও বানর। কখন কখন ব্রাহ্মণেরা এই নদীতটে মরিবার জন্য শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া এখানে তীর্থযাত্রা করে।

দক্ষিণ তটভূমি—হল্‌দে বালুর কাছাড়; তাহার তলদেশে নগ্ন বালকেরা গরুকে জল পান করাইতে আইসে। কালো শাড়ীর অঞ্চলে শিশুসন্তানকে বাঁধিয়া রমণীরা স্থির-ভাবে সোজা হইয়া, ধীরে ধীরে নদীর অভিমুখে গমন করে। মাথার উপর সৌর-করোজ্জ্বল তাম্রঘটসমূহ পিরামিডের মত উত্থিত হইয়াছে।

উত্তর দিকে সহর; প্রকাণ্ড নিম্নভিত্তি-ভূমি সমূহ;—ভূমির মাথা জলে ঢাকা—কতকটা দুর্গপ্রাকারের মত দেখা যায়। প্রাচীরের মধ্যে, কেল্লার দৃঢ়বদ্ধ দ্বারের ন্যায় ঘাট-সমূহ; ঘাটের সোপানাবলী গঙ্গায় নিমজ্জিত।

কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভিত্তি-ইমারৎ, তাহার ধারে ধারে বুরুজ-স্তম্ভ, অসংখ্য গবাক্ষ-সমন্বিত প্রাসাদ, অলিন্দ, যাহার উপর হইতে চতুষ্ক সকল সমুত্থিত। কোথাও তৃণশূন্য কাছাড়-ভূমি, তাহার উপর চিতা সজ্জিত;—এইখানে শবদাহ হয়। উপরে আওরংজেবের মস্‌জিদ, তাহার গোলাকার গম্বুজ, তাহার মিনার-স্তম্ভগুলা বিস্তৃত-মুখ। নদীর আরো উজান্ দিকে যেখানে তটের গায়ে একটা 'কোল' গড়িয়া উঠিয়াছে সেই স্থানে, এবং যেখানে তরু-মুকুট-শোভিত ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া আছে, সেইখানে ঘেঁসাঘেঁসিভাবে কতকগুলি দেবালয় অবস্থিত। পুরাতন হিন্দু গঠন-রীতি; ক্ষুদ্রাকৃতি। আসীরিয় ধরণের ভিত্তিভূমির উপর, পুরাতন পারসীক রীতি-অনুযায়ী গঠিত দ্বার-প্রকোষ্ঠের উপর (থামগুলা অসমান ঢাকের মত ও থামের মাথাগুলা বহিঃ-প্রসারিত) ধুচ্‌নী-টুপি আকারের ছোট ছোট পাথরের গম্বুজ—তাহার গায়ের উপর ঘেঁসাঘেঁসি আরও ১০।১২টা ছোট ছোট গম্বুজ; ঠিক যেন স্ফোটনোন্মুখ শতদল।

এই অসংখ্য গম্বুজগুলি (কোন কোন স্থানে ফাট-ধরা) ভূমির দিকে ঝুঁকিয়া আছে;—তাহার চাপে মাটি যেন পদ-দলিত। এই সকল দেবালয়ের পশ্চাদ্-ভাগে আরো অন্যান্য দেবালয় যেখানে বানর, ময়ূর, গরু পূজিত হইয়া থাকে, এবং সহর, যাহার রাস্তাগুলা অতি সংকীর্ণ। এই সকল রাস্তায় শিবের ষাঁড়গুলা রৌদ্র-তপ্ত জনতাকে ভূ-পাতিত করিয়া বিচরণ করে।

সমস্ত কাছাড়-ভূমি ও ঘাটের ধারে বড় বড় চ্যাপ্‌টা ছাতা বা আতপত্র বরাবর পোঁতা রহিয়াছে। এই সকল ছাতার তলে, সকল রকমের দোকান্‌দার। উহারা কাপড়, পান, আহার্য্যসামগ্রী, ছাই-ভরা থলে, ফুলের মালা, ও পুতুল বিক্রয় করিতেছে। আর ঐ দেখ কতকগুলি তীর্থযাত্রী ঘাটের প্রকোষ্ঠে সমবেত হইয়াছে; বৃহৎ সোপান দিয়া নীচে নামিতেছে: লোকদের মাথায় টুপি কিংবা লাল পাগ্‌ড়ী, পরণে সাদা ধুতি; স্ত্রীলোকদের সাদা কিংবা লাল শাড়ী; উচ্চবর্ণের রমণীরা অবগুণ্ঠিতা; শিশুরা নগ্ন। কপালে শিবের

ত্রিশূল-রেখা কিংবা বিষ্ণুর রেখা-চিহ্ন অঙ্কিত। গঙ্গার উপর কতকটা স্থান ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু, বরাবর তটভূমির ধারে-ধারে এত লোকের ভিড় যে, জল উহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তীর্থযাত্রীরা নদীতে ডুব দেয়, উহার কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জল শুষিয়া শুষিয়া দীর্ঘ-টানে পান করে। এই জলের উপর মানুষ ও পশুদিগের শব ভাসিয়া বেড়ায়; তটভূমির উপরিস্থিত দগ্ধ চিতার ভস্মরাশি এই জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

তথাপি জ্বলন্ত সূর্য্যের কিরণ গঙ্গার উপর, প্রাচীরের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন সমস্তকে অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছে; অট্টালিকার পাঁচরঙ্গা মুখ-ভাগগুলি, আতপত্র, পাগড়ী, বিচিত্ররঙ্গের পরিচ্ছদ, পতাকা, হল্‌দে মাটী, ধূসরবর্ণ বা রক্তবর্ণ সূচাগ্র-শিখর গম্বুজগুলা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

*
* *

এই প্রথম চিত্রে আমরা দেখিতে পাই—বহিঃপ্রভাব-নিরপেক্ষ লোক-প্রচলিত ধর্ম্মের অবনতিশীল ক্রমবিকাশ; ইহার প্রতিযোগী আর এক ক্রমবিকাশ আমরা দেখিতে পাই—সেটি ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহের উন্নতিশীল ক্রমবিকাশ; এই ক্রমবিকাশের উপর মুসলমানধর্ম্মের, খৃষ্টধর্ম্মের ও য়ুরোপীয় দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

অবনতিগ্রস্ত শৈবধর্ম্মের মধ্য হইতে কোন ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব আর দেখা যায় না; কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বরাবরই স্বীয় সুনম্যতা ও জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে (২)।

ইহার রূপান্তরীকরণে ক্রমোন্নতির দুইটি সমান্তরাল ধারা দেখিতে পাওয়া যায়! প্রথমটি—যাহাতে মুসলমানধর্ম্ম অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণ কম এবং যাহার স্থূল রেখাগুলি খাঁটি হিন্দুই রহিয়া গিয়াছে। একটা নাম বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবার যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভভাগে স্বামী নারায়ণের আবির্ভাব (১৭৮০-১৮২৯); আহমদাবাদে এখনও স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের লোক, গণনায় দুই লক্ষ হইবে। স্বামী নারায়ণ বহু-দেববাদ স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার মতে, সকল দেবতাই এক কৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। যোগরহস্যের বদলে তিনি আচরণগত ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দিয়া থাকেন;

(২) অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীতে নিম্নলিখিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলি ছিল যথা:—১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে চরণদাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "চরণদাসী" সম্প্রদায় (রাধাকৃষ্ণের পূজা অর্চ্চনা);—আউলে চাঁদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "কর্ত্তাভজা" (১৯ শতাব্দী);—(এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া আরাধনা করে; ইহার মধ্যে সকল বর্ণের লোক, সকল ধর্ম্মের লোক আসিতে পারে)।—রূপরাম কবিরাজ-প্রতিষ্ঠিত "স্পষ্টদায়ক" সম্প্রদায়। "বাউল"—"নয়ারা"—"সহজী"—"সখিভাবক"—"হরিবোলা"; (এই সাতটি সম্প্রদায় কেবল বঙ্গদেশেই দেখা যায়):—১৮৫০ অব্দে, "দর্ব্বেশ-ফকির" এই মুসলমানী নামে এক যাগী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়—"পল্টদাসী"—"অপাপন্থী"—"খুসি-বিশ্বাসী"—"বলরামী"—"সৎনামী"—"সাহেবধনী"—"দেবসমাজ"—(ইহা একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়)—"কুদাপন্থী"—"কুক"।—(Hindu Civilization —Bose)

কৃষ্ণ শুধু বিশুদ্ধ জীবনের পূজা চাহেন; এবং সদনুষ্ঠান ব্যতীত ধর্ম্মনিষ্ঠা নিস্ফল। স্বামী নারায়ণ,—জীব-হিংসা, মদ্যপান, এবং আত্মহত্যা (ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে করিলেও) নিষেধ করিয়াছেন। এবং কঠোররূপে নিষিদ্ধ :—ব্যভিচার, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, ঈশ্বরাবমাননা, মিথ্যাকথা বলা, বিশ্বাস-ঘাতকতা। স্বামীনারায়ণের ধর্ম্মশাস্ত্র "শিক্ষা-পত্রী"তে এই শ্লোকগুলি আছে, যথা :—

"কৃষ্ণের নাম আবৃত্তি করিবার জন্য আমার শিষ্যেরা প্রতিদিন দেবালয়ে গমন করিবেন।

তাঁহার জীবনের ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে হইবে, এবং উৎসবের দিনে তাঁহার সম্মানার্থ স্তুতিগান করিতে হইবে।

কৃষ্ণের মন্দিরে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথকভাবে থাকিবেন, কখনই পরস্পরকে স্পর্শ করিবেন না।

এই পাঁচ দেবতাকে আরাধনা করিতে হইবে, যথা :--বিষ্ণু, শিব, গণেশ, পার্ব্বতী ও সূর্য্য।

যে অন্তর্যামী প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মাকে পরিচালিত করেন তাঁহাকেই স্বপ্রকাশ পরমপুরুষ বলিয়া জানিবে; তিনি প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য দণ্ডপুরস্কার বিধান করেন।

ধ্যান-ধারণার দ্বারা যখন বুঝিতে পারিবে যে আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র, জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ, তখন প্রত্যেক মনুষ্যই কৃষ্ণকে পরমাত্মারূপে আরাধনা করিবে।

আমার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে যাহারা আমার উপদেশ পালন করিবে, তাহারা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিবে।

পরমহংস রাম-কৃষ্ণের মতবাদ (১৮৩৩-৮৬)। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবশালী শেষ-সংস্কারকদিগের মধ্যে রামকৃষ্ণ অন্যতম। রাম-কৃষ্ণ সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। যোগানন্দে আত্মহারা হইয়া, তিনি দেবতার দর্শনলাভ করিতেন; কালী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন,—নিষ্ঠুর দেবতারূপে নহে, পরন্তু দয়াময়ী ও স্নেহময়ী মাতৃরূপে। পাণ্ডুবর্ণ, শীর্ণকায়, কষ্টের সহিত চলিতে চলিতে, তাঁহার বাগ্মিতার দ্বারা তিনি জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতেন।

তাঁহার রচনাবলী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

যে হোমাপাখী কাহিনী-কথায় সুপরিচিত, সেই হোমাপাখী আকাশের খুব উচ্চস্থানে বাস করিত, অহঙ্কারে পৃথিবীর মাটিতে কখন তাহার পা পড়িত না। যখন সে আকাশে ঝুলিতেছিল, তাহার ডিম্‌গুলি ভারের আকর্ষণে সূর্য্যমণ্ডলের দিকে আকৃষ্ট হইল; কিন্তু পতনের সময় ডিম্‌গুলা ফুটিয়া উঠিল; বাচ্চাগুলা তখনি খাড়া হইয়া আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল। এইরূপ সিদ্ধপুরুষেরাও তাঁহাদের শৈশব হইতেই এই সংসারের সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান ও দিব্যজ্যোতির উচ্চপ্রদেশে সবেগে উত্থান করেন।

জনতাপূর্ণ একটা রাস্তা দিয়া যাইবার সময় একজন সাধক রুষ্টপ্রকৃতির এক ব্যক্তিকে দৈবক্রমে পদাঘাত করায় সে তাঁহাকে এত প্রহার করিল যে তিনি

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, বহুকষ্টে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল ; এবং তাহারা তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল :—"গুরুদেব, যে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে তাহাকে আপনি কি চিনিতে পারিতেছেন ?" মুনি উত্তর করিলেন :—"হাঁ যে আমাকে প্রহার করিয়াছে।" প্রকৃত সাধকের নিকট, শত্রুমিত্রে কোন পার্থক্য নাই।

শিশুরা কেবল নিজের ঘরেই পুতুল লইয়া খেলা করে। কিন্তু তাহাদের মা, তাহাদের পুতুলগুলা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার নিকট দৌড়িয়া আসেন। "মা, মা"। এইরূপ তোমরাও যখন ধনমান যশরূপ পুতুল লইয়া সংসারে নিমগ্ন থাক, তখন জগজ্জননী এই সকল পুতুল-খেলায় বিরক্ত হইয়া নিজে তোমাদের নিকট দৌড়িয়া আসেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মণি-প্রদীপ

এই বসন্তকালে একটি বেদনা আমার বুকের মধ্যে অনবরত বাজতে থাকে। পৃথিবীতে এই বসন্ত বারবার আসে, যায় কিন্তু আমার জীবনে একটিবার মাত্র বসন্ত এসেছিল। কোথায় গেল আমার সেই প্রাণের নবীনতা, কোথায় গেল সেই হৃদয়ের গুঞ্জন গান, কোথায় গেল এই বসন্তের মত্ত হাওয়ার মতো আমার মাতলামি ! রঙের সেই নেশা, সুরের সেই তন্দ্রা, গন্ধের সেই আকুলতা কেমন করে মরে গেল !

জীবনে সেই একটিবার মাত্র বসন্ত এসেছিল। সে তার কাজ-চুকিয়ে চলে গেছে—তার শেষ-কথাটি আমার কানে কানে গুঞ্জন করে বিদায় নিয়ে গেছে। কিন্তু আমি কি তাকে বিদায় দিতে পেরেছি ? জানি সে আর ফিরবেনা, আশা তার আর রাখিনে, তবু তো তাকে ভুলতে পারচিনে।

আমি তো চিরকেলে একটা নীরস মানুষ—কল্পনার দোলায় দোল খাওয়া তো কখনো আমার স্বভাব নয়—এ ত সবাই জানে ! তবে আমার এ কি হল ! কেমন করে আমার সমস্তটা এমন ওলট-পালট হয়ে গেল !—কিসে আমায় এমন-তর নূতন করে তুল্লে ! আমি যা-নয় শেষে তাই হয়ে গেলুম !

যারা কাব্য নিয়ে থাকে চিরদিন আমি তাদের ঠাট্টা করে এসেছি। কল্পনায় যারা রাজপ্রসাদ নির্ম্মাণ করে বাস করে তাদের দিকে আমি চিরকাল কৃপার চক্ষে চেয়ে এসেছি। গানের যে কোনো মূল্য আছে—এ আমার কোনো দিন বিশ্বাস ছিল না ;—কানের তৃপ্তির চেয়ে উদরের তৃপ্তির জন্য সমস্ত বিশ্বমানব আর্ত্তনাদ করচে এ তো প্রত্যক্ষ চোখে দেখচি।—তাকেই আমি বড় করে দেখেচি। সেই-আমার এ কি হ'ল ? আমার মনে হচ্ছে আমার এই

প্রাণের কান্না গান গেয়ে না বলতে পেরে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কপালে কি আছে জানি না—শেষ-বয়সে হয়ত কবিতা লিখতেই বসে যাবো!

ছেলেবেলায় যখন কলেজে কবিতা পড়েছি তখন জানতুম এই কবিতার অর্থ মুখস্থ করে পাশ করবার জন্যই কবিতার সৃষ্টি। কেন যে এত লোক কবিতা লিখেছে সে কথা তখন মনেই হতনা। কোন্ কবিতাকে কোন্ সমালোচক শ্রেষ্ঠ বলেচে সেইটে স্মরণ রাখাই হচ্ছে দরকার --আমার কাছে কি ভালো লাগে তার পরীক্ষা তো কোনো দিন করিনি। কিন্তু আজ সেই ছেলেবেলার মুখস্থ কবিতার কয়েকটা লাইন কেবলই মনের মধ্যে গুঞ্জন করছে। মনে হচ্ছে, সে কোনো কবির লেখা কবিতা নয়—আমারই মনের কান্না। আজ যেন মনে হচ্ছে একটু-একটু বুঝতে পারচি কবিরা কেন মাথা-ঘামিয়ে এই সব লিখেছিল, এ সব তাদের সৌখীনতা নয়, এ তাদেরও প্রাণের কান্না!

কান্না! কান্না! এ কেমনতর কান্না! এ জীবনে অনেক কান্না তো কেঁদেছি। ছেলেবেলায় একবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে কেঁদেছিলুম, মনে হয়েছিল তার চেয়ে বড় কান্না বুঝি পৃথিবীতে নেই—তারপর সংসারের অনেক বিপদে, বিচ্ছেদে জ্বালাযন্ত্রণায় অনেক কান্না কেঁদেছি—কিন্তু এ কী কান্না! এ কান্নার যে শেষ নেই। এ কান্নার তৃপ্তি যে কান্নাতেই। না কাঁদতে পারলে কান্নাকে যে তৃপ্তি দিতে পারিচি না।

যে আমার আনন্দ! এক এক সময় ভাবি—এ আমার পাগলামি নয়তো। যা আমি অবহেলার সঙ্গে একদিন ফেলে দিয়েছি তারই জন্যে কাঁদচি? যা একদিন আমার কাছে তুচ্ছ ছিল তাই এখন এমন মহামূল্য হয়ে উঠল কি করে? এই মহামূল্যের তো দাম দিইনি, তাই কান্না দিয়ে বুঝি এখন সে ঋণ শোধ করচি?

সে যে আমার অত্যন্ত কাছে ছিল, তাই তো কোনো দিন তাকে ভালো করে দেখতে পাই নি। সে দোষ কি আমার? সে যদি হঠাৎ একদিন প্রভাতে এই বসন্তের নব-মল্লিকার মতো তার সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-আনন্দ নিয়ে আমার চোখের সামনে দক্ষিণে-বাতাসে ফুটে উঠত তাহলে নিশ্চয় তার দিকে চেয়ে আমি অবাক হয়ে যেতুম—চোখ আমার ফিরত না। সেই হঠাতের ধাক্কায় সেই একটুখানির মধ্যে তার সবটুকু আমার হৃদয় দেখতে পেত। কিন্তু তা তো হয় নি—তাকে যে আমি রোজই দেখেছি—কোনো এক বিশেষ-মুহূর্ত্তে তো সে আমার চোখের সামনে আবির্ভূত হয়নি। কবে কখন্ তাকে প্রথম দেখলুম তা মনেই পড়ে না—কোনো স্মরণচিহ্ন তো তার অঙ্কিত হয়ে যায় নি!

লতা! লতা—এই নামটি ছেলেবেলা থেকে কতবার কানের আশেপাশে ভেসে-ভেসে চলে গেছে—ওর কোনো ঝঙ্কার কোনো দিন একমুহূর্ত্তের জন্যেও কানে বাজেনি। কিন্তু আজ দেখি এ কি?

ওর মধ্যে ছন্দ আছে, সুর আছে, তান-লয় সব আছে। ঐ একটি কথাতেই আমার হৃদয়ের সব গান যেন গাওয়া হয়ে যায়;—আমার সব কথা যেন বলা হয়ে যায়! আমি যতই বলি ততই যেন ওর সুর গভীর হয়ে আসে, ততই যেন নূতন-নূতন ছন্দে ওর ঝঙ্কার উঠতে থাকে।

কিন্তু ছাই কেন এ সব কথা বলচি?—সব কথা তো ঠিক-মতো করে বলবার ক্ষমতা আমার নেই—বলাও যে যায় না। লোকের সহানুভূতি আমি চাই? কি হবে আমার তাতে? কেউ হয়ত বলবে এ আমার প্রলাপ—তা বলুকগে!

আজ ইচ্ছে হচ্ছে লতার সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখি—দিনের পর দিন ধরে ধরে তার সবটা—তার চলা বলা, খেলা ধূলা, হাসি কান্না—মনের উপর ছবির মতো এঁকে নিই। কিন্তু কই কিছুই যে মনে পড়চে না। কিছুই তো মনে করে রাখি নি। তার দিকে মন দিলুম কবে যে সে আমার মনে থাকবে? দিনরাত তাকে চোখে-চোখে দেখেছি—মনের কারবার তো তার সঙ্গে কোনো দিন করি নি। মন দিয়ে যে তাকে দেখা যেতে পারত এ কথা মনে উঠবার অবসরই যে পাই নি। ঠিক বল্‌তে পারিনা—এখন মনে হচ্ছে, চোখের আড়াল হলে হয়ত যাকে দিন রাত দেখা অভ্যাস হয়ে গেছে তাকে মনে-মনে না দেখলে মন খুৎখুঁৎ করতো। কন্তু সে যে কখনো চোখের আড়াল হোলো

তার সম্বন্ধে দুটো একটা ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। একদিন সে আমার হাতের লেখার খাতায় একদোয়াত কালি উল্‌টে দিয়েছিল। তাতে আমি তাকে খুব মেরেছিলুম। তার সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না এখনও যেন শুনতে পাই হঠাৎ এক-বার বাতাসের মধ্যে বেজে উঠল। পরের মেয়েকে মেরেছি বলে মায়ের কাছে আমার শাস্তি হল। মায়ের হাতের মার খেয়ে আমি যত কাঁদলুম সঙ্গে-সঙ্গে লতাও তত কাঁদলে। আমার রাগ হল ভয়ানক লতার উপরে—কিন্তু প্রতিশোধ নেবার আর সাহস হল না—কারণ শাস্তির চিহ্ন তখনো আমার গা থেকে মিলোয়নি। আমি রেগে, পড়বার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইলুম—লতাকে কাছে আসতে দিলুম না। তার পর, অনেকক্ষণ পরে ক্ষিধের তাড়নায় যখন ঘরের দরজা খুল্‌লুম তখন দেখি চৌকাঠটিতে মাথা রেখে লতা ঘুমিয়ে পড়েছে—চোখের জলের দাগ তখনো তার গালের উপর আঁকা।

বাবার একটা দামী নতুন ঘড়ি একদিন নেড়ে-চেড়ে দেখতে-দেখতে আমার হাত থেকে হঠাৎ পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে তো আমার মুখ শুকিয়ে গেল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লতা; সে তো কেঁদেই ফেল্লে। ভাবনা হল আমার এই লতাকে নিয়ে। আমি যে ঘড়ি ভেঙেছি এর কোনো প্রমাণ নেই—এক লতা ছাড়া। এক-একবার মনে হচ্ছিল দোষটা লতার ঘাড়েই চাপিয়ে দিই; কিন্তু জেরায় টিঁকবে

পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে (বোধ হয় লতার ঘাড়েও দিয়েছি) দুই-একবার ভারি ঠকেছিলুম—শাস্তির পরিমাণ তাতে দ্বিগুণ হয়েছিল। সেই জন্যে লতাকে বল্লুম—"ভাই লতা, লক্ষ্মীটি, কাউকে বলিস্ নি—বুঝলি?" লতা সমস্ত-ঘাড়খানা নেড়ে বল্লে—"না"!

মনে মনে অনেক দিন ভয় ছিল—বুঝি লতা কথাটা ফাঁশ করে দেবে। আমার মনে যে কী আতঙ্ক ছিল তা বলতে পারি নে। কিন্তু সেই আতঙ্কের পরিণামের হাত থেকে লতা আমাকে বাঁচিয়ে যে কী নিশ্চিন্ত করেছিল তা আমি কখনো ভুলতে পারব না! লতা কতকটা বাচাল ছিল বটে কিন্তু এ-কথা তার মুখ দিয়ে ইহজীবনে বার হয় নি।

আর-একটা কথা মনে পড়চে। কিন্তু এ-কথাটা কেন এখনও ভুলিনি তা ঠিক বুঝতে পারচি না। এর মধ্যে কি এমন ছিল যাতে এটা স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে?

লতা তখন ছেলেমানুষটি নয়—বেশ একটু বড় হয়েছে। আমি তখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্যে ব্যস্ত। পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি এক বসন্তের বৈকালে ছাদের এক-কোণে নিরালায় বসে পড়া মুখস্থ করচি, লতা একছড়া মালা হাতে করে এসে দাঁড়ালো। বল্লে "শিরিশ-দা, তোমার জন্যে এইটে গেঁথেছি—নেবে? এই মালা গাঁথায় একটু কায়দা আছে।" —বলে সে মালা-গাঁথার প্রকরণ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা সুরু করে দিলে। আমি ধমক দিয়ে উঠলুম—"চোপ!" আমার কেমন রাগ হচ্ছিল—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকার উপর সেই রাগ। আমার মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর আর-সবাই বেশ মনের ফুর্ত্তিতে আছে কেবলমাত্র আমিই এগ্‌জামিনের দায়ে পড়েছি। ছাদের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল দুটো ছেলে মনের আনন্দে মার্ব্বেল খেলছে, রাস্তা দিয়ে একদল ছেলে হল্লা করতে-করতে চলেছে—মাথার উপর এক ঝাঁক পাখী মনের আনন্দে অবাধে উড়ে চলেছে! আর আমি যেন কেবল একটা গরাদে-দেওয়া খাঁচার ভিতর বসে তোতা পাখীর মতো বইয়ের বুলি আউড়ে যাচ্ছি;—আমার খেলবার যো নেই, আমার কোথাও ছুটে যাবার যো নেই। লতা যখন এসে ছাদে দাঁড়ালো তখন সঙ্গে করে খাঁচার বাইরেকার একটু হাওয়া যেন নিয়ে এল। তার সেই সমস্ত দেহখানার উপর কোথাও এতটুকু এগ্‌জামিনের ভাবনা নেই। তার সঙ্গেকার সেই একটুখানি হাওয়া, তার সেই মনের ফুর্ত্তির আলো পেয়ে আমার মনে হল বটে আমি যেন বাঁচলুম কিন্তু একটা হিংসে হতে লাগলো। আমিও তো এম্‌নি থাক্‌তে পারতুম—কিন্তু তা হোলো না কেন? তাই রাগে আমি ধমক্ দিয়ে উঠলুম—"চোপ!"

লতা আস্তে আস্তে মালাগাছটি আমার কাছে রেখে চলে যেতে লাগল। আমি চীৎকার করে বলে উঠলুম—"লতা, নিয়ে যাও তোমার মালা।"

লতা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"কেন শিরিশ-দা, রাগ করচ ভাই! নাও না ওটা।"

আমি বল্লুম—"না, না, আমি নেব না। ফুলের গন্ধ নাকে লাগলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না।—এখন এগ্জামিনের পড়া!"

লতা কিছু বল্লে না, শুধু একটু হাসলে। আমার রাগ তাতে আরো বেড়ে উঠল—আমি মালাগাছটা নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলুম।

মনে হ'ল লতার মনে একটু ব্যথা লেগেছে। তাতে আমি যেন একটু আনন্দ পেলুম। কেবল আমিই এ জগতে কষ্ট পাব;—আর কেউ পাবে না?

লতা ছেঁড়া-ফুলগুলোর দিকে খানিক ক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল, তার পর সেগুলো একটি একটি করে কুড়িয়ে আঁচল-ভরে নিয়ে গেল।

তারপর যখন পরীক্ষায় পাশ করলুম, বাড়িতে আনন্দ-কোলাহল পড়ে গেল তখন লতা বল্লে—"শিরিশ-দা, ইচ্ছে হচ্ছে আজ একটা ফুলের মুকুট গড়ে তোমার মাথায় পরিয়ে দি।"

কিন্তু সে তা দেয় নি।

লতার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ সেটা একটু পরিস্কার করে বলা দরকার। তাদের সঙ্গে আমাদের একটা খুব দূর-আত্মীয়তা আছে বটে কিন্তু সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আসল সম্পর্ক লতার মা আর আমার মা দুই সখী। আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতে লতারা থাকত—কিন্তু লতা সম্বন্ধে ঠিক করে বলা যায় না সে কোথায় থাকত; কারণ আমি তো দেখেচি সে আমার মায়ের কোলে-কোলেই বেড়ে উঠেছে। শুনতে পাই, মায়ের কোল নিয়ে ছেলেবেলায় আমাদের দুজনের ভারি ঝগড়া হত। আমি সহজে কোলের দখল ছাড়তুম না। মা আমায় তাই বলতেন, ছেলেটা বড় স্বার্থপর! আমরা প্রায় সমবয়সী; বোধ হয় লতা বছর-দুয়েকের ছোটো হবে। একসঙ্গে আমরা বরাবরই খেলাধূলা করেছি। মায়ের আদর আমিও যেমন পেয়েছি লতাও তেমনি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, আমি বাপ-মায়ের সবে-ধন-নীলমণি!

যদিও আমার কাছে কথাটা গোপন রাখবার চেষ্টা করা হত তবুও আমি জানতুম, মা সখীর সঙ্গে পরামর্শ করে রেখেছেন লতা তাঁর বৌ হবে। আমি জানি, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী কেউ এলে মা লতাকে দেখিয়ে বলতেন—এইটি আমার বৌ হবে! লতার মাথায় স্নেহের সঙ্গে হাত বুলোতে-বুলোতে বলতেন—দেখ দিকিন্ কেমন বৌ! কেমন টানাটানা চোখ, কেমন বাঁশীর মতো নাক—ইত্যাদি। বলে তিনি লতার গালে চুমু খেতেন, তাকে কোলে নিয়ে বসতেন।

আমি জানতুম, লতা আমার স্ত্রী হবে, কিন্তু জেনেও কথাটা তেমন করে কখনো তলিয়ে দেখিনি—বোধ হয় দেখবার ক্ষমতা আমার ছিল না। তখন কিই বা আমার বয়েস? আর কিই বা আমার জ্ঞান? লতাকে গোড়া থেকে যেমন করে দেখে আসচি বরাবর তেমনি করেই তাকে দেখতুম—তার যে অন্য রূপ থাকতে পারে এ আমার কল্পনায় কখনো আসেনি। বোধ হয় কল্পনা

জিনিষটা আমার ধাতে ছিল না। এখন ভেবে দেখচি লতাকে আমি মনে-মনে হিংসা করতুম। মা যে বলতেন আমি স্বার্থপর—কথাটা একেবারে মিছে নয়। আমার বেশ মনে পড়চে ছেলেবেলায় আমার পাণ-থেকে-চুণটুকু-খসবার জো ছিল না। আমি সব নেব—খাবি সব খাব—এই ছিল আমার ছেলেবেলাকার বুলি! লতা যে মায়ের স্নেহ দখল করে বসেছিল এর জন্যে লতাকে বোধ হয় আমি ভালো চোখ দিয়ে কখনো দেখতে পারি নি। কিন্তু এও আবার বলি, আমার বেশ মনে পড়চে, লতার একবার শক্ত অসুখ হতে সবাই যখন বলতে লাগলো আহা লতা বুঝি বাঁচে না! তখন আমার সত্যি কান্না পেয়েছিল।

এক ধরণের মানুষ পৃথিবীতে আছে যারা একেবারে নীরস—কাঠের মতো নীরস—কাটখোট্টা। আমি অনেকটা সেই ধরণের মানুষ। কিন্তু আমার ভিতরে কোথাও বোধ হয় একটি রসের ক্ষীণধারা গোপন হয়ে ছিল নইলে কেমন করে কোথাকার একটা অজানা বাতাসের শিহরণে একমুহূর্ত্তে এমনতর পুষ্পভূষিত হয়ে উঠলুম!

ছেলেবেলা থেকে এ জগৎ-সংসারটার উপর আমার কি ধারণা ছিল? এ বড় শক্ত ঠাঁই! কেবল প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দিতা—মারামারি কাটাকাটি করে সাফল্যের নিশান যে কেড়ে নিতে পারে তারই জয়—সেই সত্যকার বীর! এই যুদ্ধের জন্য আমি বরাবর তৈরি হয়েছি এবং আমাকে তৈরি করা হয়েছে। এরই মন্ত্র আমার পড়া-মুখস্থর সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে ফুঁকে দেওয়া হয়েছে—আমি ভক্তিভরে সেই মন্ত্র জপ করেছি। এই সংসারের গোপন বিজনতার ভিতর দিয়ে প্রেম স্নেহ ভালোবাসার যে পুণ্য মন্দাকিনী-স্রোত বহে চলেছে তাতে অবগাহন করে মানুষ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে—এ সত্য তো আমি জানতুম না বল্লেই হয়। জানতুম, সে শুধু কল্পনা—অলস কবির স্বপ্ন মাত্র। জানতুম, সে মায়াবী—তাই ভয়ে তার দিকে কখনো চাইতুম না। কিন্তু কি লাভ করেছি? বহু আস্ফালন করে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলুম এই জীবন-সাগর মন্থন করে কি সুধা উঠল? একশত টাকার কেরাণিগিরি বই ত নয়!

যাক্ ও সব কথা!

আমি যেম্নি এণ্ট্রান্স পাশ করলুম, মা ধরে বস্‌লেন বিয়ে করতে হবে। তাঁর অত্যন্ত তাড়া। তাঁর তাড়ার কারণ এই যে, লতা বড় হয়ে উঠেছে।

আমি মাকে বল্লুম—"তা হবে না।"

মা বল্লেন—"কেন রে?"

আমি তখন সেই-বয়সেই বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছি। আমি বল্লুম—"আমায় এখন জীবনযুদ্ধে প্রস্তুত হতে হচ্ছে—আমার এখন স্বচ্ছন্দ অবাধ গতি চাই—এ সময় আমার পিঠে গুরুভার চাপিয়ে যদি আমায় পঙ্গু করে দাও তাহ'লে চিরজীবন অকর্ম্মণ্য হয়ে কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করতে থাকব—ইত্যাদি।"

কথাগুলো ঠিক আমার রচনা নয়। তখন পড়া-মুখস্থ করে করে এমন অসাধারণ শক্তি জন্মে গিয়েছিল যে যা শুনতুম তাই মুখস্থ হয়ে যেত। কথাগুলি আমাদের এক প্রসিদ্ধ দেশনায়কের বক্তৃতার মুখে শুনেছিলুম এবং সেই বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে আমরা বিস্তর ছাত্র—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করব না—এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলুম। বাঙালীর একটা নিন্দা শুনতুম, বাঙালী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না। সেই জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল বাঙালীর এই কলঙ্ক মোচন আমি করব। সেই জন্যে মায়ের প্রস্তাবে জোরের সঙ্গে বলতে হল—"না!"

মা সব কথা বুঝলেন কি না জানি না; তবে তিনি এইটুকু বেশ বুঝলেন যে আমি বিয়ে করতে চাই না।

মা ভয়-খেয়ে গেলেন; বুঝলুম, তাঁর খুব ইচ্ছে কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি করতে তাঁর সাহস হচ্ছে না। আমার ন-মামাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিইয়ে ভারি একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে। মায়ের সেই ভয় আছে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

মায়ের অনেক দিনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে, তিনি আশা ছেড়েও ছাড়তে পারচেন না। একদিন তিনি এসে বল্লেন—"শিরিশ, তুই কি সত্যি বিয়ে করবি না?"

আমি বল্লুম—"কে বল্লে করব না। তবে এখন নয়। আগে টাকা রোজগার করি, তবে।"

মা বল্লেন—"আমি আশীর্ব্বাদ করচি তুই অনেক টাকা রোজগার করবি। বলিস তো বিয়ের ঠিক করি।"

আমি বল্লুম—"মা, তুমি ঠিক বুঝছ না!" বলেই আবার সেই জীবন-যুদ্ধের মুখস্থ বুলিটা আউড়ে গেলুম।

মা কথাটা বুঝলেন না বলেই তাঁর সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠল।

সেই সময় দেখতুম, মা লতাকে কাছে-কাছে রেখে কেবলই তার মুখে মাথায় হাত দিচ্ছেন। এক এক সময় তাঁর চোখে জল এসে পড়ত।

মা লতার মা-বাপকে আশ্বাস দিতেন—আরো কিছু দিন রাখো—লতাকে আমি বৌ করবই। কিন্তু লতার বাপ-মার সাহস হল না। মেয়ে বড় হয়েছে বলে ইতিমধ্যেই নিন্দে উঠেছে। শেষে আরো বড় করলে হয় ত বিয়েই হবে না।

লতার বিয়ে হয়ে গেল।

পশ্চিমে চাকরী করে এমন-একটি ছেলের সঙ্গে লতার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পরই লতা যে-দিন শ্বশুরঘর করতে গেল আমি সে দিন বার্ষিক পরীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত। লতা তার স্বামীর সঙ্গে আমার পড়ার ঘরে ঘোমটা-মুখে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল। তার পর একটি প্রণাম করে চলে গেল। আমি বইয়ের উপর আবার দৃষ্টি ফেরালুম।

তার সেই বিদায়-বেলাকার মুখখানি আমার দেখা হয়নি।

এখন ভাবছি সেই তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা-পত্র খানার কথা। যে একটুকরা কাগজ

কুটিকুটি করে এক-ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়—সেই কাগজের টুকরা জগদ্দল পাথরের মতো আমার বুকে চেপে বসে রইল! আর ভাবচি বাঙালীর কলঙ্ক-মোচন! কলঙ্ক-মোচন তো করেছি—কিন্তু কারুর মনের এককোণেও কি সে কথা লেখা আছে? মহা আস্ফালন, মহা লম্ফ-ঝম্প করে তো জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলুম কিন্তু কী জয় করে ফিরেছি?—এই একশত টাকার রাজত্ব? আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা কাগজের মুকুট?

আর বেশি-কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। এতক্ষণ যা বলছিলুম তার সামনে লতা ছিল, সে এতক্ষণ আমার আশ-পাশের আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে আমাকে জড়িয়ে ছিল—আমি তারই উৎসাহে বলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু যেম্‌নি তার বিদায়-গান গেয়েছি, অমনি মনে হচ্ছে আমার সমস্ত যেন শূন্য হয়ে গেছে। সে বিদায় নিয়েছে। আমার মন যেন নিভে আসছে। কিছু বলতে পারচি না।

কিন্তু বলতেই তো হবে। বলব আর কি? এক-কথায় সবটা বলা হয়ে যায়। লতা চলে যাবার পর থেকে খুব-কসে পড়া মুখস্থ করেছি আর পাশ করেছি। বইয়ের পাতা থেকে কখনো মুখ তুলে চাইনি। এত বড় বিশ্ব-সংসারটাকে বইয়ের পাতার আড়াল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। ব্যস, এই তো করেছি! তার পর পয়সার ধান্ধায় ঘুরেচি। অনেক আশা করেছিলুম; ভেবেছিলুম, না জানি কত বড় দিগগজ আমি! কিন্তু সংসারে বেরিয়ে দেখলুম, ঘা খেয়ে খেয়ে বুঝলুম—কতটুকু আমি! কোথায় বা আমার আশা! কবি ঠিকই বলেছেন:—

"বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই কিছু না,
কেবল ভস্মে ঘী ঢালা!"

একশত টাকার রাজত্ব যখন এল তখন রাণীই বা কেন না আসবেন? বলা বাহুল্য, এই রাজত্ব-লাভের সঙ্গে রাজকন্যাটিরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু সে-সব কথা তুলে নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি?

বিয়ে হল আমার মাঘ মাসের মাঝা-মাঝি। এর মধ্যে বলবার কথা কিছুই নেই। সংসার-ধর্ম্মের একটা অবশ্যকর্ত্তব্য এই বিবাহ—আমি যখন সংসারী জীব—সন্ন্যাসী বৈরাগী নই, তখন বিয়ে তো আমায় করতেই হবে—এবং করলুমও তাই। তাই বলে এটাকে যে একেবারে অবহেলা করে বসে রইলুম তা নয়। সব জিনিষকেই আমার সোজাসুজি দেখা অভ্যাস—এই বিবাহের মধ্যে যেটা সব-চেয়ে সোজা কথা অর্থাৎ সুখে-স্বচ্ছন্দে কি করে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তার উপায়ই বা কি এবং কোথাই বা তার গলদ থাকতে পারে, মনে মনে তাই নিয়ে খুব আলোচনা করতে লাগলুম—তাইতেই একরকম মেতে গেলুম। এর বাড়া অন্য কোনো কথা মনে ঠাঁইই পেলে না।

*
* *

লতা আমার বিয়েতে আসতে পারেনি তাই নিয়ে মা ভারি দুঃখ করছিলেন। বলছিলেন, লতাকে কদ্দিন দেখিনি। * *

মায়ের একটা পোষা পাখী ছিল। তিনি যেমন করে লতা লতা বলে ডাকতেন পাখীটা ঠিক তার অনুকরণ করতে শিখেছিল। অনেক দিন তার ডাক শুনিনি। আজ হঠাৎ শুনলুম সে লতা! লতা! করে চীৎকার করছে। * *

লেখাপড়ার পালা তো চুকে গেছে। পড়ার টেবিলের ভিতর কতদিনকার চোতা কাগজ জমে রয়েছে। অনেক দিন থেকে ভাবছি সাফ করে ফেলব। আজ হাতে কাজ নেই—ছেঁড়া কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে লতার ছেলেবেলাকার হাতের লেখার খাতা একখানা বেরিয়ে পড়ল। * *

কতদিন আগে একটা টক্‌টকে লাল রঙে হাত ডুবিয়ে লতা পথের ঘরের দেয়ালে পাঁচ-আঙুলের ছাপ দিয়েছিল। বাড়ির ভিতর আসতে আজ হঠাৎ দেখি সে দাগ এখনো জ্বলজ্বল করচে।

* *
*

মাঘের মাঝামাঝি আমার বিয়ে হল। ফাল্গুনের প্রথমেই দেখি লতা এসে হাজির। সে বল্লে, "ভারি দুঃখ, শিরিশ-দার বিয়েতে আসতে পারলুম না, এমন ঝঞ্ঝাটে পড়লুম! কৈ দেখি শিরিশদার বৌ?"

এ কথা আমার সামনে হয়নি—আমি তখন আপিসে ছিলুম। মায়ের মুখে শুনলুম।

আপিস থেকে ফিরে বিকেলে ছাদে বসে জলযোগের ব্যবস্থা করচি, লতা আমার স্ত্রীর হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে এসে উপস্থিত হল। এক-ঝট্‌কা বাতাস, একরাশ ফুলের গন্ধ নিয়ে এসে বল্লে—"কি শিরিশ-দা, চিন্‌তে পার?"

বাস্তবিকই আমি তাকে চিন্‌তে পারলুম না।

এই লতা!

তার দিকে চেয়ে মনে হল, এই যেন তাকে প্রথম দেখলুম। এই প্রথম পরিচয়।

লতা আমাকে অবাক দেখে বল্লে—"সে কি দাদা! বৌ পেয়ে ভুলে গেলে বুঝি?"

আমি কি স্বপ্ন দেখলুম? আমি কী দেখলুম? এ কি কোন্ মায়াবী আমার চোখে মায়ার অঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে গেল?

এই লতা!

এ যে সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য জড়ো করে রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। এমন রূপ তো কখনো দেখিনি!

এ কি লতা? এ কি মানুষ?

লতা কি বলছিল আমি শুনতে পাই নি, হঠাৎ তার হাসি শুনলুম—মনে হল সেই হাসিতে সমস্ত বিশ্ব যেন হেসে উঠেছে!

লতা বল্লে—"দাদা, আজ সমস্ত দিন ধরে তোমাদের জন্যে এই মালা গেঁথেছি—তোমাদের ফুলশয্যায় আমার ফুল দেওয়া হয়নি। এই নাও সেই ফুল।"—বলে প্রথমে আমার স্ত্রীর গলায় সে একছড়া মালা পরিয়ে দিলে, তার পর আমার

গলায় পরিয়ে দিতে এসে বল্লে—"দাদা, আজ যদি ফুলের গন্ধে রাত্রে তোমার ঘুম না হয় তাহলে আজ আর আমার উপর তোমার রাগ হবে না; খুসীই হবে জানি!"—বলে সে আমার গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে হাসতে লাগল।

জানিনা হঠাৎ আমার কি হল! আমার গলার মালা নিয়ে লতাকে পরিয়ে দিতে গেলুম।

লতা সরে দাঁড়াল; বল্লে—"ছি দাদা, তোমার গলার মালা কি আমায় পরতে আছে?"

আমি অবাক হয়ে তার চোখের দিকে চেয়ে রইলুম, লতাও আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর হঠাৎ চোখ নামিয়ে সে একবার চট্ করে চলে গেল। একটু পরেই আবার ফিরে এসে গল্প জুড়ে দিলে। আমি যেন কেমনতর হয়ে গেলুম। * * *

আমার জীবনে এই একটি মুহূর্ত্তের বসন্ত! কিন্তু ভাবি এই একটা মুহূর্ত্তই বা কার জীবনে কবার আসে? আমার সমস্ত জীবনখানার উপরে এই যে একটি মুহূর্ত্ত জেগে আছে—এ যে আমার জীবনের মণিপ্রদীপ!

আর সেই বাসন্তীর দান?—সেই ফুলের মালা? সে তো কৌটোর ভিতর থেকে শুকিয়ে ধুলো হয়ে কবে এক বৈশাখীর ঝড়ে উড়ে গেছে, কিন্তু তার সৌরভ আজও আমার প্রাণকে ভরপুর করে রেখেছে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বিগত

আমার বসন্ত দিনে অশোক-কুসুমে,
চম্পকের ঊর্দ্ধমুখী ধূপগন্ধধূমে
যে পূজা হইয়া গেছে নির্ম্মাল্য তাহার
কোথা আজি আর?

আসিয়াছে ধরিত্রীর নবীন যৌবন,
বর্ণে বর্ণে বসন্তের পূর্ণ আবাহন,
অযুত গুঞ্জন গীতে, অজস্রধারায়
প্লাবিত ধরায়!

অবিরাম অবিরাম জীর্ণ পর্ণ ঝরে,
বর্ণ অরুণিমা সুপ্ত শুষ্ক পুষ্পস্তরে,
উদাস প্রসূন মুক্ত ব্যাকুল সুবাস
শুধু দীর্ঘশ্বাস!

আমি লুপ্ত গতি শ্রান্ত, আমি বর্ণহীন,
বিরামপ্রয়াসী, স্তব্ধ আমার এ দিন,
বৃন্তচ্যুত ফুলের মতন অসহায়
মৃত্যুপথ চায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পূর্ণের অভাব

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে,
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই ত একে একে
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার করে লবে।
এম্‌নি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নবনব।
এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্য্যোদয়।
এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপ্‌নি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমেরিকায় ভারতীয় শ্রমজীবী

ইয়াঙ্কিস্থানের মজুরেরা উচ্চহারে মজুরী পায়। মাসিক ৫০।৬০৲ টাকার কম মজুরী এ দেশে নাই বলিলেই চলে। চাকর, দ্বারবান্, গাড়োয়ান, কুলী, কৃষক ও কারখানার মজুর প্রভৃতি সকল-শ্রেণীর শ্রমজীবীই স্বচ্ছলভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে। এই জন্য দুনিয়ার মজুরেরা আমেরিকায় আসিতে চাহে।

ক্যালিফর্ণিয়া অঞ্চলে শুনিতে পাই বহুসংখ্যক ভারতীয় শ্রমজীবী কার্য্য করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্তসাগরোপকূলে

প্রায় ১২০০০ ভারতবাসী মজুরী করিয়া থাকে। নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহার ফলে ভারত-সন্তানগণ আর এদেশে আসিতে পারিবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি, জামেকা, টিনিড্যাড, গায়েনা ইত্যাদি ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহে ভারতীয় শ্রমজীবীরা খাঁটি গোলামের সমান। তাহারা "দাস-খত" লিখিয়া ঐ সকল দেশে যায়। তাহাদের সম্বন্ধে কবির কথা বর্ণে বর্ণে সত্য—

"নির্ব্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাঠিদের অত্যাচারে
স্থান হারায়ে মান হারায়ে প্রবাসী আজ সাগর-পারে,
কেউ বা করে দিন-মজুরী কেউ বা ক্ষুদ্র দোকানদার।"

এইরূপ Indentured Labourer ইয়াঙ্কিস্থানে আসিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র এই ধরণের চুক্তির বিরোধী। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক এদেশে আসিয়াছে তাহারা সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভাবে বুঝিয়াই আসিয়াছে।

একজনকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, আমেরিকায় ভারতবাসী আসিতে আরম্ভ করিল কি সূত্রে?" ইনি উত্তর করিলেন—"পাঞ্জাবের শিখেরা এই বিষয়ে পথ-প্রদর্শক। শিখগণ প্রথমে ব্রহ্মদেশে চাকরী করিতে আসে। ব্রহ্মদেশে থাকিতে থাকিতে তাহারা শিঙ্গাপুরের কথা শুনিতে পায়। শিঙ্গাপুরে ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা মজুরীর হার বেশী শুনিবামাত্র ইহারা ঐ অঞ্চলে অগ্রসর হইয়াছিল। যাহারা ব্রহ্মদেশে কার্য্য করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে একদল শিঙ্গাপুরে আসিল—পঞ্চনদ হইতে প্রথমেই কেহ শিঙ্গাপুরে আসিত কিনা সন্দেহ। অগ্রণী দল যখন দেখিল শিঙ্গাপুরে সত্য-সত্যই বেতনের হার বেশী তখন তাহারা পাঞ্জাবে



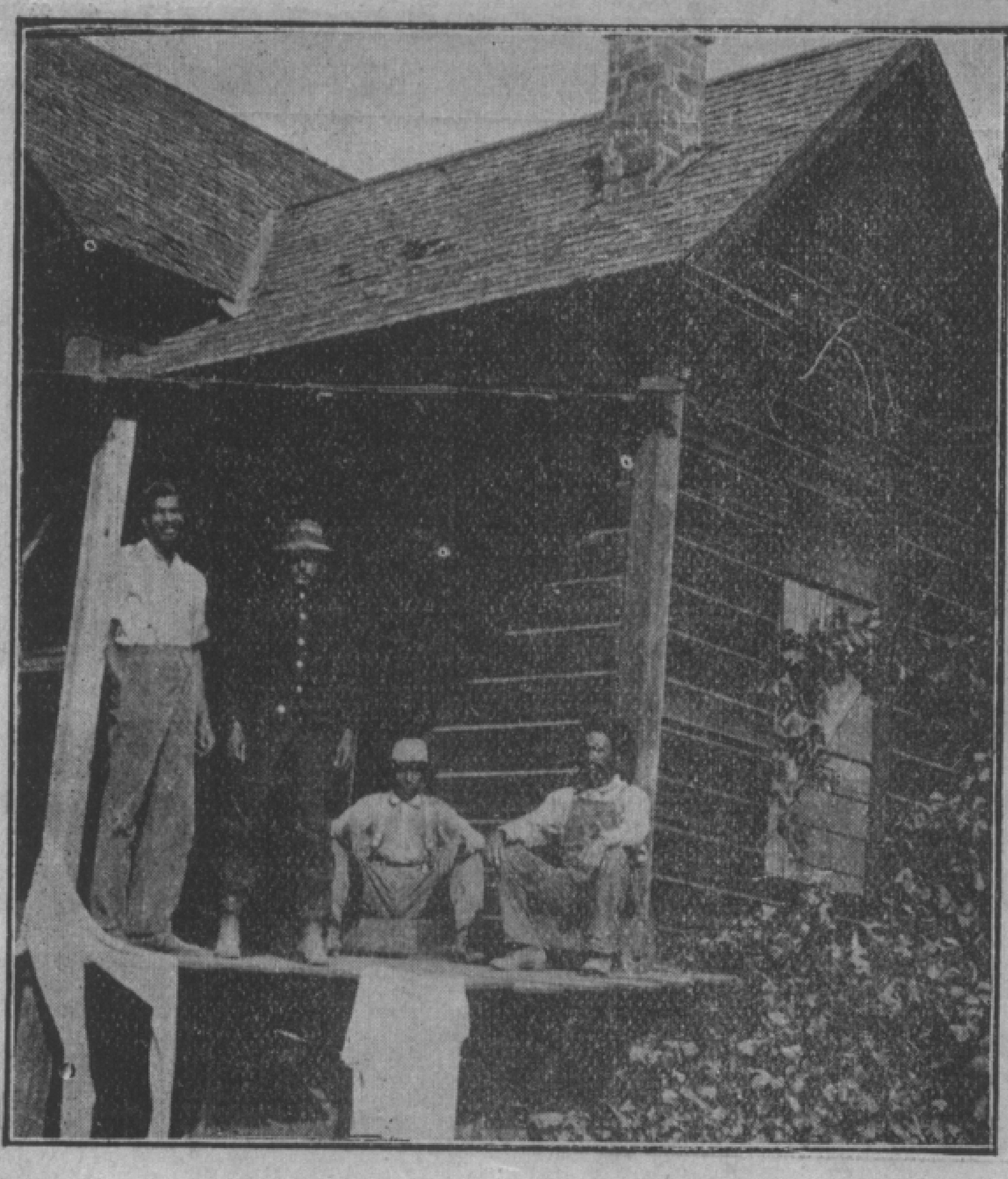
আঙ্গুরের ক্ষেতে হিন্দুস্থানী কৃষক।

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণকে সংবাদ পাঠাইল। সঙ্গেসঙ্গে শিঙ্গাপুরের প্রবাসীগণের নিকট হইতে পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে টাকা পৌছিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া পাঞ্জাবীরা ক্রমে শিঙ্গাপুরের দিকে ঝুঁকিল।

"আবার কিছুকালের ভিতরেই শিঙ্গাপুরের ভারতবাসীরা চীনের খবর পাইতে থাকিল। হংকং, সাংহাই ইত্যাদি অঞ্চলে ইংরাজ ক্ষমতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-দাস ভারতবাসীরও প্রবেশপথ সহজ হইল। ইংরাজেরা শিখ ও পাঠান সৈন্য লইয়াই চীনে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। এখনও ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশেরাই চীনের বৃটিশ-নগরে শান্তি রক্ষা করিতেছে। চীনারা এই কারণে ভারতবাসীর উপর অসন্তুষ্ট। যাহা হউক ভারতবাসীরা শিঙ্গাপুর কেন্দ্র হইতে চীন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র-স্থাপনের সুযোগ পাইল।"

কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থানে ভারতবাসীর অভিযান ব্যাপারটা কিছু বিচিত্র বোধ হইতেছে। হয়ত কোন ইংরাজ-প্রভুর সঙ্গে শিখ বা পাঠান দাস কিম্বা প্রহরী ক্যানাডায় আসিয়া থাকিবে। এইরূপে নব ভূখণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্রব আরব্ধ হয়। পরে প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলে কৃষকগণের উন্নত অবস্থা দেখিয়া ভারতবাসীরা দলে দলে চীন হইতে এখানে আসিতে প্রলুব্ধ হইয়াছে। ক্রমশ ভারতবর্ষ হইতেই শত শত লোক আমেরিকায় মজুরী করিতে আসিয়াছে।

শুনা যায়, আজকাল চীন, জাপান, সুমাত্রা, যব, মালয়, ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ, ক্যালিফর্ণিয়া ও ক্যানাডা ইত্যাদি প্রদেশে প্রায় দেড় লক্ষ ভারত-বাসীর অন্ন সংস্থান হইতেছে। ইহাদের বিষয় ভারতবর্ষের উচ্চ-শিক্ষিত লোকেরা এখন পর্য্যন্ত কোন সংবাদ রাখেন নাই। বিগত ৪।৫ বৎসরের ভিতর দাসখতে লেখা চুক্তির বিরুদ্ধে জন-নায়কগণ আন্দোলন তুলিয়া-ছেন। সেই উপলক্ষ্যে বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহে ভারতীয় প্রজার অধিকার সম্বন্ধে আলো-চনা চলিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী—



আমেরিকায় ভারতীয় কৃষকের কুটীর।

নেতা তাদের তরুর মত স্তব্ধ দৃঢ় দুঃখজিৎ
নিজের মাথায় বজ্র ধরেন বিজয় তাহার সুনিশ্চিত।

ভারতবর্ষ হইতে গোখ্‌লে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন! কংগ্রেসে কয়েকবার এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করাও হইয়াছে। Modern Review, Indian Review ইত্যাদি পত্রে কোন কোন লেখক সমস্যাটা বুঝাইবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টা সত্যভাবে বুঝিবার জন্য এখনও দেশবাসী অগ্রসর হন নাই বলিতে হইবে। এমন-কি ভারতবর্ষের বাহিরে ভারত-সন্তান কোথায় কতজন কি-ভাবে জীবন যাপন করে তাহাই জানিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বর্ত্তমান যুগেও কুলী-মজুরের দ্বারাই দুনিয়ার সর্ব্বত্র একটা বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার আকার, পরিমাণ ও মূল্য বুঝিবার জন্য উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর শীঘ্র অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। গোখ্‌লে কয়েকদিনের জন্য মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট কার্য্য সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। তাহার জন্য বহুসংখ্যক উপযুক্ত লোকের জগতে বাহির হইয়া পড়া আবশ্যক। বৃহত্তর ভারতের কেন্দ্রগুলি বুঝিতে চেষ্টা করাই কয়েক জনের একমাত্র কার্য্য হউক।

ইয়াঙ্কিরা চীনাকে আমেরিকায় চাহে না জাপানীকে চাহে না, ভারতবাসীকেও চাহে না। ইহারা ইয়াঙ্কিদের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া যাইতে অসমর্থ। ভারতীয় মজুরদের মাথায় পাগ্‌ড়ী, হাতে বালা, কানে দুল, লম্বা চুল ইত্যাদির বিষম উৎপাত দেখিয়া ইয়াঙ্কিরা "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতেছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সুচরিতা

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজয়-গর্ব্ব

জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া আমার স্ত্রী সাত সপ্তাহ বিছানায় পড়িয়া রহিল। যাহাতে তাহার বিধিমত সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না হয়, সে-জন্য হাসপাতাল থেকে আমি একজন ধাত্রী আনাইলাম। তাহার অসুখের এই সাতটি সপ্তাহ আমরা আহারনিদ্রা একরকম ত্যাগ করিয়াছিলাম বলিলেই হয়।

টাকার দরদ আমি করি নাই। যে ডাক্তার ডাকিয়াছিলাম তাঁহার দর্শনী ষোল টাকা।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে একটু একটু করিয়া সে সারিয়া উঠিতে লাগিল, ক্রমে তাহার আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া গিয়া আবার জ্ঞান হইল।

যেদিন রোগ-শয্যা ত্যাগ করিল, সেদিন সে মুখটি বুজিয়া আস্তে-আস্তে আমার শয়নগৃহে আসিয়া বসিল। আমরা দুজনে

সেদিন সুধু মুখোমুখি করিয়া বসিয়া রহিলাম—কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না।

আর-কিছুদিন পরে আমরা সেই নিরবছিন্ন মৌন ভঙ্গ করিলাম বটে,—কিন্তু সে-কেবল নেহাৎ চুপ করিয়া থাকাটা ভাল দেখায় না বলিয়া। আমাদের সেই বাধো-বাধো ভাবটা আর গেল না। আমি ইচ্ছা করিয়াই মৌনী থাকিতাম। বোধকরি সে-ও তাহাই চাহিত। মনে-মনে ভাবিলাম, "কিছুদিন এম্‌নি করেই যাক্। এ ধাক্কাটা আগে সে সাম্‌লে উঠুক্, তারপর সময়ের শুশ্রূষায় তার মনের দাগ মনেই মিলিয়ে যাবে'খন। এখন চুপ থাকাই ভাল।"

উঃ! তার অসুখের সময়ে আমার যে কি কষ্ট গিয়াছে তা বলা যায় না!—সে কি যন্ত্রণা!—আমার বুক ফাটিয়া কান্না ঠেলিয়া উঠিত, কিন্তু পাছে কেউ শোনে সেই ভয়ে প্রাণের কান্না প্রাণেই চাপিয়া রাখিতে হইত।

যেটা সত্য সেটা না জানিয়াই যে আমার স্ত্রী মরিবে ইহা আমি মনে আনিতেই পারিতাম না। তাই তার আরোগ্যলাভে আমি যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। "আগে মনের সঙ্কোচটা যাক্—পরের কথা পরে বুঝে দেখা যাবে।"—এমনিভাবে শীতকালটা কাটিয়া গেল। এই সারা শীতটা দিল্‌দরিয়া মেজাজে কাটাইয়া দিলাম। আমারই জিৎ, আমারই জিৎ—কি আনন্দ!

ভবিষ্যতের আশা-প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া ধীরে-ধীরে শীত চলিয়া গেল।

আপনমনে বসিয়া-বসিয়া সে সেলায়ের কাজ করিত,—পিছনে বসিয়া তাহার উপরে আমি নজর রাখিতাম। এতদিনে এ বনের পাখী বুঝি বশ মানিল। আমার অমতে সে আর কোন কাজ করিত না। আগেকার মত একলা আর বাড়ীর বাহিরেও যাইত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর তাহাকে লইয়া রোজ একবার বাহিরে বেড়াইয়া আসিতাম। বেড়াইতে-বেড়াইতে আমরা নানাপ্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতাম। আমি যে তাকে ভালবাসি, ঠারেঠোরে এটাও জানাইয়া দিতাম। আমার ইচ্ছা,—অতীতকে সে মন হইতে একেবারে চাঁচিয়া ফেলুক!

তবে, একটা ব্যাপার আমার চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল। এখন তাহার দিকে আমি গোপনে চাহিয়া থাকি বটে,—কিন্তু তাহার সে চুরি-করা চাহনি আর দেখিতে পাই না কেন? কই, সে ত আর—তেমন চোখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহে না!—এ কি লজ্জা, এ কি সঙ্কোচ?

ভাবিলাম, "ধৈর্য্য ধরে থাকাই ভাল। পাখী যখন পোষ মেনেছে, তখন আর ভাবনা কিসের! সে ত আমারই। দেখব, হঠাৎ সে কোন্‌দিন বুকের কাছে এসে আমাকে আত্মসমর্পণ করেচে!"

তবু, কেন জানিনা, আমার খালি মনে হইত, আমি যেন কি-একটা লুকোচুরি খেলিতেছি।

যদিও তাহার আলাদা বিছানা করিয়া দিয়াছি, যদিও তাহার সেদিনকার অপরাধ বড় সামান্য নহে,—তবু তাহার যে পাপ আছে, ইহা আমি ভাবিতেও পারিতাম না। সে বশ মানাতে আমি যে খুব

খুসি হইয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সময়-সময় তাহার এই অসহায়, করুণ আত্মসমর্পণ দেখিয়া আমার মনটা যেন কেমন-কেমন করিত।

যাহা হউক, এই সময়টুকুর মধ্যে আমি দুইচারিটা ভাল কাজ করিয়াছি। আমি দুজন অক্ষম ঋণীর টাকা ছাড়িয়া দিয়াছি, কোন জিনিষ বাঁধা না রাখিয়াই একটি রমণীকে টাকা ধার দিয়াছি।

স্ত্রীকে আমি নিজে এ-সব কথা বলিলাম না; কারণ তাহার মন রাখিতে ত আমি এ দয়ার মুখোস পরি নাই! কিন্তু একদিন সেই উপকৃত রমণীটি আসিয়া আমাকে তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে জানাইয়া গেল। ফলে, সব কথা জাহির হইয়া পড়িল। শুনিয়া আমার স্ত্রী সত্যই আনন্দিত হইল।

শীতের পর আসিল সবুজ বসন্তের নবীন-শ্রী। তপ্ত সূর্য্যকরে আমাদের বাড়ীর নিভৃত ঘরগুলি উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আলোকের পিছনে যে কিসের অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ছিল, তখন তাহা লক্ষ্য করি নাই। সে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রলয়ের শিখা গুপ্ত ছিল—যেদিন দিব্যদৃষ্টি পাইলাম, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিলাম।

যাহা ঘটিল, সে কি নিয়তির অমোঘ বিধান? তাহা কি আকস্মিক নহে? বলিতে পারি না।

এত-দৈবাৎ যে এমন ঘটিবে, কে তাহা জানিত? ঘটনাটা ঘটিল সন্ধ্যাকালে, খাওয়া-দাওয়ার পর.........

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিব্যদৃষ্টি

ঘটনাটি খুবই সামান্য। আজ মাসাবধি আমার স্ত্রী কেমন-যেন আন্‌মনা হইয়া আছে। সে আর মৌনী নয় বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই উদাস মনে কি-যেন ভাবিতে থাকে। তার এই বিষণ্ণ ভাবটা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম।

সেদিন সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া শেলাই করিতেছিল। আমি যে তাহার পানে তাকাইয়া আছি, সেদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ আমার মনে হইল, তাহার মুখ কেমন বিবর্ণ, চেহারা কেমন রুগ্ন। আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বিশেষ, আজকাল মাঝে মাঝে সে কাসিয়া উঠে—ভিতরে হয়ত কোন কঠিন রোগ হইয়াছে। তাহাকে কোনকথা না জানাইয়া আমি তখনি ডাক্তারকে খবর দিলাম।

ডাক্তার আসিলেন। সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া একবার ডাক্তারের আর-একবার আমার মুখের দিকে ঘন-ঘন তাকাইতে লাগিল।

তারপর শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার ত কিছু হয় নি!"

ডাক্তার আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনি যদি শীঘ্রই ওঁকে হাওয়া বদ্‌লাতে নিয়ে না যান, তাহলে একটা বিপদ ঘট্‌তে পারে। সমুদ্রের ধারে যেতে পারেন ত ভালই, নইলে অন্য-কোন ভাল জায়গায়।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আমার স্ত্রী কিছুক্ষণ আমার দিকে গম্ভীরমুখে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "সত্যি বল্‌ছি, আমার কিছু হয়-নি।"—কিন্তু বলিতে-বলিতে তাহার মুখ কি-এক লজ্জার বেদনায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমি সমস্ত বুঝিলাম!

সে অতবড় একটা অপরাধ করিলেও, আমি যে তাহাকে ত্যাগ করি নাই, আমি যে তাহাকে ভালবাসি, যত্ন কার, —ইহা ভাবিয়া নিজের প্রতি হয়ত তাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে!

বসন্তের এক রৌদ্ররঙ্গিন প্রভাতে দোকানে বসিয়া কাযকর্ম্ম দেখিতেছিলাম। হঠাৎ পাশের ঘর হইতে মৃদু গীতের সুর উঠিল। আমার স্ত্রী গান গায়িতেছে! কেন জানি না, তাহার গান শুনিয়া আমি যেন কেমন দমিয়া গেলাম। বিবাহের পর প্রথম-প্রথম তাহাকে গান গায়িতে শুনিয়াছি বটে,—কিন্তু প্রথম মিলনের চঞ্চল আনন্দই সে সঙ্গীতের কারণ। ইদানিং ত সে আর গান গায়িত না!

তখনকার সেই আনন্দ-সঙ্গীতে একটা গভীর শান্তি, পরিপূর্ণ আশা, অটুট স্বাস্থ্যের আভাস পাইতাম—কিন্তু,—আজি-কার এ সঙ্গীতে, যেন এক পীড়িত, তাপিত হতাশ অন্তরের বেদনা ক্রন্দনের ছন্দে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে! গানের সুর ক্রমে চড়িতে লাগিল,—তারপর, গানের মাঝখানে হঠাৎ সেই বেদনা-করুণ কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া সুরও থামিয়া গেল! শুনিলাম, সে কাসিতেছে। কাসি থামিলে আবার গান সুরু হইল,—

এবার বড় ধীরে, মৃদুগুঞ্জনে, শোনা যায়-কি, না-যায়।........

আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। আমার এ অস্থিরতার কারণ কেহ বুঝিবে না! দুঃখ? তাহার জন্য আমার এতটুকুও দুঃখ হয় নাই! গান শুনিতে শুনিতে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। আর বিস্ময়! বিস্ময় ও সন্দেহ! তাহা যেমনি তীব্র, তেমনি ক্রূর! "সে গান গায়িতেছে! অ্যাঁ! আমার সামনেই গান গায়িতেছে!

আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। তবুও অচল পাথরের মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। উঠিবার শক্তি ছিল না—পৃথিবী চোখের আড়ালে কোথায় সরিয়া গিয়াছিল! খানিক পরে কোনরকমে উঠিয়া পাগলের মত বাহির হইলাম। কোথায় যাইতেছি, হুঁস ছিল না—সহসা লুকেরিয়াকে সম্মুখে দেখিয়া ডাকিলাম, "লুকেরিয়া—"

লুকেরিয়া বিস্ময়ে আমার পানে চাহিল। আমি কহিলাম, "তোমার দিদিমণি গান গাইছে? না?"

লুকেরিয়া কোন জবাব দিল না—কেমন-এক ভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি রোজ এম্‌নি গান গায়, না এই প্রথম?"

লুকেরিয়া কহিল, "দিদিমণি মাঝে মাঝে একলা বসে গান করেন বটে, কিন্তু আপনি বাড়ী থাক্‌লে কৈ তাঁকে ত' গাইতে শুনি নি!"

আমি অস্থিরপদে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। পথের লোকগুলা আমার গায়ে ধাক্কা মারিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে

দিকে আমার লক্ষ্যই ছিল না—আমি তখন একেবারে অসাড়! রাস্তা দিয়া একখানা গাড়ী যাইতেছিল, আমি তাড়াতাড়ি তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। কিন্তু খানিকদূর গিয়াই নামিয়া পড়িলাম। গাড়োয়ানের হাতে একটা টাকা দিয়া অর্থশূন্য হাস্য করিয়া বলিলাম, "এই নাও তোমার ভাড়া!"

তাড়াতাড়ি আবার বাড়ীতে ফিরিলাম।

আমার মর্ম্মের মাঝে সেই তীক্ষ্ণ করুণ সুরটি তখনও তীরের ফলা'র মত বিঁধিয়া ছিল। আমার সাক্ষাতে আমাকেই ভুলিয়া সে যখন গান গায়িতে পারে, তখন আর কি মঙ্গল আছে?

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সে তখনও সেইখানে বসিয়া শেলাই করিতেছে। সে তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু এখন আর গান গায়িতেছে না। হঠাৎ কেহ ঘরে ঢুকিলে লোকে যেমন মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখে, লোকটা কে, —সে-ও তেমনিভাবে একবার আমার দিকে চাহিয়া আবার নিজের কাজে মন দিল।

অভিভূতের মত আমি তাহার পাশে গিয়া বসিলাম। সে ভয়ে-ভয়ে আবার আমার দিকে তাকাইল। আমি তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া দু-চারিটা কথা কহিলাম; কিন্তু আমার আলাপের সে চেষ্টা বিফল হইল;—কারণ, আমি যাহা বলিলাম তাহা যেমন অর্থহীন, তেমনি অসংলগ্ন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শেষে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম।

থাকা বড় দায়। কাজেই খানিকপরে মৃদু স্বরে বলিলাম, "এস আমরা গল্প করি। তুমি এমন চুপচাপ কেন?"

সে কাঁপিয়া উঠিল। তারপর একটু তফাতে সরিয়া বসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভয়ের একটা চমক খেলিয়া গেল,—মুখে চোখে বিস্ময়ের আভাস!

"তুমি কি এখনো আমায় ভালবাস— এখনো?"—মুখ ফুটিয়া এ-কথা সে বলিল না বটে,—কিন্তু তাহার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই যে জাগিয়া উঠিয়াছে, আমি তাহা বেশ বুঝিলাম।

আর আমি সহিতে পারিলাম না— একেবারে তাহার পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলাম। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল —কিন্তু আমি আগ্রহের সহিত তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিলাম।

এক আকস্মিক আনন্দের উচ্ছ্বাসে হৃদয় আমার ভরিয়া গেল—আমি পাগলের মত তার ছোট ছোট পা-দুখানি বুকের ভিতরে চাপিয়া ঘন-ঘন চুম্বন করিতে লাগিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমার প্রাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোখে অশ্রুর বন্যা ছুটিল,—আমি কথা কহিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না।

তাহার মুখের উপর হইতে ভয় ও বিস্ময়ের ভাব সরিয়া গেল। তাহার পায়ে চুম্বন করাতে লজ্জায় সে আকুল হইয়া উঠিল, সলজ্জ মৃদুহাস্য করিয়া আমার আলিঙ্গন হইতে পা দুইখানি সে ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া লইল।

কিন্তু, আমার প্রাণের কপাট তখন

যেখানে তাহার পা-দুটি ছিল, সেই জায়গাটি চুম্বন করিয়া উপুড় হইয়া আমি পড়িয়া রহিলাম। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম, "আমি তোমায় ভালবাসি—ওগো, তোমায় ভালবাসি!"

—লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া সে তেমনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমি বলিলাম, "অমন নিষ্ঠুরের মত সরে যেওনা সরে যেওনা—কাছে এস, বুকে এস!"

বাতাসে থর্‌থরে ফুলের চারার মত তাহার ছোট দেহখানি কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে-কাঁপিতে শেষটা সে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর সেই সজল, ডাগর চোখদুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া, সেই কম্পমান করে আমার হাতদুটি ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "শান্ত হও—অমন কোরোনা, তোমার পায়ে পড়ি!" —অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠ আবার বন্ধ হইয়া গেল।

কক্ষতলে বসিয়া বসিয়া নিষ্পলকনেত্রে আমি দেখিতে লাগিলাম, আবেগে উত্তেজনায় ধীরে ধীরে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে!

তাহাকে কোলে করিয়া বিছানার উপর লইয়া গেলাম। সেদিন সারাসন্ধ্যা আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া রহিলাম।

যখন তাহার জ্ঞান হইল, আমি বলিলাম, "দেখ, বেশ বুঝ্‌ছি তোমার অসুখ হয়েছে। এখানে থাক্‌লে তোমার অসুখ বাড়বে বৈ কম্‌বে না। আমি হয় দোকানপাট তুলে দি, নয় আর কারুকে বিক্রী করে ফেলি; তারপর চল, তোমায় নিয়ে আমি হাওয়া বদ্‌লাতে যাই। সেখানে গিয়ে আবার নূতন করে সংসার পাতব, নূতন করে জীবন গড়ব!"

তখনও সে ভয়ে-ভয়ে আমার কথা শুনিতে লাগিল—কিন্তু উত্তরে একটিও কথা কহিল না, একটিও না।

আবার তাহার চরণতলে আপনাকে লুটাইয়া দিবার জন্য একটা প্রবল আবেগ আমার বুকের মধ্যে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

বলিলাম, "আর কিছু চাই না আমি! —সেই নূতন সংসারের এককোণে একটু যদি আশ্রয় পাই, তাহলেই বর্ত্তে যাব। ভক্ত যেমন করে দেবীর পানে চেয়ে থাকে, দূর থেকে তেমনি করে আমি তোমার পানে চেয়ে থাক্‌ব, সুধু চেয়ে থাক্‌ব!"

উত্তরে, তাহার কপোলে অবাধ অশ্রুর ধারা ছুটিল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি ভেবেছিলুম, আমার উপর তুমি আর বুঝি সদয় হবে না!"

একি কথা!—কে-যেন আমার বুকটা ছুরি-দিয়া চিরিয়া দিল! তাহার এই কথায় আমি সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। না জানিয়া তাহার প্রাণে কি ব্যথাই দিয়াছি!

সেদিন সে আমার সামনে তাহার মনের কত কথাই খুলিয়া বলিল! আমি তাহাকে বাধা দিলাম না; কারণ, তাহার এই আত্মপ্রকাশের উপরই আমার সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে! অবশেষে, কথা বলিতে বলিতে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে ঘুমাইতে বলিলাম।

সে শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু

উত্তেজনার ফলে আবার সামান্য জ্বর আসিল।

আমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে পারিলাম না। সে কেমন আছে, তাই দেখিতে সারারাত ক্রমাগত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছি, তাহার রোগশান্তির জন্য কতবার ভগবানকে ডাকিয়াছি! কাল হইতে আমাদের নূতন জীবন,—কি আনন্দ! সাগ্রহে আমি প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।—"কাল আমি তার কাছে সব কথা খুলে বল্‌ব, সে-ও সব বুঝতে পারবে, তার সন্দেহ ঘুচে যাবে!"—এই আত্মস্বীকারে আমাদের নূতন জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে। আজ আমার প্রাণ অতীতের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে—সে সুধু চাহে, নূতন প্রভাত—নূতন জীবন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভোরের বেহাগ!

হাসিমুখে সে আমার কথা শুনিতে লাগিল বটে, কিন্তু তবু তার লজ্জা গেল না, ভয় ভাঙ্গিল না।—হাঁ, তাহার ভয় সঙ্কোচ আরও বরং বাড়িয়া উঠিল।—ইহাই ত স্বাভাবিক! এতদিনের 'মনান্তরে'র ফলে পরস্পরের কাছ হইতে অনেক তফাতে গিয়া পড়িয়াছিলাম; একদিনের চেষ্টায় কি এতদিনের ভাঙ্গা মন কখনো যোড়া লাগে? সুতরাং তাহার ভয়সঙ্কোচ আমি ততটা গ্রাহ্য করিলাম না। এই খানেই আমার ভ্রম হইল।

সেদিন সকালে আমি তার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করিলাম, এতদিন তার সঙ্গে সরল ব্যবহার করি নাই বটে; এতদিন তার প্রেমে আমার সন্দেহ ছিল; কেবল তাহাকে কষ্ট দিবার জন্যই বিবাহ করিয়াছি, ইত্যাদি, ইত্যাদি!

সে সকাতরে আমার হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "ওগো, থাম থাম—অমন-করে আর বোলো না!"—আবার সে কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম, "না না—নূতন জীবন চাই, নূতন জীবন! বসন্ত-প্রভাতের নূতন সূর্য্য আমাদের নূতন পথ দেখাবে—নূতন জীবন, নূতন আলো!"

আমার দোকান বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। স্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করিলাম, ভ্রমণের খরচের জন্য নিজেদের হাতে কিছু টাকা রাখিয়া বাদবাকি সব গরীব-দুঃখীদের বিলাইয়া দিব। ফিরিয়া আসিয়া সৎপথে আবার নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করিব।

সে কোন জবাব দিল না, কেবল একটু হাসিল। পাছে আমি বিরক্ত হই, তাই এ হাসি। আমার এই অনর্গল বাক্যস্রোতে মনে-মনে নিশ্চয়ই সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—এত কথার-উপর-কথা তাহার ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু ভবিষ্যতের আনন্দে আমি তখন বিহ্বল, আত্মসংযমের শক্তি আমার ছিল না।

দিন-রাত তার পাছে-পাছে লাগিয়া থাকাটা আমার ভাল হয় নাই। আমার এই উচ্ছ্বসিত আনন্দে বোধ করি সে বড়ই অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করিত। সেদিন অন্ধ আবেগে তাহার পায়ে চুম্বন করিয়া-

ছিলাম বটে, কিন্তু আজ বুঝিতেছি, আমার পক্ষে সেটা অত্যন্ত ছেলেমানুষি হইয়াছিল! তবু, এত বুঝিয়াও আমি আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিলাম না।

একদিন কথায় কথায় তাহার কাছে জুলিয়াদের বাড়ীর সেই ঘটনার কথা তুলিলাম। বলিলাম, "ওঃ, এফিমোভিচকে তুমি আচ্ছা জব্দ করেছিলে যাহোক! তুমি যে এত ভালো, এমন সরল অথচ রসিক, আগে আমি তা বুঝি-নি!"

সে শিহরিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, "এ-কথা তুমি বাড়িয়ে বল্‌ছ!"

তারপর দেখিতে-দেখিতে তাহার মুখ যেন কালির মত হইয়া গেল। দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। আবার আমি আত্মহারা হইয়া তাহার পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলাম, তাহার পা-ধরিয়া ঘন-ঘন চুম্বন করিতে লাগিলাম। আবার সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। এটি কালকের ঘটনা—তার পর দিন সকালে—

তার পর দিন সকালে! আমি কি বলিতেছি! এ' ত পরদিনের সকালের কথা নয়—এযে আজ সকালের কথা!—কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এই কয় ঘণ্টার মধ্যে যেন কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে!

সকালে যখন তাহার সহিত দেখা হইল, তখন সে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির, রাত্রির মত স্তব্ধ! কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া যোড়হাতে সে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি বড় পাপিষ্ঠা—যে পাপ করেছি, তার মার্জ্জনা নেই, আমার মনের সব শান্তি ঘুচে গেছে! তোমার মহত্ব, তোমার দয়া আমি কখনো ভুল্‌তে পারব না—আজ থেকে তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাসী! তোমার পায়ের তলায় সারা জীবন দাসীর মতই আমি পড়ে থাকব!"

একলাফে উঠিয়া পাগলের মত আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। এবং তাহার কপোল অধরে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিলাম;—আজ আমি আবার আমার স্বামীত্ব ফিরিয়া পাইয়াছি!

তারপর বিদেশ-যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলাম।—সেই বাহির-হওয়াই আমার কাল হইল। হা পরমেশ্বর, পাঁচ মিনিট—আর পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে যদি ফিরিতে পারিতাম! ওঃ! ফিরিয়া সে কি দৃশ্য দেখিলাম? বাড়ীর দ্বারে সেই জনতা—আমার প্রতি সকলের সেই দৃষ্টি, সেই নিষ্ঠুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি!—হা ভগবান……

লুকেরিয়ার মুখে সব শুনিয়াছি। আমি ফিরিয়া আসিবার কিছু পূর্ব্বে লুকেরিয়া আমার স্ত্রীর কাছে গিয়াছিল। সে তখন প্রার্থনার ভঙ্গীতে যোড় হাতে দাঁড়াইয়া ছিল।

লুকেরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ দিদিমণি?"

সে বলিল, "কিছু না! তুই এখন এখান থেকে যা। না, না—একটু দাঁড়া দেখি!"—এই বলিয়া আমার স্ত্রী লুকেরিয়ার কাছে গিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিল।

লুকেরিয়া বলিল, "দিদিমণি, এখন বুঝি মনে খুব আনন্দ হচ্ছে!"

"হাঁ, লুকেরিয়া।"

"বাঁচলুম, এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন!"

—"হ্যাঁ,—এখন তুই যা-দেখি লুকে-রিয়া!"—এই বলিয়া আমার স্ত্রী এমন ভাবে হাসিল যে লুকেরিয়ার মনে ভয় হইল। ঘরের বাহিরে গিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। খানিকক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিল।

জানালার উপরে হাত রাখিয়া এবং হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে তখন দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন; আপন ভাবে সে এমন বিভোর ছিল যে, ঘরের মধ্যে লুকেরিয়া আসিয়াছে, এটা তাহার খেয়ালও হয় নাই।

নিজের মনে কি-ভাবিয়া হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল। তাহার ভাব-গতিক কিছু বুঝিতে না পারিয়া লুকেরিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

তারপর যখন লুকেরিয়া ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত, তখন জানালা-খোলার শব্দ হইল। সেদিন বড় কন্‌কনে বাতাস বহিতেছিল; জানালা খুলিলে পাছে আমার স্ত্রীর ঠাণ্ডা লাগে, সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি আবার ঘরে ঢুকিল।

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই লুকেরিয়ার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! আমার স্ত্রী তখন জানালার আলিসার উপর উঠিয়া দাঁড়াই-য়াছে,—হাত-দুটি তার যোড়-করা!

রুদ্ধশ্বাসে লুকেরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদিমণি, দিদিমণি!"

লুকেরিয়ার সাড়া পাইয়া প্রথমটা সে ফিরিয়া দাঁড়াইতে গেল;—কিন্তু ফিরিতে ফিরিতে থামিয়া, হাতদুটি যোড় করিয়াই জানালা হইতে একেবারে বাহিরে লাফাইয়া পড়িল!

আমি আঙিনায় গিয়া দাঁড়াইবা মাত্র প্রথমটা সকলে বিষম গোলমাল করিয়া উঠিল—তারপর, আমাকে পথ ছাড়িয়া দিল। চারিদিক আবার স্তব্ধ।

তখনও তাহার দেহ শীতল হইয়া যায় নাই। তাহার মরণান্ধ চক্ষুদুটি আমার দিকেই ফিরানো ছিল,—সে দৃষ্টি ভুলি নাই, আমি ভুলি নাই!—আর, তার হাতদুটি!—তখনও তাহা যোড়-করা,—যেন-সে প্রার্থনা করিতে করিতেই অনন্ত তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে!

আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি! আমার চোখে পলক নাই—আশেপাশে লোকজনেরা আনাগোনা কানাকাণি করিতেছে,—আমি কিন্তু সেই ভূপতিতা ভগ্নপ্রতিমা ছাড়া আর-কিছু দেখিতে শুনিতে পাইতেছি না!

হঠাৎ শুনিলাম, কে-একজন লোক বলিয়া উঠিল, "এর মুখ দিয়ে ঐ-যে রক্ত বেরিয়েছে দেখ্‌চ, ঐ রক্তের তোড়েই দমবন্ধ হয়ে গেছে!"—লোকটা একখানা রক্তাক্ত পাথরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

তাহার হাতের আঙুলেও রক্ত! নিশ্চয় সে ঐ রক্তাক্ত পাথরখানায় হাত দিয়াছিল! রক্তমাখা আঙুল নাড়িয়া বার-বার সে বলিতে লাগিল, "এই রক্তেই ওর দমবন্ধ হয়ে গেছে, এই রক্তেই দমবন্ধ!"

অভিভূতের মত ঘুষি তুলিয়া লোকটার দিকে ছুটিয়া গেলাম,—"দমবন্ধ হয়ে গেছে! কি বল্‌ছিস্ তুই? দমবন্ধ!"

হাঃ! এ কি ভয়ানক—এ কি ভয়ানক!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঁচমিনিটের হের-ফের

এ কি অসম্ভব নয়? এই অভাগী আত্মহত্যা করিল কেন?

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝিয়াছি বটে, কিন্তু আত্মহত্যার আসল কারণটা আজও বুঝিলাম না। হইতে পারে আমার আকস্মিক প্রেমোচ্ছ্বাসে সে ভয় পাইয়াছিল। —আমাদের শেষ-দেখার সময়ে সে আমাকে বলিয়াছিল, "আজ থেকে আমি তোমার দাসী হব,"—হয়ত আপনার কথামত কাজ করিতে পারিবে না বলিয়াই ভয় পাইয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে। হ্যাঁ, তাই বোধ হয়!—বেশ বুঝা যাইতেছে আমাকে সে বিশ্বাস করিত না। হায়, যদি আগে বুঝিতাম! আমার ভালবাসায় সে ভয় পাইয়াছে, বুঝিলে কখনই আমি এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতাম না!

আচ্ছা, সে কি সত্যই আমাকে শ্রদ্ধা করিত না?—এফিমোভিচের সঙ্গে সেই ব্যাপারের পর হইতে, সে আমাকে আর ঘৃণা করিত কি না, এ-কথাটা ত একদিনও ভাবিয়া দেখি নাই! হায়, আমাকে ঘৃণা করিয়াও যদি সে বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলেও ত আমি সুখী হইতাম!

আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়াও অনায়াসেই হইতে পারিত! আমি তাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলাম, সে-ও তাই! আর দুই-চারিদিন যদি সে অপেক্ষা করিত তবে ত সব ধন্ধই মিটিয়া যাইত!

আমি দীর্ঘসূত্রী বলিয়াই এমন অঘটন ঘটিল!—আমি যদি আর পাঁচমিনিট আগে বাড়ী ফিরিতে পারিতাম, তাহা হইলে সমস্ত ব্যাপারটা হাল্‌কা মেঘের মত সরিয়া যাইত, এমন ভয়ানক সংকল্প তাহার মাথায় ঢুকিতনা। পাঁচ মিনিটের হের-ফেরে আজ আমি আবার একাকী! আজ আর এখানে কিছু নাই—আছে সুধু দুঃখ, সুধু যাতনা।

আমি ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, ঘুরিতেছি। কত সময় গিয়াছে, কিন্তু পাঁচমিনিটের হেরফের লইয়া কেন আমি এত মাথা ঘামাইতেছি, তোমরা কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? ভাবিয়া দেখ, যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহারা নিরীহ-নির্দ্দোষকে বাঁচাইবার জন্য মৃত্যুর আগে প্রায়ই লিখিয়া রাখিয়া যায়, "আমার মৃত্যুর জন্য আর কেহ দায়ী নহে!"—সে কিন্তু এরূপ কিছুই লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই। মৃত্যুর সময়ে লুকেরিয়া তার সঙ্গে ছিল। সুতরাং লুকেরিয়াকে লোকে দুষিতে পারিত। ভাগ্যে রাস্তার চারজন লোক আমার স্ত্রীকে আত্মহত্যা করিতে দেখিয়াছিল, বেচারী লুকেরিয়া তাইত এ যাত্রা মানে মানে বাঁচিয়া গেল! আমার স্ত্রী যে কিছু লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই, ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, আত্মহত্যার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সে প্রস্তুত ছিল না। জানালার ধারে যখন একলা সে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, তখনই হঠাৎ তাহার মাথায় মৃত্যুর কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে। মনের ঝোঁকে মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়াই এ কাজ সে করিয়া ফেলিয়াছিল। পীড়ায় দুশ্চিন্তায় তাহার জীবনী-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছিল, মনের উপর তার কোন জোর ছিল না। তা-নহিলে, এখন হয়ত সে জীবন্ত অবস্থাতেই আমার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি থাকিলে সে মরিত না—কখনই মরিত না! পাঁচ-মিনিটের হের-ফের!

তাহার ঐ মৃতদেহ এখন কি কঠোর দেখাইতেছে! চোখের পাতাগুলি ঠিক তীরের মত তার গালের উপর নত হইয়া আছে। তার মাথা ফাটে নাই, শরীরের কোথাও এতটুকু হাড় ভাঙ্গে নাই। ভিতর হইতে রক্ত ছুটিয়া অভাগীর দমবন্ধ করিয়া দিয়াছে,—সে রক্তও একঝলক মাত্র!

তাহাকে যদি আমি কবরে লইয়া যাইতে না দি? সকলে যদি তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া যায়,—ওঃ, এ-কথা ভাবিতে গেলেও যে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়! কিন্তু তাকে লইয়া যাইবে—লইয়া যাইবেই! —ওগো, আবার আমার বাড়ী পোড়ো-বাড়ীর মত হইয়া থাকিবে, আবার আমার ঘরদুখানা শূন্যতায় হা-হা করিবে, আবার আমাকে দোকানে বসিয়া একা কাজ করিতে হইবে—এ চিন্তাও যে অসহ্য!

প্রিয়তমে, তুমি অন্ধ—তুমি অন্ধ! আজ তুমি মৃত,—আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না! সে-কেমন নন্দনকানন গড়িয়া তাহার মাঝখানে তোমাকে রাখিতাম, তাহা না বুঝিয়াই তুমি চলিয়া গেলে! এ হৃদয়ে ভালবাসার যে ফুল অজস্র ফুটিয়া উঠিত, সে ফুলে আমি তোমারই পূজা করিতাম। হয়ত আমাকে তুমি কখনই ভালবাসিতে না—না-ই ভালবাসিলে? তুমি আমার বুকের কাছে-কাছে সুধু বন্ধুর মতই থাকিতে পারিতে ত! সুধু চোখে চোখ মিলাইয়াই মনের সুখে আমরা দুটিতে ঘরকন্না করিতাম! তোমার পথে আমি আমার ছায়া ফেলিতাম না—দূর হইতে আমি সুধু তোমারই পানে চাহিয়া থাকিতাম, নীরবে চাহিয়া থাকিতাম! একবার যদি আমার পানে তুমি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে—তবে, তবে,—সেই এক মুহূর্ত্তের দিব্যদৃষ্টিতে আমার বুকের সব অন্ধকার মিলাইয়া যাইত! আমাকে তুমি বুঝিতে পারিতে!

হায়রে শূন্যতা, হায়রে প্রকৃতি! লোকে বলে, সূর্য্যোদয়ে বিশ্ব জীবন্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সে সূর্য্যও কি প্রাণহীন নহে? এ নিখিল যে নির্জীব,—এখানে মানুষের মধ্যেও জীবনের কোন লক্ষণ নাই—কেবল এক গভীর স্তব্ধতা সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে!—এই ত জগৎ! "হে মানব, পরস্পরকে ভালবাস!"—এ-কথা কে বলিয়াছে—এ কার হুকুম?

রাত এখন দুইটা।—মূঢ়ের মত, হিংস্রের মত ঘড়ির দোলকটা দুলিতেছে, ঠক্ ঠক্ ঠক্! এ ঠক্‌ঠকানির বিরাম নেই! বিছানার উপর তাহার গায়ের আলোয়ান-খানি পড়িয়া রহিয়াছে!—ও যেন তার-ই পথ চাহিয়া আছে, ও যেন তাহারই ছোট তনুখানি আলিঙ্গন করিবার জন্য উন্মুখ!

কিন্তু... ... কাল যখন উহাকে কবরে লইয়া যাইবে, তখন আমি কি করিব! আমার দশা কি হইবে?

সমাপ্ত

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাদ্রাজে বিজ্ঞান-সম্মিলন

গতবৎসর (১৯১৫) জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় বিজ্ঞান-সম্মিলন উপলক্ষ্যে আমাদের মাদ্রাজ গমনের প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সি, ভি, রমন মহাশয়। ইনি মাদ্রাজবাসী; কলিকাতায় Assistant Accountant General-এর কাজ করেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় ৺মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত Indian Science Associationএ পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করিয়া থাকেন। ইনিই আমাদের মাদ্রাজে থাকিবার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইলেন, এবং ডাঃ পি, সি, রায় ও ডাঃ ডি, এন, মল্লিককেও পাকড়াও করিলেন। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক আমরা তিনজনেই এই সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম।

মাদ্রাজ রওনা হইবার আগে মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ South Indian Association হইতে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান-সম্মিলনের সম্পাদক ডাঃ সাইমনসেনকর্ত্তৃক আমি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম।

যথাসময়ে মাদ্রাজ যাত্রা করিলাম। রাস্তায় দেখিবার জিনিস অনেক, তন্মধ্যে প্রধান চিল্কাহ্রদ। পথে একটা জিনিস চক্ষে বড়ই ঠেকিল, আমরা ক্রমশঃ যতই মাদ্রাজ প্রেসি-ডেন্সীতে অগ্রসর হইতেছিলাম তালবৃক্ষের



"তালীবনরাজিনীলা"

সারি ততই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন, রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনায় কালিদাসের উল্লিখিত "তমালতালীবনরাজি-নীলা" লবণাম্বুরাশির বেলাভূমির কথা মনে পড়িল। তাইত দূরে "বেলা লবণাম্বুরাশি" আর এই তালবৃক্ষের অফুরন্ত শ্রেণী! এই পথেই ত রঘু দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলেন! এত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পথে একটা বড় বিঘ্ন এই ছিল যে আমাদের মধ্যে বটানিষ্ট না থাকাতে তমালবৃক্ষ কেহ সনাক্ত করিতে পারিলেন না।

মাদ্রাজ সহরে পৌঁছিয়াই আমাদের প্রথম কাজ হইল সমুদ্রদর্শন। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ছেলেবেলা হইতে সমুদ্রের একটা অনিন্দ্য-সুন্দর ছবি কল্পনায় মানসপটে অঙ্কিত আছে। বাস্তব জিনিসটা এ ছবির কাছে ম্লান হইয়া যাইবে কি না এ ভয় ছিল, কিন্তু সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া মনে হইল যে, নয়নসম্মুখে সমুদ্রের যে বাস্তব ছবি দেখিতেছি তাহার বর্ণনা ভাষায় সম্ভবে না, এ তরঙ্গচঞ্চল অসীম বারিধি-বিস্তারের মহত্ব ও সৌন্দর্য্য কেবল নয়ন-মনেরই উপভোগ্য।

১২ই জানুয়ারী। প্রথম দিন আমরা সি, ভি, রমন মহাশয়ের বাটীতে তাঁহাদের মেয়েদের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন আহার করিলাম। দেখিলাম, মাদ্রাজের ব্রাহ্মণের পক্ষে মাছমাংস একেবারে নিষিদ্ধ। ব্যঞ্জনে লঙ্কার ঝাল বড়ই বিষম—এমন-কি—পূর্ব্ববঙ্গের লঙ্কা-ভক্ত অধিবাসীরাও এত ঝাল খান না। তেঁতুলের অম্বল মাখিয়া লঙ্কার ঝোল দিয়া অন্নাহার শুনিলাম মাদ্রাজের একরকম প্রশস্ত আহার। মাদ্রাজে অবরোধপ্রথা না থাকাতে মেয়েরাই পরিবেষণ করিলেন। বাটীর বৌ-ঝিদের মাথায় কাপড় নাই। কিন্তু শুনিলাম বিধবারা মাথায় কাপড় দেন, যদিও ঘোমটা দেন না। দেখিতেছি অবরোধ ও জেনানাপ্রথা এক উত্তর-ভারতেই আবদ্ধ; উহা মাদ্রাজেও



সমুদ্রগামী দেশী নৌকা

নাই, বোম্বাই অঞ্চলেও নাই। তবে মাদ্রাজের মুসলমানদের মধ্যে অবরোধ প্রথা খুব প্রচলিত।

বেলা দুইটার সময়ে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখিতে গেলাম। কলেজটি সমুদ্রের ধারেই। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী তত ভাল নহে, যথেষ্ট স্থান না থাকাতে বন্দোবস্ত কতকটা এলোমেলো ধরণের। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে একজন মাদ্রাজী রিসার্চ স্কলার, সাইমনসেন সাহেবের সঙ্গে গবেষণা করিতেছেন। তিনি আমার বক্তৃতায় সহকারীর কাজ করিতে স্বতই স্বীকৃত হইলেন। ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী খুব ভালই দেখিলাম। এ ছাড়া বাইও-লজিক্যাল ল্যাবরেটরীও আছে। ল্যাই-ব্রেরীটি অতি সুন্দররূপে সাজান। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জোন্স সাহেব ও অনেকগুলি অধ্যাপকের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ত্রিবাঙ্কুর কলেজের রসায়নের অধ্যাপক গিব্ সন্ সাহেব আসিয়াছেন। ইনি সাইমনসেন সাহেবের সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর হইতেই গবেষণা করিয়া থাকেন। সাড়ে চারিটার সময় কেমি-ক্যাল ল্যাবরেটারীতে আমার এক বক্তৃতা ছিল। সাইমনসেন সাহেব সভাপতির কাজ করিলেন। সভাস্থলে প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজের অন্যান্য কলেজের বি,-এ ক্লাসের রসায়ন শাস্ত্রের অনেক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এখানে এম,-এ বা এম,-এস,-সি ডিগ্রির জন্য পঠনপাঠন হয় না। তিন বৎসরে, বি,-এ-ডিগ্রির অনারের জন্য ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ-পরীক্ষা দেয়। তবে এই অনার-ডিগ্রির পুস্তকাবলী আমাদের এম,-এর ধরণের এবং অনারপাশ-ছেলেরা দুই বৎসর পরে ২৫৲ টাকা ফি দিয়া এম,-এ উপাধি পাইয়া থাকে। বক্তৃতার পর, ছেলেদের সঙ্গে দেশের বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্পের সমবায় প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল।

ছেলেদের আগ্রহে প্রেসিডেন্সী কলেজের হোষ্টেল দেখিতে গেলাম। হোষ্টেলটি দেখিতে অতি সুন্দর—ভিতরে একটি বাগান থাকাতে উহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। ছেলেদের সৌজন্য ও ভদ্র অভ্যর্থনায় পরম প্রীত হইলাম। ছেলেরা হোষ্টেল হইতে একখানি সাময়িক পত্রিকা বাহির করিয়া থাকে। পত্রিকাখানি কেবল ইংরাজিতে লেখা। বঙ্গদেশে আজ কাল অনেক কলেজ হইতে এইরূপ College magazine বাহির হইতেছে, কিন্তু সেগুলিতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা এই দুই ভাষাতেই রচনা প্রকাশিত হয়। আমি মাদ্রাজী ছাত্র-দিগকে পত্রিকাখানিতে ইংরাজি ছাড়া তাহাদের মাতৃভাষাতেও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় না কেন জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, মাদ্রাজে ত একটি ভাষা প্রচলিত নাই; তামিল ও তেলেগু ছাড়া কলেজে "মালায়াম" ভাষাভাষীও আছেন।

সি, ভি, রমন মহাশয় আমাদের বাসের জন্য একটি বাগানবাড়ী ঠিক করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় সেইখানে পৌঁছিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা বাজারহাট

করিয়া দিল। মাদ্রাজের একজন উকিল সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমাদের যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ইহাঁর নাম মিষ্টার সুব্রমনিয়াম্। তিনি দেখিলাম বাঙ্গালীজাতির বড়ই ভক্ত। তাঁহার মতে ভারতের জাতিবৃন্দের মধ্যে বাঙ্গালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৩ই জানুয়ারী! সহর দেখিতে বাহির হইলাম। মনে করিয়াছিলাম যে মাদ্রাজ সহরটা কলিকাতার মতই বড়সড়। কিন্তু দেখিয়া বুঝিলাম কলিকাতার সঙ্গে মাদ্রাজের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কলিকাতার মত এত বড় বড় বাড়ী এত লোকজন, এত রাস্তা ঘাট, এত ভিড় মাদ্রাজে আদৌ নাই। ভবানীপুর মেটেবুরুজ প্রভৃতি কয়েকটি সহরতল্লীকে একত্র করিলে মাদ্রাজের মত দেখাইবে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রামগাড়ী আছে বটে, কিন্তু তাহা দুই একটি প্রশস্ততর রাস্তাতেই নিবদ্ধ—দেখিতেও ভাল নয়। কলিকাতার ট্রামগাড়ীতে দুইখানা গাড়ী থাকে মাদ্রাজের ট্রামে মাত্র এক খানি গাড়ী। মাদ্রাজের প্রধান দুইটি রাস্তার নাম Sea-beach Road ও Mount Road। প্রথমোক্ত রাস্তাটি অতি সুন্দর, সমুদ্রের ধার দিয়া বরাবর গিয়াছে। ইহারই উপর প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ, হাইকোর্ট, ফোর্ট সেন্ট জর্জ্জ, লাইট হাউস ও হারবার প্রভৃতি সরকারি গৃহরাজি নির্ম্মিত। একদিকে সমুদ্র ও অপর দিকে এই হর্ম্ম্যরাজিতে এই রাজপথটি অতি রমণীয়। শুনিলাম এইরূপ আর একটি রাজপথ আছে এবং ভেনিসের রাজপথের আদর্শে তাহা নির্ম্মিত। মাউণ্ট রোডের



মাদ্রাজের গোযান শ্রেণী

উপর কলিকাতা চৌরঙ্গির সাহেব-দোকানের মত অনেক দোকান আছে।

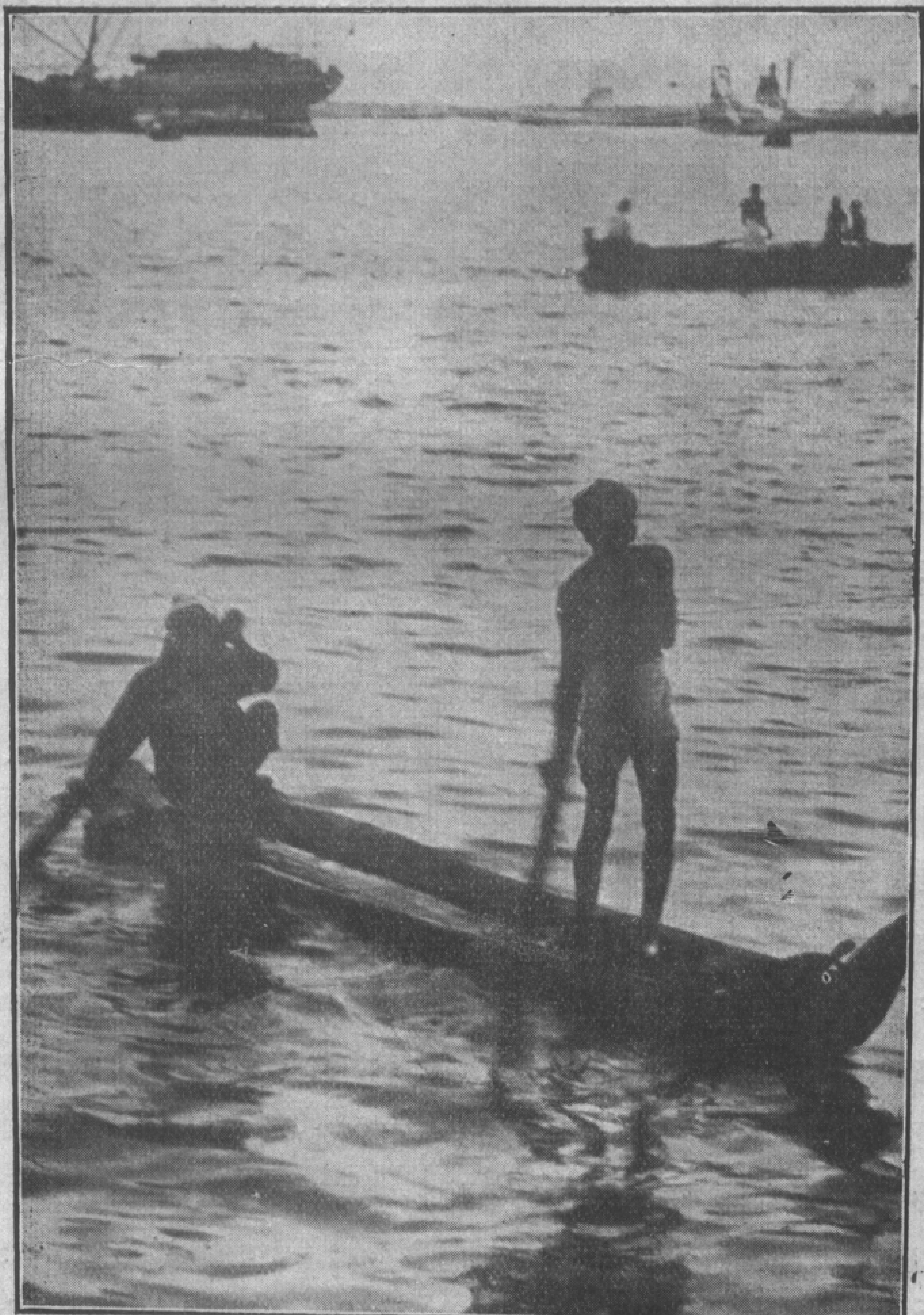
মাদ্রাজে প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান (অবশ্য সমুদ্র ছাড়া) মৎস্যাগার (aquarium)। সমুদ্রে যত প্রকার ও যত রংএর মাছ পাওয়া যায় তাহাই এখানে জীবন্ত অবস্থায় সংগৃহীত। কাঁচ-নির্ম্মিত চৌবাচ্ছায় মাছগুলি জিয়ানো। অনবরত জলের মধ্য দিয়া বুদ্বুদাকারে বাতাস চালনা করা হইতেছে। সকলে বোধ হয় জানেন না যে, পুকুর ও নদী প্রভৃতির জলে দ্রবীভূত বায়ু (dissolved air) আছে। এই বায়ুর সাহায্যে মৎস্যকুল জীবিত থাকে। সেইজন্য একোয়ারিয়ামে চৌবাচ্ছার জলে অনবরত বায়ু বদলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাছগুলির পাখ্না ও রং দেখিলে চক্ষু ফিরানো যায় না। রামধনুর সপ্তবর্ণের কথা জানি, কিন্তু এই একোয়ারিয়ামে যে কতরকম রংএর মাছই দেখিলাম তাহা বলা যায় না। আবার এই সকল রংএর কমনীয়তাও বর্ণনার অতীত। শুনিলাম সমগ্র এসিয়াখণ্ডে মাদ্রাজের মত সুন্দর 'একোয়ারিয়াম' আর একটিও নাই।

বিকালে আমার Manufacture of Iron in Ancient India সম্বন্ধে বক্তৃতা। বক্তৃতার উদ্‌যোক্তা South India Association-এর সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয়। ইনি মাদ্রাজের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন, এখন মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। সভার স্থান ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের একটি বড় হলে। সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মান্যবর Sir John Wallis মহোদয়। সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। আমরা অধ্যাপক মানুষ, কলেজে ক্লাসে বক্তৃতা করিতেই অভ্যস্ত; এত বড় সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিবার সময় যথেষ্ট হৃৎকম্প হইয়াছিল। তবে সুবিধার কথা এই ছিল যে, ইতিপূর্ব্বে বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে আমি একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। সেই পুস্তকের ছবিগুলি হইতে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি তৈরি করাইয়া সভায় ভারতের অতীত যুগের লৌহশিল্পের অদ্ভুত নিদর্শনগুলি সকলকে দেখাইবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। সভা ভঙ্গ হইলে অনেক বিশিষ্ট মাদ্রাজবাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় হইল। তাঁহারা অনেকে বলিলেন যে মাদ্রাজে বিজ্ঞানচর্চ্চা নাই বলিলেই হয়, বিজ্ঞান-সম্মিলন উপলক্ষে আমরা যে সুদূর বাঙ্গালা দেশ হইতে মাদ্রাজে আসিয়া বিজ্ঞানানুশীলনে সাহায্য করিতেছি, তাহাতে আমরা মাদ্রাজবাসীদের ধন্যবাদের পাত্র, ইত্যাদি।

১৪ই জানুয়ারী—আজ সম্মিলনের প্রথম দিন। বেলা ১০টার পর সম্মিলন বসিবে। প্রাতে খানিকটা সহর ভ্রমণ করিয়া লইলাম। মাদ্রাজবাসীদের গায়ের রং কি-রকম, অনেক বন্ধুবান্ধব আমাকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। কলিকাতায় যে-সকল মাদ্রাজী দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশই কালো। মাদ্রাজে দেখিলাম যে, ইতর শ্রেণীর লোকেরা খুব কালোই বটে, তবে ভদ্রশ্রেণীর লোকেদের—বিশেষতঃ মাদ্রাজী ব্রাহ্মণদের গায়ের রং বাঙ্গালীদের গায়ের

রংএরই মত। ইঁহাদের মধ্যে অনেককেই গৌরবর্ণ দেখিলাম। মাদ্রাজে পোষাকের সঙ্গে নেকটাইয়ের বড় চলন। অনেক ছাত্রের পায়ে জুতা নাই, পরনে ধুতি, মাথা অর্দ্ধেক কামানো; কিন্তু সার্টের উপর নেক্‌-টাই ঠিক লাগানো আছে! হ্যাটের বড় রেওয়াজ নাই—মাদ্রাজী পাগড়ীই সবিশেষ প্রচলিত।

সম্মিলন বসিয়াছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের একটি ঘরে। সম্মিলনে বহু ইংরাজ ও মাদ্রাজবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়কে উপস্থিত দেখিলাম। কিন্তু সম্মিলনের উদ্‌যোক্তারা একটা মস্ত ভুল করিয়াছিলেন—তাঁহারা ছাত্রদিগের জন্য কোন রূপ বিশেষ বন্দোবস্ত করেন নাই। টিকিটের মূল্য ৫৲ টাকা দিয়া অবশ্য ছাত্রেরা আসিতে পারে না। এবারকার লক্ষ্ণৌয়ের তৃতীয় সম্মিলনে ছাত্র-দিগের জন্য এক টাকার টিকিট করাতে অনেক ছাত্র সম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিল! সে যাহা হউক



সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার "কাটামারাণ" নামক নৌকা

সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হইলে মাদ্রাজের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড সম্মিলনের পৃষ্ঠপোষকরূপে একটি সুন্দর বক্তৃতার দ্বারা প্রতিনিধিবর্গকে মাদ্রাজের পক্ষ হইতে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মাদ্রাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তারের জন্য রিসার্চ স্কলারশিপের প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন জানাইলেন এবং সম্মিলনের বিভিন্ন বিভাগে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ একত্রে প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন দেখিয়া তিনি আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর সম্মিলনের সভাপতি Sergeon-General Bannermann মহোদয় তাঁহার সম্ভাষণ পাঠ করিলেন। এই সম্ভাষণে চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট এ-বিষয়ে কি করিতেছেন, তাহাও বিবৃত করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের সম্ভাষণ পঠিত হইলে সম্মিলনের সাধারণ অধিবেশন শেষ হইল। তাহার পর বিভাগীয় অধিবেশন হইবে। অদ্য কেবল কৃষি-বিভাগের অধিবেশন হইল। এই বিভাগের সভাপতি ছিলেন পুনা এগ্রিকালচার্যাল কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাঃ হেরল্ড ম্যান। তিনি তাঁহার সম্ভাষণে এই কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতের কৃষকের লাঙ্গলাদি যন্ত্র তাহার স্বল্প ভূমি কর্ষণের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং তাহার প্রধান অভাব জল। এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে ভারতীয় কৃষকগণকে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইতে হয়। অতএব কৃষির উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে ক্ষেত্রের জল সরবরাহের ব্যবস্থা। যেখানে irrigation canal সম্ভবপর নহে, সেখানে artesian wells খনন করিয়া ক্ষেত্রে জলের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এরূপ উপায়ের দ্বারা আফ্রিকার অনেক মরুময় প্রদেশকে শস্য-শ্যামল করা হইয়াছে। কৃষি-বিভাগে অতি অল্পসংখ্যক প্রবন্ধই পঠিত এবং আলোচিত হইল।

বৈকালে আমার বক্তৃতার কথা ছিল। এই বক্তৃতার আয়োজনও South Indian Association-ই করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Development of Synthetic Chemistry & Elucidation of Material Creation। সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজ এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সুযোগ্য সদস্য মিষ্টার (এখন Sir) শিবস্বামী আয়ার মহোদয়। বৈকাল হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি হইতে ছিল। বৃষ্টির মধ্যেই সভায় উপস্থিত হইলাম। এ-দিনও যথেষ্ট লোক-সমাগম দেখিলাম এবং অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মাদ্রাজ-বাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় হইল।

বক্তৃতায় প্রদর্শনীর অনেকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল—সেগুলি সাইমনসেন সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ধার দিয়াছিলেন। সভার সহকারীর কাজ করিয়াছিলেন রসায়নের রিসার্চ-স্কলার শ্রীমান নায়েক।

পর দিবসে কথা-প্রসঙ্গে শুনিলাম যে, এই বক্তৃতায় একটি মন্তব্য সভাপতি মহাশয়ের অপ্রীতিকর হইয়াছিল। আমি একস্থানে হীরকের রাসায়নিক স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম "Also for the vanity of man-kind the chemist has

been able to show that diamond, the most precious of all substances, is nothing but a variety of charcoal, one of the least precious substances in the world. এখন, আমি দেখি নাই যে, সভাপতি-মহাশয় দুই কানে সোনার মাকড়িতে দুই খণ্ড হীরক পরিয়াছিলেন। শুনিলাম এইরূপ মাকড়ি পরা মাদ্রাজে পুরুষ-মহলে প্রচলিত। সভাপতি-মহাশয় বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহারই কানের হীরক লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকেই Vain বলিয়াছি! আমি ব্যাপারটা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না এবং আমার সংবাদদাতা মহাশয়কে বলিলাম, তিনি যেন সভাপতি মহাশয়কে বলেন যে, আমি তাঁহার হীরকের মাকড়ি পরিধানের কথা আদৌ অবগত ছিলাম না।

১৫ই জানুয়ারী—অদ্য Physics, Chemistry, Botany প্রভৃতি বিষয়ে সম্মিলনের বিভাগীয় সভার অধিবেশন। ১০টার পর সভা বসিবে। সভায় গিয়া দেখিলাম যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের এক এক ক্লাসে এক একটি শাখার অধিবেশন হইয়াছে। আমি রসায়ন শাখার অধিবেশনেই উপস্থিত হইলাম। এখানে ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সভায় আমরা তিন চারি জন বাঙ্গালী ও ডাক্তার সাইমেনসেন প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও সহকারী ছাড়া বাঙ্গালোরের Tata Institute of Science হইতে ডাঃ সড্‌বরো, ডাঃ ওয়াটসন, ত্রিবাঙ্কুর কলেজ হইতে অধ্যাপক গিবসন, কলম্বো হইতে অধ্যাপক জোসেফ প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান-সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালীর একটি বিষয়ের প্রতি আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বিজ্ঞান-সম্মিলনে সকল শাখার পঠিতব্য প্রবন্ধের নাম পূর্ব্ব হইতে মুদ্রিত করিয়া সদস্যগণকে দেওয়া হয়। তাহাতে এই সুবিধা, প্রত্যেক সদস্য জানিতে পারেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে সভায় আলোচনা হইবে এবং সেই সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য সকলে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে পারেন। বাস্তবিক, আমি দেখিতে পাইতেছি বিজ্ঞান-সম্মিলনে প্রবন্ধপাঠান্তে যে আলোচনা হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। সাহিত্য-সম্মিলনীতে এখন যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহাতে সদস্যগণ সভায় গমনের পরও জানিতে পারেন না যে, কোন্ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ হইবে। সেইজন্য আমার মনে হয়, বিজ্ঞান-সম্মিলনের এই প্রথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত হইলে আলোচনা আরও গভীর ও কার্য্যকরী হইবে।

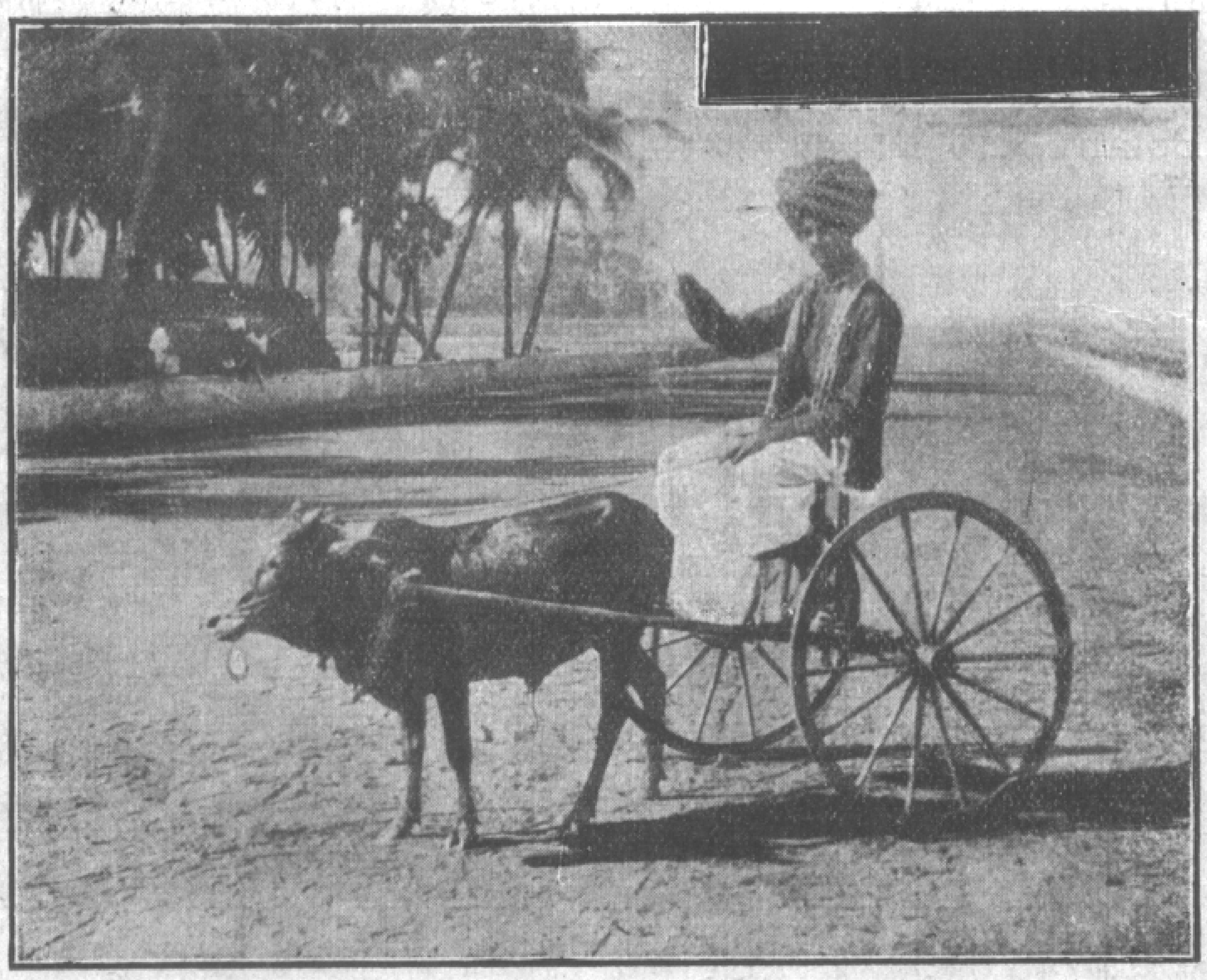
প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনায় তিন চারি ঘণ্টা কাটিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মৌলিক প্রবন্ধ ভিন্ন অন্য প্রবন্ধ বিজ্ঞান-সম্মিলনে পঠিত হয় না। বলা বাহুল্য রসায়ন শাখায় পঠিত সকল প্রবন্ধই মৌলিকতাপূর্ণ ছিল। সভাপতি-মহাশয় প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে বলিয়াছিলেন, যে-সকল প্রবন্ধ সভায় পঠিত হইল সেগুলি

বিলাতের যে-কোনও বিজ্ঞান সভার উপযুক্ত। ডাঃ সড্‌বরো সভাপতি-মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমি সমস্তক্ষণ রসায়ন-বিভাগে উপস্থিত থাকাতে অন্যান্য বিভাগে যাইতে পারি নাই। তবে সকলের নিকট শুনিলাম যে, প্রত্যেক বিভাগেই উচ্চদরের মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় মিঃ রমন Investigation in accoustics সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড বাহাদুরের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা যথাসময়ে সেথানে উপস্থিত হইলাম, এবং সেখানকার সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইলাম।

১৬ই জানুয়ারী—আজ সম্মিলনের শেষ দিন। বক্তৃতা, সভা ও নিমন্ত্রণের দৌরাত্ম্যে মাদ্রাজ সহর দেখা খুব অল্পই হইয়াছে। আজ আবার তিন-তিনটা নিমন্ত্রণ অথচ সহর দেখাও চাই। এদিকে সকাল হইতেই ঝুপঝাপ বৃষ্টি। মাদ্রাজে আসিয়াই এখানে কত বাঙ্গালী আছেন সে খোঁজ লইয়াছিলাম। শুনিলাম মাদ্রাজে বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়—গভর্ণমেণ্ট আফিস প্রভৃতিতে দুই-চারজন থাকিতে পারেন। কিন্তু উত্তর-ভারতের যেথানেই গিয়াছি, সেইখানেই বাঙ্গালীদের এক-একটি ছোট-বড় colony দেখিয়াছি। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে বাঙ্গালী বড় আসে নাই। এখানে বাঙ্গালীদের একটি কীর্ত্তির কথা উল্লেখযোগ্য —সেটি রামকৃষ্ণ আশ্রম। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য বিবেকানন্দের পথপ্রদর্শিত সেবাধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী আজ কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে সেবা-



“রেকলা” নামক অশ্ব বা গো-যান

আতুরাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দীন-দরিদ্রের সেবায় নিযুক্ত। সুদূর মাদ্রাজেও একটি রামকৃষ্ণ আশ্রম আছে জানিয়া এক দিন দেখিতে গেলাম। সেখানে দুইজন নবীন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে দেখিলাম। এক জন আমারই ছাত্র। এই ছাত্রটি রাজসাহী কলেজে বি-এস-সি পাশ করিয়া বিবাহাদি না করিয়া এই দলভুক্ত হইয়াছে এবং মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া আশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া একটি ছাত্রাবাস খুলিয়াছেন এবং সেখানে পঁচিশ-ত্রিশজন দরিদ্র মাদ্রাজী বালককে বেতন ও আহারাদি দিয়া কলেজে পড়াইতেছেন। এই আশ্রম হইতে একখানি পত্রিকাও তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন।

আজ সম্মিলনের শেষ দিন। এ কয় দিন ডাঃ রায়-মহাশয় সকালে বিকালে সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া বেড়াইয়াছেন। ডাঃ মল্লিক আসিয়া অবধি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এখানেও ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা আছে ও দশ বার জন মাদ্রাজী ব্রাহ্মও আছেন। আজ সকাল হইতে বাদল নামিয়াছে। সেই বৃষ্টিতেই আমরা সকালে একটি ছাত্রাবাসে ছেলেদের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গেলাম। এই ছাত্রেরা এ কয় দিবস আমাদের বহু পরিচর্য্যা করিয়াছে।

সকালে 'লাইট হাউস' দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে ভূবিদ্যা ও মানব-বিদ্যা বিষয়ক সম্মিলনের শাখা অধিবেশনে যাইতে পারিলাম না। বেলা ২টার সময় সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহ-সভার অধিবেশন ছিল। তাহাতে স্থির হইল, পর বৎসর (১৯১৬) লক্ষ্ণৌয়ে সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হইবে।

বেলা ৪টার সময় বাঙ্গালীভক্ত মিঃ সুব্রমনিয়াম-মহাশয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সেখান হইতে Surgeon-general Bannermann-এর বাটীতে সান্ধ্যসম্মিলনীতে রওনা হইলাম। বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী আনী বেসান্তকে দেখিলাম। কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মাদ্রাজের সহরতল্লী আডেয়ার নামক স্থানে এখন তাঁহার প্রধান আস্তানা। এখানে আসিয়া তিনি New India নামক একখানি দৈনিক কাগজ বাহির করিয়াছেন। এই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার সংবাদ-পত্রখানিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার যথেষ্ট ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় যাইবার ট্রেন। সেইজন্য এখানে অল্প সময় থাকিয়াই ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিলাম। ষ্টেশনে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, প্ল্যাটফর্ম্মে বহু ছাত্র ও কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদিগকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত। মাদ্রাজবাসীরা এ কয়-দিবস আমাদের এত যত্ন করিয়াছিলেন যে, আমরা বিদেশে আসিয়াছিলাম সে কথা একবারও মনে হয় নাই। তাঁহাদের আন্তরিক সেবা ও যত্নের কথা ভুলিবার নহে।

দারোগাগিরির একটুকরা

ভাটা আরম্ভ হইয়াছে অনেকক্ষণ, কাজেই নৌকা খুলিয়া দিলাম। খাবার জিনিষগুলি শ্যামলালবাবুর নৌকাতেই ছিল, প্রস্তাব হইল যে, রান্নার সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকা ডেকলতলার দিকে অগ্রসর হইবে। শ্যামলালবাবুর নৌকাখানা আমাদের আগে আগে চলিতে লাগিল।

সে নৌকাখানা ছিল ছোট, কাজেই দেখিতে দেখিতে সেখানা আমাদের চোখের আড়াল হইয়া গেল। আমি ও কেদার-বাবু রাত প্রায় নয়টার সময়ে থানার ঘাটে পৌঁছিয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলাম। তখন চারিদিক অন্ধকার—ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্যাম-লালবাবুর তল্লাস করিলাম, শুনিলাম তিনি একটা জরুরি মোকদ্দমায় ঘাটে না নামিয়াই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন! বাঃ! অত রাত্রে বাজার-হাটও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বাজারেও কিছু মিলিল না। বিরক্ত হইয়া আমরা সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

একে গভীর অন্ধকার রাত্রি,—তার উপর প্রবল বৃষ্টি ও কন্‌কনে বাতাস! জলে নদী ও মাঠ একাকার হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একমিনিটের জন্যও রামদীন মাঝিদিগকে নৌকা বাঁধিতে দিলনা। কিন্তু তবু পথ যেন আর ফুরাইতে চায় না! ডেকলতলা হইতে কল্যাণপুর আসিতে অথচ ভোর-বেলায় দেখা গেল, কল্যাণ-পুরের কোন চিহ্নই নাই!

আমাদের মধ্যে কেদারবাবুর এই অঞ্চলের পথঘাট জানা ছিল। ভোরবেলা বৃষ্টি থামিলে তিনি ছাপ্পড়ের বাহিরে আসিয়াই বলিলেন, "এ কিরে মাঝি। এ কোথায় নিয়ে এসেছিস্? এ'ত কল্যাণ-পুরের রাস্তা নয়,—এ'যে থল্‌সে-মারির বিল! সর্ব্বনাশ করেছিস্,—এখন উপায়?" কোথায় কল্যাণপুর গিয়া স্নানাহার করিয়া তিন দিনের পর একটু পরিতৃপ্তি লাভ করিব,—তা' নয় এই অকূল সমুদ্রে পড়িলাম! চারিদিকে অসীম সমুদ্রের মত জল থই থই করিতেছে,—বহুদূরে দিগ্বলয়রেখার প্রান্তসীমায় দুই-একটী গ্রামের অস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহার কোনটীই দুই ক্রোশের কম দূর হইবে না! মাঝি-মাল্লারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল,—রামদীন সিং ত চটিয়াই লাল,—মাঝিকে মারে আর কি!

অনুশোচনা করা বৃথা। কাজেই মাঝিকে একখানি গ্রাম লক্ষ্য করিয়া নৌকা বাহিতে আদেশ করিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় তথায় উপস্থিত হওয়া গেল। নৌকা হইতে নামিয়া সকলকে সাবধান করিয়া বলিলাম, "দেখো, তোমরা কেউ কোন কথা কোয়ো না—আমি যা করি, চুপ করে তাই দেখে

ঘাটে পান্‌সী ভিড়িতেই বালক বৃদ্ধ যুবা অনেকে কৌতূহলী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। আমি উহাদের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া সামনের একখানা বাড়ী দেখাইয়া বেশ মুরুব্বি-আনা চালে বলিলাম, "এ বাড়ী কার হে বাপু?" একজন প্রাচীন বয়স্ক লোক সম্মুখে আসিয়া বলিল, "সেবা দেই কর্ত্তা, বাড়ী আমারই।"

কি নাম তোমার?

আজ্ঞে আমার নাম বিশ্বনাথ মণ্ডল। আমরা পোদেরা।

তোমার নাম বিশ্বনাথ? তোমার বাপের নাম কি?

আজ্ঞে হাঁ, আমারই নাম বিশ্বনাথ, আমার ঠাকুরের নাম ছিল গয়ানাথ মণ্ডল।

ওঃ তুমি থল্‌সে কোঠার গয়ানাথ মণ্ডলের পুত্র বিশ্বনাথ মণ্ডল?

বিশ্বনাথ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। রামদীনের "লাল পাগড়ী আর কালো কুর্ত্তা" দেখিয়া আমরা যে "সরকারী" লোক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। "সরকারী-লোক"কে পাড়াগাঁয়ে জ্বর ওলাওঠা প্লেগ বসন্তের চেয়ে কেহ কম ভয় করে না। বিশ্বনাথ ভীতিবিহ্বল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার খোঁজ করছেন কেন কর্ত্তা? আমি কারো সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না, আমি পান্তা ভাত বাতাসা দিয়ে খাই! তবে আজ আমার ঘাটে আপনাদের পায়ের ধূলো পড়ল কেন? আমি ত কোন দোষে দোষী নই কর্ত্তা!"

বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম, "খবর পাওয়া গেছে, তেজারতি ও মহাজনীতে তোমার বিস্তর টাকা আয়, এ যাবৎ তুমি কোন ট্যাক্স দাওনি,—এবার সরকার বাহাদুর তোমার পঁয়ত্রিশ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করেছেন। আমি সেই কথা জানাতে এসেছি আর তোমার কোন আপত্তি থাক্‌লে খাতা-পত্র দেখব।"

বিস্তারিত লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সুতরাং সংক্ষেপেই বলি। বিশ্বনাথের দৌলতে সে বেলাটা আমাদের মাছে দুধে বেশ পরিতোষ রূপেই আহার হইয়া গেল! অপরাহ্নে দুইকুড়ি হংসডিম্ব এবং একটী নধর-দেহ অজশিশু আমাদের সহযাত্রীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিলাম।

নির্দ্ধারিত দিবসে ক্লেক্ সাহেব মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া আসামীগণের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিলেন। রায়প্রকাশের দিনে আবার শ্যামলাল বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম। বলা বাহুল্য, তিনি অম্লানবদনে আমার গৃহেই আতিথ্য স্বীকার ও গুরু ভোজনে তাঁহার স্ফীতোদরকে অধিকতর স্ফীত করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন। এবং বিদায় লইবার সময়ে আমাকে ভরসা দিয়া গেলেন যে, পুলিশ-সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া তিনি আমাকে তাঁহার সহকারী-রূপে অবিলম্বে ডেফলতলায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ জীবনে শ্যামলালবাবুর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

জর্দ্দাপরী

জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! হিরণ-জরির ওড়না গায়
দুপুর বেলার তীক্ষ্ণ রোদে পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
“যাই কোথায়?—
হায় রে হায়!
সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায়।”

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার?
“আবার কার?—
এই আমার!—
কুঙ্কুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙায় উৎস জ্যোৎসনার।”

জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! জমাট জরীর বোর্কা গায়
রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে তুই পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
“যাই কোথায়?—
হায় রে হায়
দরদ্ দিয়ে বুঝ্‌তে জরদ্ গরদ-গুটির দরদ-দায়।”

ধনের ঘড়া কক্ষে তোমার জোনাক-পোকার হার চুলে,
আলেয়া তোর চক্ষে জ্বলে চাইলে চোখে চোখ ঢুলে!
“চোখ ঢুলে?—
মন ভুলে?—
কুবের-পুরীর সোনার কবাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে।”

দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস তায় নিরাশ!
“বাস্‌রে বাস্!
সোনার চাষ—

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস আঁখির ভায়,
লোভের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিস্‌নে ধরা ফিরাস্ পায়।
"ফিরাই পায়?
হায় গো হায়—
পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায়।"

জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চলছ খালি ফুলের ডালি ডাহিন বাঁয়।
"সোনার পায়
মাড়াই যায়
আমার স্বয়ম্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায়!"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম, এ, এফ, এস্, এস, এফ, আর, ই, এস বিরচিত। কলিকাতা, ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়। যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ রাখিবার ধার ধারেন না, তাঁহারা এটুকু অন্ততঃ জানেন যে কালীপ্রসন্নের উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও অপরিসীম অর্থব্যয়ে সমগ্র মূল সংস্কৃত মহাভারতের উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ সাধিত হয়। কালীপ্রসন্ন যদি এই কাজটুকু ব্যতীত আর কিছু না-ও করিতেন, তথাপি তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল থাকিত। কিন্তু কালীপ্রসন্ন তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অর্থ-বল লইয়া শুধু মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। "কালীপ্রসন্নের যুগ বাঙ্গালায় প্রকৃতই 'renaissance' এর যুগ।" ভূমিকা-লেখক যে বলিয়াছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর প্রতিভা-পুনঃ-প্রদীপ্তির যাঁহারা প্রবর্ত্তক, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদিগের অন্যতম। বাঙ্গালায় এই দ্বিতীয় মানসিক উদ্দীপ্তির রোশনাইয়ে যাঁহারা মশাল ধরিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদিগের একজন" এ কথা খুব ঠিক। তখনকার কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা সংঘাতে প্রাচ্যের সকল বিশেষত্ব ভীষণ দোলা পাইয়াছিল—সেই দারুণ দুর্দ্দিনে সর্ব্ব-সুখে সুখী, বিপুল সম্পত্তিশালী কালীপ্রসন্ন তাকিয়ায় ঠেশ্ দিয়া অলস-বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া মনুষ্যত্বের অপমান করেন নাই—তিনি তাঁহার প্রভূত অর্থ, বিশিষ্ট প্রতিভা এবং যৌবনের সকল উদ্যম-অবসর লইয়া বাঙ্গালায় মনুষ্যত্ব-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন; নানাবিধ সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহা কাজে খাটাইতে ক্ষান্ত ছিলেন না; সর্ব্ব প্রকার সৎকার্য্যে অকাতরে সাহায্য করিয়াছিলেন; এবং বঙ্গ সাহিত্যে সেই পণ্ডিতী-ভাষার যুগে অত্যন্ত সহজ ঘরোয়া বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্রূপাত্মক রচনা

প্রকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভণ্ডামির আবরণ-মোচনে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার "হুতোম-প্যাঁচার নক্সা" বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি দিক উজ্জ্বল রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, এমন অসাধারণ কর্ম্মবীর তরুণ বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাঙ্গালীর আরও দুর্ভাগ্য যে এই কর্ম্মবীরের পরিচয় লইবার জন্য এতদিন বিন্দুমাত্র উদ্যোগ দেখা যায় নাই। সম্প্রতি গ্রন্থকার বিস্তর পরিশ্রমে এ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি সবিনয়ে কহিয়াছেন, "আমি এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড লইয়া বাণীমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। যে শিল্পিগণ আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসরূপ স্তম্ভ-নির্ম্মাণে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা যদি ইহা ব্যবহারোপযোগী মনে করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে। ভারবাহীর কার্য্যের সমালোচনা নাই, তাহার কার্য্য প্রশংসা ও নিন্দার বহু নিম্নে।" আমাদের কিন্তু মোটের উপর গ্রন্থখানি ভালই লাগিয়াছে। ইহাতে লেখকের চরিত-রচনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সংগ্রহ নিপুণ, সমাবেশ-শক্তি নিপুণতর। রচনায় প্রাঞ্জলতা আছে, লেখার গুণে রচনাটিতে লেখক প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন—শুধু ঘটনার কাঠামোটুকু ধরিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—কালীপ্রসন্নের উদার মহান হৃদয়ের পরিচয়ও তিনি দিতে পারিয়াছেন, অথচ তাহারই মধ্য দিয়া বাঙ্গালার অতীত যুগের একটি মনোজ্ঞ ছবি দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচনার কোথাও একটা অসংযত উচ্ছ্বাস বা মিথ্যা আড়ম্বর নাই, ইহাই এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব! তবে ভাষা আর একটু সহজ ও সরল হইলে ভাল হইত। বাঙ্গালার বহু মনস্বীর চিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—হেমেন্দ্রবাবুর ভূমিকাটি সুন্দর।

শ্রীমাতৃশ্লোক-শতকম্। বঙ্গানুবাদরসোদ্দীপনী-টীকা-সমন্বিতম্। তত্র চ শ্রীশ্রীজগদীশস্তোত্রম্। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টরাজেন মুদ্রিতম্। কলিকাতা, হাওড়া, কাদম্বিনী যন্ত্রে জয়দেব মুদ্রাযন্ত্রে চ মুদ্রিতম্। মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়াংশ চারি আনা। সংস্কৃত শ্লোক-রচনায়

চন্দন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। কলিকাতা, মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ—অনেকগুলি খণ্ড কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলিতে বিষয়-বৈচিত্র্য আছে—তবে কোন কবিতাতেই কবিত্বের তেমন ছাপ দেখিলাম না—ছন্দও অনেক স্থলে পঙ্গু, আড়ষ্ট।

পুষ্পমঞ্জরী। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনিখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চম্পিও, ব্রহ্মদেশ। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত বারোটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলি নানা দেশের নানা জাতির পাত্র-পাত্রী লইয়া লিখিত—তাহার মধ্যে একটি রূপকও আছে। অনেকগুলি গল্পেরই উপাখ্যানে বৈচিত্র্য আছে—তবে লেখক রঙের উপর রঙ লেপিয়া সেগুলিকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ভাষায় অত্যন্ত মুদ্রাদোষ—কবিত্ব ফুটাইবার চেষ্টায় গল্পের দম অনেক জায়গায় বন্ধ হইয়াছে। শব্দ-চিত্র গড়িবার একটা উৎকট প্রয়াস পাঠককে প্রতি পত্রে কাতর করিয়া তুলে। এই সকল মুদ্রাদোষ ত্যাগ করিয়া সহজ ভাবে লিখিবার চেষ্টা করিলে লেখক গল্প লিখিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে হয়। রোমান্সে তাঁহার শক্তি মন্দ নয়—তবে ভাষার দিকে বিলক্ষণ নজর রাখা প্রয়োজন। এমন 'জ্যাবড়া' করিয়া রঙ লেপিলে সব মাটি হইয়া যাইবে। জাপানী গল্পগুলিতে কয়েকখানি চিত্র আছে।

প্রণয়-প্রলাপ। শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, গৃহস্থ পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা, বাঁধানো দেড় টাকা মাত্র। এখানি ইংরাজ কবি ম্যাকে লিখিত "Love-letters of a violinist" নামক গ্রন্থের অনুবাদ। লেখায় কবিত্ব আছে—তবে ভাষা আরও সহজ এবং সরল হইলে অনুবাদে মূলের প্রাণ-সৌন্দর্য্য বজায় থাকিত। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল।

দরিদ্রের ক্রন্দন। শ্রীযুক্ত রাধাকমল

পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। কাশীমবাজার সত্যরত্ন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "আধুনিক ধনবিজ্ঞানের সহিত দেশের জাতীয় আদর্শের সামঞ্জস্য রাখিয়া বৈষয়িক উন্নতি সাধনের পন্থা ইঙ্গিত করিয়াছি। * * দেশের দারিদ্র্যের সহিত পল্লীর অবনতির যে যোগাযোগ আছে, তাহা দেখাইয়া পল্লীগ্রামের উন্নতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন এখনই না করিলে আর দেরী সহিবে না। * * * দারিদ্র্য লইয়া শুধু কি অভাবক্লিষ্ট শিল্পী, বা ধনবিজ্ঞানবিৎ আলোচনা করিবেন? শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি এমন কি ধর্ম্মের উন্নতি দারিদ্র্য-মোচন না হইলে অসম্ভব। শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক আর কতকাল শুধু কল্পনা-রাজ্যেই ঘুরিবেন? বাস্তবরাজ্যে একবার নামুন, বাস্তবের হাহাকার দুঃখবেদনার মধ্যে শিক্ষার ফল, বা ধর্ম্মের ভাবুকতা পাইবার কেহ কি কখনও আশা রাখেন?" গ্রন্থকার অধ্যাপক। এ বিষয় লইয়া বহুদিন তিনি আলোচনা করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও তিনি দাবী রাখেন। রীতিমত হিসাব ধরিয়া তিনি এদেশের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের জের কাটিয়াছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থার কারণ-নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা নিরাকরণের উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্নসংস্থান," "শিক্ষা ও ব্যবসা-প্রচার," "পল্লীচর্য্যা-বিধান" "বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্যে বণিকের আধিপত্য ও প্রতিকার" প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখক দারিদ্র্য-সমস্যার সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার যুক্তি সুদৃঢ়—ইঙ্গিত সুনিপুণ; গ্রন্থখানির আগাগোড়া কাজের কথায় পরিপূর্ণ, কোথাও বাজে উচ্ছ্বাস নাই। লেখকের সব মতের সহিত সর্ব্বত্র সকলের মিল না হইতে পারে, তবে তাঁহার মতগুলি ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য, কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। পল্লীবিষয়ক প্রবন্ধগুলি চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। এ গ্রন্থ সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

মহারাজা সিন্ধিয়া কে ব্যাখ্যান। সংপাদক রামজী দাস বৈশ্য। ১৯১৫। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। সম্পাদক মহাশয় সম্প্রতি গোয়ালিয়রের মহানুভব মহারাজা স্তর মাধবরাও সিন্ধিয়া বাহাদুরের অনেকগুলি বক্তৃতা দুইভাগে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতাগুলির অধিকাংশই হিন্দী ভাষায় রচিত—ইংরাজী বক্তৃতাও আছে। বক্তৃতাগুলি নানা বিষয়ে—সকলগুলিতেই মহারাজা বাহাদুরের কৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট। মহারাজা বাহাদুর আপনার রাজ্যে সকল ব্যাপারের সহিত যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত এবং সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থার যে তিনি প্রাণ-স্বরূপ—তাহা এ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। রাজ্যের সকল বিভাগেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। নিজের কাজ নিজে দেখিয়া করিলে তাহা যেমন সুসম্পন্ন হয়, এমন আর কিছুতে নহে। মহারাজ বাহাদুর এ নীতির অনুসরণ করেন। প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেন; এবং তাহা সার্থকও হইতেছে। ভারত-সম্রাট ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি মহারাজা বাহাদুরের ভক্তি-প্রীতি অপরিসীম। এই মহাযুদ্ধে আলস্যের মায়া কাটাইয়া সসৈন্যে তিনি জর্ম্মানির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার রাজ্য নানা বিষয়ে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। এ উন্নতির মূলে যে তাঁহার উদ্যোগ নিহিত আছে, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থখানির ছাপা-বাঁধাই চমৎকার; অনেগুলি চিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সমালোচক।

তুফান। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম. এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার; অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, উমা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে লেখকের সাতটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি নানাবিষয়ক—"নাম," "গীতাব্যাখ্যায় প্রলাপ," "প্রোফেসার ও অধ্যাপক," "বাঙ্গালায় চিঠিলেখা," "তিন," "বঙ্গে অকালবার্দ্ধক্য" ও "ডাকঘরের আত্ম-কাহিনী।" প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতা ও তথ্যের

বেশ সমাবেশ ঘটিয়াছে—স্নিগ্ধ কৌতুক-রসেরও অভাব নাই। 'নাম' প্রবন্ধে নামের মহিমার কথা বিদ্রূপচ্ছলে কীর্ত্তিত হইয়াছে—প্রবন্ধটি উপভোগ্য। "বঙ্গে অকাল-বার্দ্ধক্য" প্রবন্ধে বাঙ্গালীর অকাল-বার্দ্ধক্যের হেতু নিরূপণ করিয়া লেখক তাহা নিরাকরণের পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—প্রবন্ধটি অনুশীলনযোগ্য। বিজ্ঞান-চর্চ্চার অবসরে লেখক যে লঘু সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে একটি ছোট ত্রুটির উল্লেখ করিব—গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজের সুখ্যাতি করিতে পারি না। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক এ ত্রুটিটুকু সংশোধন করিয়া লইবেন।

বঙ্গমহিলার জাপান-যাত্রা। শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা প্রণীত। মাতৃনিকেতনের সাহায্যার্থ কুমারী শান্তিপ্রভা মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, ভারত-মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। লেখিকা মল্লিক-কন্যা, জাপানী শিল্পী ওয়েমান তাকেদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ওয়েমান তাকেদা পূর্ব্বে 'বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরিতে' সাবান-নির্ম্মাতার কর্ম্ম করিতেন, পরে নিজে 'ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরি'র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে লেখিকা স্বামীর সহিত জাপান যাত্রা করেন। সেই বৃত্তান্ত এ গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও রচনাটি উপভোগ্য, ভাষায় অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই—পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা দেখাইবার জন্য কোনরূপ টিপ্পনীও রচনায় স্থান পায় নাই। রচনায় এমন একটি স্বচ্ছ সরল প্রবাহ আছে যে বইখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। জাপানের অন্তঃপুরের যে ছবিটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুন্দর ও মনোজ্ঞ। জাপান-সম্বন্ধে আরও দুই-একখানি সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়িয়াছে—সেগুলির সহিত ইহার পার্থক্য এই—এ গ্রন্থে জাপানী নারীর অন্তরের পরিচয়টুকু অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার কারণ, লেখিকা জাপানে যে কয়মাস কাটাইয়াছিলেন, তাহা অন্তঃপুরে, জাপানী নারীর দলে—তাহাও আবার খুবই আত্মীয়-সম্পর্কে! এইটুকুই ইহার বিশেষত্ব।

স্রোতের ফুল। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। ভারতীর পাঠক-পাঠিকাগণকে এ গ্রন্থের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না—কারণ, দীর্ঘ দেড় বৎসরের উপর ধরিয়া এ উপন্যাসখানি 'ভারতী'তে ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল। এখানিকে প্রকৃতপক্ষে 'সামাজিক উপন্যাস' বলা যায়—সমাজের বহুবিধ দোষ, কুসংস্কার, ও অকল্যাণকে কল্যাণ এবং জ্ঞানের সংঘর্ষে আনিয়া বহুবিধ চরিত্রের মধ্য দিয়া লেখক সুন্দর একখানি চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রচনার কৌশলে উদ্দেশ্য কোথাও উপন্যাসের রসকে ছাপাইয়া উঠে নাই। প্লটটি যেমন সুনির্ব্বাচিত তেমনি সুকৌশলে গ্রথিত। অধিকাংশ চরিত্রই এমন সুগঠিত যে উপন্যাস পড়িবার সময় ভুলিয়া যাইতে হয় যে উপন্যাস পড়িতেছি—মনে হয়, যেন আমাদের চোখের সম্মুখে রক্ত-মাংসে গড়া নর-নারীর জীবন্ত লীলা দেখিতেছি। কর্ত্তা, গিন্নি, জয়াপিসি, রোহিণী ও নিবারণ মুখুয্যে—এ কয়টি চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব নিখুঁত সৃষ্টি—ইহাদের উপর কোথাও এতটুকু উদ্দেশ্যের ছাপ পড়ে নাই! একেবারে গোটা মানুষগুলাকেই যেন সমাজের বুক হইতে টানিয়া আনিয়া গ্রন্থকার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আঁটিয়া দিয়াছেন—এটুকু কম কৃতিত্বের কথা নয়। আমরা যতদুর জানি, এইখানিই গ্রন্থকারের প্রথম উপন্যাস—সে হিসাবে বলিতে পারি, তিনি উপন্যাস-রচনায় সফলতা লাভ করিয়াছেন। ইহার অধিক বলা, বোধ হয়, সঙ্গত হইবে না—কারণ 'স্রোতের ফুল' 'ভারতী'র নিজস্ব সম্পত্তি। তাই সত্যের খাতিরে যেটুকু না বলিলে নয়, শুধু সেইটুকু বলিলাম। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ উৎকৃষ্ট—আকার সুবৃহৎ, ৩৯৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কাজেই মূল্যও বেশী বলিয়া মনে হইল না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

নীল পরী

কানে সুনীল অপ্‌রাজিতা, পাপ্‌ড়ি চুলে জাফ্‌রাণের,
পায়ে জড়ায় নূপুর হ'য়ে শেষ বাসরের রেশ গানের,
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নালে উত্তরী,
নীল পরী গো নীল পরী।

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপ্‌টি নীলা কাঁচ-পোকার,
ধূপের ধোঁয়া পাখ্‌না তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার!
ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিন্ধনে মেঘ-ডম্বরী,
নীল পরী গো নীল পরী!

ঢুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় ঢুলের তুমি ঢল্ বিথার,
তন্দ্রা তোমার সুর্ম্মা চোখের তন্দ্রা তোমার আল্‌তা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ দু'হে নাও তার বিজুলী শিং ধরি'
নীল পরী গো নীল পরী!

স্বপ্ন তোমার শাড়ীর আঁচল, মূর্চ্ছা নিচোল নীল বরণ,
ঘুম সে তোমার আল্‌গা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
বিদায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আঁখির শর্ব্বরী
নীল পরী গো নীল পরী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আমাদের কথা

বৎসরের শেষে ভারতীর গ্রাহক অনুগ্রাহক এবং লেখকবর্গকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ভারতীর নিয়মিত লেখকেরা সকলেই এ বৎসর ভারতীতে লেখা দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছি বলিয়াই আমাদের সম্পাদন-কার্য্য এত সহজ হইয়াছে এবং ভারতী যে-ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, মোটের উপর সেই আধটু বদল হইয়া থাকিবে—কিন্তু সে সামান্য। কাজেই এ কথা বলিতে দোষ নাই যে ইতিমধ্যে ভারতীর অবনতির কোন কারণ ঘটে নাই; উন্নতি হইয়াছে কি না পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

এ বৎসর কয়েকটি নূতন লেখককে আমরা পাইয়াছি। তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা অব্যাহত থাকুক—এই কামনা করি।

আগামী বর্ষে ভারতী চল্লিশ বৎসরে

আমাদের জন্ম হয় নাই। ভারতীকে আমরা গড়িয়া তুলি নাই, ভারতীই আমাদের গড়িয়া তুলিয়াছে; সেই ভারতীর সেবার ভার এখন আমাদের উপর—ইহাতে আমরা কৃতার্থ।

ভারতী বয়সে প্রাচীন হইতে চলিয়াছে বটে কিন্তু ইহার অন্তরে কখনো প্রাচীনতার ছোপ্ পড়ে নাই। চিরদিনই ভারতী সময়ের সঙ্গে তালে তালে পা রাখিয়া চলিয়াছে, কখনো পিছনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে নাই। কাজেই সে চির নবীন।

ভারতীর এই উন-চল্লিশ বৎসরের হিসাব বড় কম হিসাব নহে। বঙ্গ-সাহিত্যের গতির ইতিহাস ইহার সহিত জড়িত। এই সাহিত্যের ভয়, আশা, উদ্বেগ, উচ্ছ্বাস, চিন্তা, কর্ম্ম, স্বপ্ন—এ সমস্তেরই ঢেউ ইহার বুকের উপর দিয়া খেলিয়া গিয়াছে। আমাদের জীবন-সমস্যার জটিলতাও ইহাকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত নামজাদা লেখকের জন্য ভারতী আসন জোগাইয়াছে। ইহার কোলে বসিয়া আমাদের অনেক যশস্বী যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। আগামী বৈশাখ-সংখ্যায় ভারতীর চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে আমরা এই সকল কথার আলোচনা করিব।

ভারতীর এই চল্লিশ-বছরটিকে লইয়া একটি ছোটোখাটো উৎসব করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে। এই উপলক্ষ্যে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকদের আমরা নিমন্ত্রণ করিতেছি এবং প্রাচীন লেখকদের কাছেও আহ্বান পাঠাইতেছি। এ উৎসব কোনো উৎসব-মণ্ডপের মধ্যে আবদ্ধ উৎসব নয়, এ উৎসবের আনন্দ আমরা ভারতীর পাতায় পরিবেষণ করিব। মনে ইচ্ছা অনেক আছে কিন্তু তাহা কাজে করিয়া তুলিতে পারিব কি না জানি না। যাঁহারা ভারতীর সারথি ছিলেন এবং যে সমস্ত মহারথী ভারতীর বল, তাঁহাদের অনুগ্রহ পাইলে এ কার্য্য তেমন দুরূহ হইবে না।

এ বৎসর ভারতী আমরা ভয়ে ভয়ে চালাইয়াছি—নূতন ব্রতী বলিয়া প্রতি পদে আশঙ্কা লইয়া আমাদের চলিতে হইয়াছে। এই একবৎসরের আশঙ্কার মধ্য হইতেই আমরা কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়াছি। সেই জন্য আশা করি আগামী বৎসরে আমাদের গতি সহজ হইবে এবং আমরা ভারতীর সৌষ্ঠব-বর্দ্ধনে অধিকতর পারদর্শী হইতে পারিব।

আমরা ভারতীর পৃষ্ঠায় গ্রাহকবর্গের কাছে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার উত্তরের সংখ্যা গ্রাহক-সংখ্যার তুলনায় নিতান্তই সামান্য; এবং চিঠিগুলি বাছিয়া সাজাইলে মত এই দাঁড়ায় যে ভারতী যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক। কেহ হয়ত কোনো বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু ঠিক সেই জিনিষকেই আর-একজন বাহবা দিয়াছেন। বেশী লোকের মতে এইটি ভালো—এমন কোনো নিষ্পত্তি পাই নাই। কাজেই তাহার উপর বিশেষ ঝোঁক দেওয়া যায় না। কয়েকখানি চিঠিতে আমরা ভালো পরামর্শ পাইয়াছি। সেগুলি আমাদের গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।